দুঃশাসনের পাঁচ বছর

১৯৯৬-২০০১

জিবলুর রহমান

দুঃশাসনের পাঁচ বছর

(১৯৯৬-২০০১)

জিবলু রহমান

নয়ন প্রকাশন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ ❑ এপ্রিল ২০০৫
স্বত্ব ❑ লেখক
প্রচ্ছদ ❑ এস কে মাসুম
প্রকাশক ❑ রাহেলা খাতুন, নয়ন প্রকাশন,৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০
অক্ষর বিন্যাস ❑ হৃদয় কম্পিউটার, ঢাকা-১০০০
মুদ্রণ ❑ আল ফয়সাল অফসেট প্রিন্টার্স, ঢাকা-১১০০
মূল্য ❑ ৪০০.০০ টাকা

DURSHASHANAR PACH BACHOR : By Jiblu Rahman. Published by Rahala Khatun, Noyun Prokashon. 34 North Brook Hall Road. Banglabazar. Dhaka-1100.
Cover design by SK Musam
Price : Taka 400.00 Only.
US $ 10

ISBN- 984 - 8404- 46 -5
www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

দৈনিক দিনকালের
সহকারী সম্পাদক
আমিনুর রহমান সরকার-কে

www.pathagar.com

সূচিপত্র

রেডিও-টিভি নিয়ে রাজনীতি / ১১
অর্থনীতির বারোটা / ২৪
আওয়ামী সরকারের পররাষ্ট্রনীতি / ৪২
আওয়ামী আমলে বি.এস.এফ-এর পাদুয়ায় হত্যাকান্ড / ৫৬
কোন নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হতে দেয়নি আওয়ামীরা / ৮০
কাদের সিদ্দিকীর উপর নির্যাতন / ৯৮
ভারতীয় আগ্রাসনে নীরবতা / ১১৮
আওয়ামী লীগের ইসলাম চর্চা / ১৫৩
সীমান্তে ভারতীয় আগ্রাসন / ১৭৫
শেখ হাসিনার বিদেশ সফরের খতিয়ান / ১৮৮
সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নমুনা / ১৯৫
শিক্ষা ক্ষেত্রে দলীয়করণ / ২৩৬
বিচার বিভাগ পৃথক করা হয়নি / ২৭৭
বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতা / ২৮২
দুর্নীতি দমন ব্যুরোর স্বাধীনতা দেয়া হয়নি / ২৮৯
হাসিনার নিরপত্তায় কুকুর আমদানী / ২৯৪
৫৪ ধারা আইনের অপপ্রয়োগ / ২৯৭
বিশেষ ক্ষমতা আইনে নিপীড়ন / ৩০২
এমপির বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ / ৩১৪
নিরাপত্তা রক্ষায় গোয়েন্দা সংস্থার ব্যর্থতা / ৩১৮
গণনিপীড়নমূলক জননিরাপত্তা আইন / ৩২৪
আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা / ৩৪৪
ব্যাংক দখল করেছেন আওয়ামী নেতা বাবু / ৩৬১
অরক্ষিত আদালত / ৩৬৩
আইনের শাসনের প্রতি আঘাত / ৩৭১
মামলার জট / ৪০১
নারী নির্যাতন / ৪২৯
পুলিশের অপরাধ প্রবণতা / ৪৩৬
মামলার রাজনীতিতে পারদর্শীতা / ৪৫৮
কারাগার নরকে পরিণত / ৪৭২
প্রশাসনের সর্বস্তরে দুর্নীতি / ৪৮০
মুজিব পূজায় কোটি কোটি টাকা / ৪৮৭
আওয়ামী আমলে দলীয়করণ / ৪৯৪

www.pathagar.com

লেখকের কথা

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে মেরী শিলী 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। এই উপন্যাসের প্রতিকী ব্যঞ্জনতার জন্য এটি কালজয়ী সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছিল। এই উপন্যাসের নায়ক ডাক্তার ফ্রাঙ্কেনস্টাইন গবেষণাগারে একটি মানুষ সৃষ্টি করতে গিয়ে সৃষ্টি করলেন মানুষরূপী এক দানব। এই দানবের হাতে প্রথম নিহত হয়েছিলেন তার স্রষ্টার সহযোগী। একে একে এই দানব ডা. ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের প্রিয়জনদের সবাইকে হত্যা করে। শেষে এই দানবেরে হত্যা করতে গিয়ে মারা যান স্বয়ং ডা. ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। উপন্যাসের এক জায়গায় দুঃখ করে ডা. ফ্রাঙ্কেনস্টাইন বলেছেন, 'আমি ওকে সব কিছু দিয়েছি, শুধু দিতে পারিনি মানুষের বিবেক ও মেধা।' আওয়ামী লীগের শাসনামলেও ডা. ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মতো অনেক নেতা সৃষ্টি হয়েছিল যারা ক্যাডার নামে পরিচিত। তারা সবকিছু নিজেরা ভাগ করার জন্য স্বাভাবিক অবস্থাকে তছনছ করে দিয়েছে। আবির্ভূত হয়েছিল সেই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন উপন্যাসের মানুষরূপী দানবের মতো। আওয়ামী আমলে ক্যাডারদের আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি তাদের প্রভুরা। প্রতিদিনই ঘটেছে কোনো না কোনো দুঃখজনক ও মর্মান্তিক ঘটনা। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের টেন্ডার নিয়ে দিনের বেলায় ঘটেছে ক্যাডারদের বন্দুকযুদ্ধ। ঢাকার আসন্ন বাণিজ্য মেলার স্টল বরাদ্দ এবং গাড়ি পার্কিং-এর দখল নিয়ে ক্যাডারদের মধ্যে হয়েছে সংঘর্ষ, থার্টি ফার্স্ট নাইটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসির সামনে এক তরুণীকে বিবস্ত্র করেছে ক্যাডাররা। যুগ্ম সচিব নিকুঞ্জ বিহারী নাথকে হত্যার পেছনেও ক্যাডাররা জড়িত বলে নেপথ্যের খবর বের হয়েছিল। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০ বার ছাত্রী ধর্ষণ করে আনন্দোৎসব করার সঙ্গে ক্যাডার জড়িত ছিল। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন চত্বরে মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকীর কনভেনশনে গুলি ও বোমা মেরে পন্ড করা এবং আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়ার পেছনেও জড়িত ছিল আওয়ামী ক্যাডাররা। বিশ্ববিদ্যালয় হলে ব্যবসায়ীদের অপহরণ করে নিয়ে মুক্তিপণ আদায়ও করেছিল ক্যাডাররা।

মাঠের রাজনীতিতে আওয়ামী লাঠিয়াল বাহিনীর পরিকল্পিত হামলা আর ক্ষমতার রাজনীতিতে অহেতুক মামলা দায়েরের নোংরা মনোভাবের পারদর্শীতা সম্পর্কে সচেতন মহল ওয়াকিবহাল রয়েছে। ১৯৫৪, ১৯৭২-১৯৭৫ বা ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সালের শাসনে আওয়ামীদের চরিত্র একই থেকেছে। ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন ক্ষমতা গ্রহণ করে হাসিনা সরকার বিরোধী দলগুলোর উপর মাঠে ঘাটে হামলা-মামলা চালিয়ে দমননীতির যে অভিষেক পালন শুরু করেছিল তা ক্ষমতা ছাড়ার শেষ দিন পর্যন্ত বহাল তবিয়তে অব্যাহত রেখেছিল। ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে সে চরিত্র তাদের ছিল না। ক্ষমতাহীন হাসিনা ছিলেন ক্ষমাশীল, পর্দাশীল, সুশীল চরিত্রের অধিকারী। প্রতিটি জনসভায় তার কাকুতি-মিনতি ছিল 'পিতা হত্যার বিচার চাই না, শুধু একটিবার জনগণের সেবা করার সুযোগ।' ক্ষমতা গ্রহণের পর সর্বক্ষেত্রে দলীয়করণের যে সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলেন তা কোন দেশেই দেখা যায় না।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে সরকার সমর্থক পত্রিকাগুলো একের পর এক চমক সৃষ্টি করেছিল। তাদের এ চমকের পিছনে কারণও ছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'চমক' শব্দটিকে খুব পছন্দ করতেন। এজন্য কারণে-অকারণে তিনি 'চমক' শব্দটি ব্যবহার করেন।

www.pathagar.com

আর তার অন্ধ ভক্ত পত্রিকাগুলো তাকে খুশি করার জন্য চমকের সৃষ্টি করবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মিথ্যা তথ্য বা তথ্য সন্ত্রাস করে পত্রিকাগুলো 'চমক' সৃষ্টি করায় নিরীহ মানুষকে এর জন্য চরম মূল্য দিতে হয়। যেমন বৃটেনে বসবাসকারী বাংলাদেশের নাগরিক সৈয়দ নুরুল আবসারকে দিতে হয়েছে। আবসারকে যেভাবে অপমান, নির্যাতন ও সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে তা হয়তো তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ভুলতে পারবেন না। কবি শামসুর রাহমানের বাসার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যেসব মাদ্রাসার ছাত্র, শিক্ষ ও তাবলীগ জামায়াতের লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের বেলায়ও ঘটেছে আবসারের পরিণতি।

হাসিনা সরকার তথ্য বিভ্রাট আর 'চমক' সৃষ্টি করে বিরোধী দলের নেতাদের যে হয়রানি করেছে এর জন্য সরকারকে চরম মূল্যও দিতে হয়েছে। একের পর এক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ধ্বংস হওয়ার পর মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর রায়সহ বিএনপির চারজন নেতাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। অতঃপর সরকার প্রচার করে এই নেতারা সরকারকে সংকটে ফেলার জন্য বিদ্যুৎ সংকটের সৃষ্টি অর্থাৎ 'সাবোটাজ' করেছে। সরকারের এই অভিযোগ আদালত পর্যন্ত গড়ালে সুপ্রীম কোর্ট সরকারকে তিরস্কার করে। একই সঙ্গে সরকারের চার লাখ টাকা জরিমানা করে সে অর্থ গ্রেফতারকৃত নেতাদেরকে দেয়ার নির্দেশ দেয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গুলি, আরামবাগে রকেট লাঞ্চার উদ্ধার, প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার চেষ্টায় জোবায়দা রশিদকে গ্রেফতারের মাধ্যমে অনেক 'চমক' সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। তিলকে তাল বানিয়ে মনগড়া তথ্য সুপরিকল্পিতভাবে প্রচার করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার অনেক চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু একটি ঘটনাতেও সরকার সুবিধা করতে পারেনি। একটি মিথ্যাকে আর দশটি মিথ্যা দিয়ে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সরকার বার বার হোঁচট খেয়েছে।

আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, মহিলা লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, শ্রমিক লীগ, যুবলীগ, হকার্স লীগ, কৃষক লীগ, বঙ্গবন্ধু পরিষদসহ বিভিন্ন কিসিমের সংগঠনের নামে সাইনবোর্ড দিয়ে দেশব্যাপী ফুটপাত, রাজপথের পাশের খালি জমি, পার্ক, খেলার মাঠ, উদ্যানের ভেতর, পরিত্যক্ত জমি-সম্পত্তি দখলে মেতে উঠে সরকারি দলের আশীর্বাদপুষ্টরা। এসব সাইবোর্ডের আড়ালে সমাজের কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক, সন্ত্রাসী চাঁদাবাজ নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সরকার ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে খাস জমি বিক্রির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় আওয়ামীরা নানা অজুহাতে নগরীর খাস জমি, পরিত্যক্ত বাড়ি, রেললাইন বা রাস্তার পাশের খালি জায়গা দখলের প্রতিযোগিতা শুরু করে। রাজধানীর উত্তরা, মিরপুর, সদরঘাট, গুলিস্তান, যাত্রাবাড়ি, মোহাম্মদপুর, নূরজাহান রোড, শেরশাহ সূরি রোড, ধানমন্ডি, কলাবাগান, বংশাল, শংকর, বাড্ডা, রায়েরবাজার, মগবাজার, ইস্কাটন, গোলাপবাগ, গজমহল, হাজারীবাগ, আউটফল, কাপ্তান বাজার, বনানী, গুলশান, কাওরান বাজার, মতিঝিল, গোপীবাগ, বাদামতলী, তেজগাঁও, টঙ্গী ডাইভারশন রোড এলাকায় ফুটপাত ও রাজপথে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করায় পথচারীদের চলাচল বিঘ্নিত, যানবাহন চলাচলে মারাত্মক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। রাস্তার ফুটপাত দখল করে বস্তি ভাড়া দিয়ে সেখান থেকে মাসে মাসে বখরা আদায় করা হয়। জমি ক্রয়-বিক্রয় করতে হলে স্থানীয় সরকারি দলের নেতা-কর্মীদের দিতে হয়েছে মোটা অংকের চাঁদা। কোনো খালি জায়গার মালিক বিল্ডিং তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিলে সেখানে সরকারি দলের সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে দিয়ে মালিকের কাছ থেকে মোটা অংকের চাঁদা আদায় করা হয়েছে।

আওয়ামীরা সরকার গঠনের পর থেকেই যে বস্তুটি শতকরা একশ' ভাগ গ্রাস করে নেয়. তা হলো বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)। সময়-অসময় মুজিব বন্দনা প্রচার, জাতির

www.pathagar.com

বিবেকের কাছে প্রশ্ন, পরিপ্রেক্ষিত, জনতার আদালত, পরিকল্পনাহীন অনুষ্ঠান বিটিভিতে প্রচার করে শহর থেকে গ্রামাঞ্চল মানুষকে প্রতিনিয়ত মানসিক যন্ত্রণা দেয়া হয়। এদেশের জনগণের অর্থে পরিচালিত বিটিভিকে নির্বাচনের সময় স্বায়ত্তশাসন দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আওয়ামীরা। স্বায়ত্তশাসন দূরে থাক কোন সরকার নিজেদের স্বার্থে বিটিভিকে সবচাইতে বেশি ব্যবহার করছে এ প্রশ্নের উত্তর বিটিভি দর্শক মাত্রই অবগত আছেন।

আওয়ামী সরকার নিজেদের সাফাই গাওয়া, বিরোধী দলের রাজনীতি, নেতা-কর্মীদের চরিত্র হনন, ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করার জন্য বিটিভিতে যতগুলো নতুন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে তন্মধ্যে একটি জঘন্য অনুষ্ঠান হলো 'ঘটনার আড়ালে'। এটি পরিচালনা করেন আবেদ খান। তার দালালির নমুনা দেখে তাকে উচ্চ নম্বর না দিয়ে পারা যায় না। 'ঘটনার আড়ালে' অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানই তার সরকারি দলের দালালির একেকটি উদাহরণ ছিল। রাজপথের জনসভা, সন্ত্রাস, জেলখানা ইত্যাদি অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে কবি শামসুর রাহমানের বাসায় হামলা পর্যন্ত যতগুলো অনুষ্ঠান বিটিভিতে প্রচারিত হয়েছে সবগুলো অনুষ্ঠানই ছিল হয় সরকারি দলের পক্ষে, না হয় বিরোধী দলকে ধোলাই, না হয় ইসলামী রাজনীতির চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধারের জন্য। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মতামতের জন্য তিনি যাদেরকে এনেছেন তাদের প্রায় সবাই ইসলাম বিদ্বেষী, সরকারের দালাল তথাকথিত মুক্তমনের চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী। তিনি বিটিভিতে ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ কবি শামসুর রাহমানের উপর হামলার বিষয় নিয়ে হাজির হন। কথায় আছে 'একে তো পাগলা বুড়ি, আরো পাইছে ঢোলের বারি নাচ আর থামায় কে'। আবেদ খান এমনিতেই একশ' ভাগ মিথ্যাকে সত্য বানাতে পারেন। আর কবির উপর হামলা নিয়ে কথা। তার উপস্থাপিত পুরো অনুষ্ঠানটিই ছিল বাংলাদেশের আলেম সমাজ ও মাদ্রাসাগুলোকে বিতর্কিত করার জন্য। আবেদ খানের ভাষায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে এদেশে ট্রেনিং নিয়েছে লাদেন বাহিনী। হাজার হাজার মুজাহিদ কবিকে মারতে গিয়েছে চাইনিজ কুড়াল দিয়ে। আবার মুজাহিদরা ধরাও পড়েছে। তিলকে তাল করতে চাইলেও প্রথমে তিলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তিল ছাড়া তাল বানানোর যে কসরত আবেদ খান করেছেন, তাতে মনে হয়েছে বাংলা ভাষায় আরেকটি নতুন প্রবাদ বাক্যের প্রয়োজন হবে 'তিল বিহীন তাল করা।'

আওয়ামী লীগের শাসনামলে বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ নিয়ে বর্তমান গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। হাসিনার আমলে দেশবাসী কিভাবে দুঃশাসনের কবলে ছিল তা এই গ্রন্থের তথ্যে সংক্ষিপ্ত ফুটে ওঠেছে। গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্য মৌলি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী এস কে মাসুমকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জিবলু রহমান

বাড়ি নং-১৪, ফ্লাট-এ/২
সড়ক নং-৩৬
গুলশান-২, ঢাকা।

www.pathagar.com

রেডিও-টিভি নিয়ে রাজনীতি

১৯৯৫ সালে রাষ্ট্রীয় প্রধান প্রচার মাধ্যম বিটিভিতে নিজের চেহারা না দেখানোর ব্যাপারে শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতির খবর দৈনিক ইত্তেফাকেই ছাপা হয়। 'ক্ষমতায় গেলে টিভিতে চেহারা দেখাইব না' শিরোনামে দৈনিক ইত্তেফাকে ২৪ জানুয়ারি প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়ঃ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা রেডিও, টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন দাবী করিয়াছেন। তিনি বলেন, ক্ষমতায় যাওয়ার আগে বিএনপিও এই স্বায়ত্তশাসনের কথা বলিয়াছিল। কিন্তু তাহারা অন্যান্য ওয়াদা ভঙ্গের সহিত এই ওয়াদাটিও ভঙ্গ করিয়াছে। শেখ হাসিনা বলেন, ক্ষমতায় গেলে রেডিও, টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিব এবং টেলিভিশনে নিজেদের চেহারা দেখাইব না গ্যারান্টি দিতে পারি। রেডিও-টেলিভিশন ঘেরাও কর্মসূচি উপলক্ষ্যে গতকাল (সোমবার) বিকালে রামপুরাস্থ মালিবাগ রেলগেট সংলগ্ন চৌরাস্তায় এক জনসভায় শেখ হাসিনা এই কথা বলেন। রিয়াজউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় আরও বক্তৃতা করেন জিল্লুর রহমান, আমির হোসেন আমু, আব্দুর রাজ্জাক, মোঃ নাসিম, মোজাফফর হোসেন পল্টু, ফজলুর রহমান, খ.ম. জাহাঙ্গীর, মুকুল বোস, কাজী ইকবাল হোসেন, মুনির হোসেন খান, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া প্রমুখ। শেখ হাসিনা বলেন, জনগণের অর্থে রেডিও-টেলিভিশন চলে। এই কারণে ইহাতে জনগণের কথা প্রচারিত হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হয় নাই। অথচ স্বৈরাচারী আমলে বিএনপিও রেডিও-টিভির স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে সোচ্চার ছিল। আজ ৮ টার সংবাদে প্রধানমন্ত্রীর ১৮ মিনিট, মন্ত্রীবর্গের ৮/১০ মিনিট খবর থাকে জনগণের কোন খবর থাকে না। তিনি বলেন, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই আন্দোলন করিতেছি। কিন্তু গণতন্ত্রের লালন-পালনের দায়িত্ব আমরা বিএনপিকেই দিয়াছিলাম। কিন্তু গণতন্ত্রের সেই শিশুটিকে বর্তমান সরকার গলা টিপিয়া হত্যা করিয়াছে। এই সরকার দলীয়করণ ছাড়া কিছুই বোঝে না।'

যে যায় লংকায়, সে হয় রাবণ-এ পুরনো প্রবাদটির তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে এদেশের মানুষের। বিরোধী দলে থাকতে কোন ইস্যুতে সোচ্চার আন্দোলন করে আওয়ামী লীগ আর ক্ষমতায় গেলে উক্ত ইস্যু বাস্তবায়নের গড়িমসি করতে একটুও দ্বিধা করে না আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী তার ওয়াদার কথা জাতিকে জানানোর দেড় বছরের মাথায় ক্ষমতায় গিয়েই সেটি ভুলে যান। চেহারা দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে বিটিভি হয়ে ওঠে আওয়ামী লীগের দলীয় একটি প্রচার মাধ্যম। শেখ হাসিনা ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে দেশবাসীকে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ক্ষমতাসীন হয়ে প্রচুর সময় হাতে পাবার পরও প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনে একটুও আন্তরিকতা দেখাতে পারেননি তারা। বরং সরকার ব্যস্ত থেকেছে বিরোধী দলকে ঠেকাতে।

১০মে ১৯৯৬ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন দলীয় সভনেত্রী শেখ হাসিনা। এই ইশতেহারের ৭ নং উপ-শিরোনাম ছিল, 'সরকারি প্রচার মাধ্যম ও সংবাদপত্র'। নির্বাচনী ইশতেহারের এই অংশে বলা হয়, 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অবাধ তথ্যপ্রবাহ ও সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। রেডিও, টেলিভিশন ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থাকে

www.pathagar.com

দলীয় প্রভাবমুক্ত করার লক্ষ্যে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদান করা হবে। সরকারি মালিকানাধীন সংবাদপত্রসমূহকে ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা হবে'। প্রতিশ্রুতি শুধু ইশতেহারেই সীমাবদ্ধ থাকেনি নির্বাচনের একদিন আগে ১০ জুন জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি রেডিও-টেলিভিশন ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থাকে স্বল্পতম সময়ে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদান করা হবে'। অনুরূপ অঙ্গীকার করা হয় ৯ জুন বিটিভিতে সরাসরি প্রচারিত 'সবিনয়ে জানতে চাই' অনুষ্ঠানে। ক্ষমতা গ্রহণের এক সপ্তাহ পর ৩০ জুন মানিক মিয়া এভিনিউতে প্রথম জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'টিভি যেন অতীতের মত সাহেব বিবি গোলামের বাক্স হতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে'।

১৯৯৬ সালের ২৩ জুন আওয়ামী সরকারের মন্ত্রীরা শপথ গ্রহণ করার পর সেইদিন রাতে একেবারেই অকারণে শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণ প্রচার করা হয়। কেন করা হয় এ প্রশ্নের জবাব তখন পাওয়া যায়নি। এরপর থেকে ৩০ মিনিটের টিভি খবরের ২০ মিনিট জুড়ে প্রচারিত হতে থাকে শেখ হাসিনা এবং তার পিতার চেহারা ও প্রশস্তি। দেশবাসীকে তাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা তারা বারবার মনে করে দিয়েছেন কিন্তু কাজ হয়নি। রেডিও বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) স্বায়ত্তশাসন দেয়ার দাবি একটি বহু পরিচিত গণদাবি।

৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ আওয়ামী লীগ রেডিও-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা প্রণয়নের জন্য সাবেক সচিব ও বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ আসাফ-উদ-দৌলাকে চেয়ারম্যান করে ১৬ সদস্যের একটি বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন নীতিমালা প্রণয়ন কমিশন গঠন করে। কমিশন গঠনের পর থেকে ৬ মাস ছিল সুপারিশমালা সরকারের কাছে উপস্থাপনের সময়সীমা। পরবর্তীকালে সে সময়সীমা ১৯৯৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সরকার বাড়িয়ে দেয়। এ কমিশন অত্যন্ত দ্রুততার সাথে একটি সুপারিশ প্রণয়ন করে। ১০ দফা সুপারিশসহ ২১ আগস্ট কমিশন তাদের প্রণীত সুপারিশ প্রধানমন্ত্রীর হাতে হস্তান্তর করে। সুপারিশ হস্তান্তরের দিনই সরকারি প্রেসে মুদ্রিত সুপারিশের সমুদয় কপি তথ্য মন্ত্রণালয়ের হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। এ রিপোর্ট তৈরির জন্য কমিশন ২৮ টি সভায় মিলিত হয়। জনসাধারণের মতামত জরিপের জন্য পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রশ্নমালা ছাপে। ঐ প্রশ্নমালায় সাড়া দিয়ে ৩০৪৬ জন উত্তরদাতা নিজস্ব মতামত জানায়। কমিশন ১৯ টি সংগঠনের লিখিত সুপারিশ গ্রহণ করে। ব্রিটেন, ভারত, পাকিস্তান, ফিলিপিন্স সফর করে কমিশন-সদস্যরা ঐ দেশগুলোর রেডিও-টিভি পরিচালনা কৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এর পর পেশ করা হয় সুপারিশমালা। প্রণয়ন কমিশনের সুপারিশমালার বাস্তবায়ন চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে সরকার ২৩ ডিসেম্বর তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবকে সভাপতি করে ৮ সদস্যবিশিষ্ট বাস্তবায়ন পর্যালোচনা কমিটি গঠন করে। সরকার এই কমিটিকে স্বায়ত্তশাসন নীতিমালা প্রণয়ন কমিশনের সুপারিশমালা বাস্তবায়নে কোন আইনগত জটিলতা আছে কিনা সে সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার দায়িত্ব দেয়। বর্তমানে রেডিও এবং বিটিভিতে সম্প্রচারের জন্য যেসব পুরনো যন্ত্রপাতি আছে তার দ্বারা স্বাভাবিকভাবে কাজ করার নিশ্চয়তা আছে কিনা সে সম্পর্কেও খোঁজ-খবর নেয়ার দায়িত্ব সরকার কমিটিকে দেয়। এই কমিটির কার্যকালের মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি।

স্বায়ত্তশাসন নীতিমালা প্রণয়ন কমিশনের সুপারিশমালা কি ছিল তা সরকার কোনো সময় প্রকাশ করেনি। তবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে বিভিন্ন তথ্য জানা যায়। ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭ দৈনিক ভোরের কাগজে 'বেতার-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসনের অগ্রগতি নেই' মর্মে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

১ ডিসেম্বর ১৯৯৮ দৈনিক সংবাদ উল্লেখ করে, 'পর্যালোচনা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ (২) (খ) সংখ্যক অনুচ্ছেদে সংবাদ ক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা

www.pathagar.com

দেয়া হয়েছে। বেতার ও টেলিভিশনের প্রশাসনিক কাঠামো যেভাবে তৈরি করা হয়েছে তাতে সম্প্রচার মাধ্যম হিসেবে তার স্বাধীনতা রক্ষা করা দুঃসাধ্য। কঠোর সরকারি নিয়ন্ত্রণের ফলে সম্প্রচার খাতে সৃষ্টি হয়েছে ভীতি, বন্ধ্যাত্ব, তোষণ। অনিবার্যভাবে নিম্নমানের অনুষ্ঠান প্রচার হয়েছে। এই পরিবেশে সম্প্রচারকর্মী, শিল্পী ও কলাকুশলীরা সৃজনশীলতা এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার মনমানসিকতা হারিয়ে ফেলেছেন। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, অতীতে বেতার ও টেলিভিশনকে জনসাধারণের কল্যাণের কাজে না লাগিয়ে সংকীর্ণ অর্থে একান্তই সরকারি প্রয়োজনে, এমনকি ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর বা দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলে গণবিচ্ছিন্ন সরকারের প্রচারযন্ত্র হিসেবে বেতার ও টেলিভিশনের যে ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল, স্বাধীনতা উত্তর কালেও সামান্য সময় বাদ দিলে সম্প্রচার মাধ্যম সে উত্তরাধিকারই ধারণ করে আছে। সরকারি নিয়ন্ত্রণে থেকে পক্ষপাতদুষ্ট এবং নিম্নমানের সংবাদ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ফলে বেতার ও টেলিভিশনের উপর জনসাধারণের আস্থা আরো কমে যেতে থাকে। এ দুটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের ফলে সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতাও কমে যায়। সরকারি প্রচার মাধ্যমের প্রতি আস্থাহীনতার কারণে দেশের মানুষ রাজনৈতিক সংকট, বিশেষত বিভিন্ন গণআন্দোলনের সময় বিদেশী বেতার ও টেলিভিশনের সংবাদ শুনতে ও দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের প্রচলন বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে দর্শকরা বিদেশী টেলিভিশনের প্রতি আরো আকৃষ্ট হন। অপরদিকে সরকারি টেলিভিশনের সংবাদ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান তাদের আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশের সংবিধানে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে ঠিকই; কিন্তু এর সঙ্গে প্রচলিত আইন, বিধি ও অনুশাসনের অসঙ্গতি রয়েছে। বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন চলমান ঘটনাবলির বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন উপস্থাপন, শিক্ষার প্রসার, দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য তুলে ধরা এবং সুস্থ চিত্ত বিনোদনের প্রয়োজন মোটানোসহ জনগণের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়'।

৯ ডিসেম্বর ১৯৯৮ দৈনিক জনকণ্ঠ থেকে জানা যায়, 'বেতার-টিভি স্বায়ত্তশাসন কমিশন সরকারের কাছে পেশ করা রিপোর্টে বেতার-টিভি পরিচালনা জাতীয় সম্প্রচার কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়। ছয় সদস্যের প্রস্তাবিত কমিশন সরকার নিয়োগ করবে এবং ঐ কমিশনই হবে বেতার-টিভির নীতি-নির্ধারক। কমিশন বেতার-টিভির নীতি নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও এর বাজেট অনুমোদন করবে। কমিশনের সুপারিশে আরও বলা হয়েছে, স্বায়ত্তশাসিত চ্যানেলের পাশাপাশি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের অনুমোদনও দেয়া যাবে। কঠোর সরকারি নিয়ন্ত্রণের ফলে সৃজনশীল মাধ্যম দু'টিতে ভীতি, বন্ধ্যাত্ব ও তোষামোদের প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। এতে সৃজনশীল পেশাদাররা হতাশাগ্রস্ত। এ কারণে টিভিকে অবিলম্বে সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে সুপারিশ করা হয়'।

২২ জুন ১৯৯৯ দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত তথ্যে জানা যায়, 'কমিশনের সুপারিশে রেডিও-টিভিকে সম্পূর্ণভাবে তথ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার প্রস্তাবে তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্তা ব্যক্তিরা এতই ক্ষুব্ধ হয়েছেন যে, সুপারিশের কোন মুদ্রিত কপি কমিশনের সদস্যদেরও দেয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, তথ্য মন্ত্রণালয়ের রোষাণলে পড়ে কমিশনের চেয়ারম্যান ও সুখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ জনাব আসাফ-উদ-দৌলা রেডিও-টেলিভিশনে ব্যাক লিস্টেড হয়ে যান। তথ্য মন্ত্রণালয় সরকারের নীতিনির্ধারক মহলকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, এই সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে সরকার দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং প্রচার মাধ্যম দু'টি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে

www.pathagar.com

চলে যাবে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্তারা প্রধানমন্ত্রীসহ নীতিনির্ধারকদের এও বুঝাতে সক্ষম হন যে, সরকারের ৫ বছর টার্মের শেষ পর্যায়ে স্বায়ত্তশাসন দিলে একদিকে এ পাঁচ বছর ইচ্ছামত নিজেদের গুণগান প্রচার করা যাবে, অন্যদিকে আগামীতে ক্ষমতায় যেতে না পারলেও নিজেদের নিয়োগ করা কর্তাদের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের সুবিধা ষোলকলায় ভোগ করা সম্ভব হবে। স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত কমিশনের পেশকৃত রিপোর্টের প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে রেডিও-টিভি সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থাকবে। ৭ সদস্যের একটি জাতীয় সম্প্রচার কমিশন থাকবে। এ কমিশনের চেয়ারম্যানসহ ৫ জন সদস্য প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে প্রেসিডেন্ট নিয়োগ দেবেন ৫ বছর মেয়াদের জন্য। রেডিও-টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদাধিকার বলে অপর দু'টি সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিয়োগ দেবে কমিশন। ৫ বছরের মধ্যে এই কমিশনের কোন সদস্যের নিয়োগ বাতিল করা যাবে না। সুপারিশ অনুযায়ী বেতার-টিভির বর্তমান সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বহাল থাকবেন। কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছে সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রচারের ক্ষেত্রে পদ-মর্যাদার ভিত্তিতে নয়, সংবাদ মর্যাদার বিষয়টি বিবেচিত হবে। তথ্য মন্ত্রণালয় কিংবা তথ্য বিবরণীর ওপর কোন নির্ভরতা থাকবে না। কমিশনের রিপোর্টে রেডিও-টিভির বর্তমান অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি এবং নোংরামি সম্পর্কেও চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করা হয়'।

কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন দূরের কথা বিটিভিকে শুধু দলীয় প্রচার মাধ্যমই নয়, দলীয় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে গোয়েবলসীয় রটনার হাতিয়ার হিসেবে একে ব্যবহার করা হয়। জাতির বিবেকের কাছে প্রশ্ন নামে একটি বিকৃত রুচির প্রতিবেদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে বিটিভি বিরোধী দলের ভাবমূর্তি ধ্বংস করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে। জাতির বিবেকের কাছে প্রশ্ন নামের অনুষ্ঠানটি মূলত বিরোধীদলের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার অনুষ্ঠান। সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অজুহাতে বিরোধী দল বিএনপির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়। আর এ অপপ্রচারকে জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য সচিত্রাকারে প্রতিবেদন দেয়া হয়। যে চিত্রগুলো প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা হয়, আর যাদের বক্তব্য নেয়া হয় তা সম্পূর্ণ পুলিশের হেফাজতে থাকা অবস্থায় পুলিশের শেখানো বুলি মাত্র। মজার ব্যাপার হলো, এ অনুষ্ঠানের উপস্থাপক থাকেন নেপথ্যে। অনুষ্ঠানের আগে-পরে এর গ্রন্থনা বা উপস্থাপনায় কে থাকেন তার কোন নাম দেয়া হয় না। প্রতিটি হরতালের আগেই তারা এর বিরুদ্ধে অনুষ্ঠান প্রচার করে।

শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পরই বিটিভিকে আওয়ামীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। দক্ষ, সৎ এবং নীতিবান কর্মকর্তাদের একে একে সরিয়ে দেয়া হয় বিটিভির প্রশাসন থেকে। তদস্থলে বসিয়ে দেয়া হয়-অদক্ষ ও অযোগ্য আওয়ামী পন্থী কর্মকর্তাদের। একই সাথে ব্যক্তি বিশেষের বন্দনায় বিটিভিকে এমনভাবে নিয়োজিত করা হয় যে দর্শক শ্রোতা ঘৃণায় বিটিভির পর্দা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

বিরোধী দলকে কোণঠাসা করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী এবং তথ্য প্রতিমন্ত্রী টিভিতে বিরোধী দলের খবরা-খবর প্রচার না করার কারণ হিসেবে প্রচার করে বেড়ান বিরোধী দলের খবরা-খবর সংগ্রহের জন্য টিভি ক্যামেরা প্রেরণ করা হলে নাকি বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ ক্যামেরা ফিরিয়ে দেন, ক্যামেরাম্যানকে মারধর করেন অথবা তাদের অনুষ্ঠানে বিটিভিকে আমন্ত্রণ জানান না। যার জন্য টিভি কভারেজ দেয়া সম্ভব হয় না। তাদের মন্তব্য হতে একটি বিষয় পরিস্কার হয় যে, টেলিভিশনের কর্মীরা সরকারি নির্দেশ ছাড়া এক পাও নড়েন না।

www.pathagar.com

বিটিভি প্রতিদিনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় এটিকে কিভাবে অপব্যবহার করা হয়েছে। ১৮ নভেম্বর ১৯৯৮ রাত দশটার খবরের অধিকাংশ সময় জুড়ে ছিলেন শেখ হাসিনা ও তার দলের লোকেরা।

১৯৯৮ সালে সারা বছর বিটিভি সম্প্রচার করে শুধুই ভারতীয় অনুষ্ঠান, সিরিয়াল আর প্যাকেজের রকমারি নাটক-ম্যাগাজিন। তারপরে ঈদের অনুষ্ঠানগুলোও বিটিভি ছেড়ে দেয় চিহ্নিত কয়েকটি প্যাকেজ নির্মাতার হাতে। ঈদের প্রায় ৩০টি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাত্র ৬টি বিটিভি হাতে রাখে। ঈদের দিন এবং ঈদের পরের দিনের ৫টি বিশেষ অনুষ্ঠানের সবক'টিই ছেড়ে দেয়া হয় প্যাকেজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইমপ্রেস টেলিফিল্মের হাতে। ১৯৯৮ সালে বিটিভি নিজস্ব প্রযোজনায় অনুষ্ঠান করেছে মাত্র কয়েকটি। বিটিভির নিজস্ব ৪ কোটি টাকায় নির্মিত বহু অনুষ্ঠান অপ্রচারিত পড়ে থাকে। দেশের প্যাকেজ অনুষ্ঠান নির্মাতাদেরও প্রায় ৬ কোটি টাকার অনুষ্ঠান রামপুরা হিমাগারে বন্দী থাকে। অথচ পুরো বছর বিটিভি ব্যস্ত থাকে কলকাতার বস্তাপচা ধারাবাহিক ফেলুদা আর ভুল বাংলায় ডাবিং করা সব সিরিয়াল নিয়ে। এর সঙ্গে সম্প্রচার হয় কতিপয় প্যাকেজ নির্মাতার অঢেল রকমারি অনুষ্ঠান। আবার অনেক নামকরা প্যাকেজ নির্মাতার একটি অনুষ্ঠানও পুরো বছরে সম্প্রচার করা হয়নি। প্রচলিত নিয়মে বছরে বিটিভিতে নাটক প্রচারিত হয়ে থাকে ৫৫টি। কিন্তু ১৯৯৮ সালে বিটিভির প্রযোজনায় নাটক হয় মাত্র ২৭টি। সারা বছরের মত বিশেষ বিশেষ দিনেও প্যাকেজ নাটকের আধিক্য ছিল বেশি। এসব নাটকের অধিকাংশই নিম্নমানের হওয়ায় ব্যাপক সমালোচনা হয়। ১৯৯৮ সালে বিটিভি প্রযোজনা করে মাত্র একটি ধারাবাহিক নাটক বেলা-অবেলা। পুরো বছরে বিটিভির প্রযোজনায় একমাত্র সঙ্গীতানুষ্ঠান ছিল গীতি বিচিত্রা। প্যাকেজের আওতায় সারা বছর প্রচারিত হয় অসংখ্য সঙ্গীতানুষ্ঠান। প্যাকেজের পাশাপাশি বিটিভিতে বছর জুড়ে আধিপত্য ছিল ভারতীয় অনুষ্ঠানের। আগে কোনো বছরই এত সংখ্যায় ভারতীয় অনুষ্ঠান বিটিভিতে প্রচারিত হয়নি। বাংলায় ডাবিং করা তানসেন, বাহাদুর শাহ, মির্জা গালিব, দ্যা নিউ এডভেঞ্চার অব সিন্দবাদ, রবিন হুড, দ্যা এক্সফাইলস এবং ফেলুদা সারা বছর জুড়ে ছিল টিভি পর্দায়। ফেলুদা সিরিয়ালটি বিটিভিতে সম্প্রচারিত হয় স্যাটেলাইট চ্যানেল এটিএনএ সম্প্রচারের পর। যা বিটিভির নীতিমালা বহির্ভূত বলে সমালোচিত হয়।

৫ জানুয়ারি ১৯৯৯ কবি শামসুর রাহমানের কথিত হত্যা প্রচেষ্টার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতারকৃত ৯ জনের বক্তব্য বিটিভি রেকর্ড করে। সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী এ বক্তব্য সিআইডি গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে জোরপূর্বক আদায় করে টেলিভিশনে ধারণ করে। বেলা ১২ টা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত ইন্সপেক্টর শফিক পাঠানের কক্ষে এ রেকর্ড করা হয়। এর আগে তাদের বক্তব্যের কয়েক দফা মহড়া চলে। টিভির রেকর্ডিং শেষ হওয়ার পর ৯ জনকে ৭ দিনের রিমান্ড চেয়ে কোর্টে পাঠানো হয়।

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২, ২৬ মাঘ ১৩৩৮ (১ শাওয়াল ১৩৫০ হিজরী) মঙ্গলবার কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন ইসলামী গান, 'ও মর রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ'। তখন গ্রামোফোন রেকর্ড হিজ মাস্টার্স ভয়েসে গানটি গেয়েছিলেন শিল্পী আব্বাস উদ্দীন আহমদ। বাংলা ভাষায় ইসলামী গানের এটাই হলো প্রথম রেকর্ড। পিলু রাগে, কাহারবা তালে। কিন্তু ১৯৯৯ সালের ঈদুল ফিতর উপলক্ষে উৎসবের তৃতীয় দিনে ১০ টা ৪০ মিনিটের 'শুভেচ্ছা' অনুষ্ঠানে কাজী নজরুলের লেখা এই বিখ্যাত ইসলামী সঙ্গীতটিকে এর বাণী বিকৃতি ও সুর বিকৃতি ঘটিয়ে র‍্যাপ সঙ্গীতের সুরে সিগনেচার টিউন হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

www.pathagar.com

৩ মার্চ বিটিভি রাত সাড়ে ১১ টার খবরে বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্যে এক নক্কারজনক ভূমিকা পালন করে। ডি-৮ সম্মেলন উপলক্ষে ঢাকায় আগত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এবং অন্যান্য মেহমানদের সম্মানে রাতে প্রধানমন্ত্রী হোটেল শেরাটনে এক ভোজসভার আয়োজন করেন। এ ভোজসভায় যোগদানের জন্য ঐদিন দুপুর আড়াইটায় খালেদা জিয়াকে দাওয়াত পাঠানো হয়। কিন্তু তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রোগ্রাম আগেই ঠিক করা ছিল। ফলে সন্ধ্যার আগেই তার ২৯ মিন্টো রোডের অফিস থেকে এ সিডিউলের কথা জানিয়ে তিনি উল্লেখিত ভোজসভায় উপস্থিত হতে পারবেন না বলে বিনয়ের সঙ্গে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেয়া হয়। রাত সাড়ে ১১ টার খবরে দেখা যায় বিটিভি বার বার বিরোধী দলীয় নেত্রীর চেয়ারটি খালি এবং তার নাম ফলকটি দেখাচ্ছে। বিটিভি উদ্দেশ্যমূলক ভাবে এটি দেখিয়ে বোঝাতে চেয়েছে যে, সরকারের পক্ষ থেকে দাওয়াত দেয়া সত্ত্বেও তিনি উপস্থিত হননি।

যশোরে ট্র্যাজেডিকে ঘিরে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্য গড়তে ১১ মার্চ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির বৈঠকে আওয়ামী ঘরানার বুদ্ধিজীবী রামেন্দু মজুমদার টেলিভিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ঝেড়ে বলেন, 'আওয়ামী লীগ সরকারের যদি পতন হয় তবে তার প্রধানতম কারণ হবে টেলিভিশন'।

২০ এপ্রিল বিটিভিকে ফ্যাসিস্ট, প্রতিহিংসাপরায়ণ, নিম্নমানের জ্ঞান সম্পন্ন দলবাজ সরকার ও তার কালচারাল টাউটদের খপ্পর থেকে মুক্ত করা, বরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও অভিনেতাদের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের, আওয়ামী অন্ধ স্তাবকদের মাধ্যমে ভূয়া মহিমা কীর্তন প্রচার, টিভিকে মানসিক পীড়নের যন্ত্রে পরিণত করা, যোগ্যতা সম্পন্ন ও মেধাবী শিল্পী কর্মকর্তাদের বিতর্কিত করা এবং বিদেশী মডেল দিয়ে বিজ্ঞাপন প্রচার ও বিজাতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা জাসাসের টিভি ভবন ঘেরাও উপলক্ষে বিকাল ৩ টায় ঢাকাস্থ সিদ্ধেশ্বরী বালুর মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবেশে দেশের শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী, সংগঠক, বুদ্ধিজীবীগণ বলেন, বাংলাদেশ টেলিভিশন এখন বাপ-বেটির বাক্সে পরিণত হয়েছে। দুই/তৃতীয়াংশ জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী বিরোধী দলগুলোর নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা, কুৎসাপূর্ণ বিষোদগার করে চলছে। এই সঙ্গে ইতিহাস বিকৃতি, জাতীয় স্বার্থ বিরোধী প্রচারণা চালিয়ে নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করছে। হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ মুছে ফেলা হচ্ছে। বিটিভি এখন আওয়ামী লীগের মুখপত্রে পরিণত হয়েছে। এসব অপকর্ম বন্ধ করে টেলিভিশনকে আগের ভাবমূর্তিতে ফিরিয়ে আনার জন্য বক্তারা সরকারের প্রতি আহবান জানান। সমাবেশে জাসাস সভাপতি রেজাবুদ্দৌলা চৌধুরীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী, টিভি অভিনেতা বাবুল আহমেদ, কবি আবদুল হাই শিকদার, চিত্র নায়ক ওমর সানী, চিত্র নায়িকা সোহানা, চলচ্চিত্রকার চাষী নজরুল ইসলাম, ব্যাংকার মাজহারুল হক, চলচ্চিত্রকার শেখ নজরুল ইসলাম, এম এ মালেক, রেহানা সালাম ও ফয়েজ উল্লাহ ফয়েজ প্রমুখ। সমাবেশে মুজিবুর রহমান এমপি, নূরুল ইসলাম খান নাসিম, বরেণ্য কবি মুশাররফ করিম, মেছবাহ উদ্দিন, আবুল হাশেম রানা, আনিসুল ইসলাম সানি, শাহীন আলম, কৌতুক অভিনেতা দিলদার, মিলন মেহেদী, মিয়া আনোয়ার হোসেন সহ বরেণ্যে শিল্পী-কবি-সাহিত্যিক-চলচ্চিত্রকার-অভিনেতা-কলাকুশলীসহ বিপুল সংখ্যক মানুষ সমাবেশ ও মিছিলে যোগ দেন

www.pathagar.com

এবং ঘেরাওয়ে অংশ নেন। সমাবেশ শেষে সিদ্ধেশ্বরী বালুর মাঠ থেকে প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ ও রেজাবুদ্দৌলা চৌধুরীর নেতৃত্বে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক সহ এক মিছিল টিভি ভবন ঘেরাওয়ের উদ্দেশ্যে বিকাল ৪টা ৫৫ মিনিটে রামপুরার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বিকাল ৫ টা ১২ মিনিটে মিছিল রামপুরা টিভি ভবনের বহু দূরে রামপুরা বাজারের একশ' গজ পশ্চিমে দেশ ডায়াগনস্টিকের সামনে পৌছলে কাটাতারের ব্যারিকেড দিয়ে পুলিশ বাধা দেয়। টিভি ভবনের প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে শান্তিপূর্ণ মিছিলে বাধা পেয়ে মিছিলকারীরা উত্তেজিত হয়ে উঠলে নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে তারা শান্ত হন। ব্যারিকেডগুলোতে দাঙ্গা মহিলা পুলিশসহ শ'শ' পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার লোক প্রস্তুত ছিল। গ্যাস, পানির গাড়ি, রায়টকার আশে পাশের বাড়ি-ঘরের ছাদে উচুঁ ভবনের ওপর বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন ছিল। বিশাল শান্তিপূর্ণ মিছিল পুলিশের বাঁধা পেয়ে রাস্তায় অবস্থান গ্রহণ করলে আশপাশের বাসা, বাড়ি, অফিস-দোকান পাট থেকেও মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে মিছিলে শরীক হন এবং করতালি দিয়ে পথচারীরাও মিছিলকারীদের অভিনন্দন জানায়। জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণের ফলে এই সমাবেশ আরো বিশাল আকার ধারণ করে। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। পরে রেজাবুদ্দৌলা চৌধুরীর নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকীর নিকট ৫ দফা দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করতে টিভি ভবনে যান। মহাপরিচালকের অনুপস্থিতিতে বিটিভির জিএম নওয়াজেশ আলী খান অসৌজন্যমূলকভাবে ভবনের প্রধান গেট থেকে স্মারকলিপি গ্রহণ করতে চাইলে নেতৃবৃন্দ গেটে স্মারকলিপি প্রদান করতে অস্বীকার করেন। পরে খান নেতৃবৃন্দকে তার নিজস্ব কার্যালয়ে নিয়ে যান এবং স্মারকলিপি গ্রহণ করেন এবং স্মারকলিপিতে বর্ণিত দাবীসমূহ সরকারকে অভিহিত করবেন বলে নেতৃবৃন্দকে আশ্বাস দেন। স্মারকলিপিতে বর্ণিত ৫ দফা দাবী ছিল-

১৯৯৯ সালের মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির এক সভায় কমিটির আওয়ামী লীগের সদস্যরাই বলেন, 'বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলো মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তা-চেতনার কাছাকাছি হচ্ছে না। এ জন্য বিটিভি সম্পর্কে মানুষের মনে একটি নেতিবাচক মনোভাব বিরাজ করছে। বিশেষ দিবস ছাড়া মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস অহরহ তুলে ধরার কারণে সাধারণ মানুষ বিটিভির ওপর বিরক্ত হচ্ছে। নাটকসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গ অতিরঞ্জিতভাবে সম্পৃক্ত করার ফলে টিভির জনপ্রিয়তা অনেক কমে যাচ্ছে'। সভায় বিটিভিকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান প্রসঙ্গটি নিয়েও আলোচনা হয় এবং এও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, জনগণের কাছে টিভির গ্রহণযোগ্যতা নিরূপণের জন্য একটি জরিপ পরিচালনা করা হবে। (সূত্রঃ দৈনিক মানব জমিন ২০ মে ১৯৯৯)

(১) অবিলম্বে জাতীয় প্রচার মাধ্যম টেলিভিশন ও রেডিওতে বিরোধী দলের ভাবমূর্তি বিনষ্টের প্রয়াস বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি জাতীয় রাজনৈতিক ইস্যুর ক্ষেত্রে এখনও ঐক্যমতের অভাব রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে তথ্য প্রচার বন্ধ করতে হবে,

(২) দর্শক ও শ্রোতাদের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠানমালা প্রচার করতে হবে এবং দলীয় নির্দেশে যেসব অনুষ্ঠান প্রচার হচ্ছে তা অবিলম্বে বন্ধ করা, পাশাপাশি দলমত নির্বিশেষে যোগ্য শিল্পী উপস্থাপক ও কলা-কুশলীদের সুযোগ দিতে হবে। বর্তমান সরকারের বিদ্বেষের কারণে শিল্পী-সাহিত্যিক, উপস্থাপক, কলাকুশলীদের টিভি অনুষ্ঠান থেকে উদ্দেশ্যেমূলকভাবে বাদ দেয়া হয়েছে, অবিলম্বে তাদের সুযোগ দিতে হবে,

www.pathagar.com

(৩) দুর্নীতিবাজ আওয়ামী লীগের ক্যাডার যেসব কর্মকর্তাদের টিভি ও রেডিওর গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয়েছে তাদের অপসারণ করতে হবে,

(৪) জাসাসের নামে নিম্নমানের এবং উদ্দেশ্যেমূলক বিভ্রান্তিকর অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ করতে হবে। এজন্য সকল মতামতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে,

(৫) বিজাতীয় ও অশ্লীল সংস্কৃতি প্রচার বন্ধ করতে হবে এবং দেশী তারকাদের পাশ কাটিয়ে বিদেশী নিম্নমানের তারকাদের দিয়ে যেসব বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে তা বন্ধ করতে হবে।

৭ জুলাই বিরোধী দলের হরতাল চলাকালে পুলিশ কনস্টেবল ফরহাদ নিহত হয়েছিলেন গুলিস্থান আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের অনতিদূরে অজ্ঞাত আততায়ীর এক বোমা বিস্ফোরণে। অথচ টিভিতে জাতির বিবেকের কাছে প্রশ্ন অনুষ্ঠানে দেখানো হয়েছিল ঢাকা মহানগর বিএনপির আহবায়ক সাদেক হোসেন খোকার নেতৃত্বে বিএনপির মিছিল ও পরে নিহত ফরহাদের ছবি। বিএনপির মিছিলের ছবিতে সাদেক হোসেন খোকার ছবিকে প্রাধান্য দিয়ে বোঝানো হয়েছিল, এ হত্যাকান্ডে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং এ ঘটনায় সাদেক হোসেন খোকাকে আসামী করে মামলাও করেছিল সরকার।

বিটিভিকে পুরোপুরি আওয়ামীকরণ করার প্রস্তুতিপর্বের শুরুতেই আওয়ামী লীগ বিটিভির সাবেক জিএম মোস্তাফিজুর রহমান, পরিচালক (বার্তা) শফিউল হক, ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এম এ ওয়াহেদ, সিনিয়র প্রকৌশলী আবুল কালাম পাটোয়ারী, অনুষ্ঠান অধ্যক্ষ জিয়া আনসারী ও কাজী আব্দুল কাইয়ুমকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়। কোনো কারণ না দর্শিয়েই কেবল চাকরির মেয়াদ ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে এই অজুহাতে ১৫ জুলাই ১৯৯৯ বিকালে কর্মকর্তাদের বাধ্যতামূলক এই অবসর দিয়ে অনেকের বাড়িতে বিশেষ দূত মারফত জরুরী ভিত্তিতে চিঠি পাঠানো হয়। প্রেসিডেন্ট ৭ কর্মকর্তার অবসর সংক্রান্ত ফাইল ৬ জুলাই স্বাক্ষর করেন। কিন্তু কয়েকটি সুবিধাজনক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পন্ন করার জন্য ফাইলটি তথ্য মন্ত্রণালয় ধরে রাখে। অবসর সংক্রান্ত নির্দেশ জারীর আগে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেষণে নিযুক্ত অতিরিক্ত প্রকৌশলী এম এ ওয়াহেদকে বিটিভিতে ফিরিয়ে আনা হয় এবং এর আগে সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত অনুষ্ঠান অধ্যক্ষ কাজী কাইয়ুমকে তার স্বপদে পুনর্বহাল করা হয়। বাধ্যতামূলক অবসরের নির্দেশপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপন করা হয়নি। এমনকি প্রেসিডেন্টের কাছে এ সংক্রান্ত যে ফাইলটি পাঠানো হয়, তাতেও এসব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগের উল্লেখ করা হয়নি। কেবল চাকরির মেয়াদ ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ায় 'জনস্বার্থে' তাদের বাধ্যতামূলক অবসরের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যে কর্মকর্তাদের অবসর দেয়া হয়, তাদের সিনিয়র অনেক কর্মকর্তা বিটিভিতে চাকরিতে বহাল থাকেন।

২২ বৈশাখ ১৪০৬ বাংলা 'দৈনিক দিনকাল' প্রকাশিত 'বিটিভি'র খবরে নজরুল জন্ম শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলা হয় :

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানমালার খবর বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) প্রচারের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। নজরুল জন্ম শতবার্ষিকীর প্রথম দিনের অনুষ্ঠানমালা প্রচারের পর স্বয়ং তথ্য প্রতিমন্ত্রী কবি নজরুল বিষয়ক খবরা খবর প্রচার না করার জন্য টিভি কর্তৃপক্ষকে মৌখিক নির্দেশ দেন বলে জানা গেছে। এর ফলে টেলিভিশনের বার্তা বিভাগ থেকে কবি নজরুলের জন্ম শতবার্ষিকীর বিভিন্ন অনুষ্ঠান

www.pathagar.com

কভারেজ করা হচ্ছে না। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, বিটিভিতে কবি নজরুলের জন্ম শতবার্ষিকীর প্রথম অনুষ্ঠানের খবর প্রচারের পর তথ্য প্রতিমন্ত্রী আবু সাইয়িদ তা দেখে ক্ষেপে যান। তিনি টিভি কর্তৃপক্ষকে ফোন করে এজন্য ধমকে দেন। জানা গেছে, তথ্য প্রতিমন্ত্রী টিভি কর্তৃপক্ষকে বলেন যে, কবি নজরুলকে নিয়ে হৈ চৈ করার কিছু নেই। বাংলাদেশে নজরুলকে নিয়ে যারা চিন্তা ভাবনা করেন অর্থাৎ শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, গবেষক সবাই রাজাকার। তাই রাজাকারদের অনুষ্ঠান টিভিতে যাবে না। তথ্য প্রতিমন্ত্রীর এ বক্তব্য ও মৌখিক নির্দেশের পর বিটিভি'র বার্তা বিভাগ নজরুল বিষয়ক অনুষ্ঠানাদির কভারেজ করা থেকে বিরত রয়েছেন। ফলে বিটিভির খবরে কৌশলে কবি নজরুলকে ব্যাক আউট করা হয়েছে'।

৬ অক্টোবর ১৯৯৯ সাফ গেমসের ফুটবলে স্বর্ণপদক বিজয়ী বাংলাদেশ ফুটবল দল দেশে ফিরে আসলে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাংলাদেশ দলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। বাংলাদেশ দলকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আওয়ামী লীগের মন্ত্রী ও এমপিদের সঙ্গে প্রধান বিরোধী দল বিএনপির পক্ষে ঢাকা মহানগর বিএনপির আহবায়ক, সাবেক ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী সংসদ সদস্য সাদেক হোসেন খোকাও উপস্থিত ছিলেন। অথচ বাংলাদেশ টেলিভিশনের রাত ৮ টার বাংলা সংবাদে ফুটবল দলের এই অভ্যর্থনার খবর প্রচারের সময় সরকারি দলের সকল মন্ত্রী এবং এমপিদের নাম প্রচার করা হলেও সাদেক হোসেন খোকার নামটি প্রচার করা হয়নি।

৭ নভেম্বর ১৯৯৯ দৈনিক সংগ্রামে 'মিরাজ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য : বিটিভির ধৃষ্টতা' শীর্ষক সংবাদে বলা হয় 'গতকাল ছিল শবে মিরাজ বা মিরাজ রজনী। ইসলামী পরিভাষায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মক্কা থেকে মসজিদুল আকসায় উপস্থিত হওয়া এবং সেখান থেকে সপ্ত আকাশ পরিভ্রমণ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হবার ঘটনাকে মিরাজ বলে। কোরআন শরীফের ১৭ নং সূরা বনি ইস্রাইলের প্রথম আয়াতে বর্ণিত আছে, পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাহকে তার নিদর্শন দেখাবার জন্য রাতে ভ্রমণ করিয়ে ছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায়।" মিরাজের সন তারিখ নিয়ে মুফাফসির ও হাদীস বেত্তাগণের মধ্যে ভিন্ন মত থাকলেও তা যে মক্কা থেকে এবং হিজরতের পূর্বেই হয়েছিল এ নিয়ে কোন মতবিরোধ নেই। অর্থাৎ মক্কা হতে হিজরত করে মহানবী (সঃ) এর মদীনা গমনের পূর্বেই মিরাজের ঘটনা ঘটে, যে কোন মুসলমানের এ কথা জানা আছে এবং যে কোন সীরাত গ্রন্থে অনুরূপ তথ্যই রয়েছে। অথচ প্রচারিত খবরে স্পষ্টই উল্লেখ করা হয়েছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত'। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, বিটিভি ৫ নভেম্বর থেকে ৬ নভেম্বর রাত ৮টার বাংলা সংবাদসহ বিভিন্ন নিউজ বুলেটিনে অন্য রকম তথ্য সম্প্রচার করে। বিটিভি তার সংবাদ বুলেটিনগুলোতে মিরাজুন নবী (সঃ) সম্পর্কে খবর প্রচার করে এই বলে যে, মহানবী (সঃ) মসজিদে নববী থেকে মিরাজ গমন করেন। মহানবী (সঃ)-এর পবিত্র মিরাজ সংক্রান্ত খবরে বিটিভি পবিত্র কোরআন বিকৃত করে এ বিভ্রান্তকর তথ্য বার বার সম্প্রচার করে। এ ব্যাপারে ৫ নভেম্বর রাত ১০ টার ইংরেজি সংবাদ বুলেটিনের পর বিটিভি কর্তৃপক্ষকে বিশিষ্ট আলেমগণের তরফ থেকে অবহিত করা হয়। কিন্তু বিটিভি এরপরও কোন সংশোধনী না দিয়ে একই ভুল তথ্য পরের দিন ৮ টার বাংলা খবরেও সম্প্রচার করে।

৩০ নভেম্বর সাপ্তাহিক অর্চি বিটিভির বার্তা বিভাগে খবর পাঠে দুর্নীতি, অনিয়ম এবং স্বজনপ্রীতির অভিযোগ নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, 'দীর্ঘদিন সংস্থার প্রচলিত নিয়মকে উপেক্ষা করে সমস্ত বার্তা বিভাগ দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি স্থায়ী রূপ নিয়েছে। জানা গেছে ক্ষমতাসীন দলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইঙ্গিতে এসব অনিয়ম চলছে।

www.pathagar.com

নিয়ম অনুযায়ী রাত ৮ টা এবং ১০ টায় খবর পাঠ করার কথা সিনিয়র পাঠকদের যাদের নাম এ+গ্রেডভুক্ত হয়েছে। এ+গ্রেডেশনভুক্ত সংবাদ পাঠকদের সংখ্যা বাংলা ও ইংরেজি মিলিয়ে ৮ জন থেকে ১০ জন। এর বাইরে অন্য কারো এ দু'টি সংবাদ পাঠের নিয়ম নেই, সুযোগও নেই। অথচ অপেক্ষমান জুনিয়র এবং যারা এ+গ্রেডভুক্ত নয় তারা অহরহ সংবাদ পাঠ করছেন। এ+গ্রেডভুক্ত সংবাদ পাঠকরা হচ্ছেন, সিরাজুল মজিদ মামুন, আসমা আহমেদ মাসুদ, মাহমুদুর রহমান, আমিনুল হক, মুননুন আহমেদ, রামেন্দু মজুমদার, তহমিনা জাকারিয়া, সালেহ আকরাম প্রমুখ। এর বাইরেও এ+ভুক্ত সংবাদ পাঠকরা হলেন, সরকার কবীর উদ্দিন, কাফি খান, রোকেয়া হায়দার প্রমুখ। অন্যদিকে এ+গ্রেডভুক্ত নন অথচ নিয়মিত ৮টা এবং ১০ টার খবর পাঠ করছেন এমন সংবাদ পাঠকরা হলেন, রোখসানা আনোয়ার, নীলুফার বানু, মাহবুবা চৌধুরী, বাবুল আখতার, সেলিম মনির, মোহসীনা রহমান, মনোয়ার বেগম প্রমুখ। এ+গ্রেড ভুক্ত নয় এমন প্রায় ২০ জনের মতো পাঠক নিয়মিত ৮টা এবং ১০টার সংবাদ পাঠ করছেন। সংশ্লিষ্টরা নিয়ম বহির্ভূতভাবে কিভাবে সংবাদ পাঠ করে আসছেন তা রহস্যজনক এবং প্রশ্নবোধক। বিটিভি'র বার্তা বিভাগে দলীয়করণ এবং স্বজনপ্রীতি সর্বকালের সর্বরেকর্ড ভঙ্গ করেছে। রাতারাতি সবাই মুজিব প্রেমিক বনে গেছে। দল ক্ষমতাসীন হবার সুবাদে অনেকে দলীয় নেতা, ক্ষেত্র বিশেষ মন্ত্রীদের নাম ভাঙিয়ে বার্তা বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। বিষয়টি ওপেন সিক্রেট। নবাগত ও অপেক্ষাকৃত জুনিয়র সংবাদ পাঠকদের কারো কারো উদ্ধতপূর্ণ আচরণে সিনিয়রদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করছে। প্রতিদিনের খবর পাঠের সিডিউল বিটিভি কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেও বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর দীর্ঘদিনের সে নিয়ম রাতারাতি উধাও হয়েছে। একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী নিজেই এখন সিডিউল বন্টন করেন। ১৯৯৬ তে বিএনপি সরকারের পতনের সময়ে জনতার মঞ্চে ছিলেন এমন একজন সংবাদ পাঠক যিনি এক সাথে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, নেপথ্যে থেকে ঐ মন্ত্রীকে গাইড করেন বলে অভিযোগ উঠেছে'।

২৯ ডিসেম্বর দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'বাংলাদেশ টেলিভিশন সেন্টারকে স্মরণকালের নিরাপত্তা দুর্ভেদ্য দুর্গ বানানো হলেও কিছু স্বার্থান্বেষী কর্মকর্তার মাধ্যমে বিটিভির সম্পদ কোটি কোটি টাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠান নামমাত্র মূল্যে প্রাইভেট চ্যানেলে পাচার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। বিটিভিতে সম্প্রচার হয়েছে এমন জনপ্রিয় নাটক, গানের অনুষ্ঠান, ধারাবাহিক নাটকসহ অন্যান্য ক্যাসেট দু'টি বাংলা টিভি চ্যানেলের কাছে খুব গোপনে বিটিভির অতি উৎসাহী কয়েকজন কর্মকর্তা বিশেষ সুবিধায় বিক্রির নামে পাচার করেছে বলে সূত্র জানিয়েছে। এতে জাতীয় সম্পদ বহু মূল্যবান অনুষ্ঠান গোপনে বিদেশী টেলিভিশন লন্ডন বাংলাকে দেয়া হয়েছে। পাচারের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানগুলো সিদ্ধেশ্বরী থেকে পরিচালিত স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল আইকে দেয়া হয়েছে বলে বিটিভির উর্ধ্বতন মহল সূত্রে জানা গেছে। এ বিষয়টি নিয়ে সরকারি অনুচরের ভূমিকা পালনকারী কিছু টিভি কর্মকর্তা বেশ কিছুদিন আগে থেকেই তাদের পছন্দের প্রাইভেট চ্যানেলে বিটিভির সেরা সেরা অনুষ্ঠান হস্তান্তরের কৌশল খুঁজতে থাকে। পরে বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের কিছু কর্মকর্তার সহযোগিতায় গোপনে সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় বিবেকবান কয়েকজন বিটিভি কর্মকর্তা বাধা প্রদান করলে তাদের থামিয়ে দেয়া হয়। দেশের বিখ্যাত সংগীত শিল্পী রুনা লায়লা ও সাবিনা ইয়াসমিনেরও বেশকিছু অনুষ্ঠান এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হস্তান্তর হয়েছে। এ খবর শিল্পী রুনা লায়লা পাবার পর তাৎক্ষণিক আপত্তি জানান। বিষয়টি পরে ফাঁস হয়ে যাবার আশংকায় আপাতত বাকী অনুষ্ঠানের

www.pathagar.com

ক্যাসেট হস্তান্তর স্থগিত রাখা হয়েছে। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সরকারি মদদদাতা কিছু কর্মকর্তার মাধ্যমে বিটিভিকে পঙ্গু করার সকল ব্যবস্থা পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে বলে কয়েকজন কর্মকর্তা অভিযোগ করেন। নানা কৌশলে দক্ষ টিভি কর্মকর্তাদের চাকরিচ্যুত করে টিভিকে মেধাশূন্য করা হয়েছে। জনগণের সম্পদ টিভি অনুষ্ঠান অন্য চ্যানেলে বিক্রি করতে হলে উপযুক্ত মূল্য পাবার নিমিত্তে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রি করার নিয়ম। কিন্তু এত গোপনে অনুষ্ঠানগুলো পাচার হয়েছে যে, অনেক কর্মকর্তাও তা জানেন না। তবে জনগণের অর্থে নির্মাণ করা কোটি কোটি টাকার অনুষ্ঠান বিনা টেন্ডারে কিভাবে দেশী-বিদেশী প্রাইভেট টিভি চ্যানেলে চলে যায় তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। একটি সূত্র জানায়, চ্যানেল আই ও লন্ডন বাংলা টিভিকে যে নামমাত্র অর্থের বিনিময়ে গোপনে নামী-দামী সব অনুষ্ঠান দেয়া হয়েছে তার দ্বিগুণ-চারগুণ অর্থ দিয়েও অন্য চ্যানেল কর্তৃপক্ষ অনুষ্ঠান কিনতে আগ্রহী ছিল কিন্তু কি রহস্যের কারণে বিশেষ দু'টি চ্যানেলকে বিটিভির সারাজীবনের সঞ্চয় গোপনে হস্তান্তর করা হয়েছে তাই নিয়ে কর্মকর্তাদের নানা অভিযোগ। আশংকা করা হচ্ছে বর্তমান সরকার চলে যাবার পর বিটিভির পুরানো কলকাতা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কারণ, মেধাবী ব্যক্তিদের তাড়ানো হয়েছে এবং অনেককে কোণঠাসা করা হয়েছে। ফলে তাদের দিয়ে ভবিষ্যতে ভাল কোন অনুষ্ঠান নির্মাণের ক্ষমতা বিটিভির থাকবে না। একটি সরকারি মহল এই প্রক্রিয়া দ্রুত বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিটিভি কর্তৃক আড়াই লাখ, তিন লাখ টাকার অনুষ্ঠান কিভাবে নামমাত্র মূল্যে প্রাইভেট চ্যানেলে দেয়া হয় তা টিভি কর্মকর্তাদেরই বিশেষভাবে হতবাক করেছে'।

২ ও ৩ ফেব্রুয়ারি বিরোধী দলের হরতালের আগের দিন ১ ফেব্রুয়ারি দিনে চট্টগ্রামে বিএনপি অফিসে এবং ঐ দিনই মধ্য রাতে ঢাকায় বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা নিয়ে বিটিভিতে জাতির বিবেকের কাছে প্রশ্ন নামের অনুষ্ঠানে প্রচার করে ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিএনপি অফিস বোমা তৈরির কারখানা হিসেবে পরিণত হয়েছে। যেসব ঘটনা তদন্তাধীন বা আদালতে বিচারাধীন সেসব ঘটনা নিয়ে টেলিভিশনের এমন উদ্দেশ্যমূলক প্রচার আদালতের উপর হস্তক্ষেপের শামিল ছিল।

১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছিলেন বাংলাদেশ প্রশাসনিক সার্ভিস এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি, রেডিও-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটির চেয়ারম্যান আসাফ-উদ-দৌলা । এর আগে তিনি সর্বশেষ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করে সরকারি চাকরী থেকে অবসর নেন। দীর্ঘ ১৩ বছর তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থতা, জননিরাপত্তা আইন প্রণয়ন, গঙ্গার পানি চুক্তি, বস্তি উচ্ছেদসহ আওয়ামী লীগের কিছু কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ হয়েই মাত্র ৪ বছরের মাথায় রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটিয়ে আওয়ামী লীগ ছাড়েন আসাফ-উদ-দৌলা। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০০ আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদককে বাসায় ডেকে তাঁর হাতে পদত্যাগপত্রটি তুলে দিয়ে দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনার কাছে একটি পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে জানিয়ে দেন, এই পত্রের মাধ্যমে তিনি ওই দিন থেকে আওয়ামী লীগের প্রাথমিক সদস্য পদ থেকেও পদত্যাগ করলেন।

মহান একুশের রাতে (২০০০) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনকালে বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে টিভি পর্দায় দেখানোর অপরাধে বিটিভির ১৪ জন কর্মকর্তা ও ক্রুর চাকরি যাবার উপক্রম হয়। অভিযুক্তদের মধ্যে থাকেন কর্মকর্তা ও ক্যামেরাম্যান। তাদের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ ইস্যু করা হয়। বিটিভি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত শো'কজ নোটিশে একুশের অনুষ্ঠান সম্প্রচারে যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য রক্ষা করা

www.pathagar.com

হয়নি বলে অভিযোগ করা হয়। টিভিতে খালেদা জিয়াকে সরাসরি প্রদর্শনই এই শোকজ নোটিশ প্রদানের মূল কারণ ছিল। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়, একুশের রাতে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর পুষ্পস্তবক অর্পণের পর বিরোধী দলীয় নেত্রীর আগমন এবং শ্রদ্ধা নিবেদনের দৃশ্য টিভি পর্দায় দেখার পর সরকারের শীর্ষ মহল দারুণভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। প্রেসিডেন্ট ও প্রধামন্ত্রীর চেয়ে বিরোধী দলীয় নেত্রীকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বলে তাদের চোখে ধরা পড়ে। আর সাথে সাথে শুরু হয় যায় এ্যাকশন। ২১ ফেব্রুয়ারি ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও ওইদিনই উল্লিখিত কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ ইস্যু করানো হয়। ৩ দিনের মধ্যে নোটিশের জবাব দেয়ার জন্য বলা হয়।

২৫ ফেব্রুয়ারি দীর্ঘ দেড় ঘন্টা ধরে বিটিভিতে প্রচারিত 'দেশবাসীর মুখোমুখি প্রধানমন্ত্রী' অনুষ্ঠানটি ছিল অগোছালো ও দায়সারা গোছের। বিটিভি কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনা ও অদূরদর্শিতার কারণে অনুষ্ঠানটি বিশৃঙ্খলা, হৈচৈ, উত্তেজনা ও টিভি ভবনে উপস্থিত দর্শকদের তির্যক বাক্য বিনিময়ের মধ্যদিয়ে শেষ হয়। অনুষ্ঠানটির উপস্থাপক ছিলেন আনিসুল হক। টিভি মিলনায়তনে উপস্থিত দর্শকদের কাছ থেকে লিখিত প্রশ্ন জমা নিয়েও তাদের প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে উপস্থাপক নিজেই প্রশ্ন করতে থাকলে অনেকেই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিদের দর্শক হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে ঘোষণা দিলেও দর্শকদের অধিকাংশই ছিল দলীয় সমর্থক। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশের তেমন কোনো সামাজিক পরিচিতি ছিল না। তারা ছিলেন অপরিচিত। পরিচিতদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সরকার সমর্থক বিভিন্ন ফোরামের নেতৃবৃন্দ। প্রধানমন্ত্রী কয়েকটি প্রশ্নের জবাবে বিরোধী দলকে আক্রমণ করে যে জবাব দেন তাতে মিলনায়তনে তুমুল করতালি পড়ে। যে হারে করতালি পড়ে তাতে মনে হয়েছে এটি দলীয় কোনো কর্মসূচি। প্রধানমন্ত্রী অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তরই এড়িয়ে যান। একটি প্রশ্ন ছাড়া কোনো প্রশ্নেরই সরাসরি জবাব মেলেনি। কবে রাজনীতি থেকে অবসর নিবেন উপস্থাপকের এই প্রশ্নের সরাসরি জবাব দেননি প্রধানমন্ত্রী। মোট ৯০ মিনিটের এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে ২১টি প্রশ্ন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী প্রায় ১ ঘন্টা ৩ মিনিটে এসব প্রশ্নের জবাব দেন। ৯০ মিনিটের মধ্যে অনুষ্ঠানের বিরতি ছিল ১০ মিনিট আর প্রশ্নকর্তারা প্রশ্ন করেন প্রায় ১৭ মিনিট। অনুষ্ঠানে বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বিরোধীদলীয় উপনেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও তাদের জন্য নির্ধারিত কোনো আসন ছিল না। দর্শক সারির প্রথম তিনটি লাইন আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য নির্ধারিত করে রাখলেও এখানে তাদের জন্য নির্ধারিত কোনো আসন ছিল না।

১০ মে ২০০০ রাত ৮টার জাতীয় সংবাদ প্রচার কোন পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই আকস্মিকভাবে ১৫ মিনিট পিছিয়ে সোয়া ৮ টায় করা হয়। সাধারণত জাতীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় ছাড়া বিটিভির নির্ধারিত ৮ টার বাংলা সংবাদ কিংবা ১০ টার ইংরেজি সংবাদ প্রচারের সময় কখনোই পরিবর্তন করা হয় না। অথচ ঐ দিন বিটিভির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সৃষ্ট একটি বেসরকারি বাংলা টিভি চ্যানেল ইটিভির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে অযাচিতভাবে বিটিভির নির্ধারিত বাংলা সংবাদের প্রচার সময় কোন পূর্ব সিদ্ধান্ত বা ঘোষণা ছাড়াই ১৫ মিনিট পেছানো হয়। এজন্য বিটিভিকে অতিরিক্ত ৪ লাখ টাকাও খরচ করতে হয়। হোটেল সোনারগাঁয়ে অনুষ্ঠিত ইটিভির ঐ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনীতে প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এবং তা বিটিভিতে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। ইটিভিও তা সরাসরি সম্প্রচার করে।

বিটিভির উর্ধ্বতন মহলে ১৪ মে আকস্মিকভাবে রদবদল ঘটে। বিটিভির জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) কাজী আবু জাফর মোহাম্মদ হাসান সিদ্দিকীর স্থলে পরের দিন থেকে

www.pathagar.com

দায়িত্বপ্রাপ্ত হন মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ। জিএম দুপুর পর্যন্ত জানতেন না তিনি আর বিটিভির জিএম হিসেবে নেই। তাঁর এক ঘনিষ্ট মহলের মাধ্যমে তিনি প্রথম জানতে পারেন নতুন জিএম হিসেবে মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ ঐ দিন সকালেই হেড অফিসে চাকরিতে নিয়োগ পেয়েছেন।

২৪ আগষ্ট দৈনিক দিনকালে প্রকাশ, 'একুশে টেলিভিশন (ইটিভি)-এ নামাজের আজান এবং কোরআন তেলাওয়াত প্রচারে মানা। বেসরকারি এই টেলিভিশন সাম্প্রতিককালে সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু থেকেই আসর, মাগরিব ও এশার নামাজের সময় আজান না দিয়ে দিব্যি অনুষ্ঠান চালিয়ে যাচ্ছে। ইটিভিতে আল্লাহর নাম নেয়াও অলিখিতভাবে নিষিদ্ধ। শুভেচ্ছা, শুভরাত্রি ইত্যাদি হচ্ছে এর পরিভাষা। দুপুর ২ টা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ইটিভির অনুষ্ঠান সম্প্রচারকালে তিন ওয়াক্ত নামাজের আজানকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে। প্রথমদিকে ইটিভিতে অনুষ্ঠান শুরুতে আল্লাহর নাম নেয়া হতো না। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরের প্রেক্ষিতে এখন শুরুতে তরজমাসহ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম উচ্চারিত হচ্ছে'।

২৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে বাজেট আলোচনার সমাপনী ভাষণে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল চালুর মতো সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছি। আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল বেতার ও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন প্রদান। আমরা তা থেকে আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছি। ইনশাল্লাহ আগামী নির্বাচনের আগে আমরা বেতার এবং টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসনও দিয়ে যাবো।'

২০০০-২০০১ সালের ৩০ রমজান মাগরিবের আজানের পর একটি হামদ প্রচার শুরু হয়। হামদটির শুরু ছিল 'পাবি নারে তুই পাবি না খোদারে, ব্যথা দিয়ে তার মানুষের প্রাণে'। হামদের এই স্থায়ী অংশটুকু প্রচারের পর তা হঠাৎ বন্ধ করে দিয়ে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ৮ জানুয়ারি ২০০১)

আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সময়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবেই ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে উপেক্ষা প্রদর্শন করে থাকে-এ অভিযোগ অনেক দিনের। আওয়ামী লীগ সরকারের অংশগ্রহণের প্রশ্নে বিতর্ক থাকলেও এই অভিযোগ অনস্বীকার্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, প্রশ্রয় এসেছে সরকারের পক্ষ থেকে এবং ঘটনাপ্রবাহের কোনো পর্যায়ে সরকার অন্তত উপেক্ষা প্রদর্শনকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি, তাদেরকে নিরুৎসাহিতও করেনি। এর ফলে ইসলাম বিরোধী দুস্কৃতকারীদের সাহস ক্রমাগত বেড়েছে এবং ইসলামকে অবমাননা করার সকল সুযোগকে তারা কাজে লাগিয়েছে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে। ২০০০ সালে ইটিভি এবং চ্যানেল আই এর পাশাপাশি বিটিভিও ঈদ-উল-ফিতরকে নিয়ে চরম উদ্ধত্যপূর্ণ উপহাস করে এবং প্রত্যক্ষভাবে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত আনে। বাংলাভাষী মুসলমানদের সবচেয়ে প্রিয় সংগীত রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ'কে চ্যানেল আইতে উপস্থাপন করা হয় অত্যন্ত আপত্তিজনকভাবে। সংগীত প্রচারকালে নগ্নতার জন্য কুখ্যাত এবং ভারতের প্রধান বিনোদন কেন্দ্র মুম্বাইয়ের উন্মাদ তারকাদের দেখানো হয়। ইটিভিও ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে একাধিক অনুষ্ঠানে। যেমন ঈদের কেনাকাটা বিষয়ক এক অনুষ্ঠানের উপস্থাপক বলে বসেন, ঈদ-উল-ফিতরের এই উৎসবের সময় 'বাঙালিরাও' কেনাকাটায় মেতে ওঠে। ইটিভির অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ঈদ মোবারক এর পরিবর্তে ঈদ মাশাররফ বলতে চেয়েও উপহাস করেন। ইটিভির অন্য এক অনুষ্ঠানে আবার ঈদের কোলাকুলি নিয়ে উপহাস করে দেবাশীষ বিশ্বাস নামধারী উপস্থাপক। কোলাকুলিকে সে প্রথমে কাঁধাকাঁধি এবং পরে বুকাবুকি বলতে চেয়েছে। বিটিভিও ধৃষ্টতা ও উপহাসের নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ঈদ-উল-ফিতরের দিন বিটিভি হিন্দু ধর্মের কাহিনী অবলম্বনে এবং যৌথ প্রযোজনার নামে ভারতে নির্মিত এমন একটি সিনেমা দেখায়, যার সম্পূর্ণটুকুতেই থাকে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাধান্য। সিনেমার চরিত্র হিন্দুদের, সংলাপও হিন্দুদের।

www.pathagar.com

অর্থনীতির বারোটা

'বাংলাদেশে বিদ্যমান বাস্তবতায় উন্নয়ন কৌশলের লক্ষ্য হবে দারিদ্র নিরসন, স্বাবলম্বিতা অর্জন ও মানব সম্পদের উন্নয়ন.....অবাধ বাণিজ্য নীতির পাশাপাশি আমদানী ও রফতানির অসমতা দূর করে বাণিজ্যে ভারসাম্য রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দেশের অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন দ্রুততর করা হবে।' (সূত্রঃ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার-১৯৯৬)

আওয়ামীরা ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে জাতীয় অর্থনীতির সার্বিক অবস্থায় মন্দাভাব দেখা দেয়। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মন্দার প্রভাব অক্টোপাসের মতো লেগে থাকে। আওয়ামীদের পক্ষ থেকে প্রচার-প্রপাগান্ডা যাই চালানো হোক না কেন প্রত্যাশিত গতিশীলতার কোন লক্ষণ ছিল না ৫ বছরের কার্যদিবসে। জাতীয় সংসদে অর্থনীতির উন্নয়নের কাল্পনিক তথ্য যেভাবে দেয়া হোক না কেন, আওয়ামী সমর্থিত সংবাদপত্রে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার নিয়ন বাতি হয়ে যেভাবেই জ্বলজ্বল করুক না কেন, টাকার কষ্টে মানুষের মুখে হাসি ছিল না, সারাদেশের সর্বস্তরের মানুষের চেহারায় লক্ষ্য করা গেছে বিষন্নতা। ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও উৎপাদন প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিরাজ করছে অনাকাঙ্ক্ষিত এক গুমোট ভাব। পাঁচ বছর অর্থনীতি কেমন ছিল এ প্রশ্নের জবাবে ঋণ ও লোকসানে নুয়ে পড়া কৃষক, সর্বস্তরের নিষ্প্রাণ দোকানদার, বেশিরভাগ শিল্পের রুগ্ন মালিক ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের চড়া দামে উদ্বিগ্ন মধ্যবিত্ত ও কর্মহীন বিত্তহীনদের এক জবাব ছিল-ভালো না।

পাঁচ বছরে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে ঢাকাসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও হাজার হাজার বিপনি বিতান, শপিং সেন্টার, ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর, মার্কেট ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু পাঁচ বছরে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য তারা পাননি। অনেক সময় দেখা গেছে ব্যবসায় খাটানো মূল টাকাই তারা পাঁচ বছরে তুলতে পারেননি। গ্রাহকের অভাবে তারা ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কষ্টকর কাজে যোগদান করেছে।

পাঁচ বছরে সংবাদপত্রে ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী বিভাগের বাণিজ্যিক যে চিত্র প্রকাশিত হয়েছে তা এক কথায় ভয়াবহ। আওয়ামী সমর্থিত কোনো কোনো সংবাদপত্রেও দেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির কথা জানানো হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী বহু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অভিমত ছিল, তারা অনেকে কোনোদিন 'বউনি' পর্যন্ত করতে পারছে না। অনেকের বক্তব্য ছিল, ৫ দিনেও 'বউনি' হয়নি। দেশের স্বর্ণ ব্যবসা প্রায় লাটে উঠে। খুলনার বৃহৎ মার্কেট কেডিএ'র শাড়ি, তৈরি পোষাক, ক্রোকারিজ, ষ্টেশনারী পণ্য, জুতো, বই-পুস্তক, জুয়েলারী প্রভৃতি ব্যবসায়ী প্রায় হাত-পা গুটিয়েই বসে ছিল। সার আর ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধিতে কৃষক আর কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে পারেনি কৃষক। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কৃষক ও ব্যবসায়ীরা। দেশের উত্তরাঞ্চল, সিলেট ও পশ্চিমাঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের বিশাল বাজার দখল করেছে চোরাচালানের ভারতীয় পণ্য। ফলশ্রুতিতে দেশীয় সংশ্লিষ্ট পণ্যের শিল্প-কারখানাগুলো পণ্যের বাজার হারিয়েছে।

www.pathagar.com

আওয়ামীরা ক্ষমতাসীন হবার প্রথম ছয় মাসেই ব্যবসা-বাণিজ্যের অবকাঠামো ভেঙে পড়ে। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে দৈনিক দিনকালের ভ্রাম্যমান প্রতিনিধির রিপোর্টে ব্যবসায়ীদের ভাষ্য ছিল, ১৯৯৫ সালের একই সময়ের তুলনায় ব্যবসা কমেছে ৭০/৭৫ ভাগ। তারা অনেকেই তহবিল ভাঙিয়ে খাচ্ছিলেন। ঘরভাড়ার টাকাও যোগাড় করতে পারেনি। কর্মচারিদের বেতন দিতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। এর কারণ ছিল উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্থবিরতা, ব্যবসা-বাণিজ্যে সরকারি অসহযোগিতা, চাষী ও ব্যবসায়ীদের অর্থ সংকট, শেয়ার মার্কেটের ধ্বংস প্রভৃতি। নিউমার্কেট, বায়তুল মোকাররম, হাটখোলা, পাটুয়াটুলী, ইসলামপুর, সদরঘাট, ফুলবাড়িয়া, বঙ্গবাজার, চকবাজার, মৌলভীবাজার প্রভৃতি এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যে মারাত্মক পরিস্থিতির বিরাজ করছিল। ওই সময়ের প্রতিবেদনে প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক আইটেমের বিক্রির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৬০ থেকে ৭০ ভাগ হ্রাস পাবার বিবরণ ছাড়াও সরেজমিনে তদন্ত করে জানা গিয়েছিল যে, বড় বড় আমদানিকারকদের কাছে ছোট ও ক্ষুদ্র আমদানিকারকরা মার খেতে শুরু করেছে। এ অবস্থা কেন হলো? সহজ উত্তর, মানুষের হাতে টাকা নেই। ক্রয় ক্ষমতা নেই। চোরাচালানের পণ্যের দাপটে দেশীয় ব্যবসায়ীরা বিপাকে। দেশী পণ্য বাজার না পাওয়ায় শিল্প-কারখানাগুলোরও অচলাবস্থা। বন্ধ হয়েছে হাজার হাজার কারখানা। ফলে মাঝারি ও ক্ষুদ্র অজস্র উৎপাদনমুখী অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বন্ধ হয়েছে। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ১০ জানুয়ারি ১৯৯৭)

২৮ নভেম্বর ১৯৯৮ দৈনিক ইত্তেফাকের সাথে এক সাক্ষাৎকারে অর্থমন্ত্রী শাহ এ এমএস কিবরিয়া বলেছিলেন, 'বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কাটাইয়া আগামী জানুয়ারি হইতেই দেশের প্রবৃদ্ধির হার পূর্বের হারকে ছাড়াইয়া যাইবে এবং অর্থনীতি আগের মতই সচল হইবে। তবে বন্যার কারণে দেশের সারা বছরের গড় প্রবৃদ্ধির হার কিছু কমিয়া যাইতে পারে। খেলাপীরাই ব্যাংক হইতে আগের মত অর্থ না পাইয়া অর্থনৈতিক মন্দার কথা বলিয়া বেড়ায়।' সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী তার কক্ষে এই সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। তিনি বন্যা, হরতাল, ব্যাংক পরিস্থিতি এবং ঋণ খেলাপীদের নিয়ে অনেক খোলামেলা বক্তব্য রাখেন।

অর্থমন্ত্রী এ বক্তব্য রাখার পর তিন বছর আওয়ামীরা ক্ষমতায় ছিল কিন্তু অর্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নীতিটি আর ভাল হলো না। বরং আরো খারাপ ও অবনতিশীল হলো। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ভয়ানক অবনতিশীল চিত্র ফুটে উঠে ১৯৯৯ সালের দিকে প্রকাশিত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত অর্থবছরের ৩য় প্রান্তিকের বিশ্ব ব্যাংকের এক পর্যালোচনায়।

এতে বলা হয়, 'কৃষি উৎপাদন, শিল্প উৎপাদন, আমদানী-রফতানী বাণিজ্য, রাজস্ব প্রবাহ, মূল্যস্ফীতি, প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি, অর্থ সরবরাহ, বাজেট ঘাটতিসহ অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহে অর্থবছরের প্রথমার্ধের অবস্থা অবনতিশীল ও হতাশাব্যঞ্জক।'

প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'অর্থ সরবরাহে প্রবৃদ্ধি চলতি অর্থবছরের প্রথম ৩ মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রা কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে নিচে রয়ে গেছে। কঠোর মুদ্রানীতির কারণে প্রথম ৩ মাসে বেসরকারি খাতের ঋণ বেড়েছে মাত্র ৯.৭ শতাংশ অথচ পূর্ববর্তী বছর এই সময়ে এ খাতে ঋণ বৃদ্ধির হার ছিল ১৬.৮ শতাংশ। অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে রাজস্ব আদায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৯ থেকে ১০ শতাংশ পিছিয়ে রয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিকে সংকুচিত করা না হলে রাজস্ব ঘাটতি ৪.৭ শতাংশ বা এর নিচে আনা সম্ভব হবে না। বছরের প্রথম ৪ মাসে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১২.৫ শতাংশ নিচে রয়ে গেছে।'

www.pathagar.com

প্রতিবেদনে বলা হয়, 'কৃষি উৎপাদন পরিস্থিতি বন্যার কারণে যতটা খারাপ হবে বলে আগে ধারণা করা হয়েছিল, বাস্তব অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। আমন উৎপাদনের চূড়ান্ত হিসাব পাওয়া না গেলেও দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত তথ্যে এ চিত্র ফুটে উঠেছে। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বন্যায় ক্ষতি বেশি হয়েছে। ফলে সেখানকার উৎপাদন পরিস্থিতি প্রত্যাশা অনুযায়ী খারাপ। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বন্যার ক্ষতি ছিল তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু এ অঞ্চলে কীটপতঙ্গ ও বিভিন্ন ভাইরাসের আক্রমণ এবং নভেম্বর মাসের অপ্রত্যাশিত বৃষ্টিতে আমনের বাম্পার ফলনের আশাবাদ ধূলিসাৎ হয়েছে। ইউএসএআইডি ও এফপিএমএই উভয় সংস্থার হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৯ অর্থ বছরে খাদ্য উৎপাদন ১৯৯৮ অর্থ বছরের ২ কোটি ৭ লাখ টন থেকে কমে ১ কোটি ৮৮ লাখ টনে নেমে আসবে।'

শিল্পোৎপাদনের হতাশাজনক চিত্র তুলে ধরে রিপোর্টে বলা হয়, 'চলতি অর্থবছরের প্রথম ৪ মাসে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের তুলনায় বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের কোয়ান্টাম সূচক অনুযায়ী উৎপাদন ৩.৫ শতাংশ কমে গেছে। সর্ববৃহৎ শিল্প গ্রুপ (অবদান ৩৮.১৬ শতাংশ) পাট, সুতা ও চামড়া খাতের শিল্পসমূহে উৎপাদন ৫.৫ শতাংশ কমে গেছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প গ্রুপ কেমিক্যাল, পেট্রোলিয়াম ও রাবার খাতে উৎপাদন কমেছে ৮.১ শতাংশ। অন্যান্য মুখ্য খাতগুলোর অবস্থা কম-বেশি একই রকম।'

প্রতিবেদনে বলা হয়, 'আমদানী ও রফতানী উভয় চিত্র থেকে মনে হয় শিল্প খাতের মন্দা অর্থবছরের প্রথম ৬ মাস অব্যাহত রয়েছে। অধিকাংশ শিল্প পণ্যের উৎপাদন এ সময়ে কমেছে। এনবিআর-এর হিসাব অনুযায়ী পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বর সময়ে মূলধনী পণ্যের আমদানী ১১ শতাংশের বেশি হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া সিমেন্টের উৎপাদন ৩৪.২ শতাংশ, সুতার উৎপাদন ২৮.৫ শতাংশ, কৃত্রিম আঁশ ২২.৫ শতাংশ এবং লৌহ ও ইস্পাতের আমদানী ১৫.৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। খাদ্য বহির্ভূত পণ্য আমদানী ব্যাপকভাবে কমেছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, '১৯৯৮-৯৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে রফতানী আয় আগের বছরের তুলনায় ৫.৬ শতাংশ কমে গেছে। চলতি অর্থ বছরে মাত্র ৬ শতাংশ রফতানী প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলেও নভেম্বর থেকে জুন '৯৯ পর্যন্ত সময়ে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১২ শতাংশ অতিরিক্ত রফতানী আয় করতে হবে। উল্লিখিত ৪ মাসে নীটওয়্যারে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে রফতানী কমে গেছে। তবে বিশ্ব অর্থনীতির দুর্বলতা, মুদ্রা বিনিময় হারের অদক্ষ বিন্যাসের কারণে ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা হারানো এবং চলতি মূলধনের ঘাটতি ও দুর্বল রফতানী আয়ের পেছনে অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করেছে।'

রাজস্ব প্রবাহের ওপর আলোকপাত করে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়, 'বন্যা পুনর্বাসনের জন্য অতিরিক্ত বৈদেশিক সহায়তা সত্ত্বেও প্লাবনোত্তর পুনর্বাসন কার্যক্রমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা পূরণ করতে সরকার ব্যাপক আর্থিক ঘাটতির সম্মুখীন হয়েছে। নতুন প্রতিশ্রুতি, সম্পূরক সহায়তা ও পুনঃকর্মসূচি তৈরিকরণ বাবদ আইডিএ ও এডিবি ৪৮ কোটি মার্কিন ডলার সহায়তা দিচ্ছে। ১৯৯৯ অর্থ বছরে এর ৫০ ভাগ অবমুক্ত হলে বন্যা পুনর্বাসনের জন্য সরকারের ২৪ কোটি ডলার পাওয়ার কথা। এর বাইরে এডিপি থেকে ৯ কোটি ৯০ লাখ ডলার সাশ্রয় করা গেলে চলতি অর্থবছরের বন্যা পুনর্বাসনের জন্য ৩৩ কোটি ৯০ লাখ ডলার পাওয়া যাবে। এরপরও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো বন্যা পুনর্বাসনের জন্য যে ৫৭ কোটি ২০ লাখ ডলার চেয়েছে তাতে ২৩ কোটি ৩০ লাখ ডলারের ঘাটতি থেকে যাবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওপর

www.pathagar.com

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে বন্যা পুনর্বাসনের জন্য অতিরিক্ত সম্পদের ব্যবস্থা করার জন্য তীব্র চাপের সৃষ্টি করা হচ্ছে। কিন্তু ঘাটতির অর্থ সংস্থানের কোনো ব্যবস্থা এখনো হয়নি।

রিপোর্টে বলা হয়, 'দুর্বল অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সংগ্রহ আর্থিক সংকটকে চরমভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরের প্রথম ৬ মাসে বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ৯ শতাংশ ঘাটতি রয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থ বছরের তুলনায় এ সময়ে রাজস্ব বৃদ্ধির হার (টাকার অংকে) ২/৩ শতাংশের মতো হবে। ডলারের হিসাবে অবশ্য প্রবৃদ্ধি হবে নেতিবাচক। আয়কর ও আমদানী পর্যায়ের সম্পূরক শুল্ক ছাড়া (মোট অবদান ১৭ শতাংশ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্য সব খাতে রাজস্ব আদায়ের অবস্থা শোচনীয়। রাজস্ব আয় হ্রাসের পেছনে বন্যা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বহিঃশুল্ক প্রত্যাহার ও আন্তর্জাতিক বাজারে জিনিসপত্রের দাম হ্রাস মুখ্য ভূমিকা রেখেছে। ৩শ' কোটি টাকা অতিরিক্ত করারোপের পর নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে রাজস্ব আয়ের কিছুটা বাড়তি প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। এরপরও লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ব্যাপক ঘাটতি কাটেনি।'

প্রকল্প বাস্তবায়নের করুণ অবস্থা তুলে রিপোর্টে বলা হয়, '১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরের প্রথম ৪ মাসে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি অনেক পিছিয়ে পড়েছে। গত বছর ৪ মাসে যেখানে ২ হাজার ৬২ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয় হয়েছিল এবার সেখানে প্রকল্প বাস্তবায়নে খরচ হয়েছে মাত্র ১ হাজার ৮শ' ২৫ কোটি টাকা। এতে দেখা যায়, চলতি অর্থ বছরে উল্লিখিত ৪ মাসে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি সাড়ে ১২ শতাংশ পিছিয়ে পড়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকল্প সাহায্যের অবমুক্তি কমে গেছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রকল্প সমূহের দ্রুত পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর ১৯৯৮ পর্যন্ত সময়ের জন্য এডিপির প্রকল্প পুনর্বিন্যাস অনুমোদনের প্রক্রিয়া সহজতর করা হয়। এর ফলে ১৭৩টি বন্যাক্রান্ত প্রকল্পের মধ্যে ৭৯টি প্রকল্পের অনুমোদন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ পর্যায়ে দানের ব্যবস্থা হয়। এর মাধ্যমে বছরের বাকি সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি দ্রুত হবে বলে আশা ব্যক্ত করা হয়।'

রিপোর্টে বলা হয়, 'সম্পদের ঘাটতির কারণে সরকারের ব্যাংক ঋণের নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজস্ব আদায়কে চাঙ্গা করা এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছে সরকারি বন্ড বিক্রি বৃদ্ধি বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে সরকারের ঋণ গ্রহণকে কিছুটা কমাতে পারে। এতে বলা হয়েছে, বেসরকারি খাতের ঋণের স্বল্প প্রবৃদ্ধি (৯.৭ শতাংশ) অর্থ বছরের প্রথম প্রান্তিকে ব্যাপক অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধিকে ১০.৮ শতাংশে সীমিত রেখেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থ বছরের জন্য যে মুদ্রা কর্মসূচি নির্ধারণ করেছিল তার লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধির এ হার পেছনে রয়েছে। ধীর গতির অর্থ সরবরাহের পরও নভেম্বর মাসে পূর্ববর্তী বছরের একই মাসের তুলনায় ১২.৪ শতাংশ মূল্যস্ফীতি হয়েছে। ১৯৯০-এর দশকের এটিই হলো সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি। এই মূল্যস্ফীতি বেশি হয়েছে খাদ্য দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে। খাদ্য দ্রব্যের মূল্যস্ফীতি ঘটেছে এ সময়ে ১৭.৩ শতাংশ। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের দ্বিতীয় অর্ধে মূল্যস্ফীতির অস্বাভাবিক উর্ধ্বগতির কারণে আর্থিক শৃংখলা বজায় রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। এজন্য ঋণ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সরকার বাধ্য হবে।'

১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের জুলাই থেকে মার্চ পর্যন্ত ৯ মাসে অর্থনীতির প্রতিটি খাতেই ঐ বছরের প্রাক্কলিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পিছিয়ে ছিল। এ ধারাবাহিকতায় অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক

www.pathagar.com

সম্পদ আহরণে ক্রমবর্ধমান ঘাটতি, বৈদেশিক মুদ্রার তহবিলে টানাপোড়েন, রেমিট্যান্সে নিম্নমুখী প্রভাব, রফতানি প্রবৃদ্ধিতে নিম্নগতি, খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে পিছিয়ে থাকা, মুদ্রাস্ফীতি উর্ধ্বগতি, ব্যাংক আমানতের তুলনায় ঋণ প্রবাহে স্ফীতি, ঘন ঘন টাকার মূল্যমান হ্রাস, পুঁজিবাজারের অব্যাহত নিম্নগতি, শিল্প উৎপাদনে স্থবিরতা ইত্যাদি কারণে গোটা অর্থনীতিতে বিরাজ করেছে ভঙ্গুর অবস্থা। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের ২৭ হাজার ৭৮৬ কোটি টাকার বাজেটে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বা রাজস্ব আদায়ের প্রাক্কলন হয়েছে ১৯ হাজার ৬২৪ কোটি টাকা। অর্থ বছরের আলোচ্য সময়ে রাজস্ব আদায়ের গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনা করে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়-বছর শেষে এনবিআরভুক্ত কর রাজস্ব এবং এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ১১শ' কোটি টাকা, এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ২৫০ কোটি টাকা এবং কর বহির্ভূত অন্যান্য উৎসবে ৬০০ কোটি টাকার রাজস্ব ঘাটতি হবে। অর্থবছরের জুলাই-মার্চ ৯ মাসে এনবিআরভুক্ত-আয়কর, আমদানি-রফতানি শুল্ক, ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক এবং বিবিধ শুল্ক খাত হতে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০ হাজার ৪৭৬ কোটি ৩৪ লাখ টাকা। এ সময়ে আদায় হয় ৯ হাজার ৬৯৪ কোটি ৪ লাখ টাকা। এসব খাতে বার্ষিক রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ১৫ হাজার কোটি টাকা। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব আদায়ের প্রাক্কলন ছিল ১১৩৫ কোটি টাকা। অর্থবছরে জানুয়ারি পর্যন্ত ৭ মাসে আদায় হয় ৪৮৬ কোটি ৬৬ লাখ টাকা। করবহির্ভূত অন্য খাতসমূহ থেকে রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩ হাজার ৪৭১ কোটি টাকা। ৭ মাসে আদায় হয় ১৬৫২ কোটি ৫৩ লাখ টাকা। বাজেট প্রাক্কলন অনুযায়ী বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ৬৪৮২ কোটি টাকা। অর্থ বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত ব্যবহার হয় ৩৩২৫ কোটি টাকা। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৮ মাসের রেমিট্যান্স পাওয়া যায় ১০২ কোটি ৩১ লাখ ডলার। আগের বছরের এই সময়ের তুলনায় ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে রেমিট্যান্স ৭ কোটি ৪৪ লাখ ডলার বেশি পাওয়া গেলেও রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি অনেক কমে যায়। ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২১.২৩ শতাংশ। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে হয় ৭.৮৪ শতাংশ। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত ৯ মাসে রফতানি আয় হয় ৩২৪ কোটি ৮৫ ৯০ হাজার ডলার। এ আয় এ সময়ের লক্ষ্যমাত্রা হতে ২৯ লক্ষ ডলার কম ছিল। অর্থ বছরের জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত রফতানি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২১ শতাংশ। এরপর থেকেই রফতানি প্রবৃদ্ধি ক্রমাগত হ্রাস পায়। জুলাই-ডিসেম্বর রফতানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৮.৯০ শতাংশ। মার্চ শেষে তা নেমে আসে ১৫.৮৯ শতাংশে। (সূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ ১২ জুন ১৯৯৮)

১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছর শেষে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ২০৪ কোটি ডলার। এ সময়ে রিজার্ভ ছিল নিরাপদ মাত্রায়। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে এপ্রিল শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১৮৪ কোটি ৫৪ লাখ ডলার। কিন্তু মে মাসের প্রথম সপ্তাহে এশিয়ার ক্লিয়ারিং ইউনিয়নকে ২৬ কোটি ৯০ লাখ ডলার পরিশোধ করায় রিজার্ভের পরিমাণ নেমে আসে ১৫৭ দশমিক ৬৪ লাখ ডলারে। সাধারণত প্রতি দুই মাস অন্তর আমদানি বিল পরিশোধ বাবদ ১০ কোটি ডলারের কিছু বেশি এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নকে দেয়ার নিয়ম। কিন্তু ঐ সময়ে খাদ্য আমদানি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় টানাপোড়েন চলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে।

১৯৯৯ সালের মাঝামাঝি দিকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-১৯৯৯' শীর্ষক বইয়ে উল্লেখ করা হয়, '১৯৯৫ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত

www.pathagar.com

দেশে শহর ও গ্রামাঞ্চলে দারিদ্রের পরিমাণ বেড়েছে। পল্লী অঞ্চলে অসম ভূমি মালিকানা এবং শহর ও পল্লী অঞ্চলে অসম আয় বন্টন, কর্মসংস্থানের অভাব এবং সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নিম্নহার দারিদ্র পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর সরকারের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির দাবি করা হলেও ভোক্তাশ্রেণী এর সুফল পায়নি।

১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে খাদ্য ঘাটতির সর্বশেষ হিসাব ধরা হয় ২৪ লাখ টন। ১৯৯৯ সালের জুন পর্যন্ত খাদ্যজাত পণ্যের দাম বেড়েছে ১২.২ শতাংশ। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে প্রবাসীদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ৯শ' ৭৮ কোটি টাকা। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের এপ্রিল পর্যন্ত তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬ হাজার ৩৪ কোটি টাকায়। টাকার অঙ্কে প্রবাসীদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ বাড়লেও ডলারের হিসেবে তা খুব একটা বাড়েনি। অন্যদিকে বিদেশে চাকরী নিয়ে গমনকারী বাংলাদেশীদের সংখ্যা কমেছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে শেষে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৬.৬ শতাংশ। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের শুরু থেকেই মূল্যস্ফীতির উর্ধমূখী প্রবণতা অব্যাহত ছিল। অর্থ বছরের জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৮ মাসের গড় মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৬.৭৫ শতাংশ। ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের প্রথম ৮ মাসে যেখানে মূল্যসূচক ছিল ১৯৩ সেখানে ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে একই সময়ে তা ২০৭-এ উন্নীত হয়। মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির ফলে জনজীবনে বৃদ্ধি পায় ভোগান্তি। (সূত্রঃ দৈনিক মানব জমিন ২৪ জুন ১৯৯৯)

আওয়ামী শাসনে অস্বাভাবিক মূল্যস্ফীতি জনজীবনকে ক্রমেই অসহনীয় করে তুলে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে জাতীয় পর্যায়ে ৮.৯১ শতাংশ মূল্যস্ফীতি হয়। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরেও ৭ শতাংশ মূল্যস্ফীতি হয়েছিল। এর পূর্ববর্তী অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির পরিমাণ ছিল ২.৫২ শতাংশ। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় পর্যায়ের মূল্যস্ফীতি ১২.৬৭ শতাংশে উন্নীত হয়। ১৯৯০-এর দশকে আর কোনো মাসে এত বেশি মূল্যস্ফীতি হয়নি। এ নিয়ে ১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থ বছরের প্রথম ৬ মাসে জাতীয় পর্যায়ের গড় মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। অর্থ বছর শুরু হবার পর জুলাই থেকে প্রতি মাসেই মূল্যস্ফীতি বাড়ে। জুলাই '৯৮ মাসে জাতীয় পর্যায়ের মূল্যস্ফীতি ছিল ৬.৬৭ শতাংশ। আগস্ট মাসে তা ৭.৭৮ এবং সেপ্টেম্বর মাসে ৮.৩৫ শতাংশে উন্নীত হয়। অক্টোবর মাসে মূল্যস্ফীতি আরো বেড়ে ৯.২৭ শতাংশ আর নভেম্বরে ১২.৪৪ শতাংশে উন্নীত হয়। সরকার বন্যা চলাকালে জিনিসপত্রের দাম বাড়ার জন্য মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বগতি বলে যে যুক্তি প্রদর্শন করে বাস্তবে তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থ বছরের প্রথম ৬ মাসের মধ্যে বন্যার ৩ মাসেই মূল্যস্ফীতি ছিল কম। আর ডিসেম্বর মাসে মূল্যস্ফীতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে যখন বন্যার কোন প্রভাবই ছিল না। অথচ সরকার প্যারিসে অনুষ্ঠিতব্য সাহায্যদাতাদের সম্মেলনের জন্য তৈরি স্মারকে মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বগতির জন্য বন্যায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়াকে দায়ী করে। স্মারকে নভেম্বরে মূল্যস্ফীতি ৮ শতাংশ ছিল বলে উল্লেখ করা হয়। অথচ পরিসংখ্যান ব্যুরোর অগ্রিম মূল্য ও মজুরী পরিসংখ্যান এবং বিশ্ব ব্যাংকের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত আপডেট-এ নভেম্বরের মূল্যস্ফীতি ১২.৪৪ শতাংশ বলে উল্লেখ করা হয়। ১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থ বছরের প্রথম ৬ মাসে দেশের গ্রামাঞ্চলের মূল্যস্ফীতি সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। ডিসেম্বর মাসে গ্রাম এলাকার মূল্যস্ফীতি ছিল ১৩.১০ শতাংশ। আর ৬ মাসের গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ১০ দশমিক ২৫ শতাংশ। ১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থ বছর শুরু হবার পর থেকে কোন মাসেই মূল্যস্ফীতির নিম্নগতি দেখা যায়নি। শহরাঞ্চলে গ্রামের তুলনায় মূল্যস্ফীতি কিছুটা কম হলেও প্রবণতা একইভাবে

www.pathagar.com

উর্ধ্বমুখী ছিল। ডিসেম্বর মাসে শহরাঞ্চলে মূল্যস্ফীতি ছিল ১১.৭১ শতাংশ। শহরাঞ্চলে ৬ মাসের গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.২৫ শতাংশ। সরকার মূল্যস্ফীতির অবনতিশীল চিত্র আড়াল করার জন্য বরাবরই খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের দাম বৃদ্ধি নিম্ন পর্যায়ে রাখার কৃতিত্ব দাবী করে আসছিল। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো দেশের মানুষ জীবন ধারণের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও পাদুকা, বাড়ি ভাড়া, জ্বালানী, আসবাব-সামগ্রী, চিকিৎসা, পরিবহন ও যোগাযোগ, শিক্ষা ও বিনোদন এবং অন্যান্য খাতে যে অর্থ ব্যয় করে তা হিসেব করে একটি ভোক্তা মূল্যসূচক নির্ধারণ করে। আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বের বছর জাতীয়ভাবে এই ভোক্তাসূচক ছিল ১৯০.২৭। এ সূচক ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে ২২৭.২৯ পয়েন্টে উন্নীত হয়। অর্থ্যাৎ ৩ বছরে মানুষের জীবন যাত্রার ব্যয় বাড়ে ১৯.৪৫ শতাংশ। ৩ বছর আগে ১শ' টাকার জীবন ধারণের যে উপকরণ সংগ্রহ করা হত তা পেতে ১৯৯৯ সালে ১১৯ টাকা ৪৫ পয়সা খরচ করতে হয়। আওয়ামীরা ক্ষমতায় আসার পর শহর-গ্রাম, শ্রমিক এলাকা নির্বিশেষে সর্বত্র নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর দাম বাড়ে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়ার কারণে গরীব মানুষের দুর্দশাই সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়। গ্রামের দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ব্যয়ের প্রায় সবটাই খরচ করে খাদ্য কেনার জন্য। খাদ্যের মূল্য অধিক বৃদ্ধির কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার ব্যয় অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল জনগোষ্ঠীর চেয়ে বেশি বেড়ে যায়। দেশের শহর ও গ্রামাঞ্চলের মূল্যস্ফীতির ব্যবধানের মধ্যে এ বিষয়টি প্রতিফলিত হয়। আওয়ামীরা ক্ষমতায় আসার পর আগের ৫ বছরের মূল্যস্ফীতিকে সামনে রেখে সরকারি কর্মজীবীদের বেতন বৃদ্ধির জন্য বেতন কমিশন গঠন করে। কমিশন বেতন বৃদ্ধির যে সুপারিশ পেশ করেছিল সরকার কাটছাঁট করে ৩ বছর সময় নিয়ে তা বাস্তবায়ন করে। সুপারিশ বাস্তবায়নকালের ৩ বছরের মধ্যেই জীবন যাত্রার ব্যয় ২০ শতাংশ বেড়ে যায়। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, জাতীয় পর্যায়ে জীবনযাত্রার ব্যয় সবচেয়ে বেশি বাড়ে খাদ্য খাতে। ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে খাদ্যের দাম ১১.৭৬ শতাংশ বেড়েছে। আওয়ামী সরকারের প্রথম তিন অর্থ বছরে খাদ্য দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায় ২১.৪৬ শতাংশ। খাদ্য বহির্ভূত ব্যয়ও ৩ বছরে কম বাড়েনি। এ সময়ে খাদ্য বহির্ভূত খাতে ব্যয় বাড়ে ১৬.২৮ শতাংশ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যহারে ব্যয় বাড়ে বাড়ি ভাড়া, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে। এ খাতের ব্যয় বাড়ে ১৬.৬১ শতাংশ। বাড়ি ঘরের আসবাবপত্র খাতে এ সময়ে ব্যয় বাড়ে সাড়ে ২০ শতাংশ। চিকিৎসার জন্য ৩ বছরের ব্যবধানে জনগণকে ১৩.১১ শতাংশ বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয়। পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৩ বছরে খরচ বৃদ্ধি পায় সাড়ে ১০ শতাংশের মত। শিক্ষা, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের ব্যয় বাড়ে ২১ শতাংশের মত। অন্যান্য খাতে ব্যয়ও এ সময়ে ১৯ শতাংশের মত বাড়ে। পরিসংখ্যা ব্যুরো দেশের গ্রাম এলাকা, শহরাঞ্চল ও শ্রমিক এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির হার পৃথকভাবে হিসাব করে। এ হিসাব অনুযায়ী গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে ৮.৯১ এবং ৩ বছরে সাড়ে ১৯ শতাংশ বাড়ে। শহরের মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ে ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে ৮.৮৯ এবং ৩ বছরে সাড়ে ১৯ শতাংশ। নারায়ণগঞ্জের শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয়ও ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে ৮.৬৫ শতাংশ বাড়ে। শ্রমজীবীদের জীবনযাত্রার ব্যয় আগের বছরও ৮.৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বাংলাদেশে কার্যরত সাহায্যদাতা দেশ ও সংস্থাগুলো দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সহিংস পরিস্থিতির ব্যাপারে অভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঢাকায় সাহায্যদাতা দেশ ও সংস্থার মিশন প্রধানদের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এতে ঢাকায় অবস্থানত

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সাহায্যদাতা প্রায় সকল দেশ ও সংস্থার মিশন প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বাংলাদেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাহায্যদাতা সকল মিশন প্রধান যৌথ স্বাক্ষরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর এক বিবৃতি প্রকাশের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিবৃতিতে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও অস্থিরতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে চরম হুশিয়ারী উচ্চারণ করার সিদ্বান্তের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ পায়। বৈঠকে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, 'দেশের অস্থির ও সহিংস রাজনৈতিক সংস্কৃতি চলতে থাকলে উন্নয়নের জন্য দেয়া সাহায্যের কোনো সুফল পাওয়া যাবে না।' বৈঠকে উল্লেখ করা হয় যে, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং প্রতিহিংসা ও নিপীড়নমূলক পরিস্থিতির অবসান ঘটানোর জন্য সম্মিলিতভাবে চাপ প্রয়োগের কোনো বিকল্প নেই। সকল সাহায্যদাতা দেশ ও সংস্থাকে এ জন্য সম্মিলিত পদক্ষেপ নিতে হবে।' সভায় জবরদস্তিমূলকভাবে আইনানুগ রাজনৈতিক কর্মসূচি বন্ধ করার প্রচেষ্টা এবং বিরোধী দলের অংশগ্রহণ ছাড়া নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ পরিস্থিতিকে অবনতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলেও উল্লেখ করা হয়। হরতালের কর্মসূচির পাশাপাশি হরতালের কারণসমূহ দূর করার উদ্যোগের বিষয়টিও এতে গুরুত্বের সাথে আলোচনা হয়। বৈঠকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বিদেশী সাহায্য দান নিয়ে তিনটি বিবৃতি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রতিটি বিবৃতিই যাতে একটি অপরটির পরিপূরক হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে বিবৃতির বিষয় নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিবৃতিটি প্রকাশ করা হয়। এরপর দ্বিতীয় বিবৃতি হিসেবে প্রকাশ করা হয় মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্ডারপার্থের বিবৃতি। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ৯ মার্চ ১৯৯৯)

৩ মার্চ ১৫ জাতির ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) তাদের বিবৃতিতে বলে, গত মাসে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও বাংলাদেশের মধ্যে যে সমঝোতা হয়েছিল তার পূর্বশর্ত ছিল দেশে মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বজায় থাকবে। কিন্তু ইইউ অভিযোগ করেছে বর্তমান সরকার দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং মানবাধিকার লংঘন করছে। ইইউ হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে, এ অবস্থা চলতে থাকলে বিদেশী সাহায্য ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গুরুতর ক্ষতি হতে পারে। ইইউ কঠোর ভাষায় এক বিবৃতিতে বলেন, 'গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের অভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।' ইইউ-এর তরফ থেকে সংস্থার বর্তমান প্রেসিডেন্ট জার্মানীর ইসু করা এই বিবৃতিতে আরো বলা হয়, 'বাংলাদেশে যদি গোলযোগ চলতেই থাকে তবে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগিতা কমে যেতে পারে।' ইইউ তাদের এই বক্তব্য বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কেও জানিয়েছে। বিবৃতি প্রকাশের এক সপ্তাহে আগে বিরোধী দলগুলোর ডাকা তিন দিনের হরতালের সময় সরকারি দলের সন্ত্রাস ও হানাহানিতে ছয়জনের মৃত্যু ঘটে। একদলীয় পৌর নির্বাচনের প্রতিবাদ এবং সরকারের প্রতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে তার পদত্যাগের দাবীতে এই হরতাল ডাকা হয়েছিল। রাজনৈতিক হানাহানিতে এই প্রাণহানির ঘটনায় ইইউ-এর বিবৃতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়, 'এ ধরনের অস্থিতিশীল পরিবেশ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে।' বিবৃতিতে আরো উল্লেখ করা হয়, 'হরতাল এবং হরতালের সময় রাজপথ দখলের নামে সরকারি দলের রাজনৈতিক সহিংসতা সাধারণ নাগরিকের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করছে। এতে জনজীবন ব্যাহত হচ্ছে এবং সাম্প্রতিক প্রলংকরী বন্যায় অর্থনীতির যে ক্ষতি হয়েছে তা

www.pathagar.com

কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না।' বাংলাদেশে উন্নয়নের ব্যাপারে ইইউ-এর গভীর আগ্রহের কথা উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়, মাত্র গত মাসেই ইইউ বাংলাদেশের সঙ্গে একটি নতুন সাহায্য চুক্তি সই করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কার্যকর সহযোগিতা দানের ব্যাপারটি ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়েছে বলে বিবৃতিতে বলা হয়। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ও বাংলাদেশের মধ্যে যে সমঝোতা হয়েছিল তার পূর্বশর্ত ছিল দেশে মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বজায় থাকবে। ইইউ অভিযোগ করে, 'বর্তমান সরকার দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং মানবাধিকার লংঘন করেছে।' বিবৃতিতে বলা হয়, '১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় বাংলাদেশের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যার প্রভাব কেটে না উঠতেই রাজনৈতিক অস্থিরতা ও হানাহানিতে জনগণের জীবন এবং দেশের অর্থনীতি হুমকির মুখে।' তারা দেশের সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি রাজনৈতিক স্বার্থে সন্ত্রাসকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার না করার জন্য সতর্ক হতে বলেন। বিবৃতিতে সকল দলকে একসঙ্গে এ বিষয়ে অঙ্গীকার করার আহবান জানানো হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো যাতে পার্লামেন্টসহ অন্যান্য আইনগত উপায়ে তাদের বিরোধ মেটাতে তৎপর হয়, ইইউ সে আহবানও জানায়। ইইউর মতে, 'সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের উচিত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে দায়িত্বশীল নেতৃত্বের অনুশীলন করা। এর জন্য প্রয়োজন সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বিরোধীদের বৈধ অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ।'

৪ মার্চ ইউরোপীয় ইউনিয়নের উদ্বেগ সম্পর্কে বিএনপি মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'ইউরোপীয় ইউনিয়নের বক্তব্যের সঙ্গে আমরা পুরোপুরিভাবে একমত। সহিংসতা দিয়ে রাজনীতি করা যায় না। কতগুলো বিষয়ে জাতীয় ঐক্যমত গড়ে তুলতে হবে। নয়তো বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিন্তু এ সরকার জাতীয় ঐক্যমতের সরকার গঠন করলেও জাতীয় ইস্যুতে ঐক্যমত গঠন করার প্রয়োজন অনুভব করে না। সরকারি দল বিরোধী দলকে ধ্বংস করার যে নীতি গ্রহণ করেছে তা থেকেই এ সহিংসতার জন্ম হয়েছে। আজকে দেশে যে সহিংসতা সৃষ্টি হয়েছে সে জন্য সরকারই পুরোপুরিভাবে দায়ী। আজকে বাধ্য হয়ে আমাদেরকে হরতাল করতে হচ্ছে। অন্যান্য পথ যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন প্রতিবাদ জানানোর জন্য হরতাল করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় থাকে না।'

মান্নান ভূঁইয়া বলেন, 'সরকার বিরোধী দলের ৩শ' নেতা-কর্মীকে হত্যা করেছে এবং হাজার হাজার মামলা দিয়েছে। রাজনৈতিক কর্মসূচি বানচাল করতে অস্ত্র দিয়ে মাস্তান নামিয়ে দেয়, রাজপথে খুন করে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে সরকারকেই নৈরাজ্যের পথ থেকে সরে আসতে হবে। তাহলেই এদেশে রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং দেশ সহিংসতা মুক্ত হবে। আমরা চাই যে কোনো অবস্থাতেই দেশের উন্নয়ন হোক।'

জাতীয় পার্টির মহাসচিব নাজিউর রহমান মঞ্জু বলেন, 'রাজনৈতিক অশান্ত পরিস্থিতির জন্য মূলত সরকার দায়ী। তারা বিরোধী দলসমূহের দাবী-দাওয়ার প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি না দেখিয়ে ঘোষণা দিয়ে রাজপথ দখলের সশস্ত্র মহড়া চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের হাতে বৈধ এবং অবৈধ অস্ত্র রয়েছে যা দিয়ে তারা মানুষ খুন করছে। এই অবস্থার কারণে ইইউ-এর হুঁশিয়ারী কার্যকর হলে দেশের অর্থনীতিতে মারাত্মক বিপর্যয় নেমে আসবে।'

তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ সরকার একদলীয় বাকশালের মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে।' দেশের অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়েছে-এই দাবী করে তিনি বলেন, 'এই অবস্থায় ইইউ-এর হুঁশিয়ারীর দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে।'

www.pathagar.com

রাজনৈতিক পরিস্থিতি শান্ত করতে বিরোধী দলের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে মঞ্জু বলেন, 'আমরা সরকার পতনের কোনো কর্মসূচি দেয়নি। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের মত খুবই সাধারণ দাবী জানানো হয়েছে। সরকার দাবী মেনে নেয়া তো দূরের কথা সংলাপই করতে চায় না। আসলে তারা বিরোধী দলের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে চায়।' তিনি ইইউ-এর বার্তাকে সরকার যে বাকশাল কায়েমের দিকে এগুচ্ছে তার প্রতি একটা সতর্কবাণী বলে উল্লেখ করেন।

জামায়াতে সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান বলেন, 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস যেখানে চলে সেখানে মানুষের নিরাপত্তা নেই। সুতরাং বিনিয়োগ হবে কিভাবে? এ জন্য বর্তমান আওয়ামী ফ্যাসিষ্ট সরকার দায়ী। সরকারের বর্তমান ভূমিকার কোনো পরিবর্তন না হলে পরিস্থিতির উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নেই।' তিনি ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের বিবৃতির সঙ্গে একমত পোষণ করে বলেন, 'সহিংসতার জন্য সরকারই দায়ী।'

বিবৃতিতে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় বলে ৫ মার্চ রাতে বিবিসি থেকে প্রচারিত খবরে মন্তব্য করা হয়। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরাজমান অবস্থা চলতে থাকলে উক্ত বিবৃতিতে উন্নয়ন সাহায্য স্থগিত হয়ে যাওয়ার হুমকিরও পরোক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে বলে বিবিসি'র খবরে উল্লেখ করা হয়। ৪ মার্চ বিভিন্ন পত্রিকায় উক্ত বিবৃতির বরাত দিয়ে যে খবর প্রকাশিত হয় তাতে উদ্বেগ ও উন্নয়ন সাহায্য স্থগিত হয়ে যাওয়ার একটা হুমকিরও পরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পরকে এর জন্য দায়ী করে দোষারোপ করা অব্যাহত রেখেছে। তাহলে এক্ষেত্রে তাদের নিজেদের গণতান্ত্রিক দায়িত্ব কতখানি স্বীকার করছে? লন্ডনের ইন্সটিটিউট অব কমনওয়েলথ রিসার্চ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশের একজন উর্ধ্বতন গবেষক মোবাশ্বের মোনেমকে বিবিসির একজন সাংবাদিক উপরোক্ত প্রশ্নটি করেছিলেন। জবাবে মোনেম বলেন, 'অনেক আগে থেকেই বিদেশী সাহায্য সংস্থাগুলো রাজনৈতিক সংকটকালীন সময়ে এ ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করে এসেছে। বাংলাদেশ যেহেতু সিভিল সোসাইটির তেমন বিকাশ ঘটেনি, তাই বিদেশী সাহায্য সংস্থাগুলো একটি ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণে এবং বাংলাদেশ সরকারের ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করে। আমার পক্ষে যেটা মনে হচ্ছে তা হল আমাদের সরকার এবং বিরোধী দলগুলো কখনো সে বিষয়ে খুব একটা মনোযোগী নয় তাদের পরামর্শ শুনতে, কারণ এখানে তাদের যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা তাদের রাজনৈতিক সুবিধা তারা আদায় করতে পারবে না। এটি হচ্ছে তার মূল কারণ বলে আমার ধারণা। এই সংকট উত্তরণের জন্যে সরকারি দলসহ কারো কোন রকমের সৎ উদ্দেশ্য আছে বলে আমার মনে হয় না।'

১১ মার্চ সংসদে প্রশ্নোত্তরের জন্য নির্ধারিত সময়ে বিএনপির এমপি সরওয়ার জামাল নিজামের প্রশ্নের জবাবে জানানো হয় ১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থ বছরের প্রথম ৭ মাসে সরকারের রাজস্ব আদায়ে ঘাটতির পরিমাণ ৮০৪ কোটি ৬ লাখ টাকা। জানুয়ারি ১৯৯৯ পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮ হাজার ৪২৫ কোটি ৯২ লাখ টাকা। রাজস্ব আদায় হয় ৭ হাজার ৬২১ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া উপস্থিত না থাকায় সংসদে উত্থাপিত অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত দু'টি প্রশ্নের জবাব দিতে দাঁড়ান কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। তবে সরকারি ও বিরোধী দলীয় সদস্যদের বেশ কয়েকটি সম্পূরক প্রশ্নের জবাব না জানার কারণে তিনি প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে বারবার নোটিশ চান।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের মাস্টার মজিবুর রহমানের এমনই একটি প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী সংসদকে জানান, 'দেশের বেশ কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকে মূলধন ও প্রভিশন ঘাটতি রয়েছে। এর মধ্যে সোনালী ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতির পরিমাণ ১২০০ কোটি ৪৩ লাখ টাকা এবং মূলধন ঘাটতির পরিমাণ ১৩২ কোটি ৫৮ লাখ টাকা। জনতা ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতি ৬৪৫ কোটি ২১ লাখ এবং মূলধন ঘাটতির পরিমাণ ২৪৯ কোটি ৫৮ লাখ টাকা, অগ্রণী ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতি ৬৪৬ কোটি ৭৭ লাখ এবং মূলধন ঘাটতির পরিমাণ ১৩১ কোটি ৩৬ লাখ টাকা। এছাড়া ১২টি বেসরকারি ব্যাংকের বিপুল পরিমাণ প্রভিশন ও মূলধন ঘাটতির চিত্র প্রকাশ করে মন্ত্রী জানান, রাষ্ট্রায়াত্ত ও বেসরকারি ব্যাংকসমূহের প্রভিশন ও মূলধন পূরণের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।'

বিএনপির আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকীর প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী মতিয়া বলেন, 'জানুয়ারি ১৯৯৯ পর্যন্ত চলতি বছরে ভ্যাট বাবদ সরকারের আয় হয়েছে ২৫০৫ কোটি ৯২ লাখ টাকা।' এ সংক্রান্ত সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'ভ্যাট আদায়ের এই পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২৮৩ কোটি ৪০ লাখ টাকা কম।'

গোলাম ফারুক অভির সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'বিশাল লটবহর নিয়ে বিদেশ গমনের উদ্দেশ্য বিলাস ভ্রমণ নয়। বিদেশ যেতে হয় সরকারি কাজে।'

মশিউর রহমানের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, '১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে বৈদেশিক ঋণের সুদ বাবদ ৬৯৮.০৪ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে ঐ খাতে সুদ বাবদ ৭২৫ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে।' বিগত পাঁচ বছরে বৈদেশিক ঋণের সুদ বাবদ পরিশোধিত অর্থের পরিমাণও তিনি জানান। এতে উল্লেখ করা হয়, '১৯৯৩-৯৪, ১৯৯৪-৯৫ ও ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে এই খাতে পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ হলো যথাক্রমে ৬১৩ কোটি ৬০ লাখ, ৬১৯ কোটি ৪৮ লাখ এবং ৬৬৮ কোটি ৯৬ লাখ টাকা।

১৯ ও ২০ এপ্রিল প্যারিসে অনুষ্ঠিত সাহায্যদাতাদের সম্মেলনে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) প্রতিনিধি মিঃ লাজারোসই মৌলহা বাংলাদেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থাকে ভঙ্গুর বলে উল্লেখ করে পরিস্থিতির উন্নতির জন্য সংস্কার কার্যক্রমকে দ্রুততর করা এবং রাজস্ব এবং মুদ্রা নীতিতে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য প্যাকেজ উদ্যোগ গ্রহণের পরামর্শ দেন।

১৪ জুন জার্মান রাষ্ট্রদূত উব শ্রাম, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ডেলিগেট প্রধান রাষ্ট্রদূত ডি সুজা মেনেজেস এনতনিও বসকো, ব্রিটিশ হাই কমিশনার ডেভিড সি ওয়াকার ও ফরাসী রাষ্ট্রদূত মিস রনে ভেরেসহ ৮জন রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিক প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ বৈদেশিক সংবাদদাতা সমিতির সাথে এক ব্রিফিংয়ে মন্তব্য করেন, 'মানবাধিকার লংঘন, যথাযথভাবে সাহায্য ব্যবহার না করা এবং সাহায্যের ব্যাপক ক্ষেত্র ও ধারণ ক্ষমতা দেখাতে না পারার কারণে বাংলাদেশে ইউরোপীয় দেশগুলোর সাহায্য কমে গেছে।'

তারা বাংলাদেশে সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকট নিরসনের আহবান জানান। ইতালির চার্জ দ্যা এ্যাফেয়ার্স পিয়েটরো প্যারিস, নেদারল্যাণ্ডের চার্জ দ্যা এ্যাফেয়ার্স বীরান্ত ডব্লিউ সমর্টার্ট, সুইডেনের চার্জ দ্যা এ্যাফেয়ার্স মিস বাই গ্রানবম, ড্যানিস চার্জ দ্যা এ্যাফেয়ার্স প্রেবেন গনডলফ, ইইউ'র কর্মকর্তা জিল্লুল হাই রাজী, ওকাবের সভাপতি মতিউর রহমান চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক নাদিম কাদিরও ব্রিফিং-এ আলোচনায় অংশ নেন।

জার্মান রাষ্ট্রদূত বলেন, 'বাংলাদেশের অগ্রগতির স্বার্থে এখানকার রাজনৈতিক সংকট দূর করতে হবে। আমরা আশাবাদী সরকার প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে এই সমস্যা সমাধন করবেন।'

www.pathagar.com

ব্রিটিশ হাই কমিশনার বলেন, 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন গত মার্চে ব্রাসেলসে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট নিরসনের আহ্বান সংবলিত ভারসাম্যপূর্ণ বিবৃতি দিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোকে এ সংকটের সমাধান করতে হবে।'

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ডেলিগেট প্রধান রাষ্ট্রদূত ডি সুজা বলেন, 'সাম্প্রতিক আমস্টারডাম চুক্তি ইইউ সংসদকে অধিকতর ক্ষমতা দিয়েছে।'

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বলতেই কূটনীতিকরা সরবে হেসে উঠেন। জার্মান রাষ্ট্রদূত বলেন, 'বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন আছে। আমরা অভিযোগ পেলে আবার কাজ করতে বলি। আমরা মধ্য মেয়াদী মূল্যায়নও করে থাকি। এনজিও'র মাধ্যমে অনেক কাজ করা হয়।' মি. এনতনিও ও মি. ব্রাম বলেন, 'বাংলাদেশের বিদেশী সাহায্য যথাযথভাবে ব্যবহার না করা এবং ব্যাপকভাবে সাহায্য গ্রহণের ক্ষেত্র দেখতে না পারার কারণে এখানে সাহায্যের পরিমাণ কমেছে।'

২৫ জুন জাতীয় সংসদে বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে বিএনপি'র টাঙ্গাইল থেকে নির্বাচিত এমপি লুৎফর রহমান খান আজাদ সরকারের বিরুদ্ধে শ' শ' কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ আনেন। সংসদে তিনি বলেন, 'আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি এ সরকার মহা দুর্নীতিবাজ। সরকারের শীর্ষ থেকে নিম্ন পর্যন্ত সকলে আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত।' তিনি সাহস থাকলে তার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেব।' বিদ্যুৎ, টিএন্ড টি ও শিল্প মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন প্রকল্পে দুর্নীতির বিভিন্ন বিবরণ তিনি সংসদে তুলে ধরেন। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমদ ও টিএন্ড টি মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের শ' শ' কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ তার বক্তব্যে প্রকাশ পায়।

লুৎফর রহমান বলেন, 'এ সরকারের দুর্নীতির কারণে দেশে আজ ভয়াবহ বিদ্যুৎ সংকট। সরকারি এবং বেসরকারি খাতে স্থাপিত অথবা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এমন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কোনটির সিদ্ধান্তই সত্যিকার অর্থে দেশের স্বার্থে প্রতিযোগিতামূলক ও অবাধ হয়নি।' তিনি বলেন, 'স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক সরকার আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের ১ নং অঙ্গীকার। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ সরকারের আমলে গৃহীত অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সকল সিদ্ধান্তই অস্বচ্ছ। আর এ অস্বচ্ছতার পেছনে লুকিয়ে আছে তাদের দুর্নীতির মাধ্যমে শ'শ' কোটি টাকা কামানোর ঘৃণ্য মানসিকতা।' বিদ্যুৎ সেক্টরের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেন, 'ময়মনসিংহের শম্ভুগঞ্জে রুরাল পাওয়ার কোম্পানী ফ্রান্সের আলসটম থেকে যে ৬০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র কিনেছে তার মূল্য হচ্ছে প্রায় ২শ' কোটি টাকা। এ একই কোম্পানী থেকে পিডিবি শাহজী বাজারের জন্য এই ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র কিনেছে তার দাম হচ্ছে ১শ' ১০ কোটি টাকা। এ দু'টি তথ্য এডিপি বইয়ে দেয়া আছে। এই যে বিরাট মার্জিন অর্থাৎ ৯০ কোটি টাকা তা এ সরকারের কর্তা ব্যক্তিদেরই পেটে গেছে। এছাড়া ফ্রান্সের আলসটম বাঘাবাড়িতে ১শ' মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র ১৩৫ কোটি টাকায় বিক্রির জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ যোগাযোগ করছে। জাপানের মারুবেনীও দিতে চাচ্ছে ১শ' ৩০ কোটি টাকায় ১শ' মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র। পিডিবি এ ব্যাপারে বহুদিন লেখালেখি করেছে মন্ত্রণালয়ে। কিন্তু বিদ্যুৎ ও জ্বালানী মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না। অথচ দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফ্রান্সের আলসটম থেকে রুরাল পাওয়ার কোম্পানীর জন্য আরেকটি ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র কেনার। এটাও কেনা হয়েছে প্রায় ২শ' কোটি টাকা ব্যয়ে বিনা টেন্ডারে। রুরাল পাওয়ার কোম্পানীর সাথে পিডিবি'র এখনো বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তিই সম্পাদিত

www.pathagar.com

হয়নি। এডিপিতেও এ প্রকল্পটি নেই।' তিনি আরও বলেন, 'প্রথম ৬০ মেগাওয়াটবাহী বার্জ যমুনার চরে আটকে আছে, প্রথম কেন্দ্রটি এখনো চালুই হয়নি। অথচ বিনা টেন্ডারে বেশি দামে দ্বিতীয়টি কেনা হয়েছে। উদ্দেশ্য একটিই তা হচ্ছে ৭৫+৭৫ মোট ১৫০ কোটি টাকা ভাগ বাঁটোয়ারা করা।'

মেঘনা ঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করে সংসদে লুৎফর রহমান বলেন, 'সরকার দলীয় একজন এমপি'র প্রতিষ্ঠান মেঘনাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাইট প্রিপারেশনের জন্য যে চীনা কোম্পানীর এজেন্ট তারা সাইট প্রিপারেশনের প্রথম দরপত্রে ননরেসপনসিভ বিবেচিত হয়। যে প্রতিষ্ঠানটি সর্বনিম্ন দরদাতা হয় তাদেরকে ওই সরকার দলীয় এমপি'র প্রতিষ্ঠান থেকে বলা হয় আমাদের সাথে আসো। সরকারের সাথে আমাদের সুসম্পর্ক রয়েছে। চুক্তি চূড়ান্ত করার আলোচনার সময় আমরা তোমাদের ১০০ কোটি টাকা বাড়িয়ে দেবো। ওই টাকা ফিফটি ফিফটি বেসিসে তোমরা-আমরা ভাগ করে নেবো। চীনা কোম্পানী এতবড় জালিয়াতিতে রাজি না হওয়ায় যৌক্তিক কোনো কারণ ছাড়াই প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তে ওই দরপত্র বাতিল করে পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়। এতে সরকার দলীয় এমপি'র প্রতিষ্ঠানকে বিতর্কিত উপায়ে সর্বনিম্ন দরদাতা করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে দাম বেড়েছে ১৮ কোটি টাকা। এরপর কাজ চলার সময় বর্ধিত কাজের নামে আরা কত টাকা দামবাড়ে তা-ই এখন দেখার বিষয়। এ ১৮ কোটি টাকা দাম ও সময় বৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রী কি শাস্তি গ্রহণ করেন সেটাই দেশবাসী জানতে চায়। কারণ তার সরকার নাকি জবাবদিহিমূলক!'

স্পীকারকে উদ্দেশ্য করে লুৎফর রহমান টিএন্ড টি মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'কোনো রাজ কবিকে দিয়ে ছাহি বড় নাসিমনামা লেখানো হলেই কেবল দেশে দুর্নীতি ও অনিয়মের বিস্তারে তার মহান অবদানের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি প্রদান সম্ভব।'

তিনি বলেন, 'মোহাম্মদ নাসিম মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পর পরই সেলুলার টেলিফোনের জন্য তিনটি কোম্পানীকে লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের শ'শ' কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। তাছাড়া লাইসেন্স প্রদানে যে বড় ধরনের লেনদেন হয়েছে তার বড় প্রমাণ আরএফপি অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর না করে ৩টি অপারেটরকে তাদের ইচ্ছেমত কলচার্জ আরোপের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এমনকি যে গ্রামীণ ফোন মন্ত্রণালয়ে জমা দেয় তাদের মূল প্রস্তাবে ইনকামিং ফ্রি রেখেছিল, তাকেও চুক্তিতে ইনকামিং কলচার্জ আরোপের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এ নিয়ে মোবাইল গ্রাহকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ চলছে। কিন্তু যেহেতু পুরো ব্যাপারটিই ঘটেছে লেনদেনের মাধ্যমে তাই পত্র-পত্রিকায় এত লেখালেখির পরও বেশি কথা বলা মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন।'

নাসিমের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, 'প্রমাণ করুণ আমার বক্তব্য সঠিক নয়। যদি তা না পারেন তাহলে পদত্যাগ করুন অথবা স্বচ্ছতা ও সততার অবতার প্রধানমন্ত্রী তাকে বরখাস্ত করে নিজের সততার প্রমাণ দিন।'

তিনি আরো বলেন, টিএন্ড টি মন্ত্রণালয় সাম্প্রতিককালে গৃহীত কোনো সিদ্ধান্তই স্বচ্ছলতা, সততা ও প্রতিযোগিতামূলক প্রস্তাব প্রাপ্তির ভিত্তিতে জাতীয় স্বার্থে নেয়া হয়নি। নিজেদেরকে টাকার কুমীর বানানোর জন্য এ সরকার কখনো সাপ্লাইয়ার্স ক্রেডিট, কখনো জয়েন্ট ভেঞ্চার আবার কখনো আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের নামে যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার প্রত্যেকটিই শ' শ' কোটি টাকার নগ্ন দুর্নীতির ঘটনা।' তিনি বলেন, 'টিএন্ড টি বোর্ডের আপত্তি

www.pathagar.com

উপেক্ষা করে সম্প্রতি টিএন্ড টি মন্ত্রণালয় বিনা টেন্ডারে ঢাকায় ৫০ হাজার তারবিহীন ওয়্যারলেস লোকাল লুপ টেলিফোন স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২৫০ কোটি টাকার বেশি দরে ওয়্যারলেসে লোকাল লুপ (ডব্লিউ এলএল) টেলিফোন বসালেও ঢাকা শহরের মানুষ এ টেলিফোন নেবে না বলে টিএন্ড টি বোর্ড বলা সত্ত্বেও মন্ত্রীর এত আগ্রহের রহস্য অজানা নয়।'

টিএন্ড টি মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি প্রসঙ্গে লুৎফর রহমান আরো বলেন, 'টিএন্ড টি বোর্ডের এ যাবৎকালের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে সর্বোচ্চ ব্যয় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে দেশের ৫৮টি জেলা শহরে ১ লাখ ৮৯ হাজার ডিজিটাল টেলিফোন। এর জন্য ১৫শ' কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্প থেকে শ' শ' কোটি টাকা কামানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী দরপত্র আহবান করতে হবে না বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। অথচ টেন্ডারে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে ৫শ' কোটি টাকায় কাজ করা যেতো। একইভাবে নিরাপত্তাজনিত তথ্যাদি ফাঁসের আশংকায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আপত্তি দিলেও ভারতভিত্তিক কোম্পানী ইরেডিয়ামের সাথে স্যাটেলাইট টেলিফোনের চুক্তি করা হয়েছে। সেনাটেলের সাথে টিএন্ডটি বোর্ডের যৌথ উদ্যোগে মোবাইল সার্ভিস চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েও কমিশন না পাবার কারণে টিএন্ড টি মন্ত্রণালয় পরে এ থেকে সরে এসেছে। অথচ একটি জাপানী কোম্পানীর সাথে পার্সোনাল হ্যান্ড ফোন চালুর জন্য টিএন্ড টি বোর্ডকে মন্ত্রণালয়ের চাপে অসম শর্তে যৌথ উদ্যোগে যেতে বাধ্য হতে হয়েছে। কারণ মন্ত্রীর নিজের লোক এতে জড়িত।'

শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমদের বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগের উল্লেখ করে লুৎফর রহমান বলেন, 'মন্ত্রী তোফায়েল আহমদের ডিএপি সারের প্রতি যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে। বিগত ১৯৯৭ সালে মন্ত্রীর নির্দেশে বিসিআইসি ৫০ হাজার টন ডিএপি সার আমদানী করলেও তা বিক্রি করা যায়নি। লোকসান দিয়ে পুশ সেল করতে হয়েছে। অথচ এরকম দুঃখজনক অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও মন্ত্রী তার দুই বন্ধুর কাছ থেকে দু'টি ডিএপি সার কারখানা কেনার আয়োজন চূড়ান্ত করেছেন। এজন্য বিসিআইসি চেয়ারম্যানকে পুনরায় চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ঘোড়াশাল সার কারখানা 'শক্তি সাশ্রয়' পরিবেশ রক্ষা এবং অনস্ট্রীম ফ্যাক্টর উন্নীতকরণ প্রকল্পের জন্য ২২৭ কোটি টাকার একটি চুক্তির কাজও প্রায় গুছিয়ে আনা হয়েছে। এ কাজটিও দেয়া হচ্ছে মন্ত্রী তোফায়েল আহমদের বন্ধুর প্রতিষ্ঠান জাপানের টয়ো ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনকে, যাদের একটি ডিএপি সার কারখানা স্থাপনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অথচ এরাই ইতিপূর্বে ঘোড়াশাল সার কারখানার নবরূপায়নের নামে বড় ধরনের ক্ষতি করেছেন।' বিনা টেন্ডারে এ কাজ দেয়ার ফলে কি পরিমাণ ব্যয় বেশি হচ্ছে তার সামান্য তিনি সংসদে উল্লেখ করে জানান '১৬ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দাম ৬৪ কোটি টাকা। বাজার মূল্য মাত্র ২০ কোটি টাকা।' এর চেয়ে দুর্নীতির বড় কোনো উদাহরণ আছে কিনা তিনি প্রশ্ন রাখেন।

আওয়ামী আমলে অর্থনৈতিক সংকট মারাত্মক হয়ে ওঠার পাশাপাশি বেড়েছে সরকারের ব্যাংক ঋণের পরিমাণ। তীব্র অর্থনৈতিক সংকট এবং আদায়ে ঘাটতিসহ দুর্বল রাজস্ব ব্যবস্থাপনার কারণে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। বিগত কয়েক দশকে আর কোনো সরকারের আমলে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে এত বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণের ঘটনা ঘটেনি। এই বিপদজনক পরিস্থিতির অন্যতম কারণ রাজস্ব আদায়ের ব্যর্থতা ও বিরাট ঘাটতি। ১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থ বছরের পৌনে ১০ মাস শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ সংশোধিত বাজেটের অংকের চেয়ে ৪শ' ৩৭ কোটি টাকা

www.pathagar.com

বেশি বৃদ্ধি পায়। অর্থবছরের পৌনে ১০ মাস শেষে (২২ এপ্রিল ১৯৯৯) ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ ১১ হাজার ৯শ' ৭৪ কোটি ৫৯ লাখ টাকায় উন্নীত হয়। এই ১ বছরে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে সরকারের নেয়া ঋণ বেড়েছে ২ হাজার ৭শ' ৮৫ কোটি ৩৬ লাখ টাকা। ১৯৯৮ সালের ২৩ এপ্রিলের তুলনায় ১৯৯৯ সালের ২২ এপ্রিল ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ বেড়েছে ৩৩.২০ শতাংশ। জুন ১৯৯৯-এ ঘোষিত অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ঋণ নিয়ে ১ হাজার ৪শ' ৬৫ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু পৌনে ১০ মাস শেষে সংশোধিত বাজেটের এ লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে সরকারের ঋণ ৪শ' ৩৭ কোটি টাকা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। অর্থবছরের শেষ পর্যায়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থের যোগানদান এবং রাজস্ব ব্যয়ের সংস্থান করতে গিয়ে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ বাড়ার সম্ভাবনার কথাও সংবাদপত্রে প্রকাশ পায়। ১৯৯৮ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে নেয়া ধারের পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ৪১ কোটি টাকা। এপ্রিল ১৯৯৯ শেষে ধারের এ অংক ১৯.১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪ হাজার ৮শ' ১৬ কোটি ২০ লাখ টাকায় উন্নীত হয়।

৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ দৈনিক জনতায় প্রকাশ, বিশ্ব বাজারে প্রায় ১৫ কোটি কেজি চা অবিক্রিত থাকায় চা রফতানির ক্ষেত্রে ভাটা পড়েছে। পরপর ১০টি নিলামে চা বাজার তেমন জমেনি। ১১ ও ১২তম নিলামে চায়ের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও তা মৌসুমের প্রথম নিলাম থেকে এখনো কেজি প্রতি ২৪ টাকা কম। প্রথম নিলামে কেজি প্রতি চায়ের মূল্য ছিল ৮০.১৮ টাকা। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে চায়ের উৎপাদন হ্রাস এবং বিদেশে চা রফতানী দু'টিই কমে গেছে বলে উল্লেখ করা হয়। ১১ মে অনুষ্ঠিত মৌসুমের প্রথম চা নিলামে বিভিন্ন গ্রেডের চা প্রতি কেজি ৭০ টাকা থেকে ৯০ টাকা মূল্যে বিক্রিত হয়। তৃতীয় নিলাম চায়ের মূল্য কেজি প্রতি ২ থেকে ৫ টাকা কমে যায়। চতুর্থ নিলাম ১ জুন অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু চায়ের বাজার জমেনি। ৬ জুলাই অষ্টম নিলামে প্রতি কেজি চায়ের গড় মূল্য ছিল সাড়ে ৬৪ টাকা। ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে এক কেজি চায়ের গড় মূল্য ছিল সাড়ে ৬৯ টাকা। একটানা ১০টি নিলামে দর পতনের পর ১১ ও ১২ তম নিলামে চায়ের মূল্য বাড়লেও ৩৮ মৌসুমের প্রথম নিলাম থেকে কেজি প্রতি ২৪ টাকা কম ছিল। ১৯৯৭ ও ১৯৯৮ সালে চা উৎপাদন ও চা রফতানীর ক্ষেত্রে তেজীভাব ছিল। এ কারণে চা বাগান কর্তৃপক্ষ ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করেও অধিক মুনাফা অর্জন করে। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশ ২৫টি দেশ থেকে ২ কোটি ৫১ লাখ ৬০ হাজার কেজি চা রফতানী করে ১৭৭ কোটি ৫০ লাখ টাকা আয় করে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে মোট ২ কোটি ২২ লাখ ৩০ হাজার কেজি চা রফতানী করে বাংলাদেশ ১৮০ কোটি ৩০ লাখ টাকা আয় করে। ঐ সময় পর্যন্ত পাকিস্তানের ক্রেতারা বাংলাদেশ থেকে চা না কিনে কেনিয়া ও শ্রীলংকা থেকে ক্রয় করে। কারণ হিসেবে কেনিয়া ও শ্রীলংকার চায়ের মূল্য বাংলাদেশের চায়ের বেশি হলেও গুণগতমান ভাল বলে উল্লেখ করা হয়। অথচ পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে অধিকমাত্রায় ফেনিংস চায়ের ক্রেতা। বোল্ড চায়ের প্রধান ক্রেতা ছিল পোল্যান্ড ও সিআইএসভুক্ত দেশগুলো। কিন্তু এ দেশগুলো বাংলাদেশমুখী হয়নি। পাকিস্তান, আফগানিস্তান, কেনিয়া ও শ্রীলংকা, পোল্যান্ড, দক্ষিণ ভারতের দিকে ঝুঁকে পড়ে। পোল্যান্ড ও সিএস অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো বাংলাদেশে না আসায় অনেক চা উৎপাদনকারী কর্তৃপক্ষ বিপাকে পড়ে। ১৯৯৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত দেশীয় চা উৎপাদনের পরিমাণ ৯০ লাখ ৭১ হাজার কেজি ছিল। ১৯৯৮ সালে একই সময়ে চা উৎপাদিত হয়েছিল ১ কোটি ৬০ লাখ ৫৩ হাজার কেজি।

www.pathagar.com

আওয়ামী সরকারের মেয়াদ ফুরিয়ে আসার সাথে সাথে রাজনৈতিক চাপে দ্রুত ব্যাংক ঋণ বাড়ানো হয়। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের প্রথম ৫ মাসের তুলনায় ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের প্রথম ৫ মাসে ৪৪৪ শতাংশ অতিরিক্ত ব্যাংক ঋণ দেয়া হয়। অর্থ মন্ত্রণালয় ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শীর্ষ পর্যায় থেকে ব্যাংক ঋণের মঞ্জুরি বৃদ্ধি ও তা দ্রুত অবমুক্ত করার জন্য চাপ দেয়া হয়। চাপের মুখে ব্যাংক ঋণ দ্রুত দিতে গিয়ে ৩টি রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকের অতিরিক্ত তরল সম্পদ দৈনন্দিন লেনদেনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণের চাইতে নিচে নেমে যায়। রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পরিষদে সরকারের রাজনৈতিক সমর্থনে নিয়োগ দান এবং ব্যাংকের শীর্ষ ব্যবস্থাপনায় নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে সরকারের রাজনৈতিক সমর্থকের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় এসব ব্যাংকের ঋণ মঞ্জুরি ক্রমাগতভাবেই দলীয়করণ হয়ে পড়ে। সরকারের শেষ বছরে এসে ব্যাংক ঋণ দ্রুত বৃদ্ধির জন্য তাগিদ দানের ফলে অর্থ বছরের প্রথম ৫ মাসে ব্যাংক ঋণ ২ হাজার ৯শ' ৫৯ কোটি ৫০ লাখ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭ হাজার ৬শ' ৫ কোটি ৬০ লাখ টাকায় এসে দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী অর্থবছরের এ সময়ে ব্যাংক ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ৫৪৩ কোটি ৪০ লাখ টাকা। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের প্রথম ৫ মাসে যেখানে ব্যাংক ঋণ বৃদ্ধি পায় ১.১০ শতাংশ সেখানে ২০০০-২০০১ অর্থবছরের একই সময় ব্যাংক ঋণ বৃদ্ধি পায় ৫.৪২ শতাংশ। তফসিলী ব্যাংকগুলোকে ২০ শতাংশের বাইরে দৈনন্দিন লেনদেনের জন্য দেড় থেকে দুই শতাংশ অতিরিক্ত নগদ তরল সম্পদ সংরক্ষণ করতে হয়।

২১ এপ্রিল ২০০০ প্যারিসে দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত দাতা গোষ্ঠীর বৈঠকে বাংলাদেশের সংস্কারের গতি এবং দুর্নীতির মাত্রা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল ও সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনার জন্য এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের দুর্নীতির ওপর বিশ্ব ব্যাংকের খসড়া রিপোর্ট নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। খসড়া রিপোর্টে বলা হয়, 'দুর্নীতি কমানো গেলে দেশটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ২.৯ শতাংশ বেড়ে যেত।' এতে উল্লেখ করা হয় যে, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশকে বিশ্বের পাঁচটি দুর্নীতিপরায়ণ দেশের একটি আখ্যায়িত করেছে। তবে দুর্নীতি দমনে একটি সম্মিলিত জাতীয় প্রচেষ্টা বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশটির দারিদ্র্য বাস্তবিক অর্থে ঘুচাতে পারত-যে দেশের ছ'কোটি লোক এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে।' বাংলাদেশ ১৯৯৯ সালের দাতাগোষ্ঠীর বৈঠকে বেসরকারিকরণ, প্রশাসনিক ও আইনি সংস্কার, দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের জন্য একজন ন্যায়পাল নিয়োগ, স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু বেসরকারিকরণ বিলম্বিত হচ্ছে, ন্যায়পাল এখনও নিয়োগ করা হয়নি এবং মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে দাতারা বৈঠকে উল্লেখ করেন।

'দেশের প্রভাবশালী কয়েকটি ইন্টারনেট সার্ভিস প্রভাইডার (আইএসপি) প্রতিষ্ঠানের অসাধু কার্যকলাপের জন্য বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি) বৈদেশিক টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে রাজস্ব আয় হারাতে বসেছে। চিহ্নিত এসব আইএসপি লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ভিওআইপি (ভয়েজ ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল) সিস্টেম ব্যবহার না করার বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েও কার্যত সে চুক্তি মানছে না। তারা কাজ করছে ওভারসীজ টেলিফোন কোম্পানীর মতোই এবং টিএণ্ডটিকে ফাঁকি দিয়ে হাতিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা'- এ ধরণের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ২০ জুলাই দৈনিক মানবজমিন। মানবজমিনের প্রতিবেদন

www.pathagar.com

থেকে জানা যায়, বিষয়টি শুধুমাত্র দুর্নীতি নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহারেরও অন্যতম দৃষ্টান্ত। কারণ টিএণ্ডটির রাজস্ব ঘাটতির হোতা ঐ সব প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত রয়েছে আওয়ামী নেতাদেরই আত্মীয়-স্বজন। যাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণেও টিএণ্ডটি কর্তৃপক্ষ অপারগ বেআইনী 'ভিওআইপি' ব্যবস্থায় যুক্ত থাকার সবচেয়ে বেশি অভিযোগ স্পেকট্রা সল্যূশন লিমিটেড ও হইটিচ লিমিটেড এর বিরুদ্ধে পাওয়া যায়। স্পেকট্রা সল্যূশন লিমিটেডের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ এক আত্মীয় জড়িত এবং হইটিচ লিমিটেড এর সাথে যুক্ত ছিলেন টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী নাসিমের আত্মীয়-স্বজন। স্পেকট্রা টিএণ্ড টির ২শ'-রও বেশি টেলিফোন ব্যবহার করছে যা অন্য কোনো আইএসপি প্রতিষ্ঠানের নেই এবং নজিরবিহীন দ্রুততার সাথে টিএণ্ড টি তাদের এ টেলিফোনগুলো সংযোগ দেয়। যা অন্য কোনো ক্ষেত্রে ঘটে না। টিএণ্ড টির বেশকিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয়ের প্রতিষ্ঠান হিসেবেই স্পেকট্রাকে সতর্ক ও সযত্ন পর্যবেক্ষণে রাখে। স্পেকট্রার মগবাজার এলাকায় রাজশাহী হাউসের ৮ তলার কার্যালয়ের অফিস কর্মীরা তাদের প্রতিষ্ঠানটিকে প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয়র প্রতিষ্ঠান হিসেবে চেনেন। হাইটিচ লিমিটেডও তাদের কাছে নাসিমের আত্মীয়ের প্রতিষ্ঠান হিসেবে একই প্রকার অনুকূল আচরণ পায়।

১৫ নভেম্বর প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের 'বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৯৯-২০০০' শীর্ষক প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. এম ফরাসউদ্দিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন। ২ নভেম্বর ১৯৯৯ পর্যন্ত ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরের ৪ মাসে সরকার ১ হাজার ৭৩ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে বলে গভর্নর উল্লেখ করেন। ১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থবছরের প্রথম ৪মাসে সরকার ১৮শ' ৬৫ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল।

আওয়ামী সরকারের পাঁচ বছরের বিনিয়োগের অন্যতম ক্ষেত্র পুঁজিবাজার ছিল স্থবির। আওয়ামীরা ক্ষমতা গ্রহণের দিন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূচক ছিল ৯৭৬.২০। শেয়ার লেনদেন গতি ফিরে আসে। ঐ বছরের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সূচক বাড়ে পাগলা ঘোড়ার মত। বিভিন্ন কারসাজির মাধ্যমে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত সূচককে উঠানো হয় ৩ হাজার ৬৪৮ দশমিক ৭৫-এ। জায়গা-জমি, গহনা বিক্রির হিড়িক পড়ে। গৃহবধূরা, সরকারের বড় কর্মকর্তারা কাজের ফাঁকে শেয়ার বাজারে জড়িয়ে পড়েন প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে। সে সময় সরকার শেয়ার বাজারের ঐ পরিস্থিতি নিজেদের কৃতিত্ব বলে দাবি করে। ৬ নভেম্বর থেকে সূচক পতন শুরু হয়। সূচক যখন ১৮'শর ঘরে তখন অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, যদি সূচক ১৫ এর নিচে নেমে আসে তবেই বলা যাবে বাজার খারাপ। ১৯৯৯-এর ৩ মে সূচক সর্বনিম্ন ৪৬২.৫৮তে নামে। ১৯৯৬-এর ৫ নভেম্বরের তুলনায় ১৯৯৯-এর ১৭ জুন পর্যন্ত সূচকের পরিমাণ কমে ৩ হাজার ১২৪ দশমিক ১৩ পয়েন্ট।

এক নজরে হাসিনার আমলে টাকার অবমূল্যায়ন

১৫	জুলাই	১৯৯৬	৪১.৮০	৪২.০০
১	আগষ্ট	১৯৯৬	৪২.০৫	৪২.২৫
৭	সেপ্টেম্বর	১৯৯৬	৪২.২০	৪২.৪০
২৩	সেপ্টেম্বর	১৯৯৬	৪২.৩৫	৪২.৫৫
৮	ফেব্রুয়ারি	১৯৯৭	৪২.৬৫	৪২.৮৫
১৯	মার্চ	১৯৯৭	৪৩.১০	৪৩.৩০

www.pathagar.com

৭	এপ্রিল	১৯৯৭	৪৩.৫৫	৪৩.৭৫
২১	জুলাই	১৯৯৭	৪৪.০০	৪৪.২০
১৮	আগষ্ট	১৯৯৭	৪৪.৪৫	৪৪.৬৫
২৬	অক্টোবর	১৯৯৭	৪৪.৮৫	৪৫.১৫
২৪	নভেম্বর	১৯৯৭	৪৫.৩০	৪৫.৬০
২	ফেব্রুয়ারি	১৯৯৮	৪৬.১৫	৪৬.৪৫
২	জুলাই	১৯৯৮	৪৬.৯৫	৪৭.২৫
১৫	অক্টোবর	১৯৯৮	৪৮.৩৫	৪৮.৬৫
১৮	জুলাই	১৯৯৯	৪৯.৩৫	৪৯.৬৫
৩০	নভেম্বর	১৯৯৯	৫০.৮৫	৫১.১৫
১০	আগষ্ট	২০০০	৫৩.৮৫	৫৪.১৫
২৪	মে	২০০১	৫৬.৫০	৫৭.৫০

www.pathagar.com

আওয়ামী সরকারের পররাষ্ট্রনীতি

ক্ষমতার শুরু থেকেই আওয়ামী লীগের ভারত ঘেঁষা নীতি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির আন্তর্জাতিকমুখী স্বাভাবিক গতিকে আঞ্চলিকমুখী ভারত ঘেঁষা করে তোলে। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন আওয়ামী সরকারের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য আওয়ামী সরকার বিশ্বের অন্যসব দেশের সাথে সম্পর্কে অবনতি ঘটাতেও দ্বিধা করেনি। সরকার গঠন করার পর শেখ হাসিনা তার প্রথম বিদেশ সফর হিসেবে চীনকে বেছে নেন। বাংলাদেশ পররাষ্ট্রনীতির আলোকে বাংলাদেশের জন্য চীন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফ্যাক্টর। কিন্তু এই ধারাবাহিকতা তিনি ধরে রাখতে পারেননি। বিশেষ করে প্রথমবারের মতো ঢাকায় রাশিয়ার অস্ত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা ও দ্বিতীয়ত চীনের বদলে রাশিয়া থেকে ৮টি মিগ ২৯ ক্রয় যুদ্ধবিমান ক্রয় করা এই দুটো ঘটনায় চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কে উষ্ণতায় ভাটা পড়ে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী অনেকটা চীনা যুদ্ধবিমান নির্ভর। চীনও মিগ-২৯ এর চীনা ভার্সন সরবরাহ করতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ চীনের বদলে রাশিয়াকে বেছে নেয়।

ক্ষমতায় বসার পরই প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় যোগদানের জন্যে নিউইয়র্কে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি জাতিসংঘের আমেরিকার স্থায়ী দূত বিল রিচার্ডসন যিনি ইতিপূর্বে কংগ্রেসম্যান ছিলেন তার উপস্থিতিতে এক ভোজ সভার আয়োজন করেন। সেখানে অনেক কংগ্রেসম্যানকে দাওয়াত দেয়া হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন কংগ্রেসম্যান সেমন গ্যারী আকরম্যান দাওয়াতে আসেননি এই বলে যে, তিনি জানতে চান কেন শেখ হাসিনা তার পিতার হত্যার জন্য আমেরিকাকে দায়ী করেন। এ প্রশ্নের জবাব শেখ হাসিনা দেননি।

আওয়ামী সরকার শাসনের শুরুতেই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেয়। এই সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারে জোর দিতে গিয়ে বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক সকল সম্পর্ককে তাচ্ছিল্য করেছে। পররাষ্ট্রনীতিতে ভারত নির্ভরতা বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ বারবার কূটনৈতিক সফলতার ফিরিস্তি দিয়েছেন। আওয়ামী সরকারের এক বছরের মাথায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এক সময় বলেছেন, 'বিদেশী দেশসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক দেশসমূহের সঙ্গে আঞ্চলিক সহযোগিতাকে এ সরকার প্রাধান্য দিয়েছে। অর্থনৈতিক কূটনীতিকে এ সরকার অর্থবহ করেছে।' বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে, আন্তর্জাতিক বাজারে নিজ দেশের অবস্থান গড়ে তোলা। দ্বিপক্ষিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সাফল্যের দৃশ্যত কোন বর্ণনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিতে না পারলেও আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সার্ক-এর অধীনে উন্নয়ন চতুর্ভূজ গঠন করে বাংলাদেশ, নেপাল, ভারত ও ভুটানের উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার কোন ক্ষেত্র সৃষ্টি এবং অপরদিকে বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড ভারত ও শ্রীলংকা এবং শেষে বার্মার অর্ন্তভুক্তিকরণের মধ্য দিয়ে অপর একটি অর্থনৈতিক সহযোগিতা (পঞ্চদেশীয়) অঞ্চল সৃষ্টি; তুরস্কের আঙ্কারায় গঠিত আটদেশীয় (তুরস্ক, মিশর, নাইজেরিয়া, সিরিয়া, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ও বাংলাদেশ) ডি-৮ গ্রুপ সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি বাংলাদেশের অবস্থানকে সাফল্যের

www.pathagar.com

দৃষ্টিতে দেখেন। তবে তিনি আরো একটি কথা উল্লেখ করেন তা হলো, 'যা সফল নয় তা ব্যর্থ হয়েছে।' ব্যর্থতার ফিরিস্তি অবশ্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেননি তবে সফলতার আঙ্গিকে বিচার করে পররাষ্ট্রনীতির ব্যর্থতা বেরিয়ে আসে।

১৯৯৬ সালেই জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদে বাংলাদেশ জাপানকে ভোট না দিয়ে ভারতের পক্ষ নেয়। ভারত এই নির্বাচনে মোট ৪০ ভোট পায় আর বাংলাদেশের অবস্থান ছিল এই ৪০টি দেশের পক্ষে। ঐ দিন ভারতকে সমর্থন দেয়া বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির দূরদর্শিতা না সীমাবদ্ধতা তা আলোচনা না করেই বলা যায়, তারপর থেকে জাপান বাংলাদেশে তার অর্থনৈতিক সহযোগিতার হাতকে সংকুচিত করে এনেছিল। জাপান বাংলাদেশের অন্যতম সাহায্যকারী দেশ, সর্ববৃহত অংকের দ্বিপাক্ষিক সহায়তা দিয়ে আসতো জাপান। ভারত ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতির কারণে শেখ হাসিনাকে জাপানের পূর্বপ্রতিশ্রুত অর্থ অবমুক্ত করার জন্য জাপান সরকারের কাছে ধর্ণা দিতে হয়। ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসের গোড়ার দিকে জাপান ভ্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল জাপানের এই সাহায্যের অর্থ এক বছর পূর্বে অবমুক্ত করার প্রয়াস চালানো।

সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে আওয়ামী সরকার ভূমিকা রাখতে পারেনি। সৌদি আরব বায়তুল মোকাররম এর খতীব ওবায়দুল হকের সাথে আওয়ামী সরকারের মন্ত্রীর বচসা নিয়ে প্রশ্ন তুলে। তাছাড়া বাকশালের শাসনামলের অবসানের পরই যেখানে সৌদি আরব বাংলাদেশের অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেয় সেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে সৌদি আরবের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে কোন উদ্যোগ নেয়নি। সৌদি আরব ১৯৯৭ সালে থেকে সে দেশ থেকে কর্মরত বাংলাদেশীদের বের করে দেয়ার উদ্যোগ নেয়।

প্রথম এক বছর শাসনে একদিকে মার্কেট সম্প্রসারণের যুগে বাংলাদেশে যেমন নিজ পণ্যের বাজার হারিয়েছে, তেমনি অনেক অনেক জায়গায় নিজেদের পণ্যের চাইতে বিদেশী পণ্যকে সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, জাপান এবং,সর্বশেষ আমেরিকা বাংলাদেশ থেকে চিংড়ী ও অন্যান্য মাছ রপ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, তার সুরহা করতে পারেনি আওয়ামী সরকার। সাধারণ বিশেষ সুবিধা (জি. এস. পির) যোগ থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য ও বিশ্বের অনেক জায়গায় বাংলাদেশ তার বাজার হারিয়েছে। জনশক্তি রপ্তানী কমেছে, নতুন স্বাধীন মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করার কথা থাকলেও তা হয়নি। আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ইরানের সঙ্গে বন্ধুত্ব রয়েছে বলে আমেরিকার চিঠিকেও উপেক্ষা করতে পারেনি। ওআইসিরও সম্মেলনে যোগ দিতে শেখ হাসিনা পাকিস্তান গিয়েছিলেন ১৯৯৭ সালের মার্চে। পরবর্তী সময়ে ১৯৯৮ সালে ভারত ও পাকিস্তান কর্তৃক পরপর কয়েকটি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর উত্তেজনা হ্রাসে শেখ হাসিনা এ দুটো দেশের রাজধানী সফর করে কোন সাফল্য অর্জন করতে পারেননি।

১৯৯৮ সালেও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি পুরোপুরি ভারতমুখী হয়েছে। কূটনীতিতে ভারতীয় স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বাংলাদেশকে বলি দেয়া হয়েছে। সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশী হত্যায় বাংলাদেশের প্রতিবাদ পর্যন্ত সরকার রেকর্ড করাতে পারেনি। পুশইন ও কাঁটাতারের বেড়া এ বছর নতুন সমস্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ট্রান্স এশিয়া রেলওয়ে ও এশিয়ান হাইওয়ের পাশাপাশি দর্শনা এবং আগরতলা-আখাউড়া রুটে বাংলাদেশ-ভারতের পুরনো রেল সংযোগ চালু করার জন্যে দু'দেশ ঐক্যমতে পৌছে। বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যের মালামাল সে দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে রাজ্যগুলোতে

www.pathagar.com

পাঠানোর জন্যে এ দেশ থেকে ট্রানজিট সুবিধা নেয়ার বিষয়টি বাংলাদেশ-ভারত-মায়ানমার-শ্রীলংকা-থাইল্যান্ড অর্থনৈতিক সহযোগিতা (বিমসটেক) এর ওপর দিয়ে জায়েজ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের ওপর ভারতীয় পতাকা উড়ানো সত্ত্বেও বাংলাদেশ চুপচাপ ছিল। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত হওয়ায় বরাবরই এ দেশের কূটনীতি ভারতের সমান্তরাল হলেও ১৯৯৮ সালে তা করা হয় সে দেশটির পরিপূরক। এর অংশ হিসবেই সেনা ও বিমান বাহিনী প্রধান এ বছর প্রায় একই সঙ্গে ভারত সফর করেন। অপরদিকে ভারতের নৌবাহিনী প্রধান আসেন বাংলাদেশ সফরে। এতদিন বাংলাদেশ চীন থেকে সামরিক সরঞ্জাম আনলেও ১৯৯৮ সাল থেকে তা আনা হয় ভারত ও রাশিয়া থেকে। ফলে ভারত সব সামরিক পরিকল্পনা কৌশল ও সমর ক্ষমতা জেনে যায়। অন্যদিকে চীনা সমর সরঞ্জাম অকেজো হয়ে পড়ে। ভারতকে খুশি করার জন্যে আওয়ামী সরকারকে ভারতের নোবেল বিজয়ী অর্মত্য সেনকে নিয়ে ব্যাপক উদ্যোগ আয়োজন করতে হয়। যিনি তার থিসিসে ১৯৭২-১৯৭৫ শাসনামলে শেখ মুজিবের একনায়কতন্ত্রকে তখনকার দুর্ভিক্ষের জন্যে দায়ী করেছিলেন। একবার দেশের কূটনৈতিক সাফল্য বিচ্ছুরিত হয় হিলি সীমান্তে মর্টারের গোলায়, সীমান্তে পুশইনের জ্যান্ত সমস্যায়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এসব প্রতিবাদ করারও সময় হয়নি। পুশইনের বিষয়টি নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নীরব কূটনীতিকেই শ্রেয় জ্ঞান করেছে যদিও সীমান্তে এ রক্তারক্তি হয়েছে। বাংলাদেশে অবৈধ ভারতীয়ের সংখ্যা বেসরকারি হিসেবে এক লাখ হলেও পররাষ্ট্রদফতর তাদের সম্পর্কে কিছু জানাতে পারেনি। অথচ অনুপ চেটিয়ার মতো অবৈধ প্রবেশকারীদের বিচার প্রকাশ্যে দিবালোকেই চলেছে। একই ভাবে পাবর্ত্য চট্টগ্রামে ভারতের পাহাড়ি রাজ্যগুলো থেকে আশ্রয় নেয়া কয়েক হাজার পরিবার সম্পর্কেও তারা নীরব ছিল।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ আটকেপড়া পাকিস্তানিদের তার দেশে ফিরিয়ে নেয়ার ঘোষণা সত্ত্বেও সরকারের একদেশদর্শী কূটনীতির কারণ তা বাস্তবায়িত হয়নি। ভারতমুখী পররাষ্ট্রনীতির কারণে বাংলাদেশের সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) অন্যতম বৃহত্তম সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ইরাকের ওপর মার্কিন-ব্রিটিশ হামলায় বাংলাদেশ জোরালো ভূমিকা নিতে পারেনি। ১৯৯৮ সালে বিদেশে বাংলাদেশের নার্স ও গৃহপরিচারিকা রফতানি সরকার সার্কুলার দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল। ফলে বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন থেকে বঞ্চিত হয়। অপরদিকে ভারত এ সুযোগ কাজে লাগায়। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ভারত তার নাগরিকদের নার্স ও গৃহপরিচারিকা হিসেবে রফতানি করে। শেষ পর্যন্ত সরকার কেবল নার্সদের বেলায় জারিকৃত সার্কুলারটি প্রত্যাহার করে। মালয়েশিয়ায় বিপুল পরিমাণ বাংলাদেশী শ্রমিকের চাকরির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সরকার একে কাজে লাগাতে পারেনি। উপরন্তু মালয়েশিয়া থেকে ব্যাপক সংখ্যক বাংলাদেশী শ্রমিককে দেশে ফেরত পাঠানো হয়। থাইল্যান্ড ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশীদের ১৯৯৮ সালে বেশি সংখ্যায় ফেরত পাঠানো হয়। সৌদি আরবও একই কায়দায় বাংলাদেশীদের ঠেলে পাঠায়। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সাথে প্রতিবছর এদেশ থেকে ৫০ হাজার শ্রমিক নেয়ার ব্যাপারে যে মতৈক্যে পৌছেছিলেন তাও সরকার কার্যকর করতে পারেনি। মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপক শ্রম বাজার হাতছাড়া হয় সরকারের কূটনৈতিক উদ্যোগের অভাবেই। সরকার শত চেষ্টা করেও সৌদি দূতাবাসের ওমরাহ ভিসা বাতিলের চেষ্টা রদ করতে পারেনি।

www.pathagar.com

প্রচলিত রীতিনীতি উপেক্ষা করে একসঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব দেশের বাইরে অবস্থান করেন। এ নিয়ে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে নানা প্রশ্ন উঠেছিল। বিশেষ করে ২২ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী এবং আগের দিন অগ্রবর্তী দলের সদস্য হিসেবে পররাষ্ট্র সচিব মুস্তাফিজুর রহমানের কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষে ঢাকা ত্যাগ করার পর ২৩ অক্টোবর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামাদ আজাদেরও একই উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করা কতটুকু প্রয়োজনীয় ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। সাবেক ব্রিটিশভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সংগঠন কমনওয়েলথকে এমনিতে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে টকিং ক্লাব হিসেবে অভিহিত করা হয়। সে ক্ষেত্রে দেশে গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকা সত্ত্বেও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান কূটনৈতিক সফলতার চাইতে ব্যর্থতার পাল্লা ভারি করার পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছে সংশ্লিষ্ট মহল। ব্যর্থতায় ঢাকা ছিল তার এর আগের আমেরিকা সফরও। শুধু ব্যর্থতা নয়, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মুখে কালিমা লেপে দেয় সে ঘটনা। স্বাধীনতার পরের ইতিহাসে সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে নজীর স্থাপন করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ১৬ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৫২ তম অধিবেশন শুরু হয় নিউইয়র্কে। বিশ্বের ১৮৫টি দেশের সরকার-রাষ্ট্রপ্রধান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, অন্য কোনো মন্ত্রী বা রাজনৈতিক নেতাদের শক্তিশালী প্রতিনিধি দল ৫২ তম অধিবেশনের বিতর্কে অংশগ্রহণের জন্যে পাঠানো হয়। ২১ সেপ্টেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন জাতিসংঘে তার বক্তব্য রাখেন। ক্লিনটন নিউইয়র্ক অবস্থানকালে দক্ষিণ এশিয়ায় তার প্রস্তাবিত সফরের এজেন্ডা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি পূর্ব প্রস্তুতি নিয়েই দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক এজেন্ডা নিয়ে কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতে এসেছিলেন। ভারত ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে তিনি দ্বি-পাক্ষিক এবং উপ-মহাদেশের সমস্যা নিয়ে মতবিনিয়ম করেন। আর বাংলাদেশের পক্ষে সেখানে ক্লিনটন ও হিলারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও তার পত্নী। উপায়ও ছিল না, কেননা কোনো মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধি তখনও নিউইয়র্ক যাননি। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ায় (১৭ সেপ্টেম্বর) তিনি জাতিসংঘে নির্ধারিত সময়ে যেতে পারেননি। বিকল্প হিসেবে প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী সেখানে যেতে পারতেন বাংলাদেশের দলের নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে। কিন্তু তা হয়নি। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন ২৪ সেপ্টেম্বর। কুলখানি সেরে তিনি ২৮ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক যাত্রা করেন। মাঝখানে দেশের ইমেজ ক্ষুণ্ন হয় বর্হিবিশ্বে। বাংলাদেশের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব হয়নি অধিবেশনকালে। প্রতিমন্ত্রী যথাসময়ে গিয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারতেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর যুক্তরাজ্য থেকে আসার পর ১৬ সেপ্টেম্বর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিব দায়িত্ব নেন। ১৭ সেপ্টেম্বর তার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। ২৪ সেপ্টেম্বর মন্ত্রীরপত্নী মারা যান। ২৬ সেপ্টেম্বর কুলখানি সেরে তিনি ২৮ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক রওয়ানা হন। সেখান থেকে ভারত-পাকিস্তান সফর শেষে ১৫ অক্টোবর তার দেশে আসার কথা থাকলেও তিনি ব্যক্তিগত সফরে ওই দিন ইসলামাবাদ থেকে পুনরায় দিল্লি রওয়ানা হন। ১৭ অক্টোবর দেশে ফেরত আসার কয়েকদিন পরই রওয়ানা হন এডিনবরায় কমনওয়েলথ সম্মেলনে। সরকারি-বেসরকারি মহল অভিমত প্রকাশ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শুধু সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীই নন, প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে সরকারের দায়িত্ববান ব্যক্তিও। প্রধানমন্ত্রী কমনওয়েলথে কূটনৈতিক বিষয়ে সহায়তা করার জন্যে প্রতিমন্ত্রী-সচিব ছাড়াও ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ফারুক সোবহান, আরেক পররাষ্ট্রসচিব এবং অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া। এছাড়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট আর্ন্তজাতিক সংস্থা উইং-এর মহাপরিচালক জিয়া উদ্দিন আহমেদ, পরিচালক শামীম

www.pathagar.com

আহসানও ছিলেন সফর দলে। তারপরও মন্ত্রণালয় শূন্য করে মন্ত্রীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য ছিল না?

এ সময় কূটনৈতিক অনেক ব্যর্থতা সংবাদপত্র ও জনসাধারণের চোখে পড়ে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মর্যাদার স্খলন এমন পর্যায়ে নামে যে, মার্কিন সেনাবাহিনীর মধ্যম সারির অফিসাররা সোজা হেটে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে হানা'র প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করেন। মন্ত্রণালয়ের পরিচালক বড়জোর মহাপরিচালকের কক্ষই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। হানা নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক দফা হানাহানি হয়ে যায় শুরুতে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলে বসেন তার জানা নেই হানা কি, কিভাবে এসেছে। কেই বা সই করেছে। এ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বামপন্থী দলগুলো বিবৃতি দিয়ে বিরোধীতা করেছিলেন। বুদ্ধিজীবীরাও অভিন্ন ভাষায় বিবৃতি দেন। বুদ্ধিজীবীরা বলেন, 'এ কেমন কথা? বিদেশমন্ত্রী বললেন, তিনি জানেন না। অথচ মাত্র ৭ দিনের মাথায় তার কাছেই হানার রিপোর্ট পেশ করা হলো।' এর আগে দেখা যায়, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী শুরু থেকেই এর যে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, শেষ পর্যন্ত তাই দিয়েছেন। অর্থাৎ এটি কোনো নতুন চুক্তি নয়, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বিদ্যমান সামরিক সহযোগিতার আওতায় ইউএসএ আইডি'র অধীন একটি প্রকল্প প্রস্তাব। মন্ত্রণালয়ের সচিব সাধারণত মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। আওয়ামী শাসনে এর আমূল পরিবর্তন আনা হয়। বলা হয়, মন্ত্রী হবে মুখপাত্র। তার অনুপস্থিতিতে সচিব দায়িত্ব পালন করবেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে ভারত-পাকিস্তানের পারমাণবিক বিস্ফোরণের বিলম্বিত প্রতিবাদ নিয়ে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার একটা ব্যাখ্যা দিলেও ঢাকা থেকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত তিনটি দেশের দূতাবাস প্রত্যাহারের কারণ বৈঠকে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। একই সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ওএসডি'র বর্তমান সংখ্যা এবং পোস্টিং বদলি নিয়ে অনিয়মের সন্তোষজনক জবাবও দিতে পারেননি সচিব। অভিজ্ঞমহল বিস্মিত হন কূটনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের ক্ষীপ্রগতি দেখে। বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে বাংলাদেশ সরকার বিদেশী দাতাদের কাছে সাহায্যের আবেদন করার দু'দিন পর বিদেশ বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের কাছে এ মর্মে চিঠি গেছে। সরকারি কাজে জরুরী বার্তা যেতে দুদিন লাগলেও বেসরকারি নিমিত্তে বার্তা যায় অনেক দ্রুত। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্তা ব্যক্তিদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও অদক্ষতার জন্য মার্কিন সরকারের সাথে বাংলাদেশের নিম্ন পর্যায়ের নাতিশীতোষ্ণ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। মানবাধিকার রিপোর্ট নিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে পররাষ্ট্রদফতরে ডেকে নিয়ে যেভাবে প্রতিবাদ জানানো হয় তা দেখে পশ্চিমা কূটনীতিকরা বিস্মিত হন। কারণ এ ধরনের রিপোর্ট প্রতি বছরই দেয়া হয়ে থাকে। রোহিঙ্গা শরণার্থী নিয়ে জ্বলন্ত সমস্যায় পড়ে বাংলাদেশ। মিয়ানমার সরকার সোজাসুজি জানিয়ে দেয় তারা ২১ হাজার শরণার্থী ফেরত নেবে না। অথচ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে এক কদম অগ্রগতি দেখাতে পারেনি। তাদের সাফল্য ছিল সাংবাদিকদের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপে। ইস্তাবুলে অনুষ্ঠিত ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ তার রিপোর্ট পেশ করতে পারেনি। অর্থনৈতিক কূটনীতি'র ঘোষণা দেয়া হলেও ১৯৯৬-১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ২ বছরে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ হয়নি। বিদেশে বাংলাদেশের শ্রম বাজারে সংকুচিত হয়েছে।

১৯৯৯ সালের প্রথমদিকে ঢাকাস্থ একজন ফরাসী কূটনীতিক অপহরণের হাত থেকে রক্ষা পান। রাষ্ট্রদূতের সন্দেহ হওয়ায় এবং তিনি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় রক্ষা পান অপহরণকারীদের হাত থেকে। এই অপহরণ চেষ্টায় যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ও এই মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবুল কাশেম তালকুদারকে জড়ানো হয়েছিল। তদন্তে দেখা গেছে, আবুল

www.pathagar.com

কামেশ নামে কোনো অতিরিক্ত সচিব উল্লিখিত মন্ত্রণালয়ে নেই। অপহরণকারীরা ১১ মার্চ একটি বৈঠকের কথা বলে ঢাকাস্থ দূতাবাসের ট্রেড কমিশনার বর্ট্রান্ড ডেসরুলেসকে গাড়িতে তুলে নিতে চেয়েছিল। অপহরণকারীদের একজন নিজেকে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের প্রটোকল অফিসার হিসেবে পরিচয় দেয়। মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবিত বৈঠকে ফরাসী রাষ্ট্রদূত রনেভেরে ও যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু থাকবেন বলে চক্রটি দূতাবাসকে জানিয়েছিল। এই বৈঠকের কথা জানার পর রাষ্ট্রদূত কিছুটা বিস্মিত হন এবং তার সন্দেহ হয়। যেভাবে বৈঠকটি সাজানো হয় তা তার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়। বৈঠকের আয়োজকরা দূতাবাসের গাড়ি ব্যবহার করতে দিতে চাননি। তার নিজেদের গাড়িতে করেই কর্মকর্তাদের বৈঠক স্থলে নিয়ে যেতে চায়। রাষ্ট্রদূতের সন্দেহ হওয়ায় বৈঠকের একদিন আগে তিনি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কথিত অতিরিক্ত সচিব এর সাথে যোগাযোগর চেষ্টা করেন। তখন তিনি জানতে পারেন ঐ নামে কোনো অতিরিক্ত সচিব নেই। আরো জানতে পারেন, যোগাযোগমন্ত্রী সহ কারো সাথেই ফরাসী ট্রেড কমিশনারের কোনো এ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। রাষ্ট্রদূত পরে কথিত অতিরিক্ত সচিবের দেয়া টেলিফোনে (৯০১০৬০০ ও ৮০৮৭০৯) রিং করেন। অপর প্রান্তে টেলিফোন রিসিভ করেন জনৈক জহির খান। রাষ্ট্রদূত কিছুক্ষণ আলাপ করার পর নিশ্চিত হন যে, মিঃ জহির খান একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি। তিনি সময় ক্ষেপণ না করে বিষয়টি পুলিশের উর্ধতন কর্মকর্তাদের নজরে নেন। রাষ্ট্রদূত ১১ মার্চ পুলিশের অতিরিক্ত আইজি বরাবর চিঠি লেখেন। চিঠিতে বলা হয়, 'ফরাসী দূতাবাস সামগ্রিক পরিস্থিতিকে ভয়াবহ বলে বিবেচনা করছে।' তিনি তার চিঠিতে পুলিশ প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, 'এটা কি অপরিচিত দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা ট্রেড কমিশনারকে অপহরণের প্রচেষ্টা নয়?' রাষ্ট্রদূত চিঠিতে বলেন, 'তাহলে আমাদেরকে কি বিশ্বাস করতে হবে যে, বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী মিশনগুলোর সাথে সরকার, সরকারের উর্ধতন কর্মকর্তা বা কোনো প্রশাসনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে জালিয়াতি হচ্ছে? তাহলে কি বিদেশী মিশনগুলোকে সরকারের সাথে কোনো ধরনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে বারবার যাচাই-বাছাই করতে হবে?' রাষ্ট্রদূত চিঠিতে আরো লিখেন, 'জহির খানকে জেলে পাঠানো দূতাবাসের উদ্দেশ্য নয়। তবে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার বাংলাদেশ সরকারের। জহির খান যা বলেছেন তা অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেছে। এই ধরনের নোংরা কর্মকান্ড থেকে তাকে বিরত রাখা উচিত।' এদিকে জহির খানকে ঘিরে চাঞ্চল্যকর তথ্য উদঘাটিত হয়। জালিয়াতির বিশাল ফাঁদ তিনি পেতেছিলেন। হোটেল এয়ারপোর্ট ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি হোটেল নির্মাণের পরিকল্পনা নেন তিনি। এতে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নির্মাণ প্রতিষ্ঠান অংশ নেয় সে জন্য তৎপরতা চালান। তার হোটেল নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের কাছে ৫শ' মার্কিন ডলারের বিনিময়ে আবেদনপত্র বিক্রিও করেন। এ জন্য তিনি যান ঢাকাস্থ বিভিন্ন দূতাবাসে। তাদের চাপ দেন যাতে সংশ্লিষ্ট দেশের নির্মাণ প্রতিষ্ঠান তার কাছ থেকে আবেদনপত্র নেয়। এজন্য দূতাবাসগুলোকে চিঠি লিখলেও জোরাজুরি করেন। নিজে চিঠি লিখেন বিভিন্ন দেশের চেম্বার অব কমার্সকে। এ নিয়ে বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সাথে তার বাদানুবাদও হয়। কয়েকটি দূতাবাসের সন্দেহ হলেও তারা বিষয়টি আমলে নেননি।

চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সভাপতি ও শ্রমমন্ত্রী এম এ মান্নান নানান সমস্যায় জর্জরিত শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়কে সঠিক পথে আনতে ব্যর্থ হন। মান্নান শ্রম প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন ১৯৯৬ সালের ২৯ জুন, পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তিনি পূর্ণমন্ত্রীর মর্যাদা পান।

www.pathagar.com

প্রতিমন্ত্রী থাকাকালে ১৯৯৭ সালের পুরো বছরই তার কাটে বিদেশ সফরে। কেবল ঐ এক বছরই ফেব্রুয়ারিতে নেদারল্যান্ড, মার্চে সৌদি আরব, এপ্রিলে কুয়েত, জুনে জেনেভা, জুলাইয়ে সাইপেন ও মালয়েশিয়া, অক্টোবরে নরওয়ে, নভেম্বরে থাইল্যান্ড সফর করেন তিনি। ১৯৯৮ সালের এপ্রিলে বাহরাইন ও মে'তে জেনেভা সফর করেন তিনি। ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি তে মন্ত্রী মালয়েশিয়া যান। মালয়েশিয়ায় গেলেও সে দেশের জেলে আটকেপড়া অবৈধ বাংলাদেশী শ্রমিকদের ব্যাপারে আশাপ্রদ কিছুই অর্জিত হয়নি। কুয়ালালামপুরে তিনি হঠাৎ অসুস্থবোধ করলে সিঙ্গাপুর যান জেনারেল চেকআপের জন্য। ডাক্তাররা জানান, অবস্থা ভয়াবহ। খুব দ্রুত বাইপাস সার্জারি করতে হবে। তাই করা হয়। শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্টদের এ অভিযোগ ছিল। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়া যান মাত্র ২৩ জন। ১৯৮০ সালে যান ৩ জন। ১৯৮৩ সালে ২৩ জন। ১৯৮৬ সালে ৫শ' ৩০ জন। ১৯৮৮ সালে ২ জন। ১৯৮৯ সালে ৪শ' ১জন। ১৯৯০ সালে ১ হাজার ৩শ' ৮৫ জন। ১৯৯১ সালে ১ হাজার ৬শ' ২৮ জন। ১৯৯২ সালে ১০ হাজার ৫শ' ৩৭ জন। ১৯৯৬ সালে ৬৭ হাজার ৯শ' ৩৮ জন। মান্নান শ্রমমন্ত্রী হবার পর ১৯৯৭ সালে তা কমে যায়। ঐ বছর মাত্র ২ হাজার ৮শ' ৪৪ জন বাংলাদেশী শ্রমিক মালয়েশিয়া যাবার সুযোগ পান। সিঙ্গাপুরে প্রথম জনশক্তি রপ্তানি হয় ১৯৭৯ সালে। সে বছর মোট ১শ' ১০ জন বাংলাদেশী সিঙ্গাপুর যান। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে ৩৮৫ জন, ১৯৮১ সালে ১ হাজার ৮৩ জন, ১৯৮২ সালে ৩শ' ৩১ জন, ১৯৮৩ সালে ১শ' ৭৮ জন, ১৯৮৪ সালে ৭শ'১৮ জন, ১৯৮৫ সালে ৭শ' ৯১ জন, ১৯৯৬ সালে ২৫ জন সিঙ্গাপুর যান। এর পরের দুই বছর কেউই সিঙ্গাপুর যাবার সুযোগ পাননি। ১৯৭৬ সালে মাত্র ২শ' ১৭ জন বাংলাদেশী সৌদি আরবে যান। ১৯৯৬ সালে ৭২ হাজার ৭শ' ৩৪ জন, ১৯৯৭ সালে ১ লাখ ৬৫ হাজার ৩৪ জন বাংলাদেশী সৌদি আরবে যান। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ থেকে ৬ হাজার ৮৭ জন দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক রফতানি হয়েছিল। দেশওয়ারী হিসেবে সৌদি আরবে গিয়েছিল ২শ' ১৭জন, কুয়েতে ৬শ' ৪৩ জন, ইউনাইটেডে আরব আমিরাতে ১ হাজার ৯শ' ৮৯ জন, কাতারে ১ হাজার ২শ' ২১ জন, ইরাকে ৫শ' ৮৭ জন, লিবিয়ায় ১শ' ৭৩ জন, বাহরাইনে ৩শ' ৩৫ জন, ওমানে ১শ' ১৩ জন, ইউরোপ-আমেরিকাসহ অন্যান্য দেশে ৮শ' ৯ জন। ঐ বছর প্রবাসীদের পাঠানো টাকার পরিমাণ ছিল ৩৫ কোটি ৮৫ লাখ। ১৯৭৬ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ২২ বছরে রিক্রুটিং এজেন্সীর সংখ্যা বেড়ে হয় ৪শ'। ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, প্রায় ২২ লাখ ৮১ হাজার ৯৭ জন বাংলাদেশী বিদেশে গিয়েছে এবং তাদের পাঠানো অর্থের পরিমাণ ৫২ হাজার ১শ' ৫০ কোটি টাকা। মান্নান শ্রমমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর ঘোষণা দেয়া হয়, মালয়েশিয়ায় শ্রমিক রফতানি করবে সরকারি সংস্থা বোয়েসেল। সে সময় সরকারি বিজ্ঞাপন দেখে সারাদেশে বিভিন্ন জেলার জনশক্তি ও কর্মসংস্থান অফিসে নাম নিবন্ধন করেন অনেকে। কেবল নিবন্ধন খাতেই সরকারের আয় হয় কয়েক কোটি টাকা। কয়েক মাস পরেই আবেদনকারীরা পেলেন দুঃসংবাদ। বোয়েসেল ঘোষণা করলো রিক্রুটিং এজেন্সীর মাধ্যমেই পাঠানো হবে মালয়েশিয়া। সরকারিভাবে একজন শ্রমিক মালয়েশিয়া গেলে তার সর্বমোট খরচ পড়ে ৪০ হাজার টাকা। রিক্রুটিং এজেন্সীর হাতে দায়িত্ব যাওয়ার কারণে সে খরচ বেড়ে দাঁড়ায় ১ লাখ থেকে দেড় লাখ টাকায়। সাথে যোগ হয় ভোগান্তি। কিন্তু কাজ হলো না কিছুই। রিক্রুটিং এজেন্সীগুলোর দেয়া জাল ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিটের কারণে কেউ যায় মালয়েশিয়ার জেলে, কেউ কেউ পালিয়ে ফেরত আসে

www.pathagar.com

বাংলাদেশে। এসব অসহায় হতভাগ্যদের হাহাকার জড়ানো আবেদনে ভারি হয় শ্রমমন্ত্রীর ফাইল। মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত অবৈধ বাংলাদেশীর বৈধকরণ প্রক্রিয়ার কথা বলা হলেও কার্যত কিছুই হয়নি। এদিকে দেশের বেশকিছু রিক্রুটিং এজেন্সীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কিছু অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে নেয়া হয়নি কোনো ব্যবস্থা। কেবল নোটিশ পাঠিয়েই কর্ম সম্পাদন করে মন্ত্রণালয়। এসব এজেন্সীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, অবৈধভাবে সৌদি আরবে শ্রমিক পাঠানো। কেন এসব এজেন্সীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া যায়নি উত্তরে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহাকারী সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা ২০ মার্চ ১৯৯৯ দৈনিক মানবজমিনকে বলেছিলেন, 'মন্ত্রণালয়ের পিয়ন থেকে শুরু করে সচিব পর্যন্ত সবার সাথে মান্নান সাহেবের সুসম্পর্ক কাউকে তিনি ক্ষ্যাপাতে চান না। কারণ তিনি আগাগোড়াই রাজনীতিক। দেশের স্বার্থের চাইতে রাজনীতিটাই তার কাছে আসল।'

২১ মার্চ ২০০০ এর মার্কিন প্রেসিডেন্টের দশ-বারো ঘন্টা বাংলাদেশ সফর নির্ঝঞ্ঝাট করতে নিরাপত্তা প্রস্তুতি ছিল ১৯ দিনের। নজিরবিহীন এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিচ্ছিদ্র করতে গিয়ে ঘটে চমকপ্রদ সব ঘটনা। মার্কিনীদের নিরাপত্তা সরঞ্জাম ও কলাকৌশল সম্পর্কে অন্ধকারে ছিলেন বাংলাদেশের নিরাপত্তা কর্মীরা। সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করেছে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের ডিপ্লোম্যাটিক সিকিউরিটি সার্ভিস। তারা হোয়াইট হাউসের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করেই নিরাপত্তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ক্লিনটনের আগমনের ব্যাপারে বরাবরই তারা ছিল সতর্কাবস্থায়। কোন বিমানে করে ক্লিনটন আসছেন তাও রাখা হয় গোপন করে। বিশেষ সঙ্কেত পেয়ে ক্লিনটন যে তার লিমুজান গাড়িতেও উঠবেন না সে কথাও কারও জানা ছিল না। হঠাৎ করেই এসব সিদ্ধান্ত হয়। এ কারণে বিমানবন্দরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকেও বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। সবকিছু ঠিকঠাকমতো চললেও এই দীর্ঘ কর্মসূচিতে ঘটেছে বেশকিছু চমকপ্রদ ঘটনা যা বাংলাদেশের নিরাপত্তা কর্মীদের জন্য ছিল একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা। ক্লিনটনের আগমন উপলক্ষে ঢাকায় আসে মার্কিন কমান্ডো বাহিনী ভারি অস্ত্র নিয়ে। তারা নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে। কমান্ডোদের গাড়ি ছিল বুলেটপ্রুপ। ঢাকায় নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীদের কাছে সবকিছুই ছিল নতুন। তারা আগে কখনও এসব দৃশ্য দেখেননি। ক্লিনটনের সফরের সময় মার্কিনীরা ব্যবহার করে ছয় রংয়ের নিরাপত্তা পাস। এসব পাসের ডিজাইন আসে হোয়াইট হাউস থেকে। সোনারগাঁও হোটেলে সংক্ষিপ্ত সময়ে অবস্থানকালে ক্লিনটন ব্যবহার করেন হোটেলের কর্মচারীদের ব্যবহৃত লিফটটি। ক্লিনটনের আগমনের আগে সবাই জানতেন তিনি ভিআইপি লিফট দিয়ে উঠে যাবেন সাত তলায় নির্ধারিত স্যুটে। কিন্তু তিনি হোটেলে প্রবেশের পর হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত বদল হয়। ক্লিনটন হোটেলের কর্মচারীদের ব্যবহার করা লিফটটি ব্যবহার করে উঠে যান হোটেলের ওপর তলায়। বঙ্গভবন থেকে সোনারগাঁও হোটেল ও বিমানবন্দরে যাবার পথে উপর থেকে রাস্তায় আলো ফেলা হয় হেলিকপ্টার থেকে। ক্লিনটনের গাড়িবহরের ওপর দিয়ে উড্ডয়নরত এসব হেলিকপ্টারে বসেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। হেলিকপ্টারের দু'পাশে বসা ভারি অস্ত্রসমেত দুই নিরাপত্তা কর্মী আলো দিয়ে দিনের মতো অবলোকন করেন রাস্তা ঘাট। কোথাও গাছের মাথা ও উঁচু ভবনের ছাদেও আলো ফেলে পরীক্ষা করা হয়। জিয়া বিমানবন্দর থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হয়ে বঙ্গভবন পর্যন্ত ১০৮টি ভবনের ছাদে নিয়োগ করা হয় নিরাপত্তা কর্মীদের। কয়েকটি ভবনের ছাদে গোপনে ক্যামেরাও স্থাপন করা হয়। ভবনের ছাদগুলো ৪টি জোনে ভাগ করা হয়। ক্লিনটনের পথ চলার হেলিকপ্টার থেকে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা হয়। রাতের বেলা দু'টি

www.pathagar.com

ভবন থেকে তির্যক আলো ফেলে সঙ্কেত দেয় মার্কিন সিক্রেট সার্ভিসের কর্মীরা। তাঁরা সঙ্কেত দিয়ে হেলিকপ্টারে থাকা কর্মীদের সাথে যোগাযাগ স্থাপন করেন। ক্লিনটনের নিরাপত্তার জন্য সংরক্ষিত এলাকায় পাস ছাড়া প্রবেশ ছিল একেবারে নিষিদ্ধ। এর আগে এ ধরনের নিয়ম সাধারণত উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা মানতেন না। তারা নিরাপত্তা জোনে নির্বিঘ্নে হেটে বেড়াতেন। মার্কিনীদের এ ব্যাপারটিও জানা ছিল। তারা এ ব্যাপারে আগে থেকেই কড়াকড়ি আরোপ করে। পাস না থাকায় কলাবাগানে একটি গোয়েন্দা সংস্থার কয়েক কর্মীকে শেষ মুহূর্তে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। ক্লিনটনের নিরাপত্তাবাহিনীর সাথে ছিল তিনটি কুকুরের বাহিনী। সোনারগাঁও হোটেলেই এগুলো অবস্থান করে। তিনটি কুকুরই ছিল বিস্ফোরক ও আগ্নেয়াস্ত্রের ওপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সোনারগাঁও হোটেলে অস্ত্র নিয়ে ডিউটি করার সময় মহড়ারত দুই কুকুর এক পুলিশ কর্মকর্তাকে ধাওয়া করে। এরপরই ডগ স্কোয়াড নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকার কোন নিরাপত্তা কর্মী এরপর থেকে আর এর ধারেকাছেও যাননি। নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীদের নিরাপত্তার সময় পিছন দিয়ে দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। তারা কেউই ক্লিনটনের গাড়ি বহরের দিকে তাকাতে পারেনি। বিমানবন্দর থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পর্যন্ত দীর্ঘ সড়কে প্রায় ১০ গজ পরপর একজন করে নিরাপত্তা কর্মী দাঁড়িয়েছিল। এদের দৃষ্টি ছিল বাইরের দিকে। বাইরের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য এদের প্রতি ছিল কড়া নির্দেশ। এ কারণে বাধ্য হয়ে নিরাপত্তা কর্মীরা রাস্তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে দায়িত্ব পালন করেছে। ক্লিনটনের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত নিরাপত্তা কর্মীরা কোন মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারেননি। এ ব্যাপারে আগে থেকেই কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের সিকিউরিটি সার্ভিস থেকে এই নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়। বলা হয়, মোবাইলের সাথে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারও সীমিত করতে হবে। প্রটোকলের দায়িত্বে নিয়োজিত নিরাপত্তা কর্মীরাও ডিউটি করেন অস্ত্র ছাড়া। তবে রাস্তায় যারা দায়িত্বে ছিলেন তাদের কাছে অস্ত্র থাকলেও তাতে কোন গুলি ছিল না।

বাংলাদেশ সফরকালে ক্লিনটনের নিরাপত্তার অজুহাতে জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল হয়। ক্লিনটনের জাতীয় স্মৃতিসৌধে যেয়ে কেন স্বাধীনতার শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালো না তার পেছনেও আওয়ামী লীগের রাজনীতি কাজ করেছে বলে বিভিন্ন সূত্র মতামত প্রকাশ করে। শেষের দিকে ক্লিনটনের সফরসূচি নিয়ে এনজিওদের সাথে পাল্লা দিতে, বিশেষ করে গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাকের সাথে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকতে সরকারের ব্যর্থতার শেষ আঁচড় পড়ে ক্লিনটনের জাতীয় স্মৃতিসৌধ সফরসূচির ওপর। আওয়ামী সরকার ধামরাই জয়পুরার কাছে তড়িঘড়ি করে তৈরি আশ্রয়ণ প্রকল্পের কয়েকটি বাড়ি-ঘর দেখিয়ে ক্লিনটনকে বোঝাতে চায় যে, সরকার গরীবদের জন্য বাড়ি-ঘর তৈরি করে দিচ্ছে। তাদেরকে দেশব্যাপী এমনি আবাসন প্রকল্পের অধীনে জীবনে বাচার ঠাঁই করে দিচ্ছে। সেনাবাহিনীর সহায়তায় তাই রাতারাতি কয়েকটি বাড়ি ঘর তৈরি করে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম সাজাবার চেষ্টা করে। আগ থেকেই তৈরি ক্লিনটনের একটি সফরসূচি ছিল জয়পুরা গ্রামে। সেখানে তিনি গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি চালিত প্রকল্প দেখবেন ও ব্র্যাক এর গণশিক্ষা প্রকল্পের অধীনে একটি স্কুল দেখার কথা ছিল। এ উপলক্ষে তিনি সারা গ্রাম ঘুরে দেখারও একটা ইচ্ছা পোষণ করেন এবং গ্রামবাসীদের সাথে বসে আলাপ-আলোচনার জন্য এক ঘন্টার একটি ব্যবস্থা রাখা হয় তার কর্মসূচিতে। ক্লিনটনের সফরসূচি চূড়ান্ত করার শেষ পর্যায়ে যখন সরকার বুঝতে পারে যে, তিনি সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্প দেখতে যাবেন না, তখন সরকারের ক'জন নেতা ও আমলা খুবই বিমর্ষবোধ-

www.pathagar.com

করেন। কেন ক্লিনটন যাবেন না-এই জন্য তার উপদেষ্টারা ঐ গ্রামে যাওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তারা কখনো আগাম নিরাপত্তাজনিত চিরুনী অভিযান ছাড়া প্রেসিডেন্টের কোথাও যাওয়াকে অনুমোদন করেনি। এর প্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষ থেকে ইঙ্গিত দেয়া হয় এই বলে যে, আশ্রয়ণ প্রকল্পে যাওয়া যদি ঝুঁকিপূর্ণ হয় তাহলে জয়পুরা গ্রামে যাওয়াও তার জন্য একই ঝুঁকির পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু যেহেতু প্রেসিডেন্ট জয়পুরা যাচ্ছেন, তাই তিনি তার পাশে আশ্রয়ণ প্রকল্প দেখতে যাওয়া মোটেই অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ নয়। তা শোনার পর প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা উপদেষ্টারা তা থেকে সিদ্ধান্ত নেয় যে, প্রেসিডেন্টকে তাহলে কোথাও যাওয়া আর ঠিক নয়। এমনি পটভূমিতে ঠিক হয় ক্লিনটন যেহেতু আশ্রয়ণ প্রকল্পে যাচ্ছেন না তাই জয়পুরা গ্রামেও যাবেন না। বিকল্প হিসেবে গ্রামবাসীদের ঢাকায় আমেরিকান দূতাবাসে নিয়ে আসা হবে, এখানেই প্রেসিডেন্ট তাদের সাথে ব্র্যাক ও গ্রামীণ ব্যাংকের দারিদ্র বিমোচনে কর্মসূচি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবেন ও কিভাবে তাদের জীবনে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আসছে তা নিজ চোখে দেখবেন।

বিকেলে ক্লিনটন ঠিক তাই করেন। বৃহৎ এই দুই এনজিও'র উদ্যোগে গ্রামের কিছু নারী-পুরুষ ও ব্র্যাক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের আমেরিকান দূতাবাসে ক্লিনটনের সামনে হাজির করা হয়। তারা শিখানো বুলি তোতাপাখির মত বলে যায়। ক্লিনটন খুশী হয়ে ব্র্যাকের প্রধান ফজলে আবেদ এর পিট চাপড়ান ও গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুসের সাথে খুশি মনে করমর্দন করেন। এদিকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ হয় এসবের বলির পাঁঠা। ক্লিনটনের নিরাপত্তা উপদেষ্টা গোয়েন্দা কর্মকর্তারা এরই মধ্যে ভাবতে থাকেন প্রেসিডেন্টের জন্য জয়পুরা যাওয়ার ক্ষেত্রে যদি নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকতে পারে, তবে গ্রামে পরিবেষ্টিত সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাওয়া কতটুকু নিরাপদ। বিশেষ করে নিরাপত্তা ঝুঁকির ইঙ্গিতটি যেখানে খোদ সরকারের একটি মহলের পক্ষ থেকেই এসেছে। বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে এমন ইঙ্গিত আসেনি, এসেছে সরকারের রাজনৈতিক মহল থেকে। কিন্তু যেদিক থেকেই আসুক একবার তা ক্লিনটনের নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের কানে পৌঁছার পর তারা ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত নেয় যে, ক্লিনটন তাহলে জাতীয় স্মৃতিসৌধেও আর যাবেন না। পরে সিদ্ধান্তটি সরকারকে জানিয়ে দেয়া হলে একটি মহল তা শেষ পর্যন্ত গোপন রাখার চেষ্টা করে। পরে তা জানাজানি হয়ে গেলে ঢাকার সব মহলেই এক জাতীয় লজ্জাবোধ ও হতাশাবোধ নেমে আসে। এজন্য সবাই আমরিকানদের এই হঠকারী সিদ্ধান্তকে যেমন প্রত্যাখ্যান করে ও নিন্দা জানায়, তেমনি সরকারের এই ব্যর্থতায়ও ক্ষোভ প্রকাশ করে। ক্লিনটন স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত হেলিকপ্টারে যাওয়ার কর্মসূচি ছিল। সেখান থেকে তিনি তার সাথে নিয়ে আসা বুলেট প্রুপ নিয়োজিত গাড়িতে করে জয়পুরা যাওয়ার কর্মসূচি ছিল। সর্বত্রই তাকে নিরাপত্তা কাভার দেয়ার কাজে থাকত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত অপর নিরাপত্তা হেলিকপ্টার। তার সাথে আরও থাকত বাংলাদেশী ও আমেরিকান দুর্ভেদ্য নিরাপত্তা ব্যূহ। শুরু থেকেই সরকার ক্লিনটনের এই সফরকে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে শুরু করে এবং তার এই সফর থেকে যত বেশি রাজনৈতিক ফায়দা লুটা যায় তার পদক্ষেপ নেয়। তাকে নিয়ে জনসভায় বক্তৃতা করানো, নাগরিক সংবর্ধনার নামে রাজনীতি ও সর্বোপরি তাকে দিয়ে ৩২ নম্বরের তার পিতার বাসভবন পরিদর্শনের মত দলীয় প্রস্তাব করা হয়। আওয়ামী লীগ ক্লিনটনের সফর উপলক্ষে এমন কিছু পোষ্টার ছাপায় যাতে শেখ মুজিবের ছবি উপরে বড় করে দেখানো হয়েছে। তার নিচে এক পাশে ক্লিনটনের ছবি, অন্যদিকে শেখ হাসিনার। শহরের বড় বড় ক্রস সেকসনেও বিলবোর্ড

www.pathagar.com

দেয়া হয়; এতে শেখ হাসিনা, প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দিন ও ক্লিনটনের পাশে শেখ মুজিবের বড় মাপের প্রতিকৃতিও স্থান পায়।

ক্লিনটনের জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাওয়া কর্মসূচি বাতিল প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'নিরাপত্তা আশংকার বিস্তারিত তথ্য মার্কিন পক্ষ আমাদের দেয়নি। তবে তারা আভাস ইঙ্গিতে বলেছে-বিপদটি বাংলাদেশের বাইরের কোন অপশক্তির মাধ্যমে ঘটতে পারে।' পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'নিরাপত্তা আশংকার বিষয়টি যেহেতু আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারিনি সেজন্য আমরা এই বক্তব্যে কনভিন্স নই। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থার কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের করণীয়ও কিছু ছিল না। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন জাতীয় স্মৃতিসৌধে না যাওয়ায় প্রধানমন্ত্রীসহ আমরা সবাই মর্মাহত। পুরো জাতি মর্মাহত।' পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ১৯ মার্চ সকালে ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন সি. হোলজম্যান প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে নিরাপত্তা আশংকার কথাটি প্রথমে বলেন। রাষ্ট্রদূত পররাষ্ট্র সচিব সিএম শফি সামীর সঙ্গে যোগাযোগ করে বলেন, জরুরী একটি বিষয় নিয়ে তাঁর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা দরকার। সচিব সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর এ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করেছেন। রাষ্ট্রদূত সেখানে প্রধানমন্ত্রীকে নিরাপত্তার বিষয়টি বললেও তারা যে কর্মসূচিটি বাতিল করতে পারেন বা তালিকা করতে যাচ্ছেন বলে এমন কোন আভাসই দেননি। প্রধানমন্ত্রী সেখানে রাষ্ট্রদূতকে বলেন, বাংলাদেশের কাছে এমন কোন তথ্য নেই। নিরাপত্তা সমস্যার কোন কারণই আমরা দেখছি না। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে বলেন, প্রয়োজনে বাংলাদেশ সরকার ক্লিনটনের ওই কর্মসূচির নিরাপত্তার একক দায়িত্ব নেবে। কিন্তু তারপরও মার্কিন পক্ষকে সম্মত করা যায়নি।' পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাদের অতি সাবধানী ভূমিকার মাধ্যমে এককভাবে কর্মসূচি বাতিল করেছে। আমাদের কোন ভূমিকায় মনোক্ষুণ্ন হয়ে তারা কাজটি করেছে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। সব কর্মসূচি নিয়েই তাদের সঙ্গে আমাদের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ছিল। নিরাপত্তার সব বিষয়ে মার্কিনীদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। পৃথিবীর সব দেশেই তারা এভাবে কাজটি করে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে আমাদের নিরাপত্তা কর্মকর্তা, কর্মীরা সার্বক্ষণিক তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করেছে। সব কর্মসূচিই ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে একক সিদ্ধান্তে তারা গুরুত্বপূর্ণ দুটি কর্মসূচি বাতিল করেছে। যা আমাদের মেনে নিতে হয়েছে।' পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'কর্মসূচিতে স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধার্ঘ্যের বিষয়টি পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করতে আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারা নিরাপত্তার বিষয়ে অতি সাবধানী। তারা রাজি হয়নি। কর্মসূচিটি বাদ পড়ায় আমরা সবাই মর্মাহত।'

২৯ মার্চ জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী প্রশ্নোত্তর পর্বে জাতীয় পার্টির এডভোকেট ফজলে রাব্বীর এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মার্কিন প্রেসিডেন্ট জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাবার ব্যাপারে আমরা সব ধরনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছিলাম। নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ যখন সাভার না যাবার সিদ্ধান্ত নেয় তখন আমাদের কিছু করার ছিল না।' তিনি বলেন, 'ক্লিনটন সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে গেলে বাংলাদেশের জনগণ আনন্দিত হতেন এবং সম্মানিত বোধ করতেন। তবে সাভার স্মৃতিসৌধ যেতে না পারায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট দুঃখ প্রকাশ করেছেন।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা করেছি। জ্বালানি ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অফুরন্ত সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমার

www.pathagar.com

দফতরে দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ আলোচনায় আমরা দুদেশের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের উদ্দেশ্যে ঘন্টাব্যাপী এক ফলপ্রসূ আলোচনা ও মতামত বিনিয়ম করেছি।' আওয়ামী লীগের মেহের আফরোজ চুমকির অপর এক সম্পূরক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বঙ্গবন্ধুর খুনীদের ফেরত পাঠাবার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে দু'দেশের মধ্যে শত্রু বিনিময় চুক্তি নেই।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর খুনীদের ফেরত পাঠাবার ব্যাপারে আশ্বাস পেয়েছি। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বন্দী বিনিময় চুক্তির কপি পাঠানো হয়েছে। আশা করছি শিগগিরই এ ব্যাপারে চুক্তি সম্পাদিত হবে।'

২ এপ্রিল ২০০০ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে আওয়ামী লীগের আব্দুর লতিফ মির্জার (সিরাজগঞ্জ-৪) সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে বিএনপি ও জামায়াতের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের বাংলাদেশ সফর বাতিলের ব্যাপারে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন, 'বিএনপি ও জামায়াত মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের বাংলাদেশ সফর বাতিলের ব্যাপারে ষড়যন্ত্র করেছিল। জাতীয় স্মৃতিসৌধে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের না যাওয়ার ব্যাপারে ষড়যন্ত্র হয়েছে।' তিনি বলেন, 'এ বিষয়গুলো তদন্ত হচ্ছে।' তিনি বিরোধী দলীয় নেত্রীর প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে সরকারের সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে নিরাপত্তা দিতে না পারা সংক্রান্ত বক্তব্য সম্পর্কে বলেন, 'আমি মনে করি তিনি ও স্বাধীনতা বিরোধী চক্র আগ থেকেই প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে না যেতে ও ফুল না দিতে বলে দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের বাংলাদেশ সফরকালে নিরাপত্তা ক্ষেত্রে কোন শৈথিল্য ছিল না।'

৪ এপ্রিল থেকে ১৯ এপ্রিল ২০০০ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে সরকারি সফর হিসেবে উল্লেখ করা হলেও বেসরকারি ব্যক্তি পর্যায়ের সফর ছিল। তার এই সফরে রাষ্ট্রের কোন লাভ হয়নি। যদিও রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে এই সফর অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর সফরে কেবল বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্টতা ছিল যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কোন সংশ্লিষ্টতা ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রে যেসব অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেন সেগুলোর সবকটিই ছিল বেসরকারি অনুষ্ঠান। এছাড়া ঐ অনুষ্ঠানগুলোতে জাতীয়ভাবে বাংলাদেশের কোন স্বার্থ জড়িত ছিল না। এতে জাতীয় কোন লাভও হয়নি। এসব অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত ইমেজই কেবল প্রাধান্য পায়। শুধু পুরস্কার গ্রহণের জন্য এবং কয়েকটি বেসরকারি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেয়ার জন্য বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয় করে বেশ বড় আকারের প্রতিনিধি দল নিয়ে বাংলাদেশের মত একটি গরীব দেশের সরকার প্রধানের সুদূর বিদেশ সফর একটি বিরল ঘটনা। এ ধরনের সফর বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু নয়, যা সাজে কেবল কোন ধনী দেশের একজন সরকার প্রধানের জন্যই। শেখ হাসিনা তার যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি স্কুলে আয়োজিত এক সমাবেশে ভাষণ দেন, পার্ল এস বাক পুরস্কার গ্রহণ করেন, ভার্জিনিয়ার লিঞ্চবার্গ মেয়রের দেয়া সম্বর্ধনা অনুষ্ঠনে যোগ দেন। এসব অনুষ্ঠানের কোনটির সাথেই বাংলাদেশের কোন জাতীয় স্বার্থ জড়িত ছিল না। না তা অর্থনৈতিকভাবে, না কূটনৈতিকভাবে। পক্ষকালব্যাপী এই সফরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সাথে শেখ হাসিনার অন্তত একটা সৌজন্যে সাক্ষাৎকার হলেও তার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল-তাতো ঘটেইনি, মন্ত্রী পর্যায়ের কোন নেতাও তার সাথে সাক্ষাত করেননি। ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের নবনির্মিত বাংলাদেশ দূতাবাস ভবনের উদ্বোধন করেন শেখ হাসিনা। এই কর্মসূচিটিই ছিল শেখ হাসিনার যুক্তরাষ্ট্র সফরকালীন একমাত্র সরকারি কর্মসূচি। এই চ্যান্সারি ভবনটি উদ্বোধনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিলনা। ঐ অনুষ্ঠানটিতেই যুক্তরাষ্ট্রের

www.pathagar.com

দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্ডারফার্থ ও জ্বালানি বিষয়ক উপমন্ত্রী ক্যালভীন হাসকে উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী পক্ষকালব্যাপী আমেরিকা সফরকালে এটিই ছিল আমেরিকান কর্মকর্তাদের সাথে তার একমাত্র যোগাযোগ। ৯ এপ্রিল ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ মিশনের নতুন চ্যান্সারি ভবন উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী সপ্তাহকাল অবস্থান করেন ফ্লোরিডার মায়ামীতে। ঐ সময় মায়ামী থেকে মাত্র ৯০ মাইল দূরে কিউবার হাভানায় অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ শীর্ষ সম্মেলন। এটি ছিল বিশ্বের স্বল্পোন্নত ও গরীব দেশেগুলোর সরকার প্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন। জাতিসংঘে বাংলাদেশ এই দেশগুলো নিয়ে গঠিত গ্রুপের সভাপতি এবং ঐ গ্রুপের সমন্বয়কারী। বাংলাদেশসহ এই দেশগুলোর উপর ধনী দেশগুলোর অর্থনৈতিক চাপ, বাণিজ্যিক চাপ, ঋণের চাপ এবং সর্বোপরি নতুন বিশ্বায়নের চাপ কিভাবে মোকাবেলা করা যায়-সেসব বিষয় নিয়েই সম্মেলনে আলোচনা করা হয়। বেশ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান ঐ সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট আব্দুল ওয়াহিদ ঐ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐ সম্মেলন স্থান থেকে মাত্র ৯০ মাইল দূরে মায়ামীতে অবস্থান করলেও হাভানা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেননি। সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ।

১৯ আগষ্ট ২০০০ সোনারগাঁও হোটেলে সফররত জাপানী প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিরো মোরি এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে গোয়েন্দাগিরির অভিযোগ সংবাদপত্রে প্রকাশ পায়। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, দুই নেতার আনুষ্ঠানিক বৈঠক শুরু হবার আগে দুই মিনিট ফটোসেশন ছিল। ফটোসেশনের পর নির্ধারিত ব্যক্তি ছাড়া অন্যরা বেরিয়ে গেলেও বাসস'র একজন সাংবাদিক এবং গোয়েন্দা সংস্থার তিনজন লোক মূল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নোট নিতে থাকে। বৈঠকের শেষ পর্যায়ে বিষয়টি একজন বিএনপি নেতার নজরে পড়লে বেধে যায় হুলস্থূল। তাদের পরিচয় জানতে চাইলে নিজেদের নিরাপত্তার লোক বলে পরিচয় দিয়ে দ্রুত কেটে পড়ে। বিএনপি নেতৃবৃন্দ বিষয়টি জাপানী দূতাবাস কর্তৃপক্ষের নজরে আনেন। এ ধরনের একটি ঘটনা যে ন্যক্কারজনক এবং সকল প্রকার রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। বন্ধুপ্রতিম দেশের সরকার প্রধান সফরে এসে দেশের বিরোধী দলীয় নেত্রীর সাথে বৈঠক করবেন। সেখানে কারা কারা উপস্থিত থাকতে পারবেন তা আগে থাকতেই ঠিক করা থাকে। এর বাইরে কারো সেখানে অবস্থান করাটা বাঞ্ছনীয় ছিল না কোনোমতেই। তাছাড়া সফররত অতিথির সাথে বিরোধীদলীয় নেত্রীর বৈঠকে সরকার গোয়েন্দাগিরি করবে এটা যেমন গ্রহণযোগ্য ছিলনা, তেমনি দেশের জন্য মর্যাদাকরও নয়। এতে বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আড়ি পেতে কারো কথা শোনা ভদ্রজনোচিত নয়। কারো পেছনে লোক লাগানো আরো অভদ্রতা এবং নিন্দনীয় কাজ। বাসসের একজন সাংবাদিক ও তিনজন গোয়েন্দা সদস্যকে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর বৈঠকে গোয়েন্দাগিরির কাজে নিয়োজিত করে সরকার একটি ঘৃণ্য দৃষ্টান্তই স্থাপন করে। এতে আর যাই হোক, বিদেশের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়নি। বিশেষ করে বন্ধুপ্রতিম দেশ জাপানের কাছে বাংলাদেশের মর্যাদাহানি ঘটেছে। আওয়ামী সরকারের হীনমন্যতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে দেশের মানসম্মান হয়েছে ভূলুণ্ঠিত। জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনে যান সরকার কতোটা নীচ মানসিকতা পোষণ করে। কূটনৈতিক শিষ্টাচার লংঘন করে তারা অন্যের আলোচনায় গোয়েন্দা মোতায়েন করে।

পাকিস্তানের সঙ্গেও সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারে কোন অগ্রগতি হয়নি। বরং শেখ হাসিনা বাংলাদেশে বোমা হামলার ব্যবহৃত বোমার সরঞ্জাম পাকিস্তান থেকে এসেছে বলে মন্তব্য করায় দু'দেশের মাঝে সম্পর্কের অবনতিই ঘটে। ৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে এক

www.pathagar.com

ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সামরিক শাসকদের অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা গ্রহণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহবান জানান। এ আহবানের পরের দিন পাকিস্তানের প্রধান নির্বাহী জেনারেল পারভেজ মোশাররফ নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে একটি নির্ধারিত বৈঠক বাতিল করায় বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। জেনারেল মোশাররফ বৈঠকস্থলে না আসায় এ বৈঠক হয়নি। জেনারেল মোশাররফের অনুরোধে হাসিনা-মোশাররফের বৈঠক আয়োজন করা হয়েছিল। পররাষ্ট্র সচিব সিএম সফি সামী সন্ধ্যায় জাতিসংঘ প্লাজায় সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে বলেন, 'পাকিস্তান বৈঠকের সময়সূচি পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছিল কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পূর্ব নির্ধারিত ব্যস্ত কর্মসূচি থাকায় কর্মসূচি পরিবর্তন করা যায়নি।' পাকিস্তান কর্তৃক এই বৈঠক বাতিল করার কারণ সম্পর্কে ব্যাপক প্রশ্নে জর্জরিত সামী বলেন, 'পাকিস্তান এই বৈঠক বাতিল করেনি। তবে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি আনোয়ারুল করিম চৌধুরী এটিকে আকস্মিক ঘটনা বলে বর্ণনা করেন। জনাব চৌধুরী বলেন, 'প্রকৃত কারণ সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই, তবে আকস্মিকভাবেই এটা ঘটেছে।' জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে প্রদত্ত ভাষণে অবৈধ ক্ষমতা দখল ও যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে শেখ হাসিনার কঠোর মন্তব্যের কারণেই জেনারেল মোশাররফ এই বৈঠক বাতিল করেছেন কিনা এ মর্মে প্রশ্ন করা হলে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ কোন সুনির্দিষ্ট দেশের বিরুদ্ধে ছিল না।' নিউইয়র্কে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেনারেল মোশাররফ জানান যে, শেখ হাসিনার সঙ্গে তার বৈঠক স্থগিত করা হয়েছে এবং জাতিসংঘে শেখ হাসিনা তার ভাষণে পরোক্ষভাবে পাকিস্তানকে আক্রমণ করায় ও কমনওয়েলথের নজীর অনুসারে জাতিসংঘ থেকে পাকিস্তানকে সাসপেন্ড করার দাবী জানানোর প্রেক্ষাপটে তিনি এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। পাকিস্তানের অতীতের তিক্ত আচরণ সম্পর্কে শেখ হাসিনার মন্তব্যের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমাদের অতীত ভুলে যাওয়া উচিত। আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত এবং ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। পাকিস্তানিরা এখনো বাংলাদেশী জনগণকে ভালবাসে।'

ভারতকে প্রভু মেনে পাঁচ বছরে বাংলাদেশ ভারতে যা রফতানী করে আমদানী করে তার চেয়ে বেশি। ফলে বাংলাদেশের পক্ষে ঘাটতি বাড়ছেই। ভারতের সঙ্গে মোট ঘাটতির পরিমান এখন ২৫ হাজার কোটি টাকারও উপরে। বাণিজ্য ঘাটতির অন্যতম কারণ হচ্ছে ভারতীয় নীতি। সাপটা চুক্তিতে বেশ কয়েকটি পণ্যের ব্যাপারে শুল্ক হ্রাস করার কথা বলা হলেও, ভারত তা করেনি। বাজপেয়ী বাংলাদেশ সফরের সময় তিনি ২৫ শ্রেণীতে ১০৯টি বাংলাদেশী পণ্যের শুল্ক ছাড়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ ভারতকে ওই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে রাজি করাতে পারেনি। বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে যাওয়ার কারণে ভারত এটাকে এখন তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইছে। এসব স্পর্শকাতর বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু শেখ হাসিনার আমলে এ ধরনের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। সরকার প্রধান হিসেবে ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে ও ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি তে ভারত সফর করলেও তার সরকার দক্ষিণ তালপট্টিতে বাংলাদেশের কর্তৃত্ব নিশ্চিত করতে পারেনি। ১৯৭৮ সালের মার্চে ভারত বাংলাদেশ সীমানায় জেগে ওঠা এই বিশাল এলাকাটি দখল করে নেয়। সেই থেকে এই অঞ্চলটি ভারতের নিয়ন্ত্রণে। তেলসম্পদ সমৃদ্ধ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এই অঞ্চলটিতে (ব্লক নং-২১) শেখ হাসিনার সময়সীমায় বাংলাদেশ তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। (সূত্র : দৈনিক যুগান্তর ২৮ জুলাই ২০০১)

www.pathagar.com

আওয়ামী আমলে বি.এস.এফ-এর পাদুয়ায় হত্যাকান্ড

২০০১ সালের ১৮ এপ্রিল ভোরে ভারতীয় বিএসএফ নগ্ন হামলা চালিয়েছিল বড়াইবাড়ি গ্রামে। হামলার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছিল বিডিআর আর বীর জনতা। ১৬ জনের লাশ ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল বিএসএফ। ৩ জন বীর বিডিআর সৈনিক শাহাদত বরণ করেছিলেন দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে। বিএসএফ সৈন্যরা যে বেআইনীভাবে বড়াইবাড়ি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ ভূ-খন্ডে প্রবেশ করেছিল তা নিয়ে কারো কোন সন্দেহ ছিল না। ৩০ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম এক সঙ্গে ১৬ জন বিএসএফের মৃত্যু ঘটে।

এর পূর্ব দুই বছরে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে অন্তত ৫১টি সংঘর্ষ হয়েছে। দুই জন বিডিআর সৈনিকসহ ৪৫ জন বাংলাদেশী নাগরিক বিএসএফের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। ২০০১ সালের এপ্রিলের পূর্ব পর্যন্ত সীমান্তের ঘটনায় ঢাকা নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনারকে অন্তত ৬ বার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডেকে পাঠানো হয়েছে। প্রায় প্রতিটি ঘটনায় আওয়ামী সরকারের পক্ষ থেকে তাদের ঘনিষ্ঠ মিত্র ভারতের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবী করা হলেও ভারত থোরাই কেয়ার করেছে। ভারত ক্ষতিপূরণ দেয়া দূরে থাক কোনও ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেনি। নিরীহ গ্রামবাসীকে গুলি করে পাখির মতো হত্যার পক্ষে ভারতের সাধারণ যুক্তি ছিল, তারা অবৈধভাবে ভারতীয় সীমানায় ঢুকে পড়েছে, বিএসএফের অস্ত্র কেড়ে নিয়েছে প্রভৃতি।

'পাদুয়া' ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির দুই দফা অনুযায়ী একটি অপদখলীয় এলাকা। দুই দেশের মধ্যে অপদখলীয় এলাকার তালিকা ও আয়তন নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ১৯৯৭ সালের ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, ২ হাজার ৩শ' ২৬.১৬ একর ভারতীয় জমি বাংলাদেশের অপদখলে এবং ৩ হাজার ২শ' ১৮.৫৬ একর বাংলাদেশের জমি ভারতের অপদখলে রয়েছে। অপরদিকে ভারতের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশের ২ হাজার ৫শ' ৪.৮৯ একর ভারতের অপদখলে এবং ২ হাজার ২শ' ৬০.৮৪ একর ভারতীয় জমি বাংলাদেশের অপদখলে রয়েছে। ভারতের সবচেয়ে বড় বন্ধু আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পরও এ ব্যাপারে জটিলতার অবসান হয়নি। ১৯৯৭ সালের ২৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালেয়র এক সভায় অপদখলীয় এলাকার পরিমাণ যৌথ জরিপের মাধ্যমে নির্ণয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই অনুযায়ী, বেরুবাড়ি ও সিংপাড়া-ক্ষুদিপাড়া এলাকায় অপদখলীয় এলাকার পরিমাণ যৌথ জরিপের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়। ১৯৯৮ সালের ৬ থেকে ১২ আগষ্ট অনুষ্ঠিত মহাপরিচালক/পরিচালক আসাম ও মেঘালয় সেক্টরে সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত যৌথ সম্মেলনে অপদখলীয় এলাকা যৌথ জরিপের মাধ্যমে জমির পরিমাণ নির্ণয়ের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। ৯ সেপ্টেম্বর একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকের কার্যপত্রে লেখা হয়, '১৯৭৪ সালের চুক্তি অনুযায়ী অপদখলীয় এলাকা সংশিষ্ট দেশের কাছে ছেড়ে দেয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্মতি রয়েছে।' উক্ত চুক্তি অনুযায়ী, বাউন্ডারী স্ট্রিপ ম্যাপ উভয় দেশের পে-নিপোটেনশিয়ারি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হওয়ার পর অপদখলীয় এলাকা হস্তান্তর হওয়ার কথা। কিন্তু

www.pathagar.com

স্ট্রিপ ম্যাপ পেনিপোটেনশিয়ারি কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হওয়ার কারণে অপদখলীয় এলাকা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব হয়নি।

কেন এই সংঘর্ষ?

সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার প্রতাপপুর সীমান্তে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তরেখার ২শ' ৫০ গজ ভিতরে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প ছিল। দেশ স্বাধীনের পর অরণ্যবেষ্টিত পাহাড়ী এলাকা পাদুয়ার মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পসহ দু'শ ৩০ একর ভূমি বিএসএফ অপদখল করে নেয়। ক্যাম্পের আশেপাশে বাংলাদেশের জনগণের বসবাস রয়েছে। ১৯৭২ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বিএসএফ সদস্যরা এই ক্যাম্প দখলে রেখে আশপাশের বাংলাদেশীদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে আসছিল। সীমান্ত লাইন থেকে অনেক ভিতরে অবস্থিত বিএসএফ-এর এই ক্যাম্পটি প্রত্যাহারে একাধিকবার আলোচনা হয়েছিল। ১৯৯৯ সাল থেকে বিডিআর-এর উপ-মহাপরিচালক ও বিএসএফ-এর আইজি পর্যায়ে প্রতিটি সভায় পাদুয়া গ্রামটি নিয়ে আলোচনা হয়। বিএসএফ পাদুয়া ক্যাম্পের অবস্থান বাংলাদেশের অভ্যন্তরে-এ কথা স্বীকার করলেও নানা অজুহাতে ক্যাম্পটি সরিয়ে নিতে গড়িমসি করছিল। এই এলাকাটির কাছাকাছি আরও কয়েকটি অপদখলীয় এলাকা রয়েছে। ১৯৯৯ সালের মাঝামাঝি সিলেট সীমান্তের লাতু এলাকা থেকে কয়েকজন বিডিআর সদস্যকে বিএসএফ ধরে নিয়ে যায়। এ সময় বিডিআরের মহাপরিচালক ছিলেন মেজর আজিজুর রহমান। বিডিআর এ সময় পাদুয়া দখলে নিতে বিএসএফকে হুশিয়ারি জানিয়েছিল। এই ঘটনাটি ছাড়া পাদুয়ায় বিএসএফের ফাঁড়ি নিয়ে আর কখনও উচ্চবাচ্য হয়নি। সর্বশেষ ঘটনার দু'মাস আগেও বিএসএফকে চিঠি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। এরই প্রেক্ষিতে বিডিআর ১৫ এপ্রিল ২০০১ রাতে পাদুয়া গ্রাম পুনরুদ্ধার করে এবং সেখানে ৩টি ক্যাম্প স্থাপন করে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে। গ্রামটি পুনরুদ্ধারের সময় কোন পক্ষ থেকে গোলাগুলি হয়নি। পাশাপাশি পাদুয়া গ্রামটি থেকে ৬ কিলোমিটার পশ্চিমে সোনাপুর সীমান্ত পর্যবেক্ষণ চৌকির উল্টোদিকে ভারত একটি পাকা রাস্তা তৈরি করে। সীমান্ত আইন লঙ্ঘন করে জিরো লাইন থেকে ৩০ মিটার দূরে নির্মিত রাস্তা টি নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। ফলে ঐ সীমান্ত এলাকায় দুই দেশের সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। পাদুয়ার ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে, বিএসএফ অবৈধভাবে নোম্যান্সল্যান্ডে রাস্তা নির্মাণ করেছিল। এই নির্মাণ কাজে বাধা দেয়া ছিল বিডিআরের রুটিন মাফিক দায়িত্ব।

ভারতের ইংরেজি দৈনিক টেলিগ্রাফের সংবাদদাতা প্রণয় শর্মা ২০ এপ্রিল ২০০১ নতুন দিল্লী ডেটলাইনে লিখেছেন, 'ভারত ফুটপাথ বিতর্কের প্রসঙ্গটি জনসমক্ষে আনেনি। সীমান্ত গাইড লাইনে বলা আছে, সড়কসহ কোন প্রতিরক্ষামূলক নির্মাণ জিরো লাইনের ১৫০ মিটারের মধ্যে নির্মাণ করা যাবে না। কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিএসএফ নির্মাণ কাজ অব্যাহত রেখেছিল। গত সপ্তাহান্তে বিডিআর ফুটপাথ নির্মাণ বন্ধ করতে ঐ এলাকায় অভিযান চালায়।'

বড়াইবাড়ি অপারেশন

প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বিএসএফ পাদুয়া ঘটনার মাত্র তিনদিনের মধ্যে বড়াইবাড়ি অপারেশন চালায়। বাংলাদেশের বড়াইবাড়ি, হিজলামারী, খেওয়ারচর, বিডিআর ক্যাম্পগুলো যেমন দুর্গম তেমনি অনুন্নত। বিএসএফ'রা ১৬ এপ্রিল দুপুরে বড়াইবাড়ি অপারেশন পরিকল্পনা করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মহেন্দ্রগঞ্জ-কামালপুর পাকা সড়ক নির্মাণ সহজ করা এবং বড়াইবাড়ির চার কিলোমিটার অতি উর্বরা জমি ভারতীয়দের দখলে আনা। ধুবরী, মহেন্দ্রগঞ্জ, গৌহাটি

www.pathagar.com

থেকে রাতেই তিন প্লাটুন ক্যাটস আই কমান্ডো ও দু'শর বেশি অতিরিক্ত বিএসএফ এসে গোপনে অবস্থান নেয় মাইনকারচর ক্যাম্পের আশপাশে। এদিকে বাংলাদেশী পত্রবাহক (বিডিআর-এর বিভিন্ন চিঠি বিএসএফ ক্যাম্পে পৌছায়) লুৎফর রহমান মাইনকারচর বিএসএফ ক্যাম্প ঘুরে এসে বলেছিলেন সেখানে ভারতীয় সেনাসদস্যরাও ব্যাংকারে অবস্থান নিয়েছে। প্রস্তুত আছে মর্টার, কামান, মেশিনগান ও সাঁজোয়া যান। বাংলাদেশ সীমান্তে পর্যবেক্ষণ টাওয়ার না থাকায় বড়াইবাড়ি ক্যাম্পের বিডিআররা বিএসএফ-এর আক্রমণের প্রস্তুতি আগে বুঝতে পারেনি। কিন্তু বিকেল ৫টায় বিএসএফ-এর কাছ থেকে ফ্ল্যাগ মিটিং-এর একটি রহস্যময় প্রস্তাব সম্বলিত চিঠি আসায় বড়াইবাড়ি ফাঁড়ির বিডিআর কমান্ডার নজরুল ইসলামের সন্দেহ হয়। কোন সংঘাত, সংঘর্ষ অঘটন নেই তবুও কেন বিএসএফ ফ্ল্যাগ মিটিং-এর জন্য প্রস্তাব দিল। আসলে বিএসএফ চেয়েছিল ফ্ল্যাগ মিটিং এর জন্য বিডিয়ারের ৫/৬ জন বড়াইবাড়ি ক্যাম্পে ভারতের সীমানায় গেলে তারা বিডিআরদের আটকে রেখে বড়াইবাড়ি হামলা করবে। পরে বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে খবর ছড়ানো হতো বাংলাদেশের বিডিআররা প্রথমে ভারতীয় সীমান্ত এলাকা অতিক্রম করে আক্রমণ করেছে। এই অজুহাতে তাদের বড়াইবাড়ি অপারেশন হতো সাকসেসফুল। ফ্ল্যাগ মিটিং-এর জন্য পাঠানো ওই চিঠিটি ষড়যন্ত্রমূলক মনে হওয়ায় বড়াইবাড়ি ক্যাম্পের কমান্ডার নজরুল ইসলাম ভারতীয়দের পাতানো ফাঁদে পা দেননি। উল্টো রাতে ক্যাম্পে ১০ জন সহযোগীকে তিনি সারারাত সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন। কাঁটাতারের বেড়ার মাঝে পূর্ব অংশের গেট দিয়ে রাত ৩ টার দিকে ভারতীয় কমান্ডো, সেনা ও বিএসএফ-এর প্রায় চারশত' সদস্যের যৌথ-বাহিনী ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে ঢুকে পড়ে বড়াইবাড়ি সীমানায়। শুকিয়ে যাওয়া খাল দিয়ে তারা ক্রস করে এগিয়ে তিনদিক থেকে বড়াইবাড়ি ক্যাম্প আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। এর আগে গেট পেরিয়ে ভারতীয় বাহিনীর বড়াইবাড়িতে ঢুকে পড়ার দৃশ্যটি দেখে ফেলে ঐ গ্রামের মিনহাজ। ভোর সাড়ে ৩টায় ধানক্ষেতে সেচ দিতে গিয়ে মিনহাজ কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে সারি সারি সৈন্য আসছে দেখতে পায়। তখনই সে দৌড়ে খবর দেয় বড়াইবাড়ি ক্যাম্পে। সাথে সাথে ওয়্যারলেসে খবর চলে যায় পার্শ্ববর্তী হিজলমারী ও খেওয়ারচর ক্যাম্পে। ভোর সাড়ে ৪টার দিকে পূর্বদিক থেকে বিএসএফ বড়াইবাড়ি ক্যাম্পে গুলিবর্ষণ যখন শুরু করে তখন প্রথম ১০ মিনিট বিডিআররা ছিল নিশ্চুপ। ভারতীয় বাহিনী এ ঘটনায় মনে করেছিল বিডিআর'রা ক্যাম্প ছেড়ে পালিয়েছে। এরপর তাদের একটি বাহিনী পশ্চিম গ্রামের দিক থেকে একটি দল ক্যাম্পের দিকে অসতর্কভাবে এগুতে শুরু করলে বড়াইবাড়ি বিওপি থেকে বিডিআর-এর চারটি মেশিনগান একযোগে গুলিবর্ষণ শুরু করে। এই মেশিনগান এক একটি মিনিটে সাতশ গুলি ছুঁড়তে পারে। অকস্মাৎ এ আক্রমণে ভারতীয় বাহিনী হতচকিত হয়ে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করে। তারা ভেবে বসে উল্টো দিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে। তাই বিডিআর এর ল্যান্স নায়ক ওহিদুজ্জামান ও ১৬ জন বিএসএফ নিহত হয়। এরপর হিজলমারী ও খেওয়ারচর বিওপি থেকে বড়াইবাড়ি ক্যাম্পের ১০ জন বিডিআর-এর সাথে আরো ১৬ জন বিডিআর যোগ দেন ভারতীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। ভারতীয় বাহিনী সকাল ১০ টা পর্যন্ত বিওপি'র দু'শ গজ দূরে বাংলাদেশের সীমানায় ছিল। জামালপুর থেকে ৩৩ রাইফেল ব্যাটেলিয়ান-এর কমান্ডিং অফিসার লে. কর্ণেল এস জামান-এর নেতৃত্বে অতিরিক্ত বিডিআর বড়াইবাড়িতে পৌছার পর ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের সীমানা ছেড়ে ওপারে পালিয়ে যায়। এরপর লাগাতার প্রায় দু'দিন চলে উভয়পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময়। এই সংঘর্ষে বিএসএফ আরো নিহত হয়েছে বলে জানা

www.pathagar.com

গেলেও নিশ্চিতভাবে সংখ্যা জানা যায়নি। নিহত হন মাহফুজার রহমান এবং আং কাদের নামক আরো দু'জন বিডিআর। আহত হন হাবিলদার আঃ গনি, সিপাহী আঃ রহমান, সিপাহী জাহেদুর, দুলাল বড়ুয়া, নজরুল ইসলাম, আওলাদ হোসেন, নূরুল ইসলাম প্রমুখ। গ্রামবাসীদের মধ্যে আহত হন শেখ সাদী (৪), বিলকিস খাতুন (১২), মকবুল হোসেন (৬০), ছমিরন নেছা (৫৫) এবং গোলাম মোস্তফা (৩৫)। গ্রামবাসীর হাতে ধরা পড়ে অক্ষয় কুমার ও বিমল প্রসাদ নামক দু'জন বিএসএফ সদস্য। পরে বিডিআর উদ্ধার করে মোট ১৬ জন বিএসএফ-এর লাশ। যা পরে ভারতের কাছে হস্তান্তর করা হয়। বিডিআর আরও উদ্ধার করে দু'টি এলএমজি, ১৫টি এসএলআরসহ গুলি, ম্যাগাজিন, জুতা, ওয়্যারলেস সেট প্রভৃতি। এগুলো সবই বিএসএফ-এর। পরবর্তীতে উচ্চ পর্যায়ের চাপে ফ্ল্যাগ মিটিং-এর মাধ্যমে বন্ধ হয় সংঘর্ষ। প্রশমিত হয় উত্তেজনা। ঐ সময়ে ঐ সীমান্তের আশপাশের প্রায় ৩০টি গ্রামের ৩৫ হাজার মানুষ বাড়ি-ঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। এদের ভোগ করতে হয় অবর্ণনীয় কষ্ট ও দুর্ভোগ।

১৮ এপ্রিল ২০০১ দৈনিক যুগান্তরকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে বিডিআরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আ.ল.ম. ফজলুর রহমান বলেন, 'বিনা কারণে রৌমারী সীমান্তে বিএসএফএর গুলিবর্ষণ ও প্রাণহানির জন্য ভারতকে ক্ষমা চাইতে হবে। ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।' বিডিআর-এর মহাপরিচালক আরো বলেন, 'ভারত আমাদের প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র। ভারতকে অবশ্যই বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। বিডিআর-এর একজন সদস্য জীবিত থাকতে পবিত্র মাতৃভূমির এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দেয়া হবে না।' তিনি বলেন, 'আর্ন্তজাতিক আইন লংঘন করে বিএসএফ মর্টারের গোলাবর্ষণ করেছে। বিডিআর-এর কাছে আরো আধুনিক মর্টার শেল রয়েছে। রক্তপাত এড়াতে তা ব্যবহার করা হয়নি।' বিডিআর-এর মহাপরিচালক আরো বলেন, 'আমরা সব সময়ই শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানে বিশ্বাসী। তাই বলে জোর যার মুলুক তার এমন মনোভাব মেনে নেয়া যায় না।' তিনি বলেন, 'বিডিআর আত্মরক্ষা ও ক্যাম্প রক্ষার জন্য গুলি ছুড়েছে। অন্যদিকে বিএসএফ বিনা উস্কানীতে, বিনা কারণে ভোর সাড়ে ৫টায় আন্তর্জাতিক সীমান্ত রেখা অতিক্রম করে বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকে গুলিবর্ষণ শুরু করে।' তিনি বলেন, 'এ ঘটনায় দায়-দায়িত্ব বিএসএফকে বহন করতে হবে।'

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশোবন্ত সিং ১৯ এপ্রিল মন্তব্য করেন যে, 'পাদুয়ায় বিডিআর-এর অবাঞ্ছিত প্রবেশে শেখ হাসিনা সরকারের সায় ছিল না।' এটা তাঁর ভাষায়, a misadventure by local commoanders.

১৯ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বিএনপি'র চেয়ারপার্সন ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কুড়িগ্রামের রৌমারীতে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী কর্তৃক সম্পূর্ণ বিনা উস্কানীতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে বিডিআর ক্যাম্পে আক্রমণের ঘটনার কঠোর প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান। খালেদা জিয়া বলেন, 'রৌমারী বিডিআর ক্যাম্পে বিএসএফ-এর এই আক্রমণ ভারতের আগ্রাসী তৎপরতাই প্রমাণ করে। এর দ্বারা আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইনও নির্লজ্জভাবে লংঘন করা হয়েছে।' তিনি বলেন, 'বর্তমান সরকারের আমলে গত পৌণে ৫ বছরে বিএসএফ অসংখ্যবার সীমান্তে আক্রমণ চালিয়ে নিরীহ মানুষ ও বিডিআর জোয়ান হত্যা করেছে। ভারতীয় দৃঃকৃতিকারীরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেআইনী প্রবেশ করে জমির ফসল ও হালের বলদ নিয়ে গেছে এবং নিরীহ মানুষকে অপহরণ ও জিনিসপত্র লুটপাট করেছে। কিন্তু বর্তমান তাবেদার সরকার এসবের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে কিংবা কঠোর

www.pathagar.com

কোন প্রতিবাদ জানাতে পারেনি বলেই আজ বিএসএফ সীমান্ত অতিক্রম করে রৌমারী বিডিআর ক্যাম্পে হামলা চালাতে পেরেছে।' তিনি সরকারের তাবেদারী ও নতজানু পররাষ্ট্রনীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং ভবিষ্যতে যাতে কখনো আর এমন আগ্রাসী ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা নিশ্চিত করার কার্যকর কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোর দাবী জানান।

একই দিনে বিএসএফ-এর হামলায় ৩ জন বিডিআর নিহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এক বিবৃতিতে বলেন, '৩০ বছর ভারতের দখলে থাকা পাদুয়াবাড়িসহ ২৫০ একর জায়গার নিয়ন্ত্রণভার বিএসএফ-এর কাছ থেকে বিডিআর লাভ করার কারণে বিনা উস্কানীতে কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে বিএসএফ আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিডিআরের উপর হামলা চালায়। বিএসএফ-এর হামলায় কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে ৩০টি গ্রামের মানুষ বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। এ সীমান্তে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে। বাংলাদেশ সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণেই বিএসএফ বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে বিডিআরসহ বাংলাদেশী নাগরিকদের উপর হামলা চালিয়ে তাদের হত্যা, বাংলাদেশের জমি দখল, গরু-মহিষসহ ক্ষেতের ফসল লুট করে নেয়ার সাহস পাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার ভারতের আগ্রাসী হামলা মোকাবিলায় সব সময়ই নতজানু পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করছে, যা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্য রীতিমত অবমাননাকর।' মাওলানা নিজামী নতজানু পররাষ্ট্রনীতি পরিহার করে সিলেট ও কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে বিএসএফ-এর হামলায় ৩ জন বিডিআর হত্যার ব্যাপারে ভারতের কাছে কড়া প্রতিবাদ জানানো ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানান।

ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম বুলবুল এবং সেক্রেটারী জেনারেল নজরুল ইসলাম এক বিবৃতিতে বলেন, 'সীমান্তে ভারতীয় বাহিনীর হামলা নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে যা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী মানসিকতার প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই ভারত একের পর এক বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপ নিয়ে আসছে। বাংলাদেশের সরকারগুলো সব সময় ভারতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করতে চাইলেও বৃহৎ শক্তি হওয়ার খায়েশে দেশটি প্রায়ই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সর্বশেষ আজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সীমান্ত চৌকী দখলের মতো ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজ করেছে।' নেতৃবৃন্দ বর্তমান সরকারের ভূমিকার নিন্দা জানিয়ে বলেন, 'সকল ক্ষেত্রে ভারতের তল্পীবহন করার মানসিকতার কারণেই বাংলাদেশ ভূখন্ডের প্রতি সরাসরি হুমকি সৃষ্টি করার সাহস দেখিয়েছেন ভারত।' নেতৃবৃন্দ বলেন, 'আমরা আশা করি সরকার ভারতের এই দুঃসাহসের কড়া জবাব দেবে। অন্যথায় দেশের জনগণ ধরে নেবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের এই অনুপ্রবেশে সরকারের নীরব সমর্থন ছিল।'

২০ এপ্রিল বিকেলে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় পররাষ্ট্র সচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী বলেন, 'আজ আর কোন গুলি চলেনি। সীমান্ত অবস্থা সম্পূর্ণ শান্ত।' পররাষ্ট্র সচিব সাংবাদিকদের জানান, 'সিলেটের তামাবিল এলাকার পাদুয়া থেকে বাংলাদেশ রাইফেলস বা বিডিআর-এর ঘেরাও তুলে নেয়া হয়েছে। ভারতও তার বিরোধপূর্ণ রাস্তাটি ভেঙ্গে দিয়েছে।' পররাষ্ট্র সচিব বলেন, 'বিএসএফ নির্মিত রাস্তাটি নিয়েই ছিল সমস্যা। ঘটনার সূত্রপাত

www.pathagar.com

এখানেই। দু'দেশের সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে বৈঠক হয়েছে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা রাস্তাটি ভেঙ্গে দিয়েছে। আমরাও ঘেরাও তুলে নিয়েছি। পাদুয়ায় আমাদের কর্তৃত্ব বহাল রয়েছে।' পররাষ্ট্র সচিব বলেন, 'পাদুয়ায় বরাবরই বাংলাদেশের লোকজন কাজ কর্ম করে আসছে। সেখান থেকে নুড়ি পাথর নিয়ে আসছে। সেখানে একটি বিএসএফ ক্যাম্প রয়েছে। তারা ঐ ক্যাম্পের সাথে সংযোগকারী একটি রাস্তা নির্মাণ করায় সমস্যার সৃষ্টি হয়। রাস্তাটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, এখন বিএসএফ ক্যাম্পটিও যাতে তারা তুলে নেয়, সে জন্য আলোচনা চলছে।' রৌমারী প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, 'আজ ফ্লাগ মিটিং দু'দফায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।' তিনি জানান, 'বিকেলেও বৈঠক চলছিল। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারত বিএসএফকে বড়াইগ্রাম থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে। বিডিআরও আমাদের দিকের আন্তর্জাতিক সীমানার মধ্যে রয়েছে।' পররাষ্ট্র সচিব জানান, 'বিএসএফের ১৫টি লাশের ময়না তদন্ত হয়েছে। লাশগুলো আজই জামালপুরের কামালপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করার কথা ছিল। কাল না হয়ে থাকলে আজ হস্তান্তর হবে। যে দু'জন আহত বিএসএফ সদস্যদের চিকিৎসা চলছে, তারা সুস্থ হয়ে উঠলে তাদেরকেও ফেরত দেয়া হবে।' সীমান্তে বিডিআরের কর্মকান্ডের জন্য আগে থেকে সরকারের অনুমতি নেয়া হয়েছিল কিনা-এ মর্মে এক প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, 'তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার বিডিআর-এর রয়েছে। আমাদের সীমান্তে কেউ আক্রমণ করলে, তা প্রতিহত করার অধিকার তাদের রয়েছে। এ ব্যাপারে স্ট্যান্ডিং অর্ডার রয়েছে এবং এটা তাদের চার্টার্ড ডিউটি।' ভারতপক্ষে বহু হতাহত হয়েছে-এ ব্যাপারে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, 'এটা খুবই স্বাভাবিক যারা আগে আক্রমণ করবে, তাদের পক্ষেই বেশি হতাহত হবে।' পররাষ্ট্র সচিব বলেন, 'সীমান্ত সংঘর্ষের কারণে দু'দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন বিরূপ প্রভাব পড়বে না।' অপর এক প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, 'পাদুয়ায় বিএসএফ-এর সাথে নিয়মিত সেনাবাহিনীর পরিবহন দেখা গেছে।' তিনি বলেন, 'বিডিআর-এর সমর্থনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কাজ করেনি। কোন সৈন্যকেই সেনানিবাসের বাইরে মোতায়েন করা হয়নি।'

একই দিনে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্রও বলেন, 'বাংলাদেশ ও ভারতের নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যকার ৫ দিনের সীমান্ত সংঘর্ষের অবসান ঘটেছে। গুলি বিনিময় বন্ধ হয়েছে।' তিনি বলেন, 'ভারত মনে করে, বাংলাদেশেও ভারতের সুদীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। সীমান্ত ব্যবস্থাপনা নিয়ে সমস্যা হতেই পারে এবং সময়ে সময়ে সে সমস্যার সমাধানও হতে পারে।' নতুন করে আবার সংঘাত হবে কি-না এ মর্মে এক প্রশ্নের উত্তরে ভারতীয় মুখপাত্র বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি সীমান্তে শান্তি বহাল থাকবে।'

তবে একই দিনে দেশের অন্যান্য সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। ভারত ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে বিএসএফ-এর শক্তি বৃদ্ধি করে। কুড়িগ্রামেও জনগণের মধ্যে শঙ্কা ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করে। উত্তেজনাও অব্যাহত ছিল। সুন্দরবন থেকে ঈশ্বরদী পর্যন্ত বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় প্রচণ্ডভাবে। এলাকা ছেড়ে নিরাপদে চলে যায় অনেক পরিবার। কুড়িগ্রাম সীমান্তে হামলা ও যুদ্ধ চলায় গোটা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তের বিওপিতে বিএসএফ তাদের জনবল ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে। বিএসএফ-এর ফাঁড়ি ও চৌকিতে ভারী অস্ত্রও আনা হয়। এদিকে বাংলাদেশের সীমান্তে বিডিআর-এর প্রহরাও জোরদার করা হয়। সতর্কাবস্থায় রাখা হয় বিডিআর বাহিনীকে। সুন্দরবন থেকে মিরপুর (কুষ্টিয়া) হয়ে ঈশ্বরদী

www.pathagar.com

পর্যন্ত প্রায় ৭৭৪ কিলোমিটার এলাকায় বিডিআর-বিএসএফ মুখোমুখি অবস্থান করে। উল্লেখ্য, দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ২০০০ সালে বিএসএফ কমপক্ষে অর্ধশতবার হামলা চালিয়েছে। উস্কানীমূলকভাবে তারা কয়েকজন বিডিআরকে গুলি করে হত্যাসহ কমপক্ষে ১৮/১৯ জন সাধারণ নাগরিককে হত্যা করেছে। এ অঞ্চলের সীমান্তবর্তী জমিতে চাষ করার সময় বহুবার বিএসএফ হামলা করেছে। বহু লোককে ধরে নিয়ে গেছে। ইছামতি নদীতে বাংলাদেশী বহু জেলেকে ভারতীয় বিএসএফ গুলি করে হত্যা করেছে। বাংলাদেশের ভূখন্ড দক্ষিণ তালপট্টিতে ১৯৮০ সালের দিকে বিএসএফ গুলি চালিয়ে ২৫ জন বাংলাদেশী জেলেকে হত্যা ও বহু জেলেকে ধরে নিয়ে যায়। এ অঞ্চলে বিডিআর সতর্কাবস্থায় ছিল। বাংলাদেশের সাথে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় আকস্মিক শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। বিএসএফ এর সাথে পাঠানো হয় বিশেষ কমান্ড বাহিনী। তারা সীমান্ত এলাকায় টহল দেয় ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। যশোর-বেনাপোল সীমান্তে বিডিআর-এর শক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি সতর্কাবস্থায় রাখা হয়। রাতে গ্রামবাসীরাও বিডিআর এর সাথে পাহারা দেয়। বিএসএফ কাঁচাপাকা সড়কগুলোতে ভারী যানবাহন, ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে টহল দেয়। রৌমারী সীমান্তের ওপারে বিএসএফ-এর পোষাকে হাজার হাজার ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যরা ভারতীয় অস্ত্রশস্ত্রসহ অবস্থান করে। ১৯ এপ্রিল দিবাগত গভীর রাত থেকে উভয় পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় বন্ধ থাকলেও বিডিআর প্রস্তাবিত সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে পরের দিন সকাল ১০টার নির্ধারিত ফ্লাগ মিটিং-এ বিএসএফ-এর অনমনীয় ও দুরভিসন্ধিমূলক মনোভাবের কারণে অনুষ্ঠিত হয়নি। ফলে ২০ এপ্রিল ঐ সীমান্তে চরম উত্তেজনা বিরাজ করে। তবে বিকেল ৫ টা ৩০ মিনিটের দিকে বড়াইবাড়ি সীমান্তের ১০৬৬ নং আন্তর্জাতিক সীমানা পিলারের কাছে বিডিআর-বিএসএফ এর সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে ফ্লাগ মিটিং শুরু হয়। বিডিআর এর পক্ষে সেক্টর কমান্ডার কর্ণেল এনায়েত করিম এবং বিএসএফ-এর পক্ষে ডিআইজি জে সিংহ ফ্লাগ মিটিংয়ে নেতৃত্ব দেন। দিনভর ফ্লাগ মিটিং অনুষ্ঠিত না হওয়ায় জনগণের মধ্যে উৎকণ্ঠা এবং ভীতি বিরাজ করতে থাকে। নতুন করে সংঘর্ষের আশঙ্কায় শত শত মানুষ বিভিন্ন গ্রাম থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। হামলার পর থেকে ৩ দিন ধরে বাড়িঘর ছাড়া প্রায় ৩৫ হাজার মানুষ এখানে-সেখানে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করে। সীমান্তবর্তী ৪০ গ্রামের কৃষি কাজ স্থবির হয়ে পড়ে। সেচের অভাবে বোরো ক্ষেতগুলো শুকিয়ে ঠন ঠন করে। ২০ এপ্রিল সকাল ৮টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে রৌমারী সীমান্তে সংঘর্ষে নিহত একজন বিএসএফ সহ ১৫ জন এবং ১ জন বিডিআর নিয়ে মোট ১৬টি লাশের ময়না তদন্ত সম্পন্ন হয়। লাশগুলো ময়নাতদন্ত করেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডা. আনোয়ার হোসেন ও প্রভাষক ডা. আবুল মনসুর। ময়না তদন্ত শেষে বিএসএফ-এর ১৫টি লাশ ট্রাকযোগে বিকেলে শেরপুর জেলার জামালপুরের সীমান্তবর্তী ঝাওডাঙ্গা ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। এদিকে নিহত বিডিআর আঃ কাদের এর লাশ রাষ্ট্রীয়ভাবে তার গ্রামের বাড়ি মুক্তাগাছা উপজেলার বন্দগোয়ালীয়ায় দাফন করা হয়। পঞ্চগড়ের বাংলাবন্দ ও খাগড়া সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ সদস্যদের তৎপরতার প্রেক্ষিতে জেলার সমগ্র ২২০ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করে। এর আগে ২০ এপ্রিল জেলার আকাশে ভারতীয় জেট জঙ্গী বিমানের প্রবেশের ফলে আতঙ্কগ্রস্থ জনসাধারণ প্রাণ বাঁচানোর জন্য ছুটাছুটি করতে

www.pathagar.com

থাকে। এদিকে বিএসএফ পঞ্চগড়ে সদর উপজেলার তেঁতুলিয়া ও খাগড়া পয়েন্টে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে।

২১ এপ্রিল সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত জুড়ে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করে। সীমান্তের গ্রামবাসীরা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দিন যাপন করেন। এদিকে সীমান্ত সংঘর্ষে নিহত যে ১৫ জন সদস্যের লাশ ভারতের নিকট হস্তান্তর করা হয়, ভারত অভিযোগ করে তাদের লাশ বিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ভারতের প্রতিবাদে বলা হয়, 'বিএসএফ সদস্যদের ধরে নিয়ে নির্যাতন চালানো হয়েছে এবং কুড়িগ্রাম সীমান্তে বিডিআর বিএসএফ সংঘর্ষে ১৬ জন বিএসএফ সদস্য নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারত কড়া মনোভাব গ্রহণ করে বাংলাদেশের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবাদ জানায়। ভারতের আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদটি ভারতের নিযুক্ত বাংলাদেশ হাই কমিশনার মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করে নিয়ে হস্তান্তর করা হয়। নয়াদিল্লী থেকে ইউএনআই-এর খবরে বলা হয় যে, 'ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ১৬ জন বিএসএফ কর্মী নিহত হওয়ায় কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছেন।' ভারতের একজন সরকারি মুখপাত্রের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা জানায়, 'বিডিআর কর্মকর্তারা ভারতের নিকট বিকৃত লাশ হস্তান্তর করেছে। এ খবরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী বিচলিত হয়েছেন। বলা হয়েছে তাদেরকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করা হয়েছে-বাজপেয়ী বর্তমানে মেঘালয় রাজ্যের শিলং-এ অবস্থানরত বিএসএফ মহাপরিচালক ও পুলিশের আইজিকে অবিলম্বে নয়াদিল্লী ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি আহমেদাবাদে অবস্থানরত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আদভানীর সাথেও কথা বলেছেন এবং দিল্লী ফিরতে বলেছেন। ভারতের প্রতিবাদে আরো বলা হয়েছে যে, নিহতদের শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন রয়েছে। ভারতের একজন মুখপাত্র বলেছেন, বাংলাদেশের এই আচরণ মেনে নেয়া যায় না।' নয়াদিল্লী থেকে বাসস-এর খবরে বলা হয়, 'ভারত তার প্রতিবাদে আরও উল্লেখ করেছেন যে, নিহত বিএসএফ সদস্যদের লাশের সাথে অমানবিক আচরণ করা হয়েছে এবং অনেক দেরীতে তাদের লাশ ফেরত দেয়া হয়েছে বলে ভারতের সরকারি মুখপাত্র বলেন। ভারতের পররাষ্ট্র সচিব সাংবাদিকদের বলেছেন, তিনি বাংলাদেশ পররাষ্ট্র সচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলীর সাথে এ ব্যাপারে টেলিফোনে কথা বলেছেন।

২১ এপ্রিল ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার মনিলাল ত্রিপাঠি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপর পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিবিসিকে জানান, 'সীমান্তে গত কয়েক দিনের সংঘর্ষ এবং প্রাণহানির ঘটনা নিয়ে তারা আলোচনা করেন।' এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হয় যে ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবাদ করেছে সে ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার কি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমরা এটা খুব গুরুত্ব সহকারেই দেখবো। আফটার দ্যা শূটিং তাদের টর্চার করা হয়েছে কিনা আমরা দেখবো।' বিবিসি প্রশ্ন করে, 'সে দেখাটা কিভাবে দেখবেন সেটা তদন্ত করে দেখবেন?' পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'হ্যাঁ আমরা তদন্ত করে দেখবো।' বিবিসির প্রশ্ন ছিল, 'এটিতো সাম্প্রতিক সময়ে বড় ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা এবং বেশ প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। এটা কেন হলো এবং কারা এর নির্দেশ দিয়েছে?' পররাষ্ট্রমন্ত্রী উত্তরে বলেন, 'এ ঘটনা ঘটেছে পাদুয়ায় রাস্তা নির্মাণ নিয়ে। তারপর এটা কিভাবে বাড়লো সে ব্যাপারে খবর নিচ্ছি। কিন্তু যতটুকু জেনেছি, ঐ রাস্তাটা তৈরি করার সময় আমাদের বিডিআর সদস্যরা বাধা দেয়।' বিবিসির প্রশ্ন ছিল, 'সেক্ষেত্রে পুরো ঘটনা মিলে কোন তদন্ত হবে?' পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'নিশ্চয় আমরা এটা

www.pathagar.com

তদন্ত করে দেখবো।' অপর এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'ভারত ক্ষোভ প্রকাশ করলে যেভাবে দেখতে হয় তাই দেখছি। তাদের ক্ষোভ তো তারা প্রকাশ করবেই। তাদের রাইট আছে ক্ষোভ প্রকাশ করার।' তিনি বলেন, 'দুই দেশের মধ্যে আমাদের ভাল সম্পর্ক আছে এবং যে কোন ঘটনা হোক-আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তার নিষ্পত্তি করতেই হবে।'

এদিকে ঢাকায় বাংলাদেশ পররাষ্ট্র সচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী প্রেস ব্রিফিংকালে বলেন, '১৮ এপ্রিল সীমান্ত সংঘর্ষকালে নিহত বিএসএফ সদস্যের শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন রয়েছে-ভারতের এই অভিযোগের তদন্ত করবে বাংলাদেশ সরকার। তদন্তের পর বিষয়টি ভারতকে অবহিত করা হবে।' নিহত বিএসএফ সদস্যদের লাশের ময়না তদন্ত হয় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের দিয়ে। তারা বলেছেন, 'বিএসএফ সদস্যরা নিহত হয়েছে গুলিতে। তাদের শরীরে বুলেট বিদ্ধ হওয়ার চিহ্ন রয়েছে। নির্যাতনের কোন চিহ্ন শরীরে ছিল না।' এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র সচিব জানান, 'গ্রামবাসীরা বিএসএফ সদস্যদের উপর নির্যাতন চালিয়েছেন কিনা যা ভারত দাবী করছে-তা তদন্ত করে দেখা হবে। তবে আক্রমণকারীরা গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়লে এমনটা ঘটতেই পারে-এটা অস্বাভাবিক নয়। তবে এটা একটা জঘন্য কাজ।' পররাষ্ট্র সচিব বলেন, 'ভারতের প্রধানমন্ত্রী যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আমাদের উত্তরে তার প্রতিফলন থাকবে।' পররাষ্ট্র সচিব বলেন, 'সীমান্তে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। ২৪ ঘন্টায় কোথাও কোন গোলাগুলি হয়নি।' তিনি বলেন, '২০ এপ্রিল রৌমারীতে অনুষ্ঠিত সেক্টর কমান্ডার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, গুলি বিনিময়ের সময় উভয় পক্ষে আরো কেউ নিহত হয়েছেন কিনা তা অনুসন্ধান করা হবে।' সিলেটের পাদুয়া গ্রাম সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্র সচিব বলেন, 'পাদুয়া বাংলাদেশের ছিল, বাংলাদেশের আছে এবং বাংলাদেশেরই থাকবে। পাদুয়ায় বিডিআর প্রহরা দিচ্ছে। আমরা ভারতকে অনুরোধ করছি-বিএসএফ ক্যাম্পটি তুলে নিতে।'

অপর এক খবরে বলা হয়, 'প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলবেন বলে ভারতে পত্র-পত্রিকায় যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, ভারতের একজন মুখপাত্র তা নাকচ করে দেন।'

বড়াইবাড়িতে রাতের আধারে সীমান্ত অতিক্রম করে শত শত ভারতীয় সৈন্যের বাংলাদেশে অবৈধ অনুপ্রবেশ, বিডিআর সৈন্যদের হত্যা, বাংলাদেশের গ্রাম লুট ও জ্বালিয়ে দেয়ার ঘটনায় যখন সারাদেশ ভারতের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করার দাবী উঠেছে ঠিক তখনই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২ এপ্রিল দিবাগত রাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে আধাঘন্টাব্যাপী এক টেলিফোন সংলাপে বসেন এবং এই সময়ে শেখ হাসিনা ৩ বার ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিডিআরের ভূমিকায় (বীরত্বের জন্য) দুঃখ প্রকাশ করেন। এদিকে নিজ দেশে বাজপেয়ী সরকারের মুখ রক্ষা করতে শেখ হাসিনা দুঃখ প্রকাশ করলে ভারতীয় পক্ষ থেকে তাদের দেশে শেখ হাসিনার ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে এ ঘটনার দায়ভার এককভাবে বিডিআর প্রধানের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু বিডিআর প্রধান মেজর জেনারেল ফজলুর রহমান দৈনিক মানবজমিন পত্রিকায় (২১-৪-২০০১) দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমার বিশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর এতে সমর্থন থাকবে। এই আস্থা নিয়েই আমি অগ্রসর হয়েছি। আমি প্রধানমন্ত্রীকে চিনি। খুব কাছ থেকে দেখেছি।' পত্রিকাটি আরও জানায়, 'ভূমি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে বিডিআর প্রধানকে নিরুৎসাহিত করলে তিনি নিজ উদ্যোগে এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম তেহেলকা ডটকম জানায়, 'নির্বাচন

www.pathagar.com

যতই ঘনিয়ে আসছে প্রধানমন্ত্রী (শেখ হাসিনা) ততই শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এবং সেনাবাহিনী ও মৌলবাদীদের কাছে ঘেঁষতে তাকে এ কৌশল নিতে হয়েছে। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ও মৌলবাদীরা ভারত বিদ্বেষী। বর্তমান উত্তপ্ত পরিবেশে থেকে দেখিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে বাংলাদেশ ছেড়ে কথা বলে না। শেখ হাসিনার জন্য ভোট আদায়ের এটি একটি কৌশল মাত্র।'

দ্যা ষ্টেটম্যান ২০ এপ্রিল সংখ্যায় 'বাংলা পলিটিক্স বিহাইন্ড ফায়ারিং' শীর্ষক খবরে বলা হয়, 'বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত উত্তেজনা বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতির অংশ হতে পারে.....নির্বাচন সন্নিকটে এবং আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলের জন্য ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। ভারত বিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে বিএনপি মৌলবাদীদের হাত করতে সমর্থ কিন্তু আওয়ামী লীগের ভারতপন্থী ইমেজ রয়েছে। নির্বাচন সামনে রেখেই মৌলবাদীদের হাত করতেই আওয়ামী লীগ সরকার ভারত বিরোধী একটি ইমেজের অধিকারী নিজেদের করতে চায়।'

হিন্দুস্তান টাইমস এই দিন তাদের সম্পাদকীয়তে বলেন, 'নির্বাচনী সুবিধা অর্জনের স্বার্থে বরাবরের মত ভারত বিরোধী সেন্টিমেন্ট মোকাবেলার জন্য ঢাকা এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে।' অন্য এক প্রতিবেদনে টাইমস অব ইন্ডিয়া বলে, 'শেখ হাসিনা নির্বাচনের আগে ভারতের পুতুল বলে নিজের পরিচিতিকে মুছে ফেলতে চান।'

টেলিগ্রাফ ইন্ডিয়ার খবরে বলা হয়, 'বাংলাদেশে নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। এমন অবস্থায়...শেখ হাসিনা সরকারের কড়া ভারত বিরোধী মনোভাব গ্রহণ ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।' বাংলাদেশের চিন্তাশীল পাঠকের পত্রিকা পাক্ষিক 'চিন্তা' অনেকের বরাত দিয়ে বলে, 'অনেকে মনে করেন এটা বাজপেয়ীর ও হাসিনা সরকারের পাতানো খেলা।' (সূত্রঃ পাক্ষিক চিন্তা, ১৫ মে, ২০০১)

২৬ এপ্রিল পাদুয়া গ্রাম পরিদর্শন শেষে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আইডি স্বামী বলেন, 'বাংলাদেশের মত প্রতিবেশী দেশগুলোর কাছ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার যে ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে তার মোকাবেলায় সীমান্তরক্ষী বাহিনীতে স্থানীয় লোকদের মোতায়েন করা হলে তা সহায়ক হতো। পাদুয়া-২ গ্রামে কতগুলো সীমান্ত পিলার দেখার পর মিঃ স্বামী গ্রামবাসীদের এই মর্মে আশ্বাস দেন যে, 'এই বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই ভূমি আমাদেরই থাকবে।' তিনি বলেন, 'এই গ্রাম রক্ষার দায়িত্ব বিএসএফ ও স্থানীয় গ্রামবাসীর।' মিঃ স্বামী ধৈর্য্যের সঙ্গে গ্রামবাসী ও বিএসএফ সদস্যদের বক্তব্য শোনেন এবং তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন যে, অবিশ্বাস ও সত্যিকার যোগাযোগের অভাবের কারণেই বিডিআর গ্রামটি দখল করতে সক্ষম হয়েছিল।

বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার তদন্ত প্রতিবেদন

রৌমারীর বড়াইবাড়ি সীমান্তে ১৮ এপ্রিলের বিএসএফ-বিডিআর সংঘর্ষের কারণে সাধারণ মানুষের প্রচুর ক্ষতিসাধিত হয়। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্ত বায়ন সংস্থার তদন্ত পরিচালক এডভোকেট এলিনা খানের নেতৃত্বে বিষয়টি সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার পক্ষ থেকে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত দল গঠিত হয়। তদন্ত দল ৭ দিন ধরে উপরোক্ত বিষয়টি তদন্ত করে। তদন্ত দল ঘটনাস্থল পরিদর্শনসহ বিভিন্ন উৎস থেকে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে সংক্ষিপ্তভাবে প্রাথমিক প্রতিবেদন তুলে বলা হয় :

www.pathagar.com

তদন্ত দলের উদ্দেশ্য

(ক) তদন্তের মাধ্যমে তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে মতামত তৈরি করা,

(খ) প্রকৃত বিষয় উদ্‌ঘাটন করে সরকারসহ জনগণকে জানানো,

(গ) এক্ষেত্রে নারী ও শিশু কতটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং তাদের বর্তমান অবস্থা কি জানা,

(ঘ) প্রয়োজনে ভিকটিমদেরকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা সহ অন্যান্য সাহায্য করা।

রৌমারী বড়াইমারী সীমান্তে ১৭-০৪-২০০১ ইং তারিখ শেষ রাতে অর্থাৎ ১৮-০৪-২০০১ইং তারিখ ভোরে আনুমানিক ৪টা থেকে ৪-৩০টার দিকে বিএসএফের সদস্যরা রৌমারী বিডিআর বিওপি অর্থাৎ বড়াইবাড়ি সীমান্ত ফাঁড়িটি আক্রমণ করে। তখন ঐ ফাঁড়িতে একজন নায়েক সুবেদার, একজন হাবিলদার ও ৯ জন সিপাহীসহ একজন পাচক ছিলেন।

১৮-০৪-২০০১ ইং তারিখে ভোরের দিকে ক্যাম্পের পাশের বড়াইবাড়ি গ্রামের একটি ছোট ছেলে পানি আনার জন্য ঘরের বাইরে বের হয়। তখন দেখতে পায় বিডিআর ক্যাম্পের আশপাশের ধানক্ষেত্রের ভেতর আইলের মধ্যে দিয়ে অনেক (শত শত) বিএসএফ সৈনিক বসে আছে। এই অবস্থা দেখে ছেলেটি দৌড়ে বাড়ির ভেতরে চলে যায় এবং তার বড় ভাইকে দেখার জন্য ডেকে নিয়ে আসে। বড় ভাই বিএসএফ সৈন্যদের দেখে বুঝতে পারে বিডিআর ক্যাম্প আক্রমণ বা অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে বিএসএফদের। তখন বড় ভাই তাড়াতাড়ি দৌড়ে বিডিআর ক্যাম্পে গিয়ে খবর দেয় বিডিআর সদস্যদের। তখন হাবিলদার নজরুল ইসলাম বিএসএফদের বাংলাদেশ সীমান্তের মধ্যে দেখে ক্যাম্পের ভেতরে সবাইকে প্রস্তুত হতে এবং খবর সরবরাহকারী ব্যক্তিকে দিয়ে গ্রামবাসীকে সরে যেতে বলে। বিএসএফ সৈন্যরা আনুমানিক ৩০০ থেকে ৪০০ জন বিডিআর-এর ক্যাম্প চতুর্দিক থেকে ঘিরে আক্রমণ শুরু করে। বিডিআর ১১ জন মিলে বিএসএফের ৩০০ থেকে ৪০০ সৈন্যকে প্রতিহত করতে থাকে। ইতিমধ্যে বিডিআর সিপাহী ওয়াহেদ মৃত্যুবরণ করেন (এখানে উল্লেখ্য যে, বিডিআর-এর বিওপিটি ছিল উঁচু মাটির ওয়ালে চতুর্দিক ঘেরা। যার ফলে বিডিআর-এর সদস্যরা কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল এবং অপর দিকে বিএসএফ সৈন্যরা ছিল ধানক্ষেত এবং কাদামাটির মধ্যে যা তাদের অবস্থানের প্রতিকূলে ছিল) আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে জামালপুর সিও লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মোঃ শাহেরুজ্জামানকে জানানো হয় বড়াইবাড়ি ক্যাম্পে আক্রমণের কথা এবং যে ১১ জন বিডিআর রয়েছে তাদের গুলি প্রায় শেষ এবং বিএসএফের সৈন্যরা মর্টার ও রাইফেল এবং স্টেনগানের গুলি ব্যবহার করছে। জামালপুর থেকে তখনই দুই প্লাটুন সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হন লেফটেন্যান্ট কর্ণেল শাহেরুজ্জামান। তার সাথে দুই প্লাটুনে মোট ৪০ জন বিডিআর সৈন্য ছিল। কর্ণেল শাহেরুজ্জামানের পৌছানোর ঘন্টা খানেকের মধ্যে এক প্লাটুন বিডিআর সৈন্য নিয়ে মেজর আতিয়ার রহমান ঘটনাস্থলে পৌছান। জামালপুর থেকে ৪০ জন সৈন্য নিয়ে কর্ণেল শাহেরুজ্জামান জিঞ্জিরাম নদী পর্যন্ত এসে পৌছেন এবং স্থানীয় লোকদের সহায়তায় লেঃ কর্ণেল শাহেরুজ্জামান তার দলবল নিয়ে বিডিআর বিওপির কাছাকাছি গ্রামে এসে পৌছান। এরপরে ক্যাম্পের কাছেই আছে আরও একটি ছোট খাল। সেই খালপাড়ে যখন বিডিআর-এর সিও এসে পৌছান, তখন দেখতে পান বিডিআর ক্যাম্পটি চারদিক থেকে ঘিরে আছে বিএসএফের সৈন্যরা। (তখন সময় সকাল আনুমানিক ১০ থেকে ১০-৩০ মিনিটের মত, বিডিআর ও স্থানীয় লোকদের বক্তব্য মতে)। ১০-৩০ মিনিট পর্যন্ত এভাবে ফায়ার চলতে থাকে। কোনভাবেই বিডিআর-এর সৈন্যরা (জামালপুর থেকে আগত) ক্যাম্পের ভেতর প্রবেশ করতে পারছিল না। তখন কিছু সৈন্যরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কৌশলের সঙ্গে পাল্টা আক্রমণ

www.pathagar.com

চালায় বিএসএফের উপর পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব ও দক্ষিণ পশ্চিম দিকে (স্থানীয় লোকদের ভাষ্য)। বিডিআর-এর ৬ জনের আরেক দল হিজলমারী থেকে খবর পেয়ে গ্রামের মধ্য দিয়ে উত্তর দিকে এসে বিএসএফের উপর আক্রমণ করে। ত্রিমূখী আক্রমণে তখন ভারতীয় বিএসএফের সৈন্যরা মাঝে পড়ে যায় এবং অনেকেই মাঝে পড়ে মারা ও আহত হয়। তখন খালের পাড় দিয়ে ধানক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে বিএসএফ সৈন্যরা দৌড়ে ভারত সীমানায় চলে যায় এবং সেই সময় বিএসএফের সৈন্যরা নিহত এবং আহতদের কাঁদে বা টেনে নিয়ে গেছে। (স্থানীয় লোকদের ভাষ্য, যারা ঘটনার সময় বিডিআরদের রসদ ও খাদ্য দিয়ে সাহায্য করেছে) তাদের ভাষ্য অনুযায়ী ১৬ জন নয়, আরো অনেক নিহত ও আহত হয়েছে, যা ভারত সরকার নিজেদের দোষ ও দুর্বলতা ঢাকার জন্য গোপন রেখেছে।

* এই সময় বিডিআর-এর সিও লে. কর্ণেল শাহেরুজ্জামানের নেতৃত্বে বিডিআর-এর সৈন্যরা রৌমারী-বড়াইবাড়ি সীমান্ত ক্যাম্পে প্রবেশ করেন এবং পূর্ব ও দক্ষিণ কর্ণার দিকে অবস্থানরত সৈন্যদের (বিএসএফ)-এর সাথে গোলাগুলি চলতে থাকে বিডিআরের সৈন্যদের। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিডিআর ক্যাম্পের পূর্ব ও দক্ষিণ পাশে ৫০ গজের মধ্যে বিএসএফের ৫টি লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। ঐ লাশগুলো যখন স্থানীয় জনগণ আনতে যায়, তখনও বিএসএফএর সৈন্যরা ফায়ার করতে থাকে এবং বিডিআর ক্যাম্পের পশ্চিম দিকে অর্থাৎ বাংলাদেশের একদম ভিতরে ৭টি লাশ পড়ে থাকে। অন্যান্য লাশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে ছিল।

* মর্টারের আঘাতে বড়াইবাড়ি বিওপির আশপাশের ৪টি বাড়ি খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং বিএসএফএর সৈন্যরা ১৮-০৪-২০০১ইং তারিখে প্রায় ৮০টি ঘর আগুনে পুড়িয়ে দেয়। উভয়পক্ষের মধ্যে ১৯-০৪-২০০১ইং তারিখ পর্যন্ত গোলাগুলি চলতে থাকে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিএসএফের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হয় শান্তির জন্য কিন্তু ১৯-০৪-২০০১ইং তারিখ পর্যন্ত কোন সাড়া পাওয়া যায়নি (বিডিআর-এর ভাষ্য মতে)। কিন্তু ২০-০৪-২০০১ইং তারিখে সকালে বিএসএফের পক্ষে সাদা ফ্লাগ উড়িয়ে দু'টো বাচ্চা দিয়ে চিঠি পাঠায় মিটিং করার জন্য, তখন বিডিআর-এর পক্ষ থেকেও মিটিংয়ের জন্য চিঠি পাঠানো হয় এবং সাদা পতাকা উড়ানো হয়। সাদা পতাকা ও চিঠি পাওয়ার পর বিডিআর গোলাগুলি বন্ধ রাখে। কিন্তু বিএসএফের পক্ষ থেকে তখনও থেমে থেমে গুলি চলতে থাকে (স্থানীয় লোকের বক্তব্য)। সেই দিনই উভয়পক্ষের মিটিং হয় এবং পরবর্তীতে লাশ হস্তান্তর করা হয়।

* এ মিটিংয়ের প্রস্তাব দেয়া হয় ভারতীয় বিএসএফের ৩০ জন নিরস্ত্র সৈনিক ও বাংলাদেশী বিডিআর ৩০ জন নিরস্ত্র সৈনিক মিলে বাংলাদেশের মধ্যে গোলাগুলি এলাকাটি সার্চ করবে। কিন্তু বাংলাদেশের বিডিআর পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়া হয় এবং বিডিআর-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, কেন এই প্রস্তাব– তখন তারা জানায় যদি তাদের কোন লাশ বা ডকুমেন্টস অথবা কিছু থেকে থাকে, তাহলে তারা আনবে। যেহেতু তারা এখন ১৫টি লাশ পেয়েছিল। পরবর্তীতে বিডিআর খুঁজে আরও একটি শিখের লাশ পায় বাংলাদেশের মধ্যে একটি শ্যালো মেশিনের কাছে। তিনদিন পরে থাকায় লাশ তখন পচন ধরেছে। সেই লাশটি বাংলাদেশ হস্তান্তর করে এবং একই সঙ্গে ভারতীয় সৈন্যদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র ফেরত দেয়।

* এই লাশটি মিলে মোট ১৬টি মৃত দেহ উদ্ধার করে বিডিআর এবং ২ জনকে আহত অবস্থায় আটক করে। আর বিডিআর পক্ষে মৃত্যুবরণ করে ৩ জন। বিএসএফের দেয়া আগুনে বড়াইবাড়ির প্রায় ৮০টি ঘর পুড়ে নারী ও শিশুরা সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কোলের

www.pathagar.com

শিশুরা খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ পাচ্ছে না, স্কুলে যাওয়ার ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনা করতে পারছে না খাদ্য, বস্ত্র, বইপত্রের অভাবে। তারা ঘটনার দিন এক কাপড়ে বাসা থেকে দূরে চলে যায়। ফিরে এসে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অবস্থায় পায় তাদের ঘরবাড়ি। এর মধ্যে প্রথম রেড ক্রিসেন্টের পক্ষ থেকে কিছু সাহায্য পৌঁছেছে এবং সরকার কর্তৃক প্রথম সাহায্য ৫-০৪-২০০১ইং তারিখে সেখানে পৌঁছায়, তার মধ্যে আছে ত্রিপল, কিছু শাড়ি এবং হাঁড়ি পাতিল, খাদ্য সামগ্রী। কিন্তু শিশুদের পোশাক, খাদ্য, ওষুধ, কিছুই পৌঁছায়নি। ছেলেমেয়েদের অনেকের পরীক্ষা সামনে, তারা কি করবে বুঝতে পারছে না। এ পর্যন্ত বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশে আক্রমণ ও নিহতদের তালিকা নিম্নরূপ :

সাল	দুর্ঘটনা	নিহত	আহত
১৯৯৬	১৩০	১৩	১৮
১৯৯৭	৩৯	১১	১১
১৯৯৮	৫৬	২৩	১৯
১৯৯৯	৪৩	৩৩	৩৮
২০০০	৪৭	২৫	৩৯
২০০১	১০	৬৯	১৩
মোট	৩২৫	১১৪	১৩৯

উপরোল্লিখিত তালিকায় গত ৬ বছরে ভারতের বিএসএফের আক্রমণে ৮ জন বিডিআর নিহত এবং ৯ জন আহত হয়েছে। বাকী সবাই সাধারণ মানুষ নিহত ও আহত হয়েছে বিএসএফ কর্তৃক, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন (এখানে উল্লেখ্য যে, ৮ জন নিহত বিডিআর-এর মধ্যে ৫ জন পূর্বে আর বাকি ৩ জন নিহত হন ১৮-০৪-২০০১ইং তারিখে বিএসএফের আক্রমণে)

মামলা সংক্রান্ত তথ্য

বড়াইবাড়ি ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে ৫জন এলাকাবাসী জিডি করেন। যার নম্বর জিডি নং-৬৮৫, তারিখ ২৯-০৪-২০০১ইং, সময় ২০-৩০ মিনিট, রৌমারী থানা, জেলা-কুড়িগ্রাম।

আবেদনকারীর ক্ষতির বিবরণ

১। মোঃ আং রহিম
পিতা-শমেগ উদ্দিন
গ্রাম-বড়াইবাড়ি
থানা-রৌমারী, জেলা-কুড়িগ্রাম।

ক্ষয়ক্ষতি- টিনের ঘর ৪টির মূল্য প্রায় ১ লাখ টাকা, খড়ের ঘর ৪টির মূল্য ৪০ হাজার টাকা, দোকানের মালামাল, গৃহস্থালীর মালামাল ১ লাখ টাকা, মোট ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা।

২। মোঃ ছামছুল হক
পিতা-হাবিবুর রহমান
গ্রাম-বড়াইবাড়ি
থানা-রৌমারী, জেলা-কুড়িগ্রাম।

ক্ষয়ক্ষতি-টিনের ঘর ১টির মূল্য ৩০ হাজার টাকা, খড়ের ঘর ১টির মূল্য ১০ হাজার টাকা, হাঁস-মুরগি, ধান-চাল ও গৃহস্থালী মালামালের মূল্য ৬০ হাজার টাকা, মোট ১ লাখ টাকা।

www.pathagar.com

৩। মোঃ তাহেজ উদ্দিন
পিতা-মৃত ইসমাইল দেঃ
গ্রাম-বড়াইবাড়ি
থানা-রৌমারী, জেলা-কুড়িগ্রাম।

ক্ষয়ক্ষতি-টিনের ঘর ১টির মূল্য ৪০ হাজার টাকা, খড়ের ঘর ১টির মূল্য ১০ হাজার টাকা, হাঁস-মুরগি ও গৃহস্থালী মালামালের মূল্য ৮৫ হাজার টাকা, মোট ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা।

৪। মোঃ আঃ সাত্তার
পিতা-মৃত ইসমাইল দেঃ
গ্রাম-বড়াইবাড়ি
থানা-রৌমারী, জেলা-কুড়িগ্রাম।

ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ ঃ টিনের ঘর ২টির মূল্য ৬০ হাজার টাকা, খড়ের ঘর ১টির মূল্য ১০ হাজার টাকা, ধান-চাল ও অন্যান্য মালামালের মূল্য ৫০ হাজার টাকা, মোট ১ লাখ ২০ হাজার টাকা।

স্থানীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক অভিযোগপত্রের বিবরণ

মোঃ নুরুজ্জামান (বকুল) রৌমারী ইউনিয়ন রৌমারী থানায় মামলা দায়ের করতে গেলে থানা কর্তৃপক্ষ সেটা জিডি হিসেবে গ্রহণ করে। উক্ত জিডি নং-১৪, তারিখ ০১-০৫-২০০১ইং, রৌমারী থানা, জেলা-কুড়িগ্রাম। জিডির বিষয়বস্তু নিম্নরূপ-

১। বিগত ১৮ এপ্রিল ২০০১ ইং তারিখ সকাল ৫ ঘটিকায় বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার বড়াইবাড়ি সীমান্ত বরাবর ভারতীয় বিএসএফ ৩০০ সদস্য আন্তর্জাতিক সীমারেখা অতিক্রম করে বাংলাদেশের ভূখন্ডের ভেতর প্রবেশ করে এবং বড়াইবাড়ি বিডিআর সীমান্ত ফাঁড়িতে আক্রমণ করে। এই আক্রমণে তারা ভারী অস্ত্র ও মর্টার ব্যবহার করে।

২। উক্ত আক্রমণে গ্রামের ঘরবাড়িসহ লুটতরাজ এবং গ্রামের লোকজনকে মারধর করে ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। বিপুল গবাদিপশুও নিধন করে। এরপর বড়াইবাড়ি সীমান্ত ফাঁড়িতে ১০ জন বিডিআর সৈনিকের উপর ভাড়ী অস্ত্র ও মর্টার হামলা চালায়। সীমান্ত ফাঁড়িটি দখল করার জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। বিডিআর সৈনিক ১ জন নিহত হয় অপর একজন আহত হয়। বাংলাদেশের বিডিআর কর্তৃপক্ষ বিএসএফকে গোলাগুলি করতে নিষেধ করে, তারপরও তারা নিষেধ না মেনে ১৮ এপ্রিল ২০০১ সকাল ৫টার সময় ফাঁড়ি দখলের জন্য আক্রমণ চালায়। এক পর্যায়ে বিডিআর আত্মরক্ষার জন্য পাল্টা ধাওয়া করে। এরপর বিএসএফের অগ্রগামী দল বিডিআর ক্যাম্প বিওপি দখলের অপচেষ্টা চালায়। অতঃপর তারা বড়াইবাড়ি গ্রামে অবস্থান নেয় ও বিওপি আশপাশের এলাকায় গুলি অব্যাহত রাখে। তাদের গোলাগুলি ১৯ এপ্রিল ২০০১ রাত ২১-০০ ঘটিকা পর্যন্ত অব্যাহত রাখে।

৩। এমতাবস্থায় উভয় রাষ্ট্রের কূটনৈতিক পর্যায়ে যোগাযোগের প্রেক্ষিতে গোলাগুলি কমানোর সিদ্ধান্ত নেয় এবং বিএসএফ বাহিনী রাত ১১-৩০ মিনিটে গোলাগুলির তীব্রতা কমিয়ে আনে। ২০ এপ্রিল ২০০১ ভোর ৪টার সময় তারা বড়াইবাড়ি ত্যাগ করে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে।

৪। উল্লেখিত বড়াইবাড়ি সীমান্তে ভারতীয় আক্রমণে ৩ জন বিডিআর সৈনিক মৃত্যুবরণ করে এবং ৫ জন আহত হয়। অপরদিকে বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে ভারতীয় বিএসএফ ১৬ জন নিহত, ২ জন আহত অবস্থায় বিডিআর ও গ্রামবাসীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। উল্লেখ্য,

www.pathagar.com

ভারতীয় বিএসএফ পিছু হটার সময় তাদের নিহত সহকর্মী ছাড়াও বিপুল সংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডে রেখে যায়।

৫। প্রাথমিক অবস্থায় মৃত ১৫ জন বিএসএফ সদস্যের লাশ যথাযথ ময়না তদন্তপূর্বক বিগত ২০ এপ্রিল ২০০১ তারিখ ১৭-৪৫ মিনিটে জামালপুর জেলার কমলাপুর থানার বিপরীতে ভারতের মহেন্দ্রগঞ্জ বিওপিতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তীতে বড়াইবাড়ি এলাকায় ২০ এপ্রিল ২০০১ তল্লাশি কালে অপর ১ জন ভারতীয় জোয়ানের লাশ উদ্ধারের পর ময়না তদন্ত পূর্বক ২২ এপ্রিল একই স্থানে মহেন্দ্রগঞ্জে হস্তান্তর করা হয়। এক পর্যায়ে আহত অবস্থায় আটক অপর ২ জন বিএসএফ জোয়ানকে হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তীতে ২৫ এপ্রিল ২০০১ বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে ভারতীয়দের ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র হস্তান্তর করা হয়।

৬। উদ্ভূত ঘটনাবলির আলোকে ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক অনুরূপ এবং পূর্বাভাস ব্যতিরেকে আন্তর্জাতিক সীমানা লংঘনপূর্বক বাংলাদেশের ভূখণ্ডে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ ও আক্রমণ আন্তর্জাতিক রীতিনীতির পরিপন্থী এবং যুদ্ধাপরাধের শামিল। উপরোক্ত তাদের আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগের কারণে বড়াইবাড়ি গ্রামে বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১ কোটি টাকার উপরে এবং বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক উক্ত আক্রমণ ভারতীয় সরকারের নির্দেশে পরিচালিত হয়-এই মর্মে সংবাদপত্র থেকে অবগত হয়ে এমতাবস্থায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদেরকে দায়ী করত বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক বড়াইবাড়ি গ্রামে ও বিডিআর বিওপি আক্রমণ, হত্যা, নারী অবমাননা, লুণ্ঠন চালানোর অপরাধসমূহ নথিভুক্ত করতঃ নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নামে মামলা দায়েরের জন্য বলা হয়।

১। শ্রী গুরুচরণ জগত
মহাপরিচালক, বিএসএফ
নয়াদিল্লী, ভারত।

২। শ্রী ডি.কে.গৌর
আইজিবিএসএফ,
এএমএম এন্ড এন, ভারত।

আক্রমণে সরাসরি অংশগ্রহণকারী ও মদদ দানকারী অন্য সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা ব্যক্তিবর্গ।

এই ছিল রৌমারী ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের জিডির সারমর্ম। মামলা গ্রহণের পরিবর্তে আমলযোগ্য অপরাধে কেন সাধারণ ডায়রী হিসেবে গ্রহণ করা হল-এসপিকে তদন্ত দল জিজ্ঞাসা করলে জানান, অভিযোগটি আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এসবি ও আইজি বরাবর ফ্যাক্সের মাধ্যমে পাঠিয়েছি। তাদের নির্দেশ পেলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

তদন্ত দলের মতামত ঃ জনগণই ক্ষমতার উৎস, সেটা আরেকবার প্রমাণিত হল রৌমারী বর্ডারে। সেদিন যদি বিডিআর-এর পাশে বড়াইবাড়ি এবং আশপাশের জনগণ এগিয়ে না আসত, তাহলে আজ বিডিআর-এর একার পক্ষে জয়লাভ করা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ? তদন্ত দল বিভিন্ন স্থানে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে তদন্ত করে জানতে পারে, ১৭-৪-০১ ইং তারিখে শেষরাত্রে অর্থ্যাৎ ১৮-০৪-২০০১ ইং ভোরে রৌমারীর বড়াইবাড়ি ফাঁড়িটি প্রথম আক্রমণ করে বিএসএফ-এর সৈন্যরা। এই আক্রমণের মূল কারণ ছিল বড়াইবাড়ি গ্রামসহ ফাঁড়িটি দখল করে নেয়া। তদন্ত দল ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেছে, বড়াইবাড়ি বিডিআর ফাঁড়িটি থেকে বিএসএফ-এর ফাঁড়ির দূরত্ব ৬০০-৭০০ গজ হবে। তাহলে বাংলাদেশ সীমানার ৬০০-৭০০ গজ ভেতরে এসে

www.pathagar.com

বিডিআর ক্যাম্পে আক্রমণ করার কি কারণ ছিল। নিছক গোলাগুলি হলে ধরে নেয়া যেত শুধুমাত্র সীমান্ত উত্তেজনার ফসল এটা। কিন্তু ভোররাতে বিডিআর-এর ফাঁড়ি পুরো এলাকা ঘিরে ভারী অস্ত্রসহ আক্রমণ করার মধ্যে বোঝা যায়, এটা পরিকল্পিত এবং অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কারণ বিএসএফ ৩০০-৪০০ জন সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করে বিডিআর ক্যাম্পটি। যখন বড়াইবাড়ি ক্যাম্পের পশ্চিম পার্শ্বে ৫০ গজের মধ্যে ৭টি লাশ পাওয়া যায় তাদের প্রত্যেকের প্রায় শরীরে ছিল বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট। বিএসএফ মর্টার ও স্টেনগানের মত ভারী অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে-তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিডিআর বিওপি'র ওয়ালে আক্রমণের চিহ্ন দেখে। শুধু তাই নয়, বিএসএফ সুপরিকল্পিতভাবে বড়াইবাড়ি বিডিআর ক্যাম্পটি আক্রমণ করেছে, যেমন ঃ ১৮-০৪-০১ ইং তারিখ সকাল ৬টায় একই সময়, একই দিনে তিন জায়গায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কোম্পানি কমান্ডারকে ফ্ল্যাগ মিটিং-এ ডাকা হয়। কোন কারণ ছাড়াই কেন ডাকা হয়েছে তাদের, সেটা অনেকে পরে বুঝতে পেরেছেন। যেখানে পূর্বের ইতিহাসে সকাল ৯টা-১০টার আগে ফ্ল্যাগ মিটিং বলতে গেলে কখনোই হয়নি। সেখানে হঠাৎ করে সেদিনই একসঙ্গে তিন জায়গায় খুব সকালে কেন ফ্ল্যাগ মিটিং ডাকা হল? এতে পরিস্কার হয়ে যায়, এর পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র লুকিয়ে ছিল। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বড়াইবাড়ির বিওপি আক্রমণের মধ্য দিয়ে।

বিএসএফ-এর সৈন্যরা বড়াইবাড়ি গ্রামের লোকদের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে এবং বলেছে, গ্রামের লোকদের এলাকা ছেড়ে চলে যেতে। যদি তারা শুধু বিডিআরকে আক্রমণ করবে তাহলে গ্রামবাসীকে কেন চলে যেতে বলবে। কারণ একটি, তা হল-এলাকাটি দখল করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। আন্তর্জাতিক যুদ্ধরীতি লংঘন করে তারা নিরীহ গ্রামবাসীর বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে তাদের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন করেছে। নারী ও শিশুদের তারা চরম অসহায় অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। এই সংঘর্ষে বিডিআর অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা পালন করে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ৩৩ রাইফেল ব্যাটেলিয়ানের অধিনায়ক লে. কর্ণেল শাহেরুজ্জামানের নেতৃত্বে ৪০ জন এবং মেজর আতিয়ার রহমানের নেতৃত্বে ২০ জন বিডিআর জামালপুর ও ময়মনসিংহ থেকে সংঘর্ষস্থলে পৌছায়। পাশ্ববর্তী হিজলতলী বিওপি থেকে আসে আরও ৬ জন বিডিআর জওয়ান। সর্বমোট ৭৭ জন বিডিআরকে লড়তে হয় তাদের প্রায় ৫ গুণ বেশি সংখ্যক বিএসএফ-এর সাথে এবং বিডিআর-এর এই সাহসী প্রতিরোধে আক্রমণকারী বিএসএফ সদস্যরা শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য হয়। আমরা বিস্তারিত তদন্তে জেনেছি, বিএসএফ অনুপ্রবেশ করে বড়াইবাড়ি বিওপি'র পূর্ব ও দক্ষিণ দিক থেকে এবং পশ্চিম দিক থেকে বিওপি ও বিওপি'র পূর্বে অবস্থিত গ্রামবাসীকে ঘেরাও করে ফেলে। বিডিআরকে তখন লড়তে হয় পুরো অবরুদ্ধ অবস্থায়। বেলা ১০টার দিকে লে. কর্ণেল শাহেরুজ্জামান ও মেজর আতিয়ার রহমানের নেতৃত্বে মোট ৩ পাটুন বিডিআর অবরুদ্ধ বিডিআর-এর সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেলেও তারা বিওপি পর্যন্ত পৌছতে পারেনি। বিওপি ও তাদের মাঝখানে তখন বিএসএফ এর অবস্থান। ঐ অবস্থায় তারা বিওপি'র বিডিআরদের কোনরকম টিকে থাকার নির্দেশ দিয়ে নিজেদের পজিশন থেকে ফায়ার ওপেন করেন। পরিস্থিতিতে বিএসএফ দ্বিমুখী অবস্থান নিতে বাধ্য হয়। তারা আক্রমণ চালাতে থাকে বিওপিকে লক্ষ্য করে এবং একই সাথে লে. কর্ণেল শাহেরুজ্জামানের নেতৃত্বে অবস্থানরত বিডিআরদের লক্ষ্য করে। উত্তর পার্শ্বে থেকে হিজলতলী বিওপি'র বিডিআররা ফায়ার ওপেন করলে বিএসএফ তখন ত্রিমুখী পাল্টা আক্রমণের শিকার হয়ে ক্রমশ পিছু হটতে থাকে। বড়াইবাড়িতে প্রায় ৮০টি পরিবার

www.pathagar.com

মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তদন্ত দল বড়াইবাড়ি গ্রাম আগুনে পোড়ানোর সময় প্রত্যক্ষদর্শী বয়স্ক গোলজাহা বেগমের কাছ থেকে জানতে পারে, গ্রাম ছেড়ে সবাই পালিয়ে গেলে ওই সংঘর্ষের সময় গোলজাহা সেখানেই অবস্থান করছিলেন তার স্বামীসহ। তার ভাষ্য, আমি ওদের ভাষা বুঝতে পারিনি। প্রথমে ওরা আমার গোয়ালঘর ও ...াঘরে আগুন দেয়। এ সময় আমি ওদের কাছে কাকুতি মিনতি করলে 'ভাগ যাও' বলে আমাকে ধমকে ওঠে। ওরা ঘরবাড়িতে আগুন লাগাচ্ছিল, আর সেই আগুনের দিকে তাকিয়ে হাসছিল।

* বিএসএফ এর প্রায় সৈন্যদের শরীরে ছিল বুলেট প্রুফ জ্যাকেট। এর কারণ কি ছিল? আগে থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করা।

* বিএসএফ-এর সৈন্যরা বড়াইবাড়ি ক্যাম্পটি যখন আক্রমণ করে, তখন তারা মর্টার, স্টেনগানসহ আরও অনেক ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে? তদন্ত দল মনে করে, যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে না, সেখানে ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সাধারণ নিরীহ মানুষের ওপর এবং কয়েকজন সৈনিকের ওপর আক্রমণ করার মধ্যে হিংসাত্মক মনোভাব পরিলক্ষিত হয় বিএসএফ-এর। যা দু'দেশের জন্য মোটেও মঙ্গলজনক নয়।

* বিএসএফ সৈন্যদের প্রায় লাশ পাওয়া গেছে বিডিআর বড়াইবাড়ি ফাঁড়ির ৫০-৭০ গজের মধ্যে। এ থেকে অতি সহজেই অনুধাবন করা যায়, বিএসএফ বড়াইবাড়ি বিডিআর ফাঁড়িসহ পুরো এলাকাটি দখল করার অভিপ্রায়ে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে। কিন্তু এলাকার মানুষ এবং পরিবেশ তাদের প্রতিকূলে থাকায় তাদের বিশাল বাহিনী মাত্র কয়েকজন দেশপ্রেমিক বিডিআর-এর অসীম সাহসিকতার কাছে পরাজয় বরণ করে।

* ভারতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিডিআরকে দোষারোপ করা হয়েছে যে, বিডিআর ভারতের ভূখণ্ডে ঢুকে বিএসএফ-এর সৈন্যদের হত্যা করেছে অথবা বিএসএফ সৈন্যদের ধরে এনে নির্যাতন করে হত্যা করেছে। তদন্ত দল সীমান্ত এলাকার কাছ থেকে দেখেছে যে, বিএসএফ-এর ফাঁড়িটিসহ সীমান্ত এলাকা কাঁটাতারে ঘেরা। প্রশ্ন জাগে, ১৮ জন সুস্থ ভারতের জওয়ানকে কিভাবে তার কাঁটার বেড়া ভেদ করে এবং ভারতের সীমান্ত ফাঁড়ির চোখ ফাঁকি দিয়ে বিডিআর আনল? যদি ভারতের কথা সত্যি ধরা হয় তাহলে ভারতের লজ্জা পাওয়ার কথা। কারণ, তাদের নিরাপত্তা বেষ্টনী এত দুর্বল এবং তাদের সেনা সদস্যরা এত কাপুরুষ যে, তারা কোন প্রতিরোধ ছাড়াই বিডিআর-এর কয়েকজন সদস্যকে দেখে চলে আসে এবং অন্য সদস্যরা এদের ধরে আনা দেখে পালিয়ে যায়।

অবশ্য এটা শুধুমাত্র কল্পনাই করা যায় কিনা সন্দেহ, বাস্তবে তদন্ত দলের বলার কিছুই নেই। যারা রৌমারী-বড়াইবাড়ি সীমান্তে গিয়েছেন সেসব প্রত্যক্ষদর্শী জানান, কাঁটা তারের বেড়া, বেইলি ব্রীজ পার হয়ে কখনও তার মধ্যে হুট করে ঢোকা সম্ভব নয়, তেমনি ১৮ জন মানুষকে আনা সম্ভব কিনা প্রশ্নবোধক? তদন্ত দল প্রমাণ পেয়েছে, বিএসএফকে হত্যা বা নির্যাতন কোনটাই করা হয়নি। তারা সংঘর্ষে মৃত্যুবরণ করে।

* কারণ সিলেট সীমান্তে বিডিআর পাদুয়া নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। এর প্রতিশোধ হিসেবে রৌমারী সীমান্তে বিএসএফ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে বিডিআরকে আক্রমণ করে এবং তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বিএসএফ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে অর্থাৎ সীমান্ত লংঘন করায় বাংলাদেশের উচিত ছিল ঘটনাটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরা। সীমান্ত এলাকার গ্রামাবাসীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। কেউ বাড়ি ফিরে যেতে পারছে না। সরকারের উচিত সীমান্ত সমস্যার সমাধান করা। বড়াইবাড়ির স্থানীয় লোকদের অভিযোগ, ভারত সীমান্তে ওদের অনেক মন্ত্রী এসে দেখে গেল, আর আমাদের একটি মন্ত্রী এলো না দেখতে।

www.pathagar.com

* উভয় দেশের সরকার আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের কথা বললেও ভারতের সীমান্তে শক্তি বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাংলাদেশের মানুষকে হতাশ ও আতঙ্কিত করে তুলেছে। ভারত যেহেতু বাংলাদেশের বন্ধু দেশ, সেহেতু উভয়ের মধ্যে স্থিতিশীল সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং ভবিষ্যতে সব ধরনের ঘটনা এড়াতে আলোচনার পাশাপাশি স্পর্শকাতর বিষয়সমূহের সমাধান করতে উভয়কে বিশেষ করে ভারতকে নমনীয় হতে হবে।

তদন্ত দলের মতামতের ভিত্তিতে সুপারিশমালা

১। বড়াইবাড়ি গ্রামে বিএসএফ কর্তৃক ৮০টি ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার কারণে প্রায় ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করছে, তাদের পরণের কাপড় ছাড়া আর কিছুই নেই। তাই তাদের জন্য সরকারকে অবশ্যই অবিলম্বে থাকার ও খাবারের ব্যবস্থা করা উচিত। একই সঙ্গে অনতিবিলম্বে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক নারী ও শিশুদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ব্যবস্থা অতি জরুরী ভিত্তিতে করা প্রয়োজন।

২। সাধারণ গ্রামবাসীর জান-মালের ওপর বিএসএফ এ ধরনের অমানবিক, নিষ্ঠুর কার্যকলাপ করে আন্তর্জাতিক নিয়ম লংঘন করেছে, এই অভিযোগে বাংলাদেশ সরকার অবশ্যই ভারতের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে।

৩। আত্মরক্ষার অধিকার সংবিধানসহ দেশের প্রচলিত আইনে দেয়া আছে। এ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার স্বার্থে যদি কেউ প্রতিঘাত করে এবং এ কারণে কেউ মারা গেলে বা আহত হলে সে জন্য প্রতিরোধকারী দায়ী হবে না। এ ক্ষেত্রে বিডিআর আত্মরক্ষার্থে যা করণীয় তাই করেছে এবং তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেছে। অল্পসংখ্যক বিডিআর সদস্য যে বিপুল সংখ্যক বিএসএফ দেখে ভয়ে পলায়ন বা আত্মসমর্পণ করেনি, সেজন্য বাংলাদেশের মানুষ তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। এ জন্য তাদের প্রাপ্য সম্মান দেয়া উচিত। তদন্ত দল মনে করে, একই ঘটনায় যদি নিহতরা শহীদ হয় এবং রাষ্ট্রীয় সম্মান পায় সে ক্ষেত্রে যুদ্ধনীতি অনুযায়ী যুদ্ধের ক্ষেত্র থেকে ফেরত সৈন্যরা অর্থ্যাৎ গাজীরা কেন রাষ্ট্রীয় সম্মান পাবে না? তাই তাদের প্রকৃত সম্মান দেয়া হোক।

৪। সংস্থার তদন্ত দল মনে করে, রৌমারী-বড়াইবাড়ি বিডিআর ক্যাম্পসহ এলাকাটি দখল করার উদ্দেশ্যে বিএসএফ আক্রমণ করে। এর জন্য দায়ী ভারতের বিএসএফ-এর সৈন্যরাই। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের উচিত ভারত সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবাদ জানানো। বিনা উস্কানীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে অবৈধভাবে প্রবেশ এবং বিডিআরসহ সাধারণ মানুষের জান-মালের ক্ষতিসাধন করায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিষয়টি উত্থাপন করা।

৫। সরকারের উচিত সকল সীমান্ত ফাঁড়ির যোগাযোগ ব্যবস্থা জরুরী ভিত্তিতে উন্নত করা। না হলে যে কোন সময় বাংলাদেশ একটু একটু করে নিজেদের জায়গা হারাবে।

৬। বিডিআর ক্যাম্পে আরও বেশি বিডিআর সৈন্য মোতায়েন করা এবং তাদের আধুনিক অস্ত্রসহ দক্ষ ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কারণ, দেশরক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাদের ওপর।

৭। যে কোন আমলযোগ্য অপরাধের ঘটনায় স্থানীয় থানা কর্তৃপক্ষ মামলা নিতে বাধ্য। যেখানে বিএসএফ-এর সদস্যরা ঘর-বাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে, মালপত্র লুটতরাজসহ ক্ষতি সাধন করেছে, সেখানে মামলা না নেয়ার কি কারণ থাকতে পারে, তা আমাদের বোধগম্য নয়।

এক্ষেত্রে সরকারের উচিত অনতিবিলম্বে জিডিকে মামলায় রূপান্তরিত করা। কারণ, আমলযোগ্য ঘটনায় জিডি হয় না, সেটা সরাসরি মামলা হয়। তারপর তদন্ত সাপেক্ষে চার্জশীট

www.pathagar.com

অথবা ফাইনাল রিপোর্ট হবে। যদি কেউ আমলযোগ্য অপরাধে জিডি গ্রহণ করে, তাহলে ধরে নেয়া হবে সে ইচ্ছা করে এই ধরনের কাজ করছে। তাই তার বিরুদ্ধে দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এই ব্যাপারে সরকার অথবা যে কোন সংস্থা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উচিত জিডিকে মামলায় রূপান্তরিত করতে কেন দেরী হল, এজন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮। যা ঘটে গেছে তা সত্যিই দু'দেশের জন্য দুঃখজনক। ভবিষ্যতে যাতে এরকম না হয় সে চিন্তাই করতে হবে। ১৯৭৪ সালের ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির আলোকে সব ধরনের জটিলতার সমাধান করা দরকার। তাই ভারত সরকারের উচিত, ওই চুক্তির দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা, তা না হলে দু'দেশের সম্পর্কোন্নয়নে বিরাট বাঁধার সৃষ্টি হবে। (কিছু তথ্য, সাক্ষী, সাক্ষ্য আমরা তদন্তের স্বার্থে সংরক্ষণ করলাম।)

মিডিয়ার দৃষ্টিতে সংঘর্ষের চিত্র

বড়াইবাড়িতে যখন প্রায় ৫শ' ভারতীয় হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাংলাদেশে তখন মুক্তিযুদ্ধের তথাকথিত স্বপক্ষের ছত্রধরেরা পাকিস্তানি কূটনীতিক ইরফান রাজার একটি বিতর্কিত মন্তব্যের কারণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়(?) উদ্ভাসিত হয়ে পাকিস্তানের পিন্ডি চটকাতে ব্রত। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের একটি ক্যাম্প (পাদুয়া) যখন তাদের নেত্রী শেখ হাসিনা বিনা বাধায় ভারতের হাতে তুলে দিল তখন নীরব ছিল তারা। বড়াইবাড়িতে আক্রমণ ও তিন বিডিআর সদস্যের হত্যার প্রতিবাদেও তাদের মুখে রা' শব্দটি ছিল না। এ কারণেই প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ফরহাদ মাজহার পত্রিকায় কলাম লেখেন 'পাকিস্তান গালি দিলে মারতে উঠি, ভারত লাথি মারলে মামা ডাকি।'

২০ এপ্রিল দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার প্রথম পাতায় মোজাম্মেল হোসেন জোরেসোরে প্রশ্ন তোলেন, 'আকস্মিকভাবে পাদুয়া দখলের মত সামরিক পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত কেনা নিলেন? কোন পর্যায়ে নেয়া হলো?'

ভারতের অধিকাংশ সংবাদপত্র তাদের পৃথক সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন এবং দ্বিপক্ষীয় সমস্যাগুলো বন্ধুত্বপূর্ণ সংলাপের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার আহবান জানায়। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এক সম্পাদকীয়তে বলে, 'বাংলাদেশের নির্বাচনের সময় ভারত বিরোধীতা একটি স্থায়ী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত কূটনৈতিক অগ্রগতির সম্ভাবনা কম।' দ্যা হিন্দু পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সমন্বয় সংক্রান্ত আলোচনা পুনরায় শুরু করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। দু'দেশের সীমান্ত সমস্যা সমাধানে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের ব্যাপারে ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে যে চুক্তি হয়েছিল, দ্যা হিন্দু তা পুনরায় উজ্জীবিত করার ওপরও জোর দেয়। সম্পাদকীয়তে বলা হয়, 'সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত ছিটমহলগুলোর ব্যাপারে যে সমস্যা রয়েছে তা সমাধানের জন্য দু'দেশের নেতাদের একযোগে কাজ করতে হবে।' এশিয়ান এজ-এর সম্পাদকীয়তে বলা হয়, 'উভয় দেশের মধ্যে চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে। এই সঙ্কট নিয়ে আলোচনার সময় এই বিষয়টি মনে রাখতে হবে এবং তা যেন এ অঞ্চলের শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য কোন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।' ষ্টেটম্যান্স পত্রিকার সম্পাদকীয়তে দ্রুত এই সঙ্কট নিরসনের উপর জোর দেয়া হয়। এতে বলা হয়, 'এই সামরিক তৎপরতা ও বাংলাদেশ রাইফেলস প্রধানের প্রতিক্রিয়া মনে হয়েছে, দু'টি প্রতিবেশী দেশ পাদুয়া প্রশ্নে যুদ্ধ লিপ্ত হয়েছে।'

www.pathagar.com

স্বাধীনতার কথিত পক্ষের পত্রিকা (আওয়ামী নেতা সাবের হোসেন চৌধুরী সম্পাদিত) দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক সংবাদ ২১ এপ্রিল প্রকাশ করে 'বড়াইবাড়ি বাংলাদেশের অপদখলমুক্ত ভূখণ্ড।'

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের ঘটনা নিয়ে ভারতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্নভাবে সংবাদ পরিবেশন ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়। ২১ এপ্রিল ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকার খবরে বিএসএফ-এর সদস্যদের দেহকে ক্ষতবিক্ষত করার ঘটনাকে 'অমানবিক' বলে বর্ণনা করা হয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এ ঘটনার জন্য ঢাকাকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বলার জন্য কঠোর পদক্ষেপ নিতে সরকারের প্রতি দাবী জানায়। পরিষদের সভাপতি বিষ্ণুহরি ডালমিয়া বলেন, 'ভারত সরকারের উচিত এ ব্যাপারে চাপ প্রয়োগের কঠোর পদক্ষেপ নেয়া।' ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের অপর এক রিপোর্টে বলা হয়, 'বিএসএফ সদস্যদের ১৫টি লাশ হস্তান্তর করা হলেও প্রকৃত পক্ষে ঐ ভয়ঙ্কর রাতে কি ঘটেছিল তা এখনো একটি প্রশ্নবোধক রয়ে গেছে। বিএসএফ-এর মহাপরিচালক বলেছেন, ১৬ জন জনওয়ানকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করা হয়েছে। তারা সীমান্ত সংঘর্ষে মারা যায়নি।' দ্য হিন্দু পত্রিকা ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশোবন্ত সিং-এর বরাত দিয়ে বলে, 'বিডিআর কর্তৃক বিএসএফ-এর ১৫ জন সদস্যকে হত্যার ব্যাপারে ২টি তদন্ত চালানো হচ্ছে। মিঃ সিং বলেন, যেভাবে তাদের হত্যা করা হয়েছে তা অমানবিক। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিএসএফ এই তদন্ত পরিচালনা করছে এবং তদন্ত রিপোর্ট এখনো তৈরি হয়নি।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে বলা হয়, 'নয়াদিলী বৃহস্পতিবার (১৯ এপ্রিল) রাতে ঘোষণা করেছে যে, ঢাকা ও নয়াদিল্লী ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সম্মত হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে কাজ চলছে। বিডিআর কর্তৃক বিএসএফ-এর ১৬ জন জওয়ান নিহত হবার পর বাংলাদেশ সংলগ্ন ত্রিপুরা-খোর-মিজোরাম সীমান্তের ১ হাজার ২৮৬ কিলোমিটার এলাকায় সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থা বজায় রাখা হয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রামেন্দ্র জামাল বলেছেন, বৃহস্পতিকার দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ স্তিমিত হয়ে পড়লে বাংলাদেশ ও ভারত উভয় পক্ষই সর্বোচ্চ সংযম অবলম্বন এবং স্বাভাবিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। সীমান্ত সংঘর্ষের ঘটনায় বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ দাবী করেছেন। ভারতীয় সংবাদপত্র ও বিশেষকরা এই ঘটনাকে বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখছেন। বাংলাদেশ বিরোধী দলগুলো বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ব্যর্থতার জন্য শেখ হাসিনাকে অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের কর্মকর্তারা এ ধরনের যোগসূত্রের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

২৩ এপ্রিল দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায়, 'বিএসএফ সদস্যদের লাশের ময়না তদন্তের সময় দেখা গেছে, একজনের গায়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পোশাক।' একই দিনে প্রথম আলো পত্রিকায় কথিত স্বাধীনতার চেতনায় উদ্ভাসিত আরেক সিপাহসালার সাংবাদিক ও চিংড়ী ব্যবসায়ী আবেদ খান প্রশ্ন তোলেন, 'বিডিআর প্রধান ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হলো না কেন?'

নয়াদিল্লী থেকে প্রকাশিত টাইমস অব ইন্ডিয়া পরিবেশিত খবরে বলা হয়, 'ভারতের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পর্যায়ের অনুমোদন নিয়েই বিএসএফ বাংলাদেশের বড়াইবাড়ি সীমান্তে প্রবেশ করে তাদের অভিযান চালিয়েছিল।' টাইমস অব ইন্ডিয়া বিএসএফ সূত্রের বরাত দিয়ে

www.pathagar.com

বলে, 'বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্য গত সপ্তাহে বড়াইবাড়িতে এক আগ্রাসী তৎপরতায় অংশ নেয়। এদিকে কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, যশোর, খুলনা ও ফেনী থেকে পাওয়া খবরে বলা হয়, সীমান্তের ওপারে ভারত যুদ্ধের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সূত্রেও বলা হচ্ছে সীমান্তের নাজুক স্থানগুলোতে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থা জারি করা হয়েছে। সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বিএসএফ-এর তৎপরতায় উত্তেজনা বৃদ্ধি ও ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে।' বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে বলা হয়, 'সীমান্তের ওপারে ভারতের নতুন করে সৈন্য সমাবেশের খবর পাওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সীমান্তের বিরোধপূর্ণ এলাকাগুলো থেকে তার বাহিনীকে সরিয়ে নিয়েছে। সীমান্তে নতুন করে বাংলাদেশের সৈন্য সমাবেশের অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে বলা হয়, 'বিএসএফ-এর ৪টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত একটি বাহিনীর একটি অংশ বাংলাদেশ নিয়ন্ত্রিত বড়াইবাড়ি সীমান্তে একটি আগ্রাসী অভিযান চালাতে গিয়েছিল। অভিযানে ১৬ জন বিএসএফ সৈনিক নিহত হয়।' বিএসএফ সূত্রের বরাত দিয়ে টাইমস অব ইন্ডিয়া বলেছেন, 'একটি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তাদেরকে একটি ঝুঁকিপূর্ণ মিশনে পাঠানো হয়েছিল। সিলেটের পাদুয়ায় দখলের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিএসএফ দ্রুত ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ঐ সিদ্ধান্ত ভারতের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পর্যায়ে অনুমোদিত হয়। তাদের লক্ষ্য ছিল বড়াইবাড়ি বিডিআর ঘাঁটি দখল করা এবং সেখানকার সকল বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা। কারণ ঐ এলাকার জনগণ কট্টর ভারত বিরোধী। বিএসএফ অবশ্য তাদের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দিতে পেরেছিল-কিন্তু বিডিআর পাল্টা জবাব মোকাবিলা করতে পারেনি। প্রাণ দিতে হয়েছে বেঘোরে। বিএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পরে ঐ এলাকা পরিদর্শন করে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন কোনভাবেই ঐ এলাকায় অপারেশন চালাবার জন্য উপযুক্ত ছিল না।' টাইমস অব ইন্ডিয়া অপর এক খবরে বলা হয়, 'ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মানকের চর সেক্টরে কয়েকটি আর্মি কলাসকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ইষ্টার্ণ কমান্ডের সিনিয়র কর্মকর্তাদের সূত্রে একথা বলা হয়েছে 'বিএসএফ দক্ষিণ বাংলা সীমান্ত অঞ্চলেও শক্তি বৃদ্ধি করেছে। ভারতের তরফ থেকে আশংকা করা হয়েছে বাংলাদেশ খুলনা-যশোর অঞ্চলে সেনাবাহিনী সতর্কাবস্থায় রেখেছে।' টাইমস অব ইন্ডিয়া বলেছে, 'বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ভূমি অপদখল নিয়ে বিরোধ দীর্ঘদিনের। এ নিয়ে সীমান্তে প্রায়ই বিডিআর-বিএসএফ সংঘর্ষ হয়ে থাকে। অপর এক খবরে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সীমান্তের ঘটনা নিয়ে ভারতের ক্ষমতাসীন কোয়ালিশন সরকারের মধ্যে বিরোধ বেধেছে। সরকারি দলের এমপিরাই সরকারের বিরোধীতা করছেন। তারা অভিযোগ করেছেন, বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকারকে রক্ষা করার জন্যই নমনীয় গ্রহণ করা হয়েছে। তারা বলেন, সামনে বাংলাদেশে নির্বাচন। এই অবস্থায় সরকার শেখ হাসিনাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে চায় না। বিবিসি জানায়, আসামের মূখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্তোর উদ্ধৃতি দিয়ে সংবাদ সংস্থাগুলো বলেছে যে, তিনি দাবী করেছেন, রাজ্যের দক্ষিণে করিমগঞ্জ এলাকায় বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কিছু তৎপরতাকে কেন্দ্র করে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ঘটেছে। দু'দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সমঝোতা ও ঐক্যমত্য থাকলেও সীমান্তের উত্তেজনা কমেনি। ২৫ এপ্রিল অনেকগুলো বৈঠক হয়েছে সীমান্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে। এ দিন ফেনীর কাছে সীমান্তে কয়েকটি পয়েন্টে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে। এ বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের সীমান্ত কর্মকর্তারা কিছুটা উদ্বিগ্ন ছিলেন। (দৈনিক ইনকিলাব ২৬ এপ্রিল ২০০১)

www.pathagar.com

২৮ এপ্রিল টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়, বড়াইবাড়িতে আকস্মিক হামলা বিএসএফ-এর পক্ষে একটি 'মিস এডভেঞ্চার' ছিল বলে মনে হচ্ছে। এর ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে অনেক সময় লাগবে। এক্ষেত্রে এটা পরিস্কার হয়ে গেছে যে, বাংলাদেশ রাইফেলস এর ফাঁড়িটি আনাড়ীভাবে দখল করে নিতে গিয়ে বিএসএফ এর ৩শ' জওয়ান তাদের ১৮ জন সহযোদ্ধাকে ফেলে রেখে বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে পালিয়ে এসেছিল। এই ১৮ জনের মধ্যে ১৬ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। বিডিআর কর্তৃক বিনা উস্কানীতে ১৫ এপ্রিল মেঘালয় সীমান্তবর্তী ভারত অধিকৃত পাদুয়া গ্রাম দখল করে নেয়ার প্রেক্ষিতেই পর পর এসব ঘটনা ঘটে গেছে। এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে বিএসএফ তড়িঘড়ি করে একটি বিডিআর ফাঁড়ি দখল করে নেয়ার পরিকল্পনা করে। উদ্দেশ্য ছিল দখলকৃত বিডিআর ফাঁড়িটিকে কেন্দ্র করে দরকষাকষি করা। একটি সূত্র জানায়, বিএসএফ মনে করেছিল যে, বিডিআর যেভাবে সহজে পাদুয়ার দখল নিয়েছিল ঠিক একইভাবে তারা বিডিআর ফাঁড়িটি দখল করে নিতে সক্ষম হবে। ঐ এলাকায় বিএসএফ-এর সদস্য সংখ্যা কম ছিল বলে বড়াইবাড়ির বিপরীত দিকে মোতায়েন একটি কোম্পানিকে সহায়তা করার জন্য আরও ভেতরের দিকে মোতায়েন ২টি কোম্পানিকে (যাদের সদস্য সংখ্যা ২০০) জরুরী ভিত্তিতে তলব করা হয়। ১৮ এপ্রিল ভোরে ৩টি কোম্পানিকে নিয়ে গঠিত একটি বাহিনী বড়াইবাড়িতে ঢুকে পড়ে। কিন্তু তাদের এই আক্রমণের কথা বিডিআর জানতে পারে। বিডিআর দ্রুত গ্রামবাসীদের সংগঠিত করে। বিডিআর ও হাজার হাজার গ্রামবাসীর আকস্মিক আক্রমণের ফলে বিএসএফ দিশেহারা হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় তারা তাদের ১৮ জন সহযাত্রীকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ যারা বলছে যে, নিহত সৈন্যরা ঐ এলাকায় আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে টহল দিচ্ছিল, তারা এখন ঐ টহল দলের কি পরিমাণ সদস্য ছিল সে ব্যাপারে নীরব রয়েছে। এই মৃত্যু নিহতদের জন্য তো কোন গৌরব বয়ে আনেনি। তদুপরি যারা জীবিত আছে তাদের প্রতি যেন আরও বেশি অবহেলা করা হচ্ছে। এই অবস্থায় বিএসএফ চুপসে গেছে। বিএসএফ-এর পিআরও আই কে চারি এখন ছুটিতে আছেন। এদিকে বিএসএফ ১৮, ১৯ ও ২০ এপ্রিল ৩টি এফআইআর দায়ের করেছে। এসব এফআইআর-এ বিডিআরকে আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে।

২৮ এপ্রিল দি ডন পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়, '১৬ জন বিএসএফ জওয়ানকে হত্যা করার জন্য ভারতীয় সৈন্যরা বৃহস্পতিবার (২৬ এপ্রিল) বাংলাদেশকে যুদ্ধাপরাধের জন্য অভিযুক্ত করেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ দু'দেশের মধ্যে ভয়াবহ সীমান্ত সহিংসতা শুরুর জন্য ভারতকে দায়ী করেছে। উভয় দেশের সরকারই পরস্পরকে তাদের ৪ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত বরাবর সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করায় ব্যাপারে অভিযুক্ত করেছে। গত সপ্তাহে সীমান্ত সংঘর্ষে ১৬ জন বিএসএফ জওয়ান ও ৩ জন বিডিআর সদস্য নিহত হন। কর্মকর্তারা জানান, সীমান্তে এখনো উত্তেজনা বিরাজ করলেও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী বলেন, ভারতই এই সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। বিডিআর কেবল আত্মরক্ষার্থেই গুলি চালিয়েছে। তিনি বলেন, মেঘালয় রাজ্যের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পাদুয়া গ্রামের কাছে একটি সড়ক নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার ব্যাপারে একটি অনুরোধ অগ্রাহ্য হবার পরই বিডিআর বিরোধপূর্ণ এলাকাটি দখল করে নেয়। তিনি বলেন, ভারতীয় বাহিনী এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে পাদুয়া থেকে ২১০ কিলোমিটার দূরে আসাম সীমান্ত সংলগ্ন বাংলাদেশের স্বীকৃত ভূখণ্ড রৌমারীতে অনুপ্রবেশ করে। মোয়াজ্জেম আলী বলেন,

www.pathagar.com

বিএসএফ রৌমারী এলাকায় যুদ্ধ শুরু করে। তিনি বলেন, আপনারা যদি এখান থেকে ২১০ কি. মি. দূরে একটি নয়া রণাঙ্গণ খুলতে চান এবং সেখানে সৈন্য পাঠান এবং বিডিআর এর ওপর গুলি চালান তাহলে নিঃসন্দেহে বিডিআর এরও আত্মরক্ষার্থে ব্যবস্থা নেয়ার অধিকার রয়েছে। ভারত বলেছে, সে তার প্রতিক্রিয়া জানানোর আগে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিবের উক্তি পরীক্ষা করে দেখবে। তবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রামিন্দর সিং জেসাল নয়াদিলীর বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করে বলেন যে, বাংলাদেশ এই বিরোধের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব সীমান্তে বাংলাদেশের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির কথা অস্বীকার করে বলেন, ভারত কেন এমনটা করল তা তিনি বুঝতে পারেননি। তিনি বলেন, আমরা এ মুহূর্তে সীমান্তে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। তিনি বলেন, সীমান্তে বিএসএফ এর সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করছে। আমরা জানতে চাই, তারা কেন এটা করছে। আসামের গৌহাটি থেকে বিএসএফ-এর একজন সিনিয়র কমান্ডার বলেন, সপ্তাহান্তে ভারতের অন্য স্থান থেকে ৭০ সদস্য বিশিষ্ট দু'টি কোম্পানিকে বাংলাদেশ সীমান্তে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের জওয়ানরা নয়া প্রতিরক্ষা ব্যূহগুলোতে মর্টার লাঞ্চার ও মেশিনগান নিয়ে সার্বক্ষণিকভাবে অতন্দ্র প্রহরায় নিয়োজিত রয়েছে। তিনি বলেন, তবে এখনো পর্যন্ত সেনাবাহিনী তলব করা হয়নি। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি কোম্পানিসহ ৩ ব্যাটেলিয়ন সৈন্যের সমাবেশ ঘটিয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগড়তলায় নিরাপত্তা কর্মকর্তারা জানান, গত কয়েকদিন ধরে নতুন করে কোন সৈন্য সমাবেশ করা হচ্ছে না। গত সপ্তাহে নয়াদিলী ও ঢাকা এ ব্যাপারে একমত হয় যে, তাদের সৈন্যরা ১৯৪৭ সালে নির্মিত বিরোধপূর্ণ সীমান্ত বরাবর তাদের সাবেক অবস্থানে ফিরে যাবে। এদিকে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র বৃহস্পতিবার জানায়, সীমান্তে নতুন করে উত্তেজনার প্রেক্ষিতে ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন কিছু এলাকায় নতুন করে সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে। একটি সরকারি সূত্র স্থানীয় পত্র-পত্রিকার খবরের সত্যতা স্বীকার করে বলেছে, বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে ফেনী, উত্তরাঞ্চলে জকিগঞ্জ ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে লালমনিরহাট সীমান্তগুলোর বিপরীত দিকে বিএসএফ বুধবার সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে থাকায় ঐসব এলাকায় উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার এই উত্তেজনা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আনুষ্ঠানিক কোন মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানায়। দি ডেইলী স্টার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকটি সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে, ভারত ফেনী জেলার বেলুনিয়া ও ছাগলনাইয়া সীমান্তসংলগ্ন ত্রিপুরা রাজ্যে ৩টি ট্রাকভর্তি বিএসএফ জওয়ান পাঠিয়েছে। পত্রিকাটি জানায়, ভারত মুহরির চরের কাছে একটি অবস্থানে আরও ১৫০ জন সৈন্য পাঠিয়েছে। উভয় দেশেই মুহরির চরের কিছু অংশের মালিকানা দাবী করছে। সীমান্ত-বর্তী জকিগঞ্জ ও লালমনিরহাটেও বিএসএফ ও তার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করছে বলে পত্রিকাটি জানায়। তবে বিএসএফ-এর একজন উর্ধ্বতন গোয়েন্দা কর্মকর্তা এ কথা অস্বীকার করেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঐ কর্মকর্তা বলেন, আমরা বাংলাদেশের মত উস্কানীমূলক টহল দিচ্ছি না। আমরা যা করছি তা সীমান্তের রুটিনমাফিক কাজ। তিনি বলেন, আমরা সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থা বজায় রেখেছি। তবে উত্তেজনা ছড়ানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে সীমান্তের ওপার থেকে কোন কিছু করা হলে সেটার মোকাবেলা করা।'

মূলত, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে এত প্রাণহানির মতো সংঘর্ষ এর আগে আর কখনো ঘটেনি। কুড়িগ্রাম ও সিলেটে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে আওয়ামী সরকারের নীতি নির্ধারকরা উদ্বিগ্ন ছিল। এই ঘটনায় ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার রীতিমত

www.pathagar.com

হতচকিত হয়ে যায়। প্রথমে ভারত সরকার বিষয়টি হজম করার চেষ্টা করলেও প্রচার মাধ্যম ও বিরোধী দলের চাপে পড়ে এ নিয়ে সোচ্চার হয়। ঘটনাটি ভারত ও তার বিশাল সামরিক বাহিনীর ইজ্জতের উপর একটা বড় ধরনের আঘাত ছিল। স্বভাবতই তারা ক্ষিপ্ত হয় বাংলাদেশের উপর। আর এই ক্ষোভের বিষয়টি আওয়ামী লীগ সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তুলে। আওয়ামী সরকারের একটি মহল বিডিআর-এর ভূমিকায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। তারা মনে করেছে নির্বাচনের আগে এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে বিডিআর সরকারকে বেকায়দায় ফেলেছে। এই মহল কোনভাবেই ভারতকে চটাতে রাজি ছিল না। পাদুয়া দখলমুক্ত করার পর তা আবার ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়ায় সিলেটসহ সারাদেশের মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এ বিষয়টিও আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারকদের ভাবনায় ফেলে। সরকার কোন মতে সীমান্ত পরিস্থিতিকে শান্ত করে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করে। যাতে এটি কোনভাবেই ইস্যু না হয়ে দাঁড়ায়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষকেও নানাভাবে বোঝানো হয় একে একটি দুর্ঘটনা হিসেবে।

শেখ হাসিনা সরকার শহীদ সিপাহীদের জাতীয় মর্যাদায় দাফন ও পুরস্কৃত করা তো দূরে থাক সরকারের একজন মন্ত্রীও রৌমারী পরিদর্শনে যাননি দীর্ঘদিন। এমনকি এ সময় বিডিআর প্রধানকে সহ বড়াইবাড়ির বীর জওয়ানদের বদলী করা হয় (শাস্তিস্বরূপ)। পাদুয়া এবং রৌমারীর ঘটনা যা-ই হোক না কেন পরবর্তীকালের বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয়েছে আসলে এটি ছিল একটি পাতানো খেলা। একটি ষড়যন্ত্র। বিশেষ করে ভারতীয় পত্র-পত্রিকা ও সংবাদ মাধ্যমের ফাঁস করে দেয়া তথ্যে এই ষড়যন্ত্র নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। কিন্তু মাঝখানে বড়াইবাড়ি ক্যাম্পের ১১ জন সৈনিক নিজেদের অজ্ঞাতেই এই ষড়যন্ত্র ও পাতানো খেলাটির চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেয়, যা পরবর্তীকালে ষড়যন্ত্রকারী উভয় পক্ষের জন্য বুমেরাং হয়ে পড়ে। ষড়যন্ত্রটি হল, 'সে সময় নির্বাচন যতই নিকটবর্তী হচ্ছিল, আওয়ামী লীগের দুঃশাসন ও চারদলীয় জোটের ক্রমবর্ধমান গণজোয়ারে সরকার ভীত হয়ে পড়ছিল। আর এই ভীতি থেকেই তারা উদ্যোগ নেয়, যে কোনভাবে নির্বাচনে জয়লাভ সম্ভব না হলে নির্বাচন প্রতিরোধ করা। এ লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ বিজেপি সরকার সম্মিলিতভাবে এই ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে। আওয়ামী লীগের ধারণা ছিল সীমান্তে একটি সঙ্কট সৃষ্টি করা গেলে দেশে জরুরী অবস্থা জারি করে নির্বাচন বাতিল করা যাবে। তা সম্ভব না হলে নিদেনপক্ষে আওয়ামী লীগের গা থেকে ভারত তোষণের দুর্নাম ঘুচবে এবং এন্টিইন্ডিয়ান ভোটগুলো নৌকায় পড়বে। অন্যদিকে কারগিল বিপর্যয়ে বিপর্যস্থ বিজেপি সরকারও জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরাতে সক্ষম হবেন। কিন্তু মাঝখানে বাধ সেঁধেছে বড়াইবাড়ি ক্যাম্পের ১১ জন বীর বিডিআর সদস্য ও স্থানীয় জনগণ-যারা এই ষড়যন্ত্রের কথা জানত না। কারণ ষড়যন্ত্রকারীদের এই ১১জন দেশপ্রেমিক সৈন্যের বীরত্ব সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। তাই তারা ষড়যন্ত্রের কথা এই সৈন্যদের জানানো প্রয়োজন মনে করেনি।

www.pathagar.com

কোন নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হতে দেয়নি আওয়ামীরা

প্রতিটি দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর সবকটি নির্বাচনে ভোট দেয়ার অধিকার রয়েছে। এ অধিকার থেকে কেউ কাউকে বঞ্চিত করতে পারেনা। বিশ্বে ভোটের অধিকারকে গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। শেখ হাসিনাও জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে অনেক মায়াকান্না কেঁদেছেন কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে সেই অধিকারকে কবর দেয়ার সার্বিক আয়োজনকে নিরবে সহ্য করে গেছেন। প্রতিটি নির্বাচনে তার দল আওয়ামী লীগ ভোট কারচুপির মাধ্যমে, সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে, হত্যার মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকারকে নষ্ট করেছে, অপমান করেছে।

১০ ডিসেম্বর ১৯৯৮ পাবনা-২ উপ-নির্বাচনে নজীরবিহীন কারচুপি সন্ত্রাস, ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা প্রদান, পুলিং এজেন্টদের বের করে দেয়া, মহিলা ভোটারদের শাড়ি, ওড়না কেড়ে নেয়া, প্রাণনাশের হুমকির মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ আসনটি দখল করে নেয়। এ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন একে খন্দকার। আওয়ামী লীগ ২৩টি কেন্দ্র দখল করে নিয়ে নৌকায় সীল মেরে ব্যালট বাক্স ভর্তি করে। সন্ত্রাসীদের হাত কেটে নেয়া এবং প্রাণনাশের হুমকিতে বিএনপির সমর্থকরা ছিল ভীত সন্ত্রস্ত। যারা ভোট কেন্দ্রে এসেছে তাদের মধ্যে অধিকাংশ ভোটারকে দারুণ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে দেখা যায়। সকাল ৮টায় ভোট শুরু হবার পর অনেক কেন্দ্র থেকে ৯টার মধ্যেই বিএনপির এজেন্টদের বের করে দেয়া হয়। সেনাবাহিনী এবং বিডিআর, পুলিশ মোতায়েন করলেও তারা কেন্দ্রের বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। কোনো কোনো কেন্দ্রে প্রকাশ্যে এবং কোনো কোনো কেন্দ্রে পুলিশ ও প্রশাসনের সহায়তায় আওয়ামী লীগ ভোট কেটে নেয়। অধিকাংশই বিএনপি'র সমর্থকরা ভোট দিতে এসে দেখে তাদের ভোট দেয়া হয়ে গেছে। বিভিন্ন কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের হামলায় কমপক্ষে ৪০ জন বিএনপি কর্মী আহত হয়। সকাল ১০টার দিকে সুজানগরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু হেনা উপস্থিত হলে বিএনপি প্রার্থী সেলিম রেজা হাবিব সাতবাড়িয়া ও কাদোয়া কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত রাখার দাবী জানান। নির্বাচন কমিশনার এই দু'টি কেন্দ্র পরিদর্শনকালে বিএনপির কোনো এজেন্ট দেখতে পাননি। এ সময় বিএনপির রফিকুল ইসলাম বকুল, ব্যারিস্টার আমীনুল হক এমপি, জহিরউদ্দিন স্বপন উপস্থিত ছিলেন। বিকাল ৩টার দিকে কাশিনাথপুর সড়কের রেস্ট হাউজে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাংবাদিকদের জানান, 'কিছু অনিয়ম হয়েছে। এখন কোনো মন্তব্য করবো না।' সাংবাদিকরা নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম হবার কথা তার কাছে তুলে ধরেন। সকাল ৯টায় মথুরাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (ভোট সংখ্যা ১৮২৯) গিয়ে দেখা যায়, আওয়ামী সন্ত্রাসীরা বিএনপির এজেন্টদের বের করে দিয়েছে। বিএনপির এমপি মুজিবুর রহমান সরোয়ার অসহায়ের মতো কেন্দ্রের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রিজাইডিং অফিসার এমদাদুল হক জানান, তার কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে ভোট হচ্ছে। অথচ একজন ভোটার অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে অভিযোগ করেন, 'নির্বাচনের আগের রাতে ধানের শীষের এজেন্টদের প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয়েছে এবং ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।' নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল খুব কম। ধানের শীষের ভোটারগণ ভোট কেন্দ্রে

www.pathagar.com

তেমন আসেনি। এখানে বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, জহিরুদ্দিন স্বপন, কে আই খলিলকে কেন্দ্রের কিছুটা দূরে দেখা গেছে। সুজানগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে (ভোটার সংখ্যা ৪৫৪৬) সকাল সাড়ে ৯টায় ব্যাপক ভোটারদের উপস্থিতি ছিল। এই কেন্দ্রে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সকাল ১০টায় পরিদর্শন করবেন বলে ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। ভোটারদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। সকাল পৌনে দশটায় মানিকদি সেন্টারে (মোট ভোটার ৩২৪১। মহিলা ১৫১০। পুরুষ ১৭৩১) গিয়ে দেখা যায় খুব কম সংখ্যক ভোটার লাইনে রয়েছেন। ৯টা ২৫ মিনিটের মধ্যে ১ হাজার ভোট দেয়া হয়ে যায়। এই কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার ছিলেন সুজানগর থানার সাব-রেজিস্ট্রার নজরুল ইসলাম। সাতবাড়িয়া, তাড়াবাড়িয়া ও কাদোয়া কেন্দ্রে বিএনপির এজেন্টদেরকে আওয়ামী লীগ বের করে দেয়। রাস্তায় রাস্তায় মেয়েদের ওড়না, শাড়ি ধরে টান দিয়ে লাঞ্ছিত করে। প্রাণনাশের হুমকি দেয়। ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে আসতে পারেনি। তাড়াবাড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সামসুল হকের নেতৃত্বে সকাল থেকে বিএনপির সমর্থকদের কেন্দ্রের আশ-পাশে ভিড়তে দেয়া হয়নি। তাড়াবাড়িয়া কেন্দ্রে (মোট ভোটার সংখ্যা ২৩১১। এর মধ্যে ১১শ' মহিলা ও ১২১১ পুরুষ) ভোট দিতে যাবার সময় বিএনপির ৫ জন কর্মীকে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা ধরে নিয়ে যায়। চেয়ারম্যান সামসুল হক সন্ত্রাসের নেতৃত্ব দেন। সামসুল হক সাংবাদিকের গাড়ি দেখে রাস্তার এক পাশে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে ঢাকা থেকে নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক দল ডিজি নারকোটিকস নাজমুল আহসান চৌধুরী ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এম.এ. কামাল এবং জাতীয় মহিলা আইনজীবী নেত্রী এডভোকেট সালমা আলী এসে উপস্থিত হন। বিএনপির কর্মীরা তাদের কাছেও বিষয়টা জানায়। প্রিজাইডিং অফিসারের কক্ষে জাল ভোট দেয়ার অভিযোগে ৩ জনকে বসিয়ে রাখার দৃশ্য এই সময় দেখা যায়। কচোয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট মঞ্জুর মোর্শেদকে ইয়ানুছ আলী নামে বিএনপির একজন কর্মীকে গুরুতর আহত অবস্থায় দেখানো হয়। তাকে সাংবাদিকসহ বিএনপির কর্মীরা ব্যবস্থা নিতে বললে তিনি লিখিত চান। নিরাপত্তার অভাবে কেউ কেন্দ্রে যেতে না পারার কথাও বিএনপির ভোটাররা জানান। কিন্তু তিনি কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ প্রার্থী এই কেন্দ্র পরিদর্শনে আসলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানান 'সুষ্ঠুভাবে ভোট হচ্ছে। কোন অসুবিধা নেই।' মোকছেদ হোসেন নামে ৬০ বছরের এক বৃদ্ধা জানান, 'বাবা আমরা কোথায় যাব। দেশে থাকতে পারবো না। পুলিশ, বিডিআর, সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি।' কদোয়া সেন্টারে (মোট ভোটার সংখ্যা ২৬৭০) গিয়ে দেখা যায় এখানে বিএনপির কোনো এজেন্ট নেই। এজেন্টদেরকে পূর্বের রাতে কেন্দ্রে আসতে নিষেধ করা হয়। ১১ টার মধ্যে ৫০০ ভোট কাস্ট হয়। বিএনপির কোনো এজেন্টকে থাকতে দেয়া হয়নি। আওয়ামী লীগের সমর্থকরা জোর করে বের করে দেয়। হাসান নামে একজন আওয়ামী লীগ কর্মী জানায়, 'এই কেন্দ্র নৌকার। প্রিজাইডিং অফিসার জানান ৫ জন জাল ভোটদানকারীকে আটক করা হয়েছে। এরা হচ্ছে হেলাল, দুলাল, হাফিজুর রহমান, তোফাজ্জল, আকমল ও ইয়াকুব। ধানের শীষের এজেন্টদেরকে কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া হয়। যেসব সমর্থক ধানের শীষের ভোটার তারা অত্যন্ত ভয়-ভীতির মধ্যে ভোট দিতে গেছে। এই কেন্দ্রের কর্তব্যরত আওয়ামী প্রার্থীর এজেন্ট হালিমা খাতুন মহিলা ভোটারদের কাছ থেকে ব্যালট পেপার নিয়ে নৌকায় ভোট দিচ্ছে কিনা তা দেখে নিশ্চিত হয়। দক্ষুতপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে নৌকার সমর্থকরা আগেই ভোট দিয়ে ভোটারদের বলেছে, 'আপনাদের ভোট দেয়া হয়ে গেছে।' এই কেন্দ্র থেকে

www.pathagar.com

আক্কাস আলী, আঃ রাজ্জাক নামে বিএনপির এজেন্টদের বের করে দেয়া হয়। বিশু ও মামুন ভোট দিতে গিয়ে দেখেন তাদের ভোট দেয়া হয়ে গেছে। সাগরকান্দি রিয়াজ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে ২৮৮৪ ভোটের মধ্যে দুপুর ১২টায় ১৮৮৪ ভোট কাস্ট হয়। এই কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার ছিলেন নাটোরের এসি ল্যান্ড নূরুল ইসলাম। এই কেন্দ্রে অনেক ভোটার এসে দেখে তাদের ভোট দেয়া হয়ে গেছে। আমীনপুর আইনুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে ১২টা পর্যন্ত মোট ১৯৫৩ ভোটের মধ্যে ১১৪৭ ভোট কাস্ট হয়। প্রিজাইডিং অফিসার জানান, 'এই কেন্দ্রে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে ভোট হচ্ছে।' আহমদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকাল থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ড. মুজিব ও মেজর (অব.) ইকবাল নামে দু'জন কর্মকর্তার নেতৃত্বে ভোট কেন্দ্রে আসা বিএনপি এজেন্টদেরকে হুমকি দেয়। বিএনপির এজেন্টকে বের করে দিয়ে হত্যা করার জন্য আটক করা হয়। এই খবর সাংবাদিকরা পেয়ে সেখানে গেলে দেখতে পান এই বিএনপি'র এজেন্ট রাজ্জাক বসে কাঁদছেন। তার সাহায্যে কোনো পুলিশ আসেনি। পরে সাংবাদিকরা রাজ্জাককে উদ্ধার করে তাদের গাড়ীতে করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসেন। পরে তার বাড়িতে গিয়ে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা অত্যাচার শুরু করলে তার স্ত্রী ছোট ছেলেকে দিয়ে খবর পাঠায় সে যেন থানায় গিয়ে বসে থাকে। টাংবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোটার ৩০৮১ জন। দুপুর ১২ টার মধ্যে ১৪৯৮ ভোট কাস্ট হয়। এই কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার ছিলেন কুড়িগ্রাম জেলার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মকবুল। নটিয়াবাড়ি ধোপাখোলা করেনেশন উচ্চ বিদ্যালয় স্কুলে দুপুর দেড়টার দিকে মোট ৮৭৪৪ ভোটের মধ্যে ১৬৫৪ ভোট কাস্ট হয়। কেন্দ্রের বাইরে অপেক্ষমান ছিলেন বিএনপির এমপি আমান উল্লাহ আমান, নাজিমুদ্দিন আলম এমপি, খায়রুল কবীর খোকন ও আবুল খায়ের ভূঁইয়া। সাংবাদিকদের কাছে জনাব আমান অভিযোগ করেন, 'সিংহাসন, বসন্তপুর, লক্ষ্মীপুর, নটিয়াবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে বিএনপির ভোটারদের যেতে দেয়া হচ্ছে না। এইসব ভোটকেন্দ্রে কর্তব্যরত ধানের শীষের এজেন্টদের বের করে দেয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন বুথে এজেন্টদের ভয়-ভীতি দেখানো হয়েছে।' লক্ষ্মীপুর ভোটকেন্দ্রে সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান ভোটারদের মারধর করেছে বলে অভিযোগ করেন। দুর্গাপুর উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে বিএনপি এজেন্টদের বের করে দেয়া হয়। ভোটাররা এসে দেখে তাদের ভোট দেয়া হয়েছে। চরদোলাইতে দুপুর আড়াইটায় ৩৭০০ ভোটের মধ্যে ২৫০০ ভোট কাস্ট হয়। বিএনপির কোনো এজেন্টকে দেখা যায়নি। কেন্দ্রের আশেপাশে থমথমে অবস্থা বিরাজ করে। ভোটারদের উপস্থিতিও সে রকম চোখে পড়েনি। সরেজমিনে পরিদর্শনকালে সকালের দিকে সাতবাড়িয়া ইউনিয়নের ভায়না গ্রামের সাধারণ ভোটাররা প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ঘেরাও করে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে। ভোটাররা জানান, তারা ধানের শীষে ভোট দিবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে সন্ত্রাসীরা তাদের ভোটকেন্দ্রে যেতে দিচ্ছে না এবং বিএনপি'র দু'জন এজেন্টের কাছ থেকে ভোটার তালিকা ছিনিয়ে নিয়ে তাদের বেদম প্রহার করে কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়। এ অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিনি তদন্তের আশ্বাস দেন। সুজানগর ইউনিয়নের চরভবানীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের জেলা কমিটির সভাপতি এডভোকেট আরশেদ আলমকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে তিনি অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান।

আওয়ামী লীগ তাদের প্রথম তিন বছর শাসনামলে অনেকগুলো নির্বাচন সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে বিরোধী দলবিহীন পৌরসভা নির্বাচনে ফাঁকা মাঠ পেয়েও আওয়ামী লীগ উত্তর জনপদে আশানুরূপ ফল ঘরে তুলতে পারেনি। তিন বছরে আওয়ামী শাসনামলের ফসল-চালের

www.pathagar.com

কেজি ১৫/১৬ টাকা, সন্ধ্যা হলেই বিদ্যুতের লোডশেডিং এবং আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি এ সবের কারণে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠে। ফলে পৌরসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ যতটুকুই হোক, অংশগ্রহণকারী ভোটাররা ব্যালটের মাধ্যমে তাদের জবাব দেয়। আওয়ামী ঘাঁটি হিসেবে চিহ্নিত বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার সাতটি পৌরসভার মধ্যে মাত্র ২টির চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয়লাভ করে। রংপুর অঞ্চলের অবস্থাও একই। বিরোধী দলের কারচুপির আশংকাকে জোর গলায় প্রত্যাখ্যান করে একদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানকারী আওয়ামী লীগের প্রার্থীরাই শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ দাখিল করে এবং কারচুপির অভিযোগে হরতালও ডেকেছে। বৃহত্তর দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলের বিভিন্ন পৌরসভা নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, দিনাজপুর সদর পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগের প্রার্থী আমিনুল হক ব্যক্তি পরিচয়ে দিনাজপুরের মানুষের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ইতিপূর্বে এক দফা চেয়ারম্যানও ছিলেন। নির্বাচনে তিনি ব্যক্তি পরিচয় নয়, আওয়ামী পরিচয়ে প্রার্থী হন। আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ও নেতাদের নেতৃত্বে মিছিল নিয়ে প্রচারণা চালান। কিন্তু হেরে যান তরুণ, কর্মঠ ও শ্রমিক নেতা হিসেবে বিবেচিত ক্ষুদে দল ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থী মোছাদ্দেক হোসেন লাবুর কাছে। আমিনুল হকের মত ব্যক্তির পরাজয়ে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা বিস্মিত হলেও সাধারণ মানুষ বিস্মিত হয়নি। কেননা একদিকে জেলা আওয়ামী লীগের কোন্দল ছিল ওপেন সিক্রেট। তার উপর মানুষের অর্থনৈতিক দৈন্য-দশা সর্বোপরি আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি, দুর্নীতি, অনিয়ম আর বাজারে জিনিসপত্রের মূল্যের উর্ধ্বগতি সাধারণ মানুষের মধ্যে আওয়ামী বিদ্বেষের সূচনা করে। আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা আরো পরাজিত হয় পার্বতীপুর, ঠাকুরগাঁও, পীরগঞ্জ, রংপুর, পঞ্চগড় ও সৈয়দপুর পৌরসভায়। দিনাজপুরের বিরামপুর থানায় নবগঠিত পৌরসভা উদ্বোধনের পর থেকে আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন আলী সরকারকে প্রশাসক হিসেবে বসানো হয়। জনশ্রুতি ছিল, আওয়ামী লীগের স্থানীয় এক নেতার সহযোগিতায় পৌর প্রশাসক এহেন কোন দুর্নীতি নেই, যা করেননি। ফলে বিরামপুরবাসী প্রকাশ্যে না পারলেও ব্যালটের মাধ্যমে আওয়ামী দুঃশাসনের জবাব দেয়। পার্বতীপুরে তাদের পরাজিত প্রার্থী ভোট কারচুপির অভিযোগে হরতাল ডাকে। সৈয়দপুরে হেরে যাওয়ায় আওয়ামী প্রার্থীর সমর্থকরা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। অপরদিকে আওয়ামী নেতা হয়েও দলীয় মনোনয়নের বাইরে প্রার্থী হয়ে জয়ী হওয়ায় মনোনয়ন দেয়া পরাজিত প্রার্থীর পরিবর্তে জয়ী প্রার্থীকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী বলে চালিয়ে দেয়া হয়। অথবা বিজয়ী স্বতন্ত্র প্রার্থীদের গোপনে ম্যানেজ করে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে চালানোর মাধ্যমে পরাজয়ের গ্লানি মোছার চেষ্টা চালানো হয়।

বিএনপি'র সংসদ সদস্য আহমদ আলীর মৃত্যুতে ১৩ ফেব্রুয়ারি মেহেরপুর-১ আসনটি শূণ্য হয়। ৫ মে ১৯৯৯ বিরোধী দলের বর্জন, হরতাল ও বিক্ষুব্ধ পরিবেশে মেহেরপুর-১ আসনের এক দলীয় উপ-নির্বাচন সম্পন্ন হয়। নীল নকশার এই উপ-নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতির হার ২৫ শতাংশ বলে জেলা প্রশাসন দাবী করলেও উপস্থিতির হার ছিল খুবই কম। বিরোধী দলের আহবানে খুলনা বিভাগের অন্যান্য জেলার মতো মেহেরপুরেও সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। হরতালের কারণে ভোটার উপস্থিতির হার কম বলে স্থানীয় প্রশাসন যুক্তি দেখালেও এলাকার লোকজনের একতরফা নির্বাচনে অংশ নিতে আগ্রহ ছিল না। নির্বাচন কমিশনার ও তার সফরসঙ্গী সাংবাদিকদের দেখানো এবং টিভির ক্যামেরায় অপেক্ষমান

www.pathagar.com

ভোটারদের চিত্র ধারণ করার স্বার্থে লোকজন ম্যানেজ করার ব্যাপারে প্রশাসনকে আগেই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। সে মোতাবেক লোক জড়ো করতে স্থানীয় প্রশাসন গলদঘর্ম হয়। প্রবল চাপের মুখেও ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত করানো সম্ভব হয়নি। আওয়ামী প্রার্থীর পোলিং এজেন্টরাও বলেন, 'বিরোধী দল ছাড়া একতরফা এ নির্বাচন জমেনি।' সরকারের একদলীয় নির্বাচন ও অগণতান্ত্রিক আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে মেহেরপুর প্রেসক্লাবে আহুত এক সাংবাদিক সম্মেলন থেকে বিএনপি নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। উপ-নির্বাচনের দু'জন প্রার্থীই ছিল আওয়ামী লীগের। আনোয়ার হোসেন মঞ্জু সমর্থিত মোতাসিম বিল্লাহ এবং অপর দু'জন স্বতন্ত্র প্রার্থী এ নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ায়। সরকার ও নির্বাচন কমিশনের মুখ রক্ষার্থে শেষ পর্যন্ত সর্বশেষ চেষ্টা চালান আওয়ামী লীগের প্রফেসর আব্দুল মান্নান এবং মোঃ হিসাব উদ্দিন। আব্দুল মান্নান কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সমর্থনে নৌকা প্রতীক পান। সতন্ত্র প্রার্থী হিসাব উদ্দিন টেলিভিশন প্রতীক নিয়ে লড়লেও তার প্রতি ছিল স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের সমর্থন। এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দ দু'শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েন। তাদের দলীয় বিরোধ উঠে তুঙ্গে। নির্বাচন কমিশনার মুস্তাক আহাম্মদ চৌধুরী একদল সাংবাদিক নিয়ে বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার যোগে সকাল সাড়ে ৯টায় মেহেরপুর নির্বাচনী এলাকায় পৌছান। সফরসঙ্গীদের নিয়ে তিনি শহরের মিশন সরকারি প্রাইমারী স্কুল পরিদর্শনে গেলে দেখা যায় ভোটার উপস্থিতি হাতেগোনা। পৌনে তিন ঘন্টায় ওই কেন্দ্রের ২২৯৫ ভোটের মধ্যে মাত্র ১৮২টি ভোট গ্রহণ করা হয় বলে প্রিজাইডিং অফিসার শামসুল আলম জানান। বিটিভির ক্যামেরাম্যান লোক দাঁড় করিয়ে চিত্র ধারণের ব্যর্থ চেষ্টা চালান। ওই কেন্দ্র পরিদর্শনকালে জনা কয়েক মহিলা ভোটারের উপস্থিতি দেখে তিনি বলেন, 'লোক না থাকলে ছবি বানাবো কোত্থেকে।' চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার জাহাঙ্গীর হোসেন দীঘিরপাড় কেন্দ্র থেকে ১০টা ৫০ মিনিটে ওয়্যারলেস সেটে অপর এক পুলিশ কর্মকর্তাকে কাতর স্বরে বলেন, 'ভাল একটা কেন্দ্র দাও বাবা, যেটা দেখানো যাবে'। প্রত্যুত্তরে ওই কর্মকর্তা জবাব দেন সেই সব কেন্দ্রের অবস্থা একই। ভোটার শূণ্য। নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, বেলা সোয়া ১১টা পর্যন্ত দীঘিরপাড় কেন্দ্রে ২৯৪১ ভোটোর মধ্যে ২২৫ ভোট, হান্নানগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেলা সোয়া ১১টা পর্যন্ত ৪০৮০ ভোটের মধ্যে ৩০৯ ভোট পড়ে। নির্বাচন কমিশনার মুস্তাক আহাম্মদ ভোটার উপস্থিতিতে সন্তোষ প্রকাশ না করায় জেলা প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা তাকে আশ্বস্ত করেন যে, অন্য কেন্দ্রে অফিসার পাঠানো হয়েছে। তিনি লোক গুছিয়ে খবর দেবেন। টিভি'র ক্যামেরাম্যানকে তিনি জানান, এ ছবি দর্শকদের দেখানো যাবে না। আনন্দবাসী মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে বেলা ২টা পর্যন্ত ২৭০১ ভোটোর মধ্যে ২৩১ ভোট পড়ার কথা প্রশাসনিকভাবে দাবী করা হয়। অথচ খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ওই কেন্দ্রে সকাল ৮টা থেকে সোয়া ৯টা পর্যন্ত মাত্র একটি ভোট পড়েছে। মুস্তাক আহাম্মদ উপ-নির্বাচনী এলাকা পরিদর্শন শেষে তেজগাঁও পুরনো বিমান বন্দরে সফরসঙ্গী সাংবাদিকদের জানান, 'নির্বাচনে উপস্থিতির হার একেবারেই কম।' অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সকল দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হওয়া দরকার বলে তিনি মন্তব্য করেন। মেহেরপুর নির্বাচনে খুশি কি না জানতে চাইলে কৌশলে তিনি জবাব এড়িয়ে যান। এদিকে জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদের আহবায়ক ডক্টর নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহর নেতৃত্বাধীন পর্যবেক্ষক টীম ওই নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেন যে, 'কেন্দ্রগুলোতে ভোটারের উপস্থিতি ছিল কম। এমনকি কোথাও কোথাও শূণ্য, যেমন ২৯ নং আমঝুপী সরকারি বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়

www.pathagar.com

কেন্দ্রের ৬নং মহিলা বুথে ২৪৮ জন ভোটারের সকাল ৮টা থেকে শুরু করে বিকেল ৪টায় ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হওয়া অবধি ১টি ভোটও পড়েনি। ৪২ নং দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মহিলা কেন্দ্রে সকাল ১১টায় কুষ্টিয়া থেকে আগত ম্যাজিস্ট্রেট মাহাবুব আহসানকে বুথের বাইরে দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখা গেছে। ৪৬ নং সোনাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে সকাল ১০টায় ১৯৬৫ জন ভোটারের জন্যে ১৯৫০টি ব্যালট পেপার পাঠানো হয়। গেজেটে ১৯৫০ জন ভোটারের উল্লেখ থাকায় কর্তৃপক্ষ ১৯৬৫ জন বৈধ ভোটার বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ১৯৫০টি ব্যালট পেপারই সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেন। ৮নং মেহেরপুর দারুল-উলুম আহমদিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে দুপুর ১২টায় গোরস্থান পাড়া থেকে আগত মোঃ ফিরোজ আহমেদ, পিতাঃ খোদা বকসকে জাল ভোট প্রদানের অভিযোগে কর্তৃপক্ষ আটক হাতে দেখা যায়।' মেহেরপুর-১ আসনের একদলীয় উপ-নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী প্রফেসর আব্দুল মান্নানকে ২৬ হাজার ৭শ' ১৭ ভোটে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাব উদ্দিন ১৬ হাজার ৭শ' ৮৫ ভোট পান। স্বতন্ত্র প্রার্থী হুমায়ূন কবীর ৩৮০, কৃষক দলের সাদেক ৮৯, মুতাছিম বিল্লা মতু ১৭৪ ভোট পান। রাতে বিবিসি সংবাদে বলা হয়, 'বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা মেহেরপুরে জাতীয় সংসদের একটি আসনের জন্য উপ-নির্বাচন হয়েছে প্রধান বিরোধী দলগুলোর ডাকা হরতাল ও নির্বাচন বর্জনের মধ্য দিয়ে। প্রধান বিরোধী দল বিএনপিসহ অন্যান্য দলগুলো তাদের ৪ দফা দাবীতে নির্বাচন বর্জন করে। বর্তমান সরকারের যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টিও শেষ মুহূর্তে তাদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে নেয়। নির্বাচনে ভোটারের উপস্থিতি ছিল খুবই কম। যদিও প্রধান বিরোধী দল বিএনপি'র একজন সংসদ সদস্যের মৃত্যুতে এই আসনটি শূণ্য হয়েছিল কিন্তু বিএনপিসহ অন্যান্য বিরোধী দল আসনটির উপ-নির্বাচন বর্জন করেছে। এমনকি বর্তমান সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টিও উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৪৮ ঘন্টা আগে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নেয়ায় ওই উপ-নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোনো রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ ছিল না।'

২৭ অক্টোবর ফরিদপুর-৪ আসনের আওয়ামী লীগের একদলীয় প্রহসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ৫ জন প্রার্থী দেখানো হলেও মূল প্রার্থী জাকের পার্টির চেয়ারম্যান মোস্ত ফা আমীর ফয়সল এবং আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর প্রার্থী নাসির উদ্দিন আহমেদ মুসা নির্বাচন বয়কট করেন। ফলে আওয়ামী লীগ প্রার্থী সালেহা মোশাররফের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কৃষক মুক্তি আন্দোলন প্রার্থী। অবশ্য এই প্রার্থীকে নির্বাচনী এলাকার কোথাও দেখা যায়নি। ফলে প্রার্থী মূলত সালেহা মোশাররফই ছিলেন। নির্বাচনী এলাকায় বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে আওয়ামী লীগের কর্মী ও ক্যাডার দিয়ে তাদের নৌকা প্রতীকে ও বয়কট প্রার্থীর প্রতীকে কিছু কিছু সীল মেরে ভোটের নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রায় সবগুলো ভোটকেন্দ্র ছিল ফাঁকা। কোনো ভোটারকে দেখা যায়নি। শুধুমাত্র যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী ও আওয়ামী লীগ ক্যাডাররা বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ঢুকে নিজেরাই লঙ্গল, গোলাপ ফুল, পদ্মফুল, ও মোরগ প্রতীকে সীল মারে। ভোট কেন্দ্রে বয়কট প্রার্থীর হয়ে নিজেরাই পোলিং এজেন্ট সাজিয়ে ভোট নাটক করে। বয়কট প্রার্থীদের প্রতীকে সীল মেরে আওয়ামী লীগ একদলীয় প্রহসনের উপ-নির্বাচন নিরপেক্ষ দেখানোর চেষ্টা করে। কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের কর্মীদের দিয়ে লাইন করিয়ে ছবি তোলা হয়। প্রায় কেন্দ্রেই ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্সে ফেলা হয়। যেমন আওয়ামী লীগ ২ হাজার, গোলাপ ফুল ২শ', লাঙ্গল ৫শ' প্রভৃতি। নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রার্থী না থাকায়

www.pathagar.com

ভোটকেন্দ্রগুলো ছিল আওয়ামীদের দখলে। উপ-নির্বাচন সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নিরপেক্ষ করার জন্য সদরপুরের ৫৫টি ও চরভদ্রাসনের ২১টি মোট ৭৬টি ভোট কেন্দ্রের জন্য নিয়োগ করা হয় ৭৬ জন প্রিজাইডিং অফিসার, ৩০৮ জন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও ৭১৬ জন পোলিং অফিসার। একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে ছিল ২ পুলিশ কর্মকর্তাসহ ১২ সশস্ত্র পুলিশ, ৪ মহিলা আনসারসহ ২২ আনসার সদস্য। এছাড়া সমগ্র নির্বাচনী এলাকায় ৩৫টি ভ্রাম্যমাণ দলে ছিল ৪৪ ম্যাজিস্ট্রেট, ২০০ আর্মড ব্যাটেলিয়ন পুলিশ। ৭৬টি ভোটকেন্দ্রে ভোটার ছিল ১ লাখ ৩৬ হাজার ৬শ' ৩৫ জন। এর মধ্যে মহিলা ভোটার ছিল ৬৭ হাজার ৮শ' ১৭ জন। এতো কিছু আয়োজন সত্ত্বেও ভোটকেন্দ্রগুলোতে আওয়ামী ক্যাডাররা বয়কট প্রার্থীদের প্রতীকে সীল মারে। নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়ে বিবিসির খবরে বলা হয়, 'প্রধান বিরোধী দলগুলো এই উপ-নির্বাচনে অংশ নেয়নি। আওয়ামী লীগ দলের সংসদ সদস্য মোশাররফ হোসেনের মৃত্যুতে এই ফরিদপুর-৪ আসনটি শূণ্য হয়েছিল। বিএনপিসহ প্রধান বিরোধী দলগুলো এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে অংশ না নেয়ার ঘোষণা দিয়ে ফরিদপুরের এই আসনটির উপ-নির্বাচন বয়কট করেছে। তবে এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি বিরোধী দলের এই অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও তারা বলেছেন যে, তাদের লাঙ্গল প্রতীক ধরে রাখার জন্যই নামে মাত্র প্রার্থী দিয়েছেন। আর আদালত পর্যন্ত গড়িয়েও লাঙ্গল প্রতীক না পাওয়ায় সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি (মি-ম) শেষ মুহূর্তে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এছাড়াও দুদিন আগে প্রশাসনে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করে জাকের পার্টির মোস্তফা আমীর ফয়সল প্রার্থীতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। ফলে ফরিদপুর-৪ আসনটির এই উপ-নির্বাচন মূলত আওয়ামী লীগ ও একটি ছোট দলের নির্বাচনে পরিণত হওয়ায় মানুষের মাঝে সেখানে তেমন কোনো সাড়া নেই। তবে ব্যালটপত্রে ৫ জন প্রার্থীর নামই রয়েছে।

৮ ডিসেম্বর কিশোরগঞ্জ-১ আসনের উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উপনির্বাচনে ঘোষিত ফলাফল নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। একেক সময় একেক ধরনের ফলাফল সাংবাদিকদের কাছে সরবরাহ করা হয়। সর্বশেষ ফলাফলে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ড. আলাউদ্দিন ৫৮ হাজার ৮শ' ৬৫ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হন। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এডভোকেট ফজলুর রহমান পান ২৮ হাজার ৮শ' ৭৫ ভোট। কিশোরগঞ্জের এ নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল খুবই নগণ্য। অধিকাংশ কেন্দ্রই ছিল ভোটারশূন্য। ভোট কেন্দ্রগুলো দেখে মনে হয় পরীক্ষার হল। এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে যেভাবে নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়েন করা হয় ঠিক তেমন অবস্থায় ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, আনসার বাহিনীর সদস্যদের শূন্য কেন্দ্র পাহারা দিতে দেখা যায়। নির্বাচনী এলাকার ৬৯টি কেন্দ্রের মধ্যে ৩০টি কেন্দ্রে ঘুরে অধিকাংশ কেন্দ্রে একই দৃশ্য দেখা গেছে। কেন্দ্রগুলো প্রায় ভোটারবিহীন দেখা গেলেও কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী ধান ক্ষেতগুলোতে মানুষের কমতি ছিলনা। পাকুন্দিয়া-হোসেনপুর একটি কৃষি প্রধান এলাকা। এই দুই থানার শতকরা ৯০ জনই কৃষক। এই এলাকায় ধান কাটার ভর মৌসুম ছিল। শ' শ' কৃষককে মনের আনন্দে ঘরে ঘরে ধান তুলতে দেখা গেছে। তাদের মধ্যে ভোট দেয়ার কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি। স্বল্পসংখ্যক ভোটার এ আসনে ভোট দেন। ভোটাররা ভোটের পবিত্র আমানত হাতছাড়া করতে চাননি। ভোট কেন্দ্রগুলোতে ভোটারদের উপস্থিতি তেমন দেখা না গেলেও এ নির্বাচনে শতকরা ৪৭ ভাগ ভোট পড়ে। উপ-নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে রাতে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। রাত ৮ টায় রিটার্নিং অফিসারের বরাত দিয়ে আওয়ামী লীগের নেতারা জানান, সব

www.pathagar.com

ক'টি কেন্দ্রে নৌকা পেয়েছে ৬০ হাজার ৮শ' ৬৫ ভোট। বিপরীতে পিঁড়ি মার্কা পেয়েছে ২৮ হাজার ৮শ' ৭৫ ভোট। এ সংবাদ পাওয়ার পর জাতীয় দৈনিকের একাধিক রিপোর্টার জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ফোন করলে জানানো হয়, নৌকা পেয়েছে ৮৮ হাজার ৮শ' ৬৫ ভোট। পিঁড়ি পেয়েছে ৪৪ হাজার ৮শ' ৭৫ ভোট। সাংবাদিকরা কিশোরগঞ্জ জেলা সদরের একটি ফ্যাক্স ফোনের দোকান থেকে সংবাদপত্র অফিসে এ সংবাদ পাঠানোর উদ্যোগ নেন। এ পর্যায়ে রাত ১০ টায় জেলা আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক এডভোকেট শাহ আজিজ এসে জানান, নৌকা পেয়েছে ৫৮ হাজার ৮শ' ৬৫ ভোট। বিপরীতে পিঁড়ি পেয়েছে ২৮ হাজার ৮শ' ৭৫ ভোট। এ সংবাদ পাওয়ার পর জাতীয় দৈনিকের ঢাকার সাংবাদিকরা রিটার্নিং অফিসারের কন্ট্রোল রুমে ফোন করেন। তখন কন্ট্রোল রুম থেকে এর সত্যতা স্বীকার করা হয়। ফলাফল নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সংবাদ কেন পরিবেশন করা হলো এ নিয়ে কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যোগাযোগ করা হলে কেউ সঠিক তথ্য দিতে পারেননি। ওদিকে নির্বাচন কমিশনে অন্য দু'টি উপ-নির্বাচনে ফলাফল বিবরণী ফ্যাক্সযোগে আসলেও কিশোরগঞ্জের ফলাফল আসে ফোনে। তাৎক্ষণিকভাবে রিটার্নিং অফিসার লিখিতভাবে ফলাফল দিতে চাননি বলে টেলিফোনের আশ্রয় নেয়া হয়। বেসরকারি ফলাফলে দেখা যায়, মোট ১ লাখ ৯৭ হাজার ৪ ভোটের মধ্যে মাত্র ৯২ হাজার ৮২ ভোট গ্রহণ হয়েছে। অর্থাৎ ১ লাখ ৫ হাজার ভোটারই ভোট দিতে যাননি। ভোটের এই হিসাব সরকারিভাবে প্রদত্ত। এ হিসাবে শতকরা ৪৭ দশমিক ৮ ভাগ ভোট পড়ে। কিন্তু ভোট কেন্দ্রগুলোতে এ আলামত দেখা যায়নি। সকাল ৮ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র ছিল ভোটার শূন্য। এ সময় কোনো কেন্দ্রেই একসাথে ১৫/২০ জনের বেশি ভোটার চোখে পড়েনি। মাঙ্গিয়াদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাকুন্দিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, মঠখোলা গার্লস স্কুল, বরুদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কেন্দ্র, ধুলজুড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মান্দারকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বরুদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, বাহাদিয়া হাই স্কুল, চরফরাদি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুড়িমারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, এগারসিন্ধু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চরপুমদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দাপুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধুলিহর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র প্রায় সময়ই ছিল ফাঁকা। ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি, প্রত্যক্ষদর্শী ও নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের বর্ণনা মতে, নির্বাচনে ২০/২৫ ভাগ ভোটার ভোট প্রদান করেছেন।

সংসদের সিরাজগঞ্জ-৭ (শাহজাদপুর), রাজশাহী-৫ (বাগা-চারঘাটা) ও কিশোরগঞ্জ-১ (পাকুন্দিয়া-হোসেনপুর) আসনের উপ-নির্বাচন বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন পর্যবক্ষণ সমাপ্ত করে। সিরাজগঞ্জে কিছু কিছু কেন্দ্রে পুলিশের সহায়তায় আওয়ামী লীগের সমর্থনকারীদের জালভোট প্রদানের অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া বিজয়ী ও পরাজিত প্রার্থী উভয়ই তাদের নিজ নিজ এলাকায় ভোট জালিয়াতি করার অভিযোগও পাওয়া যায়। রাজশাহী-৫ উপ-নির্বাচনে ভোট বর্জনের আহবানে বিরোধী দলের হরতাল থাকার প্রেক্ষিতে ভোটার উপস্থিতি খুবই নগণ্য ছিল। সরকারি হিসেবে বেশি বলা হলেও বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের পর্যাবেক্ষকগণ ১৫% এর বেশি ভোটার ভোট প্রয়োগ করেনি বলে রিপোর্টে উল্লেখ করেন। সহিংসতা ও ভোট জালিয়াতির তেমন কোন অভিযোগ রাজশাহী-৫ উপ-নির্বাচনী এলাকা থেকে আসেনি। কিশোরগঞ্জ-১ উপ-নির্বাচনে সহিংসতার ঘটনা না ঘটলেও আওয়ামী লীগের সমর্থক কর্তৃক ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা ঘটে অনেক বেশি। ভোটারদের অনিহা এবং সহিংসতার আশংকার প্রেক্ষিতে কিশোরগঞ্জ উপ-নির্বাচনে ভোটাদের উপস্থিতি ছিল খুবই কম।

www.pathagar.com

সরকারিভাবে ৪৭ শতাংশের বেশি ভোটার ভোট প্রয়োগের কথা বলা হলেও মানবাধিকার পর্যবেক্ষকগণ জানায়, প্রকৃতপক্ষে ২৫% এর বেশি ভোটার ভোট প্রদান করেনি। কিশোরগঞ্জে ব্যাপক ভোট জালিয়াতি করা হয়। হোসেনপুরের জামাইল প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আওয়ামী লীগের সমর্থকরা প্রতিপক্ষের এজেন্টদের ভোট কেন্দ্র থেকে বের করে দিয়ে জাল ভোট প্রদান করে। মানবাধিকার পর্যবেক্ষকগণ জানায়, কিশোরগঞ্জ-১ উপ-নির্বাচনের বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের আঙ্গুলে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক দেয়া আমোচনীয় কালি ব্যবহার করা হয়নি। ফলে জাল ভোট প্রদান সহজ হয়।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের পূর্বে চট্টগ্রাম অশান্ত ছিল। ৩ জানুয়ারি ২০০০ নির্বাচন শেষ হয়ে গেলে চট্টগ্রাম শান্ত হয়। মাত্র একদিনের ব্যবধানে চট্টগ্রামের দৃশ্যপট পাল্টে যায়। একদিন আগেও যে চট্টগ্রাম ছিল দেশবাসীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ভরা ভূতুড়ে নগরী, সেখানে পরেরদিন ছিল প্রাণোচ্ছল মানুষের ঢল। ৪ জানুয়ারি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ভোট পড়ে সর্বোচ্চ ৫৪ শতাংশ। ৪ জানুয়ারি রিটার্নিং অফিসার আলহাজ্ব এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীকে মেয়র হিসেবে নির্বাচিত ঘোষণা করেন। চট্টগ্রাম স্টেডিয়াম সংলগ্ন জিমনেসিয়ামে স্থাপিত অস্থায়ী নির্বাচন কমিশন ও রিটার্নিং অফিসার সিরাজুল ইসলাম মেয়র হিসেবে মহিউদ্দিন চৌধুরীকে নির্বাচিত ঘোষণা করেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের এক তরফা নির্বাচনে মেয়র পদে মনোনয়নপত্র জমাদানকারী অপরাপর তিন জন প্রার্থী ১৮ ডিসেম্বর তাদের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করায় আওয়ামী লীগ নেতা ও মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরীই একমাত্র বৈধ (?) প্রার্থী ছিলেন। কোন প্রার্থী না থাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেয়র পদে তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়। এই নীল নকশা বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা এর পূর্বে বেশ তৎপর ছিলেন। ৪১ টি ওয়ার্ডে ৫৮ জন প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ১৫৭ জন আর মহিলা কমিশনার পদে প্রার্থী ছিলেন ৩৮ জন। ৪১ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৫টি এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনের ১৪টির মধ্যে ৩টিতে একক প্রার্থী থাকায় এ আটটি পদেও নির্বাচন করার কোন প্রয়োজন ছিলনা। রমজান মাস শুরু হবার পর থেকে চট্টগ্রাম হরতাল, অবরোধ, সংঘর্ষ বোমাবাজিসহ বিরোধী দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠে। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য বিরোধী দল মরিয়া হয়ে উঠলে চট্টগ্রাম নগরীতে ক্ষোভ-বিক্ষোভের আগুন জ্বলে। মেয়র পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একজন প্রার্থীর জিতে যাওয়া সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার সংবাদপত্রকে বলেন, 'মেয়র পদে একজন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নির্বাচিত হওয়ায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক কমে গেল, আমাদের টেনশনও কমলো।' প্রধান নির্বাচন কমিশনার আরও বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতি এ নির্বাচনের অনুকূল নয় এ কথা জানিয়ে ইতিপূর্বে সরকারকে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলাম। কিন্তু সরকার তাতে সাড়া না দেয়ায় বাধ্য হয়েই আমাদের এ নির্বাচন করতে হচ্ছে।' ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯৯ থেকে হরতাল কর্মসূচি দিয়ে যে আন্দোলনের শুরু ৩ জানুয়ারি কার্ফু হরতালের মধ্য দিয়ে ২২ দিনের টানা আন্দোলনের সমাপ্তি হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার ও সরকারি দলের অনমনীয় মনোভাব এবং বিরোধী দলের প্রতিহত করার লড়াকু মনোভাবের যে যুদ্ধে ২২ দিন ধরে চট্টগ্রামের মানুষ শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় ছিল তার অবসান ঘটে নির্বাচন নাটক শেষের মাধ্যমে। মানুষের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কেটে যায়।

www.pathagar.com

২৬ সেপ্টেম্বর চরম অব্যবস্থাপনা, ব্যাপক জালভোট, ব্যালট ছিনতাই ও অনিয়মের মধ্য দিয়ে ১২টি পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিরোধী দল আগের মত পৌরসভা নির্বাচন বর্জন করায় একদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ফলে এ নির্বাচন নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে কোন উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল না। মূলত আওয়ামী লীগের একাধিক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। শান্তি পূর্ণ ভোট কারচুপির ঘটনা নির্বাচনকে কার্যত প্রহসনে পরিণত করে। আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা জালভোটের প্রতিযোগিতায় নামে। চরম অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে টঙ্গী পৌরসভার নির্বাচন শেষ হয়। এই নির্বাচনে ৪৮টি ভোট কেন্দ্রেই শত শত জালভোট পড়ে এবং শত শত ভোটার তাদের ভোট দিতে পারেননি। বেলা সোয়া একটার দিকে টঙ্গী সফিউদ্দিন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ কেন্দ্রে বেশ কিছু মহিলা ভোটার তাদের ভোটার আইডি কার্ড নিয়ে গিয়েও ভোট দিতে পারেনি। স্থানীয় প্রশাসন নির্বাচনের ভোটার তালিকা তাদের ইচ্ছামত উল্টাপাল্টা করে এক কেন্দ্রের ভোটার তালিকা অন্য কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিয়ে ভোটদানের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করে। প্রশাসনের এই অযৌক্তিক পদক্ষেপ আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে বিজয়ী করার জন্যই তৈরি করা হয়। বেলা ৩টার দিকে টঙ্গী সরকারি কলেজ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলাকালীন সময় ২ জন পোশাকধারী পুলিশ ব্যালট পেপার ভর্তি একটি বাক্স উক্ত কেন্দ্রের ৪নং বুথ থেকে গোপনে সরিয়ে অন্য কক্ষে নিয়ে যাবার সময় জনতার হাতে ধরা পড়ে এবং পরে ঐ কেন্দ্রের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রিজাইডিং অফিসার অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ব্যালট ভর্তি ঐ বাক্সটি পুনরায় ঐ বুথে পোলিং এজেন্টদের সামনে পোলিং অফিসারের কাছে বুঝিয়ে দেন। এ সময় ঐ কেন্দ্রে শ' শ' ভোটার ও জনতার মধ্যে চরম উত্তেজনা দেখা দেয়। এলাকার শ' শ' ভোটার ভোট দিতে না পারায় চরম ক্ষোভ প্রকাশ করে। অপরদিকে পুরাতন ভোটার তালিকা অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠানের কারণে ৮০ হাজার ভোটার ভোটদানে বঞ্চিত হন। এছাড়া ১০ নং ওয়ার্ডের নওয়াগাঁও ভোট কেন্দ্রে কমিশনার প্রার্থী আবুল হোসেন সিবু এবং তার স্ত্রী আঞ্জুমান আরা বেগমকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী কমিশনার প্রার্থী মোঃ নূরুল ইসলাম (নুরু)-এর লোকজন লাঞ্ছিত করে। নির্বাচনের প্রতিটি ভোট কেন্দ্রেই চরম অব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়। অনেক মহিলা কমিশনার পদপ্রার্থীই নির্বাচনের আচরণ বিধি লংঘন করে নির্বাচনে অংশ নেয়। ভোটাররা চরম হয়রানির শিকার হয় এই নির্বাচনে। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর পৌরসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ করা হয়। সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর পৌরসভার নির্বাচনে হারুনুর রশীদ হিরণ মিয়া চেয়ারম্যান পদে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হন। তিনি থানা আওয়ামী লীগের একাংশের সভাপতি এবং উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেন ও স্পীকার গ্রুপের লোক হিসেবে পরিচিত। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আশীর্বাদপুষ্ট সিদ্দেক গ্রুপের সমর্থক পৌর প্রশাসক মুকিত মিয়া তৃতীয় স্থান লাভ করেন। সিদ্দিক গ্রুপের অপর প্রার্থী আব্দুল হকের সাথে হিরণ মিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীতা হয়। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর সিলেটে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের ক্ষমতার লড়াই তীব্র হয়ে উঠে। বগুড়ার নবগঠিত পৌরসভার নির্বাচনে আব্দুল হামিদ সরদার ৩৪৭০ ভোট পেয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। নির্বাচনে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ওয়ারেছ আলী পান ১৭৭৩ ভোট। রংপুর জেলাধীন নবগঠিত বদরগঞ্জ পৌরসভার নির্বাচন ব্যাপক জালভোট ও কারচুপির মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। এ নির্বাচনে বেসরকারিভাবে স্থানীয় আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী আনিছুল হক চৌধুরীর লোক রিক্সা মার্কার প্রার্থী উত্তমকুমার সাহা ৩ হাজার ৪শ' ৯০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাইকেল মার্কার প্রার্থী মোশাররফ হোসেন পান ২ হাজার ৬শ' ৪৫ ভোট। এছাড়া আরেকজন প্রার্থী একরামুল হক দুলু

www.pathagar.com

ছাতা মার্কায় ভোট পান ১ হাজার ৬শ' ৪৪ ভোট। উত্তম কুমারের পক্ষে নির্বাচনের আগের রাতে এলাকার লোকজনের মধ্যে টাকা বিতরণ করে ভোটারদের কিনে নেয়া হয়। এছাড়া সরকারি ক্ষমতার প্রভাবও খাটানো হয় বিভিন্নভাবে। নির্বাচন চলাকালে সকাল ১১টার দিকেই অসংখ্য ভোটার ভোট দিতে এসে দেখেছে তাদের ভোট দেয়া হয়ে গেছে। এ জাল ভোট দেয়ার অভিযোগে কর্তৃপক্ষ ২৬ জনকে গ্রেফতার করে। নির্বাচনে মোট ৯ হাজার ৭শ' ৬১ জন ভোটারের মধ্যে ৭ হাজার ৭শ' ৭৯ জন ভোট দান করেন। নাটোরের গঠিত গোপালপুর পৌরসভার নির্বাচনে কেশবপুর কেন্দ্রে জাল ভোট দেয়ার চেষ্টা করায় পুলিশ মোস্তাক আলী ও কফের আলীকে আটক করে। নির্বাচনে লালপুর থানা যুবদলের আহ্বায়ক মঞ্জুরুল ইসলাম বিমলকে চেয়ারম্যান পদে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আওয়ামী লীগের আলহাজ শাহাব উদ্দিন আহমেদ সাদু। নওগাঁ জেলার নতুন বদিপুর পৌরসভার নির্বাচনে বেসরকারিভাবে এছাহাক হোসেনকে (গরুর গাড়ি মার্কা) জয়ী ঘোষণা করা হয়। এছাহাক হোসেন ১৭৪৮ ভোট পেয়ে জয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আনোয়ার হোসেন (চাকা মার্কা) পন ১৭২৪ ভোট। মোট ভোটার ৭১১৫ জনের মধ্যে ৬১৭১ জন ভোট প্রদান করেন। তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় এমপি শামসুজ্জোহা খান তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'ভোটে কারচুপি করা হয়েছে।' এই কারচুপির বিরুদ্ধে মিছিল বের হয়। মিছিলকারীরা একটি স্মারকলিপি এডিএম-এর কাছে দিতে গেলে স্মারকলিপিটি নেয়া হয়নি।

কুমিল্লা পৌরসভার নির্বাচন পরিদর্শনে গিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কেন্দ্রগুলোতে ব্যাপক অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, জালিয়াতি, বিশৃঙ্খলা, অসংখ্য জালভোট, কেন্দ্র দখল, ব্যালট বই ছিনতাই, আওয়ামী লীগের বিরোধী প্রার্থীদের এজেন্টকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া, মহিলা ভোটারদের লাঞ্ছনা, শত শত ভোটারের ভোট দিতে না পারা এবং আরো নানা কারচুপির ঘটনা স্বচক্ষে দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। কেন্দ্রগুলোতে ভোটারদের হয়রানি, স্থানীয় কর্মকর্তাদের ব্যর্থতা ও সার্বিক অরাজক অবস্থার প্রেক্ষিতে হতাশ হয়ে তিনি মন্তব্য করেন, 'টোটাল ক্যাওয়াজ। হোয়াট ক্যাওয়াজ ইউ আর ক্রিয়েটিং ফর দেম।' সকাল ১০ টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত শহরের ৭টি কেন্দ্র পরিদর্শন করে তিনি গোবিন্দপুর প্রাইমারী স্কুল ও লুৎফুন্নেসা গার্লস স্কুল কেন্দ্রের ভোট গ্রহণই বাতিলের নির্দেশ দেন। তবে এই দুই কেন্দ্রের ভোট বাতিলের সিদ্ধান্ত নিতে সিইসিকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে ঘন্টাধিকালেরও বেশি সময় ধরে নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তার সাথে শলাপরামর্শ করতে হয়। কুমিল্লা পৌরসভার নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও সাংবাদিকরা দেখতে পান, সেখানের কেন্দ্রগুলোতে কমপক্ষে শতকরা ৫০ ভাগই জালভোট পড়েছে। নির্বাচনের নামে চলছে প্রহসন। ৩২টি কেন্দ্রে পুরুষ-মহিলা মিলে হাজার হাজার ভোটার ভোট দিতে না পেরে ফিরে যেতে বাধ্য হন। এদের অধিকাংশেরই আইডি কার্ড থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রে প্রবেশ করে পোলিং অফিসারদের কাছে জানতে পারেন, তাদের ভোট আগেই দেয়া হয়ে গেছে। কে বা কারা তাদের ভোট দিয়ে গেছে তা কেউ বলতে পারে না। এত জাল ভোট সত্ত্বেও স্থানীয় নির্বাচনী কর্মকর্তারা কোন জাল ভোট দাতাকেই গ্রেফতার করেননি। তবে এই কারচুপির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় অত্যন্ত নীরবে ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে। কেন্দ্রগুলো পরিদর্শনে গেলে প্রতিটি বুথেই ৮/১০ জন করে ভোটার প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে অভিযোগ করেন যে, তাদের ভোট কে বা কারা আগেই দিয়ে গেছেন বলে তদের বৈধ ভোটটি আর নেয়া হচ্ছে না। প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রিজাউডিং ও পোলিং অফিসারদের কাছ থেকে যাচাই করে এবং

www.pathagar.com

ভোটার লিষ্ট পরীক্ষা করেও এর সত্যতা পান। বেশ কয়েকজনের জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ চ্যালেঞ্জিং ভোটেরও ব্যবস্থা করেন। অবশেষে তিনি তার ডায়রীতে ৭ কেন্দ্রে এ ধরনের শতাধিক ভোটারের নাম-ধাম তালিকাভুক্ত করার পর এক পর্যায়ে হতাশ হয়ে তিনি ঐ তালিকা করা বন্ধ করে সার্কিট হাউসে ফিরে আসেন এবং লজ্জায়, ক্ষোভে-দুঃখে সাংবাদিকদের সাথেও দেখা করতে অস্বীকার করেন। দুপুর সোয়া ১১টায় গোবিন্দপুর প্রাইমারী স্কুল কেন্দ্রে গিয়ে সিইসি দেখতে পান কেন্দ্রটিতে ভোটারদের তেমন কোন উপস্থিতি নেই। বাইরে ভোটারদের কোন লাইনও নেই। অথচ এই কেন্দ্রর ২ হাজার ১২০ টি ভোটের মধ্যে ততক্ষণে প্রায় সাড়ে ৮ শ' ভোট গ্রহণ শেষ হয়ে গেছে। কেন্দ্রটি কুমিল্লা জেলা আওয়ামী লীগ নেতা আফজাল খানের নিয়ন্ত্রণাধীন। সেখানে আওয়ামী লীগের বেশকিছু ক্যাডার কেন্দ্রটি ভেতরে-বাইরে পাহারা দিচ্ছে এবং নিজেরাই ইচ্ছেমত ব্যালট পেপার ছিঁড়ে রিকশা মার্কায় সীল দিয়ে বাক্সে ঢুকাচ্ছে। ফলে কোন ভোটারেরও প্রয়োজন পড়ছে না। সেখানে বিএনপিপন্থী প্রার্থী কামাল উদ্দীন চৌধুরী (ঘড়ি মার্কা) ও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী শফিকুল ইসলাম সিকদারের (মোমবাতি) কোন এজেন্টকে প্রবেশই করতে দেয়া হয়নি। কেন্দ্রটিতে অন্যতম চেয়ারম্যান প্রার্থী কামাল উদ্দীন চৌধুরী এ অভিযোগ প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে জানালে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জসীম উদ্দীন আহমদের (রিকশা মার্কা) পৃষ্ঠপোষক আফজাল খান কেন্দ্রের ভেতরেই সিইসির সামনে জনাব কামালকে গালাগালি করেন এবং আক্রমণে উদ্যত হন। এক পর্যায়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে আফজাল খানকে ধমকে কেন্দ্র থেকে বের করে দেন। এখানে আফজাল খান সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান, 'কুমিল্লা পৌরসভার ১৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে তার নিয়ন্ত্রণাধীন এই ৭ ওয়ার্ডের সাধারণ ও সংরক্ষিত মহিলা কমিশনার পদে তার ভাই এবং মেয়ে যথাক্রমে আমানুল্লাহ খান হিম্মত ও আনুজমান সুলতানা সীমা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। কেউ তাদের সামনে প্রার্থী হতে সাহস পাননি।' কেন্দ্রটির ভোট গ্রহণেও দেখা গেল ব্যাপক অনিয়ম। নিয়ম ভঙ্গ করে নির্বাচন কর্মর্কতারা ব্যালট পেপারে আগেই গোল সীল মেরে রেখেছে এবং কাউন্টার ফয়েলে কোন ভোটারদেরই স্বাক্ষর রাখা হচ্ছে না। এ দেখে সিইসি বিস্ময় প্রকাশ করেন। এখানে কাজী বরকত আলী খান (২০ নং ভোটার) নামে একজন ভোটার সিইসির কাছে অভিযোগ করেন যে, আইডি কার্ড থাকা সত্ত্বেও তার ভোট আগেই দেয়া হয়ে গেছে। অপরদিকে সিদ্দিক মিয়া নামে একজন পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তি আসেন ভূয়া ভোট দিতে। একঘন্টা অবস্থানের পর সিইসি এ কেন্দ্র ত্যাগ করা মাত্রই আওয়ামী লীগের সংঘবদ্ধ ক্যাডাররা বুথ দখল করে আবার জাল ভোট প্রদান শুরু করে এবং কেন্দ্র কর্মকর্তারাই তাদেরকে এ কাজে সহায়তা করে। নির্বাচন কমিশনের একজন কর্মকর্তা মোস্তফা ফারুক এসব জাল ভোটারদের ধরে দিলেও কেন্দ্র কর্মকর্তারা তাদের ছেড়ে দেন। গাড়ীতে বসে খবর পেয়ে অবশেষে সিইসি কেন্দ্রটির ভোট গ্রহণ বাতিলের নির্দেশ দেন। এর আগে সকাল ১০টায় মডার্ন স্কুল কেন্দ্র পরিদর্শন করতে গেলে সেখানে শ' শ' ভোটার প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে অভিযোগ করেন যে, তাদের ভোট দিতে কর্মকর্তারা অস্বীকার করছেন। এসব ভোটাররা ছিল আওয়ামী লীগ বিরোধী। লিষ্টে নাম থাকা সত্ত্বেও আশোকতলা নোনাতলা এলাকার এসব ভোটারের ও লিষ্ট সুকৌশলে কেন্দ্রটিতে পাঠানো হয়নি এবং লিষ্ট নেই বলে কর্মকর্তারাও তাদের ভোট দিতে টালবাহানা করেন। এ অবস্থায় ভোটাররা এক বুথ থেকে আরেক বুথে এবং এক কেন্দ্র থেকে আরেক কেন্দ্রে ছুটাছুটি করে হয়রানি হন। সেখানে ৭৯০ নং থেকে ৮৯১ নং পর্যন্ত ১শ' ভোটারের একটি লিষ্ট স্বয়ং প্রধান নির্বাচন কমিশনারও খুঁজে পাননি। দুপুর সোয়া

www.pathagar.com

১টায় লুৎফুন্নেছা গার্লস স্কুল কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায়, কেন্দ্রটির ভেতরে যুবকদের ব্যাপক ভিড়। বুথগুলো এজেন্টদের দখলে। সেখানে কে ভোটার কে এজেন্ট তা বোঝার উপায় নেই। কেন্দ্র কর্মকর্তাদের নির্দেশ কেউ মানছে না। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে আওয়ামী লীগের ১০/১২ জনের একদল যুবক, পুলিশ ও কেন্দ্র কর্মকর্তাদের সামনেই এখান থেকে ২টি ব্যালট বই ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তারা ব্যালট বাক্সও ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত বাক্স নিতে পারেনি। পরে এসব ব্যালটে সীল দিয়ে তারা বিভিন্ন বুথের বাক্সে ভরে দিয়ে যায় এবং ব্যালটের মুড়িও ফেরত দেয়। তারা বিএনপিপন্থী ঘড়ি মার্কার এজেন্টদের বের করে দেয়। এ সময় কেন্দ্রের বাইরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং দুদলের কিছুক্ষণ ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে। ঘটনার সময় পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকলে সেনা সদস্যরা এক পর্যায়ে পুলিশের কাছ থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে উচ্ছৃংখল জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ সময় ছুটাছুটিতে বেশ কিছু মহিলাও লাঞ্ছিত হয়। পরে ভোটারদের সারিবদ্ধ করে লাইনে দাড় করানো হলেও তারা একে একে ভেতরে গিয়ে জানতে পারেন তাদের অধিকাংশেরই ভোট দেয়া হয়ে গেছে। ব্যালট পেপার ছিনতাইয়ের সময় এ কেন্দ্রে প্রায় আধা ঘন্টা ভোট গ্রহণ করা বন্ধ থাকে। তবে কেন্দ্রের ভেতর প্রায় ৬০% জাল ভোট পড়ে। কেন্দ্রে নিয়ম-শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় অপারগ হয়ে প্রিজাইডিং অফিসার কাজল কান্তি দে সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করেন, 'আমি ব্যর্থ হয়েছি। পুলিশ, পোলিং এজেন্ট কেউই আমার কথা মানছে না।' ২ হাজার ৮১০ ভোটের এই কেন্দ্রে দুপুরের আগেই দেড় হাজার ভোট গ্রহণ শেষ হয়ে যায় অথচ শতাধিক ভোটার সিইসির কাছে অভিযোগ করেন যে, তাদের ভোট কে বা কারা আগেই দিয়ে দেয়ায় তাদের ভোট দেয়া হচ্ছে না। অবশেষে সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে সিইসি এই কেন্দ্র বাতিলের নির্দেশ দিয়ে চলে আসেন। এ কেন্দ্রের দায়িত্বরত ম্যাজিস্ট্রেট শওকত হোসেন চৌধুরীর ভূমিকা ছিল রহস্যজনক। তিনি ব্যালট বই ছিনতাইয়ের ঘটনা অস্বীকার করেন। নারী ভোটারদের লাঞ্ছনার ঘটনার বিষয়ে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'মহিলাদের ইজ্জত রক্ষায় আমি বুক পেতে দিয়েছি। তবে কেন্দ্রের শান্তি শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব আমার নয়।'

রাতারাতি ভোটারদের ক্রমিক নম্বর ও কেন্দ্র পরিবর্তন, ব্যাপক অনিয়ম, জাল ভোট ও কারচুপির মধ্য দিয়ে টঙ্গী পৌরসভার নির্বাচন সম্পন্ন হয়। বিরোধী দলের বর্জনের মুখে উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনাবিহীন এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের সমর্থকরা বিভিন্নভাবে কারচুপির আশ্রয় নিয়ে ফলাফল নিজেদের দিকে নেয়ার চেষ্টা করে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিল (নির্বাচন সময়কার চেয়ারম্যান) ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজমত উল্লাহ খান, জেলা আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি কাজী মোজাম্মেল হক ও থানা আওয়ামী লীগ নেতা শাহাজাদা আলম। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন হাফিজ উদ্দিন সরকার। পৌরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের দত্তপাড়া এলাকার ৩টি ভোট কেন্দ্রের ৭ হাজার ভোটারকে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়। ভোটের পূর্বরাতে টঙ্গী ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা কেন্দ্র, দত্তপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র ও বনমালা প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের ৬৯৯৩ জন ভোটারের ক্রমিক ও কেন্দ্র আকস্মিকভাবে পুর্নবিন্যাস করায় ভোট গ্রহণে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ভোটাররা পূর্ব নির্ধারিত কেন্দ্রে ভোট দেয়ার জন্য সকাল থেকে সারিবদ্ধ হয়ে বুথে ঢুকলে তাদের জানান হয়, কেন্দ্র পরিবর্তন হয়েছে, অমুক কেন্দ্রে যান। আবার অনেক ক্ষেত্রে ভোট কর্মকর্তারা জানাতই পারেননি কেন্দ্র পরিবর্তন করে কোথায় পাঠানো হয়েছে। চেয়ারম্যান ও কমিশনার প্রার্থীর পোলিং এজেন্টরা পূর্বনির্ধারিত কেন্দ্র অনুযায়ী তালিকা নিয়ে এসে জানতে পারেন সেটা

www.pathagar.com

পরিবর্তন হয়েছে। তারাও ছুটাছুটি শুরু করে নতুন তালিকা সংগ্রহের জন্য। ফলে এসব কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শুরু করতেও বিলম্ব হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যালট বাক্স পৌঁছতেও বিলম্ব হয়। দত্তপাড়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রের একটি বুথে ভোট গ্রহণ শুরু হয় সকাল ১০ টায়। ২ ঘন্টা বিলম্বে শুরুর কারণ ছিল ব্যালট বাক্স আসতে বিলম্ব হয়েছে। এই কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার আতাউজ্জামান বিলম্বে ভোট শুরুর কথা স্বীকার করলেও তিনি ২ ঘন্টা বিলম্বের কথা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, কোন কোন পোলিং অফিসার আসতে দেরী হওয়ায় কয়েকটি বুথে বিলম্বে ভোট গ্রহণ শুরু করতে হয়েছে। মিরণ নামের এক ভোটার জানান, তিনি ৭ টায় এসে লাইনে দাঁড়িয়েছেন। ৩ ঘন্টা পর বুথে ঢোকার সুযোগ পেয়েছেন। ভোটার ইউসুফ জানান, সীল মারার গোপন বুথ একটা কক্ষে থাকায় ভোট গ্রহণে গতি নেই। তিনটি ব্যালটে সীল দিয়ে বাক্সে ঢোকাতে গড়ে ৪/৫ মিনিট করে সময় লেগে যায়। মাদ্রাসা কেন্দ্রে মহিলা বুথের সাইকেল মার্কার পোলিং এজেন্ট বিপ্লব জানান, মাদ্রাসা কেন্দ্রে ১ থেকে ১২৫০ পর্যন্ত মহিলা ভোটারদের ভোট গ্রহণের কথা ছিল। আমরা সে অনুযায়ী তালিকা নিয়ে এসেছি। হঠাৎ করে সকালে এসে দেখি ২৭১ থেকে ৭৬০ পর্যন্ত ভোটারদের এ কেন্দ্র থেকে সরিয়ে ফেলেছে। এই ভোটারদের যে কোথায় দিয়েছে প্রিজাইডিং অফিসার আমাদের এখনও জানায়নি। এতে করে শত শত মহিলা এখানে এসে ভোট না দিতে পেরে ফিরে যাচ্ছে। গেজেটে যেভাবে কেন্দ্র বিন্যাস ও ভোটার বন্টন করা হয়েছে তা আকস্মিক পরিবর্তনে এ বিড়ম্বনা দেখা দিয়েছে। এ কেন্দ্রের ভোটার আকবর খান জানান, তিনি অসুস্থ শরীরে ভোট দেয়ার জন্য পূর্ব নির্ধারিত দত্তপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যান। সেখানে জানানো হয়, মাদ্রাসা কেন্দ্রে স্থানান্তর হয়েছে। এখানে আসার পর এখন বলছে, দু'মাইল দূরে বনমালা প্রাইমারী কেন্দ্রে যেতে হবে। চেয়ারম্যান প্রার্থী হাফিজ উদ্দিন সরকারের নিজ গ্রামে ভোট গ্রহণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আজমত উল্লাহ খানের পরিকল্পিত কারসাজি হিসেবে আখ্যায়িত করেন অনেক ভোটার। এ এলাকায় ভোট কাস্টিং এর হার কমিয়ে রাখাই এ কারসাজির লক্ষ্য বলে মন্তব্য ছিল তাদের। মাদ্রাসা কেন্দ্রে কোন কোন বুথে বেলা ১১ টায় মাত্র ১০০ ভোট পড়ে। এটাই আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সাফল্য বলে আজমত উল্লাহ খানের সমর্থকদের উৎফুল্ল প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। বনমালা কেন্দ্রে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আবুল হাসেম প্রিজাইডিং অফিসারের সামনে সাংবাদিকদের জানান, 'এমপি সাহেব ও চেয়ারম্যান সাহেব ডিসিকে বলে দত্তপাড়ার এই তিন কেন্দ্রের ভোটারদের কেন্দ্র পুর্ননির্ধারিত করেছেন গতরাতে।' এই কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার জানান, ৭ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত গেজেট অনুযায়ী বনমালা কেন্দ্রে মোট ভোটার ছিল ১৪২৩ জন। গতরাতের পরিবর্তনের কারণে ভোটার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭৪৭ জনে। ভোটার আইডি কার্ডে ভুল, ভোটার তালিকার মুদ্রণপ্রমাদ প্রভৃতি কারণেও অনেক জাল ভোট হয়েছে এবং অনেক ভোটার ভোট দিতে পারেনি। আইডি কার্ড প্রদর্শন করেও অনেকে ভোট দিতে ব্যর্থ হয়। জানানো হয়, আগেই ভোট দেয়া হয়ে গেছে। শফিউদ্দিন একাডেমী এন্ড কলেজ কেন্দ্রের সেলিনা আক্তার আইডি কার্ড নিয়ে ভোট দিতে আসে। কার্ডে তার স্বামীর নাম লেখা ছিল তাজুল ইসলাম আবার ভোটার তালিকায় স্বামীর নাম আবু বকর। মহিলারা অপদস্ত হয়ে ভোট না দিয়ে ফিরে যান। এ কেন্দ্রে মালেকা বানু (ভোটার নং ২২৩৮) ও সাহেদা বেগম (নং ২৩৮২) নামে দুই মহিলা এসে দেখেন, তাদের ভোট আগেই দেয়া হয়ে গেছে।

২০ ডিসেম্বর খুলনা-৫ আসনের উপ-নির্বাচন সরেজমিনে পরিদর্শন শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ সাঈদ উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, 'এটা নির্বাচন নয়। আগামী জাতীয়

www.pathagar.com

নির্বাচনের রিহার্সেল মাত্র।' সিইসির এ বক্তব্য নিয়ে তোলপাড় হয়েছে কমিশন ও রাজনৈতিক মহলে। অনেকে বিস্মিত হন। ক্ষুব্ধ অনেকে। অনেকের মন্তব্য করেন, 'সিইসি'র ভবিষ্যদ্বাণী আগামীতে সত্য হলে তা মোটেই সুখকর হবে না।' একাধিক নির্বাচন কমিশনার, দেশের প্রধান ৪টি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দসহ অনেকেই এ বক্তব্যে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'এই উপ-নির্বাচন যদি রিহার্সেল হয়, তবে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনও কি এরকম হবে?' এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনার মুশতাক আহমদ চৌধুরী বলেন, 'কোনটা নির্বাচন আর কোনটা রিহার্সেল সেটা প্রধান নির্বাচন কমিশনারই ভালো বলতে পারবেন। এ জাতীয় নির্বাচনে হেলিকপ্টারে চেপে একগাদা টাকা খরচ করে যাওয়ার যৌক্তিকতা কতটুকু তা আমার বোধগম্য নহে।' তার প্রশ্ন, 'আর এটা যদি রিহার্সেল হয় তাহলে পুরো থিয়েটারটা কবে হবে?' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আর একজন নির্বাচন কমিশনার বলেন, 'আমি নির্বাচনী এলাকায় যাইনি। প্রধান নির্বাচন কমিশনার সরেজমিনে নির্বাচনী এলাকায় ঘুরেছেন। তিনি সবকিছু দেখেছেন। সবকিছু দেখার পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার যদি এটাকে নির্বাচনী রিহার্সেল হিসেবে আখ্যা দেন, তাহলে আগামী সংসদ নির্বাচন কেমন হবে তিনিই ভালো বলতে পারবেন।' অন্য একজন নির্বাচন কমিশনার বলেন, 'প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছেন নির্বাচন নয়, রিহার্সেল। কিন্তু নির্বাচন সব সময়ে নির্বাচনই হয়, কখনো রিহার্সেল হয় না। তবে এটা সত্য যে, প্রতিদ্বন্দ্বি না থাকা, আগামী সংসদ নির্বাচন ঘনিয়ে আসা, রমজান মাস, ধান কাটার মওসুম-সর্বোপরি উপ-নির্বাচন বিধায় ভোটারদের উপস্থিতি ছিল খুবই কম। এ কারণে কোনো নির্বাচনকে নির্বাচনী রিহার্সেল বলার অবকাশ নেই।'

৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ পাবনা পৌরসভা ও সদর উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত পাবনা-৫ আসনের বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য রফিকুল ইসলাম বকুল সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কারণে শূন্য আসনে একতরফা, জাল ভোটের এবং অনেকটাই ভোটারবিহীন উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ সাঈদ ভোট কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে বলেই ফেলেন, 'কেন্দ্রে লোক নেই, তবু কি ৪০ ভাগ ভোটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে কিনা কে জানে!' উপ-নির্বাচন সরেজমিন পরিদর্শনকালে তিনি বলেন, 'প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন এ নির্বাচনে কারচুপির রিহার্সেল দিচ্ছে।' প্রধান বিরোধী দলগুলো আগের মতো এ উপ-নির্বাচনও বর্জন করায় এ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর জয়লাভ ছিল শুধু সময়ের ব্যাপার। আর এ কারণে প্রচার প্রচারণাও ছিল সীমিত। সকালে হেলিকপ্টার থেকে পাবনা শহরে নেমে নির্বাচনের কোনো আমেজ খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সাত প্রার্থীর মধ্যে শুধু আওয়ামী লীগের প্রার্থীর ছিটেফোঁটা দু'একটা পোস্টার চোখে পড়েছে। ভোট কেন্দ্রগুলোতেও কোন প্রচারণা ছিল না। এ বিষয়ে পাবনা শহরের বই বিক্রেতা আওয়াল মিয়া প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে পাবনা আসতে আপনাদের যত টাকা খরচ হয়েছে তার চেয়েও কম টাকায় সংসদ সদস্য হয়ে গেলেন ডা. কাদেরী।' তার মতে নির্বাচনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায় মানুষের এ নিয়ে কোনো আগ্রহ নেই। উপ-নির্বাচনের ১০০টি কেন্দ্রের অধিকাংশই ছিল ফাঁকা। দিনভর বেশ কিছু কেন্দ্রে কোথাও ৯ থেকে ১৮ শতাংশের বেশি ভোট পড়তে দেখা যায়নি। কোনো কেন্দ্রেই ভোটারদের লাইন ছিল না। প্রধান নির্বাচন কমিশনার যাওয়ায় স্থানীয় প্রশাসন টেলিভিশন ক্যামেরার জন্য অতিকষ্টে দুটি কেন্দ্রে লাইনের ব্যবস্থা করে দেন। সিইসি সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত যে ৭টি কেন্দ্রে গেছেন সেগুলোতে গড়ে ১০ ভাগ ভোট পড়েনি। কোন কোন কেন্দ্রে মাত্র আড়াই ভাগ ভোট পড়ে। খয়েরসূতি, নলদহ, দুবলিয়া সাদুল্লাপুর, তারাবাড়িয়া কেন্দ্রগুলো ছিল

www.pathagar.com

ফাঁকা। গ্রামের কেন্দ্রগুলোতে ভোটার ছিল না। শুধু কোলচরী স্কুল কেন্দ্রে দুপুর পর্যন্ত ৩৬ ভাগ ভোট পড়ে। সিইসি সেখানে এক তরুণকে জাল ভোট দেয়ার সময় হাতেনাতে ধরে ফেললে সবাই কেন্দ্র ছেড়ে চলে যায়। বেলা সোয়া ১টায় সিইসি সেখানে বলেন, 'ওই কেন্দ্রে ভোট কারচুপি হচ্ছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই নির্বাচনে, তবু ভোট পড়েছে ৩৬ ভাগ, আমরা না এলে ৫০ ভাগ হয়ে যেত।' দিনভর নির্বাচন পরিদর্শন শেষে সিইসি নির্বাচন সম্পর্কে সাংবাদিকদের কাছে কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি। বিরোধী দলের বর্জনের মুখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী প্রার্থী, শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মাজহার আলী কাদেরী ছাড়া বাকি ৭ জন প্রার্থীর পোলিং এজেন্টও ছিল না। দুজন ছাড়া বাকি প্রার্থীদের নামও জানা ছিলনা ভোটারদের। স্বতন্ত্র প্রার্থী মাসুদা আক্তার বকুলের টেলিভিশন মার্কার এজেন্ট পাওয়া যায় শহরের কয়েকটি কেন্দ্রে। প্রশাসন এ আসনের ১০০টি কেন্দ্রের মধ্যে ৫৫টিকেই অতি ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছিল। কিন্তু সেসব কেন্দ্রের কয়েকটিতে গিয়ে ঝুঁকি দূরের কথা, ভোটারকেই পাওয়া যায়নি। পুলিশ, বিডিআর, আনসার অলস সময় কাটিয়েছে। কোলচড়ি কেন্দ্রে একজন নির্বাচনী কর্মকর্তা সিইসিকে বলেন, 'সেখানে একতরফা ভোট হচ্ছে।' শহরতলীর আরিফপুর মাদ্রাসা কেন্দ্রে পোলিং অফিসাররা বলেন, 'বড় দলগুলোর প্রার্থী না থাকায় ভোটাররা নির্বাচনের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে না।' আওয়ামী লীগের প্রার্থীর পক্ষেও কেন্দ্রগুলোতে তেমন প্রচারণা দেখা যায়নি। নৌকার মাত্র ১৮০০ পোষ্টার ছাপানো হয়েছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি প্রতিনিধি দল বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে যান। তারা জানান, 'আগামী জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের কাজ সম্পর্কে ধারণা পেতে তারা পাবনার উপ-নির্বাচন দেখতে গেছেন। কৃষ্ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে সকাল পৌনে ১১টা পর্যন্ত মাত্র ৪.৩ ভাগ ভোট পড়ে। সেখানে একটি বুথে ১০৫৩ জন ভোটারের মধ্যে তখন পর্যন্ত ভোট পড়ে ৭৩টি। আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সমর্থক-ভোটাররা সিইসিকে দেখাতে লাইন দিয়ে দাঁড়ালেও সিইসি চলে যাওয়ার পরই কেন্দ্র শূন্য হয়ে যায়। পিটিআই কেন্দ্রে মহিলা বুথে ২ হাজার ৮৪৩ জন ভোটারের মধ্যে ১১ টা পর্যন্ত ভোট দেন ৩০ জন। ওই কেন্দ্রের ১ নং বুথে ৪১৫ জন ভোটারের মধ্যে তখন পর্যন্ত ভোট দেয় মাত্র ৩ জন। বেলা পৌনে ১২টায় আরিফপুর মাদ্রাসায় ৮/১০ জন মহিলা লাইনে দাঁড়ানো ছিল। সেখানে ৫নং বুথে ৪৬০ জন ভোটারের মধ্যে তখন পর্যন্ত ভোট পড়েছে ১২টি। ৬ নং বুথে ৪৫১ ভোটারের মধ্যে ৪৫টি ভোট পড়ে। ১২টায় খয়েরসুতি উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ কেন্দ্রে গিয়ে ভোট ফাঁকা কেন্দ্র দেখে সিইসি ক্ষেপে যান। তিনি পোলিং অফিসারদের জিজ্ঞাসা করেন, 'ভোটারদের লাইন কোথায়?' সেখানে ১ নং বুথে ১০৫৩ জন ভোটারদের মধ্যে তখন পর্যন্ত ভোট দেন ৫৮ জন। ৩ ও ৪ নং বুথে কোন ভোটার ছিল না। কেন্দ্রের কোথাও একটি নির্বাচনী পোস্টারও ছিল না। নীলদহ, দুবলিয়া কেন্দ্র দুটি একেবারে শূন্য দেখে সিইসি সেখানে গাড়ি থেকে নামেননি। তারাবাড়িয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে তিনি দুবার যান। সেখানে ৩ হাজার ১৭৬ জন মহিলা ভোটারের মধ্যে বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত মাত্র ৮৪টি ভোট পড়ে। এখানে মাত্র আড়াই ভাগ ভোট পড়তে দেখে সিইসি অবাক হয়ে যান। তিনি ভোট গ্রহণের হার হিসাব করতে থাকেন। সেখানে একটি বুথে বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত ছিল ৩১টি ভোট। বেলা আড়াইটায় আবার সেখানে গিয়ে দেখা যায়, আরেকটি ভোটও পড়েনি। সেখানে সিইসি ভোট গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের বলেন, 'সবাই বলে নির্বাচন নিরপেক্ষ হচ্ছে না। আমাদের এ অপবাদ নেয়ার দরকার নেই। খুলনার উপনির্বাচনে ৪০ ভাগ ভোট পড়েছে দেখানো হলেও মিডিয়া বলেছে ২০ ভাগ ভোট পড়েছে। যেখানে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, সেখানে কত ভোট

www.pathagar.com

পড়বে! যা ভোট পড়ে তা-ই দেখাবেন, আমাদের ওপর সবার বিশ্বাস যাতে চলে না যায়। কারণ সামনে জাতীয় নির্বাচন। এখন থেকেই কেউ কেউ বলছেন, নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না।' পরে তিনি কোলচরী বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে বেশি সময় কাটান। সেখানে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়ে। আওয়ামী একজন সাবেক এমপির বাড়ির দরজার এ কেন্দ্রে বেলা ১টা পর্যন্ত ৩৬ ভাগ ভোট পড়ে। ২ হাজার ৫৯৬ জন ভোটারের মধ্যে ৯৩৭টি ভোট পড়ে। বিকেল ৩টায় সেখানে ১৪টি ভোট বাড়ে। ওই কেন্দ্রে ইলিয়াস মন্ডল নামে এক মাদ্রাসা ছাত্র জাল ভোট দিতে গিয়ে সিইসির হাতে ধরা পড়ে। তিনি তাকে পুলিশে সোপর্দ করেন। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে পাবনা থানায় নিয়ে যায়। সিইসি বলেন, সেখানে একটি সংঘবদ্ধ চক্র ভোট কারচুপি করছে। মিলিটারী, পুলিশ, আনসার দিয়ে ভোট কারচুপি রোধ করা যাচ্ছে না বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। সেখানে যে আধঘন্টা পর্যবেক্ষকরা ছিলেন তখন একজন ভোটারও পাওয়া যায়নি। সেখানে জাল ভোটার ধরার পর সিইসি নির্বাচন কমিশনের যুগ্ম সচিব (আইন) আলাউদ্দিন সরদারকে আরও কিছু সময় নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য রেখে আসেন। পরে সাদুল্লাপুর স্কুল কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায়, একজন ভোটারও নেই। একটি বুথে ৮৩৫ জন ভোটারের মধ্যে মাত্র ৯২ জন ভোট দিয়েছেন। সেখান থেকে সিইসি পাবনা শহরে ফিরে জালভোট দেয়ার কারণে গ্রেফতারকৃত তরুণটিকে দেখতে যান। তিনি তাকে শাস্তি না দিয়ে তাকে কারা প্ররোচনা দিয়ে জাল ভোট দিতে পাঠিয়েছে তা খুঁজে বের করতে পুলিশকে নির্দেশ দেন। পাবনার জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার হাসিনুর রহমান এবং পুলিশ সুপার আসাদুজ্জামান মিয়া সিইসির সঙ্গে ছিলেন। পাবনা শহরের মালিগলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে বেলা ২টা পর্যন্ত কোন ভোট পড়েনি। শিবরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে বেলা ২টা পর্যন্ত ভোট পড়ে ৪ শতাংশ। বেলা ২টা পর্যন্ত কোন কেন্দ্রেই ১০ ভাগের বেশি ভোট পড়েনি। শহরের বিভিন্ন কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী ছাড়া অন্য কোন সাধারণ মানুষকে দেখা যায়নি।

ভোটার তালিকা নিয়ে আওয়ামীদের নগ্ন রাজনীতি জনদুর্ভোগের সৃষ্টি করে। নির্বাচন কমিশন ডাটা-বেইজ ভোটার তালিকা তৈরির কাজ শুরু করে ১৯৯৫ সালে। মাসব্যাপী ভোটার তথ্য সংগ্রহ করে তালিকা তৈরি করা হয়। কিন্তু অজ্ঞাত রহস্যজনক কারণে ডাটা-বেইজ কর্মসূচি বাতিল করা হয়। ভোটার পরিচয়পত্র তৈরির সকল প্রাথমিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে সরকার পরিবর্তনের সাথে এ কার্যক্রমও বন্ধ হয়ে যায়। বিরোধী দলগুলোর দাবীর মুখে ১৯৯৮ সালের নভেম্বর থেকে বন্ধ কার্যক্রম আওয়ামী সরকার আবার শুরু করে। এজন্য নূতন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ভোটার আইডি কার্ড প্রকল্পের জন্য নিযুক্ত হয় প্রকল্প পরিচালক। ৩০ জুন ১৯৯৯ প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। ভোটার আইডি কার্ড প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শেষ হয়নি। প্রকল্প মেয়াদ আরো দু'মাস বাড়ানো হয়। কিন্তু প্রকল্পের কাজকর্মে ঘটে সব আজব এবং ভৌতিক কান্ড। প্রকল্প পরিচালক মোঃ হেলাল উদ্দিন খান প্রকল্পের ১ম দফা মেয়াদ শেষ হবার পর জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন। ভোটার পরিচয়পত্র প্রস্তুত, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ের এ বিজ্ঞাপনটি প্রথম ছাপা হয় ২ জুলাই। প্রকল্পের ১ম দফার নির্ধারিত মেয়াদের ৮ মাস শেষ হয়ে যায়। কিন্তু দেশের প্রায় অর্ধেক ভোটার তাদের নির্ভুল আইডি কার্ড হাতে পায়নি। বর্ধিত দু'মাসের মেয়াদের মধ্যে দেশের বাকী অর্ধেক ভোটারের কাছে কোন অবস্থাতেই নির্ভুল কার্ড পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। ৩০ জুনের মধ্যে প্রায় ৬ কোটি ভোটারের আইডি কার্ড প্রস্তুত ও বিতরণের সময়সীমা থাকলেও

www.pathagar.com

১৫ মার্চ ১৯৯৯ পর্যন্ত কার্ড প্রস্তুত হয় ২ কোটি ৮৬ লাখ। ৪৮ শতাংশ ভোটারের আইডি কার্ড প্রস্তুত করা হলেও বিতরণ করা হয় ১ কোটি ৪৫ লাখ। অর্থাৎ মোট ভোটারের ২৫ শতাংশ।

ভোটার আইডি কার্ড প্রণয়ন এবং বিতরণের ব্যাপক অনিয়ম, কারচুপি এবং দলীয়করণের আশ্রয় নেয়া হয়। আওয়ামী লীগের পছন্দের বাইরের হাজার হাজার মানুষ নতুন পর্যায়ে প্রণীত ভোটার তালিকাভুক্তি এবং আইডি কার্ড প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। নিজের নাম ভোটার তালিকায় না দেখে এলাকার মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের পরিবর্তে আওয়ামী কর্মীরাই আইডি কার্ড বিতরণ করেছে। ছবি তোলার ব্যাপারেও রেজিস্ট্রেশন অফিসারের স্থলে আওয়ামী কর্মীদের প্রভাব খাটিয়ে বিরোধী দলের সমর্থকদের আইডি কার্ড থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ভোটার আইডি কার্ড নিয়ে একটি কৌতুক খবর প্রকাশিত হয়েছে ১২ এপ্রিলে ১৯৯৯ এর একটি দৈনিকে। খবরে বলা হয়, 'নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্দিরগঞ্জ থানার গোদানাইল গ্রামে ভুল ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ আইডি কার্ড ভোটারদের সরবরাহ করা হয়েছে। আইডি কার্ডের জন্য ভোটারদের ছবি তোলা হয়েছিল ডিসেম্বর মাসে। আর কার্ড সরবরাহ করা হয়েছে গত সপ্তাহে। ওইসব কার্ডে ছবি উল্টা পাল্টা লাগানো হয়েছে। একজনের কার্ডে লাগানো হয়েছে অন্যজনের ছবি। কারো কারো কার্ডে লাগানো ছবিতে মাথার ওপরের অংশ নেই। এমনকি মহিলাদের আইডি কার্ডে পুরুষের ছবি লাগাতেও দেখা গেছে। কারো কারো কার্ডে বয়স কমিয়ে লেখা হয়েছে। ব্যবহার করা হয়েছে অস্পষ্ট ছবি।

১৯৯৯ সালের মার্চের মধ্যভাগে ঢাকা মহানগরীর মিরপুর ১২ নম্বর সেকশন এবং পল্লবী, দুয়ারীপাড়ায় হাজার হাজার লোক নতুন ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে। দুয়ারীপাড়ায় বেশ কজন আওয়ামী লীগ নেতা আইডি কার্ড বিতরণ করেন। গুলশান থানার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের রামপুরার ১৩ নম্বর উলনের একটি বাড়ি থেকে আইডি কার্ড বিতরণ করা হয়। আওয়ামী লীগের নেতার এই বাড়ি থেকে কার্ড বিতরণ করায় জাতীয় পার্টি, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী সমর্থকরা আইডি কার্ড পায়নি। শহরাঞ্চলে বিভিন্ন বস্তি এবং ভাসমান লোকদের ধরে এনে আওয়ামী লীগের নেতারা ভোটার তালিকাভুক্ত করেন। ঐ সব লোকদের লাইনে দাঁড় করিয়ে নিজেরাই ছবি তোলার কাজে প্রত্যক্ষ সহায়তা করেন। অনেক মহল্লার পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিরাও ভোটার হতে পারেননি। স্থানীয় সন্ত্রাসীদের হুমকির মুখে এরা ভোটার হওয়ার ভরসা ছেড়েই দেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও অনুরূপ অনিয়ম ও কারচুপি হয়। ভোটার আইডি কার্ড নিয়ে ঢাকায় বিচিত্র ধরনের তেলেসমাতি কর্মকান্ড চলে। ভোটারের নামের সঙ্গে আইডি কার্ড এবং ভোটার তালিকার মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। একজনের ছবি লাগানো হয় অন্য জনের কার্ডে। ছবি তোলার মান এতই নিম্ন ছিল যে, তা মানুষের ছবি না গাছের গুঁড়ি বোঝা কঠিন। ভোটার তালিকার নামের সঙ্গে অনেক ভোটারের নামের গরমিল ধরা পড়ে। সেই সঙ্গে ছবি তোলার জন্য ক্যাম্পে যেয়ে হয়রানির শিকার হবার ঘটনাও ঘটছে।

www.pathagar.com

কাদের সিদ্দিকীর উপর নির্যাতন

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী একসময় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং টাঙ্গাইলের সখিপুর-বাসাইল নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত এমপি ছিলেন। শেখ মুজিবের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ করে তিনিই প্রথম অস্ত্র হাতে তুলে নেন, প্রকাশ্য প্রতিবাদ করেন। এর ফলে ১৯৭৫ সালে তাঁকে দেশ ছাড়তে হয়। দীর্ঘদিন ভারতে প্রবাস জীবন কাটিয়ে দেশে ফিরে আসেন ১৯৯০ এর ডিসেম্বর মাসে। আওয়ামী সরকার গঠিত হওয়ার পর বিভিন্ন সময়ে তাঁর গঠনমূলক বক্তব্য-বিবৃতি নিয়ে দলের নেতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলতে থাকে। এক সময় তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর রফিকুল ইসলামের পদত্যাগ দাবী করেছিলেন। সংবাদ সম্মেলন করে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য প্রাপ্ত বীরোত্তম খেতাব বর্জনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় গঠনসহ কয়েকটি দাবী-দাওয়া সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে নতুন করে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

কাদের সিদ্দিকীর বিভিন্ন সত্য বক্তব্য দ্বারা প্রমাণ হয়েছে দলের মধ্যে কারা শেখ মুজিব হত্যার সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। ১১ অক্টোবর ১৯৯৮ দৈনিক আজকের কাগজের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কাদের সিদ্দিকী দাবি করেন, 'বঙ্গবন্ধু হত্যার অপরাধে মোশতাক মন্ত্রীসভার সব সদস্যই আসামী। কার বিচার হবে-না হবে সেটা বিচারকের দায়িত্ব'। সাক্ষাৎকারে কাদের সিদ্দিকী মুজিব হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা প্রথম প্রতিরোধ, তৎকালীন নেতাদের ভূমিকা, দেশের সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বর্তমান রাজনীতির হালচাল নিয়েও বিভিন্ন প্রশ্নের খোলামেলা উত্তর দিয়েছিলেন।

হেগ শান্তি সম্মেলন থেকে ফিরে প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, আওয়ামী লীগ একটি বড় দল। এ দলে নানা ধরনের লোক থাকতে পারে তাই কাদের সিদ্দিকীর কথায় কান দেই না। তিনি বলেন, পাগলে কি না বলে ছাগলে কি না খায়। কাদের সিদ্দিকীর সম্পদ সম্পর্কেও প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন। ১৯ মে ১৯৯৯ দৈনিক মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে কাদের সিদ্দিকী প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক একটি উক্তির জবাবে বলেন, 'আমার নেত্রী বর্তমানে রাষ্ট্রের একটি উচ্চাসনে আছেন। অতো উচ্চাসনে থেকে এতো নিচু কথা বলা শোভা পায় না। বললে সেটা আসনের মর্যাদাহানি হয়। নিশ্চিয়ই আমরা কেউ এই কাজটি করবো না। আমি তারই দলের একজন সদস্য। আমার সম্পর্কে কিছু বললে তাতে দলেরও ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। আমার সম্পদ সম্পর্কে যদি তিনি প্রশ্ন করে থাকেন, তাহলে আমি তাকে অত্যন্ত বিনীত চিত্তে ধন্যবাদ জানাবো যে, তিনি খুব ভালো একটা কথা বলেছেন। আমি চাই, আমার জন্মের পর থেকে এখন পর্যন্ত যে সম্পদ রয়েছে, তা খুবই কঠোরভাবে তদন্ত করা হোক। যদি আমার সম্পদ হিসাব বহির্ভূত দেখানো সম্ভব হয়, তাহলে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কাঠগড়ায় দাঁড়াতে প্রস্তুত রয়েছি। সেই সাথে আমি বিনীতভাবে তার কাছে এবং দেশবাসীর কাছে অনুরোধ করবো, অন্য যারা আছেন তাদের সম্পদেরও আলতো বা খুব নরমভাবে হলেও একটি সমীক্ষা করা দরকার। দেখা দরকার যে, তারা কে কি অবস্থায় ছিলেন। আমি মুক্তিযুদ্ধ করেছি এ দেশের সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য। কোনো গজিয়ে ওঠা কোটিপতির জন্য আমি

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধ করিনি। কারো সম্পদের পাহাড় গড়ার জন্য আমি যুদ্ধ করিনি'। দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে কাদের সিদ্দিকী তাঁর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানান। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করে বলেন, 'মানুষের জন্য যদি জেলে যেতে হয়, তার জন্যও তিনি প্রস্তুত আছেন'। দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেননি, এটাও দৃঢ়তার সাথে বলেন। তার সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী যে মন্তব্য করেছিলেন, তার জবাবে বলেন, 'জনগণের পক্ষে কথা বলেছি, সেটা আওয়ামী লীগের বিপক্ষের কোনো কথা নয়। তাছাড়া আমি নতুন কোন কথা বলছিনা, দলের ভিতরেও আমি আগে বলেছি'।

আওয়ামী লীগের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কাদের সিদ্দিকী এমপির গঠনমূলক বক্তব্য দেয়ায় ১৪ জুন ১৯৯৯ টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে স্থানীয় শহীদ মিনার অঙ্গনে অনুষ্ঠিত আহবায়ক ও ডাকসুর ভিপি হাসান ইমাম খান সোহেল হাজারীর সভাপতিত্বে সমাবেশে ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন ছাত্র লীগের নেতা-কর্মীদের কাদের সিদ্দিকীর সকল সভা-সমাবেশ টাঙ্গাইল জেলায় প্রতিহত করার নির্দেশ দেন। তিনি কাদের সিদ্দিকীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'মুজিব কোট পরে মুজিব কন্যার বিরুদ্ধে কোন কথা বলবেন না। মুজিব কোট খুলে দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেখুন কতজন নেতা-কর্মী আপনার পেছনে থাকে। আওয়ামী লীগ পাগল-ছাগলকে দল থেকে বহিস্কার করে না। পদত্যাগ করে দেখিয়ে দিন আপনি বাপের বেটা'। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাসানুর রশিদ মামুন, আবু সাঈদ আল আজাদ, আসাদুজ্জামান লেনিন, কাজী অলিদ ইসলাম প্রমুখ। অজয় কর বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর ভারতে গিয়ে আপনি এর প্রতিবাদের জন্য দেশে ফেরার চেষ্টা করেননি। সেখানে ব্যবসা-চাঁদাবাজি করে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আপনাকে সে দেশ থেকে বের করে দিতে চেয়েছিল কিন্তু শেখ হাসিনার অনুরোধে তা করেননি। শেখ হাসিনা আপনার জন্য যা করেছেন, আপনার গায়ের চামড়া দিয়ে জুতা তৈরি করে দিলেও সে ঋণ শোধ হবে না'। বিকালে জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে অজয় কর বলেন, 'কাদের সিদ্দিকী খালেদা জিয়ার কাছ থেকে ব্যবসার নামে কোটি কোটি টাকা নিয়েছেন'। অজয় কর কাদের সিদ্দিকীর সব ধরনের সমাবেশ প্রতিহত করার জন্য দেশের সকল নেতা-কর্মীদের নির্দেশ দেন।

২৮ জুন সখিপুর থানার বড়চওনা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে স্থানীয় আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে কাদের সিদ্দিকী এমপি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রীর কুত্তা-বিলাই পালনের জন্য বছরে ৪ কোটি টাকা খরচ করা হলেও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ২ হাজার টাকা ভাতা দেয়া হচ্ছে না। পুলিশ-মিলিটারী, কেরানীরা যদি পেনশন পায় তাহলে মুক্তিযোদ্ধাদের পেনশন দিতে হবে'। তিনি শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'যদি দিতে না পারেন তবে ক্ষমতা ছেড়ে দিন। ক্ষমতা ছেড়ে চলে যান'। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল হাইয়ের সভাপতিত্বে সভায় কাদের সিদ্দিকী আরো বলেন, 'শেখ হাসিনা, আপনি আমার জামা খুলে নিতে চান, জামা খোলার জন্য লোক পাঠান। আপনি এত নিচে নেমে গেছেন ভাবতেও পারিনি'। সন্ধ্যা সাড়ে ছটার দিকে কাদের সিদ্দিকীর বক্তব্যে জনগণ আবেগাপ্লুত হয়ে শ্লোগান দিয়ে বলে ওঠেন, 'শেখ হাসিনার দিন শেষ-কাদের সিদ্দিকীর বাংলাদেশ।' সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আবু মোহাম্মদ এনায়েত করিম, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান হামিদুল হক বীর প্রতীক, মুক্তিযোদ্ধা

www.pathagar.com

সমন্বয় পরিষদের সদস্য সচিব সাদেক আহমেদ খান, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রাজ্জাক, আওয়ামী লীগ নেতা ইদ্রিস শিকদার, গোলাম সরোয়ার দুলাল, ছাত্র নেতা মাসুদ পারভেজ, আমির উদ্দিন প্রমুখ। তিনি ছাত্র লীগ সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকনকে উদ্দেশ্য করে বলেন,' তুমি অত বড় মায়ের পুত হওনি যে আমার কোট খুইলা নিবা'। তিনি বলেন 'আমার কোট খুলে নিতে চাইলে আমি বসে বসে আঙ্গুল চুষবো না'। তিনি শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, '২ হাজার টাকা করে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা দিন। তাহলে আমার কোট খুলতে হবে না নিজেই খুলে দেব'। তিনি শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'মাত্র ২ মাসের আন্দোলনেই আপনার ঘুম কামাই হয়ে গেছে। ৬/৭ মাসের আন্দোলন হলে উপায় হবে কি?' জনসভায় কাদের সিদ্দিকী আতিয়া বন অধ্যাদেশ সম্পর্কে বলেন, 'এই কালো আইন সংসদীয় কমিটি বাতিলের সুপারিশ করলেও মন্ত্রী তা করছেন না। কারণ ওনার নেত্রী শেখ হাসিনা নিষেধ করেছেন। এই অধ্যাদেশ যদি বাতিল না হয় তাহলে আওয়ামী লীগ সরকারের গালে জুতা মারা উচিত'। তিনি বলেন, 'আমরা এমন একটি দেশ চেয়েছিলাম যেখানে পুলিশ হবে জনগণের সেবক। কিন্তু এরা পুলিশকে দিয়ে যত কুকাম আছে তাই করাচ্ছে। ঘুষ, দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গেছে। এ থেকে জনগণকে মুক্ত না করা পর্যন্ত আমার আন্দোলন থামবে না। আমি প্রতিবাদ করেই যাব'। তিনি বলেন, 'আজ দেশে অবস্থা ভাল নয়। কোন দিন শুনবেন কাদের সিদ্দিকীকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। সেদিন আপনারা যদি চরম প্রতিবাদ করেন তবে আমার আন্দোলন সার্থক হবে'।

প্রধানমন্ত্রী কাদের সিদ্দিকীর সম্পদের হিসাব চেয়েছিলেন। এর জন্য কাদের সিদ্দিকীও তার সম্পদের হিসাব দেয়ার জন্য আহবান জানিয়েছিলেন। ১ জুলাই ১৯৯৯ দৈনিক প্রথম আলো থেকে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনার দলের সভানেত্রীও বটে। প্রধানমন্ত্রীর সম্পদের হিসাব চাওয়ার আগে কি আপনার সম্পদের হিসাব দেয়া উচিত নয়? প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'দলের নেত্রী ও রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী কখনো একই জিনিস নয়। যখনই যে বা যারা দলের নেত্রী-নেতা ও রাষ্ট্রের কর্মব্যবস্থা দু'টি জিনিসকে গুলিয়ে ফেলেছে তখনই অশুভ ফল ফলতে শুরু করে এবং ফলেছেও। প্রধানমন্ত্রী আমার সম্পত্তির হিসাব চেয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয়েছে তিনি এক্ষেত্রে দায়িত্বশীল উক্তি করেননি। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নির্বাহী পদাধিকারী, তিনি অন্য সাধারণ মানুষের মতো একজনের সম্পত্তির হিসাব চাইতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী চাইবেন না, তিনি করবেন। তার উচিত হিসাব না চেয়ে আমার সম্পত্তির হিসাব করা। পত্রিকার মাধ্যমে জেনেছি সেই কাজটি উনি করেছেন। এ কথাও শুনেছি যে, কাজটা করা হচ্ছে একটি গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে। এটাও একটি ত্রুটিপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ সম্পত্তির হিসাব প্রকাশ্যে করতে হয়। আমিও প্রধানমন্ত্রীর হিসাব চেয়েছি প্রকাশ্যে। বিভিন্ন জনের কর্মকান্ড পরিচালনার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি থাকে। তিনি হয়তো গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমেই আমার সম্পত্তির হিসাব নেয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাকে কিছু জানানো হয়নি। তাই নিশ্চিত করে বলতে পারি না আদৌ কি হচ্ছে। তবে গোয়ান্দা সংস্থাই নয় অন্য কোনো বিভাগের কেউই আমার কাছে কোনো খোঁজ খবর করেননি।

১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি মিল-কারখানা স্থাপনের নামে উত্তরা ব্যাংক স্থানীয় শাখা মতিঝিল থেকে ১৫ লাখ ৫৩ হাজার টাকা নিয়ে অন্যখাতে ব্যয় করার অভিযোগ এনে কাদের সিদ্দিকী, তাঁর সোনার বাংলা পোল্ট্রি ফার্মের পরিচালক ই.আর এম সালাহউদ্দিন, পরিচালক আঃ হালিম ও পরিচালক রনজিৎ কুমার সরকারের বিরুদ্ধে ১৯৭৬ সালে ১৩ মে দুর্নীতি দমন

www.pathagar.com

ব্যুরোর ইন্সপেক্টর বাদী হয়ে মতিঝিল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। পরে ১৯৭৫ সালের সামরিক আইনের ১-এর ১১ (৯) ধারায় মামলার চার্জশিট দেয়া হয় ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭৬ সালে। চার্জশিট থেকে এজাহারভুক্ত তিনজনকে অব্যাহতি দেয়া হলেও কাদের সিদ্দিকীকে আসামী রাখা হয়। মামলাটি সামরিক আদালত থেকে পরে ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ বদরুল হায়দারের আদালতে স্থানান্তর করা হয়। বিচারক মামলার নথি পর্যালোচনা করে দেখেন এ মামলায় চার্জশিট হবে প্রচলিত ধারায় এবং চার্জশিট দাখিল করতে হবে একজন প্রথম শ্রেণী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। আদেশ মতো মামলাটি পুনঃতদন্ত ও সংশোধিত চার্জশিটের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হয়। পরে দন্ডবিধির ৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪২০/৪০৬ ধারায় পুনরায় এ মামলার চার্জশিট তৈরি হয়। কিন্তু কাদের সিদ্দিকী সংসদ সদস্য হওয়ায় মামলার ধারা কিছুটা সংশোধন করে ফৌজদারী কার্যবিধির ৮৭/৮৮ ধারা অনুসরণ করে তদন্ত কারী কর্মকর্তা মামলার নথি সিএমএম এর বরাবরে পাঠান। কিন্তু সরকারের সমালোচনা করায় উপরের নির্দেশেই দীর্ঘ প্রায় ২ যুগ পর মামলাটি পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং নতুন চার্জশিট হওয়ার পর ১৩ জুলাই ১৯৯৯ ঢাকার মহানগর মুখ্য হাকিমের আদালত থেকে কাদের সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করে এটি তামিলের জন্য টাঙ্গাইল সদর থানায় পাঠানো হয়।

১৯৭৬ সালে সামরিক সরকারের রুজ্জু করা দুর্নীতি মামলার পুনরুজ্জীবন ও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির পর ১৪ জুলাই কাদের সিদ্দিকী আদালতে হাজির হয়েছিলেন। তিনি আদালতে হাজির হবেন-এই সংবাদ জানতে পেরে তাঁর নির্বাচনী এলাকা এবং জন্মস্থান টাঙ্গাইল থেকে ৭/৮ বাস বোঝাই কয়েক হাজার সমর্থক-শুভানুধ্যায়ী দুপুর ১২টা থেকেই আদালত প্রাঙ্গণে সমবেত হতে থাকেন। মহানগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকেও কয়েক হাজার লোক সমবেত হন। ৩টা ৪৫ মিনিটি কাদের সিদ্দিকী, তাঁর স্ত্রী এবং কয়েজন সঙ্গী নিয়ে আসেন আদালত প্রাঙ্গণে। ৩টা ৫০ মিনিটে তিনি সোজা চলে যান সিএমএম ভবনের দ্বিতীয় তলায় মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে। এ সময় বিশিষ্ট সাংবাদিক এম. আর আখতার মুকুল, কাদের সিদ্দিকীর স্ত্রী, তার বড় ভাই লতিফ সিদ্দিকী এমপি, তার স্ত্রী, গণফোরাম প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সিনিয়র আইনজীবী এডভোকেট জহুরুল আলম, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় সমন্বয় পরিষদের আহবায়ক ইশতিয়াক আজিজ উলফাত, সদস্য সচিব সাদেক আহম্মেদ খান, টাঙ্গাইল পৌরসভার চেয়ারম্যান জামিলুর রহমান মিরন, কাদেরিয়া বাহিনীর বেসামরিক প্রশাসক আবু মোঃ এনায়েত করীম এবং বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধাসহ প্রায় অর্ধশত আইনজীবী, সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। আদালতের বাইরে অপেক্ষায় ছিলেন গণফোরাম সভাপতি ও বিশিষ্ট আইনজীবী ড. কামাল হোসেন। জনাকীর্ণ আদালত ভবনে পিনপতন নীরবতার মধ্যে কাদের সিদ্দিকী ঢাকা মহানগর মুখ্য হাকিম কে এম আব্দুল্লাহর আদালতে বিচারকের কাছে তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ চেয়ে কথা বলার অনুমতি চান। বিচারক অনুমতি দিলে কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'আমাকে একটি মামলায় পলাতক বলা হলেও আমি কখনোই পলাতক ছিলাম না। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর অনেকে তার রক্তের ওপর পা দিয়ে মন্ত্রী হয়েছে। সরকারি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছে। আমি এর কিছুই করিনি। বরং এই হত্যার প্রতিবাদে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলি। আর এই অপরাধে তাৎকালীন সামরিক সরকার ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি উত্তরা ব্যাংক, মতিঝিল শাখা থেকে ঋণ হিসাবে ১৫ লাখ ৫৩ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগ এনে একটি মামলা দায়ের করে। এই মামলা যখন দায়ের

www.pathagar.com

করা হয় তখনও আমি পলাতক ছিলাম না। দেশের মাটিতে থেকেই সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম। হয়তো ওই সময়ের কর্তৃপক্ষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ছিলাম। এর বেশি কিছু নয়'। কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'আমি স্তম্ভিত হই, এমন একটি সামরিক সরকারের আমলে করা মিথ্যা মামলায় বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার আবার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছে আমাকে হয়রানীর উদ্দেশ্যে'। তিনি বলেন, 'একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় আমি একজন সংসদ সদস্য হওয়া সত্ত্বেও শুধু হয়রানির উদ্দেশ্যে পুনরুজ্জীবন ঘটানো একটি মামলায় আমাকে পলাতক দেখানোয় আমি মর্মাহত হয়েছি। এছাড়াও এই ঘটনায় আমার মর্যাদাহানি ঘটেছে।' তিনি বলেন, 'দীর্ঘ ১৬ বছর দেশের বাইরে নির্বাসিত জীবন যাপন করার পর ১৯৯০ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশে ফেরার পর আমি সারাদেশে অসংখ্য সভা-সমাবেশ করেছি। ১৯৯১ সালে আওয়ামী লীগের হয়ে নির্বাচন করে সামান্য ভোটে হেরেছি। ১৯৯৬ এ নির্বাচন করে জয়ী হয়েছি। প্রতিদিন আমি সংসদে যাই। অথচ আমাকে বলা হচ্ছে পলাতক'। কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'যেদিন আমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয় সেদিনও আমি মতিঝিলে একটি সমাবেশ বক্তৃতা দেই। সেই সমাবেশে গুলি ও বোমা হামলা চালানো হয়। এতোদিন আমাকে কিছু বলা হতো না। কিন্তু গত ২৬ এপ্রিল বিবেকের তাড়নায় দেশের মানুষের কথা ভেবে, বেকার যুবকদের কথা ভেবে যখন সরকারের কাছে কয়েকটি দাবী উত্থাপন করি, তখন থেকেই আমার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র শুরু হয়। সম্প্রতি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ পড়ে জানতে পারি আমার বিরুদ্ধে ১৯৭৬ সালের একটি মামলা পুনরুজ্জীবন ঘটানো হয়েছে। আমার হাতে আদালতের কোনো কাগজপত্র নেই। যদি ভবিষ্যতে এই মামলায় চুলচেরা বিশ্লেষণের জন্য আদালতে উত্থাপন করা হয় তখন আমি আমার সমর্থনে কাগজপত্র দেখাবো। আমি এখানে আত্মসমর্পণ করতে আসিনি। আমি আল্লাহর কাছেই আত্মসমর্পণ করবো। আজ গ্রেফতারী পরোয়ানার কথা শুনে আপনার কাছে হাজির হয়ে প্রমাণ করতে এসেছি যে আমি পলাতক নই। আমি জামিন চাইতেও আসিনি'।

তিনি জামিনের জন্য আনুষ্ঠানিক কোনো আবেদন না করলেও দীর্ঘ ৩০ মিনিট ধরে দেয়া কাদের সিদ্দিকীর বক্তৃতা শুনে মুখ্য হাকিম তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন। বিচারকের ঘোষণার পর কাদের সিদ্দিকী যখন আদালত থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন তার সমর্থকরা তুমুল করতালি ও মুহুর্মুহু শ্লোগান দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। অনেকেই এ সময় শেখ হাসিনার দিন শেষ, কাদের সিদ্দিকীর বাংলাদেশ বলে শ্লোগান দেয়। আদালত থেকে বেরিয়ে এসে সিএমএম ভবনের সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে অপেক্ষমান কয়েক হাজার সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, 'কাদের সিদ্দিকী পলাতক-এই কথা বলে এই সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের অপমান করেছে'। তিনি বলেন, 'এই অপমান, এই আঘাত শুধু কাদের সিদ্দিকীর নয়, এই আঘাত সত্য ও ন্যায়ের ওপরও। আমি এ কথা বলবো, আমরা বিজয়ী হয়েছি। আদালত আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। তার আদেশে সত্যের বিজয় হয়েছে'। উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্যে করে কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'আমাদের এই বিজয় ধরে রাখতে হবে। সকল অন্যায়ের মোকাবেলা করতে হবে যোগ্যতা দিয়ে'। তিনি বলেন, 'এই বাংলাকে স্বাধীন করতে হবে-বঙ্গবন্ধুর আদেশ পেয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আর আজ আমাকে আদালতে বিচার চাওয়ার জন্য আসতে হয়েছে। এর চেয়ে দুঃখের-কষ্টের আর কি থাকতে পারে'? এ সময় তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। কাদের সিদ্দিকীর বড় ভাই আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী বলেন, 'কাদের সিদ্দিকীর ওপর যখন আঘাত আসে তখন দল থাকে না'। তিনি বলেন, 'আগামী কাল

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী এয়ারপোর্টে নামার সাথে সাথে তার কান ভারি করে দেয়া হবে নানা কথা বলে'। উপস্থিত বক্তব্যে ড. কামাল হোসেন বলেন, 'কাদের সিদ্দিকীর ব্যাপারে যে অকল্পনীয় ঘটনা ঘটেছে তাতে আমি হতভম্ব হয়ে গেছি'। তিনি বলেন, 'সংবিধানে লেখা আছে বেআইনীভাবে কাউকে হয়রানী করা যাবে না। যখন শুনতে পেরেছি ১৯৭৫ সালের একটি মামলায় কাদের সিদ্দিকীকে পলাতক দেখানে হয়েছে-পক্ষান্তরে তাতে সংবিধানকে অবমাননা করা হয়েছে'। তিনি বলেন, 'কাদের সিদ্দিকীকে অপমান করা মানে স্বাধীন বাংলার ১৩ কোটি মানুষকে অপমান করা। যারা তাঁকে অপমান করেছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে'। তিনি বলেন, 'সিংহাসনে বসে আইন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলবে না। কাদের সিদ্দিকীর পাশে আইন আছে'।

এ প্রসঙ্গে ১৮ জুলাই দৈনিক প্রথম আলো 'কাদের সিদ্দিকী ইস্যু-রাজনৈতিকভাবে সমস্যা রাজনৈতিক সমাধান করুন' শীর্ষক সম্পাদকীয়র এক জায়গায় উল্লেখ করা হয় 'ভিন্নমত পোষণ ও তা প্রকাশের জন্য কাদের সিদ্দিকী নানা রকম হয়রানীর শিকার হচ্ছেন, এটা এখন সাধারণ মানুষের কাছেও স্পষ্ট হয়ে গেছে। এতে করে দুটো খারাপ জিনিস বেরিয়ে এসছে। এক. কাদের সিদ্দিকী যে দলের সদস্য, অর্থাৎ ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলটির অভ্যন্তরে গণতন্ত্র নেই। দুই. সরকারি দল চাইলেই তার অপছন্দের কাউকে হয়রানী করার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানাদির অপব্যবহার করতে পারে'।

ভিন্নমতাবলম্বন করার অপরাধ হিসেবে কাদের সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয় আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদ। ২৩ জুলাই সকাল ১০ টায় দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলীয় সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এই সভা শুরু হয়। সভায় ৬৭ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের ৫৩ জন উপস্থিত ছিলেন। কাদের সিদ্দিকীর এক যুগ বয়সের কেন্দ্রীয় সদস্যপদ স্থগিত করা হয়। একই সাথে দুই যুগের পুরনো প্রাথমিক সদস্যপদ কেন খারিজ করা হবে না, এ মর্মে শোকজ করে চার সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়।

বৈঠককে কেন্দ্র করে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী দলীয় কার্যালয়ে আসার পূর্ব থেকে তথা সকাল থেকেই প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষীরা কেন্দ্রীয় সদস্য নন এমন কাউকেই দলীয় কার্যালয়ে ঢুকতে দেননি। প্রধানমন্ত্রীর আগমনের খবর শুনে মহানগরীর বিভিন্ন এলাকার নেতা-কর্মীরা সকাল থেকেই দলীয় কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন। কিন্তু নিরাপত্তারক্ষীরা কার্যালয়ের প্রবেশ মুখের কাছাকাছি কাউকে ভিড়তে দেয়নি। সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত তারা রাস্তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় নেতা, মন্ত্রী ও এমপিদের আগমন-নির্গমন দেখেন। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ জাসদ কার্যালয়েও পুলিশ সকালে কাউকে ঢুকতে দেয়নি। এ নিয়ে জাসদের কিছু কর্মীর সাথে নিরাপত্তারক্ষীদের বচসা হয়। আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের আশপাশের মার্কেটগুলো দুপুর পর্যন্ত বন্ধ ছিল। চারদিকের বিভিন্ন ভবনের ছাদেও প্রচুর পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল।

সভার শুরুতে দলের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমানের বক্তব্যের পর দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শামসুর রহমান খান শাজাহান দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে কাদের সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবের ওপর দলের সিনিয়র নেতাদের মধ্যে প্রেসিডিয়াম সদস্য সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন, আব্দুস সামাদ আজাদ, আমির হোসেন আমু, আব্দুল রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, আব্দুল জলিল ও সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিম বক্তব্য রাখেন। বৈঠকে একজন প্রেসিডিয়াম সদস্য বলেন, 'কাদের সিদ্দিকীর বিষয়ে অনেক আগেই সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত ছিল। বিষয়টি নিয়ে দেরি

www.pathagar.com

করাতে দলের কর্মীরা ক্ষুব্ধ। তাই আর সময় ক্ষেপণ করা ঠিক হবে না'। অন্য একজন নেতা বলেন, 'যতো তাড়াতাড়ি তাঁকে বের করে দেয়া যাবে দলের জন্য তা ততোই মঙ্গল হবে। তার জন্য জনগণের কাছে দলের ইমেজ ক্ষুণ্ন হচ্ছে'। সভাপতি মন্ডলীর অন্য একজন সদস্য বলেন, 'কাদের সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে শাস্তির বিষয়টি সঠিকভাবে ফরমুলেট করতে হবে'। দলের অন্য একজন প্রভাবশালী নেতা বলেন, 'দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের বিষয়ে কোনোরকম দুর্বল সিদ্ধান্ত বা উদারতা দেখানো ভবিষ্যতে দলের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তার বিরুদ্ধে এখনই কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার কোনে বিকল্প নেই'। দলের সিনিয়র একজন প্রেসিডিয়াম সদস্য বলেন, 'রাজনীতি বড়ই নিষ্ঠুর খেলা। কখনো কখনো বন্ধুকেও বের করে দিতে হয়। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে, দলীয় নীতি আদর্শের ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেললে সে যতো আপনজনই হোক না কেন তাকে পরিত্যাগ করতে হয়। তাই মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৯৭৫ পরবর্তীকালে তাঁর ভূমিকা ভালো হলেও বর্তমান তৎপরতা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। শাস্তি তাঁকে পেতে হবে। তাঁকে সময় দেয়াটাই ঠিক হয়নি। এতে তিনি তো কিছুটা বেশি সুবিধা পেয়েছেন'।

২৫ জুলাই ১৯৯৯ বাসভবনে দৈনিক মানব জমিনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'আমাকে পরিকল্পিতভাবে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাদের মূল উদ্দেশ্য, আমাকে বহিস্কার করা। আর এ জন্য দলের একটি কোটারি স্বার্থবাদী গ্রুপ দায়ী। আমি সেদিন টাঙ্গাইলে ছিলাম। আগের রাতেই তারা টাঙ্গাইল শহরকে বিডিআর-পুলিশ দিয়ে ভরে ফেলে। আমাকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্তের আগেই টাঙ্গাইলসহ আমার নির্বাচনী এলাকা সখিপুর-বাসাইল এবং কালিহাতি পুলিশ-বিডিআর দিয়ে সয়লাব করে ফেলে। তাতেই বোঝা যাচ্ছিল, এরকম একটা কিছু হবে। দলের একটি কোটারি শক্তি এরকম একটি সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতেই দলের সভা আহবান করেছিল'। কাদের সিদ্দিকী সংসদ থেকে পদত্যাগেরও ইঙ্গিত দেন। তিনি উল্লেখ করেন, 'গত ২৩ জুন আমি সখিপুরে এক জনসভায় ঘোষণা দিয়েছি, আগামী ২ মাসের মধ্যে আটিয়া বন অধ্যাদেশ বাতিল না হলে এলাকার মানুষের মতামত নিয়ে সংসদ থেকে পদত্যাগ করবো'। সাসপেন্ড ও শোকজের পর এবার তাঁর গন্তব্য কোথায়-প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'অবস্থা ও পরিবেশ বুঝেই আমি কর্তব্য ও কর্মসূচি নির্ধারণ করবো'। আরেকটি ব্রাকেটবন্দী আওয়ামী লীগ গঠনের ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য ছিল, 'আমার আওয়ামী বা জনতার দলে কোনে ব্রাকেট থাকবে না'। তবে কি নতুন দল করছেন? তার সহাস্য জবাব, 'নতুন করে রাজনীতি শুরু করলে নতুন দল প্রয়োজন হতো। আমি দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করি। এখন প্রশ্ন, দলের মালিকানা নিয়ে। জনগণের জন্য রাজনীতি করতে, তাদের সেবা করতে কারো অনুমতি লাগে না। তাই আমারও কোনো দল গঠনের দরকার হবে না। একটি কমিটি গঠনের দরকার হবে'। কাদেরকে নিয়ে এই কমিটি গঠন করবেন? কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি নিয়ে হবে আমার কমিটি। জনগণের শক্তির ওপর যাদের আস্থা ও বিশ্বাস আছে এবং জনগণও যাদেরকে ভালো মানুষ বলে জানে, তাদেরকে নিয়ে আমি পথ চলবো'। কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'আওয়ামী লীগে কাউন্সিলররাই দলের মূল ভিত্তি। আমি তাদের সভা ডাকবো। তাদের সামনে আমার অবস্থান ব্যাখ্যা করবো। তাদের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ মেনে চলার চেষ্টা করবো'। দলের কাউন্সিলরদের ডাকার অধিকার আপনার আছে কি? জবাবে তিনি বলেন, 'দলের যে কোনো সদস্যই তা পারেন। আমি আগামী ৮০ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে তলবি সভা ডাকবো। তাদের সামনে সব

www.pathagar.com

তুলে ধরবো। বলবো জননেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাহী সংসদের বৈঠকে বলেছে, মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধু হত্যার পর আমার ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। বর্তমানে আমি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ২০০০ টাকা মাসিক সম্মানি ভাতা চেয়েছি, এক কোটি বেকার যুবকের কর্মসংস্থান চেয়েছি, দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রতিকার চেয়েছি, বঙ্গবন্ধুর খুনিদের শেখ হাসিনার চারপাশ থেকে বিতাড়িত করতে বলেছি। আমার এসব কর্মকাণ্ডকে তিনি শৃঙ্খলা বিরোধী বলেছেন। এসব বিষয়ে কাউন্সিলররা কি বলেন, তা জানতে চাইবো। জানতে চাইবো আপনারা বিষয়টিকে কিভাবে দেখছেন'?

২৯ জুলাই আওয়ামী লীগের টিকেটে নির্বাচিত এমপি কাদের সিদ্দিকী জাতীয় সংসদের স্পীকারের কাছে প্রদত্ত একটি চিঠিতে উল্লেখ করেন-

মাননীয় স্পীকার,

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা।

বিষয় : সংসদ ভবনের অফিস কক্ষ খালিকরণ প্রসঙ্গে।

মহাত্মন,

গত ২৭/৭/৯৯ তারিখ সন্ধ্যা ৭ টায় গোলাম কিবরিয়া, উপ-সচিব, প্রশাসন-১ এর প্রেরিত একটি পত্র আমার হস্তগত হয়েছে এবং উক্ত পত্রটির বিষয়বস্তু একই দিনের জাতীয় দৈনিক আজকের কাগজ-এ প্রকাশিত হওয়ায় যারপর নাই বিস্মিত, হতবাক ও মর্মাহত হয়েছি। জাতীয় কোন বিষয়বস্তু বা নির্দেশ যথাস্থলে পৌঁছার আগেই তার খবর কাউকে ছোট বা হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে যদি বাইরে প্রকাশ হয়ে যায়, সেটাকে কোন দক্ষ প্রশাসন বলে না এবং সেই বিষয়টিরও তেমন কার্যকরিতাও থাকে না।

আপনি একটি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুযোগ্য সন্তান। আপনার কর্মময় জীবনে বহু দায়িত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করে আপনার উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ কৃতিত্বের সাথে পালনের মাধ্যমে অভাবনীয় প্রশংসা অর্জন করেছেন। আপনার মত খ্যাতিমান, সৎ, সরল, মিষ্টভাষী সর্বগুণে গুণ মান সম্পন্ন একজন মানুষকে স্পীকার হিসেবে পেয়ে মহান জাতীয় সংসদে সকল মাননীয় সদস্যই গৌরব ও মর্যাদা বোধ করেছি এবং করছি। আপনার দ্বারা সংসদের মান মর্যাদা এবং গুরুত্বের হানি না হয়ে আরও অনেক অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে সেটাই আমাদের সকলের সাথে দেশবাসীরও কাম্য।

বহু ত্যাগ, তিতিক্ষা, চড়াই-উৎরাইয়ের পর এক বুক আশা নিয়ে এই মহান সংসদের সদস্য হিসেবে আপনার মাধ্যমে পবিত্র সংবিধান এবং যে দেশের জন্মের বেদনার সাথে আমরা জড়িত সেই দেশের ও দেশবাসীর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিলাম। শপথ নেয়ার সময় আমি খুবই গর্বিত ছিলাম যে, একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আর একজন মহান মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করার একটি দুর্লভ সুযোগ পেয়েছি। এই সংসদে এসে প্রতিদিন এবং প্রতি মুহূর্তে আপনার যে মহানুভবতা, সহৃদয়তা পেয়েছি তা আমার ভবিষ্যৎ জীবনে অত্যন্ত স্মরণীয় একটি অধ্যায় হিসেবে পরিগণিত হবে। আমার প্রতি আপনার আস্থা ও বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৫/১০/৯৬ তারিখে একপত্রে সুনির্দিষ্ট কিছু কার্যক্রম দেখাশুনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সততা, আন্তরিকতা ও পরম নিষ্ঠার সাথে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব এতদিন পালন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি।

উপরোক্ত দায়িত্বগুলো সুষ্ঠুভাবে পালনের লক্ষ্যে সংসদ ভবনের ৫ম তলায় আমার জন্যে একটি কক্ষ বরাদ্দ করেছিলেন। সে জন্যে সত্যিই আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। সংসদ ভবনের

www.pathagar.com

বরাদ্দকৃত কক্ষে বসে প্রতি নিয়ত সংসদের এবং সংসদ সদস্য হিসেবে অন্য কিছু নয় শুধুমাত্র পবিত্র রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার চেষ্টা করেছি। ইতিমধ্যে কিছু কিছু রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আমার সাথে সরকারের মতবিরোধ সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে শাসক দলের চাপে কক্ষটি ছেড়ে দেয়ার একটি অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। আমি নিজেও অনুভব করি বরাদ্দকৃত কক্ষটি এখন আর ব্যবহারের তেমন প্রয়োজন নেই। কিন্তু রুষ্ট সরকারের রোষাণলের কারণে অসাংবিধানিক পন্থায় অপরিপক্ক লেখা একটি নোটিশের মাধ্যমে পুলিশী কায়দায় হবে-এটা সংসদের জন্যে মর্যাদাকর নয়।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে আপনাকে জানাতে চাই, এ পৃথিবীতে কারও ক্ষমতা, প্রতিপত্তি চিরস্থায়ী নয়। তাই আজ যে পরম পরাক্রমশালী হয়ত কাল বা পরশু তারাই হবে পথের ভিখারী। প্রশ্ন যদি কোন ব্যক্তিকে নিয়ে হত তাহলে আমি কোন প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত করতাম না। প্রশ্নটি হয়েছে সংসদ এবং সংসদ সদস্যদের নিয়ে। বর্তমান সংসদ সদস্য আমরা আর নাও থাকতে পারি। কিন্তু মহান সংসদ থাকবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে আর কখনও সংসদ সদস্য নাও হতে পারি। কিন্তু কেউ না কেউ অবশ্যই সংসদ সদস্য হবেন। তাই কোন ব্যক্তির মান মর্যাদা আর প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংসদ সদস্যের মান মর্যাদা এক করে দেখা যায় না, উচিতও নয়।

২৮ বছর আগে নগদ অর্থে খরিদকৃত বাড়ি থেকে গত বছর পুলিশ আমার দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ও ব্যবহৃত বই-পুস্তক, দলিল দস্তাবেজ বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় ফেলে দিয়ে চেঙ্গিস খানের বাগদাদ সভ্যতা ধ্বংসের মত ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। এক্ষেত্রে সংসদেও তা যাতে না হয়, সে জন্যেই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এতদিন আমি একটি রাজনৈতিক দলের বৈধ সদস্য হিসেবে অবৈধ কমিটির নিয়ন্ত্রণে ছিলাম। গত ২৩ জুলাই হতে সেই কমিটির নিয়ন্ত্রণ থেকে আমি মুক্ত। তাই একজন সংসদ সদস্য হিসেবে কোন কাজের দায়িত্ব দিয়ে বরাদ্দকৃত কক্ষ ভদ্রোচিতভাবেই খালি করতে হবে, গায়ের জোরে, পুলিশী কায়দায়, কলংকজনক ইতিহাস সৃষ্টি করে নয়, সে সুযোগও এখন আর সরকারের হাতে তেমন একটা নেই।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংসদীয় কমিটির মনোনীত সদস্য হিসেবে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে সংসদে এসেছি। বর্তমান সেই সংসদীয় বোর্ডকে যেহেতু আমি বৈধ বলে মনে করতে পারি না, সেহেতু তাদের মনোনীত সদস্য হিসেবে মহান সংসদে অবস্থান করা খুবই অরুচিকর। আপনি ভাল করে জানেন, তেমন অরুচিকর কাজ আমি কখনই করবো না। আর বিশেষ করে আমার নির্বাচনী এলাকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী আটিয়া বন অধ্যাদেশ বাতিলের প্রতিশ্রুতিতে আমাকে ভোট প্রদান করেছিলেন। সেই অধ্যাদেশ আজ পর্যন্ত বাতিল হয়নি। এমতাবস্থায় সংসদ সদস্য পদ আঁকড়ে থাকার কোন মানে হয় না। তাছাড়া গত ১১ জুলাই সরকার কর্তৃক আমাকে পলাতক দেখিয়ে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি সংসদকে চরমভাবে অবমাননা করার সামিল। এরপরও সংসদে থাকার তেমন কোন স্বার্থকতা আছে তা খুঁজে পাচ্ছি না। তাই এই পদে ইস্তফা দেয়া এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। আমার জন্যে বরাদ্দকৃত কক্ষে সঠিকভাবে রাজনীতি করার কারণে ক্ষুব্ধ সরকারের অসহিষ্ণু পদক্ষেপ বন্ধ করুন। সংসদ এবং সংসদ ভবন সরকারের অধীনস্থ পদানত আজ্ঞাবহ কোন প্রতিষ্ঠান নয়। আমি সেখানে জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলি, সাংবাদিকদের সামনে নিয়ে মতামত ব্যক্ত করি-এ জন্যে কেউ ক্ষুব্ধ হলে আর কিছু করার নেই। মহান সংসদের গুরুত্ব ও মর্যাদা রক্ষা করেই আমি কাজ করি। তবে আমি এও জানি কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে, কামড় দিয়েছে পায়, তা বলে কি কুকুরের কাজ মানুষের শোভা পায়? ... আপনাকে কথা দিতে পারি, অসহিষ্ণু হয়ে ক্ষমতাধররা যা করেছেন আমি তেমন কিছুই করব না।

www.pathagar.com

নগদ অর্থে টাঙ্গাইলে ১০ শতাংশ জায়গা কেনা, নিভৃত গ্রামে দুই আড়াই লাখ টাকায় তিন চার একর কৃষি জমি কেনাকে যারা অবৈধ দখল হিসেবে দেখাতে পারেন, সংসদ ভবনের এই কক্ষটি নিয়ে তারা আমার সংসদ দখলের অভিযোগ আনতে পারেন। তারা সে অভিযোগ আনুক। কিন্তু তাদের অভিযোগ যাতে সত্য না হয়, সে ব্যাপারে আমি সব সময় সচেষ্ট।

দীর্ঘদিন আপনার সাথে কাজ করে যে অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জন করেছি তা আমার চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে। আপনার নির্ঝঞ্ঝাট দীর্ঘ জীবন ও সুস্বাস্থ্য কামনায়,

আপনারই একান্ত
বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী
জাতীয় সংসদ সদস্য
১৪০, টাঙ্গাইল-৮।
২৯.৭.৯৯

বিঃদ্রঃ কক্ষ খালিকরণের নোটিশটি সংসদ সচিবালয় থেকে পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় আমিও এই পত্রটি প্রকাশের জন্যে সংবাদপত্রে পাঠাতে বাধ্য হলাম।

আওয়ামী লীগ থেকে শো'কজ প্রাপ্ত বিদ্রোহী নেতা বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী ২৩ আগস্ট জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তাঁকে পাগল এবং ছাগল বলাসহ আরো কিছু 'অন্যায়' ও 'গর্হিত' অপরাধের সুবিচার না পাওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন। পদত্যাগপত্রে কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'আওয়ামী লীগের কমিটি বৈধ নয়, আওয়ামী লীগের সংসদীয় কমিটি অবৈধ। সরকার স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি নয়। আওয়ামী লীগ কোন নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিই রক্ষা করেনি। বর্তমান তথাকথিত ঐকমত্যের সরকার গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে এঁটে রাখলেও তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না'।

সংসদের চতুর্দশ অধিবেশনের উদ্বোধনী দিনে কাদের সিদ্দিকী সংসদে উপস্থিত থেকে অধিবেশন সমাপ্তির পর সকাল ১০ টা ৫০ মিনিটে তিনি স্পীকারের কক্ষে যান। এ সময় যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন সেখানে পূর্ব থেকেই উপস্থিত ছিলেন। কাদের সিদ্দিকী কিছুক্ষণ বক্তব্য রাখেন এবং পরে স্পীকারের হাতে পদত্যাগপত্র জমা দেন।

স্পীকারের কাছে দেয়া দীর্ঘ ৫ পৃষ্ঠার পদত্যাগপত্রে কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের প্রধান নির্বাহী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনা হেগের শান্তি সম্মেলন থেকে দেশে ফিরে আমাকে পাগল এবং ছাগল বলে আখ্যায়িত করেছেন। আমি একজন প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামী। স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার ভূমিকার জন্য রাষ্ট্র আমাকে বীরত্ব স্তবক জীবিতদের মধ্যে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব বীরোত্তম-এ ভূষিত করেছে। যা আমি সরকারের অযৌক্তিক কাজের প্রতিবাদ স্বরূপ সরকারকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। গত সাধারণ নির্বাচনে লক্ষাধিক ভোট পেয়ে আমি মহান জাতীয় সংসদে এসেছি। কিছু সময় আপনার (স্পীকার) সাথেও কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। এ রকম অবস্থায় সরকার প্রধান এবং সংসদ নেত্রী হিসেবে একজন সংসদ সদস্যকে পাগল এবং ছাগল বলা একটি অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ যা সংসদ অবমাননার শামিল। এই অন্যায় ও গর্হিত অপরাধের সুবিচারসহ অন্যান্য বিষয়গুলোর যথাযথ প্রতিকার যথাসময়ে পাওয়া যায়নি বলে কার্যপ্রণালী বিধির ১৭৭ (১) নং বিধি বলে আজ ইং ২৯-০৮-৯৯, বাংলা ১৪ ভাদ্র ১৪০৬, রবিবার, ১৪০ টাঙ্গাইল-৮ আসন থেকে নির্বাচিত সদস্য পদে ত্যাগপত্র আপনার বরাবরে পেশ করছি।'

পদত্যাগের পর প্রেস ব্রিফিং-এ তিনি বলেন, 'আমি শিগগিরই আওয়ামী লীগের শুদ্ধ কাউন্সিল ডেকে জনতার আওয়ামী লীগ গঠন করবো-যে দল বস্তি ভাঙ্গবে না, সন্ত্রাসীদের

www.pathagar.com

লালন-পালন করবে না'। তিনি বলেন, বর্তমান সংসদে অনেক অমীমাংসিত বাস্তব সমস্যা নিয়ে কোন আলোকপাত না করে বরং অনেকগুলো মীমাংসিত জাতীয় সমস্যাকে টেনে এনে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল, অর্পিত সম্পত্তি আইন বিলুপ্ত, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, বেতার-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন, বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে পৃথকীকরণ এসব কোন প্রতিশ্রুতিই রক্ষা করেনি। সরকার সন্ত্রাস দমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, বাস্তবে তার কোন কিছুই করেনি। বরং সংসদে দাঁড়িয়ে 'দেখামাত্র গুলি করা হবে'- প্রধানমন্ত্রীর এই আস্ফালনে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের গন্ধ পাওয়া যায়। আগে আমরা ব্যাংক থেকে টাকা লুটের কথা শুনেছি। এবার দেখলাম ব্যাংক লুট করা হয়েছে। এই সরকার স্বাধীনতার পক্ষের নয়, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সরকার নয়।

দল থেকে পদত্যাগ করে কাদের সিদ্দিকী উপ-নির্বাচনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলে চ্যালেঞ্জের প্রত্যুত্তরে সরকার অত্যধিক সেনসিটিভ হয়ে ওঠে। যে কোনো মূল্যে নৌকার জয় নিশ্চিত করার নীতি কার্যকর করতে মন্ত্রিসভা, গোটা প্রশাসন, আওয়ামী লীগের সর্বশক্তি নিয়োজিত হয় সেখানে। ১০ নভেম্বর ১৯৯৯ টাঙ্গাইল উপ-নির্বাচনের প্রচারকালে আকস্মিকভাবেই হাজির হন বেশ কয়েকজন মন্ত্রী ও সাংসদ। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে টাঙ্গাইল শহরের পার্শ্ববর্তী পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের রেষ্ট হাউসে থেকে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডা. এস এ মালেকের তত্ত্বাবধানে প্রায় ২০ জন তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা ঢাকা থেকে গিয়ে কাজ করেন দলীয় প্রার্থীর পক্ষে। তারপরও এখানে প্রচার ও নির্বাচনী তৎপরতায় এগিয়ে থাকেন কাদের সিদ্দিকী। সরজমিনে সখীপুর ও বাসাইল ঘুরে দেখা গেছে, দু'টি থানাতে আওয়ামী লীগের সমর্থক সংখ্যা বেশি থাকলেও ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তায় কাদের সিদ্দিকী শওকত মোমেন শাজাহানকে অতিক্রম করেছিলেন। কাদের সিদ্দিকীকে হেনস্তা করার জন্য এবং তাঁর পরাজয় নিশ্চিত করতে মন্ত্রী ও সাংসদদের নির্বাচনী এলাকায় জোর তৎপরতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেন অনেকে। আওয়ামী লীগ প্রার্থী শাজাহানের পক্ষে প্রচারণা চালাতে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ সখীপুরে জনসভা ও সমাবেশে বক্তব্য দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী, হুইপ উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ, হুইপ মিজানুর রহমান মানু, এমপি সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ, আব্দুল লতিফ মির্জা ও শামসুর রহমান শরীফ। বিকেলে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জিন্নাতুননেসা তালুকদার ঢাকার কয়েকজন মহিলা ওয়ার্ড কমিশনার নিয়ে সখীপুরে যান। বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী খ ম জাহাঙ্গীর ও এমপি শাজাহান খান যান বাসাইলে।

১৫ নভেম্বর টাঙ্গাইল-৮ আসনের উপ-নির্বাচনে ভোটের মৃত্যু হয়। প্রশাসনিক নীল নকশায় নির্লজ্জ, নারকীয় কারচুপির বন্যায় ভেসে যায় সখীপুর ও বাসাইলের ভোটের বাক্স। কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে ব্যর্থ হাজার হাজার মানুষের আহাজারিতে দুই নির্বাচনী এলাকার পরিবেশ অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। গণতন্ত্রের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে তারা বিডিআর-পুলিশের হাতে গুলিবিদ্ধ হন। সহিংসতার নানা ঘটনায় ৫০ জন হতাহত হন। ৮২ টির মধ্যে ৫০ টি কেন্দ্রে কাদের সিদ্দিকীর পোলিং এজেন্টদের সরকারি দল প্রবেশ করতে দেয়নি। আওয়ামী এমপি ও সন্ত্রাসীরা ভোট কেন্দ্রেগুলো কব্জায় নিয়ে বিডিআর-পুলিশ ও নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় ব্যালট পেপারে নৌকা প্রতীকের ঘরে একতরফা ছাপ্পা মারে। জনগণ উত্তেজিত হয়ে উঠলে প্রিজাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণ বন্ধের ঘোষণা দেন। সখীপুর থানার বড়ওচনা কেন্দ্রে ম্যাজিস্ট্রেট, প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, পুলিশ নৌকা

www.pathagar.com

মার্কার ব্যাচ যাদের নেই তাদের ভোট দিতে দেয়নি। শ' শ' ভোটারকে তাদের ভোট দেয়া হয়ে গেছে বলে ফিরিয়ে দেয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে ভোটারদের হাতে কালি লাগিয়ে দিয়ে বলা হয়, আপনার ভোট পূর্বেই দেয়া হয়ে গেছে। এ অবস্থায় ভোটারা ভোট দিতে না পেরে প্রতিবাদ জানায়। দুপুর ১২ টার দিকে প্রায় ১ হাজার মানুষ জড়ো হয়ে প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এক পর্যায়ে জনগণ মিছিল নিয়ে কেন্দ্রের দিকে এগুতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে পুলিশ প্রথম মিছিল লক্ষ্য করে গুলি চালালেও ক্ষুব্ধ জনগণ গুলি উপক্ষো করে কেন্দ্রের দিকে এগুতে থাকে। এ পর্যায়ে পুলিশ ও বিডিআর মিছিল লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে ৯ জন গুলিবিদ্ধ হয়। তাদেরকে দ্রুত সখীপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর শুকুর আলী, শাজাহান, দিলদার, ইদ্রিস আলী ও অজ্ঞাত ১ যুবককে আশঙ্কাজনকভাবে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। জনগণের প্রতিবাদকালে বড়চওনা ভোটকেন্দ্রে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ ইমদাদুল হক আহত হন। পুলিশ, বিডিআর ও জনতার সংঘর্ষের পর দুপুর ২ টায় এ কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধ করে দেয়া হয়।

ভোটের আগের দিন রাতে নারায়ণগঞ্জ-২ আসনের এমপি এমদাদুল হক ভুঁইয়া ঢাকা মেট্রো-গ-১১-৬৮০৮ নম্বর গাড়িতে করে সখীপুরের সারাসিয়া গ্রামে এসে আওয়ামী সমর্থক সিকান্দর আলীর বাড়িতে উঠেন। রাতে তিনি গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে নৌকায় ভোট দেয়ার জন্য কয়েক লাখ টাকা বিলি করেন। সকালে সারাসিয়া ভোটকেন্দ্রের নিকটবর্তী একটি বাড়িতে বসে তিনি ভোটকেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ করেন। এমপির উস্কানীর মাধ্যমে তার সঙ্গী ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ সমর্থকদের দিয়ে জাল ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করছিলেন। এ অবস্থায় পিঁড়ি সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। দুপুর ১২টায় পিঁড়ি মার্কার সমর্থক প্রায় ৪/৫শ' জনতা ওই বাড়ি ঘেরাও করে এমপিকে আটক করে। এ সময় বিক্ষুব্ধ জনতা তাকে মারধর করে। বিক্ষুব্ধ জনগণের কেউ কেউ এমপির পরনের কাপড় খুলে তাকে শাড়ি পরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয় কিছু মুরব্বী লোক এতে বাধা দেন। তারা এমপিকে অন্য একটি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখেন।

কালিয়া আড়াইপাড়া সিনিয়র মাদ্রাসা কেন্দ্রে প্রকৃত ভোটারদের পুলিশ ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড় করিয়ে রেখে সকাল থেকেই নৌকা মার্কার সমর্থকরা পুলিশের সহযোগিতায় ব্যালট পেপারে সিল মারতে থাকে এবং অপেক্ষমান কিছু সংখ্যক ভোটারকে তাদের ভোট দেয়া হয়ে গেছে বলে জানিয়ে দেয়া হয়। এ অবস্থায় ভোট কেন্দ্রে ক্ষুব্ধ মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে প্রায় ১ হাজার জনগণ কেন্দ্র ঘেরাও করে এর প্রতিবাদ জানায়। এক পর্যায়ে ক্ষুব্ধ জনগণ কেন্দ্রের ভিতর ধাওয়া দিয়ে সন্ত্রাসী টিটো, দুলু, মাইনুদ্দিন, নুরুল ইসলাম ও আবু হানিফকে আটক করে বেধড়ক মারপিট করে ভোট বন্ধ করার দাবি জানায়। উক্ত সন্ত্রাসীরা ঢাকা-চ-১১-১১৩১ নম্বর গাড়িতে করে এই কেন্দ্রে আসে। পাঁচজনকে আটকের পর গাড়িতে অবস্থানরতরা কেটে পড়ে। ব্যাপকহারে সিল মারার কারণে কেন্দ্রে সকাল ১১ টার মধ্যে ২৯শ' ভোটের মধ্যে ১৫শ' ভোট কাস্ট হয়ে যায়। উপস্থিত জনগণ কেন্দ্র ঘেরাও করে দাবি করে এই ভোট অবৈধভাবে দেয়া হয়েছে। জনগণ কর্তৃক সন্ত্রাসী আটক ও কেন্দ্র ঘেরাওয়ের খবর পেয়ে সকাল ১১ টার কিছু পরে কাদের সিদ্দিকী কেন্দ্র পরিদর্শনে যান। এ সময় প্রায় এক হাজার জনতা কাদের সিদ্দিকীকে ব্যাপকহারে নৌকায় সিল মারার ঘটনা জানান। এক পর্যায়ে ক্ষুব্ধ জনগণের বিক্ষোভের মধ্যে প্রিজাইডিং অফিসার মোঃ শামসউদ্দিন ভোট বন্ধের ঘোষণা দেন।

www.pathagar.com

সকাল ৯ টায় সরকার সমর্থকরা বোয়ালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রটি দখল করলে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ দিয়ে কাদের সিদ্দিকীর এজেন্টকে বের করে দেন। এ সুযোগে সরকার সমর্থকরা ব্যালট পেপারে নৌকায় সিল মারতে থাকে। এ সময় বোয়ালিয়া কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী নলুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্রে নির্বাচন কমিশনার মোস্তাক আহমেদ চৌধুরী ও নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা পরিদর্শন করছিলেন। কাদের সিদ্দিকীর সমর্থকরা নির্বাচন কমিশনারের কাছে বোয়ালিয়া কেন্দ্র দখলের খবর জানালে নির্বাচন কমিশন সচিব ওই কেন্দ্রে যান। এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনার জানান, ওই কেন্দ্রে কিছু অনিয়মের খবর পাওয়ার পর আমি সচিব মহোদয়কে সেখানে পাঠাই। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, কাদের সিদ্দিকীর এজেন্টরা অযথা হাঁটাহাঁটির কারণে তাদেরকে ম্যাজিস্ট্রেট কেন্দ্র থেকে বের করে দেন। এ কাজটি করা ম্যাজিস্ট্রেটের উচিত হয়নি। সুখীপুর-বাসাইলের ৮২টি কেন্দ্রের প্রতিটিতেই বিপুল সংখ্যক ভোটার উপস্থিত ছিল। পুরুষের চেয়ে নারী ভোটারের সংখ্যা ছিল বেশি। প্রচন্ড রোদের মধ্যে প্রতিটি কেন্দ্রে শ' শ' মহিলা ভোটার দীর্ঘ লাইনে ঘন্টার পর ঘন্টা ভোট দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু এদের বেশির ভাগই ভোট না দিয়ে বাড়ি ফিরেছে। যেসব কেন্দ্রে কাদের সিদ্দিকীর সমর্থক সংখ্যা বেশি সেসব কেন্দ্রে ভোটদানের গতি শ্লথ করে দেয়া হয়। অনেক কেন্দ্রে বিকেল ৪টা পর্যন্ত দাঁড়িয়েও অসংখ্য ভোটার ভোট দিতে পারেনি। ভোটারদের ভোটদান প্রক্রিয়া শ্লথ থাকলেও বড়চওনা কেন্দ্রে মোট ৪ হাজার ৭শ' ৩৬ জন ভোটারের মধ্যে দুপুর ১২টার মধ্যেই ২ হাজার ৫শ' ৯৮টি ভোট কাস্ট হয়ে যায়। সকাল ১১টার মধ্যে আওয়ামী সমর্থকরা জোরপূর্বক কেন্দ্র দখল করে তাদের প্রার্থীর সপক্ষে ব্যালট পেপারে সিল মেরে তা বাক্সে ঢুকিয়ে দেয়। নির্বাচন কমিশনার মোশতাক আহমদ চৌধুরী এই কেন্দ্র পরিদর্শনে আসেন। উত্তেজিত লোকজন তাকে এ সময় ঘিরে ধরে তাদের অভিযোগের কথা জানান। নির্বাচন কমিশনার সব দেখে বলেন, এভাবে ভোট চলতে পারে না। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে এই কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত করে দেন। দুপুর সাড়ে ১২টায় সখীপুরের প্রতিমাবঙ্কী সিনিয়র মাদ্রাসা ভোটকেন্দ্রের বেশিরভাগ ভোটার ভোট দিতে পারেনি। এই কেন্দ্রে মোট ভোটার ৩ হাজার ২শ'। ১১টার মধ্যে এই কেন্দ্রে ভোট কাস্ট হয় ২ হাজার। এই কেন্দ্রের এমপি আব্দুল লতিফ মির্জা নিজে উপস্থিত থেকে সকালে জোরপূর্বক ভোটকেন্দ্র দখল করে কারচুপি করেন। কেন্দ্রে ভোট কারচুপির অভিযোগ শুনতে পেরে ১২টা ৫৫ মিনিটে কাদের সিদ্দিকী কেন্দ্রে আসেন। এ সময় উপস্থিত লোকজন তাঁকে কারচুপির কথা বলেন। তিনি খোঁজখবর নিয়ে কারচুপির বিষয়ে সত্যতার কথা জানতে পেরে প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে লিখিতভাবে ভোট গ্রহণ স্থগিত রাখার আহবান জানান। এর পরপরই জাল ভোট দেয়ার অপরাধে খোরশেদ আলম নামের নৌকা প্রতীক সমর্থনকারী এক ব্যক্তিকে লোকজন মারধর করে। এ সময় উত্তেজিত লোকজনকে নিয়ন্ত্রণ করেন কাদের সিদ্দিকী। বাসাইল ও সখীপুর থানার গোবিন্দ, দক্ষিণ বাড়ি, বাথুলি, নিমতৈলা, নলুয়া, বোয়ালি, চতল বাইত, কালিয়া, ইন্দ্রজানি, গুল্লা, অটোয়া, কেন্দুরা পাড়া, হাবলা, হাতি বান্দা, রাজাবাড়ি, বইয়া মদু, কালিয়া পাড়াসহ বেশকিছু কেন্দ্র পুলিশ-বিডিআরের সহযোগিতায় সরকারি দলের সমর্থকরা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের লোকজনকে অস্ত্রের মুখে বের করে দিয়ে ব্যালটে নৌকা সীল মারে।

টাঙ্গাইল-৮ আসনের উপ-নির্বাচনে নৌকার প্রার্থীর পক্ষে সরকারের নজিরবিহীন কারচুপির প্রতিবাদে এবং নির্বাচন বাতিলের দাবীতে ১৭ নভেম্বর বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'কোন কোন পরাজয় যে বিজয়ের

www.pathagar.com

চেয়েও শতগুণ বেশি মহিমান্বিত তা গত ১৫ নভেম্বরের টাঙ্গাইল উপ-নির্বাচন প্রমাণ করেছে। এই প্রধানমন্ত্রীর দল যে কি উলঙ্গভাবে ভোট ডাকাতি করতে পারে তা আমি সমগ্র জাতিকে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছি। আর এই ভোট ডাকাতি করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্লজ্জভাবে আমার বিজয় ছিনিয়ে নিলেও মূলতঃ তিনিই পরাজিত হয়েছেন। জনগণের কাছে তার নির্বাচনী স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। এজন্য টাঙ্গাইলবাসীর মুখে মুখে এখন শ্লোগান উঠেছে 'শেখ হাসিনা ভোট চোর/ধরা পড়েছে সখিপুর'। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতদিন বলে বেড়াতেন দুই ভোটচোরা একত্র হয়ে সরকার থেকে নাকি হাসিনাকে উৎখাতের অপচেষ্টা করছে। এখন প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসে কাউকে ভোট চোর বলার কোন অধিকার আর তার রইলো না। কারণ টাঙ্গাইল উপ-নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী এখন জাতীয় ও আন্ত র্জাতিকভাবে সর্বকালের সেরা ভোট ডাকাত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। প্রশাসনকে ব্যবহার করে যে ভোট ডাকাতি প্রধানমন্ত্রী করেছেন তার সেই প্রশাসনিক ভোট ডাকাতদের প্রতিহত করাই আমাদের বর্তমান লক্ষ্য। এই ভোট ডাকাতদের সামাজিকভাবে প্রতিহত করে ধীরে ধীরে শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসাই আমাদের আগামী কর্মসূচি। ডাকাত চিহ্নিত হয়েছে, এখন তাদের ধরা অনেক সহজ হবে'। দেশবাসীর প্রতি তিনি এই ভোট ডাকাতদের প্রত্যাখ্যান করার আহবান জানান।

সংবাদ সম্মেলনের সময় তিনি ছিলেন হাস্যোজ্জ্বল এবং যথেষ্ট দৃঢ়চেতা। তিনি টাঙ্গাইলের ডিসি ও রিটার্নিং অফিসার মোল্লা ওয়াহিদুজ্জামানের বেশ কিছু ঘোরতর অনিয়ম এবং শাসক দলীয় কর্মীর মত আচরণের অভিযোগ করে সাংবাদিকদের বলেন, 'জীবনে আমার বহু অভিজ্ঞতা রয়েছে, কিন্তু ১৫ নভেম্বরের এই প্রহসনের নির্বাচন আমার কাছে এক বিস্ময়কর নতুন অভিজ্ঞতা। এই সরকার যে প্রশাসনকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে তা এখানে নগ্নভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছেন। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের নিরপেক্ষতার নূন্যতম মর্যাদাও তারা রাখেনি। ভবিষ্যতে এই চরিত্রহীন, নীতিহীন নেতৃত্ব দিয়ে জাতির কোন কল্যাণ আশা করা যায় না। যে ১৩০ জন ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়েছিল তার অনেকেই ব্যক্তিগতভাবেও ভোট চুরিতে অংশ নিয়েছে। সুতরাং এই ম্যাজিস্ট্রেটরা কিভাবে দেশের বিচার কাজ করবে'? তিনি কর্তব্যরত সশস্ত্র বাহনী প্রসঙ্গে বলেন, 'আর্মি-বিডিআর ভোট চুরিতে অংশ নেয়নি। তবে তারা বাধাও দেয়নি। তাদেরকে ভোট চুরির সাক্ষী বানানো হয়েছে। যারা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করবে, এভাবে তাদের স্থবির করে ফেলা হয়েছে'। উপ-নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করার দাবী জানিয়ে কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'আমি আশা করি প্রশাসনের এই জালিয়াতি ও প্রহসনের নির্বাচনের দায় নির্বাচন কমিশন কখনো নেবে না এবং তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতেও ব্যর্থ হবে না। তাদের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ জনগণকে আশান্বিত করবে এবং নির্বাচন কমিশনের ভাবমূর্তি ও মর্যাদা রক্ষা করবে'। তিনি উল্লেখ করেন, 'ঐ নির্বাচনে ৬০% ভোটারই তাদের ভোট দিতে পারেনি অর্থাৎ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে দেয়া হয়নি'। তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে ৪৮টি কেন্দ্রের ব্যাপারে আপত্তি দিয়েছেন বলে জানান। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে একটি বিবেকবান সরকার প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে তিনি আরো বলেন, 'সরকার সরকারের মতো কাজ করবে, ব্যক্তির মতো নয়। কিন্তু বর্তমান সরকার ব্যক্তিগত অনুরাগ-বিরাগের বশবর্তী হয়ে কাজ করছে'।

২৪ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের প্রতি চ্যালেঞ্জ দিয়ে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্দেশ্যে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন চত্বরে স্থাপিত উন্মুক্ত প্যান্ডেলে কয়েক হাজার লোকের

www.pathagar.com

উপস্থিতিতে কাদের সিদ্দিকী আহুত কনভেনেট (সম্মেলন) সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে শান্তি পূর্ণভাবে যথারীতি শুরু হয়। জাতীয় ও দলীয় পতাকা উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কনভেনশনের কাজ শুরু হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ড. কামাল হোসেন জাতীয় পতাকা এবং সভাপতি কাদের সিদ্দিকী দলীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কনভেনশনের উদ্বোধন করেন। এরপর 'আমারি দেশ সব মানুষের' শীর্ষক দলীয় সঙ্গীত পরিবেশন শেষে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট ও ৩ নভেম্বরের জেল হত্যাকান্ডের নিহত সকল নেতৃবৃন্দ, ১৯৭৫-এর স্বাধীনতা আন্দোলনের শহীদ, ১৯৭৫-এর প্রতিরোধে কাদেরিয়া বাহিনীর নিহত সদস্যরা, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, কর্নেল তাহের, মেজর জেনারেল মঞ্জুর, এমএ জলিল প্রমুখের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এরপর কনভেনশনের প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক সাবেক এমপি ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের প্রাক্তন সভাপতি এডভোকেট ফজলুর রহমানের স্বাগত ভাষণ এবং এর ইংরেজি তরজমা শেষে সোয়া ১১টায় কাদের সিদ্দিকী বক্তব্য দিতে দাঁড়ালে প্যান্ডেলের পেছন থেকে একদল তরুণ 'বিভেদ না ঐক্য, ঐক্য ঐক্য' শ্লোগান দিয়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করে এবং একই সময়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভেতর থেকে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা সম্মেলন স্থলের দিকে মুহুর্মুহু গুলি ছুঁড়তে থাকে। এ সময় মঞ্চে ড. কামাল হোসেন ছাড়াও বিশেষ অতিথি ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন, কাদের সিদ্দিকীর স্ত্রী নাসরীন সিদ্দিকী, কনভেনশন কমিটির আহবায়ক এডভোকেট ফজলুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। প্যান্ডেলে শ্রোতাদের কাতারে ছিলেন রাশিয়ান কূটনীতিক নাখারভ, বিএনপি নেতা হারিস চৌধুরী, জহিরউদ্দীন স্বপন, সিরাজুল ইসলাম সেলিম, গণফোরাম নেতা জহিরুল ইসলাম, মফিজুল ইসলাম, বিশিষ্ট সাংবাদিক এনায়েত উল্লাহ খান প্রমুখ। কাদের সিদ্দিকী বক্তৃতায় বলেন, 'যদি আমাকে ও ড. কামালকে হত্যা করলে শেখ হাসিনার সুবিধা হয় তবে এই মঞ্চে এসে আমাদের হত্যা করে যান। কিন্তু আমরা মরলেও শেখ হাসিনা আপনি আর বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না। ক্ষমতা ছাড়তেই হবে আপনাকে'। তিনি বলেন, 'এই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একদিন পাক বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছি, কিন্তু সেই উদ্যান থেকে সরকারের লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসী বাহিনী আমাদের উপর হামলা করে জনগণের সাংবিধানিক অধিকার ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উপর আঘাত হেনেছে। তাই এ লজ্জা সরকারের। তারা সারাদেশকে এভাবে বিশৃঙ্খলায় ভরে ফেলেছে। সরকারের এই ব্যর্থতার প্রতিবাদ করায় আওয়ামী লীগ আমাকে সতীনের পুত্র বলে মনে করছে'। বক্তৃতার এ পর্যায়ে দুপুর পৌনে ১২ টার দিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে সন্ত্রাসীরা আবারও আক্রমণ শুরু করে। পুলিশের সক্রিয় ছাত্রছায়ায় অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত শতাধিক ছাত্রলীগ সন্ত্রাসী উপর্যুপরি গুলি চালাতে চালাতে ৩০ মিনিটের মধ্যেই কনভেনশনের প্যান্ডেল ও স্টেজ দখলে নিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর এবং বোমাবাজি করলে ভয়ে সাংবাদিক ও অন্য নেতৃবৃন্দ মাটিতে শুয়ে পড়েন। গুলি তখন মঞ্চে, প্যান্ডেলে এসে পড়তে থাকে। সন্ত্রাসীদের গুলিতে কনভেনশনে আগত রইস, সুমন, দীন ইসলাম, রেজা, আঃ রশিদ, শাহাজালাল, রুবেল, নাসির, ইব্রাহীম, কামাল, কাদের, পাভেল প্রমুখসহ দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার সাংবাদিক সাইদুর রহমান, কেরামত উল্লাহ ও দৈনিক খবরের তিমির দত্ত আহত হন। পরে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মুহূর্তের মধ্যে হামলায় কনভেনশন পন্ড হয়ে যায়। উত্তেজিত কাদের সিদ্দিকী তখন খালি হাতেই সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধে এগিয়ে যান। কিন্তু দলের অন্য নেতা-কর্মীরা তাঁকে বিরত করে ফিরিয়ে আনেন এবং ড. কামাল হোসেন, আব্দুল মতিন, নাসরীন সিদ্দিকীকে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেন। সন্ত্রাসীরা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ১৫ মিনিটের মধ্যেই উদ্যান থেকে এসে সভার মঞ্চ দখল করে নেয় এবং

www.pathagar.com

ব্যাপক ভাঙচুর ও বোমাবাজি করে। পুলিশের রহস্যজনক নিষ্ক্রিয়তায় সন্ত্রাসীদের ব্যাপক তান্ডবের মধ্যে উপস্থিত লোকজনের প্রাণভয়ে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। সন্ত্রাসীরা মঞ্চ তছনছ, চেয়ার-টেবিল ও গাড়ি ভাঙচুর সহ প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে এক পর্যায়ে মঞ্চেও অগ্নিসংযোগ করে। বলরাম পোদ্দার, কালা সেন্টু, সাজ্জাদ হোসেন প্রমুখের নেতৃত্বে সশস্ত্র ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা মঞ্চ ভেঙ্গে স্থাপিত মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শামসুল হকের ছবি নামিয়ে ভেঙ্গে ফেলে এবং ছবিতে অগ্নিসংযোগ করে, স্টেনগান, ওজি রাইফেল, কাটা রাইফেল, রিভলভার, পিস্তল, এলজি ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্রের এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ে, বোমা ফাটিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান দিয়ে উপস্থিত পুলিশের সহযোগিতায় বীরদর্পে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় চলে যায়। তারা কনভেনশনস্থলের পাশে রাখা ড. কামাল হোসেনের প্রাইভেট কার ও কাদের সিদ্দিকীর পাজেরো জীপসহ ৭/৮ টি গাড়ি ভাঙচুর করে। কাদের সিদ্দিকী মঞ্চ থেকে নেমে সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধের জন্য পুলিশের প্রতি নির্দেশ দিলে পুলিশের সাথে তাঁর কথা কাটাকাটি হয় এবং পুলিশ তাঁকে সভাস্থল ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করে। অবশেষে তিনি উপস্থিত কনভেনশনে নাসরীন সিদ্দিকী, ড. কামাল হোসেন, ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন, এডভোকেট ফজলুর রহমান প্রমুখ নেতা-কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মিছিল করে প্রেসক্লাবের দিকে চলে আসেন। তারা এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীদের সহযোগিতাকারী পুলিশের ওপরও চড়াও হয় এবং চেয়ার ভাঙ্গা কাঠ, বাঁশের লাঠি দিয়ে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধের প্রচেষ্টাকালে পুলিশ একতরফা টিয়ার গ্যাসের শিকার হয়। এসময় তারা রমনা থানার ওসির নেতৃত্বাধীন পুলিশ বাহিনীকে ধাওয়া করলে কিছু পুলিশ প্রাণভয়ে ইনস্টিটিউশন চত্বর ছেড়ে উর্ধ্বশ্বাসে রমনা উদ্যানের দিকে দৌড়ে পালাতে থাকে। এ সময় পুরো এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কাদের সিদ্দিকী ও ডা. কামাল হোসেন মিছিল নিয়ে প্রেসক্লাবের সামনে এসে তাৎক্ষণিক এক প্রতিবাদ সমাবেশ করেন। এখানে কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'এই সরকার ইয়াহিয়ার উত্তরসূরী। তারা দেশদ্রোহী। ইয়াহিয়াকে যেমনি ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করেছি, তাদেরকেও তেমনি গণআন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করব'। ড. কামাল হোসেন এই হামলার জন্য ছাত্রলীগকে দায়ী করে বলেন, 'রাষ্ট্রীয় ছত্রছায়ায় এভাবে সারাদেশে সন্ত্রাস হচ্ছে'। তিনি আরও বলেন, 'তারা এভাবে সংবিধানের ওপর, মানবাধিকারের ওপর আঘাত হানছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অপমানিত করছে। কিন্তু সংবিধানকে রক্ষার জন্যই আমাদের এই উদ্যোগ'। এ জন্য তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানান। এই প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে কাদের সিদ্দিকী প্রেসক্লাবে এক তাৎক্ষণিক সংবাদ সম্মেলনে তার 'কনভেনশন ঘোষণা' পাঠ করেন এবং নবগঠিত নতুন রাজনৈতিক দলের নাম 'বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-জনতা লীগ' (বাকশজল) ঘোষণা করেন। এ সময় তাঁর সাথে ড. কামাল হোসেনও উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'আমরা আওয়ামী লীগ থেকে আসিনি বা আওয়ামী লীগেও যাইনি। মুক্তিযুদ্ধে ছিলাম, এখনও আছি'। আওয়ামী লীগ ধীরে ধীরে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের লোক দ্বারা বর্তমানে ভরে গেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। প্রধান বিরোধী দলসমূহের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'দলের চেয়ে জনগণের মিলনই আমাদের প্রধান লক্ষ্য'।

প্রেসক্লাবে সমাবেশ ও সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখার পর কাদের সিদ্দিকী দলীয় সমর্থকদের নিয়ে মিছিল করে আবার ইনস্টিটিউটে আসেন। সড়ক ভবন মসজিদে তিনি জুমার নামাজ পড়তে গেলে তার সমর্থকরা রাস্তায় অবস্থান নিলে যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে সড়কের

www.pathagar.com

এক অংশ ছেড়ে দেয়া হয়। নামাজের পর পৌনে ২ টায় সমর্থকদের নিয়ে কাদের সিদ্দিকী লন্ডভন্ড হয়ে যাওয়া কনভেনশন প্যান্ডেলে যান এবং এবং কনভেনশনের ২য় পর্ব শুরু করেন। এখানে তিনি নবগঠিত বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের ১০১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠনের ঘোষণা দেন। এডভোকেট ফজলুর রহমান নতুন দলের আহবায়ক কমিটির সভাপতি হিসেবে কাদের সিদ্দিকীর নাম প্রস্তাব করলে সকলে হাত তুলে সমর্থন জানান। কাদের সিদ্দিকী দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ফজলুর রহমানের নাম প্রস্তাব করলে তাঁর প্রতি সমর্থন জানানো হয়। এরপর কাদের সিদ্দিকী বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি বলেন, 'আমরা একটা নতুন দল গঠন করছি। এটা কারোর পছন্দ নাও হতে পারে। কিন্তু দানবীয় কায়দায় ভাঙচুর করার অধিকার কারোর নেই। আওয়ামী লীগের মহান নেত্রীকে বলে দিতে চাই, 'আপনি বাংলার মানুষকে চিনেন না। সখীপুর-বাসাইলে ভোট চুরি করে যতটা না নিজের ক্ষতি করেছেন, আজ দানবীয় হামলা করে তার চেয়েও বেশি ক্ষতি করলেন'। কাদের সিদ্দিকীর বক্তৃতাকালে ২টা ৮ মিনিটে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের উত্তর দিকে একটি প্রাইভেট কার থেকে পুনরায় গুলিবর্ষণ শুরু হলে লোকজন ছোটাছুটি শুরু করে। সন্ত্রাসীরা ৪/৫ রাউন্ড গুলি ছুড়লেও ভেতরে প্রবেশ করেনি। গুলিবর্ষণের পর কাদের সিদ্দিকী তড়িঘড়ি করে ২ টা ৮মিনিটে কনভেনশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এরপর কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি মৎস্য ভবন, তোপখানা রোড, পল্টন মোড় হয়ে মতিঝিলে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল শেষে কাদের সিদ্দিকী সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সরকারকে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলেন, 'জুলুমবাজরা টিকে থাকতে পারে না। এটাই ইতিহাস'।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে কনভেনশনে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলার প্রতিবাদে ৩১ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে কাদের সিদ্দিকীর পূর্বনির্ধারিত প্রতিবাদ সমাবেশ পন্ড করে দেয় পুলিশ। দুপুর ২ টায় কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের কর্মীরা পল্টন ময়দানে মাইকসহ একটি ট্রাক নিয়ে উপস্থিত হয়। তারা সভায় যোগদানের জন্য জনসাধারণকে মাইকে আহবান জানাতে থাকলে পশ্চিম দিক থেকে দুই প্লাটুন পুলিশ গিয়ে ট্রাকটি ঘিরে ফেলে। মতিঝিল থানার ওসির নেতৃত্বে একদল পুলিশ মাইক বন্ধ করে ট্রাক নিয়ে দ্রুত পল্টন ময়দান ত্যাগ করার জন্য কাদের সিদ্দিকীর কর্মীদের নির্দেশ দেয়। নির্দেশ উপেক্ষা করে মাইকে জনসভার প্রচার চালাতে থাকলে পুলিশ হ্যাঁচকা টান দিয়ে মাইকের তার বিচ্ছিন্ন করে ট্রাক থেকে নিজেরাই মাইক খুলে ফেলে। পুলিশ সাংবাদিকদের জানায়, কাদের সিদ্দিকীর সমাবেশে হামলার আশংকা আছে বলে তারা গোয়েন্দা রিপোর্ট পেয়েছেন। এজন্য তারা ওপরের নির্দেশে সমাবেশ করতে দেবে না। এছাড়া জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পল্টন ময়দান ব্যবহারের জন্য কাদের সিদ্দিকীকে অনুমতি দেয়নি বলে তারা জানান। এ সময় পল্টন ময়দানের দক্ষিণপ্রান্তে 'রাসেল কিশোর ক্রিকেট প্রতিযোগীতা' লেখা একটি হলুদ রং-এর ব্যানার পিছনে রেখে একদল তরুণ ক্রিকেট খেলছিল। মাইক নিয়ে পুলিশের সঙ্গে কাদের সিদ্দিকীর কর্মীদের কাড়াকাড়ির সময় কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ নেতা মুক্তিযোদ্ধা ইশতিয়াক আজিজ উলফাত সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেন, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রথমে মাঠ খালি আছে বলে অনুমতি দিয়েও পরে উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাদের মাঠ ব্যবহার করতে দিচ্ছে না। আজ এখানে একটি লোক দেখানো ক্রিকেট খেলার মহড়া দেয়া হচ্ছে। এ সময় স্টেডিয়াম এলাকায় শ'শ' লোক পল্টন মাঠের সমাবেশ পন্ড করার দৃশ্য দেখছিলেন। বিকাল ৩ টায় কাদের সিদ্দিকী মিছিলসহ পল্টন ময়দানে এসে পৌছলে পুলিশ সতর্ক অবস্থান নেয়। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'এই সরকার কতটা স্বৈরাচারী আজকে

www.pathagar.com

আমাদের প্রতিবাদ সমাবেশ করতে না দিয়ে তা প্রমাণ করলো। তিনি বলেন পথে ঘাটে সমাবেশ না করে শুধুমাত্র পল্টন ময়দানে সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত এই সরকারই নিয়েছে। অথচ আজ রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার কারণে আমাদের সমাবেশ করতে দিচ্ছে না।' তিনি বলেন, 'দেশ স্বাধীন হবার পর '৭১ সালের ১৮ ডিসেম্বর আমিই প্রথম পল্টন ময়দানে সমাবেশ করেছিলাম।' এরপর সমাবেশ করতে না দেয়ার প্রতিবাদে কাদের সিদ্দিকী দ্রুত পল্টন ময়দান ত্যাগ করে সরকার বিরোধী বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে স্টেডিয়াম ঘুরে উত্তর গেট দিয়ে বের হয়ে মতিঝিলের দিকে রওয়ানা হন। মিছিলটি দৈনিক বাংলা মোড়, জনতা ব্যাংক মোড় ঘুরে স্টেডিয়ামের পূর্ব গেইট দিয়ে মাইকসহ আবার স্টেডিয়ামের সামনের সড়কে এসে দাঁড়ায়। কাদের সিদ্দিকী ফ্লাড লাইটের টাওয়ারের নিচে উচু জায়গায় দাঁড়িয়ে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে পল্টনে সমাবেশ করতে না দেয়ার প্রতিবাদে বক্তব্য রাখেন। এখানে কাদের সিদ্দিকী বলেন, '২৪ ডিসেম্বর যদি সরকার আমাদের কনভেনশনে হামলা না করত তাহলে আজ এই প্রতিবাদ সমাবেশ ডাকার প্রয়োজন হতো না'। তিনি বলেন, 'আজ পল্টনের উত্তর প্রান্তে সমাবেশ করে প্রমাণ করলাম আমরা পিছু হঠতে জানি না'। কাদের সিদ্দিকী সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'শেখ হাসিনা যদি আবারও অস্ত্রের ভাষায় কথা বলেন, 'তাহলে আগামীতে জনগণকে সাথে নিয়ে তার সমুচিত জবাব দেয়া হবে। একটু অপেক্ষা করুন আন্দোলন কাকে বলে শেখ হাসিনাকে দেখাব'। তিনি বলেন, 'হাসিনা ভয় পেয়েছে বলেই আজ পল্টনে আমাদেরকে সমাবেশ করতে দেয়নি। বাধা দিয়ে সরকার প্রমাণ করলো কৃষক শ্রমিক জনতা লীগকে গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছে'। কাদের সিদ্দিকী সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে আরও বলেন, 'আমার দল এখন সহিষ্ণুতার পরিচয় দিচ্ছে। আপনারা পাথর মারবেন আর আমরা আপেল ছুড়ে মারবো এমন কিছু মনে করবেন না'। তিনি জনসাধারণকে মহল্লায় মহল্লায় গিয়ে হাসিনা সরকারের স্বৈর আচরণের কথা প্রচার করার আহবান জানান। সমাবেশে গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেনের একটি বিবৃতি পাঠ করে শোনান কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ফজলুর রহমান। ড. কামাল হোসেন এই সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেবেন বলে কথা ছিল। পুলিশী বাধায় সমাবেশ পন্ড হয়ে যাওয়ায় সরকারের তীব্র নিন্দা করে কামাল হোসেন বলেন, 'আমি জেনে বিক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হয়েছি। সরকার আবারও সংবিধান লংঘন করেছে'।

১৪ মে ২০০০ দুর্নীতি দমন ব্যুরো কাদের সিদ্দিকীর কাছে তাঁর সকল সম্পত্তির হিসাব চেয়ে নোটিশ পাঠান। টাঙ্গাইল পুলিশের মাধ্যমে নোটিশটি জারি করা হয়। সকাল সাড়ে ১১টায় কাদের সিদ্দিকীর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান সোনার বাংলায় নোটিশটি গ্রহণ করেন বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের কেন্দ্রীয় নেতা এ এম এনায়েত করিম। এর আগে পুলিশ নোটিশটি কাদের সিদ্দিকীর হাতে দিতে চাইলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। দুর্নীতি দমন ব্যুরো কর্তৃক প্রেরিত নোটিশটির স্মারক নম্বর ছিল ৪৪১-৯৯ (গ) টাঃ ফোঃ ৩/৬৩০। এর আগে ৩০ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে কাদের সিদ্দিকীর সম্পত্তির হিসাব নেয়ার জন্যে অনুমোদন দেন। অনুমোদনপত্রের সংখ্যা নং ২৩.৪০.০৪.০১.৪৮৬.৯৯-৭৫৯। এরপর প্রায় সাড়ে তিন মাস কাদের সিদ্দিকীর সমুদয় সম্পত্তির হিসাব-নিকেশ খোঁজ-খবর নিয়ে ১৬ জানুয়ারি নোটিশটি কাদের সিদ্দিকীকে দিতে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর উপ-পরিচালক খন্দকার শওকত হোসেন স্বাক্ষর করেন। নোটিশে উল্লেখ রয়েছে-'প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনুসন্ধান করিয়া সরকারের স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, আপনি জনাব আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম

www.pathagar.com

আপনার জ্ঞাত আয়ের বর্হিভূত স্বনামে/বেনামে বিপুল পরিমাণ সম্পদ-সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন। সেহেতু ১৯৫৭ সালের দুর্নীতি দমন আইনের (এ্যাক্ট নং ২৬) ৪ (১) ধারায় ক্ষমতাবলে আপনি জনাব কাদের সিদ্দিকী (সাবেক সংসদ সদস্য) আপনার নিজের, আপনার স্ত্রী, আপনার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের স্বনামে-বেনামে অর্জিত যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ- সম্পত্তি, দায়-দেনা আয়ের উৎস ও উহা অর্জনের বিস্তারিত বিবরণী অত্র আদেশপ্রাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে দুর্নীতি দমন ব্যুরো বরাবর দাখিল করতে হবে। এতদসঙ্গে প্রেরিত সরকারের নির্ধারিত ছকে বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মহাপরিচালকের বরাবরে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া যাইতেছে। যদি এই সময়ের মধ্যে হিসাব না পাঠানো হয় তাহলে উপরোক্ত আইনের ৪(২) ধারা মোতাবেক আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে'।

১৮ জুন ২০০০ দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবে ভিআইপি লাউঞ্জে দেশের আইন-শৃংখলা ও সার্বিক অবস্থার ভয়াবহ অবনতি এবং বিরাজমান রাজনৈতিক সংকটি নিয়ে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সভাপতি কাদের সিদ্দিকী বীরোত্তম বলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত সকল অপরাধীকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় না করিয়ে গুটি কয়েক অপছন্দের লোককে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। এ হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতদের যারা সরকারের সাথে আছেন তারা নিস্কৃতি পেয়েছেন'। তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধু যখন নিহত হন তখন সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন শফিউল্লাহ। ১৫ আগষ্টের হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত থাকুক বা না থাকুক সেনাবাহিনী যে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে সে জন্য সামরিক আইনে জেনারেল শফিউল্লার বিচার হওয়া উচিত ছিল'। জনাকীর্ণ এ সংবাদ সম্মেলনে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ফজলুর রহমান সহ কেন্দ্রীয় ও ঢাকা মহানগরী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হোক সেটা সরকার আন্তরিকভাবে চায় না। একদিকে সাধারণ আদালতে বিচার করছেন অন্যদিকে পৃথিবীর বিস্ময় ঘটিয়ে বিচারকদের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিল করবেন-এটা তো হতে পারে না। মূলত আগামী নির্বাচনে কান্নাকাটি করে জনগণের সহানুভূতি পাওয়ার জন্য সরকারের মন্ত্রীরা লাঠি মিছিল বের করেছে। এটা একটা সাজানো নাটক ছাড়া আর কিছু নয়।' কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'চার বছর দেশ পরিচালনা করে সরকার জনবিছিন্ন হয়ে পড়েছে। পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া থেকে সিলেটের হাওড়-বাঁওড় এলাকা ঘুরে যা দেখেছি আগামীতে সুষ্ঠু নির্বাচন হলে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ৩৬ আসনের বেশি পাবে না'। তিনি বলেন, 'এ সরকার ওয়াদাভঙ্গকারী সরকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১৯৯৬ এর নির্বাচনের আগে জনগণের কাছে তারা যে সব ওয়াদা করেছিল তার একটিও পূরণ করেনি। পাটের দাম ৫০০ টাকা করে দেবে, সারের দাম কমাবে, বিশেষ ক্ষমতা আইন ও অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল করবে, টিভি-রেডিওর স্বায়ত্তশাসন দেবে বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা তারা রক্ষা করেনি। তারা বলেছিল বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে আলাদা করবে-সেদিকে এক পাও আগায়নি। তিনি বলেন, 'দেশে আইনের শাসন আজ নির্বাসিত। গুলশানে বহুল আলোচিত ব্যবসায়ী শিপু হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতদের কেশাগ্র পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারছে না সরকার। সরকারি দলের লোকেরা বাড়ি দখল করছে, জায়গা দখল করে অবৈধভাবে মার্কেট তৈরি করছে। জনরোষের মুখে মার্কেট ভাঙা হলেও এর জন্য কোনো জবাবদিহি করতে হয় না। এ ধরনের ব্যর্থ, অযোগ্য সরকার কখনো দেশ পরিচালনা করতে পারে না। এদের যতো তাড়াতাড়ি পতন ঘটানো যাবে ততোই জাতির মঙ্গল'। কাদের সিদ্দিকী তাঁর ওপর পুলিশী নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে বলেন,

www.pathagar.com

'২৪ মে গভীর রাতে আমার ছোট ভাই মুরাদ সিদ্দিকীকে পুলিশ অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে। যে মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয় মহামান্য হাইকোর্ট ওই মামলায় তাঁকে ২১ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হওয়ার সুযোগ দিয়েছিল। হাইকোর্টের এ আদেশ অবমাননার প্রতিবাদে ২৫ মে আমরা সমাবেশের ডাক দেই। পুলিশ আমাদের সমাবেশস্থলে ১৪৪ ধারা জারি করে। আমরা ১০ কিলোমিটার দূরে এলেঙ্গা নামক স্থানে সমাবেশ করতে যাই। পুলিশ সেখানে আমাদের ওপর বর্বরোচিত হামলা চালায়। পুলিশের হামলায় আমি গুরুতর আহত হই। রাত সাড়ে ১০টায় আমাকে টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালে নেয়া হয়। পুলিশ বাহিনী হাসপাতালে সন্ত্রাসের যে রাজত্ব কায়েম করেছে সাধারণ মানুষ হলে মরে যেতো'। তিনি বলেন, 'মুরাদ সিদ্দিকীকে গ্রেফতারের সময় আমরা গ্রেফতারী পরোয়ানা দেখতে চাই। ওই সময় পুলিশ কর্মকর্তা স্পষ্ট ভাষায় জানান, এখন কাউকে গ্রেফতার করার জন্য গ্রেফতারী পরোয়ানার প্রয়োজন পড়েনা। এতে বুঝা যায়, আইন তার নিজস্ব গতিতে চলছে না। কারো কারো মর্জিতে চলে'। তিনি বলেন, 'কিছু দিন আগে আমিনুর রহমান তাজ নামে একজন সিনিয়র সাংবাদিককেও গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়াই পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। পরে সাংবাদিকদের প্রতিবাদের কারণে তিনি মুক্তি পান। একজন সাংবাদিককে যখন গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়া গ্রেফতার করা হয় তখন সাধারণ মানুষের অবস্থা কি তা সহজে অনুমেয়'। তিনি বলেন, 'এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না, গণতন্ত্র মানেন না, গণতন্ত্রের প্রতি তার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধও নেই'। তিনি বলেন, 'সরকারের অন্যায় আচরণের প্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালের ১ জানুয়ারি জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আমি বীর উত্তম খেতাব বর্জন করেছিলাম। ১৯৯৯ সালের ২৯ আগষ্ট আওয়ামী লীগ ও জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করার পর আমি আবার বীর উত্তম খেতাব ব্যবহার করছি।'

www.pathagar.com

ভারতীয় আগ্রাসনে নীরবতা

ভারতীয় পণ্যের আগ্রাসন বা চোরাচালান নিয়ে আওয়ামী আমলে কম লেখালেখি হয়নি এবং আওয়ামী সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর চোরাচালানী কারবার এত বেড়ে যায় যে, দোকানপাটে সাজানো পণ্যের দিকে তাকিয়ে বোঝাই কঠিন ছিল এটা বাংলাদেশ না ভারত? আওয়ামী শাসনের ৫ বছরে ঝড়ের গতিতে চলেছে চোরাচালান। সীমান্তে অবৈধ পারাপার কার্যত বাধাহীন ছিল। নির্বিঘ্নে বুক ফুলিয়ে চোরাচালানীরা ভারতীয় পণ্য এনেছে। তাদের মেজাজ বেশ ফুরফুরে ছিল। কোনো ঝঞ্ঝাট ছিলনা। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হয়নি। সীমান্তের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার এক শ্রেণীর সদস্য চোরাচালানে মদদ দিয়েছে প্রত্যক্ষভাবে। টাস্কফোর্সের তৎপরতা চোরাচালানীদের তোপের মুখে থেমে যায়। সীমান্তে চোরাচালান সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে গেলে লোকজন বলেছে 'কি হবে এসব খোঁজ নিয়ে। চোরাচালানীরা এখন ধরাছোঁয়ার বাইরে। পত্রিকায় লিখেইবা কি লাভ হবে? বেশি ঘাটাঘাটি করলে জীবনটা হারাবেন। ওদের সাথে বাড়াবাড়ি করে লাভ নেই। ওদের শিকল অত্যন্ত গভীরে।'

বাস্তবেও ছিল তাই। নির্দিষ্ট কোন পয়েন্ট দিয়ে চোরাচালান হয়নি। গোটা সীমান্তের সবখান দিয়েই ভারতীয় পণ্য আনা হয়েছে। সীমান্তের অসৎ দুর্নীতিবাজ সদস্যও পেয়েছে মোটা অংকের উৎকোচ। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সৎ, নিষ্ঠাবান, দেশপ্রেমিক সদস্যরা সংঘবদ্ধ চোরাচালানী ও দুর্নীতিবাজ সদস্যদের ধাক্কায় কোণঠাসা হয়ে পড়ে। চোরাচালান হচ্ছে জাতীয় অর্থনীতির সবচেয়ে বড় শত্রু। চোরাপথে আসা পণ্যকে যেহেতু শুল্ক দিতে হয় না তাই এদিকে বিপুল অংকের রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয় রাষ্ট্র, অন্যদিকে বৈধপণ্য তথা দেশীয় শিল্প-কৃষিকে দিতে হয় চরম খেসারত। আওয়ামী সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমদ জাতীয় সংসদে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলেন, 'বিগত সরকারের আমলে দেশে ছোট-বড়-মাঝারি প্রায় ৮২ হাজার কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।' অথচ আওয়ামী সরকারের তাদের প্রথম তিন বছরে নতুন নতুন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়াতো দূরের কথা, যেগুলো ছিল সেগুলোরও উল্লেখযোগ্য একটি অংশ বন্ধ হয়ে যায়। শুধু গার্মেন্টস শিল্পই বন্ধ হয় প্রায় এক হাজার। এছাড়া পাটকল, চিনিকল, বস্ত্রকল ও চট্টগ্রাম স্টিল মিলসহ বন্ধ হয়ে যায় ছোট-বড়-মাঝারি বহু শিল্প-কারখানা। এইসব কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ যে চোরাচালান তা খোলাসা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। পাগলেও নিজের ভাল বোঝে অথচ মুক্তবাজার অর্থনীতি ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার নামে উন্মুক্ত করে দেয়া হয় সীমান্ত। বৈধ পথে যে পরিমাণ পণ্য এসেছে, তার প্রায় সাড়ে পাঁচগুণ এসেছে অবৈধ পথে। আগে চোরাচালানীরা মাল আনত চোরাগোপ্তাভাবে আর আওয়ামী শাসনামলে এনেছে প্রকাশ্যেই। চোরাচালান পণ্যের শতকরা মাত্র দু'ভাগ আটক করা হয়েছে এবং বাকী আটানব্বই ভাগই বাজার দখলের সুযোগ পেয়েছে। সরকারের কর্তাব্যক্তিরা মুখে যা বলেছেন তার সাথে বাস্তবতার কোন মিল ছিলনা। তারা বক্তৃতার সময় বেসরকারিকরণের পক্ষে ঢাক পিটিয়েছেন। অথচ চোরাচালানের কারণে বেসরকারি কোনো উদ্যোগই কোমর সোজা করে

www.pathagar.com

দাঁড়ানোর সুযোগ পায়নি। বিষয়টি নিয়ে কম লেখালেখি হয়নি। দেশে পুলিশ, বিডিআর, কাস্টমস ও চোরাচালান বিরোধী টাস্কফোর্স ছিল। কিন্তু তারা চোরাচালান দমনের নামে কি করেছে তা দেশবাসী দেখেছে। তাদের চোখের সামনেই চলেছে অবৈধ কারবার এবং আওয়ামী সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর এই কারবার গেছে সীমা ছাড়িয়ে।

স্থলপথে চোরাচালানী রুট জীবননগর থানা

আওয়ামী শাসনামলে স্থলপথে চোরাচালানী রুট হিসেবে চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর থানা উল্লেখযোগ্য ছিল। এই থানার শতকরা ৯০ জন মানুষ সরাসরি চোরাচালানী কাজের সাথে জড়িত ছিল। জীবননগর থানা একটি বাণিজ্য শহর। এই শহর থেকে ভারতীয় সীমান্ত মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে। এই থানা শহরের প্রাণকেন্দ্রে চোরাচালানী প্রতিরোধ করার জন্য কর্তৃপক্ষ নামমাত্র একটি বিশেষ বিডিআর ফাঁড়ি বসায়। এ ছাড়া একটি থানা, পুলিশ ফাঁড়ি, আনসার ভিডিপি ক্যাম্পসহ থানা সীমান্তে ৫ মাইলের ভিতর রয়েছে বিডিআর সীমান্ত চৌকি রাজাপুর, ধোপাখালি, গয়েশপুর, নতুন পাড়া ও মেদিনীপুর। থানা সীমান্তের চারপাশ ঘিরে রেখেছে ভারতীয় কাঁটা তারের বেড়া। অথচ প্রকাশ্যে দিনের বেলায় হাজার হাজার চোরাচালানী তাদের মালামাল আনা-নেয়া করেছে এ পথে। এই সকল মালামাল সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে এবং নিজ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আদান-প্রদান চলেছে। চোরাচালানীরা প্রতিদিন বাস ও ট্রেনযোগে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে জীবননগর মেইন বাসস্ট্যান্ডে, কেউবা জীবননগর থানার সীমান্ত রেলস্টেশন উথলী এসে নেমেছে এবং সরাসরি রিকসা ভ্যান, মিশুক ও পায়ে হেঁটে সীমান্তে চলে গেছে। চোরাচালানীদের কাছ থেকে উৎকোচ নেয়ার জন্য চলতি পথে কিছু আদায়কারী বসানো ছিল। এই স্থানকে চোরাচালানীদের ভাষায় 'ঘাট' বলে। বেশি আয় হয়েছে জীবন নগর থানা পুলিশ ফাঁড়ির ২শ' গজ পশ্চিমে ডাংগা পাড়ার ঘাটে। এ ছাড়া ছিল পিচমোড়, সন্তোষপুর, উথলী, ধোপাখালীর ১ নং ঘাট, ২ নং ঘাট, ৩ নং ঘাট ও ৪ নং ঘাট, গয়েশপুরের চালতে গাড়ির ঘাট, বড়পুকুর ঘাট, সানবান্দার ঘাট, নতুন পাড়ার ১ নং ঘাট, ২ নং ঘাট ও ৩ নং ঘাট, মেদিনীপুরের ১ নং ঘাট, ২ নং ঘাট ও ৩ নং ঘাট। এই ঘাট প্রকাশ্যে বেসরকারিভাবে লাখ লাখ টাকায় মাসিক চুক্তিতে ডাক হয়েছিল।

জীবননগর সীমান্তের প্রতিটি ঘাট থেকে যে পরিমাণ অবৈধ পাসপোর্টধারী আসা-যাওয়া করেছিল ও চোরাচালানী হয় সেই অনুপাতে জীবননগর থানা প্রতিমাসে উৎকোচ (চাঁদা) পেয়েছিল ৫ লাখ টাকা, বিশেষ বিডিআর ফাঁড়ি ৫ লাখ, ডিএসবি ২ লাখ ৫০ হাজার, সিআইডি ২ লাখ, এন্টিকরাপশন (চুয়াডাঙ্গা) ১ লাখ, ভিডিপি ৫০ থেকে ৬০ হাজার এবং বিডিআর ফিল্ড সিকিউরিটি (এফএস) পায় প্রায় ৯০ হাজার টাকা। এই ৭টি সংস্থা প্রতিমাসে চোরাচালানীদের কাছ থেকে নগদ উৎকোচ পেয়েছে ২০ লাখ টাকার উর্ধ্বে। এছাড়া সীমান্তে ৫টি সীমান্ত চৌকী আছে। সেখানেও মোটা অংকের উৎকোচ দিয়েই চোরাচালানীদের এই ৭ টি সংস্থা ঘাট পার হয়েছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে তারা চোরাচালানীদের সবুজ সংকেত দেখানোর পর জীবননগর থানা সদরের ৭ সংস্থার উৎকোচ আদায়কারী সদস্যরা সর্বদা ব্যস্ত ছিল। সতর্কতার মাধ্যমে ঘাটে বসে উৎকোচ আদায় করেছে। সাদা পোশাকধারী বা সন্দেহজনক কোন ব্যক্তিদের ঘাটের পথে বা সীমান্তের পাশে ঘোরাফেরা করতে দেখলে উন্নত মানের ভারতীয় চকলেট ফটকা ফাটিয়ে সমস্ত চোরাচালানীদেরকে সতর্ক করে দিয়েছে দায়িত্বে নিয়োজিতরা। প্রতি বছরে শীত মৌসুমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ ভারতীয় চোরাচালানীদের

www.pathagar.com

জীবননগর শহরে ভিড় জমেছে। তখন প্রত্যন্ত অঞ্চলের বড় বড় চোরাচালানী মহাজনরা সরাসরি প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস, এমনকি ট্রাক নিয়ে সীমান্তে চলে এসেছিল। পরিবহন-এর ব্যবস্থা খুবই উন্নত থাকায় চোরাচালানীরা স্থল পথে জীবননগর শহরকে তাদের নিরাপদ স্থান মনে করেছে। এ রাস্তা দিয়ে চোরাচালানীরা ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে কোলকাতা অথবা ঢাকায় যেতে পারে। ভারতীয় মহাজনদের সাথে নগদ টাকাসহ চোরাচালানী মালামাল আদান-প্রদান করা হয়েছে।

চট্টগ্রামে চোরাচালানীতে অসংখ্য সিন্ডিকেট ছিল

১৯৯৯ সালের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে সরকারপন্থী পত্রিকার এক খবরে বলা হয় যে, 'বন্দর নগরী চট্টগ্রামে চোরাচালানীতে অসংখ্য সিন্ডিকেট রয়েছে যা ওপেন সিক্রেট। তবে কমপক্ষে ৩৩ টি চোরাচালান সিন্ডিকেট যে সক্রিয় সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হাওয়া যায়। নৌ বাহিনী ছাড়া চোরাচালান প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট কোনো বাহিনীই তেমন উদ্যোগী নয়। কেন উদ্যোগী নয়, তাও ওপেন সিক্রেট। গত ১৯ জুলাইয়ের পূর্ববর্তী এক সপ্তাহে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা ও কাট্টলী থেকে ২০ কোটি টাকার চোরাচালানের দ্রব্যাদি খালাস হয়েছে। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এ পরিমাণ চোরাচালান হচ্ছে এ রুটে। অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, হুইস্কি, বিয়ারসহ অন্যান্য লিকার, সিগারেটসহ চটকদার দ্রব্যাদি চোরাচালানের অন্যতম সামগ্রী। পুলিশ তালিকাভুক্ত অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের মহাআয়োজনে গ্রেফতার করার কর্মসূচি হাতে নিলেও খুব চেনা চোরাচালানীদের গ্রেফতার করার জন্য এক পাও এগোয় না। অবশ্য চট্টগ্রাম মেট্রো পুলিশ ইতিমধ্যে অপারেশন উইং নামে একটি অভিযান চালিয়েছিল। কিছু অবৈধ চোরাচালানী দ্রব্য আটকও হয়েছে। কিন্তু ৩৩ টি সিন্ডিকেটের মধ্যে মাত্র একজনকে গ্রেফতার করেই পুলিশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অনেকের মতে, অপারেশনটি ছিল নিছক আইওয়াশ। পুলিশ, কাস্টমস ও চোরাচালান বিরোধী টাস্কফোর্স চোরাচালানীদের খুব একটা গ্রেফতার করতে না পারলেও কিছু কিছু চোরাচালানী দ্রব্য আটক করতে সক্ষম হয়। কিন্তু অভিযোগ আছে, আটককৃত দ্রব্যের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ যথাস্থানে জমা না পড়ে উধাও হয়ে যায়।' খবরে আরো উল্লেখ করা হয় যে, 'প্রতিরোধ ব্যবস্থা আলগা বলেই চোরাচালান বাড়ছে।'

রাজশাহীতে প্রকাশ্যে চলছে চোরাচালান

রাজশাহীতে প্রকাশ্যে দিনে-রাতে চোরাচালান চলছে। প্রতিদিন নৌকাভর্তি ভারতীয় পণ্য সীমান্ত পাড়ি দিয়ে রাজশাহীর বিভিন্ন ঘাটে ভিড়েছে। আওয়ামী শাসনের ৫ বছর চোরাচালান ছিল রাজশাহী সীমান্তে ওপেন সিক্রেট। আভ্যন্তরীণ ঘাটতি মিটাতে সরকারি নির্দেশে সীমান্ত পথে ভারত থেকে পিঁয়াজ, চাল, ডাল, চিনিসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী আনা হয়েছে। সেই সঙ্গে এর আড়ালে এসেছে নানা ধরনের মাদক দ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্র। বিডিআর কর্মকর্তারা ভারত থেকে আনা পণ্যসামগ্রী আটক করতে নিষেধ করে দেয় অধীনস্থ জোয়ানদের। ফলে ১৯৯৯ সালের জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে গোদাবাড়ি থানার বিদিরপুর ঘাট দিয়ে হাজার হাজার মণ চাল, চিনি, ডাল, কাপড়সহ অন্যান্য সামগ্রী এসেছে। এ সময় জাতীয় পত্রিকার কয়েকজন সাংবাদিক সরেজমিন ঘুরে দেখতে পান প্রকাশ্যে পিঁয়াজ, ডাল, চাল ও অন্যান্য সামগ্রী ভর্তি নৌকা বিদিরপুর ঘাটে এসে ভিড়েছে এবং সাথে সাথেই তা ট্রাকে তুলে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। বিডিআরের বিওপি চেক পোষ্ট এখান থেকে মাত্র ১০০ গজের মধ্যে। আওয়ামী সরকারের একজন মন্ত্রীর নির্দেশে বিদিরপুরসহ জেলার অন্যান্য সীমান্ত দিয়ে অবাধে চোরাচালানের মাল

www.pathagar.com

এসেছে। নিরাপদ এ ঘাটে গড়ে উঠে বড় বড় চোরাকারবারীদের আস্তানা। আওয়ামী লীগের একজন প্রভাবশালী নেতা বিদিরপুর ঘাট ফ্রি স্টাইল করে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ঢাকার বড় নেতা ম্যানেজ করার নামে প্রতিদিন এ ঘাট থেকে ২০ হাজার টাকা চাঁদা তিনি নেন। বিদিরপুর ঘাটে চোরাচালানীর অবস্থা সম্পর্কে বিডিআর কর্মকর্তারা রহস্যজনক ভূমিকা পালন করেছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বিদিরপুর ঘাটটি রাজশাহী জেলার সর্ববৃহৎ চোরাচালানঘাট। প্রতিদিন এ ঘাট দিয়ে কয়েক হাজার লোক শ' শ' নৌকা বোঝাই পণ্য এপার-ওপার করেছে। এর বিনিময়ে ২৪ ঘন্টায় অন্তত কয়েক লাখ টাকা বখরা আদায় হয়েছে। এই বখরার ভাগ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যের মধ্যে বাঁটোয়ারা হয়েছে। বিডিআর-এর রাজশাহী ব্যাটেলিয়ানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার উপস্থিতিতেই নৌকা বোঝাই চোরাচালানী পণ্য খালাস করে ট্রাকে তুলতে দেখা গেছে। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ১৩ জানুয়ারি ১৯৯৯)

১৯৯৮ সালে এসেছে ৮০ হাজার কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য

১৯৯৮ সালে অবৈধ পথে বাংলাদেশে এসেছে প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য, যা বাংলাদেশ সরকারের ১৯৯৮-১৯৯৯ সালের বাজেটের চেয়ে প্রায় আড়াই গুণ বেশি। চোরাচালানে আসা এই বিপুল পণ্য সামগ্রীর বেশির ভাগই ফেনসিডিল ও অন্যান্য নেশা দ্রব্য, নিম্ন মানের কৃষি পণ্য, সার, কীটনাশক এবং ওষুধপত্র। এ ছাড়া অবাধ বাণিজ্যের সুবাদে যে বিপুল ভোগ্যপণ্য আমদানি করা হয় তাও অতিমাত্রায় ভেজাল ও নিম্নমানের। ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা এ প্রসঙ্গে অভিমতে বলেছিল, চোরাচালান প্রতিরোধে সরকারের ব্যর্থতার কারণেই ভারতীয় পণ্যের আমদানি ও চোরাচালান অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। প্রলংকরী বন্যার সময় থেকে বাংলাদেশের সকল প্রকার পণ্যের বাজার দখল করে নেয় ভারত। বিশ্ব ব্যাংকের জরিপ মতে, 'বাংলাদেশ এখন ভারতীয় পণ্যের বড় ধরনের আগ্রাসনের শিকার।' আওয়ামী শাসনামলে ভারত থেকে বাংলাদেশে যে পরিমাণ পণ্য এসেছে তার মাত্র শতকরা ১৭ ভাগ বৈধ এবং বাকী ৮৩ ভাগই আসছে চোরাপথে এসেছে। বৈধ পথে আসা ১৭ ভাগ পণ্যের হিসাবই বাণিজ্য ঘাটতি ৮০ হাজার কোটি টাকারও বেশি হবে। ঢাকা শিল্প ও বণিক সমিতির বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উল্লেখ করে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৮ সমিতির ৩৭ তম সাধারণ সভায় উত্থাপিত প্রতিবেদনে বলা হয়, 'দেশে ব্যবসা ও বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ না থাকায় পণ্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বাংলাদেশ ক্রমাগত মার খাচ্ছে। এ অবস্থায় ভারতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়।' (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ৩ জানুয়ারি ১৯৯৯)

উত্তরাঞ্চলে চোরাচালানের স্বর্গরাজ্য হিলি

১৯৯৭ সালের শেষের দিকে উত্তরাঞ্চলে চোরাচালানের স্বর্গরাজ্য বলে পরিচিত হিলি সীমান্তে কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সংঘবদ্ধ ও সক্রিয় চোরাকারবারিরা নিরাপদ ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে সীমান্ত ঘেষা ফুলবাড়ি ও বিরামপুর থানা সদরে ঘাঁটি গাড়ে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ছত্রছায়ায় বিশাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দাপটের সাথে তৎপরতা চালিয়ে যায় চোরাচালানী চক্র। হিলিতে স্মাগলিং বন্ধ হবার পর চোরাচালানিরা রুট পরিবর্তন করে। ৫ রাইফেলস ব্যাটেলিয়ানের আওতাধীন ফুলবাড়ি ও বিরামপুর থানার ৪ টি সীমান্ত ফাঁড়ির বিভিন্ন চোরাপথ দিয়ে অবাধে ভারতীয় মালামাল আসে প্রতিদিন। যে সমস্ত রুট দিয়ে ভারতীয় পণ্য এসেছে সেগুলো হল ফুলবাড়ি থানার জলপাইতলি সীমান্ত ফাঁড়ির

www.pathagar.com

আওতাধীন চৌধুরীপাড়া ও বেজাই। বিরামপুর থানার রাণীনগর সীমান্ত ফাঁড়ির আওতাধীন মৌগ্রাম ও বাগড়া। একই থানার আমড়া সীমান্ত ফাঁড়ির রসুলপুর, শেখপাড়া, রুদ্রানী সীমান্ত ফাঁড়ির ভেড়ম, চৌধুরী পাড়া, জগন্নাথপুর। এসব রুট দিয়ে সবচেয়ে বেশি এসেছে ভারতীয় চিনি। এরপরই রয়েছে ভারতীয় গরু। চিনি আনা হয় সাইকেলে চাপিয়ে ফুলবাড়ি ও বিরামপুর থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর দেড় থেকে দুই হাজার সাইকেলের বহর ছুটে যায় সীমান্তের কাছাকাছি নির্দিষ্ট পয়েন্টে। সীমান্ত থেকে চিনি নিয়ে সাইকেলের বহর গন্ত ব্যস্থল ফুলবাড়ি ও বিরামপুর থানার বিভিন্ন আড়তে ফিরে আসে ভোরের দিকে। প্রতিটি সাইকেলে চাপানো হয় এক থেকে দুই বস্তা পর্যন্ত। সে হিসেবে এসব রুট দিয়ে প্রতিদিন দু' থেকে আড়াই হাজার বস্তা চিনি এসেছে। চোরাপথে ভারতীয় চিনি আনার সময় যাতে কোন ঝক্কিঝামেলা না হয় তারও ব্যবস্থা ছিল সাইকেলের বহর সীমান্ত এলাকায় রওয়ানা দেবার আগে। চিনি নিয়ে ক্লিয়ারেন্স নেয়ার জন্য অগ্রগামী দল আগেভাগেই রওয়ানা দেয়। অগ্রগামী দলের সবুজ সংকেত পাওয়া মাত্রই রওয়ানা দেয় সাইকেলের বহর। একইভাবে 'লাইন খারাপ' হলে তারও সংকেত ছিল। লাল সংকেত হলে যাতায়াত বন্ধ থাকে। এ ব্যবস্থার ফলে সচরাচর কোন বিপদের ঝুঁকি থাকে না। আর এ কারণেই নিরাপদে ভারতীয় পণ্য আনা-নেয়া করেছে চোরাচালানী চক্র। ভারতীয় চিনি কেনা-বেচার জন্য ফুলবাড়ি ও বিরামপুর থানা সদর বাজারে বড় ধরনের আড়ত খোলা হয়। ফুলবাড়িতে ১৫ থেকে ২০ এবং বিরাপুরে ৩০ থেকে ৩৫ টি আড়ত ছিল। কোন রাখডাক ছিল না। রাস্তার পাশে পাকা, আবার কোনকোন ক্ষেত্রে বাঁশ, চাঁটাই ও টিনের চালা দিয়ে অস্থায়ী আড়ত তৈরি করা হয়। আড়তদারদের ভাবসাব দেখে মনে হয়েছে বাংলাদেশের খাদ্যশস্য বেচা-কেনার জন্য এসব আড়ত খোলা হয়েছে। চোরাচালানীরা ভারতীয় চিনি এসব আড়তে বিক্রি করেছে। আড়তদাররা এভাবে শ'শ' বস্তা চিনি গুদামজাত করে। পরে সুযোগ বুঝে বাইরের পার্টির কাছে চিনি বিক্রি করেছে। ফুলবাড়ি ও বিরামপুর থেকে সরাসরি ট্রাকে করে রংপুর, বগুড়া, জয়পুরহাট, নাটোর, দিনাজপুর, নওগাঁ, সৈয়দপুর ও নীলফামারী পাঠানো হয়েছে ভারতীয় চিনি। দিনে নয় চিনি ভর্তি ট্রাকগুলো গভীর রাতে বেপরোয়া গতিতে গন্তব্যস্থলের দিকে ছুটে গিয়েছে। ট্রাকের মালিকরাও এসব চিনি পরিবহন করতে আগ্রহী দু'টি কারণে ছিল। প্রথমতঃ স্বাভাবিকের চেয়ে ভাড়া মিলেছে বেশি, দ্বিতীয়ত আড়তদারদের সাথে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার গোপন আঁতাতের কারণে ঝুঁকি ছিলনা। বিরামপুর ও ফুলবাড়ি থেকে ট্রাকে করে যেসব সড়কপথে চিনি পাঠানো হয় সেগুলো হলো গোবিন্দগঞ্জ, জয়পুরহাট, দিনাজপুর ও পার্বতীপুর সড়ক, সৈয়দপুর ও নীলফামারী। নীলফামারীর ট্রাকগুলো গিয়েছে পার্বতীপুরের একজন চোরাকারবারীর মাধ্যমে। কিছু চিনি গিয়েছে বেজাইমোড় হাবড়াখয়ের পুকুর হয়ে বদরগঞ্জে। ৪টি সীমান্ত ফাঁড়ির বিভিন্ন এলাকা দিয়ে চোরাপথে আসা ভারতীয় চিনির বখরা আদায়ের জন্য বিভিন্ন সংস্থার নিয়োজিত লোকজন ছিল খুবই তৎপর। এদের বলা হয় লাইনম্যান। এসব লাইনম্যানের সাথে বিভিন্ন সংস্থার মাসিক চুক্তি ছিল। চোরাচালানীদের কাছ থেকে বখরা আদায়ের পর লাইনম্যানরা চুক্তির নির্দিষ্ট টাকা বিভিন্ন সংস্থাকে প্রদান করেছে। অবশিষ্ঠাংশ টাকা পেয়েছে লাইনম্যানেরা। এছাড়া প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথেও ছিল গোপন সমঝোতা। যার জন্য চোরাচালানীদের হাত হয়ে আড়তে এবং ট্রাকযোগে গন্তব্যস্থলে পৌছানো পর্যন্ত সবকিছুই হয়েছে নিরাপদে। আশ্বিন-কার্তিকের মংগার দু'মাস ক্ষেতে-খামারে কাজকর্ম না থাকায় ক্ষেতমজুর, দিন মজুরসহ 'দিনে আনে দিন খায়' শ্রেণীর মানুষজন বেকার পড়ে থাকে। এই বেকারত্ব ঘোচাতে অনেকে জড়িয়ে

www.pathagar.com

পড়ে চোরাচালানে। এতে নিজস্ব পুঁজির প্রয়োজন ছিলনা। আস্থাভাজন হলে ব্যবসার স্বার্থে আড়তদাররাই অর্থের যোগান দিত। অন্তত অভাবের দু'মাস নিশ্চিন্তে খেয়েপড়ে চলতে পারবে- এ আশায় অনেকেই ঝুঁকে পড়ে এই অপরাধমূলক চোরাচালান 'ব্যবসায়'। এ কারণেই চোরাচালানীদের অস্বাভাবিক তৎপরতা ছড়িয়ে পড়ে ফুলবাড়ি ও বিরামপুর থানার প্রত্যন্ত অঞ্চল জুড়ে। (সূত্রঃ দৈনিক সংবাদ ২ নভেম্বর ১৯৯৭)

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল সীমান্ত দিয়ে হয়েছে চোরাচালান

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল সীমান্তের অসংখ্য পয়েন্ট দিয়ে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য বাংলাদেশে এসেছে। এর প্রমাণ মেলে আটক চোরাচালান পণ্যের হিসাবে। মোট চোরাচালানের মাত্র ২/৩ শতাংশ পুলিশ, বিডিআর ও টাস্কফোর্সের হাতে আটক হয়। বাকী ৯৭/৯৮ শতাংশ চোরাচালান পণ্য বাজারজাত হয়। 'আদৌ কি কখনো চোরাচালান বন্ধ হবে? বন্ধের কি কোন ব্যবস্থা নেই? চোরাচালান দেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে খান খান করে দিচ্ছে, অথচ জোরালো পদক্ষেপ নেই কেন? চোরাচালান করেও তারা কিভাবে বলতে সাহস পাচ্ছে যে, ওপেন ব্যবসা করি। শুধুমাত্র চোরাচালানী ও রাঘব-বোয়ালদের তালিকা তৈরি করেই ক্ষান্ত থাকছে কেন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা? আটক কিংবা ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়টি কেন বরাবরই থাকছে অনুপস্থিত'-এই প্রশ্নগুলো সচেতন ও পর্যবেক্ষক মহলে বড় হয়ে দেখা দেয়। দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা ৫ এপ্রিল ১৯৯৮ সংখ্যার এক রিপোর্টে উল্লেখ করে, 'দু'দেশের সীমান্তরক্ষী ও পুলিশের মদদে চোরাচালান বেড়ে গেছে' ১৯৯৮ সালের মে মাসের কয়েকদিন যশোর, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গার বেশ কয়েকটি সীমান্ত পয়েন্টে অত্যন্ত খোলামেলাভাবেই ট্রাক, ভ্যান, রিকশা, গরু-মহিষের গাড়ী ও মাথায় করে চোরাচালানীরা ভারতীয় পণ্য এনেছে। পায়ের আলতা, নেইল পালিশ থেকে শুরু করে, নিত্যব্যবহার্য পিঁয়াজ, রসুন, চাল, ডাল, চিনি, লবণ, কৃষি উপকরণ, শাড়ি-ব্লাউজ, জুতা, স্যান্ডেল, কলম, কাগজ, খাতা, পেন্সিল, মোটর পার্টর্স, বাইসাইকেল, মোটর সাইকেল, বই, ম্যাগাজিনসহ প্রায় সবকিছুই এসেছে ভারত থেকে। রাঘব-বোয়াল চোরাচালানীরা রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। সীমান্তের আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় অসৎ দুর্নীতিবাজ সদস্যরা ডাকযোগে ও ব্যাংকে ডিডি করে প্রতিমাসে বিপুল পরিমাণ অর্থ নিজ বাড়িতে পাঠিয়েছে। চোরাচালানের এই ফ্রি স্টাইল অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গে করে। আগে চোরাচালান হতো চোরা পয়েন্টে, আওয়ামী শাসনে চোরাচালান হয়েছে দিনের আলোয় সবার সামনে। বেনাপোল সীমান্তের সাদীপুর 'সীমান্ত ঘাট' সম্পর্কে বহু লেখালেখি হয়। উপরন্তু ঐ ঘাট দিয়ে চোরাচালান পণ্য আনা-নেয়া ও অবৈধ পারাপার, নারী-শিশু পাচার বাড়ে কয়েকগুণ। ঐ ঘাট সম্পর্কে পুলিশ-বিডিআর-প্রশাসনের কর্মকর্তারাও অবগত ছিল। কিন্তু তাদের অবস্থা দেখে মনে হয়েছে কারো কিছুই করার নেই। ১৯৯৮ সালের মে মাস পর্যন্ত একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ঐ ঘাট চালিয়েছে। প্রতিদিন ঐ ঘাট দিয়ে কয়েক কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য এসেছে। অবৈধ পারাপার হয়েছে দু'শতাধিক ব্যক্তি। লাগামহীন চোরাচালানের বিরুদ্ধে 'টু' শব্দটি করতে সাহস কেউ পায়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চোরাচালানীরা চুক্তি মোতাবেক অর্থ না দিলেই শুধু তাদের পণ্য আটক করা হয়েছিল। বাকি চুক্তির পণ্য কখনো আটক করা হয়নি। সীমান্তবর্তী যশোর, সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর জেলার অগণিত পয়েন্ট দিয়ে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য বাংলাদেশে এসেছে। শুধুমাত্র যশোর বিডিআর ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত

www.pathagar.com

১১ কোটি ৪৪ লাখ ৬৭ হাজার ৭২৪ টাকার ভারতীয় পণ্য আটক করে। ১৯৯৮ সালের প্রথম ৪ মাসেও কয়েক কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য আটক হয়। যদি দু'শতাংশ পণ্য মোট চোরাচালানের মধ্যে আটক হয় তাহলে বছরে একটি ব্যাটেলিয়নের আওতায় ১৯৯৭ সালের হিসাব অনুযায়ী ৫শ' কোটি টাকার পণ্য চোরাচালানের আনুমানিক হিসাব পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সকল বিডিআর ব্যাটেলিয়ানের আটক পণ্যের হিসাব ধরলে বলা যায়, প্রতি বছর ভারত থেকে এই সীমান্তপথে হাজার হাজার কোটি টাকার পণ্য বাংলাদেশে ঢুকেছে। গোটা সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্টে টালি খাতায় হিসাব কষে সীমান্তের এরপর ও ওপারের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার একশ্রেণীর সদস্য চোরাচালানীদের কাছ থেকে টোল আদায় করেছে। সীমান্তের চিহ্নিত পয়েন্ট সাতক্ষীরার তলুইগাছা, কেড়াগাছি, গ্যাড়াখানি, বাকডাটা, রাজাপুর, ভাদিয়ালী, চান্দা, হিজলদী, বড়ালী, সুলতানপুর, চান্দুটিয়া, যশোরের বড়আঁচড়া, বাগআঁচড়া, সাদীপুর, শিকারপুর, কাশীপুর, কাবিলপুর, পুটখালী, রুদুপুর, অগ্রভুলোট, মাসিলা, ঝিনাইদহের যাদবপুর, পোলেমপুর, শ্যামকুড়, বাগডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গার দর্শনা, কেওখালী, মেদেনীপুর, রাজাপুর, মেহেরপুরের জগন্নাথপুর, মুজিবনগর, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর, চিলমারীসহ অসংখ্য সীমান্ত পয়েন্ট দিয়ে চোরাচালান হয়েছে বেপরোয়াভাবে। সীমান্তের ওপারের চোরাচালানীরা অত্যন্ত তৎপর ছিল। ওপারের সীমান্তরক্ষীরাও চোরাচালানে মদদ দিয়েছে ও সহযোগিতা করেছে প্রত্যক্ষভাবে। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ১৩ মে ১৯৯৮)

আদর্শ লিপি ভারতে ছাপানো হয়েছে

আওয়ামী শাসনের পাঁচ বছর প্রতি মাসে ১২ লাখ আদর্শ লিপি ভারত থেকে ছাপিয়ে আনা হয়। এছাড়া কোরআন শরীফ, কায়দা, আমপারা, গণশিক্ষার বই, শিশুতোষ বর্ণমালাসহ ইউনিসেফ, ইউএনডিপি, বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠী ও এনজিওগুলোর মুদ্রণকাজ বাংলাদেশের প্রেসের বদলে ভারত থেকে ছাপিয়ে আনা হয়। এর ফলে দেশের প্রকাশক ও প্রেস মালিকরা হতাশ হয়ে পড়েন। তারা অভিযোগ করেন, 'অব্যাহতভাবে মুদ্রণের কাজ ভারতের কাছে হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের ৭ শতাধিক ছাপাখানার ৮০ ভাগই বছরের ৯ মাস কোন কাজ না পেয়ে অচল থাকছে। মুদ্রণ শিল্পের সাথে জড়িত ১২শ' বাঁধাই কারখানার অবস্থা তথৈবচ। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১২ লাখ শ্রমিক কাজের অভাবে দিশেহারা হয়ে পড়ে। মুদ্রণ ব্যবসার এ সংকটে শিল্পটি থেকে সরকার শুধু যে কোটি কোটি টাকা রাজস্ব হারায় তা নয়, রফতানিমুখী শিল্পে পরিণত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও শিল্পটি অতল গহবরে তলিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাদি প্রতিদিন লক্ষ্য করা যায়। সঠিক নীতিমালার অভাব এবং উচ্চ করারোপের ফলে মুদ্রণ শিল্পে এ দশা চলেছে। কাগজ আমদানি করে বাংলাদেশে প্রকাশকদের মুদ্রণ ব্যবসা করতে শুল্ক, অগ্রিম কর, উন্নয়ন কর, লাইসেন্স ফি ও ভ্যাট মিলিয়ে ৫১.৩৭ ভাগ কর দিতে হয়। ভারতে এক্ষেত্রে কর প্রদান করতে হয় মাত্র সাড়ে ৫ ভাগ। এছাড়া ভারত সেদেশের প্রকাশকদের মুদ্রণ কাজ রফতানীতে ১৭ ভাগ ভর্তুকি প্রদান করে। ফলে বাংলাদেশের মুদ্রণ ব্যবসায়ীরা করারোপের তুলনায় ভারত থেকে ছাপার কাজ সেরে আনলে ৪৬ ভাগ ট্যাক্স মার্জিন সুবিধা পায়। অন্যদিকে দেশে চাহিদার তুলনায় মাত্র ৩৫ ভাগ কাগজ উৎপাদিত হয়েছে। বাকি ৬৫ ভাগের ৫০ ভাগ কাগজ এসেছে ভারত থেকে। ১০ থেকে ১৫ ভাগ কাগজের চাহিদা পূরণ করা হয় জাপান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়াসহ অন্য কয়েকটি দেশ থেকে। স্বাভাবতই মুদ্রণ ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ থেকে ট্রেসিং ব্রীফকেসে ভর্তি করে ভারতে চলে যান

www.pathagar.com

এবং সেখান থেকে ছাপার কাজ শেষে ট্রাক ভর্তি বইপত্র নিয়ে চলে আসেন বাংলাদেশে। এছাড়া ভারত থেকে মুদ্রণের কাজ করে আনার সময় সুনীলের বইয়ের সাথে সাদা কাগজ চলে এসেছে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে। সরকারের নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচির বই ছাপা হয় ভারত থেকে। বছরে প্রায় দেড় কোটি আদর্শ লিপির চাহিদার ৯০ ভাগের বেশি ছাপা হয়ে আসে ভারত থেকে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ছাপার কাজের পাশাপাশি গার্মেন্টস শিল্পের টুকিটাকি ছাপার কাজও ভারতে চলে গিয়েছিল। বাটা সু কোম্পানির জুতার বাক্স ছাপিয়ে আনা হয় ভারত থেকে। ইউনিসেফে'র বিভিন্ন প্রকাশনার কাজ ভারতে যাবার পর বাংলাদেশের শতাধিক ছাপাখানা তাদের ব্যবসা হারিয়েছে। সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানির ছাপার কাজও হয়েছে ভারতে। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে অসম প্রতিযোগিতা চলতে না পারার কারণে মুদ্রণের কাজ টেন্ডারে সংগ্রহের পর বাধ্য হয়ে ভারত থেকে ছাপার কাজ করিয়ে আনতে হয়। (সূত্রঃ দৈনিক সংগ্রাম ২৫ মে ১৯৯৯ ও দৈনিক ইনকিলাব ২৬ জুন ২০০০)

স্বাধীন দেশে ভারতীয় ডাক টিকিট ব্যবহার

১০ নভেম্বর ১৯৯৭ দৈনিক দিনকালে প্রকাশিত তথ্য হতে জানা যায়, এদেশের একটি চিঠিতে ভারতীয় ডাক টিকিট ব্যবহার করা হয়েছে। একটি স্বাধীন দেশের পতাকা কিভাবে অন্য একটি দেশের ডাক টিকিটে আসতে পারে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে দেশবাসী। আওয়ামী সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোন বক্তব্য দেয়া হয়নি। বক্তব্য দিলে হয়তো তারা বলতেন ডাক টিকিটি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু না, ডাক টিকিট যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের নয় তার বড় প্রমাণ, মুদ্রিত বাংলাদেশের পতাকাটি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের (প্রবাসী সরকার) পতাকায় লাল সূর্যের মধ্যে স্বর্ণালী বাংলাদেশের মানচিত্র অংকিত ছিল। কিন্তু এ পতাকায় মাত্র সূর্য মুদ্রিত হয়েছিল। ডাক টিকিটটিতে দেখানো হয় বাংলাদেশের মানচিত্র, বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা ও পতাকা। ডাক টিকিটটিতে শুধু পতাকা ও মানচিত্র ছাপানো হয়েছে তা নয়, দেশের নাম লেখা হয়েছে (হিন্দি ও ইংরেজিতে) ভারত এবং টিকিটটির শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছে 'জয় বাংলা'। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার কোনো প্রতিবাদ করেনি।

সিলেট নিয়ে ষড়যন্ত্র

বৃটিশ রাজ কর্তৃক ভারত-পাকিস্তান বিভাজনের প্রাক্কালে সিলেট অঞ্চল কোন পক্ষে থাকবে এ নিয়ে বিতর্ক উঠে। হিন্দু, মুসলিম এবং অন্যান্য উপজাতীয়দের তীর্থভূমি সিলেটের ভাগ্য নির্ধারণে এলাকাবাসীর মতামত গ্রহণকেই গুরুত্ব দেয়া হয়। হ্যাঁ-না জাতীয় গণভোটে শতকরা ৫৬ ভাগ ভোট পড়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পক্ষে। ফলে, আসামের বিশাল সম্পদশালী অঙ্গ সিলেট তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশের সাথে সংযোজিত হয়। স্বাধীনতা-সার্বভৌম বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ সিলেট নিয়ে নতুন ধরনের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের একটি ঘৃণ্য পরিকল্পনার খবর ১৯৯৭ সালে সংবাদপত্রে প্রকাশ পায়। সিলেট সংলগ্ন আধিপত্যবাদী ভারতের আসাম রাজ্যে জোরালো করার চেষ্টা চলে। 'সিলেট দখল' শিরোনামের এই আঞ্চলিক আন্দোলন উপলক্ষ্য করে মিছিল, মিটিং, হ্যান্ডবিল বিতরণ, পোস্টারিং ইত্যাদির পাশাপাশি চলে চাঁদা তোলার হিড়িক। ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির দক্ষিণ আসাম শাখা নভেম্বর মাসে রাজ্য সরকার বরাবরে স্মারকলিপিও পেশ করে। এতে বলা হয়, '১৯৪৬ সালের

www.pathagar.com

পূর্ব সিলেট মূলত আসামেরই অঙ্গীভূত ছিল। 'প্রতারণামূলক' ভোটের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই লীলাভূমি তৎকালীন পাকিস্তানের সাথে জুড়িয়ে দেয়া হয়। বৃটিশ রাজ উপমহাদেশের আধিপত্য ত্যাগের প্রাক্কালে আসামের এই সর্বনাশটি ঘটিয়ে দিয়ে গেছে। এখন স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সিলেটকে ফিরে পাওয়ার আন্দোলন সকলকেই উদ্যোগী হতে হবে।' আসামের একাধিক পত্র-পত্রিকায় আলোচ্য আন্দোলন বিষয়ে বিশাল প্রতিবেদন ও যুক্তিবাক্য প্রকাশিত হয়। ভারতের শিলচর থেকে প্রকাশিত দৈনিক যুগশঙ্খ পত্রিকায় ১৪ সেপ্টেম্বর দীর্ঘ প্রতিবেদন ছাপানো হয়। এতে শিরোনাম ছিল, 'সিলেটকে ফিরিয়ে আনার আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে বরাকে।' এতে বলা হয়, 'গণভোটের মাধ্যমে সিলেটকে আসাম তথা ভারতের বাইরে ঠেলে দেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাঙালিদের মনে একটা চাপা ক্ষোভ রয়েই গেছে। গত পঞ্চাশ বছরে এই ব্যাপারটি নিয়ে রাজনৈতিক স্তরে কোন বড়ো ধরনের নাড়াচাড়া লক্ষ্য করা যায়নি ঠিকই কিন্তু ভিতরে ভিতরে নানা মহলে কথাবার্তা জারি হয়েছে।' প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, 'আসামের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যেমন দেশ ভাগ এখন এক ইতিহাস হয়ে গেছে, তেমনি আসাম থেকে সিলেট বিশেষ করে বারোটি থানা বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার ঘটনাটিও ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডী ছাড়া আর কিছু নয়।' এই সমিতির সাথে সে অঞ্চলের অনেক শিক্ষাবিদ ও ইতিহাসবিদ জড়িত। এ ধরনের ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন আসামের অমলেন্দু ভট্টাচার্য, অর্চনা চক্রবর্তী, নন্দিতা রায় প্রমুখ। এই সংগঠনটি ১৯৭৪ সালে বাবা সাহেব আপতে নামে একজন ভারতীয় বুদ্ধিজীবী প্রতিষ্ঠা করেন। আসামে সমিতির কার্যক্রম শুরু করেন শিলচরের সংগঠক পান্নালাল বক্সী। একই ইস্যুতে আন্দোলনের স্বার্থে নিকটবর্তী রাজ্যের নেতা-কর্মীদের একই সংগঠনের পতাকাতলে সমবেত করানোর উদ্যোগও গৃহীত হয়েছে। মিজোরাম, মনিপুর, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, দক্ষিণ আসাম নিয়ে গঠিত নতুন মোর্চার নাম দেয়া হয় 'উদয়াচল দক্ষিণ'। এই আন্দোলনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতের শিলচরে সংগঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংশ্লিষ্ট ইস্যুর পক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে 'রিচার্স এন্ড স্টাডি সেন্টার' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংগঠনের ইতিহাসবিদদের একাংশের মতে, ১৯৪৬ সালে আসাম রাজ্য হতে সিলেটকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে পক্ষে-বিপক্ষে যে ভোট হয় তা ছিল শ্রেণী ও বর্ণ-বৈষম্যে পূর্ণ এবং অসঙ্গতিপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে তাদের বক্তব্য, পাঁচ লাখ সাঁওতাল চা-শ্রমিককে গণভোটে অংশ নিতে দেয়া হয়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, ভাষা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনসমূহে সিলেটবাসী বরাবর অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। এলাকার উন্নয়ন সাধনে ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পরিচালনায় আওয়ামী সরকারের অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে বেশ কয়েকটি হরতাল, মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদি সম্পন্ন হয়। এ পরিস্থিতিতে জনগণও সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। এমনি নাজুক পরিস্থিতিতে আন্দোলনকে জোরালো রূপ দেয়া সম্ভবপর বলে সমিতির উদ্যোক্তারা ধারণা করেন। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতা বা স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র ভূমিকায় অবতীর্ণ উলফা, নাগা, বড়ো বিপ্লবীদের প্রতিহতকরণে ভারত সরকার সর্বোচ্চ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করে রাখে। অন্যদিকে একটি স্বাধীন দেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত 'সিলেট দখল' আন্দোলনের নেতাদের প্রতিহতকরণের ব্যাপারে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। তবে বিষয়টি নিয়ে বৃটিশ কূটনীতিকরা তটস্থ ছিলেন। বৃটিশ সিক্রেট সার্ভিসের তথ্য মতে, 'এই

www.pathagar.com

আন্দোলন (১৯৯৭ সালে) অনেকটা পরিকল্পনা পর্যায়ে সীমিত। এখনই প্রতিহত করা না হলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে অনেক রক্ত ও উচ্চমূল্য দিতে হতে পারে বলে তাদের ধারণা।' (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ১৮ নভেম্বর ১৯৯৭)

ইলেকট্রনিক্স মার্কেট ছিল ভারতীয়দের দখলে

আওয়ামী শাসনামলে মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রভাবে ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স মার্কেট ভারতীয়দের দখলে ছিল। ভারতীয় পণ্যের আগ্রাসনের কারণে দেশীয় ইলেক্ট্রনিক্স ও ইলেকট্রনিক পণ্য বাজারে চরমভাবে মার খায়। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রীর মার্কেট নওয়াবপুর ও ইলেক্ট্রনিক্স মার্কেট বায়তুল মোকাররম ও ষ্টেডিয়ামে অধিকাংশ দোকানে ভারতের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী থরে থরে সাজানো দেখা গেছে। ভারতীয় ইলেকট্রিক সামগ্রীর দাম কম থাকায় ক্রেতারাও তা লুফে নেয়। ঐ একই ঘটনা ঘটেছে ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রীর ক্ষেত্রেও। নওয়াবপুরের অধিকাংশ মার্কেটে ভারতীয় টিউব লাইট প্রকাশ্যে বিক্রি হয়। পাশাপাশি রকমারী বৈদ্যুতিক সুইচ, মার্কারী লাইট, টুনী বাল্ব বিক্রি হয়। অধিকাংশ বৈদ্যুতিক পণ্য সামগ্রী এসেছে চোরাইপথে। নওয়াবপুর ইলেকট্রিক মার্কেটে দেশীয় ১টি টিউব লাইট যেখানে বিক্রি হয়েছে ১০০ টাকা থেকে ১২০ টাকা, সেখানে ১টি ভারতীয় টিউব লাইটের দাম ৭৫ থেকে ৮০ টাকা পড়েছে। ভারতীয় প্রতিটি পণ্যের দাম কম থাকায় মানুষ ভারতীয় পণ্য ক্রয় করতেই বেশি আগ্রহী ছিল। চোরাইপথে ভারতীয় পণ্য অবাধে আসার কারণে ব্যবসায়ীরা পণ্য বিক্রি করতে চরমভাবে হিমশিম খায়। ইলেকট্রিক পণ্যের ন্যায় একই অবস্থা বিরাজ করেছে ইলেক্ট্রনিক্স মার্কেট বায়তুল মোকাররম ও ষ্টেডিয়াম মার্কেটে। ইলেকট্রনিক্সের এ দুটি বৃহৎ মার্কেটে ভারতীয় সামগ্রীর রমরমা ব্যবসা চলেছে। দেশীয় ক্ষুদে ইলেকট্রনিক্স শিল্পগুলো ভারতীয় পণ্যের কাছে চরমভাবে মার খায়। ভারতীয় এহেন কোন সামগ্রী নেই যে, এ দুটি মার্কেটে পাওয়া যায়নি। ভারতীয় যন্ত্রাংশ দিয়ে বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক্স প্রতিষ্ঠানগুলো টিভি ও ক্যাসেট প্রস্তুত করেছে। কিন্তু ভারতীয় যন্ত্রাংশ সরকারের চোখ ফাঁকি দিয়ে চোরাইপথে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ভারতীয় বিখ্যাত ইলেকট্রিক কোম্পানিগুলো বাংলাদেশের বাজার ধরার জন্য যৌথ কারবারেও নেমেছিল। এতে করে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ভারতীয় ইলেকট্রনিক্স প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে কুলিয়ে উঠতে পারেনি। ভারতের পাশাপাশি ইলেকট্রনিক্স মার্কেট সিঙ্গাপুর ও তাইওয়ানের হাতেও ছিল। তবে ভারতীয় পণ্য সামগ্রী ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকায় জনগণ ভারতীয় পণ্যের দিকেই বেশি ঝুঁকেছে। কিন্তু অন্যান্য দেশের ইলেকট্রনিক্স পণ্যের চাইতে ভারতীয় পণ্য তুলনামূলক হালকা। যা বেশিদিন স্থায়িত্ব হয় না।

চোরাই পথে ভারতীয় লবণ এসেছে

আওয়ামী শাসনামলে বাংলাদেশের লবণ শিল্পকে ধ্বংসের আয়োজন অনেক দূর এগিয়ে যায়। আবার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নামানো হয় দেশের লবণ শিল্পে জড়িত মালিক ও শ্রমিকদের। ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ জাতীয় একটি দৈনিকে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, 'স্থল ও সমুদ্রপথে ভারত থেকে আসছে বিপুল পরিমাণ লবণ। সমুদ্র পথে ট্রলার ও কার্গো বোটযোগে প্রতিদিন অবৈধ লবণ আসছে। এই লবণ খুলনা, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে লবণ আসছে এবং আরো বেশি পরিমাণ আসছে স্থল পথে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের দর্শনা, ইথলি, সাতক্ষীরা, আনসারবাড়িয়া, কলারোয়া, মংলা, যশোর, বেনাপোল, চৌগাছার মালিয়া এবং ঝিনাইদহের মাধবপুর সীমান্ত এলাকা দিয়ে

www.pathagar.com

ভারতীয় লবণ পাচার হচ্ছে প্রতিদিন। চোরাচালানের অবৈধ পথে এই লবণ এত বিপুল পরিমাণে আসছে যে, এর ফলে এক কথায় বাংলাদেশের বাজার ভারতীয় লবণে সয়লাব হয়ে গেছে।' ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত তথ্যে জানানো হয়, কক্সবাজারসহ লবণ শিল্পের তথা উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত এলাকাগুলোতে সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। দেশে লবণ উৎপাদনের মৌসুমেও ভারতীয় লবণের দাপটে বন্ধ হয়ে যায় ২৪০ টি লবণ মিল। ফলে বেকার হয়ে পড়ে প্রায় ৫ লক্ষাধিক শ্রমিক। ওদিকে বিরান পড়ে থাকে প্রায় ৪৫ হাজার একর জমি-যেখানে লবণ উৎপাদন করা হতো। শুধু তাই নয়, যে স্বল্প সংখ্যক শিল্প মালিক প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেও উৎপাদনে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তারা এমনকি লোকসান দিয়েও লবণ বিক্রি করতে পারেননি। কয়েকজন মালিকের গোডাউনে ১৯৯৭ সালের ৫০ হাজার মণ লবণ অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে ছিল।

চোরাইপথে আসা ভারতীয় লবণ ও চিনি খেয়ে পাবনাসহ দেশের উত্তরাঞ্চলের মানুষ জন্ডিসসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছে। ভারত থেকে চোরাইপথে যে লবণ ও চিনি এসেছে তা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর ছিল। এ লবণ ভারতের কাঁচা চামড়া পচনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহারের উপযোগী করে উৎপাদন করা হয়েছিল। কাঁচা চামড়া পচনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এ লবণে সালফার মিশনো হয়, মানবদেহের জন্য তা অত্যন্ত ক্ষতিকর। চিকিৎসকরা মত দিয়েছিলেন, এ লবণ ব্যবহার করলে হজম শক্তির ব্যাঘাত ঘটে এবং মানুষ রোগাক্রান্ত হয়। ফলে, জন্ডিসসহ নানা রোগ দেখা দেয়। ভারতীয় চিনিতেও ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। চিকিৎসকদের মতে, ভারতীয় চিনিতে অধিক পরিমাণে এ্যালুমিনিয়াম, ফিটকিরি, ফসফেট ও কাঁচের গুঁড়োসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর পদার্থ থাকায় শিশু ও বয়স্করা কিডনি ও লিভারের নানা রোগে আক্রান্ত হয়। ভারতীয় চিনি পানিতে মেশানোর পর পাত্রের তলদেশে কাঁচের গুড়োসহ বিভিন্ন দ্রব্যের গুঁড়ো পাওয়া যায়। চোরাকারবারিরা সারের বস্তা পরিস্কার না করেই চিনি বা লবণ বহনের জন্য তা ব্যবহার করেছিল। আবার অনেক সময় বস্তা ফেটে যাওয়ায় বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভয়ে অপরিস্কার জায়গায় ঢেলে ফেলা চিনি বা লবণ পরে আবার তুলে নেয়ার সময় ধুলোবালি মিশে যাওয়ায় ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। অথচ এ রকম অপরিস্কার লবণ বা চিনিই হরদম বেচাকেনা হয়। (সূত্র ঃ দৈনিক আজকের আওয়াজ ৭ মে ১৯৯৯)

ভারতে পাট পাচার হয়েছে

আওয়ামী শাসনে দেশের সীমান্ত অঞ্চলের জেলাগুলো থেকে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ পাট ভারতে পাচার হয়েছে। সীমান্ত পথে পাচার হয়ে যাওয়া পাটের মান 'রফতানি গ্রেডের' ছিল। প্রতি বছর দেশে পাট নিয়ে কৃষক যে বিপাকে পড়েছে, সেই অব্যবস্থার সুযোগ নিয়েছে ভারতীয় মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা। বিদেশী বেনিয়ারা বাংলাদেশে এসে তাদের মনোনীত এজেন্টদের দিয়ে উত্তমমানের সাদা ও তোষা পাট ক্রয় করে রাতের অন্ধকারে পাচার করেছে ভারতে। এতে দেশ কোটি কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বঞ্চিত হয়। ১৯৯৭ সালে পাটের বাম্পার ফলন হয়। এ বছর দেশের উত্তরাঞ্চলে পাট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৮ লাখ বেল; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ফলন হয় এর দ্বিগুণ। এ মৌসুমে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে সাদা পাট উৎপাদিত হয় ৭১ হাজার হেক্টর জমিতে, তোষা উৎপাদিত হয় ১ লাখ হেক্টর জমিতে। সবচেয়ে বেশি ফলনপ্রাপ্ত জেলাগুলো ছিল পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট,

www.pathagar.com

গাইবান্ধা ও জয়পুরহাট জেলা। এ বছর পাটের দাম নিম্নগামী হওয়ায় কৃষককূল দিশেহারা হয়ে পড়ে। কৃষকের শ্রম-ঘামে উৎপাদিত পাট ন্যায্য মূল্যে বিকাতে না পেরে পাটে আগুন দেবার মত ঘটনাও ঘটে যায়। এ সময় হাটবাজারে পাট বিক্রি হয় ১৫০ থেকে ১৯০ টাকা মাত্র। এত স্বল্প দামে পাট বিক্রি করে কৃষকের উৎপাদন খরচ উঠে আসেনি। ১৯৯৬ সালের সরকারি ক্রয় কেন্দ্র থেকে কেনা কৃষকের পাটের মূল্য শোধ করা হয়নি। ১৯৯৬ সালে ঐ ১৬টি জেলায় কৃষকের বকেয়া ছিল ১৫০ কোটি টাকা, অথচ এত বিপুল অংকের টাকার মধ্যে শোধ করা হয় মাত্র ৬০ কোটি টাকা। সরকারি ক্রয় কেন্দ্রগুলোর কাছে ১৯৯৭ সালে বকেয়া ছিল ৪০ কোটি টাকা। এত বিপুল পরিমাণ বকেয়ার বোঝা বহন করে কার্যত ক্রয় কেন্দ্রগুলো পাট ক্রয় কার্যক্রম বন্ধ রাখে। পাটকলগুলোতে পাট যোগানদাতা ফড়িয়াদেরও অর্থ ও সরকারের কাছে বাধা থাকায় তারা মিলের পাট কিনতে পারেনি। এই হিসেবে হাট-বাজার প্রায় পাট ক্রেতা শূন্য হয়ে পড়ে। এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে জমজমাট পাট কেনাবেচা হয়। এই পাট পাচার হয় ভারতে। ভারতে প্রতিমণ পাট বিক্রি হয় ৩৫০ থেকে ৪০০ ভারতীয় রুপীতে। ১৯৯৬ সালে মিলগুলো সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা মণ পর্যন্ত পাট কিনেছিল। ১৯৯৭ সালেও তাই কৃষকের মধ্যে পাট চাষে উৎসাহ এবং পাটের পেছনে উৎপাদন খাতে খরচ করাতে দ্বিধা ছিল না। এর আরেকটি কারণ ছিল আওয়ামী সরকারের নির্বাচন পূর্ব প্রতিশ্রুতি। তাদের প্রতিশ্রুতি ছিল ক্ষমতায় এসে পাটের মূল্য বাড়ানো। প্রকৃত পক্ষে সরকার ক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে কেনা কৃষকের পূর্বের বকেয়া পরিশোধ করতে পারেনি এবং পাটের দাম বাড়ানো থেকেও বিরত থেকেছে।

বাংলাদেশ সর্ম্পকে ভারতের সেনাপ্রধানের বক্তব্য

১৯৯৭ সালের আগষ্ট মাসে ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল শংকর রায় চৌধুরী বাংলাদেশ সফরে এসে দু'দেশের নিরাপত্তার কথা বলে যান। তিনি বলেন, 'উভয় দেশের নিরাপত্তা পরস্পর সংযুক্ত।' বাংলাদেশের তিনদিক থেকে ঘিরে আছে ভারত। একদিকে রয়েছে সাগর। পালিয়ে তো আর সাগরে যাওয়া সম্ভব নয়। যেতে হবে জমিতে। যেমন ১৯৭১ সালে এদেশের মানুষ ভারতেই আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু তখন ছিল বাংলাদেশের দূরবস্থা। আর আওয়ামী শাসনামলে বাংলাদেশের কিছু লোককে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের সীমান্ত এলাকা ত্রিপুরায় ভারত আশ্রয় দেয়। ১৯৭১ সালের আশ্রয় ছিল নিরাপত্তার আর এ আশ্রয় বাংলাদেশকে নিরাপত্তাহীন করে তুলে। এখানেই রায় চৌধুরীর পারস্পরিক নিরাপত্তা থিওরী প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে গেছে। রায় চৌধুরী বাংলাদেশে এসেছিলেন ৫ আগষ্ট এবং চলে যান ১১ আগষ্ট। ভারতীয় সেনাপ্রধান ১০ আগষ্ট ভারতীয় হাইকমিশনারের বাসভবনে কয়েকজন বাছাই করা সাংবাদিকের সাথে এক অনির্ধারিত ঘন্টাব্যাপী এ আলাপচারিতায় তিনি অনেক কথা বলেন। রায় চৌধুরীর পৈত্রিক নিবাস ছিল যশোর জেলায় টাকি-সহিদপুর গ্রামে। ১৯৪৭ এর পর দেশ বিভাগের পরও তাঁর পিতা, পিতামহ এই এলাকায় যাওয়া-আসা করতেন। ইছামতী নদীর তীরেই ছিল তাদের নিবাস। বাঙালি সামরিক অফিসারদের মধ্যে রায় চৌধুরী হচ্ছেন দ্বিতীয় জন যিনি ভারতের বিশাল বাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পঞ্চাশের দশকে জেনারেল জেএন চৌধুরী প্রথম বাঙালি অফিসার ছিলেন, যিনি এ দায়িত্ব পালন করেছেন। 'একজন সৈনিকের স্বপ্ন হচ্ছে সেনাবাহিনীর প্রধান হওয়ার। আমি তা হতে পেরে সন্তুষ্ট'। রায় চৌধুরী তার কথোপকথনে একথা বলেন। রায় চৌধুরী বলেন, 'চোরাচালানী রোধ, সন্ত্রাস দমন,

www.pathagar.com

ইনসারজেন্সি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উভয় দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে সহযোগিতা হতে পারে।' এরপর তিনি উল্লেখ করেন, 'ভারত থেকে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর জন্যে অস্ত্র কেনার ক্ষেত্রেও সহযোগিতা হতে পারে, তবে তিনি এবার সে সম্পর্কে কোন আলাপ করেননি বা কোন পক্ষ তা উত্থাপন করেননি বলে জানান।

অটল বিহারীর বক্তব্য

২০ মার্চ ১৯৯৯ কলকাতা সফরকালে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী বলেছেন, 'বাংলাদেশে অর্পিত সম্পত্তি আইন থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।' তিনি এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবেন। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ এদেশে কোন আইন বলবৎ থাকবে, আর কোনটা থাকবে না, সেটা বাংলাদেশের নিজস্ব ব্যাপার। এটা আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও কূটনৈতিক শিষ্টাচারের পরিপন্থীও বটে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা লুট

আওয়ামী শাসনের ৫ বছরে আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শাখা ও লিয়াজোঁ অফিস স্থাপন এবং এসব প্রতিষ্ঠানে বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়োগের সুযোগের অপব্যবহার করে হাজার হাজার ভারতীয় নাগরিক বৈধ ও অবৈধভাবে বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে যায়। বাংলাদেশের লাখ লাখ শিক্ষিত তরুণ যেখানে বেকারত্বের শিকার হয়ে দুঃসহ জীবন যাপন করছে সেখানে বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপনী সংস্থাতে পর্যন্ত ভারতীয় নাগরিকরা অবাধে কাজ করেছে। এদের মধ্যে বৈধ ভিসা ও কর্মানুমতি ছাড়া বিপুল সংখ্যক ভারতীয় নাগরিক ছিল। এদের বিরুদ্ধে আওয়ামী সরকার কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি। কোন বিদেশী নাগরিক বাংলাদেশে ওয়ার্ক পারমিট বা কর্মানুমতি পেতে চাইলে তাকে এ সম্পর্কিত স্থানীয় কমিটি, বিনিয়োগ বোর্ড অথবা বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল (বেপজা) কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হয়। বেপজা কর্তৃপক্ষ রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে বিদেশী নাগরিকদের ওয়ার্ক পারমিট দিয়ে থাকে। বিনিয়োগ বোর্ড নিবন্ধিত স্থানীয় বিদেশী বা যৌথ বিনিয়োগ সংবলিত শিল্প প্রকল্পের ক্ষেত্রে ওয়ার্ক পারমিট দেয় বিআইও কর্তৃপক্ষ। এর বাইরে বিদেশী কোম্পানির বাংলাদেশে শাখা বা লিয়াজোঁ অফিস স্থাপন এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞদের ওয়ার্ক পারমিট প্রদানের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবকে সভাপতি এবং স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, শ্রম ও জনশক্তি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিনিধিকে সদস্য করে একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (শিল্প বিনিয়োগ)-কে কমিটির সদস্য সচিব করা হয়। বাংলাদেশে কোন বিদেশী নাগরিক চাকরি করতে চাইলে পূর্বেই তার 'ওয়ার্ক পারমিট' নেয়ার আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বেসরকারি খাতের কোনো শিল্পোদ্যোক্তা বিদেশী নাগরিককে চাকরিতে নিয়োগ করতে চাইলে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হয়। এ জন্য ওয়ার্ক পারমিট প্রার্থীকে কতগুলো শর্ত পূরণ করতে হয়। বিনিয়োগ বোর্ড নির্ধারিত শর্তের মধ্যে রয়েছে প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নাগরিক হতে হবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত বা নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠানেই ওয়ার্ক পারমিট দেয়ার কথা বিবেচনা করা হবে। সাধারণভাবে যেসব পদে বিদেশী নাগরিকদের নিয়োগের কথা বিবেচনা করা হয় সেখানে স্থানীয় বিশেষজ্ঞ বা টেকনেশিয়ান পাওয়া যায় না। অনুর্ধ্ব ১৮ বছরের ব্যক্তি চাকরির জন্য

www.pathagar.com

বিবেচিত করা হবে না। নতুন কর্মে নিয়োগের বা মেয়াদ সম্প্রসারণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির পরিচালক মন্ডলীর সিদ্ধান্ত আবেদনে সন্নিবেশিত করতে হবে। সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গসহ বিদেশী নিয়োগের সংখ্যা কোনোভাবে ৫ শতাংশ অতিক্রম করা যাবে না। প্রাথমিকভাবে ২ বছরের জন্য বিদেশী নাগরিককে ওয়ার্ক পারমিট দেয়া হবে এবং তা পরবর্তীতে সন্তোষজনক কারণ সাপেক্ষে বর্ধিত করা যেতে পারে। বিদেশী নাগরিককে কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। স্থায়ী কমিটি ইপিজেড ব্যতীত বাংলাদেশে বিদেশী রফতানি বাণিজ্য ও লিয়াঁজো অফিস স্থাপনের অনুমতি দেয়। এসব প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বিদেশী ব্যাংক, বীমা, এয়ারলাইন্স ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে ওয়ার্ক পারমিট প্রদান করে থাকে। ওয়ার্ক পারমিট দেয়ার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বোর্ড ও স্থায়ী কমিটির শর্ত প্রায় একই ধরনের। আওয়ামী শাসনে বিদেশী নাগরিকদের বাংলাদেশে কাজ করার ক্ষেত্রে ওপরে উল্লেখিত নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা হয়নি। ভারতের হাজার হাজার নাগরিক ওয়ার্ক পারমিট ছাড়া এবং ভূয়া তথ্য দিয়ে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে বাংলাদেশে কাজ করেছে। স্থায়ী কমিটি বা বিনিয়োগ বোর্ডের ওয়ার্ক পারমিট দেয়ার আগেই অনেক ভারতীয় নাগরিক বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের শাখা বা লিয়াজোঁ অফিস খোলার নামে কাজ শুরু করে দেয়। নীতিমালায় যেখানে বিদেশী নাগরিককে ওয়ার্ক পারমিট দেয়ার ক্ষেত্রে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনশক্তি হওয়া এবং উক্ত পদে নিয়োগের জন্য স্থানীয় জনবল না পাওয়ার শর্ত রয়েছে সেখানে বায়িং হাউজ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সঙ্গীত একাডেমী, বিজ্ঞাপনী সংস্থা, এনজিওসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় নাগরিকদের নিযুক্ত করা হয়। ওয়ার্ক পারমিট প্রাপ্তির পর কর্মে নিযুক্ত হবার কথা থাকলেও কয়েক সপ্তাহের ভ্রমণ ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে এসে কাজ শুরু করে অনেকেই। ওয়ার্ক পারমিটের আবেদন ফরমে অনেক সময় ভূয়া তথ্যও সরবরাহ করেছে। অধিক বেতনধারী ব্যক্তিকে ওয়ার্ক পারমিট দেয়া হবে না সন্দেহে বেতন ও সুযোগ-সুবিধার উল্লেখ করা হয়েছে একেবারেই কম। এর মধ্যে আয়কর ফাঁকি দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা স্বদেশে পাচার করা হয়। ভারতীয় নাগরিকদের পাশাপাশি কোরিয়া ও থাইল্যান্ডসহ কয়েকটি এশীয় দেশের নাগরিকও বাংলাদেশে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কাজ করেছে, যেসব পদে নিয়োগ পাবার মত প্রচুর সংখ্যক যোগ্য বাংলাদেশী রয়েছে। কোনো কোনো কোরীয়-থাই নাগরিক তাদের ওয়ার্ক পারমিটের আবেদনে বেতন দেখিয়েছে ৭/৮ হাজার টাকা। এত কম বেতনে বাংলাদেশে কাজ করতে আসাটা অবিশ্বাস্য হলেও কর্তৃপক্ষ যথারীতি ওয়ার্ক পারমিট দিয়ে দিয়েছে। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস থেকে বিজ্ঞাপনী সংস্থা, প্যাকেজ নাটক, চলচ্চিত্র প্রভৃতি অঙ্গনে ভারতীয় নাগরিকদের আগমন অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। সদ্য বিকাশমান বিজ্ঞাপনী খাতকে বিদেশীদের জন্য অবাদ করার ব্যাপারে তীব্র বিরোধীতা সত্ত্বেও চূড়ান্ত খসড়া শিল্পনীতিতে বিদেশীদের অংশগ্রহণ অবারিত রাখা হয়। অর্নব ব্যানার্জি ওরফে রিংগো নামে একজন ভারতীয় নাগরিকের প্যাকেজ অনুষ্ঠান করা নিয়ে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে এসে তার নানা ধরনের রোমাঞ্চকর কেলেংকারীর সাথে জড়িয়ে যাবার খবরও বেরিয়েছে। আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর বৈধ-অবৈধভাবে ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশে কাজ করা বেড়ে যায়। সরকার এ বিষয়টি জানার পরও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। এতে চাকরি প্রার্থী বাংলাদেশী তরুণরা যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তেমনি ক্ষতি হয়েছে জাতীয় অর্থনীতি।

www.pathagar.com

সিএনএনকে প্রধানমন্ত্রীর দেয়া সাক্ষাৎকারের প্রতিবাদ

বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া ১০ সেপ্টেম্বর ২০০০ এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর সিএনএনকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশকে ভারতের সঙ্গে একীভূত হওয়ার স্বপ্নসহ বাংলাদেশ-ভারতের অভিন্ন মুদ্রা চালু এবং দেশের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেন সেগুলোকে দেশের মর্যাদার জন্য ক্ষতিকর, অসত্য ও অরাষ্ট্রনায়োকচিত বলে উল্লেখ করে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'জনৈক ভারতীয় নাগরিক প্রধানমন্ত্রীকে যখন প্রশ্ন করেন যে, বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে একীভূত হওয়ার অঙ্গীকারের কি হলো তখন প্রধানমন্ত্রী এর প্রতিবাদ না করে বরং ভারতের সঙ্গে মধুর সম্পর্কের ফিরিস্তি দিয়েছেন। তাহলে কি এদেশের মানুষ ধরে নেবে যে, বাংলাদেশকে ভারতের সঙ্গে একীভূত করার কোনো অঙ্গীকার প্রধানমন্ত্রী বা তার লোকেরা ক্ষমতায় আসার পূর্বে বা পরে করেছিলেন। একটি স্বাধীন দেশ সম্পর্কে এহেন অমর্যাদাকর প্রশ্নের পিছনে কি চক্রান্ত লুকিয়ে আছে? প্রধানমন্ত্রী এর প্রতিবাদ না করে বরং প্রশ্নটিকে উপভোগ করে দেশের মান-মর্যাদা কি বিকিয়ে দেননি? একইভাবে তিনি বাংলাদেশ-ভারতের অভিন্ন মুদ্রার প্রশ্নটির পক্ষ অবলম্বন করেও এ কাজে সময় প্রার্থনা করেছেন। তাকে এ ধরনের অধিকার কি দেশবাসী দিয়েছে যে, তিনি ইচ্ছে করলেই সময়ান্তে একাজ সমাধান করতে পারবেন? প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এই রাষ্ট্রঘাতী, স্বাধীনতা বিপন্নকারী ও অমর্যাদাকর মন্তব্যে বিস্মত, ক্ষুব্ধ ও আংতগ্রস্থ হয়েছেন দেশবাসী। প্রধানমন্ত্রী হয়তো ভুলে গেছেন যে, লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশ অন্য কোন দেশের সঙ্গে একীভূত হওয়া বা তাদের মুদ্রা ব্যবহারের জন্য জন্মলাভ করেনি। বাংলাদেশকে সিকিম বানানো সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রীর এসব বক্তব্যের উৎস ও উদ্দেশ্য কি? আমরা সেই ব্যাখ্যা দাবি করছি।' বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'সিএনএন যে প্রধানমন্ত্রীর সরকার ও দলের বশংবদ বিটিভি নয় এই পার্থক্য ভুলে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের বিরোধী দল ও অতীতের বিরুদ্ধে যে কুৎসিত মিথ্যাচার ও বিষোদগার করেছেন, তাতে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের সামনে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি, মর্যাদা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি। এই হীনতা ও দীনতা সারা জাতির জন্য এক মর্মান্তিক আঘাত। প্রধানমন্ত্রী নিজেদের কল্পিত কীর্তির কথা তুলে ধরতে গিয়ে এহেন মন্তব্যও করেছেন যে, বাংলাদেশে তার সরকার ক্ষমতায় আসার আগে কোনো অবকাঠামো ছিল না। এই মন্তব্য যে মিথ্যার চরম পরাকাষ্ঠা শুধু তাই নয়, এই মন্তব্যে বিদেশী বিনিয়োগ আরো নিরুৎসাহিত হবে। কারণ, বিদেশী বিনিয়োগকারীরা ভাববেন যে, বাংলাদেশে যদি মাত্র চার বছর আগে থেকে অবকাঠামো নির্মাণ শুরু হয়ে থাকে তাহলে এই অল্প সময়ে সেই প্রয়াস আর কদ্দুরইবা এগিয়েছে। সুতরাং তারা বিনিয়োগের আগে এইসব হিসাব অবশ্যই করবেন। অথচ দেশের বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, বিদেশী বিনিয়োগ আসার মতো অবকাঠামো দেশে অনেক আগেই তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে বিএনপির বিগত শাসনামলে এই প্রয়াস চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে। বরং আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরই অবকাঠামোগত ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হয়েছে সরকারের অযোগ্যতা, দুর্নীতি ও প্রতিহিংসাপরায়ণতার জন্য। বিরোধী দলকে খাটো করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বিনিয়োগ বিরোধী যে মন্তব্য করেছেন তার খেসারত দিতে হবে জাতিকে। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রীর পুরো সাক্ষাৎকারটাই ছিল অরাষ্ট্রনায়কোচিত, হিংস্র আক্রমণ ও বালখিল্যতায় ভরপুর। বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে ছোট করার এমন নজির বিরল। প্রধানমন্ত্রীর এহেন কীর্তি আবার ঘটা করে দেশের প্রিন্ট ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারও করা হয়েছে।' বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রঘাতী অমর্যাদাকর বক্তব্যের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সজাগ থাকা ও এই তাঁবেদার অকর্মণ্য সরকারের পতন আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

ভারত সৃষ্ট বন্যা

২০০০ সালের অক্টোবর মাসে দেশের পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলার বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকে। কোথাও কোথাও আরো অবনতি ঘটে। ৫ অক্টোবরের সংবাদপত্রে বন্যা কবলিত এলাকার যেসব খবরাখবর প্রকাশিত হয় তাতে শিউরে উঠতে হয়। ৩ অক্টোবর রাতে সাতক্ষীরা জেলার আরো ৪৫ টি গ্রাম প্লাবিত হয়। একই সাথে বন্যার্তদের দুর্দশা-দুর্গতি উঠে চরমে। ত্রাণ শিবিরে অসহায় মানুষ যাপন করছে মানবেতর জীবন। খাদ্য, পানীয়, সরকারি কোনো সাহায্য ছিলনা। ঘর-বাড়ি হারিয়ে মানুষ আশ্রয় নেয় বাঁশের মাচায়, গাছের ডালে। বানভাসি মানুষের জন্য মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো নেমে আসে সন্ত্রাসীদের অত্যাচার। ৫ অক্টোবরের পত্রিকায় বন্যা কবলিত, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলার সীমান্ত এলাকার আশ্রয়কেন্দ্রসহ বিভিন্ন স্থানে কমপক্ষে অর্ধশত যুবতী ও মহিলা ধর্ষিত হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়। এসব ধর্ষণের সাথে জড়িত থাকে আওয়ামীরা। ঘর-বাড়ি হারিয়ে বন্যার্ত আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণকারী অভিভাবকগণ তাদের যুবতী কন্যাদের নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দিন যাপন করেন। নরপশুরা যুবতীদের হুমকি দেয় যে, 'ওদের কথা না শুনলে গলাটিপে হত্যা করে বানের পানিতে ভাসিয়ে দেয়া হবে।' বন্যা কবলিত এলাকায় মানুষ একদিকে বানের পানির সাথে লড়াই করেছে, অপর দিকে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে ইজ্জত-আব্রু বাঁচাবার চিন্তায় আকুল থাকতে হয়। অপরদিকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গের জালঙ্গি, মহানন্দা, ভাগীরথী, ইছামতি ও কোদলা নদীর বাঁধ একই সাথে খুঁলে দেয়ায় প্রচন্ড বেগে বিপুল জলরাশি বাংলাদেশে প্রবেশ করে। অকাল বন্যার শুরুতেই এ অভিযোগটি উঠেছিল। ভারতের অতিরিক্ত পানি বাংলাদেশে হঠাৎ ঢুকিয়ে দেয়ার ফলেই এই বন্যার সৃষ্টি-এটা প্রমাণিত সত্য। নইলে বাংলাদেশের ঋতুচক্র এবং জলবায়ুর নিয়মানুসারে এ সময়ে এ ধরনের ভয়াবহ বন্যা হতে পারে না। কিন্তু আওয়ামী সরকার এ বিষয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। বাঁধ কেটে পানি দিয়ে ভারত বাংলাদেশের একটি অংশ তলিয়ে দিলো, কোটি কোটি টাকার সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ করলো, লাখ, লাখ মানুষের জীবনকে করে তুললো দুর্বিসহ। অথচ সরকার মুখে কুলুপ এঁটে বসে ছিল।

ঈদ মার্কেটে ভারতীয় শাড়ি

১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঈদ মার্কেট ছিল ভারতীয় শাড়িতে সয়লাব। সোনারগাঁও, মোগড়াপাড়া এবং ফুলবাড়িয়া আন্ডার গ্রাউন্ড মার্কেটসহ সারাদেশের দোকানপাটে অবাদে বিক্রি হয় ভারতীয় শাড়ি। ফলে দেশীয় বস্ত্র শিল্প এবং এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত প্রায় এক কোটি শ্রমিক-কর্মচারীর জীবিকা পড়ে হুমকির মুখে। চোরাচালানের পূর্বাঞ্চলীয় নিরাপদ ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহৃত হয় নারায়ণগঞ্জ জেলার ঐতিহাসিক সোনারগাঁও থানার মোগড়াপাড়ার কয়েকটি গ্রাম। কুমিল্লা সীমান্ত পথে আনা শাড়ি ও অন্যান্য পণ্য নামানো হয় এই এলাকায়। দৈনিক প্রায় অর্ধকোটি টাকার শাড়ি ও ফেনসিডিল এসেছে এখান দিয়ে। এই সব পণ্য ঢাকায় বাজারজাতকরণের জন্য নারায়ণগঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জ, ফতুল্লা ও ডেমরায় গড়ে তোলা হয় বেশ কিছু পয়েন্ট। এই সব পয়েন্টে পণ্য পৌছানোর সাথে সাথেই ঢাকার পার্টি সেগুলো পাইকারি বিক্রেতাদের কাছে পৌছে দেয়। শাড়ি বহনের কাজে ব্যবহার করা হয় দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের। আওয়ামী শাসনামলে দেশের প্রায় এক লাখ বিত্তহীন নারী এই চোরাকারবারের

www.pathagar.com

সঙ্গে জড়িত ছিল। রাজধানীর ফুলবাড়িয়া আন্ডারগ্রাউন্ড মার্কেটে প্রতিদিন ভোরে এদের দেখা গিয়েছে। এদের অনেকে পাটের বা রেক্সিনের হ্যান্ডেল ওয়ালা ব্যাগে, ছোট আকারের গাঁটে বা দেহের সঙ্গে পেঁচিয়ে শাড়ি বহনের কাজ করেছে, আবার অনেকে পাইকারী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে শাড়ি কিনে মহল্লার বাসায় বাসায় ফেরি করে বিক্রি করেছে। বাংলাদেশে শাড়ির বার্ষিক চাহিদা ১২ কোটি পিস। সেক্ষেত্রে আওয়ামী শাসনে কেবল ভারত থেকে চোরাপথে এসেছে ৬ কোটি পিস। ফলে দেশীয় বস্ত্রশিল্পের হাল হয়েছে করুণ। দেশীয় শাড়ির বাজারে ক্রেতা ছিলনা। দাম কম বলে সবার চোখ ছিল ভারতীয় শাড়ির দিকে। দামের তারতম্যের সম্পর্কে দেশীয় বস্ত্র শিল্পের মালিকদের বক্তব্য মোটেও অযৌক্তিক ছিলনা। সূতা আমদানির ওপর তাদের মোট ৩১ ভাগ এবং রং আমদানির ওপর প্রায় ৬৫ ভাগ কর দিতে হয়েছে। এতে দেখা যায়, পিস প্রতি ভারত ও বাংলাদেশী শাড়ির উৎপাদন মূল্যের মধ্যে ব্যবধান দাঁড়ায় ৭০ টাকার। চোরাপথে আসা পণ্যকে শুল্ক দিতে হয় না। স্বভাবতই বৈধ পণ্য তার সামনে টিকতে না পারাটাই স্বাভাবিক।

আনন্দবাজার পাবলিশার্স বাংলাদেশে

আওয়ামী শাসনামলে কলিকাতার আনন্দবাজার পাবলিশার্স (এবিপি লিমিটেড) ঢাকায় ব্যবসা করবার অনুমতি পায়। এই গোষ্ঠীর দৈনিক পত্রিকা আনন্দবাজার প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। সাহিত্য এবং পত্রিকা প্রকাশনা সংস্থা আনন্দবাজার পাবলিশার্স বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী কার্যক্রমের জন্য দেশবাসীর কাছে অনেকবার নিন্দিত ও চিহ্নিত হয়েছে। বিশেষ করে বাঙালি জাতির মহান ভাষা আন্দোলনে প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা ছিল বিতর্কিত। মুক্তিযুদ্ধের সময় আনন্দ পাবলিশার্স তাদের বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষতিকর রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাদের প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৯২ সালে প্রকাশিত নীরোদ সি চৌধুরীর একটি লেখায় স্বাধীন বাংলাদেশকে 'তথাকথিত বাংলাদেশ' বলে আখ্যায়িত করে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি কটাক্ষ করা হয়। এজন্য বিএনপি সরকার দেশ পত্রিকা এদেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। ফলশ্রুতিতে পত্রিকাটি অস্তিত্বহীনতার সম্মুখীন হয়। পত্রিকাটির প্রকাশনা সাপ্তাহিক থেকে পাক্ষিকে রূপান্তরিত হয়। এ থেকে প্রমাণ হয় 'দেশ'র উদ্দেশ্য কিরূপ ছিল। শুধু 'দেশ' নয়, তাদের প্রকাশিত 'সানন্দা'সহ আরও কয়েকটি পত্রিকার মাধ্যমে তারা এ অশুভ কর্মকান্ড চালিয়ে যায়। বাংলাদেশের সচেতন মানুষেরা আনন্দ পাবলিশার্সের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকে এবং 'দেশ'-'সানন্দা'সহ আরও কয়েকটি পত্রিকা বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে আবার বর্জনের সম্মুখীন হয়। তখন তারা গ্রহণ করে ভিন্ন পন্থা। কিছু কিছু লেখা তাতে প্রকাশ পায় যা বাংলাদেশের চিন্তা-ভাবনার সাথে মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু বিস্মিতভাবে লক্ষ করা যায় আর এক ঘটনা। ওই একই পত্রিকার একই সংখ্যার বাংলাদেশে যে কপিগুলো এসেছে, তার সাথে পশ্চিম বাংলায় প্রচারিত কপিগুলোর অধিকাংশই মিল নেই। পশ্চিম বাংলার কপিতে বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বক্তব্য, এমনকি প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলোই নেই। শুধু তাই নয়, ওই সংস্করণে এমন কিছু লেখা ছাপা হয় যা বাংলাদেশের জন্য চরম অবমাননাকর ও আপত্তি জনক।

ছিটমহল সমস্যার সমাধান করা হয়নি

আওয়ামী শাসনামলে ভারতের সাথে বিরাজিত ছিটমহল সমস্যার সমাধান করা হয়নি। ছিটমহল দু'দেশেরই রয়েছে। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তির সময় সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা

www.pathagar.com

সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করার জন্য রেডক্লিফ মিশন যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিল ভারত কোন সময়ই সে সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি। ফলে পাকিস্তান একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হলেও ভারত যেমন পূর্ব পাকিস্তানকে তার প্রাপ্য ছিটমহল প্রত্যার্পণ করেনি, তেমনি বাংলাদেশকেও কোন ছিটমহল প্রত্যর্পণ করেনি 'বন্ধু রাষ্ট্র' হিসেবে। এক্ষেত্রে ভারত এমনকি বাংলাদেশ প্রস্তাবিত যৌথ পর্যক্ষেণেও কখনো সাড়া দেয়নি। অথচ আশা করা গিয়েছিল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর ভারত নিছক বন্ধুত্বের খাতিরেও আন্তরিকতার পরিচয় দিবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ভারতের একগুঁয়েমির কারণে ছিটমহল সমস্যার সুরাহা না হওয়ায় ছিটমহলবাসী জনগণ নাগরিত্বহীন এক অসহায় অবস্থায় দিনাতিপাত করতে বাধ্য হচ্ছে। ছিটমহল সমস্যাটি সেই শুরু থেকেই সম্প্রসারণবাদী ভারতের সৃষ্টি যা একমাত্র ভারতের একরোখা মনোবৃত্তির কারণে সমাধান করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের যেসব ছিটমহল ভারতের মধ্যে রয়েছে ভারতের দাবি মতে সেসব ছিটমহল 'সঙ্গত কারণেই' ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় রাজ্যশাসিত কুচবিহার ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলে কুচবিহারের যেসব ছিটমহল পাকিস্তানি জেলা রংপুর ও দিনাজপুরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সেগুলো ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ছিটমহল নিয়ে বাংলাদেশ-ভারত বিরোধের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বেরুবাড়ি। ১৯৪৭ সালে রেডক্লিফ যখন দু'দেশের সীমান্ত চিহ্নিত করেন তখন তিনি জলপাইগুড়ি জেলার কিছু থানা পাকিস্তানকে ও কিছু ভারতে হস্তান্তরের সুপারিশ করেন। কিন্তু তিনি বোদা নামে একটি থানার প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান, যা পরবর্তীতে দাবি করে পাকিস্তান সরকার। এ নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে বিরোধ শুরু হয় এবং ১৯৫৮ সালে উভয় সরকার প্রধান এক আলোচনায় মিলিত হয়। অতঃপর নূন-নেহেরু যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে ১৯৫৮ সালে উভয় সরকার এক সমঝোতায় উপনীত হয়। এই সমঝোতা মতে, বেরুবাড়ি ১২ নম্বর ইউনিয়নের অর্ধেক পাকিস্তানকে ও বাকি অর্ধেক ভারতকে প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ইতিমধ্যে আলোচ্য চুক্তি নিয়ে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে চুক্তি বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয় এবং ততদিনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় নূন-নেহেরু চুক্তি অকার্যকর হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে শেখ মুজিব ও ইন্দিরা গান্ধী একটি চুক্তি সই করেন। চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ বৃহত্তর রংপুর সীমান্ত সংলগ্ন দক্ষিণ বেরুবাড়ি ইউনিয়নের অর্ধাংশসহ সন্নিহিত ছিটমহলগুলো ভারতের কাছে হস্তান্তর করে। বিনিময়ে বাংলাদেশ পায় দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা ছিটমহল। এই ছিটমহলগুলো বাংলাদেশের মূল ভূ-খণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় উল্লেখিত চুক্তিতে বলা হয়েছিল, 'বাংলাদেশ যাতে পাটগ্রাম থানার পালগ্রাম মৌজার সাথে অবাধে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে সে জন্য ভারত তার এলাকাভুক্ত তিনবিঘা করিডোরটি স্থায়ীভাবে বাংলাদেশের কাছে লীজ দেবে।' করিডোরটির দৈর্ঘ্য ১৭৮ মিটার ও প্রস্ত ৮৫ মিটার। এদিকে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরপরই মুজিব সরকার তড়িঘড়ি করে বেরুবাড়ি ভারতের হাতে তুলে দেয়। ১৯৭৪ সালে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের আপত্তির দরুণ তা বাস্তবায়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়। একই সময়ে ভারতের একজন নাগরিক ওই চুক্তি ভারতীয় সংবিধানের পরিপন্থী বলে অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। দীর্ঘদিন মামলা চলার পর কলকাতা হাইকোর্ট তাদের রায়ে বলেন যে, 'তিনবিঘা বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করতে হলে ভারতের সংবিধান সংশোধন করতে হবে।' অন্য দিকে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতা হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপীল করে। মূলত চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখার

www.pathagar.com

জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষই কৌশলে এসব মামলা-মোকদ্দমা ও আপীল নাটকের সূত্রপাত করে। তাই ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টে বছরে পর বছর এই মামলা ঝুলতে থাকে এবং বাংলাদেশকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়া হয় যে, আইনগত সমস্যা না মেটা পর্যন্ত তিনবিঘা হস্তান্তর করা যাবে না। শেষ পর্যন্ত ১৯৯০ সালের ৫ মে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট তিনবিঘা করিডোর অবাধে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অধিকারের অনুকূলে রায় প্রদান করে, যার ফলশ্রুতিতে ১৯৯২ সালে খালেদা-রাও চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হয়। ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত বাংলাদেশী ছিটমহলগুলোর মূল সমস্যা হচ্ছে-ভারতীয় কর্তৃপক্ষের একগুয়ে মনোভাবের দরুণ ছিটমহলে বসবাসরত বাংলাদেশী জনগণ অবাধে বাংলাদেশ ভূ-খন্ডে যাতায়াত করতে পারে না। এছাড়া বিচারকার্য, ভূমি ব্যবস্থা, শিক্ষাসহ সকল নাগরিক ও মৌলিক অধিকারের প্রশ্নেও তাদের প্রতিনিয়ত নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

ভারতীয় হাইকমিশনের কূটনৈতিক স্থাপনাসমূহ স্থানান্তর করা হয়নি

১৩ জুন ২০০১ দৈনিক ইনকিলাবে সালাহ্ উদ্দিন শোয়েব চৌধুরী লিখেছেন, 'পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার বার তাগাদা সত্ত্বেও ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের কূটনৈতিক স্থাপনাসমূহ ধানমন্ডি এলাকা থেকে কূটনীতিকদের জন্য নির্ধারিত গুলশান-বনানী-বারিধারা এলাকায় স্থানান্ত র করা হচ্ছে না। আর এ কারণে প্রতি বছরই বাংলাদেশকে কোটি কোটি টাকা বাড়তি খরচের চাপ সইতে হচ্ছে। ভারতীয় হাইকমিশনের নামে বারিধারায় বেশ কয়েক বিঘা পরিমাপের একটি বিশাল প্লট বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু এই সম্পত্তির দখল বুঝে নেয়া সত্ত্বেও হাইকমিশন স্থাপনা এখানে স্থানান্তরের ব্যাপারে ভারতীয়রা নানান টালবাহনায় কালক্ষেপণ করছে। ধানমন্ডি থেকে হাইকমিশন স্থানান্তরে ভারতীয়দের অনাগ্রহের পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ আছে। প্রথম, দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর উপস্থিতি ধানমন্ডিতে তুলনামূলকভাবে কম। যেহেতু ভারতীয় হাইকমিশনের বর্তমান দফতরগুলোয় নিয়মিতভাবেই এদেশীয় এজেন্টদের পদচারণা তাই গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারি অপেক্ষাকৃত কম থাকায় এটি ভারতীয়দের কাছে সুবিধাজনক। এছাড়াও বাংলাদেশ রাইফেলস-এর সদর দফতর ভারতীয় হাইকমিশনের খুব কাছে হওয়ায় বিডিআরের অভ্যন্তরীণ ওয়্যারলেস যোগাযোগ বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে ধানমন্ডিস্থ ভারতীয় হাইকমিশন থেকে আড়িপাতা হয়। এ বিষয়ে স্থানীয় পত্রপত্রিকায় একাধিকবার খবর বেরিয়েছে। এদেশীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছেও এ সংক্রান্ত অভিযোগ রয়েছে। দ্বিতীয় কারণটি হল বাংলাদেশী এজেন্টদের সাথে ভারতীয় দূতাবাসে কর্মরত আন্ডার কভার 'র' কর্মকর্তাদের প্রায়শই বৈঠক হয় ঢাকা ক্লাবসহ ধানমন্ডি, সেন্ট্রাল রোড, লালমাটিয়া, সোবহানবাগ প্রভৃতি এলাকার জনবহুল রেস্তোরাগুলোয়। এ ছাড়াও ভারতীয় কূটনীতিকদের মধ্যে কেবল মাত্র হাইকমিশনার ছাড়া আর বাকি সবাই ধানমন্ডি এলাকায় এপার্টমেন্টে থাকেন। যেহেতু ঐসব এপার্টমেন্টে স্থানীয় লোকরা ও ভারতীয় কূটনীতিকদের প্রতিবেশী হিসেবে বসবাস করেন তাই এই মোক্ষম সুযোগে নিয়মিতভাবেই ভারতীয় হাইকমিশনের কূটনীতিকরা নির্বিঘ্নে তাদের এদেশীয় এজেন্টদের সাথে নিয়মিতভাবেই তাদের বাসভবনে বা এপার্টমেন্টে মিলিত হন। 'র' এর আন্ডার কভার অফিসার এবং ভারতীয় হাইকমিশনের বহুল বিতর্কিত দ্বিতীয় সচিব দীনেশ পাটনায়েক ধানমন্ডির একটি বহুতল এপার্টমেন্ট ভবনে বসবাস করতেন। একই ভবনে 'অল ইন্ডিয়া রেডিওর' বাংলাদেশ প্রতিনিধিও থাকতেন। বিশাল এই ভবনে আছে ষোলটির মত এপার্টমেন্ট। রাত-দিন লোকজনের যাতায়াত ছিল। 'র' কর্মকর্তা দীনেশ

www.pathagar.com

পাটনায়েকও এর পুরো সুযোগ নেন। প্রতি সন্ধ্যায়ই তার এপার্টমেন্টে বসতো এজেন্টদের সাথে তার ব্যক্তিগত আসর। মদ, বিয়ারসহ আরো অনেক ব্যবস্থাই থাকতো। সে সময়ে দীনেশ পাটনায়েকের একজন ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক কর্মী তাকে গুলশান-বারিধারা এলাকায় বাসা বদলের পরামর্শ দিলে দীনেশ তাকে বলেন যে, ধানমন্ডি এলাকায় তিনি অনেক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। কারণ এখানে টিকটিকির উপদ্রব কম। বাংলাদেশের মাটিতে বসে এদেশীয় এজেন্টদের মাধ্যমে নানা ধরনের ক্ষতিকর কর্মকান্ড পরিচালনার অবাধ মওকা ভোগের উদ্দেশ্যেই ভারতীয় হাইকমিশনের কূটনীতিকরা গোয়ার্তুমি করে ধানমন্ডি এলাকায় থাকছেন এবং এখান থেকে তাদের কূটনৈতিক স্থাপনা সরাচ্ছে না। ভারতীয়দের গোয়ার্তুমিতে বাংলাদেশকেও ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ভারতীয় হাইকমিশনের জন্য বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে যেয়ে বাংলাদেশের প্রতিবছর অন্তত পক্ষে তিন/চার কোটি টাকা বাড়তি খরচ হয়। এছাড়াও ধানমন্ডিতে বিশাল যে কয়েকটি ভবন ভারতীয়রা ব্যবহার করছে এর জন্য প্রতিমাসে এরা সরকারকে ভাড়া দেয় মাত্র কয়েকশ' টাকা। যদিও বর্তমান বাজার মূল্যে ঐ বাড়িগুলোর মোট ভাড়া হবে অন্তত পক্ষে ৫ লাখ টাকা। এই হিসাবে প্রতিবছর বাংলাদেশ সরকার ৬০ লাখ টাকার ভাড়া থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। ধানমন্ডি আবাহনী মাঠের কাছে একমি ল্যাবরেটরির পাশে অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সম্পর্কে আরেকটি গুরুতর অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। প্রতি সন্ধ্যায় ঐ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ছাদে মেয়ে-ছেলেদের নানা ধরনের বেলেল্লাপনা, মদ খাওয়া ইত্যাদি চলে। বহুল বিতর্কিত ও 'র' কণ্ঠ হিসেবে পরিচিত একটি কাগজের জনৈক কলাম লেখকও এই সান্ধ্য আসরে প্রায়ই যোগ দেন। একটি কূটনৈতিক স্থাপনায় এ ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ কূটনৈতিক শিষ্টাচারের সুস্পষ্ট লংঘন। প্রতিবছর রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে ভারতীয় হাইকমিশনকে ধানমন্ডি এলাকায় থাকতে দিয়ে বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপ করার সুযোগে। অন্যান্য কূটনৈতিক মিশনের মত ভারতীয় হাইকমিশনকেও কূটনৈতিক এলাকা গুলশান-বারিধারা-বনানীতে এদের হাইকমিশন অবিলম্বে স্থানান্তরের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের তৎপর হওয়া প্রয়োজন।'

ভারতীয় ফেনসিডিলের আগমন

আওয়ামী শাসনামলে উত্তরাঞ্চলে মাদকাসক্তের সংখ্যা বেড়েছে। ভারত থেকে চোরাপথে অবৈধভাবে মাদকদ্রব্য আমদানির ফলে এই সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পায়। মাদকদ্রব্যের পাশাপাশি চোরাচালানীরা ভারত থেকে পাটগ্রামসহ উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে নিয়ে এসেছে মোটর সাইকেল, বাইসাইকেলের খুচরা পার্টস, কাঁচা সুপারী, লবণ, চিনি, ব্লাউজ পিস, কম্বল, চাঁদর, গরু, ডাল, এলাচ, গুড়া দুধ ও সূতাসহ বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী। ভারতীয় বাইসাইকেল, লবণ ও চিনি লালমনিরহাট জেলার হাটবাজারে প্রকাশ্যে বিক্রি হয়। এছাড়াও চোরাচালানকৃত মোটর সাইকেল কিছু কিছু এ অঞ্চলেও চলাচল করতে দেখা গেছে। ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাটগ্রাম থানার বাউরা ইউপির রসুলপুর মৌজার একদল ভিডিপি সদস্য আনুমানিক রাত ৯/১০টার সময় ভারত থেকে অবৈধভাবে আমদানিকৃত দুই বস্তা সূতা আটক করে সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যানকে জমা দেয়। পরবর্তীতে ঐ সূতা বাউরা নবীনগর বিওপিতে জমা দেয়া হয়। এর আনুমানিক মূল্য ৩ লাখ টাকা। উত্তরাঞ্চলের প্রায় প্রতিটি সীমান্ত দিয়েই চলেছে অবাধ চোরাচালান। এসব ঘটনা ঘটেছে সীমান্তরক্ষীদের সামনেই। তবে বিভিন্ন

www.pathagar.com

দ্রব্যসামগ্রীর সাথে মাদক দ্রব্যও এসেছে। আর অবৈধভাবে আমদানিকৃত এ মাদকদ্রব্যের প্রভাব পড়েছে কিশোর ও যুবকদের ওপর। ফলে এ অঞ্চলে ফ্রি স্টাইলে ব্যবসা হয়। এক শ্রেণীর সমাজ বিরোধীরা ভারত থেকে ফেনসিডিলসহ বিভিন্ন রকমের মাদকদ্রব্য আমদানি করছে। বিশেষ বোঝাপড়ার বদৌলতে আইনের চাবুক এদের স্পর্শ করেনি। এরা আগে থেকেই এক শ্রেণীর অসাধু আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারীকে টাকার বিনিময়ে বসে আনে। ফলে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করেছে এরা। বলা যায়, উত্তরাঞ্চল পরিণত হয় এক বিশাল ভারতীয় মাদক বাজারে। চোরাচালানীরা উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে আনে মাদকদ্রব্য। এসব মাদকদ্রব্যের মধ্যে ছিল ফেনসিডিল, হেরোইন, মদ, গাঁজা, টিডি, জেসিক ইনজেকশন, বিজিস ওয়াটার, বরিজ কম্পাউন্ড ও ট্রাংকুলাইজার জাতীয় ট্যাবলেট। টিডি জেসিক ইনজেকশন ভারতে ব্যবহার করা হয় জটিল অপারেশনের রোগীকে। কিন্তু বাংলাদেশে তা মাদকদ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করেছে। এমনিভাবে এলাকার যুবকরা মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্ত হয়েছে। ফলে চুরি, ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ বেড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক ভারসাম্য নষ্ট হতে শুরু করে। কেননা মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা নেশার দ্রব্য কেনার জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠে এবং যেখান থেকে পারুক অর্থ তাদের চাই। এতে পরিবারের অনেক মূল্যবান জিনিসও বিক্রি করতে তারা কুণ্ঠা বোধ করেনি। এক পর্যায়ে তারা নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মে লিপ্ত হয়। ফলে এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙ্গে পড়ে। প্রতিদিন অপরাধকর্ম সংঘটিত হয়। উত্তরাঞ্চলে স্থল বন্দর চালু হওয়ার পর ভারত থেকে এলসিতে মালামাল আসতে শুরু হলে পণ্যবাহী ট্রাকে মাদকদ্রব্য আসার পরিমাণ বেড়ে যায়। স্থলবন্দরগুলোতে ওয়েটব্রীজ ও সরকারি কোন গুদাম না থাকায় ভারতীয় পণ্যবাহী ট্রাক সরাসরি আনলোড হয় আমদানিকারকের গোডাউনে। এতে ঐ ট্রাকে অতিরিক্ত মালামাল এমনকি মাদকদ্রব্য থাকলেও সংশ্লিষ্ট কাস্টমস এবং আইন প্রয়োগকারী পুলিশ ও বিডিআরের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। মাদকদ্রব্য বেশি আসার এটাও একটা কারণ ছিল। কেননা চোরাচালানীদের ধর্মই হলো যে, সুযোগ ব্যবহার করে তাদের কালো ব্যবসা জোরদার করা। তারা করেছেও তাই। পাশাপাশি আইনের সেবকদের দায়িত্বহীন মনোভাব তাদের জন্য সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে ট্রানজিট প্রদানের আলোচনা

১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে আলোচনার জন্য ভারতকে ট্রানজিট প্রদান ও সীমান্ত বাণিজ্যের বিষয়টি এক কর্মপত্রে ঠাঁই পায়। এতে উল্লেখ করা হয়, 'ভারত সরকার ট্রানজিট পেতে এবং বাণিজ্য সুবিধা পেতে বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করেছে।' কর্মপত্রের ভাষা অনুযায়ী যদি বাংলাদেশ ভারতীয় পণ্য পরিবহণে বাংলাদেশ ভূ-খণ্ড ব্যবহার করতে দেয়, ভারতও বাংলাদেশী পণ্য ভারতে রফতানি করতে শুল্ক সুবিধা দিবে। এতে উভয় দেশের বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পাবে বলেও ভারতীয় কর্তৃপক্ষ মনে করে। বিষয়টি স্পর্শকাতর বিধায় প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণের আগে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ আবশ্যক ভেবেই এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মপত্রটি তৈরি করে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে ১৯৮০ সালের বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির ৮ নং ধারার রেফারেন্স দেয়। আওয়ামী সরকার ভারতকে বাংলাদেশী ভূ-খণ্ড ব্যবহার করতে দেবে, এ লক্ষ্যে প্রথম থেকেই চালানো হয় নিরলস প্রচেষ্টা। বের করা হয় ভাষার চাতুর্য। এজন্যই যুক্তি তৈরি করা হয় ১৯৮০ সালের বাণিজ্য চুক্তির ৮ নম্বর ধারার। ধারাটি যে কঠিন শর্তের, তা কিন্তু আওয়ামী

www.pathagar.com

সরকার প্রকাশ করেনি। ওই ধারার মূল শর্তেই রয়েছে, 'পারস্পরিক লাভের ভিত্তিতে এই সুবিধা দেয়া যেতে পারে।' একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বাংলাদেশকে ভারতের ওপর দিয়ে নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান বা আরও দূরবর্তী কোন দেশের বাংলাদেশী পণ্য বা সে সব দেশে পণ্য পরিবহন সুবিধা দিলে তবেই তা বাংলাদেশের জন্য লাভজনক হতে পারে অন্যথায় নয়।

সীমান্তের পিলার গায়েব

অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাগ্য নির্ণায়ক তথাকথিত শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পর ১৯৯৮ সাল থেকে ভারত নতুন উদ্যমে বাংলাদেশের পশ্চিম-দক্ষিণ অঞ্চল নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। চিত্ত সূতার ও কালিদাসকে দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌম ও অস্তিত্ব বিনাশকারী 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' প্রতিষ্ঠার দিবাস্বপ্ন কয়েক বছর কিছুটা চেপে রাখার পর আবার এদেরকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। তারা সম্পূর্ণ নতুন কোন জটিল চক্রান্তের জাল বিছিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চায়। যার আলামত ক্রমাগত স্পষ্ট হয়ে উঠে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের জন্য মারাত্মক ভীতিপ্রদ ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশের সাতক্ষীরা ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চব্বিশ পরগণার মধ্যকার দুইশত কিলোমিটার এলাকা জুড়ে স্থাপিত হাজার হাজার বর্ডার পিলার (সীমান্ত চিহ্নিতকারী স্তম্ভ) রহস্যজনকভাবে প্রায় রাতারাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে ভারতের একটি ইংরেজি দৈনিক 'দি স্টেটম্যান' ২৯ এপ্রিল ১৯৯৮ তারিখে প্রকাশিত সংখ্যায় বলে, 'এর ফলে বাংলাদেশ ও ভারতের অঞ্চল সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।' এদিকে রহস্যজনকভাবে এই নজিরবিহীন পিলার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সূত্র ধরে ভারতের থলের বিড়াল বেড়িয়ে পড়ে। তারা তাদের আসল মতলব ফাঁস করে। তবে একটু রাখ-ঢাক ভারত বলেছে, 'নদী তীরবর্তী সীমান্ত পুনঃনির্ধারিত হওয়া দরকার।' ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে এই সীমান্ত পিলার অপসারণ, নিশ্চিহ্ন করণ এবং এই অপকর্মের পর বাংলাদেশের ভূ-খণ্ড দখল বা দাবী করার খাসলত ভারতের নতুন নয়। বাংলাদেশকে বেকায়দায় ফেলার জন্য অথবা ক্ষণে ক্ষণে বিব্রত করে ফায়দা হাসিল করার সুদূর প্রসারী কুমতলব থেকে ভারত এই কাজটি মাঝে-মধ্যেই করে থাকে। তবে এই পিলার নিশ্চিহ্নকরণকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার বলেছে, 'এই ঘটনাটি হয় চুরি অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে'। কারা এইভাবে একটানা ২০০ কিলোমিটার এলাকার সীমান্ত পিলার চুরি করলো, এই আশ্চর্যজনক চুরির উদ্দেশ্য কি, সে সম্পর্কে অবশ্য তারা নীরব ছিল। তাছাড়া সীমান্ত পিলারগুলো লোহা, তামা, ব্রোঞ্জ কিংবা সীসা নয়, স্রেফ ইট ও সিমেন্ট দিয়ে তৈরি--কোন চোরেরা এই সামান্য ব্যবহৃত ইট এভাবে শত শত কিলোমিটার থেকে চুরি করে নিয়ে যাবে-সে দিকটিও তাদের কথায় পরিষ্কার ছিলনা। এছাড়া তাদের কথানুযায়ী যদি পিলারগুলো ক্ষতিগ্রস্তও ধরে নেয়া যায়, তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, এভাবে একটানা ২০০ কিলোমিটার এলাকার সবগুলো পিলারই কিভাবে রাতারাতি এক সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হলো? এ ব্যাপারেও কোন ব্যাখ্যা ভারত দেয়নি। তাহলে ধরে নেয়া যায়, এই ভয়ানক অপকর্মটি যারা করেছে, তাদের ব্যাপারে পুরো তথ্য ভারতের কাছে ছিল। এই সন্দেহ আরও বাড়ে যখন ভারতীয় পত্র-পত্রিকাগুলো রিপোর্ট করে, ভারত কর্তৃক ২ শতাধিক কিলোমিটার এলাকায় কিছুদিন আগে একটি প্রাথমিক জরিপ চালানো হয়েছে। এই রকম একটি স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভারত কেন বাংলাদেশের পক্ষের অজ্ঞাতে (?) একলা জরিপ কার্য চালালো তাও একটি জিজ্ঞাসা বটে। দুই দেশের সীমানা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালের র‌্যাডক্লিফের সুপারিশ অনুযায়ী স্থাপন

www.pathagar.com

করা হয়েছিল এসব পিলার। ভারতীয় পত্র-পত্রিকার মতে, 'দুদেশের সীমানা রক্ষার বিষয়টি শক্তভাবে নেয়ার জন্য ১৯৮৭ সালে দু'পক্ষ আলোচনা করেন। কিন্তু নানা কারণে সেটা আর অগ্রসর হয়নি। দীর্ঘ ১১ বছর পর বাংলাদেশ ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আবার বসেন এর সমাধান খুঁজে বের করার জন্য। দি স্টেটম্যান বলেছে, 'উচ্চ পর্যায়ের এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৩ ও ১৪ এপ্রিল ১৯৯৮ বাংলাদেশের সাতক্ষীরায়। ভারতীয় পক্ষে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা পুলিশ সুপার এবং উপ-পরিচালক (জরিপ) বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এতে বাংলাদেশ পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপার, মহা-পরিচালক (ভূমি জরিপ) এবং বিডিআরের কমান্ডিং অফিসার। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, উভয়পক্ষ এই এলাকায় একটি যৌথ জরিপ পরিচালনা করবেন। আরেক দফা বৈঠকের পর এটা শুরু হতে পারে। এদিকে ভারত দাবী করে বসে, 'নদী তীরবর্তী সীমান্ত পুনঃ নির্ধারিত হওয়া দরকার। সব মিলিয়ে নতুন জটিলতা ও ষড়যন্ত্র ঘণীভূত হয়ে উঠে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে।

চামড়া পাচার হয়েছে ভারতে

আওয়ামী শাসনামলে দেশের চামড়া শিল্প ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছে। পশুর চামড়া বাংলাদেশের রফতানি তালিকার অন্যতম একটি আইটেম। প্রতিবছর চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রফতানি করে বাংলাদেশ আয় করছে প্রায় এক হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা। ঈদুল আযহা চামড়া সংগ্রহের অন্যতম উৎস। কোরবানীকৃত পশুর চামড়া থেকে চাহিদার এক বিশাল অংশ এসে থাকে। সে হিসাবে কোরবানীর চামড়ার যথাযথ সংরক্ষণ ও বিপণন অপরিহার্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আওয়ামী শাসনের ৫ বছর দেশের চামড়া শিল্প অবহেলা ও অব্যবস্থার শিকার হয়। সাধারণত বাংলাদেশ থেকে ফিনিশড চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য বিদেশে রফতানি হয়ে থাকে। বাংলাদেশের পশুর চামড়ার গুণগত মান ভালো থাকায় আন্তর্জাতিক বাজারে এর চাহিদা ভালো। বলা যায়, চামড়া খাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পারে। কিন্তু আওয়ামী শাসনের প্রথম তিন বছরে যে অবস্থা চলেছে তাতে এ খাত মুখ থুবড়ে পড়তে শুরু করে। ৩ বছরে দেশের ট্যানারী ছিল ২৫০ টি। এর মধ্যে চালু ছিল মাত্র ৪০ টি। বাকী ২১০ টি নানাবিধ কারণে ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পুঁজি ও চলতি মূলধনের অভাবে ১৯৯৭ সাল থেকে এসব ট্যানারী বন্ধ হয়ে আছে। এর মধ্যে অধিকাংশ ব্যাংক ঋণ খেলাপীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। ১৯৯৯ সালের এপ্রিল পর্যন্ত চামড়া শিল্পে খেলাপী ঋণের পরিমাণ ১২ থেকে ১৩শ' কোটি টাকা ছিল। বিদ্যমান নাজুক পরিস্থিতির কারণেই এসব ঋণ আটকা পড়েছে। ক্রমাগত লোকশান গুণতে গুণতে চামড়া শিল্প-মালিক এবং ব্যবসায়ীরা অনেকেই হতাশ হয়ে ব্যবসা ছেড়ে দেন। আওয়ামী শাসনের প্রথম তিন বছরে কোরবানীর সময় চামড়া ক্রয় বাবদ ব্যবসায়ীদের ঋণদানের ক্ষেত্রে অবলম্বন করা হয় ঋণ সংকোচন নীতি। ফলে নগদ অর্থের অভাবে ব্যবসায়ীরা চামড়া ক্রয় করতে পারেনি। ১৯৯৯ সালে চামড়া বাজারে অস্বাভাবিক মন্দার কারণে ভারতে কোটি কোটি টাকার চামড়া পাচার হয়। এরপরও যা কিছু চামড়া পুঞ্জীভূত করা হয়েছিল তাও সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবসায়ীদের হতাশার কারণে নষ্ট হয়ে যায়। ওয়েট ব্লু চামড়া (আধাকাঁচা) রফতানি বন্ধের পর থেকে চামড়া শিল্পে ধস নামে। অন্যদিকে ভারত সে দেশে ওয়েট ব্লু চামড়া রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা না থাকায় একচেটিয়া বাজার দখল করে। এ অবস্থায় দেশের রফতানি বাণিজ্যের পাশাপাশি চামড়া শিল্পে নিয়োজিত বিপুলসংখ্যক কর্মচারী শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। আওয়ামী

www.pathagar.com

শাসনের প্রথম থেকেই চামড়া শিল্পে সংকট শুরু হয়। আওয়ামী ৫ বছরে যতই দিন গিয়েছে এ শিল্পে সংকট ততই বেড়েছে। সবদেশেই সংকট নিরসনের উদ্যোগ নেয়া হয়। আর বাংলাদেশে সংকট আরও দীর্ঘতর হয়। বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি দেশ যে কোন রফতানিকে উৎসাহিত করে। কিন্তু বাংলাদেশে বন্ধ করে দেয়া হয়। আগে ওয়েট ব্লু চামড়া ব্যবসায়ীরা রফতানি করতো। দেশের জন্যে অর্জিত হতো প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা। কিন্তু আওয়ামী সরকারের ভ্রান্ত-অস্থির চিত্র মতিগতির কারণে ওয়েট ব্লু চামড়া রফতানীর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। অথচ ভারত দেদারছে ওয়েট ব্লু চামড়া রফতানি করেছে। বাংলাদেশের নিষেধাজ্ঞা জারি করায় ভারত একচেটিয়াভাবে চামড়ার ব্যবসা করেছে। অথচ বাংলাদেশ ছিল চামড়া রফতানিকারক দেশ। চামড়া রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়, কিন্তু কেন? এ প্রশ্নের উত্তর রহস্যাতে ঘেরা ছিল। শোনা গিয়েছে, ভারতীয় মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীদের আবেদনের প্রেক্ষিতেই বাংলাদেশী কর্তাবাবুরা এহেন পদক্ষেপ নেয়। এজন্যে বিশেষ সমঝোতাও হয় খুবই গোপনে। মোটা অংকের বখশিশ দেয়া হয় একশ্রেণীর বাংলাদেশী কর্মকর্তাদের। বিনিময়ে দেশের চামড়া শিল্পকে বারোটা বাজানোর দায়িত্ব নেয় তারা। অর্থাৎ বন্ধু দেশ ভারতের ব্যবসায়ীরা যেন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কোন বাধার সম্মুখীন না হয়। ঈদুল আযহা উপলক্ষে মানুষ পশু কোরবানি করেন। লাখ লাখ চামড়া এ সময় বেচাকেনা হয়। অতীতে প্রায় প্রত্যেকটি সরকার চামড়া ব্যবসায়ীদের জন্যে বিশেষ ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করতেন। এর প্রধান কারণ দেশের চামড়া শিল্পকে বাঁচানো। যাতে করে চামড়া ব্যবসায়ী সঠিক মূল্যে চামড়া কিনতে সক্ষম হয় এবং তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। কিন্তু আওয়ামী সরকার ১৯৯৯ সালে রহস্যজনক কারণে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করেনি। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো চামড়া ব্যবসায়ীদের পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণ সরবরাহ না করায় তারা চামড়া ক্রয় করতে পারেনি। এই সুযোগে কতিপয় লোক অল্পমূল্যে চামড়া ক্রয় করে এক প্রকার বিনা বাধায় পাচার করে দিয়েছে ভারতে। পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা যায়, ভারতীয় চামড়া ব্যবসায়ীরা দেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় ঈদের কয়েক দিন আগে থেকেই অস্থায়ী আড়ত স্থাপন করে শ' শ' ট্রাক এনে রেখেছিল। তারা স্থানীয় এজেন্টদের দ্বারা নিম্ন দরে চামড়া ক্রয় করে ট্রাকে তুলে নিয়ে গেছে। অবশ্য ঘোষণা দেয়া হয়, ঋণ দেয়া হবে কিন্তু সেখানে এতই শর্ত আরোপ করা হয় যে, যার মর্মার্থ দাঁড়ায় 'বউ তোকে তালাক্ দেবো, সেটা কি পেটানো দেখে টের পাস না?' অথচ ঈদের আগে ব্যবসায়ীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন এফবিসিসিআই বিবৃতি দিয়ে সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছিল। বিবৃতিতে তারা বলেছিল, 'যদি ব্যবসায়ীরা সময়মত ঋণ না পান, তবে বিপুল পরিমাণ চামড়া বিদেশে পাচার হয়ে যাবে। দেশ বঞ্চিত হবে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় থেকে।' এছাড়া এফবিসিসিআই বাফার স্টকের মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে চামড়া ক্রয় করে এ সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু আওয়ামী সরকার এ বিষয়টিকে মালুমই করেননি। অর্থাৎ সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল মুখ টিপে হেসে বলতে চেয়েছেন, তারাতো এটাই চান। অর্থাৎ টাকা না দিলেই মন্দাভাব দেখা দেবে। চামড়া চলে যাবে ভারতের মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীদের হাতে। গোপন সমঝোতা তো রয়েছেই। দেশের রাজস্ব আয়ের বিষয়টি তো তাদের মাথায় থাকার কথা ছিল না। কেননা, তারা দেশের স্বার্থে চাকরি করেননি, তারা চাকরি করেছেন ব্যক্তিস্বার্থের জন্যে। চাকরির টাকা দিয়ে কি বাড়ি-গাড়ি আর বিলাসবহুল জীবন অতিবাহিত করা যায়? যায় না। কিন্তু কমিশনের টাকা দিয়ে কোটিপতি হওয়া যায়। একজন অবুঝ শিশুও বোঝে চামড়া

www.pathagar.com

রফতানি দেশের জন্যে কল্যাণকর কিন্তু আওয়ামী প্রশাসনযন্ত্র এটা বোঝে নি, একথা ভাবার কোন অবকাশ নেই। অথচ ওয়েট ব্লু চামড়া রফতানি নিষেধাজ্ঞা জারি করায় কর্মকর্তারা কি ক্ষতিই না করেছে। ওয়েট ব্লু চামড়া রফতানি বন্ধ ঘোষণার পর থেকেই বিদেশীদের চাহিদা কমে যায় ক্রমেই। আগে ঈদপূর্ব ও পরবর্তী সময়ে শ' শ' বায়ার ঢাকার হাজারীবাগ এলাকায় ভিড় জমাতো। ১৯৯৯ সালে দু'চারজন দেখা পাওয়াও দুস্কর ছিল। কয়েকটি দেশ চাহিদা জানিয়ে হাতে গোনা কয়েকটি ট্যানারির সাথে যোগাযোগ করেছে। কেবল ঐ ট্যানারিগুলোতেই চামড়া ফিনিসড, কালার ও মানসম্মত প্রক্রিয়াজাত হয়ে থাকে। তবে তারা সীমিত চাহিদাই পূরণ করতে পারে। ট্যানারি মালিকরা কোরবানি ঈদ মওসুমে অন্তত ওয়েট ব্লু চামড়া রফতানি করার সরকারি ঘোষণার দাবী করে এসেছে। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের এ দাবি মেনে নেয়ার কোন লক্ষণ বা আলামত দেখা যায়নি। প্রশাসন একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সুবিধা দেখতেই ব্যস্ত ছিল। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। সীমান্তবর্তী জেলাগুলো থেকে শতকরা ১০ ভাগ চামড়াও ঢাকায় আসেনি, সেগুলো সীমান্ত পথে ভারতে পাচার হয়েছে। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ঈদের অনেক আগেই এদেশীয় এজেন্টদের প্রচুর টাকা অগ্রিম দিয়ে রেখেছিল। তারা চামড়া কিনে অনায়াসেই ওপারে পাঠাতে সক্ষম হয়। আর বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের অবস্থা তথৈবচ। তাদের এজেন্টরা বিভিন্ন জেলায় গিয়ে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে চামড়া কিনতে পারেনি। ফলে মফস্বল এলাকায় চামড়ার দাম ছিল অসম্ভব কম। ঢাকা মহানগরীতে বড় সাইজের একটি গরুর চামড়া বিক্রি হয় ৭শ' থেকে ৮শ' ৫০ টাকা, অথচ ময়মনসিংহের গ্রামে একই মাপের চামড়াটি মাত্র সাড়ে ৪শ' থেকে ৫শ' টাকায় বিক্রি হয়। সারাদেশে কোরবানীর পশুর চামড়া নামমাত্র মূল্যে বিক্রি হয়। একই সাথে বিপুল পরিমাণ চামড়া ভারতে পাচার হয়ে গেছে। দেশের উত্তরাঞ্চলের ১০ টি জেলা থেকে প্রায় ৫০ কোটি টাকার চামড়া ভারতে পাচার হয়। দেশের অন্যান্য সীমান্তবর্তী জেলাসমূহ থেকেও বিপুল পরিমাণ চামড়া ভারতে পাচার হয়। ক্ষেত্রে ভেদে প্রতিটি গরুর চামড়া বিক্রি হয় ৩শ' থেকে ৭শ' টাকা এবং খাসীর চামড়া বিক্রি হয় ৮০ থেকে ১শ' টাকায়। চামড়া শিল্পে ধসের আলামত নিয়ে সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের কোন মাথা ব্যথা ছিলনা। তারা ঈদের আগে চামড়া ব্যবসায়ীদেরকে সহযোগিতা করেনি।

নেপালে পণ্য রফতানীর পথে ভারতীয় প্রতিবন্ধকতা

ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব জোরদার করার নামে বাংলাদেশের ওপর ভারতীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে ওকালতি করার মতো রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীর অভাব আওয়ামী আমলে বাংলাদেশে ছিল না। তাত্ত্বিক অনেক কথাই তারা বলেছেন, সুযোগ পেলেই এনেছেন মুক্ত বাজার অর্থনীতি এবং ইউরোপের দেশগুলোর প্রসঙ্গ। কিন্তু অত্যাবশ্যকীয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যান, তাহলো, বন্ধুত্ব বা সুসম্পর্ক কখনো এক পাক্ষিক হতে পারে না। দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও বিকশিত করতে চাইলে প্রয়োজন দ্বিপাক্ষিক উদ্যোগ এবং পরস্পরের প্রতি সমান মর্যাদার ভিত্তিতে ভদ্র আচরণ। ভারত প্রসঙ্গে আওয়ামী শাসনে আরো একবার একথা বলার সময়ে আসে এই কারণে, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যেভাবেই বন্ধুত্বের হাত বাড়ানো হোক না কেন, ভারত সব সময় ব্যস্ত থেকেছে শুধু নিজের স্বার্থোদ্ধারের জন্য। এই লক্ষ্য নিয়ে ভারত পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের পণ্য বাজারের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে বাধাগ্রস্ত ও

www.pathagar.com

ক্ষতিগ্রস্ত করার পদক্ষেপ নিয়েছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের এই প্রচেষ্টা ও পদক্ষেপ আওয়ামী শাসনামলে জোরালোভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ৪ মার্চ ১৯৯৯ দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, 'বাংলাদেশ থেকে নেপালে পণ্য রফতানীর পথে ভারত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে এবং এর ফলে বাংলাদেশের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নেপালে সার রফতানি করতে পারেনি। জানা গেছে, ঐ প্রতিষ্ঠানটি নেপালের সঙ্গে ৬ হাজার টন সার রফতানির ব্যাপারে চুক্তি সম্পাদন করাসহ সকল আয়োজন সম্পন্ন করার পর একেবারে শেষ মুহূর্তে ভারত তার মধ্যে দিয়ে নেপালকে ট্রানজিট দিতে অস্বীকার করে। ঐ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিষয়টি সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হলেও সরকার কোনো কূটনৈতিক উদ্যোগ নেয়নি। সে কারণে শুধু একটি রফতানি প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়নি, একই সঙ্গে দেশের মোট রফতানির ক্ষেত্রে ঘাটতি ও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কেননা চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশ যে, ৩০ হাজার টন ইউরিয়া সার রফতানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল, নেপালের জন্য সংরক্ষিত ৬ হাজার টন তার অন্তরর্ভুক্ত। অর্থাৎ চলতি অর্থ বছরে দেশ থেকে রফতানি হবে ২৪ হাজার টন সার। অন্যদিকে বিসিআইসি ২৪ হাজার ২৬০ টন সার রফতানির হিসাব দিলেও প্রকৃতপক্ষে সারের রফতানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৮ হাজার ২৬০ টন।' প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয়, 'ভারতের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করার পরিবর্তে বাংলাদেশ সরকার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটিকে অভ্যন্তরীণ বাজারে উক্ত ৬ হাজার টন সার বিক্রির অনুমতি দিয়েছে।' সরকারের এই পদক্ষেপে প্রতিষ্ঠানটি কতটুকু উপকৃত হবে-সেকথা জানা না গেলেও বৈদেশিক মুদ্রার আয়সহ রফতানি খাতে বাংলাদেশকে যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে বলে সংবাদে জানানো হয়। নেপালে সার রফতানীর ক্ষেত্রে বাধা দেয়ার মধ্য দিয়ে সকল বিচারেই ভারত মারাত্মক অন্যায় করেছে এবং নিন্দনীয়ভাবে অবন্ধুসুলভ মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছে। এই মনোভাবের ফলে বাংলাদেশের পাশাপাশি আরেক প্রতিবেশী নেপালও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সমভাবে। আওয়ামী সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে নানামুখী পদক্ষেপ নেয়া হয়, সম্পাদিত হয় বেশ কয়েকটি বিতর্কিত সমঝোতা চুক্তি। এরকম একটি পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৯৮ সালের প্রথম দিকে বাংলাদেশের বাংলা বান্দা থেকে ভারতের কাকরভিটা পর্যন্ত ৪৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ট্রানজিট রুট চালু করা করা হয়েছিল। এই ট্রানজিট রুটের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতীয় প্রতিনিধিও অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু দু'একদিনে কয়েকটি মাত্র যানবাহন চলাচলের পরই ভারতের পক্ষ থেকে অঘোষিতভাবে ট্রানজিট রুটটি বন্ধ করে দেয়া হয়। সার রফতানীর ক্ষেত্রে বাধা দেয়ার মধ্য দিয়ে আরো একবার ভারতের সেই একই মনোভাবের প্রকাশ ঘটে।

চুক্তি অনুযায়ী পানি আসেনি

জনমতকে উপেক্ষা করে এবং জাতীয় সংসদকে সম্পূর্ণরূপে পাশ কাটিয়ে ভারতের সঙ্গে ৩০ বছর মেয়াদী পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরের পর আওয়ামী সরকার দেশবাসীকে আশ্বাসের অনেক বাণী শুনিয়েছিল। অসম এবং বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী এই পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টিকে আজো পর্যন্ত আওয়ামীরা এক সাফল্য হিসেবে উপস্থাপন করে। আওয়ামী নেতৃবৃন্দ সুযোগ পেলে এখনো দেশবাসীকে এমনভাবেই আশ্বস্ত করে, যেন ঐ চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ

www.pathagar.com

উপকৃত হয়েছে এবং নিয়মিত পানি পাচ্ছে চুক্তির শর্তানুসারে। আওয়ামীদের নানামুখী দাবী ও প্রচারণা সত্ত্বেও বাস্তব পরিস্থিতি কিন্তু বিপরীত চিত্র তুলে ধরে। যে কোনো সময়ের পর্যালোচনা এই অভিযোগের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করে যে, স্বাক্ষরিত হওয়ার পর প্রথম থেকেই ভারত বাংলাদেশকে বঞ্চিত রেখেছে এবং কখনো শর্তানুসারে প্রাপ্য পানি বাংলাদেশ পায়নি। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পরিবর্তে চুক্তি পরবর্তী প্রথম বছর অর্থাৎ ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসের পরিসংখ্যান উল্লেখ করলে দেখা যাবে, সে মাসের ১০ দিনের প্রথম ও দ্বিতীয় চক্রে বাংলাদেশের প্রাপ্য যেখানে ছিল ৩৫ হাজার কিউসেক, ভারত সেখানে দিয়েছিল ২১ হাজার কিউসেক করে। শুধু তাই নয়, সর্বনিম্ন পরিমাণ পানিপ্রাপ্তির রেকর্ডও স্থাপিত হয়েছিল সে সময়। ২৭ মার্চ ভারত দিয়েছিল মাত্র ৬ হাজার ৪৫৭ কিউসেক পানি, যেখানে বাংলাদেশের প্রাপ্য ছিল গড়ে ২৯ হাজার ৬৮৮ কিউসেক। এত কম পানি বাংলাদেশ আগে আর কখনো পায়নি। দ্বিতীয় বছরে মোটামুটিভাবে পানি পাওয়া গেলেও তৃতীয় বছরের প্রথম ভাগেই ভারত আবারও চুক্তিভঙ্গ করতে শুরু করে। ভারতের কারণে ১৯৯৯ সালের শুকনো মৌসুমে পদ্মায় পানি ছিল না এবং আগের বছরের তুলনায় মাত্র দুই/তৃতীয়াংশ পানি পায় বাংলাদেশ। পানিবন্টন চুক্তিতে মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত শুকনো মৌসুমের সময়কে 'টপ পিরিয়ড' হিসেবে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হলেও ১ এপ্রিল ১৯৯৯ থেকে আরো একবার শুরু হয় ভারতের প্রতারণা। চুক্তির শর্তানুসারে ১ মার্চ থেকে ১০ মে পর্যন্ত ১০ দিনের প্রতিটি চক্রে বাংলাদেশের যেখানে ৩৫ হাজার কিউসেক হিসেবে পানি পাওয়ার কথা, ১ এপ্রিল সেখানে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে পানি প্রবাহ ছিল ৩৩ হাজার কিউসেকের মতো। ৩ এপ্রিল একই পয়েন্টে পানিপ্রবাহ রেকর্ড করা হয় ৩২ হাজার ৮৩৩ কিউসেক, যা চুক্তির চাইতে ২ হাজার ১৬৭ কিউসেক কম। অথচ ১৯৯৮ সালে একই দিনে ঐ পয়েন্টে পানি প্রবাহের পরিমাণ ছিল ৪৬ হাজার ৯৬০ কিউসেক এবং সে হিসেবে ১৯৯৯ সালে পানিপ্রবাহ কমেছে ১১ হাজার ১২৭ কিউসেক। পানি বন্টন চুক্তিতে বলা হয়, 'ফারাক্কা পয়েন্টে কোনো কারণে পানির পরিমাণ হ্রাস পেলেও বাংলাদেশ ১০ দিনের প্রতিটি চক্রের প্রতিদিন অন্তত ৩৫ হাজার কিউসেক পানি পাবে।' কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ভারত প্রথম থেকেই বাংলাদেশকে পানি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত রেখেছে এবং আওয়ামী শাসনে ভারতের নীতি বাংলাদেশের সামনে ভয়াবহ পরিস্থিতিকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। যৌথ নদী কমিশনের সনদ অনুসারে প্রতিবছর দু'বার মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত বিগত প্রায় পৌণে দু'বছরে একটিও বৈঠক হয়নি। দীর্ঘ বিরতির পর ৯-১০ এপ্রিল ১৯৯৯ ভারতের রাজধানীতে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক আয়োজন করা হয়। এ ধরনের বৈঠকের প্রাক্কালে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে ভারত সাধারণত আকস্মিকভাবে পানি প্রবাহ বাড়িয়ে দেয় এবং বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর আবার যথারীতি তা কমিয়ে দেয়। বন্ধুত্বের আড়ালে ভারতের প্রতারণাপূর্ণ পানি বন্টন নীতি বাংলাদেশের সর্বনাশ ঘটিয়ে চলেছে এবং বাংলাদেশকে ৩০ বছর মেয়াদী চুক্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করার পর ভারতের বঞ্চনামুখী তৎপরতা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠেছে।

ভারতীয় অবৈধ অস্ত্র

ভারত বাংলাদেশে অবাধে অবৈধ অস্ত্র প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। সীমান্তের ওপার ভারত থেকে চোরাপথে শুধু কাপড়, আলু, চিনি, লবণ, প্রসাধন সামগ্রী, সিঙ্গল সুপার ফসফেটই

www.pathagar.com

আসেনি, অন্যান্য পণ্যের পাশাপাশি এসেছে বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র। উত্তরাঞ্চলের চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে কুড়িগ্রাম পর্যন্ত যে সীমান্ত এলাকা রয়েছে তার প্রায় পুরোটাই খোলা থাকার কারণে চোরাপাথে ভারতীয় পণ্য আনার বিষয়টি ১৯৯৭ সালে তেমন গোপন কোনো বিষয় ছিল না। চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ, হিলি, বিরল, আর বুড়িমারীর মতো এ অঞ্চলে যেসব স্থলবন্দর রয়েছে, সে দিক দিয়ে গোপনে বা প্রকাশ্যে ভারতীয় পণ্য আনার বিষয়টি যেমন সবার নজরে পড়েছে, তেমনি আবার রাতের আঁধারে অনেক এলাকা দিয়ে সুযোগ বুঝে অন্যান্য পণ্যের সাথে আনা হয় ভারতে তৈরি ২২ বোর, ২৩ বোর, ২৫ বোরসহ নানা বোরের পিস্তল। এসব পিস্তলের দাম, মান ও সৌন্দর্যভেদে সীমা রাখা হয় ৪ হাজার থেকে ১৫ হাজার পর্যন্ত। ভারত থেকে পিস্তলসহ নানা ধরনের যেসব আগ্নেয়াস্ত্র এসেছে তা এনেছে বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষ। তবে এ বিষয়টি ঠিক পিস্তল বা অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র, লবণ, চিনির মতো আসেনি। যারা এসব এনেছে তাদের অধিকাংশই প্রকৃত অর্থে চোরাকারবারী নয়। সীমান্তের ওপার থেকে যারা আগ্নেয়াস্ত্র বাংলাদেশে সরবরাহ করেছে, তারা চোরাকারবারী হলেও এদেশে যারা কিনেছে তাদের অনেকেই এসব অস্ত্র ব্যবহার করেছে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার পাশাপাশি ডাকাতি, খুনসহ নানা ধরনের সহিংস ঘটনা ঘটানোর জন্য। ১৯৯৭ সালে শেষ দুই মাসের মধ্যে জয়পুরহাটে মোটর সাইকেল আরোহী এক ব্যক্তিকে খুব কাছ থেকে যে পিস্তল দিয়ে গুলি করা হয়, তা ছিল ভারতের তৈরি। এ বিষয়টি বাংলাদেশ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বাহিনীর সদস্যরা প্রায় নিশ্চিত হয়েছেন যে, বাংলাদেশে যেসব আগ্নেয়াস্ত্র এসেছে তা রাষ্ট্রীয়ভাবে তৈরি করা সম্ভব নয়। সম্ভবত এসব তৈরি হয় সে দেশের ছোটখাট ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপগুলোতে। আগেও ভারত থেকে নানা ধরনের অস্ত্র আসতো, তবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে তা এসেছে ব্যাপকহারে। ভারতের তৈরি এসব আগ্নেয়াস্ত্রের গায়ে বড় অক্ষর দিয়ে লেখা ছিল 'মেইড ইন চায়না' কিন্তু এই শব্দগুলোর অধিকাংশেরই বানান ভুল। এতে করে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, ঐসব অস্ত্র চীনে তৈরি হয়নি। ১৯৯৭ সালে সীমান্তবর্তী জেলা জয়পুরহাটে এ ধরনের একটি পিস্তল পাওয়া গেছে যাতে লেখা 'মেইড ইন চায়না' কিন্তু বানান ভুল। সীমান্ত সংলগ্ন অন্যান্য জেলাগুলোতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন যেসব অস্ত্র উদ্ধার করতে পেরেছে, তার অনেকই যেমন দেশে তৈরি, তেমনি অনেকই আবার এসেছে সীমান্তের ওপার ভারত থেকে। স্থলবন্দর হিলির কাছাকাছি আটাপাড়া এবং আশপাশের অন্যান্য এলাকার বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি যেসব ঘরবাড়ি রয়েছে, তার অনেকেই কাজে লাগানো হয় হেরোইন, ফেনসিডিল, আগ্নেয়াস্ত্রসহ চোরাপথে আসা নানা ধরনের পণ্য বেচাকেনার জন্য। এসব ঘরবাড়ি দিনের অধিকাংশ সময়ই বন্ধ থাকে, তেমন কোন লোকজন থাকে না। যে দু'চারটি ঘরবাড়িতে মানুষ বসবাস করে তারা এ ধরনের পণ্য বেচাকেনার সাথে সরাসরি জড়িত নয়। ঐ এলাকায় যেসব যুবক রয়েছে তাদের অনেকেই ফেনসিডিল, হেরোইনসহ নানা ধরনের মাদকদ্রব্যে আসক্ত হবার কারণে নানা ধরনের অসুখে ভুগেছে। অনেককে দেখলে মনে হয়েছে জীবন্ত কঙ্কাল। চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে কুড়িগ্রাম পর্যন্ত সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় চোরাই পণ্য কেনাবেচার জন্য ছোটবড় যেসব বাজার গড়ে উঠে তার অনেকই বাংলাদেশ রাইফেলস ও পুলিশ ফাঁড়ি সংলগ্ন ছিল। এসব বাজারে নানা ধরনের পণ্য বেচাকেনা হলেও সাধারণত ফেনসিডিল, হেরোইন, অস্ত্র ও মানুষ বেচাকেনার কাজটি হয় বিশেষ বিশেষ এলাকায় রাতের আঁধারে। অপরদিকে আন্দামান থেকে কক্সবাজার সীমান্ত পথে অবৈধ অস্ত্র বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এক্ষেত্রে

www.pathagar.com

অস্ত্রের চালান নিয়ে আসা জাহাজকে ভারত বাধা দেয়নি। ভারতীয় ম্যাগাজিন 'আউটলুক'-এর ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও সরকার বাংলাদেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের শক্তিশালী করে তোলার জন্য এই অস্ত্র পাঠায়। আউটলুক-এর রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায়, ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তার অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিরক্ষা বাহিনীকে বলেছে আন্দামান সাগর দিয়ে অস্ত্রের চালান নিয়ে যেসব জাহাজ কক্সবাজার যায় সেগুলো যেনো এড়িয়ে যাওয়া হয়। কক্সবাজার দিয়ে যেসব অবৈধ অস্ত্র বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে অত্যাধুনিক একে সিরিজের রাইফেলসমূহ, রকেট প্রপেল্ড, গ্রেনেডসমূহ, নাইটভিশন ফিটেড রাইফেলসমূহ এবং অন্যান্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ। আউটলুক এ সম্পর্কে ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সার্কুলারও প্রকাশ করে। নয়াদিল্লীর সাউথ ব্লক থেকে ২৭ জুলাই ১৯৯৮ তারিখে সার্কুলারটি জারি করেন ভারতীয় প্রতিরক্ষা সচিব অজিত কুমার। সার্কুলারে বলা হয়, 'প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন সার্ভিসের সদর দফতরসমূহ সময় সময় সুনির্দিষ্ট খবর পেয়ে থাকে যে, আন্দামান সাগর থেকে কক্সবাজার অভিমুখে অস্ত্র ও গোলাবারুদ বহনকারী বিভিন্ন জাহাজ যায়। এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বাহিনীগুলোকে পরামর্শ দেয়া হয় যে, অস্ত্র বহনকারী জাহাজের তৎপরতা বন্ধে যেনো হস্তক্ষেপ না করা হয় এবং সরকারের অনুমতি ছাড়া কোন অভিযানও যেনো চালানো না হয়। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ সার্কুলার এবং আউটলুক-এর রিপোর্ট অনুযায়ী এটা পরিষ্কার যে, বাংলাদেশে অবৈধ অস্ত্রের চালান এসেছে। এই অস্ত্র কারা এনেছে কিংবা বাংলাদেশের কোন কোন এলাকায় যায় সে সম্পর্কে রিপোর্টে কিছু ছিল না। এ ব্যাপারে ২ মার্চ ১৯৯৯ দৈনিক দিনকালের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র সচিব সফিউর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এ বিষয়টি তার জানার কথা নয়, এটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ার। বিষয়টি সম্পর্কে প্রতিরক্ষা সচিবের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য যোগাযোগ করে তাকে পাওয়া যায়নি। 'আউটলুক'-এর রিপোর্ট সম্পর্কে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকেও কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। এ খবরে দেশের রাজনৈতিক ও বিশেষজ্ঞ মহল উদ্যোগ প্রকাশ করেন। বিশেষজ্ঞ মহলের মতামত ছিল, 'বাংলাদেশকে নিয়ে দেশে-বিদেশ যে সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত হচ্ছে, এটা তারই অংশ। বাংলাদেশে বিভিন্ন নাশকতামূলক তৎপরতা চালানোর জন্যেই নানাভাবে এসব অস্ত্র আসছে। এসব অস্ত্র যাচ্ছে বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রুপের হাতে। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার মতে, এটা পরিস্কার বাংলাদেশে যে অস্ত্র আসছে, সেটা ভারত সরকারের নজরে আছে। এসব অস্ত্রের চালান যাতে আটকানো না হয় সে জন্য সে দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বাহিনীসমূহকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যেই এসব অস্ত্র দেশে আসছে। বাংলাদেশ অস্থিতিশীল থাকলে এদেশে বিদেশী বিনিয়োগ আসবে না, এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা গড়ে উঠবে না। ফলে বাংলাদেশ চিরদিনের জন্য ভারতের বিরাট বাজার হিসেবেই থাকবে।' (সূত্রঃ দৈনিক সংবাদ ১৫ নভেম্বর ১৯৯৭ ও দৈনিক দিনকাল ৩ মার্চ ১৯৯৯)

ভারতে বাংলাদেশী বিমান হাইজ্যাকের কথিত চক্রান্ত

১১ জানুয়ারি ২০০০ সকালে বাংলাদেশ বিমানের এয়ার বাস কলকতা থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার প্রাক্কালে ভারত সরকার এগারো ব্যক্তিকে বিমানে আরোহণ করতে বাধা দেয়।

www.pathagar.com

জিজ্ঞাসাবাদের নামে তাদেরকে অন্তরীণ করে রাখা হয়। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বলে, 'ভারতের অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা সেন্ট্রাল ব্যুরো ফর ইনবেস্টিগেশনের (সিবিআই) গোপন রিপোর্টে জানানো হয়েছে, 'শেখ মুজিব হত্যাকান্ডের যেসব আসামী এখন কারাগারে, তাদের মুক্তির দাবীতে বাংলাদেশের বিমানকে ছিনতাই করার চেষ্টা চালানো হবে।' সাথে সাথে এ খবর ফলাও করে দেয় ভারত সরকারের উর্ধতন কর্মকর্তারা। বিবিসির বরাত দিয়ে ১২ জানুয়ারি ঢাকা একটি ইংরেজি পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদে বলা হয়, 'কলকাতায় কর্মরত ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের কাছে একটি সুনির্দিষ্ট খবর রয়েছে। খবরটি হলো যে একটি আন্তর্জাতিক চক্র বাংলাদেশ বিমান হাইজ্যাক করার ষড়যন্ত্র করছে। হাইজ্যাক ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য হলো শেখ মুজিবুর রহমানকে খুনের অভিযোগে নিম্ন আদালত কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মুক্ত করা। খবরের স্বপক্ষে বিবিসি সিবিআইর একজন যুগ্ম সচিবের বরাত দেয়, কিন্তু সে যুগ্ম সচিবের নাম উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকে। খবরে বলা হয় যে, ১১ জানুয়ারি মঙ্গলবার ঢাকাগামী বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট বিজি ০৯২ থেকে ১১ যাত্রীকে বিমানে আরোহণ থেকে বিরত রাখা হয়। এই বিমানটি ছিল এয়ারবাস-৩১০। বিমানটি কলকাতা থেকে ঢাকা আসছিল। খবরে বলা হয়, যে ১১ ব্যক্তিকে আটক করা হয় তারা সকলেই ছিলেন ইরানী পাসপোর্টধারী। কিন্তু আসলে তারা সকলেই আফগান। অনেকদিন আগে তারা ইরানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। এই ১১ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। উক্ত বেনামী জয়েন্ট সেক্রেটারীর বরাত দিয়ে বলা হয়, বিমানটি হাইজ্যাক করা হতো ভারতের আকাশে। উদ্দেশ্য ছিল ভারত ও বাংলাদেশের বন্ধুত্ব সম্পর্ক বিনষ্ট করা। বিবিসির ঐ খবরে কলকাতায় কর্মরত বাংলাদেশ বিমানের স্টেশন ম্যানেজার জনাব মোহাম্মদ শাহজাহানের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়। জনাব শাহজাহান বিবিসিকে বলেছেন যে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট ছিনতাই করার সম্ভাবনা সম্পর্কে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাকে পূর্বাহ্নেই সতর্ক করে দিয়েছেন। ঢাকার এই ইংরেজি পত্রিকাটির রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, তারা ঢাকাস্থ বাংলাদেশ বিমানের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করলে তারা কোন রকম মন্তব্য করতে অস্বীকার করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। পরদিন ১৩ জানুয়ারি আলোচ্য ইংরেজি পত্রিকাটিসহ ঢাকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে খবর প্রকাশিত হয় যে, বাংলাদেশের সমস্ত বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সূত্র সমূহ বলেন যে কলকাতা বিমান বন্দরে বিমান ছিনতাই সতর্কতার পর এই কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কোন কোন পত্রিকায় এমন খবরও প্রকাশিত হয়েছে যে শুধুমাত্র জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্যই সেনাবাহিনীর ১৫০ জন কমান্ডো মোতায়েন করা হয়েছে। শুধু ঢাকা বিমান বন্দরেই নয়, দেশের সমস্ত বিমান বন্দরেই নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে কঠোরতর করা হয়েছে। বেসামরিক বিমান পরিবহন কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ বিমান কর্মচারীগণকে ব্যাচ পরতে এবং পরিচয়পত্র সাথে রাখতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশ বিমান কর্তৃপক্ষ যখন সাজ সাজ রব তুলেছেন তখন ২৪ ঘন্টা পর আটক ঐ ১১ জন যাত্রীকে ছেড়ে দেয়া হয়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বলেছে যে, তাদের পাসপোর্ট এবং ভিসা সম্পূর্ণ বৈধ। তবে আটকদের মুক্তির দিন বিবিসির সম্প্রচারে অকস্মাৎ ডিগবাজী মারা হয়। রাত ১০টার সম্প্রচারে বলা হয় যে ঐ ১১ জনের কেউ কেউ ছিল ইরানী পাসপোর্ট ধারী। আর অবশিষ্টরা ছিলেন ইসরাইলী পাসপোর্টধারী। তবে বিবিসির বক্তব্যে একটি লেজ লাগিয়ে বলা হয় যে, এরা ইসরাইলী ও ইরানী পাসপোর্ট ধারী হলেও তারা মূলত সকলেই আফগান।

www.pathagar.com

বিবিসির ঐ খবরে বলা হয়, যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ১১ জন যাত্রীকে বাংলাদেশ বিমান যোগে ঢাকায় নিয়ে যেতে বলেছে, কারণ তাদের সকলের কাছেই বাংলাদেশ বিমানের টিকেট আছে। ১৩ জানুয়ারি আলোচ্য ইংরেজি দৈনিকের খবরে বলা হয় যে, ঐ ১১ জন যাত্রীকে বিমানে করে ঢাকায় আনা হবে কিনা সে ব্যাপারে বিমান কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ তারা এ ব্যাপারে ঢাকা বা দিল্লী কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে কোন পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পায়নি। এ ছাড়া বিমান তাদের সঠিক পরিচয়ও জানতে পারেনি। ১৩ তারিখের রিপোর্টে বলা হয় যে, ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব ইজতেমায় অংশ নেওয়ার জন্য ঐ ১১ ব্যক্তি ঢাকায় আসছিলেন। ঢাকা আগমনের প্রয়োজনীয় অনুমতিও পেয়েছিলেন। ঐদিনের রিপোর্টে বলা হয় যে, তাদের সকলের ছিল ইসরাইলী পাসপোর্ট। তারা সকলে ইসরাইলে বসবাসরত ফিলিস্তিনী অধিবাসী। বিবিসির সন্ধ্যাকালীন অনুষ্ঠানে আবার একটি চমক দেওয়া খবর মধ্যে ৩ বার বদল হয়েছে। ভারতের মাটিতে বাংলাদেশী বিমান হাইজ্যাকের কথিত চক্রান্ত নিয়ে সে দেশের সরকারের তোলপাড় কান্ড 'মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ' প্রবচনটি স্মরণ করিয়ে দেয়। অথচ বিস্তর ঢাকাঢোল পেটানোর পরও প্রমাণিত হয় যে, এ ব্যাপারে ভারত সরকারের প্রচারণা ভিত্তিহীন। ঘটনার পরদিন কলকাতাস্থ বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনারকে এ বিষয়ে বার্তা সংস্থা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'আজ সংবাদপত্র পড়ে এটা জানতে পারলাম।' এদিকে এমন একটি মারাত্মক ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও ঢাকায় বাংলাদেশ বিমানের কর্মকর্তারা সাংবাদিকদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়েও নিশ্চুপ থাকেন রহস্যজনকভাবে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, সিবিআইর মতো গোয়েন্দা সংস্থা থেকে বিমান হাইজ্যাক প্রয়াসের খবর পেয়ে ১১ জন বিদেশীকে আটক করার খবর কেন কলকাতার ডেপুটি হাইকমিশনে জানানো হলো না সাথে সাথে? অথচ ঐ শহরেই ঘটনাটি ঘটেছে। এই প্রেক্ষাপটে জনগণ মনে করেছে, বিমান হাইজ্যাকের সম্ভাবনার খবর প্রচারের পেছনে ভারতের রয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য। হাইজ্যাকের আশংকা যদি সত্যিই হতো, কলকাতাস্থ ডেপুটি হাইকমিশন সে খবর পেতো অবশ্যই। এদিকে ঐ ১১ জন যাত্রীকে একদিন না যেতেই ভারত সরকার ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কারণ তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। বিমান হাইজ্যাকের কথিত চক্রান্তের সাথে তাদের যোগসাজশের মিলেনি কোন প্রমাণ। এরপরও তারা বাংলাদেশে ঢুকতে ব্যর্থ হন। তাবলীগের বিশ্ব ইজতেমায় যোগ দেয়ার জন্য সুদূর ইসরাইল থেকে এদেশের একেবারে কাছে এলেও তাদেরকে ফিরে যেতে হয়। কারণ, ঢাকা থেকে বাংলাদেশ সরকার কলকাতায় ডেপুটি হাইকমিশনারকে নির্দেশ দেয় তাদের ভিসা বাতিল করার জন্য। তারা আরব বলে জানানো হলেও ঢাকায় কর্তৃপক্ষ মনে করেন তারা আফগান। তাই ঢাকাগামী বিমানে উঠা সত্ত্বেও তাদেরকে নামিয়ে দেয়া হয় জোর করে। বাংলাদেশ বিমানের ঐ ফ্লাইটের যাত্রীরা ঢাকায় এসে জানান, 'উল্লেখিত ১১ জনের ব্যাপারে ভারতের সন্দেহ মিথ্যা প্রমাণিত হবার পরও বিমানের সাধারণ যাত্রীদেরকে চেক করার নামে হেনস্থা করা হয়েছে। এই অবাঞ্ছিত দুর্ভোগ ঘটেছে কলকাতায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে।' সেদিন ভারতের সরকারি সূত্র প্রচার করে যে, অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ফোনে হুমকি দিয়ে কলকাতা বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষকে বলেছে, 'এই ১১ জনকে মুক্তি দেয়া না হলে বাংলাদেশের বিমান হাইজ্যাক করা হবে।' এ জন্যই নাকি নিরাপত্তার স্বার্থে ঢাকাগামী যাত্রীদের চেক করা হয় কঠোরতার সাথে। লক্ষ্যণীয়, কথিত বিমান হাইজ্যাকের কারণ হিসেবে পূর্বে বলা হয় মুজিব হত্যার আসামীদের মুক্তি আদায়, আর একদিন না যেতেই বলা হয় ১১ জনের মুক্তির কথা। এই ১১ জন যাত্রীর পরিচয় নিয়েও নানা কথা বলা হয়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ প্রথমে জানায়, তারা

www.pathagar.com

আফগান যদিও তাদের কাছে রয়েছে ইরানী পাসপোর্ট। বিবিসি একথা যথারীতি প্রচারও করে। এরপর ভারত সরকারই বলে, তারা ইসরাইলের পাসপোর্টধারী এবং আসলে এরা আরব। ভারতীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা জানায়, ওরা ১১ জন কেবল হিব্রু ভাষায় কথা বলে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের একেক সময় একেক কথা নিয়ে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। ঐ যাত্রীদের কাছে কোন দেশের পাসপোর্ট রয়েছে তা জানা মোটেও কঠিন ছিল না। তারা যদি ইসরাইলী নাগরিক হয়ে থাকে তাহলে কেন শুরুতে তাদের সাথে ইরানকে জড়ানোর চেষ্টা করা হলো? তদুপরি কী কারণে বলা হলো যে, তারা আসলে আফগান! অবশেষে ইসরাইলী আরব হিসেবে উক্ত ১১ জনকে চিহ্নিত করা হলেও বলা হয় তারা আরবী নয়, শুধু হিব্রু ভাষায় কথা বলতে পারে। কিন্তু কোন আরব কেবল ইহুদীদের ধর্মীয় ঐতিহ্যবাহী ভাষা হিব্রু জানে এবং মাতৃভাষা আরবী জানে না-এটাও কি বিশ্বাসযোগ্য? এমন বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদানের পেছনে মতলবটা কী ছিল তা আজো জানা যায়নি? পর্যবেক্ষকগণ মনে করেছেন, 'ভারত সরকার একটি কৃত্রিম ট্র্যাজেডি বানাতে গিয়ে বাস্তবে প্রহসনের জন্ম দিয়েছে। এসব আবোল-তাবোল ও আজগুবি কথাবার্তা তারই প্রমাণ।' তবে কিছু গুরুত্ব ব্যাপারও লক্ষ্যণীয় ছিল। যেমন সন্দেহভাজন এই ১১ জন যাত্রীকে প্রথমে আফগান হিসেবে প্রচার করার পেছনে বিশেষ উদ্দেশ্য থাকা বিচিত্র নয়। তাহলো, 'মৌলবাদী' তালেবান শাসিত এবং ওসামা বিন লাদেনের সমর্থক আফগানিস্তানের লোক বলে দেখাতে পারলে সহজেই তাদেরকে সন্ত্রাসী বলে তুলে ধরা সম্ভব হবে-এমন ধারণাই দিল্লী সরকারের ছিল। সিবিআই নাকি নিশ্চিত ছিল যে, তারা আফগানী। পরে প্রমাণিত হয়েছে তাদের এই তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাহলে উক্ত গোয়েন্দা সংস্থা প্রদত্ত বিমান হাইজ্যাকের ষড়যন্ত্রের খবর কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য? সচেতন দেশবাসী লক্ষ্য করেছে, ভারত বাংলাদেশের বিমান হাইজ্যাকের আশংকার কথা বলে এক ধরনের তামাশা করার পরও বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে যে ভূমিকা নেয় তাকে কিছুতেই সঠিক বলা যায় না। সরকার পূর্বোক্ত ১১ জনের ভিসা বাতিল করে দেয়ায় তারা আর ঢাকায় আসতে পারেনি। বলা হয়েছে, বিমান হাইজ্যাকের কোন সম্ভাবনাই যাতে না থাকে সে জন্য বাংলাদেশ সরকার তাদের আগমনের সুযোগ দিয়ে কোন ঝুঁকি নিতে চায়নি। অর্থাৎ সরকারি কর্তৃপক্ষ দেখাতে চায় যে তারা এ ব্যাপারে কেবল সজাগই নয়, অতিমাত্রায় সতর্ক। কিন্তু জনমনে সাথে সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দেয় যার জবাব পাওয়া যায়নি। প্রথমতঃ যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের বিমান হাইজ্যাক হতে পারে বলে খবর প্রচার করেছে এবং যারা এই ইস্যুতে তোলপাড় বাধাতে চেয়েছে, তারাই শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছে যে, ঐ ১১ জন বিমান যাত্রীর পাসপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র সম্পূর্ণ বৈধ। এগুলোর কোথাও সামান্য ত্রুটি থাকলেও ভারত সরকার তাদেরকে ছেড়ে দিতো না। তাদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য যদি সন্দেহের উদ্রেক করতো তাহলেও তারা রেহাই পেতো না। দ্বিতীয়তঃ জানা গেছে, এই ১১ জন ব্যক্তি ইসরাইলের নাগরিক। বাংলাদেশের সাথে এই রাষ্ট্রের কোন কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। তাই বাংলাদেশে পৌঁছার জন্য তারা প্রথমে ভারতের রাজধানীতে আসেন এবং সেখানে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকে ভিসা বা ল্যান্ডি পারমিট সংগ্রহ করেছেন। বাংলাদেশের হাইকমিশন নিশ্চয়ই কোন খোঁজ খবর না নিয়ে এবং আবেদন জানানোর সাথে সাথেই ভিসা দিয়ে দেয়নি। বিশেষতঃ ইসরাইলের বাসিন্দা ও নাগরিক যারা তাদের ক্ষেত্রে নিয়ম কানুনের কড়াকড়িটা বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে এটা নিঃসন্দেহ যে, যাচাই-বাছাই সতর্কতার সাথে করার পরই তাদেরকে ঢাকায় আসার অনুমতি দেয়া হয়। তৃতীয়তঃ এসব বিদেশী মুসলমান কোন

www.pathagar.com

রাজনৈতিক বা ব্যবসায়িক কিংবা কোন প্রকার বৈদেশিক উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশে আসছিলেন না। টঙ্গীতে তাবলীগ জামায়াতের বিশ্ব ইজতেমায় যোগ দেয়াই ছিল তাদের এই সফরের লক্ষ্য। এই বিশাল সমাবেশে প্রতিবছর প্রায় সবক'টি মুসলিম রাষ্ট্র এবং বহু অমুসলিম দেশের প্রতিনিধিরা মিলিয়ে লাখ লাখ মুসলমান শামিল হয়ে থাকেন। এই ইজতেমার মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের বিশেষ পরিচিতিও রয়েছে। চতুর্থতঃ আওয়ামী সরকার যদি প্রমাণ্য তথ্যসহকারে নিশ্চিত হতো যে শেখ মুজিব হত্যা মামলার বন্দী আসামীদের মুক্ত করার জন্য গোপনে তৎপরতা চলছে এবং এসব ব্যক্তি এর সাথে জড়িত বলে সন্দেহ করা যায়, তাহলে সরকার নিশ্চয়ই তাদেরকে ব্যাপক জেরা ও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঢাকায় নিয়ে আসার উদ্যোগ নিতো। কিন্তু তা না করে সরকার তাদেরকে স্বদেশে ফিরে যেতে দিয়েছে। এতে এটাই প্রতীয়মান হয় আসলে শেখ হাসিনার সরকার বিরোধী গণআন্দোলন দুর্বার ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠায় জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাতে এবং ক্ষমতাসীন সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হয়রানি করার জন্য বিমান হাইজ্যাক এর কথিত চক্রান্তের প্রচারণা চালানো হয়েছে।

ভারতীয় ডাকাতদের আগমন

দেশের চোর-ডাকাতদের জ্বালায় যেখানে দেশবাসী অতিষ্ঠ ছিল, সেখানে আওয়ামী শাসনামলে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার ন্যায় বিদেশী ডাকাতদের আনাগোনা তাদের আরো বেশি আতংকিত করে তুলে, কেড়ে নেয় চোখের ঘুম। পত্রিকান্তরে প্রকাশ, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্ত এলাকায় ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে ভারতীয় ডাকাতদের তৎপরতা আশংকাজনকহারে বৃদ্ধি পায়। সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসরত বাংলাদেশীরা ওই সশস্ত্র ডাকাতদের ভয়ে বিনিদ্র রজনী কাটান। অধিকাংশ গ্রামে রাতের বেলা পাহারা বসিয়েও গ্রামবাসীরা ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা পাননি। রাতের অন্ধকারে ডাকাতরা অবাধে বাংলাদেশে প্রবেশ করে ডাকাতী ও লুটতরাজ করে নির্বিঘ্নে সীমান্ত পেরিয়ে আবার ভারতে চলে যায়। ওদের এ কাজে সহায়তা করেছে খোদ বিএসএফ। আবার ডাকাতে ডাকাতে পিসতুতু ভাই বাংলাদেশী ডাকাতরাও ভারতীয় ডাকাতদের প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছে। বিশেষ করে সাতক্ষীরা জেলার ডাকাতদের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ বেশি ছিল। কোন কোন স্থানে ডাকাতি করতে সুবিধা হবে তার সম্পূর্ণ ইনফরমেশন আগে থেকেই ভারতীয় ডাকাতদের কাছে সরবরাহ করেছে বাংলাদেশী ডাকাতরা। বাংলাদেশী ডাকাতরা সাতক্ষীরায় ডাকাতি করার জন্য ভারতীয় ডাকাত ভাড়া করে এনেছে। সাতক্ষীরায় একাধিক ডাকাত ধরা পড়লে তারা স্বীকার করে যে, বাংলাদেশের ডাকাতদের সাথে তাদের সখ্যতা ও যোগাযোগ রয়েছে। ভারতীয় ডাকাতরা ডাকাতি কাজে ব্যবহৃত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সঙ্গে করে এনে যোগ দেয় বাংলাদেশী ডাকাতদের সাথে। ২২ মার্চ গভীর রাতে সাতক্ষীরা সীমান্তে ডাকাতি করতে আসা ৪ জন ভারতীয় ডাকাতকে অস্ত্রসহ শ্যামনগর থানা পুলিশ গ্রেফতার করে। তারা পুলিশকে জানায় ৩০ হাজার টাকার চুক্তিতে জনৈক গোপীনাথের বাড়িতে ডাকাতি করে চলে যাওয়ার সময় ধরা পরে। তারা আরো জানায়, প্রায় প্রতি রাতেই তারা বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে গরু-ছাগল এমনকি মুক্তিপণ হিসেবে মানুষও অপহরণ করে নিয়ে যায় ভারতে। ওই ডাকাতদের দেয়া খবর অনুযায়ী পুলিশ আরো ৪ জন ডাকাতকে গ্রেফতার করে। শুধু সাতক্ষীরার গ্রামাঞ্চলেই নয়, সুন্দরবনে এবং সীমান্ত এলাকার নদীতে যেসব ডাকাতি সংঘটিত হয়, তার প্রায় সবগুলোই ঘটে ভারতীয় ডাকাতদের সহযোগিতায়। সুন্দরবনের ভারতীয় বনদস্যু ও জলদস্যুরা এদেশীয় ডাকাতদের যোগসাজশে

www.pathagar.com

প্রতিবছর বনের মধ্যকার বাওয়ালী, মৌয়াল ও জেলেদের সর্বস্ব কেড়ে নেয়। অনেক সময় সুন্দরবনে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জিম্মি করে হাতিয়ে নেয় লাখ লাখ টাকা। ভারতীয় চোর-ডাকাতরা আগেও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে ছোট-খাটো চুরি-ডাকাতি করতো, তবে সেটা ছিল কালে-ভাদ্রের ঘটনা। আওয়ামী শাসনামলে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে প্রায় প্রতিরাতে। আর মানুষ অপহরণের কথা তখনতো শোনাই যায়নি।

শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টার সংবাদ ভারত প্রকাশ করে

নতুন দিল্লীস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন-এর ফ্যাক্স যোগে ঢাকায় পাঠানো দু'টি রিপোর্ট ভুলক্রমে ভারতের গোয়াহাটির এক সাংবাদিকের হাতে পৌঁছে গিয়েছিল। প্রথম রিপোর্টটি ছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ (রিপোর্টে নামটি এইভাবে লিখিত) কে হত্যার চেষ্টার বিবরণ। ওই রিপোর্টে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে সভা-সমিতিতে যোগদান করা ও মানুষের অত্যন্ত কাছে যেতে বারণ করা হয়। দ্বিতীয় রিপোর্ট ছিল তাসমিনা নামে কেরালার এক তরুণী বাংলাদেশ ভ্রমণের জন্য চিত্রসহ তার ভিসার জন্য আবেদনপত্র। এ দু'টি রিপোর্ট পাওয়ার পর গোয়াহাটির সাংবাদিক মহল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া দৈনন্দিন ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত ১৬ মে'র দৈনিক যুগান্তর ও ১৮ মে ২০০০ দৈনিক জনকণ্ঠে যথাক্রমে প্রথম রিপোর্ট সম্পাদিত আকারে ও দ্বিতীয় রিপোর্ট ওই একইভাবে মন্তব্যসহ প্রকাশিত হওয়ায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ফ্যাক্সে পাওয়া 'র'-এর প্রথম রিপোর্টে বলা হয়, 'শ্রীলংকার বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন লিবারেশন টাইগার অব তামিল ইলম (এলটিটিই) বর্তমানে দারুণ আর্থিক অনটনে রয়েছে। 'র'-এর গোয়েন্দারা ঢাকায় জানতে পেরেছে বনানীর এক এপার্টমেন্টে গত ২৩ মার্চ বিএনপি মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূইয়া, ব্রিগেডিয়ার মোশারফ হোসেন, কাদের সিদ্দিকী, (কাদের বানান লিখা হয়েছে 'কিউ' দিয়ে) ও ফ্রিডম পার্টির কয়েকজন সদস্যের গোপন সভা হয়। ওই সভায় এলটিটিই'র সঙ্গে সমন্বয়কারীকে দিয়ে ওই অনুরোধ পাঠানো হয় যে তারা যেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করার জন্য তিনজন তামিল মহিলা সুইসাড স্কোয়াড ঢাকায় পাঠান। এই হত্যাকান্ড চালাবার জন্য এলটিটিইকে দশ লাখ মার্কিন ডলার দেয়া হবে এবং বিএনপি আবার ক্ষমতায় এলে শ্রীলংকায় তৎপরতা চালাবার রসদ সংগ্রহের জন্য বঙ্গোপসাগর ব্যবহার করার সুযোগ দেয়া হবে।' 'র'-এর ওই রিপোর্টে বলা হয়, 'এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপর আক্রমণ চালানো হবে এবং ইতোমধ্যে তিনজন তামিল মহিলা বিভিন্ন পথ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।' এই রিপোর্টে বর্ণিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার প্রায় একমাস পর ঢাকার পত্রিকায় ওই রিপোর্টটি আংশিক সংশোধন করে প্রকাশ করে। এ সুযোগ দেয়ার পেছনে শুধু একটি কারণই থাকতে পারে, তা হলো বিএনপির বিরুদ্ধে সরকার উৎখাতের একটি ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করা। বিশেষ করে 'র'-বর্ণিত সময় পার হয়ে পাওয়ার পর ও বাংলাদেশে কথিত অনুপ্রবেশকারী তিনজন তামিল তরুণীর সন্ধান না পাওয়ার পর সম্ভবত 'র' বলতে চেয়েছে বিপদ এখনো রয়ে গেছে। দ্বিতীয় রিপোর্টটি ওই সম্ভাবনার কথাই বলেছে। ওই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে দৈনিক জনকণ্ঠ ১৮ মে। প্রতিবেদনে 'র'-কে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর অন্যতম বিশেষণে আখ্যায়িত করে বলেছে, 'বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর উচিত ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ও ইন্টারপোলের সাহায্য নেয়া।' দ্বিতীয় রিপোর্ট পাঠিয়েছে নতুন দিল্লীস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন। এতে তাসমিনা নামে কেরালার এক তরুণীর ভিসার জন্য

www.pathagar.com

আবেদনপত্র রয়েছে তার ছবিসহ। ওই আবেদনপত্র অনুযায়ী তাসমিনার পাসপোর্ট নম্বর বি-১৭২৫১৮৪। এটি কাঝি কোঠ থেকে ইস্যু করা হয় ৩/৪/২০০০ইং তারিখে। পাসপোর্ট অনুযায়ী তার জন্ম তারিখ ২১/১১/৭৮ ইং তারিখ। শিক্ষাগত যোগ্যতা গ্রাজুয়েট। পাসপোর্ট ইস্যু হওয়ার ১১ দিনের মাথায় তিনি ১৪/৪/২০০০ইং তারিখে বেনাপোল দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। মালয়ালাম ভাষাভাষী কেরল রাজ্যের মুসলমান তরুণী তার পাসপোর্টে বাংলাদেশে পরিচিত যাদের নাম দিয়েছেন এরা সবাই শেখ; যেমন শেখ আব্দুল কুদ্দুস, ঠিকানা খুলনা। এই তরুণীর বিস্তারিত পরিচয় না দিয়েই ১৮ মে জনকণ্ঠ পত্রিকা তাকে তামিল গেরিলা হিসেবে আখ্যায়িত করে। শুধু তাই নয়, সে বাংলাদেশে ভিসা শেষ হওয়ার পরও অবস্থান করছে। সুতরাং তাকে গ্রেফতারের জন্য বিশেষ শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর সাহায্য নেয়া প্রয়োজন বলে জনকণ্ঠ উল্লেখ করে। তাসমিনার পাসপোর্ট যে 'র'-ইস্যু করেছে গোয়াহাটির সাংবাদিক মহলের এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ ছিলনা। তার ঢাকায় যাওয়ার ব্যবস্থাও তাদের করা। জনকণ্ঠ তো বাংলাদেশের পাসপোর্ট কর্মকর্তাদের একচোট নিয়ে বলেছে, সহজ লভ্য বাংলাদেশী পাসপোর্ট নিয়ে তাসমিনা হয়তো বাংলাদেশ ত্যাগ করেছে। কিন্তু পত্রিকাটি এটি বলতে নিশ্চুপ যে ভারতীয় হাইকমিশন তাকে ভিসা দিল কেমন করে? গোয়াহাটিতে সহকর্মীর ফ্যাক্স মেশিনে প্রাপ্ত দু'টি রিপোর্টে বাংলাদেশের 'র'-এর তৎপরতা প্রকাশ পায়। কলকাতা, মুম্বাই, চেন্নাই ও গোয়াহাটির কিছু কিছু সংবাদপত্রে 'র'- মাঝে-মধ্যে চাঞ্চল্যকর কিছু তথ্য প্রকাশ করে। আওয়ামী শাসনামলে তারা বাংলাদেশেও ওই প্রক্রিয়া শুরু করেছিল।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের ইসলাম চর্চা

আওয়ামী-বাকশালী সরকার পতনের পর থেকে ১৯৯৬ সালের পূর্ববর্তী সরকারগুলোর সংবিধানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই যাবতীয় কার্যাবলির ভিত্তি, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা সংযোজনকে আওয়ামীরা কোন সময় মেনে নিতে পারেনি বলেই এগুলোর বিরোধীতা করছে সর্বোতভাবে। বছরের পর বছর তারা কৌশল ও চাতুর্যের সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার ধজা উড়িয়ে সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোজন মৌলবাদী উদ্যোগ, ধর্মনিরপেক্ষতার বরখেলাফ আখ্যায়িত করে গালিগালাজ করেছে। শুধু তাই নয়, সমর্থক, বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে যে কোন মুসলিম সংস্কৃতিকে পাকিস্তানি মডেল হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তাদের ইসলাম বিদ্বেষী ভূমিকার দরুণ ক্ষমতার মুকুট যখন বারবার হাতছাড়া হয়ে গেছে তখন ক্ষমতায় যাওয়ার নতুন কৌশল হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয়নি তারা। ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে শেখ হাসিনা কৌশলগতভাবে সাময়িক সময়ের জন্য আকস্মাৎ রাজনৈতিক ভন্ডামির ষোলকলা পূরণ করার জন্য তার রাজনৈতিক বেশভূষাও বদলে ফেলেন এবং ক্ষমতায় যাওয়ার উদগ্র লালসায় নির্বিচারে ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। বাংলাদেশের কোটি কোটি সরলপ্রাণ ধর্মভীরু মুসলমানকে প্রতারণা ও ধোকা দেয়ার জন্য শেখ হাসিনা হযরত শাহজালালের পবিত্র মাজারে দু'হাত তুলে মস্ত কাবরণ বা হিজাব কালো পট্টি লাগিয়ে তসবি-তাহলিলরত অবস্থায় ছবি তোলেন, ত্বরিৎ গতিতে সকল সংবাদপত্রে প্রেরণ করেন যা জনগণের মনে কিছুটা দাগ কাটতে সক্ষম হয়। এছাড়াও একটি নির্বাচনী পোষ্টারে ধোঁকাবাজির পরাকাষ্ঠা হিসেবে ছবিটি ছাপিয়ে লাখ লাখ কপি দেশের দেয়ালগুলোতে সাঁটানো হয়। অপর পোষ্টারের উপরিভাগে 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান' জুড়ে দিয়েও লাখ লাখ কপি দেশের সর্বত্র সাঁটানো হয়। শেখ হাসিনা সরলমনা জনগণকে ভাওতা দেয়ার জন্য মাথায় কৃষ্ণবর্ণের হিজাব পরে জনসভায় হাজির হন। বক্তৃতার মঞ্চে অতীতের ভুলত্রুটি স্বীকার করেন এবং প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আরেকবার ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ ভিক্ষা করেন। কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরক্ষণেই শেখ হাসিনা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। হিজাব কালো পট্টি মাথা থেকে উধাও হয়ে যায়। অনুরূপভাবে উধায় হয় তার হস্তধৃত তসবিহ। পবিত্র হজ্জব্রত সম্পাদন এবং টেলিভিশনে সেটা সম্প্রচার করে তিনি তার ধর্মপরায়ণতা জাহির করেন। কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণের পর শেখ হাসিনাই দেশে ও বিদেশে পুরুষ মানুষের সাথে নির্বিচারে করমর্দন করেন।

আওয়ামীরা ক্ষমতা গ্রহণের পর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দাওয়াত কার্ড থেকে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বাদ দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। 'বিসমিল্লাহ' বলতে গিয়ে বাধাগ্রস্ত হওয়ার প্রতিবাদে ১৯৯৬-এর ১২ আগষ্ট আইন মন্ত্রণালয়ে পদত্যাগপত্র প্রেরণ করেন নেত্রকোনার পিপি নূরুল ইসলাম। পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেসীর একটি সভায় তিনি বক্তৃতার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' উচ্চারণ করলে সভাপতি বলেন, 'বিসমিল্লাহ' উচ্চারণের প্রয়োজন নেই।

www.pathagar.com

সরকারের ধর্মের প্রতি অবহেলার সুযোগে বিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ধর্ম নিয়ে ব্যঙ্গ করার দুঃসাহস পেয়েছে কিছু শিক্ষক। মোমেনশাহীর মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার নবম শ্রেণীর ইসলাম ধর্ম (নৈর্ব্যক্তিক) বিষয়ের প্রশ্নপত্রে উল্লেখিত একটি প্রশ্ন হচ্ছে ঃ বাংলাদেশের স্রষ্টা কে? (ক) আল্লাহ, (খ) রাসূল, (গ) ফেরেশতা, (ঘ) বঙ্গবন্ধু। একই বছর যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রের ৭ নং প্রশ্নটি ছিল মুসলিম জাতির আদি পিতা কে? (ক) শেখ মুজিবুর রহমান, (খ) হযরত ওমর (রাঃ), (গ) হযরত ইব্রাহিম (আঃ), (ঘ) হযরত নূহ (আঃ)।

ভারতের সঙ্গে পানি চুক্তি করার পর সরকার দেশের সকল মসজিদে গুণকীর্তন গেয়ে বিশেষ মোনাজাত করার জন্য ইমামদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে একটি চিঠি ইস্যু করেন। ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯৬ ইস্যু করা এ রকম প্রেরিত একটি চিঠিতে গাজীপুরের জেলা প্রশাসক জেলার মসজিদগুলোর ইমামদের কাছে যে নির্দেশনামা পাঠান তাতে ইমামকে সম্বোধন মূলে প্রাপক 'পুরোহিত' এবং ব্রাকেটে সকল মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডার কথা উল্লেখ করা হলেও অন্যান্য উপাসনালয়-এ বিশেষ প্রার্থনার অনুরোধ করার মধ্য দিয়ে 'অন্যান্য উপাসনালয়' এর মধ্যে মসজিদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অপরদিকে পানি চুক্তির জন্য দোয়া মনঃপুত না হওয়ায় খুলনা টাউন মসজিদের ইমাম খুলনা আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মওলানা মোহাম্মদ সালেহকে চাকরিচ্যুত কেন করা হবে না-'কারণ দর্শাও' নোটিশ জারি করা হয় খুলনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে। ১৯৯৭-এর ফেব্রুয়ারি তে দৈনিক দিনকালে প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ফেনীর সোনাগাজীতে সন্ত্রাসীদের ভয়ে সেখানকার মসজিদে মাগরিব ও এশার জামাত হয় না। আওয়ামী সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাস, লুণ্ঠন, এলাকার নিরীহ জনতাকে অপহরণ, খুন প্রভৃতির কারণে এলাকাটি প্রেতপুরীতে পরিণত হয়। শুধু তাই নয়, সেখানকার গুনক ঈদগাহে ঈদের জামাত সে বছর প্রথম সন্ত্রাসীদের হামলার আশংকায় পুলিশ প্রহরায় অনুষ্ঠিত হয়।

রমযান মাসে ফরিদপুর জেলা শহরের চাঁদমারী মাঠে জেলার প্রধান ঈদের নামাযের পূর্বক্ষণে জেলা প্রশাসক শেখ মুজিবকে জাতির জনক এবং মোনাজাতে ইমাম সাহেবকে শেখ মুজিবের নাম উচ্চারণ করতে বলেন। মোনাজাতে ইমাম সাহেব শেখ মুজিবকে নবী রাসূলদের চেয়েও অধিক মর্যাদা দিয়ে প্রার্থনা করলে উপস্থিত মুসল্লীদের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। অনেকে মোনাজাত ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র নামাজ পড়তে চলে যান এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছাড়া মুসলমানদের আর কোন জাতির পিতা নেই বলে প্রতিবাদ করেন। অনেকের প্রতিবাদের জবাবে ইমাম বলেন, আমি কি করব, ডিসি সাহেব আমাকে বলেছেন মোনাজাতে আর বয়ানে শেখ মুজিবের নাম 'জাতির জনক' উল্লেখ করে জোরে জোরে উচ্চারণ করতে।

৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শেখ মুজিবের প্রদত্ত ভাষণের স্থানে 'শিখা চিরন্তনের' ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে উদ্বোধনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, 'এখান থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ সমস্ত দেশে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে প্রদক্ষিণ করবেন এবং ২৬ মার্চ এই ময়দানে জ্বলন্ত মশাল দ্বারা শিখা চিরন্তন জ্বালিয়ে জাতির জনকসহ দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি রক্ষার্থে জ্বলন্ত শিখার চারপাশে বেষ্টনী দেয়া হবে।' দেশের আলেম সমাজ এ পদক্ষেপকে অগ্নি পূজার সাথে তুলনা করেছেন।

আওয়ামীরা ক্ষমতায় আসার পর শুধু 'শিখা চিরন্তন' স্থাপনই করেনি বরং এদেশের ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের জন্য

www.pathagar.com

কাজ শুরু করে। হাসিনা সরকারের আমলে ইসলামিয়াত পরীক্ষা ১০০ নম্বর হতে ৫০ নম্বরে কমিয়ে আনা হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। '৭৫ সালে প্রাক্তন ইসলামিক একাডেমী ও বায়তুল মোকাররম মসজিদের সমন্বয়ে এ প্রতিষ্ঠান গঠিত। বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ এ প্রতিষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন আইন ১৯৭৫-এর ৬ (১) ধারায় সরকার কর্তৃক তিন বছরের জন্য সর্বোচ্চ পরিচালনা পরিষদ বোর্ড অব গভর্ণরস গঠন করা হয়। ১৪ সদস্যের বোর্ডে ধর্মমন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব ভাইস চেয়ারম্যান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক সদস্য সচিব এবং শিক্ষা সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান, ২ জন স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং ৫ জন খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ হলেন সদস্য। কিন্তু সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেই বোর্ড অব গভর্ণরসের সকল সদস্য পদে দলীয় লোকজনকে বসায়। বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব সবসময় এ কমিটির সদস্য থাকলেও তাঁকে বাদ দেয়া হয়। এমনকি সরকারের এক বছর পূর্তির পূর্বেই খতিবকে জাতীয় ঈদগাহে ঈদুল আজহার নামাজে ইমামতি করতে দেয়া হয়নি। সেখানে সরকার দলীয় সংসদ সদস্য ডা. ইকবালের এক আত্মীয় দিয়ে ইমামতি করানো হয়। খতিবকে জাকাত বোর্ডের সদস্যপদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। সরকার ২২ মে চট্টগ্রামে টিভি উপ-কেন্দ্র থেকে পাঁচ ওয়াক্ত আযান বন্ধ করে দেয়। ইংরেজি দৈনিক নিউনেশনের পক্ষ থেকে আযান বন্ধ করে দেয়ার কারণ জানতে চাইলে টিভি কর্তৃপক্ষ অকপটে বলেছেন, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই তারা আযান বন্ধ করে দিয়েছে। ওই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রামের টিভি কেন্দ্রকে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র দেয়ার জন্য এবং কোন বিশেষ ধর্মানুভূতিকে নিয়ে বেশি গুরুত্ব না দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

বায়তুল মোকাররমের খতিবকে ষড়যন্ত্র করে সরানোর চেষ্টা করে অতীতে সরকার বারবার ব্যর্থ হয়ে ১৭ জুলাই এক অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য খতিবকে দায়ী করে চরম হীনমনোভাবের পরিচয় দেয়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হলো, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ, ধর্ম সচিব আব্দুস শাকুর, খতিব উবায়দুল হক ও ফাউন্ডেশনের মহাপরিচাক মোঃ মোরশেদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন। সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে সন্ধ্যা ৭ টা ৫০ মিনিটে ধর্ম সচিব বক্তৃতার শুরুতেই বলেন, 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন।' এ বক্তব্য প্রদানের সাথে সাথে উপস্থিত মুসল্লীগণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণ না করার এবং প্রদত্ত বক্তব্য প্রত্যাহারের জন্য আহবান জানিয়ে বলেন, 'মুসলমানদের জাতির জনক যদি কাউকে বলতে হয়, তাহলে তিনি হবেন পবিত্র কোরআন অনুযায়ী হযরত ইব্রাহীম (আঃ), অন্য কেউ নন।' কিন্তু ধর্ম সচিব পূর্বের বক্তব্য প্রত্যাহার না করে মুসল্লীদের দাবীকে পদদলিত করে শেখ মুজিবের গুণগান গেয়ে বক্তব্য দিতে থাকেন। এর ফলে উত্তেজিত মুসল্লীগণ মঞ্চকে লক্ষ্য করে জুতা নিক্ষেপ করতে থাকেন। তখন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বিক্ষুব্ধ মুসল্লীদের শান্ত হতে অনুরোধ জানালে জুতা নিক্ষেপের গতি আরো বেড়ে যায়। এই সময় অবস্থা বেগতিক দেখে মন্ত্রীর কাছ থেকে মাইক নিয়ে বায়তুল মোকাররমের খতিব মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে মন্ত্রীর অনুমতি চাইলে মন্ত্রী তাঁকে

www.pathagar.com

ধমক দিয়ে বসিয়ে দেন। অবশেষে অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশের ব্যাপক নিরাপত্তায় প্রেসিডেন্টসহ সবাই মঞ্চ ত্যাগ করেন।

ফাউন্ডেশনের অনুষ্ঠান পন্ড হওয়ার পরে সরকারের তরফ হতে বলা হয়, এসব খতিবের কারসাজি। খতিব একজন বয়োবৃদ্ধ ও আল্লাহর নির্দেশ পালনে সর্বদা জাগ্রত থাকেন। তাঁর কী সাধ্য আছে আল্লাহর ঘরের প্রাঙ্গণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য উৎসাহ প্রদান করার। সরকার কার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ এনেছিল সে সম্পর্কে সম্ভবত তারা অবগত ছিল না। শুধু তাই নয়, সরকার খতিবকে জনসমক্ষে হেয় করার দুঃসাহস প্রদর্শন করে। খতিব সরকারের সকল অভিযোগের দাতভাঙ্গা জবাব দিয়ে ১৯ জুলাই সংবাদপত্রে প্রেরিত এক বিবৃতিতে অনুষ্ঠান পন্ড হওয়ার ঘটনাকে নিঃসন্দেহে দুঃখজনক ও লজ্জাকর হিসেবে অভিহিত করেন।

একই সময় ড. আলী আসগর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনকে 'সন্ত্রাসী' হিসেবে আখ্যায়িত করলে দেশব্যাপী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পদে। ওই পরিস্থিতিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে আওয়ামী লীগ রেডিও-টিভি ও সমর্থক সংবাদপত্রের নগ্ন সহায়তায় 'বায়তুল মোকাররম ইস্যু তৈরির চেষ্টা চালায়।' মিলাদুন্নবী (সাঃ) অনুষ্ঠান পন্ড করার অভিযোগ শেষ পর্যন্ত বুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়। ২২ জুলাই ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বিকেল ৪ টায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে বায়তুল মোকাররমের অপ্রীতিকর ঘটনার প্রতিবাদে মেয়র মোহাম্মদ হানিফের সভাপতিত্বে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে কেন্দ্রীয় সভানেত্রীর অনুপস্থিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি আমির হোসেন আমু, ধর্ম প্রতিমন্ত্রীসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশের সভাপতি সবাইকে ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলার আহবান জানালেও কেন্দ্রীয় সভাপতি আমু ও ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আওয়ামী লীগের ভাইদের জোটবেঁধে বায়তুল মোকাররম মসজিদে গিয়ে শুক্রবারের জুম্মা'র নামাজ আদায় করার জন্য আহবান জানান। তাদের ভাষায় বায়তুল মোকারমকে ইহুদীদের দখল থেকে মুক্ত করতে আওয়ামী কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সমাগম ঘটাতে হবে। একই দিনে ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এক সভায় খতিবকে ১৭ জুলাইয়ের ঘটনার জন্য কেন দায়ী করা হবে না এবং কেন অব্যাহতি দেওয়া যাবে না-এক সপ্তাহের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ করা হয়। অপরদিকে খতিব তাঁর বিরুদ্ধে সকল অভিযোগের জবাব দিয়ে ২৩ জুলাই দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকারে আনীত সকল অভিযোগ ষড়যন্ত্রমূলক বলে অভিহিত করেন।

এসব ঘটনায় বায়তুল মোকাররম মসজিদের হাজার হাজার মুসল্লীসহ দেশের কোটি কোটি ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে। বিরোধী দল ও বিভিন্ন মহল থেকে সরকারের বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জ ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানানো হয়। জাতীয় মসজিদ নিয়ে আওয়ামীদের এসব উস্কানী ক্রমেই গণবিক্ষোভে রূপ নেয়। সরকার তৌহিদী জনতাকে ভয় পেয়ে ২৪ জুলাই বায়তুল মোকাররম মসজিদ এলাকায় এবং ২৫ জুলাই একদিনের জন্য মসজিদের আশেপাশের এলাকায় সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারিসহ দু'শতাধিক পাটুন পুলিশ, বিডিআর ও আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ান মোতায়েন করে। ২৫ জুলাই অন্যান্য জুম্মাবারের চেয়ে বেশি মুসল্লী মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করার সময় মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে চেক করা হয়। উল্লেখ্য, একমাত্র হিন্দুস্থানের দিল্লী জামে মসজিদেই মুসল্লীদের দেহ-তল্লাশির জন্য সেখানকার পুলিশ মেটাল ডিটেক্টর ব্যবহার করে। দুনিয়ার আর কোথাও এরকম দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না।

www.pathagar.com

খতিবের ইমামতীতে শান্তিপূর্ণভাবে নামাজ আদায় শেষে মসজিদে প্রবেশের সময় অশোভন আচরণ, ১৪৪ ধারা জারি ও খতিবকে শোকজ নোটিশ জারির প্রতিবাদে হাজার হাজার মুসল্লী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পুলিশ ও জয়বাংলা শ্লোগানধারী সন্ত্রাসীরা নিরীহ মুসল-ীদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের ওপর বর্বরোচিত হামলা চালায়। হামলার ঘটনায় শতাধিক মুসল্লী আহত ও ৪ জন মাদ্রাসা ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত মাদ্রাসা ছাত্ররা ছিল শরিফ, শামসু, শাহনুর ও জামাল। বায়তুল মোকাররম এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি থাকায় মিছিলটি বেশি এগুতে পারেনি। একই দিন বিকেলে একই দাবীতে বহুমুখী শ্রমজীবী ও হকার সমিতি পুরানা পল্টন মোড়ে সমাবেশের চেষ্টা করলে পুলিশ মাইক ছিনিয়ে নেয় ও সমাবেশ পন্ড করে। পুলিশ ঢালাও গ্রেফতার চালিয়ে মিছিল সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ১৪৪ ধারা জারির প্রতিবাদে জাগপা স্বেচ্ছায় কারাবরণ কর্মসূচি গ্রহণ করলে এতে ২২ জন নেতা-কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ৮ আগষ্ট জুম্মার নামাজের পর ইসলামী ঐক্যজোট ১৪৪ ধারা জারি ও ইসরাইলে ইহুদি মহিলা কর্তৃক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অবমাননাকর পোস্টার প্রকাশের প্রতিবাদে মিছিল বের করলে পুলিশ মিছিলে হামলা চালায়।

ঘোষিত-অঘোষিত কয়েকটি টিম নিয়ে তদন্ত করলেও সরকার খতিবের কোনো ত্রুটি খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর সিদ্ধান্তমূলক ও উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রমাণ করতে যে তদন্ত কমিটি গঠিত হয় তার রিপোর্টও গণরোষের মুখে সরকার কার্যকর করার সাহস পায়নি। ২০ সেপ্টেম্বর ফাউন্ডেশনের গভর্নিং বোর্ডের সভার পর ওই রিপোর্ট সরকার ধামাচাপা দিয়ে আত্মসম্মান রক্ষার চেষ্টা করে।

১৯৯৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী ওলামা লীগের সভাপতি ও দৈনিক আল আমিনের যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল আউয়ালকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহা-পরিচালক পদে তিন বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়। এর পূর্বের বছর পত্রিকায় প্রকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪৩ টি জেলার তাবৎ কার্যক্রম গুটিয়ে দেয়ার জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয় একটি চিঠি প্রেরণ করে।

২৬ অক্টোবর দৈনিক দিনকালে প্রকাশিত সংবাদে প্রকাশ, টঙ্গীর অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলস-এর জামে মসজিদে সন্ত্রাসীরা হামলা ও ভাংচুর করে এবং মসজিদের ইমামকে লাঞ্ছিত করে। উল্লেখ্য, মসজিদের সামনে একটি খাজা'র ডেক বসিয়ে চিহ্নিত একদল সন্ত্রাসী নাচ গানের আসর বসায়। মসজিদের ইমাম মুফতি আব্দুল কাইয়ূম এতে বাধা প্রদান করেন। কিন্তু সন্ত্রাসীরা বাধা উপেক্ষা করে পরদিন আবারও একই স্থানে গান-বাজনা ও নৃত্যের আসর জমায়। ইমাম সাহেব এই ঘটনার প্রতিবাদ করেন এবং মসজিদ থেকে কোরআন তেলাওয়াত শুরু করেন। কোরআন তেলাওয়াত করায় সন্ত্রাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে মসজিদে হামলা চালায় এবং তাঁকে লাঞ্ছিত করে। এভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ-মাদ্রাসায় সন্ত্রাসী হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে।

২৩ ডিসেম্বর পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এবং সরকারি নির্দেশনামায় দেখা গেছে যে, বন্যা-উত্তর পরিস্থিতি মোকাবিলায় কৃচ্ছতাসাধনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ইফতার মাহফিল আয়োজন করতে নিষেধ করেছেন। তিনিও কোনো ইফতার মাহফিল আয়োজন করবেন না। স্মতর্ব্য যে, ১৯৯৭ সালের রমজানেও প্রচন্ড শীত ও শৈত্য প্রবাহের অজুহাত দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইফতার মাহফিলের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি জনসাধারণকেও ইফতার মাহফিলে নিরুৎসাহিত করে বলেছিলেন, এ অর্থে দরিদ্রদের শীতবস্ত্র প্রদান করবেন। শীতবস্ত্র যে কী পরিমাণ দেয়া হয়েছে

www.pathagar.com

তা অবশ্য পরে আর জানা যায়নি। বন্যা-উত্তর পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে না করতেই অনুষ্ঠিত হয় দুর্গাপূজা। কিন্তু পূজা আয়োজনে সরকারি তহবিল থেকে অর্থ ঠিকই দেয়া হয়েছে। এরপরে ৭০/৮০ কোটি টাকায় শ্রাদ্ধ করা হয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের নামে। আন্তর্জাতিক সম্মেলনের জন্য প্রায় ৯০ কোটি টাকার বিলাসবহুল গাড়ি ক্রয়ের সময় কৃচ্ছতার কথাটি মনে আনা হয়নি। মুজিবের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে সরকার দেশব্যাপী পোস্টার সাঁটাতে যে টাকা ব্যয় করেছে তার অর্ধেক দিয়েই একমাস ইফতার মাহফিল আয়োজন করা যেত খুব ভাল করেই।

১৩ জানুয়ারি ১৯৯৯ দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত হয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণী অর্চনা ১৪০৫-এর আমন্ত্রণলিপিতে স্বরস্বতী দেবীর মূর্তির ঠিক নিচে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের "ইন্নাদ্দীনা ইনদালাহিল ইসলাম"-পবিত্র কোরআনের আয়াত সম্বলিত মনোগ্রাম ছাপা হয়েছে। কোরআনের এতবড় অবমাননা, ধৃষ্ঠতার পরও মুসলিম প্রধানমন্ত্রী, ভিসি কয়েস উদ্দিনের কেশাগ্র স্পর্শ করেননি। ঐ ভিসিতো প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব লোক। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ঘটনা ভুলবশতঃ হয়েছে বলে অবশেষে সংবাদপত্রে প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৬ জানুয়ারি জানা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী পরিচালকের স্বাক্ষরিত ব্যাখ্যায় ছাপাখানার ভুল বলে উল্লেখ করে বিষয়টি মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের কারণে দুঃখ প্রকাশ ও নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। আরো বলা হয়, এ ভুলের জন্য পূজা কমিটিকে তিরস্কার করে ভিসি উক্ত আমন্ত্রণপত্র প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন, যা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা।

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী তার ঈদ বাণীতে লিখেন 'ঈদুল ফিতর ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সার্বজনীন ধর্মীয় উৎসব।' ঈদ মুসলমান সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎধর্মীয় উৎসব। বাংলাদেশে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা হচ্ছে জাতীয় উৎসব। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর বাণীতে হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজার ন্যায় ঈদের আগে সার্বজনীন ঈদ উৎসব লেখা হয়। একমাত্র হিন্দুসম্প্রদায়ের পূজা উৎসবে সার্বজনীন পূজা কমিটি ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়।

পবিত্র রমজানের ২৯ তম দিবসে বায়তুল মোকাররমসহ দেশের সকল মসজিদে বিপুল সংখ্যক মুসল্লী ইফতারীর পর থেকেই চাঁদ দেখা কমিটির ঘোষণা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন। বিটিভি'র আটটার বাংলা খবরের জন্য অপেক্ষা করেন সকলে। মসজিদগুলোতে তারাবী নামাযের সময় বাড়িয়ে দেয়া হয়। বিটিভি'র বাংলা সংবাদের শুরুতেই জানানো হয়, বাংলাদেশের আকাশে কোথাও শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যায়নি। এ ঘোষণার পর সকল মসজিদে তারাবী নামাজ শুরু হয়ে যায়। হঠাৎ রাত দশটার ইংরেজি খবরের শুরুতেই অপ্রত্যাশিতভাবে বলা হয়, আগামীকাল পবিত্র ঈদুল ফিতর। ঈদ উপলক্ষে পূর্বেই ১৯ থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৮ জানুয়ারি ছিল রমজানের ২৯ তম দিন। এদিন সরকারি-বেসরকারি অফিস ও সংবাদপত্র অফিসগুলো খোলা থাকায় বিপুল সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমান রাজধানী ছেড়ে নিজ নিজ গ্রামে গিয়ে পৌছতে পারেননি। সন্ধ্যার পরপরই বাংলাদেশের আকাশ সীমায় চাঁদ দেখা যাবার খবর জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির নিকট এসে পৌছলেও তারা বৈঠককেই ব্যস্ত থাকে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও তা দেশবাসীকে জানাতে চরম গাফলতি ও উদাসীনতার পরিচয় দেয়। চাঁদ দেখা কমিটির প্রধান দায়িত্ব রমযান, শাওয়াল ও জিলহজ্ব মাসের চাঁদ দেখা।

প্রতি বছর চাঁদ দেখা কমিটি নির্দিষ্ট সময়ে চাঁদ দেখা না দেখা নিশ্চিত করে ঈদের ঘোষণা দেন, কিন্তু এবার তার ব্যত্যয় ঘটিয়ে রাত দশটায় ঘোষণা দেয়া হয় চাঁদ দেখা গেছে। রাত

www.pathagar.com

দশটায় ঘোষণা দেয়ায় প্রশ্ন আসে ঐ দিন আকাশে কি রাত দশটায় চাঁদ উঠেছিল? ঘোষণায় তারা ব্যাখ্যা করেছেন, ঝিকরগাছা, ঝিনাইদহ, খাগড়াছড়িসহ অন্যান্য অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেছে। যদি এসব অঞ্চলে চাঁদ দেখা গিয়ে থাকে তাহলে নিশ্চিত তা যথাসময়ে দেখা গিয়েছিল, এত বিলম্বে ঘোষণা দেয়ার যে বিষয়টি বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে চাঁদ দেখা নিয়ে কমিটির কোনো প্রস্তুতি ছিল না। সবচেয়ে জরুরী যে বিষয়টি বেরিয়ে এসেছে তা হচ্ছে বিভিন্ন থানা এবং জেলার সাথে সমন্বয়হীনতা। খাগড়াছড়িতে চাঁদ দেখা গিয়েছে এ সংবাদ ঢাকায় আসতে দশটা বাজবে কেন? তাহলে কি চাঁদ দেখা কমিটির টেলিফোন কিংবা ফ্যাক্সে গলদ ছিল? 'ঢাল নেই তলোয়ার নেই, নিধি রাম সর্দার'-বস্তুত চাঁদ দেখা কমিটির এ পর্যায়ে ছিল অবস্থান।

কবি শামসুর রাহমান নিঃসন্দেহে একজন মুজিব প্রেমিক ও আওয়ামী ঘরানার খাঁটি সদস্য এবং আওয়ামী সরকারের আমলেই দলীয় ফোরাম থেকে যেমন ব্যাপক সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে তেমনি বাংলা একাডেমীর চেয়ারম্যানও নিয়োগ করা হয়েছে। ঈদ ঘোষণার নাটক কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই এই কবিকে নিয়ে পরিকল্পিতভাবে নাটক করেছে সরকার। ১৮ জানুয়ারি কথিত ম্যাগাজিনের জন্য কবিতা চেয়ে না পাওয়ার জন্য কবির উপর হরকাতুল জিহাদ-ই বাংলাদেশের সদস্য ফজলে এলাহী হাসান, মাহতাব উদ্দিন ও কাজল তাকে হত্যার জন্য হামলা চালিয়েছে বলে সরকার প্রচার করে। তারা ওসামা বিন লাদেনের কাছ থেকে টাকা পেতেন বলে অভিযোগ করা হয়। সরকার কবিকে হত্যার প্রচেষ্টার সাথে হরকাতুল জেহাদের সদস্য চিহ্নিত করে মাদ্রাসা অধ্যক্ষকে গ্রেফতারের জন্য তালিকাভুক্ত করে। তালিকাভুক্ত মাদ্রাসাসমূহের মধ্যে কওমী মাদ্রাসার সংখ্যাই হচ্ছে ৪২১টি। সরকারের তৈরি করা এ তালিকা অনুযায়ী সিআইডিসহ কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থা দেশব্যাপী গ্রেফতার অভিযান পরিচালনা করে। কবির বাসভবনে হামলার পর থেকে গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ঢাকা মহানগরী যুবলীগ (উত্তর) শাখার সাধারণ সম্পাদক সরদার বেলায়েত হোসেন মুকুলের চাচা এবং ঢাকা আইনজীবী সমিতির সভাপতি সরদার সমরুজ্জামানের ভাই সরদার বখতিয়ার হোসেনও ছিলেন। গ্রেফতারকৃত বখতিয়ার উত্তরা থানা আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত। পুলিশ ৩০ জানুয়ারি উত্তরার দক্ষিণখানের একটি মাদ্রাসা সংলগ্ন সার্ভেন্টস অব সাফারিংস হিউম্যানিটি অফিস থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিক এবং হীরা ব্যবসায়ী আহমদ সাদিক আহমেদ, পাকিস্তানি নাগরিক মোহাম্মদ সাজেদ এবং তিন বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করে। পুলিশ বলেছে, উত্তরার দক্ষিণ খান থেকে গ্রেফতারকৃত ৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ফলে তাদের ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ছাড়া চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী শাহাব উদ্দিন, মানিকগঞ্জের সালিম হোসেন এবং সিরাজগঞ্জ থেকে নজরুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকেও তথ্য পাওয়া যায়নি।

আওয়ামী সরকারের তিন বছরের মাথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সুপরিকল্পিতভাবে ইসলামের নাম নিশানা মুছে ফেলার নীল নকশা শুরু হয়। নীল নকশা অনুযায়ী তখন যে সব ছাত্রী বোরখা পরে ও ধর্মীয় বিধিবিধান মেনে চলেছিল অমুসলিম ছাত্রীরাসহ ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের মহিলা কর্মীরা তাদের ঠাট্টা বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেছে। ফলে ধার্মিক ও পর্দানসীন মেয়েরা প্রায়ই নাজুক পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। এ ব্যাপারে রোকেয়া হলের একজন ছাত্রী সংবাদপত্রে অভিযোগ করে বলেছিল, 'হলে যেসব ছাত্রী নামাজ পড়ে সুযোগ পেলেই অমুসলিম ছাত্রীরাসহ ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা তাদের রুম তল্লাসী করে, এমনকি

www.pathagar.com

তাদের হল থেকে চলে যাওয়ার হুমকি দেয়। ফলে অনেক ছাত্রীই নাজেহালের শিকার হয়ে নামাজ পড়া ছেড়ে দিয়েছে'। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ৬ নভেম্বর ১৯৯৯)

আওয়ামী শাসনে পবিত্র রমজান মাসে দেশের বিভিন্ন স্থানে অবাধে চলে অশ্লীল-অর্ধনগ্ন চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী ও প্রচারণা, কুরুচিকর ভিউকার্ড বিক্রয়, আপত্তিকর নাটক ও সঙ্গীত পরিবেশন, অশালীন নাচ ও যাত্রা। বিশ্বের মধ্যে অন্যতম মুসলিম অধ্যুষিত দেশের মাটিতে একটি মুসলিম সরকার ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত থাকার পরও প্রশাসনের নাকের ডগায় চলে ইসলাম বিরোধী তৎপরতা। বিগত সরকারগুলোর আমলে পবিত্র রমজান মাসে প্রাত্যহিক জীবন যাত্রা ও সামাজিক পরিবেশে লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে। আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ রীতি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়েছে। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় অপসংস্কৃতির প্রভাবে এবং সরকারের মদদে রমজানেও আপত্তিকর অনেক কিছু চলেছে ফ্রি ষ্টাইলে। আওয়ামীরা ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী এবং রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার-এর বিরুদ্ধে সর্বদা উচ্চকণ্ঠ। নামায-রোযা-যাকাত-হজ্জকে তারা নিছক ধর্মীয় ব্যাপার বলে মনে করে থাকে এবং এসব নিয়ে দলের ব্যানারে কোন বক্তব্য রাখতে আওয়ামী নেতাদের আগে দেখা না গেলেও ১৯৯৯ সাল থেকে সিটি কর্পোরেশন ও সংসদ নির্বাচনকে সামনের রেখে বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা রমযানের পবিত্রতা রক্ষার আবেদন জানিয়ে ঢাকায় নিজস্ব নাম ঝুলানো বিপুলসংখ্যক ব্যানার এবং রমযানের ক্যালেন্ডার ছাপিয়ে ধর্মীয় বিষয়কে ব্যবহার করতে শুরু করে। অপরদিকে রোযার দিনেও বিরোধী দলের হরতাল ঠেকাতে তারা পিছপা হয়নি। বিরোধী দলের কোনো কর্মসূচি থাকলেই তারা নেমেছে কমরে কাপড় বেঁধে। তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পুলিশও হাতে দড়ি নিয়ে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। রমযানের মর্যাদা ও পবিত্রতার পরিপন্থী কার্যকলাপ প্রতিরোধে কাজ যেখানে পুলিশের করা উচিত ছিল সেখানে তারা থেকেছে হাত গুটিয়ে। পয়লা রমযানেই বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় অর্ধনগ্ন ও কামোদ্দীপক ছবি সম্বলিত বড় বড় বিজ্ঞাপন ছাপা হয় কয়েকটি চলচ্চিত্রে। এর মধ্যে ছিল চিটার নাম্বার ওয়ান, নারীর মন, আশা আমার আশা প্রভৃতি। চিটার নাম্বার ওয়ানে ভারতের অভিনেত্রী শতাব্দী রায়সহ তিন জোড়া নায়ক-নায়িকার সমাহার ঘটানো হয়। এসব ছবির প্রচারণায় এমন চিত্র ব্যবহার করা হয় যা সেন্সর বোর্ডের অনুমতি কিভাবে পায়, সেটাই রুচিশীল মানুষের জিজ্ঞাসা ছিল। এগুলো পোষ্টার ও বিজ্ঞাপনে যুবক-যুবতীর আলিঙ্গন ও চুম্বনসহ বিভিন্ন ধরনের অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির দৃশ্য অবাধে ছাপা হয়। রমযান মাসেও পথেঘাটে পোষ্টার লাগানো হয় পুলিশের নাকের ডগায়। রমযানের মধ্যে ইংরেজি ছায়াছবিও দেখানো হয় জোরেশোরে। মতিঝিলের সিনেমা হলটিতে পবিত্র মাসের পয়লা দিনই মুক্তি পেয়েছে রেইডার্স অব দি লস্ট আর্ক। অর্ধনগ্ন যুবতীর ছবির মাধ্যমে এর দর্শক আকৃষ্ট করার চেষ্টা চলে। ঢাকার কোন কোন সিনেমা হলে আগে থেকেই চলছিল হলিউড বা হংকং এর ইংরেজি চলচ্চিত্র টাইম কপ ও ওপেনস অব ডেথ। সেগুলো রমযানেও প্রদর্শন করা অব্যাহত ছিল। রমযানে যাত্রা মঞ্চস্থ করার অনুমতি দেয়ার কথা নয়। তবুও তা চলে কোন কোন এলাকায়। প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুদূর পল্লীতেই শুধু নয়, খোদ রাজধানীর বুকে রমযানের সময়েও যাত্রা প্রদর্শনীর উদ্যোগ-আয়োজন করা হয়। বিপুল প্রচারণা চালিয়ে রমযান মাসে পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনে দেখানো হয় চলচ্চিত্র 'চিত্রানদীর পাড়ে'। দর্শনীর বিনিময়ে পরপর কয়েকদিন এর প্রদর্শনী হয় (দিনে চারবার করে)। এটি নির্মাণকালেই জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। ইতিহাসের বিকৃতি এবং মুসলিম বিরোধী সাম্প্রদায়িকতার কারণে এই চলচ্চিত্র সমালোচিত। রমযানের সময়ই নীলফামারীতে মাহে রমযানে সেহরীর

www.pathagar.com

সময়ে রোযাদারদেরকে জাগানোর মাইক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। প্রশাসনের এহেন নিষেধাজ্ঞা জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে।

২০ মার্চ ১৯৯৯ আওয়ামী অঘোষিত সমর্থক উদীচীর উদ্যোগে পল্টন ময়দানে ৬ মার্চ রাতে নৃশংস বোমা হামলার প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা প্রায় সবাই কুষ্টিয়ায় কাজী আরেফের হত্যাকান্ডে কিংবা যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা হামলা ঘটনার জন্য দেশের ইসলামী দলগুলোকে দায়ী করেন। প্রধানমন্ত্রীও অবুঝ শিশুর মতো তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইসলামী দলগুলোর সঙ্গে অন্যান্য দলকে সংযুক্ত করে বলেন, 'ঘটনা ঘটাবেন অথচ দায়িত্ব নেবেন না।' আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে প্রধানমন্ত্রী অনেক কথাই বলেছেন কিন্তু একটিরও প্রমাণ দিতে পারেননি।

২৬ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী ইমাম সম্মেলনে মনোনীত ইমামদের সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। সম্মেলন উপলক্ষে অংশগ্রহণকারী ইমামদের উদ্দেশ্য করে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর উপ-পরিচালকের মাধ্যমে সরকার '১৩ টি আচরণবিধি' নামে একটি সার্কুলার জারি করে। জারিকৃত আচরণবিধির ৩ নং বিধিতে 'সম্মেলন স্থানে পান বা তামাক জাতীয় দ্রব্য সেবন করা যাবে না', ৪ নং বিধিতে 'মঞ্চে মেহমানদের সাথে করমর্দন বা হাত মেলানো যাবে না', ৭ নং বিধিতে 'মিলনায়তনে গিয়ে ইমামগণ স্ব স্ব সিটে নীরবে বসে যাবেন'। মিলনায়তনের ভেতরে হাঁটাহাটি বা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা করা যাবে না। অনুষ্ঠানের সময় কোন প্রকার শ্লোগান, তকবির দেয়া যাবে না। কেউ এরূপ করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে', ৮ নং বিধিতে, 'মিলনায়তনে অহেতুক বাথরুম পরিহার করতে হবে। টয়লেট ব্যবহার নিতান্তই প্রয়োজন হলে নিজ নিজ জেলা কর্মকর্তার পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে', ১০ নং বিধিতে, 'সম্মেলন চলাকালে কোন ইমাম দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না', ১১ নং বিধিতে, 'মিলনায়তনে ইমামগণ সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবেন। কোন ইমাম অশালীন ও অসৌজন্যমূলক বা আপত্তিকর কোন আচরণ করতে পারবেন না। কেউ এরূপ অশালীন, অসৌজন্যমূলক বা আপত্তিকর আচরণ করলে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন' এ কথাগুলো বলা হয় বিধিগুলোতে।

আওয়ামী সরকারের প্রথম দিকের শাসন প্রক্রিয়া অবলোকন করলে প্রমাণ পাওয়া যায়, মাদ্রাসা বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে এনজিওগোষ্ঠী। আওয়ামীরা ক্ষমতায় আসার পর ইসলামী চেতনা বিরোধী চিহ্নিত কয়েকটি এনজিও ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে পরিকল্পিত অপপ্রচার শুরু করে। এসব তথ্য সরকার সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে অবগত হয়েও হিন্দু রাষ্ট্র ভারতের ইশরায় এনজিও কর্মকান্ডকে অঘোষিতভাবে সমর্থন দিতে থাকে। মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে পরিকল্পিত অপপ্রচার এনজিওরা শুরু করেছে সত্য কিন্তু তাদের কথা আমলে নিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেয়ার প্রয়াস সরকারই স্ব-ইচ্ছায় নিয়েছিল। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ নামক একটি এনজিও মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের জন্য উদ্যোগী হয়। তারা তাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য শুরুতেই মাদ্রাসা ও ইসলামী শিক্ষা বন্ধ করার পক্ষে কিছু ম্যাটার তৈরির জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে। পরিষদের সদস্যরা ছিলেন ড. আবু হামিদ লতিফ, ড. মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, সোনিয়া নিশাত আমিন ও বেগম মমতাজ জাহান। মাদ্রাসা ও ইসলামী শিক্ষা নিষিদ্ধ করার জন্য একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন তৈরি করেন সাংবাদিক আবুল মোমেন। এই প্রতিবেদন তৈরিতে আরো সহযোগীতা করেন আফরোজা রুবী, আবু মোহাম্মদ মোর্শেদ ও মোজাম্মেল হক। ৫

www.pathagar.com

ডিসেম্বর মাদ্রাসা ও ইসলামী শিক্ষা নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আনুষ্ঠানিক সুপারিশ করতে একটি সেমিনার আয়োজন করে তারা। সেমিনারে ৪৯ জন শিক্ষাবিদ, লেখক, রাজনীতিক, সাংবাদিক, এনজিও নেতা অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সেমিনারে সরকারের প্রতি যেসব সুপারিশ উপস্থাপন করা হয় তাহলোঃ 'মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে, রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে মাদ্রাসা শিক্ষা চালানো যাবে না, জনগণের ট্যাক্সে মাদ্রাসা শিক্ষা চালানো যাবে না, মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে করণীয় নির্ধারণে নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা দরকার, ইসলামিক শিক্ষা শাখা কলেজে খোলার যে পাঁয়তারা চলছে তা এখনই প্রতিহত করা প্রয়োজন, মাদ্রাসা ভিত্তিক শিক্ষা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে পারে-তারা এখন অস্ত্রের দিকে ঝুঁকছে। এখনই ওদের প্রতিহত করতে হবে'।

সেমিনারে অংশগ্রহণকারী ৪৯ জন এই সুপারিশ অনুমোদন করেন। এর মধ্যে ১৫ জন ছিলেন নারী প্রগতি সংঘের কর্মকর্তা, ৪ জন ব্র্যাক কর্মকর্তা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ জন শিক্ষক। কয়েকটি বাম সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সাংবাদিকদের মধ্যে ছিলেন সন্তোষ গুপ্ত, দৈনিক সংবাদের মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, দৈনিক ভোরের কাগজের মুন্নি সাহা, ডেইলী স্টারের পারভিন আহমদ, দৈনিক দিনকালের মাহমুদা চৌধুরী। তবে নারী প্রগতি সংঘের তালিকাভুক্ত সুপারিশকারীদের মধ্যে অনেকেই উক্ত সেমিনারের সাথে সংশ্লিষ্টতার কথা অস্বীকার করেন। দৈনিক দিনকালের মাহমুদা চৌধুরী জানান, তিনি নারী প্রগতি সংঘের উক্ত সেমিনারের কথা কিছুই জানেন না। শুধু তাই নয়, এনজিও ও সরকারের মাদ্রাসা ও ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে অনুসৃত দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়ে তিনি ভিন্নমত পোষণ করেন।

নারী প্রগতি সংঘের দাবীর কাছে নতিস্বীকার করে ১৯৯৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত দেশের কমপক্ষে ৩শ' মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও এমপিওভুক্তি বন্ধ করে দেয় সরকার। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী সরকার সেই সময় পর্যন্ত রংপুর জেলার মোট ২১৮ টির মধ্যে ২০০ টি মাদ্রাসা, সাতক্ষীরায় ৩৬ টি, হবিগঞ্জ জেলায় ২৫ টি এবং মৌলভীবাজার জেলার ৯ টি মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও এমপিওভুক্তি বন্ধ করে দেয়। ওই মাদ্রাসার মধ্যে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা ছিল। ঐ সময়কালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মোঃ বদিউজ্জামান স্বাক্ষরিত বিভিন্ন মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও এমপিওভুক্তি বন্ধের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কাছে চিঠি দেয়া হয়। চিঠিতে মাদ্রাসা বন্ধের কারণ হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন টীমের প্রতিবেদনের আলোকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থান চালুকরণ ও স্বীকৃতি প্রদানের নীতিমালায় ন্যূনতম শর্ত পূরণের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করা হয়। চিঠিতে ঢালাওভাবে বলা হয়, মাদ্রাসার স্বীকৃতির মেয়াদ শেষ, প্রতি শ্রেণীতে প্রয়োজনীয় একশ' জন ছাত্র নেই, সাধারণ তহবিলে নির্ধারিত অংকের টাকা জমা নেই, মাদ্রাসার গুণগত ও সংখ্যাগত ফলাফল সন্তোষজনক নয়, লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় বই নেই। প্রকৃতপক্ষে উল্লেখিত শর্ত সব মাদ্রাসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হওয়া সত্ত্বেও স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও এমপিওভুক্তি বন্ধের মাধ্যমে সরকার মাদ্রাসা বন্ধের প্রক্রিয়া শুরু করে। মাদ্রাসাসমূহকে ৩ বছরে মেয়াদে অনুমোদন দেয়া হয়ে থাকে। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বোর্ডের কাছে মেয়াদ বৃদ্ধির (নবায়নের জন্য) আবেদন জানায়। ওই আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট থানার পরিদর্শকগণ মাদ্রাসা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন। যেসব মাদ্রাসা বন্ধ করা হয় তার মধ্যে অনেক মাদ্রাসারই মেয়াদ নবায়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন ছিল। নবায়ন প্রক্রিয়াধীন থাকা মাদ্রাসার স্বীকৃতি বাতিল করার কোন যুক্তিকতা ছিলনা। ১০ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক চিঠির মাধ্যমে

www.pathagar.com

মৌলভীবাজারের রাজনগর থানার রাজনগর দারুছ ছুন্নাতু ফাজিল মাদ্রাসার আলিম ও ফাজিল স্তরের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা হয়। অনুরূপভাবে স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা হয় একই জেলার রাজনগর থানার মোকামবাজার সৈয়দ আবদুল বারী সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসার। ওই জেলার বন্ধ হওয়া আরও ৭ টি মাদ্রাসা ছিল বড়লেখা জামেয়া ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসা, কাজির বাজার দাখিল মাদ্রাসা, বড়লেখা মোহাম্মদিয়া দাখিল মাদ্রাসা, পরগনাহী দৌলতপুর সিনিয়র মাদ্রাসা, চাঁন্দগ্রাম এইউ ফাজিল মাদ্রাসা, সুজাউল আলিয়া মাদ্রাসা, পাথরিয়া গাংকুল মনসুরিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ১ জুলাই ১৯৯৯)

এসব মাদ্রাসার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়। এসব অভিযোগ বাংলাদেশের প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেই ছিল। কিন্তু এই দুর্নীতি দানা বেঁধে উঠার মূল কারণ এসব প্রতিষ্ঠানের মনিটরিং এর দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যেসব কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত তাদের দায়িত্বহীনতা। কিন্তু দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে সরকার মাদ্রাসাসমূহ উচ্ছেদের ভূমিকায় নামে। কারণ নারী প্রগতি সংঘের সুপারিশমালায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কোন দাবী ছিল না। বরং যে কোনভাবে মাদ্রাসা ও ইসলামী শিক্ষা নিষিদ্ধের দাবী জানানো হয়েছিল।

৬ জুলাই ১৯৯৯ দেশের ৩০০ মাদ্রাসা বন্ধ করা এবং স্কুলের ছাত্রীদের উপবৃত্তি সংকুচিত করে দেয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত নেয়ায় জাতীয় সংসদে তুমুল হৈচৈ ও উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। বিরোধী দলীয় হুইপ বিএনপির সদস্য মশিউর রহমান প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন করতে গিয়ে এ দু'টি তথ্য সংসদে প্রকাশ করলে বিরোধী দলীয় সদস্যরা 'শেম শেম' বলে একযোগে প্রতিবাদ জানান। এ সময় সরকারি দলের কয়েকজন সদস্যও টেবিল চাপড়িয়ে বিরোধী দলীয় সদস্যদের প্রতিবাদের প্রতি সমর্থন জানায়। প্রশ্নোত্তর পর্বে মশিউর রহমান মাদ্রাসা শিক্ষা ও ছাত্রীদের উপবৃত্তির ব্যাপারে সরকারের সংকোচন নীতির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'সামান্য খুঁটিনাটি বিষয় তদন্তের মধ্যে এনে সরকার দেশের ৩০০ মাদ্রাসার এমপিও (সরকারি অনুদান) বাতিল করেছে'। ছাত্র উপবৃত্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বিএনপি সরকার ১০ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের বিধান চালু করেছিল। কিন্তু সম্প্রতি দেশের স্কুলগুলোতে সার্কুলার পাঠিয়ে জানানো হয়েছে যে, ক্লাসের পরীক্ষায় শতকরা ৪০ ভাগ নম্বর না পেলে ছাত্রীরা উপবৃত্তির সুবিধা পাবে না'। সম্পূরক প্রশ্নে এ দু'টি বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর জবাব দাবী করা হয়। এ সময় সংসদে সভাপতিত্ব করেন স্পীকার প্যানেলের সদস্য জাতীয় পার্টির ডা. রোস্তম আলী ফরাজী। সরকারি ও বিরোধী দলের বহু সদস্য স্পীকারের কাছে এ ব্যাপারে কথা বলার অনুমতি চাইলেও তিনি সুযোগ দেননি। হৈচৈ এর মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী এ.এস.এইচ.কে সাদেক প্রশ্নের জবাব দিতে দাঁড়িয়ে মূল প্রশ্ন এড়িয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করে টানা ১৭ মিনিট বক্তৃতা করেন। শিক্ষামন্ত্রীর বক্তৃতার পুরো সময় সরকার ও বিরোধী দলের সদস্যরা উচ্চস্বরে প্রতিবাদ করতে থাকেন। মাদ্রাসা বন্ধ করার প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন কমিটি দেশের ২২০০ মাদ্রাসা বন্ধ করার পরামর্শ দিয়ে রিপোর্ট পেশ করেছিল। সরকার অনেক ছাড় দিয়ে মাত্র ৩০০ মাদ্রাসা এমপিও স্থগিত করেছে'। ছাত্রী উপবৃত্তি সংকোচন নীতির ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী তার বক্তৃতায় কিছু বলেননি।

নারী প্রগতি সংঘের সাথে এডাবও একই ভূমিকা রেখেছে। ২৪ মার্চ ২০০০ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি খবরের শিরোনাম ছিল 'মাদ্রাসা শিক্ষাখাতে ব্যয় কর্তন করিয়া সাধারণ শিক্ষাখাতে বরাদ্দের দাবী'। দাবীটি করে এনজিও সংস্থা এডাব। ইত্তেফাকের খবর

www.pathagar.com

থেকে জানা যায়, পরিবেশ দূষণ মুক্তির জন্য টু-স্ট্রোক ইঞ্জিনের বেবীট্যাক্সী নিষিদ্ধ করা, পলিথিন ব্যাগের ওপর শুল্ক বৃদ্ধি করা, শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ করা, সোশাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের জন্য রাজস্ব বরাদ্দ করা, নগরের দরিদ্রদের জন্য গৃহায়ণ প্রকল্প গ্রহণ করা, পোশাক কারখানাগুলোকে শহরের প্রান্তে স্থানান্তরিত করা এবং প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় না বাড়ানোর জন্য প্রস্তাব দিয়েছে এডাব। এই প্রস্তাব দেয়া হয় অর্থমন্ত্রী শাহ এ.এম.এস.কিবরিয়াকে। উপস্থিত ছিলেন এডাবের চেয়ারম্যান খুশি কবীর, এডাবের নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ, এনজি'র নেতৃবৃন্দ। ইত্তেফাকের ভাষ্য মতে, 'মাদ্রাসা শিক্ষা প্রসঙ্গে এডাব তাহাদের বাজেট প্রস্তাবে বলিয়াছে, মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় এবং তাহার বিনিময়ে অনেক ক্ষেত্রেই যাহা পাওয়া যায় সেই হিসাব করা অত্যন্ত জরুরী। গত কয়েক বছরের প্রবণতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য আর্থিক বরাদ্দ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। শিক্ষা খাতে অর্থের একটি বড় অংশ মাদ্রাসা শিক্ষাখাতে চলিয়া যাইতেছে। অথচ মাদ্রাসাগুলোর একটি বড় অংশে গ্রহণযোগ্যমানের শিক্ষা পাওয়া যাইতেছে না। এসব শিক্ষার সামাজিক উপযোগীতা কোনক্রমেই সাধারণ শিক্ষার মত নয়'। আর বলা হয়, 'একটি বড় সংখ্যক মাদ্রাসা ছাত্র কর্মক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়া পিছাইয়া পড়িতেছে। এই অবস্থায় কার্যকর মানব সম্পদ গড়িয়া তোলার জন্য সাধারণ শিক্ষা প্রদানে সক্ষম মাদ্রাসাগুলিতেই সহায়তা দেওয়ার এবং অনুপযুক্ত মাদ্রাসাগুলির আর্থিক সহায়তা কর্তন করিয়া তাহা সাধারণ শিক্ষাখাতে প্রবাহিত করার প্রস্তাব করা হইয়াছে'।

ধর্ম ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের কারণে ১৯৯৮ সাল থেকে ১৯৯৯ সালে সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্বযাত্রীদের সংখ্যা ১ হাজার ৪১ জন কম হয়। সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্বযাত্রীদের ব্যালটি হাজী ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে হজযাত্রীদের নন ব্যালটি হাজী বলে। ১৯৯৮ সালেও ১৯৯৭ সালের তুলনায় ৯শ' ৪ জন কম হয়েছিল। মক্কা শরীফে বাড়ি ভাড়ার নামে হাজীদের টাকা আত্মসাৎ, হেরেম শরীফের বহু দূরে দুর্গম পাহাড়ের ওপর কষ্টকর যাতায়াত, মোটা অংকের ফি দেয়ার পরও হজ্বঅনুষ্ঠানে মোয়ালেমদের গাফিলতিসহ নানা অনিয়মের ফলে সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্বযাত্রীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। ১৯৯৯ সালে ৭ হাজার হাজীর জন্যে মক্কায় ৯২ টি বাড়ি ভাড়া করা হয়। হাজীদের বিমান ভাড়া, মক্কায় বাড়ি ভাড়া, মোয়ালেম ফি, মিনা-মুজদালিফায় কোরবানী ও অন্যান্য খরচ বাবদ ৮৪ হাজার টাকা প্রতিজন হাজীর নিকট থেকে সরকার আদায় করে। ১৯৯৮ সাল থেকে জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা করে বেশি নেয়া হয়।

২৮ মার্চ ১৯৯৯ বিশ্ব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার দিলীপ কুমার সিনহা কলকাতার শান্তি নিকেতনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক ডি-লিট উপাধি প্রদানের জন্য আয়োজিত বিশেষ সমাবর্তনে সম্মাননাপত্র পাঠ করার সময় বলেন 'শেখ হাসিনা আমাদেরই লোক। আজ তাকে সম্মান জানানোর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের আরো কাছাকাছি আসলেন'। দিলীপ কুমার সিনহা তার বক্তব্যে শেখ হাসিনার জীবন বৃত্তান্ত তুলে ধরে তার গুণাবলী উল্লেখ করেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন, '১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তিনি গণতন্ত্রের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করেন। এর আগে অজ্ঞাতবাসে থেকেও তিনি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন'। মিঃ সিনহা বাংলাদেশ জাতীয় সংসদকে 'লোকসভা' হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, '১৯৮৬ সালে শেখ হাসিনা লোকসভায় বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন'। আবেগ-আপ্লুত মি সিনহা হিন্দুদের মতো মুসলমান প্রধানমন্ত্রীর সিঁথিতে সিদুর পরিয়ে দেন। বিশ্ব ভারতীর

www.pathagar.com

চ্যান্সেলার ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দর কুমার গুজরাল শেখ হাসিনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'দেশিকোত্তম' উপাধীর সনদ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটির এই পর্ব শুরু হয় শঙ্খ ধ্বনি দিয়ে আর শেষ হয় ওম শান্তি, ওম শান্তি উচ্চারণে শান্তি বচনের মাধ্যমে। শেখ হাসিনা এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি আইকে গুজরাল অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। আশ্রম সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশ্ব ভারতীয় শিল্পীরা। বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ১০টা থেকে অনুষ্ঠানটি দূরদর্শন এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন সরাসরি সম্প্রচার করে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৯৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫টি বিভাগের অনার্স শ্রেণীতে অঘোষিতভাবে মাদ্রাসার ছাত্রদের ভর্তি বন্ধ করে দিয়েছে বলে দৈনিক ইত্তেফাকের এক খবরে প্রকাশ। খবরটিতে বলা হয়, ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় প্রধান্য পাইলেও মাদ্রাসা আলিম (এইচ এস সি সমমানের) পাস ছাত্র-ছাত্রীদের 'খ' ও 'ঘ' ইউনিটভুক্ত ইংরেজি, অর্থনীতি, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, সমাজবিজ্ঞান এবং সমাজকল্যাণ বিভাগে ভর্তি করা হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে নিম্ন মেধাক্রমধারীদের দিয়ে এ বিষয়গুলোর আসন পূর্ণ করা হচ্ছে। বর্তমানে 'খ' ও 'ঘ' ইউনিটের ভর্তির জন্য সাক্ষাৎকার চলছে। অতীতে বাংলা বিভাগের মাদ্রাসা ছাত্রদের ভর্তি করা হতো না। এ নিষেধাজ্ঞার ফলে অনেক মেধাবী ছাত্রের ভবিষ্যত শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

১৫ সেপ্টেম্বর ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজিব হলের ১২ জন ছাত্রকে কোরআন শিক্ষার আসর থেকে ধরে এনে মারধর করে হল থেকে বের করে দেয়। একইদিনে স্কার্ফ পরার কারণে বের করে দেয়া চট্টগ্রাম ইস্পাহানী স্কুল ও কলেজের ছাত্রী সৈয়দা আতিয়া বেগমের পিতা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর সৈয়দ মোহাম্মদ আতাহার এক বিবৃতিতে বলেন, 'কলেজের প্রিন্সিপাল আমার মেয়েকে বইপত্র সহ কলেজ ত্যাগ করতে বাধ্য করেন'। স্কার্ফ পরার কারণে আতিয়া বেগমকে কলেজ থেকে বের করে দেয়া প্রসঙ্গে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন ও কলেজ প্রিন্সিপালের প্রতিবাদের প্রেক্ষাপটে তিনি এ দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি বলেন, 'ঘটনার প্রকৃত বিবরণ প্রদান করা আমি নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করি। আতিয়া বেগম ১০ আগষ্ট উক্ত কলেজে ভর্তি হয়। ১৬ আগষ্ট থেকে ক্লাস শুরু হলে সে নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান করে ক্লাস করতে থাকে। সে একজন প্রাপ্ত বয়স্কা ও ধর্মপ্রাণ মুসলমান রমণী হিসেবে কলেজের ইউনিফর্মের অতিরিক্ত একটি স্কার্ফ দিয়ে তার মাথা, মুখের নিম্নভাগ ও কবজি পর্যন্ত হাত আবৃত করে রাখে। ১৬ আগষ্ট সে এভাবেই ক্লাস করে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের লেকচার শুনতে থাকে। কিন্তু ১৭ আগষ্ট ক্লাস শুরু পূর্বে আনুমানিক সকাল ৭টা ৫০ মিনিটে ক্লাসে উপরোক্তভাবে মাথা, মুখ ও হাত আবৃত না করে ক্লাস করার জন্য তাকে শ্রেণী শিক্ষিকার মাধ্যমে মৌখিকভাবে বলা হয়। এতে ধর্মীয় বিধান লংঘিত হবে ভেবে সে সম্মত হয়নি। এরপর তার মাধ্যমে আমাকে কলেজের প্রিন্সিপালের সাথে দেখা করার জন্য বলা হয়। সে অনুযায়ী আমি ১৮ আগষ্ট সকাল সাড়ে ৯ টায় তার সাথে দেখা করি। এই সাক্ষাৎকারে আমি ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী পর্দা রক্ষার সুযোগ দিয়ে আমার মেয়েকে ক্লাস করার অনুমতি প্রদানের জন্য তার কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি তাতে সম্মত হননি। এ অবস্থায় আতিয়া ১৯ আগষ্ট আবার কলেজে যায় এবং যথারীতি ক্লাস করে। ক্লাস শেষে তাকে প্রিন্সিপাল তার কক্ষে ডেকে নেন এবং ২১ আগষ্ট সকাল ১০ টায় কলেজ থেকে টিসি নিয়ে যেতে বলেন। এ অবস্থায় আমি ২১ আগষ্ট নিজে মেয়েকে কলেজে নিয়ে যাই এবং ক্লাস করতে বলি'। বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'আমার ধারণা

www.pathagar.com

ছিল এ ধরনের একটি অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত হয়ত শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন হবে এবং প্রিন্সিপাল ইসলামের বিধান অনুযায়ী পর্দা রক্ষার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে আমার মেয়েকে ক্লাস করার অনুমতি দিবেন। তিনি একজন মুসলিম নারী হওয়ায় তার কাছ থেকে এই প্রত্যাশা করা আমার কাছে অসঙ্গত এবং অস্বাভাবিক মনে হয়নি। কিন্তু আমার প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়। ঐদিন ক্লাস শেষ হওয়ার পর তিনি আমার মেয়েকে তার কক্ষে ডেকে পাঠান এবং কয়েকজন শিক্ষকের উপস্থিতিতে তার প্রতি কটাক্ষপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করেন। প্রিন্সিপাল তাকে সাদা কাগজে দস্তখত দিয়ে কিছু কাগজপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন। আমার কন্যা এই অবস্থায় সাদা কাগজে দস্তখত দিতে অস্বীকার করে উল্লেখিত কাগজপত্র আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ জানায়। এরপর প্রিন্সিপাল আমার মেয়েকে সকাল ১০টা ২০ মিনিটে বই পত্র সহ কলেজ ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। ২২ আগষ্ট এক আবেদনপত্রে আমার কন্যাকে ইসলামী বিধান অনুযায়ী পর্দা অনুসরণ করে ক্লাস করার অনুমতিদানের আবেদন করি। এ আবেদনের কোন উত্তর না পেয়ে আমি ২৮ আগষ্ট আরো একটি আবেদন করি। আজ অবধি তার কোন উত্তর পাইনি। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে প্রদত্ত প্রতিবাদে কলেজ প্রিন্সিপাল এ সত্য ঘটনাকে সম্পূর্ণ অসত্য ও ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ উল্লেখিত ঘটনার কোন কিছুই উল্লেখ না করে ঢালাওভাবে অসত্য ও ভিত্তিহীন হিসেবে অবহিত করায় আমি বিস্মিত হয়েছি। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে নিজেদের যথাযথ ও নিষ্কলুষ মনে করলে ঘটনার প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করতে পারতেন। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছ থেকে এতটুকু সততা ও সৎসাহস মূল্যবোধের এ বিপর্যয়ের যুগেও আমরা প্রত্যাশা করি। ইসলামী বিধিবিধান ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণের যে দাবী প্রতিবাদপত্রে করা হয়েছে তা সত্য হলে আমার কন্যার ব্যাপারে এসব ঘটনা কেন ঘটলো? কলেজ কর্তৃপক্ষ কি তার কোন ব্যাখ্যা দিবেন? প্রতিবাদলিপিতে আরো বলা হয়েছে, কলেজের রীতিনীতি ও সুনির্দিষ্ট ইউনিফর্ম পড়ে ক্লাসে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক। এতে সহযোগীতা দেয়া অভিভাবকদের কর্তব্য। পত্রের বক্তব্যে মনে হয়, আমার কন্যা ইউনিফর্ম পড়ে ক্লাসে যায়নি। কলেজ কর্তৃপক্ষের এই বক্তব্যকে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস বললেও কম বলা হবে। আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই, আমার মেয়ে কলেজের নির্ধারিত পোশাক পরিধানের বিধান কোনোভাবেই লংঘন করেনি। সে শুধু নির্দিষ্ট পোশাকের অতিরিক্ত একটি স্কার্ফ পড়ে মাথা ও মুখ আবৃত করেছে। একজন প্রাপ্তবয়স্কা মুসলমান রমণীর জন্য পর্দার এ বিধান পালন শুধু তার অধিকারই নয়-ধর্ম নির্দিষ্ট কর্তব্যও বটে। এ ধর্ম নির্দিষ্ট বিধান পালনে বাধা দেয়ার অধিকার ইস্পাহানী স্কুল ও কলেজের কর্তৃপক্ষের কিংবা কোন সমাজ বা রাষ্ট্রেরও নেই'।

২১ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশ, 'মুজিববাদী ছাত্রলীগ কর্মীরা শিবির কর্মী সন্দেহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো ৮ জন ছাত্রকে প্রহার করে বের করে দিয়েছে। গত সোমবার (২০ সেপ্টেম্বর) ভোররাতে মুহসীন হলের আবাসিক ছাত্র বাকিবিল্লাহ ফজরের নামাজ পড়ার জন্য হলের মসজিদের দিকে আসছিল। এ সময় হল শাখার ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাখাওয়াত হোসেন, বিমান ও হাবিব তাকে শিবির কর্মী সন্দেহে আটক করে এবং কাটা রাইফেলের বাঁট দিয়ে নির্দয়ভাবে প্রহার করে। পরবর্তীতে তারা হলের আরো ৭ জন ছাত্রকে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে আসার সময় শিবির কর্মী সন্দেহে আটক করে। এসময় ছাত্রলীগ কর্মীরা তাদের প্রহার করে হল থেকে বের করে দেয়। হলে শিবিরের ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি আছে বলে ছাত্রলীগ সূত্রে অভিযোগ করা হয়েছে'। নামাজী ছাত্রদের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগের

www.pathagar.com

এ্যাকশনের অংশ হিসেবে ২৩ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া হলে ৪ জন ছাত্রকে গভীর রাতে তিন ঘন্টা ধরে বেদম প্রহার করে হল থেকে বের করে দেয়া হয়। ছাত্রলীগ ক্যাডাররা চার নামাজী ছাত্রকে ঘুম থেকে তুলে তাদের শিবির কর্মী আখ্যায়িত করে মারতে শুরু করে। ছাত্রলীগ ক্যাডাররা এ সময় লাঠি, হকিস্টিক, রড, চামড়ার বেল্ট দিয়ে মেরে গুরুতর আহত করে। তাদের আর্তচিৎকারে হলে আতংকজনক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এ সময় হলের সামনে রমনা থানা এস.আই সাজাজাদের নেতৃত্বে দু'ট্রাক পুলিশ অবস্থান করছিল। তারা নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকে। ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা নামাজী ছাত্রদের বইপত্র এবং অন্যান্য মালামালও লুঠ করে। সংশ্লিষ্ট হল ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের রহস্যজনক নীরব ভূমিকা এসব অবৈধ কাজে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের আরো বেশি উৎসাহ দেয়। হলে সাধারণ মারামারির ঘটনায় কর্তৃপক্ষ সাথে সাথে জড়িত ছাত্রকে শোকজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করলেও এসব ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ন্যূনতম কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়নি। ২৪ সেপ্টেম্বর সৌদী রয়ালকে বের করে দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ছাত্রদের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাতিমান অধ্যাপক বলেন, 'শিবির আখ্যা দিয়ে ছাত্রদলের ছেলেদের পিটিয়ে হল থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে'। একই দিনে ঘটে আরেকটি ঘটনা। শেফালী দাস, সোমা দত্ত, জয়ন্তী সাহা, গীতা অধিকারী, পুতুল রানীর নেতৃত্বে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের কর্মীরা ফয়জুন্নেসা হলের ১১২ নম্বর রুমে হামলা চালিয়ে রুম ভাঙচুর করে এবং কক্ষের ছাত্রীদের মারধর করে। ছাত্রীরা এ সময় কোরআন শরীফ ছিঁড়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং ফ্রেমে বাঁধানো কাবা শরীফের ছবি ভেঙ্গে ফেলে। এর আগে তারা রোকেয়া হলের বিভিন্ন কক্ষে হামলা চলিয়ে নামাজী ছাত্রীদের বইপত্র সহ মূল্যবান জিনিসপত্র তছনছ করে। এ সময় তারা বর্ধিত ভবনের একটি কক্ষের একজন ছাত্রীর জায়নামাজ পদদলিত করে এবং কোরআন শরীফ শেখানোর ব্লাকবোর্ড মাঠে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। তারা এ কক্ষের ছাত্রীদের তথাকথিত গোপন দলীয় চিঠি উদ্ধার করে বলে দাবী করে। ঐ কক্ষে একজন ছাত্রী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আগ্রহী ছাত্রীদের কোরআন শিক্ষা দিত। প্রায় এক বছর ধরে মেয়েরা ঐ ছাত্রীর নিকট বিভিন্ন ব্যাচে কোরআন শিখত। ইতিপূর্বে হলের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ঐ ছাত্রীর কোরআন তেলাওয়াত উপস্থিত সকল ছাত্রীকে মুগ্ধ করে। পরবর্তীতে হলের সাধারণ ছাত্রীরা তার নিকট কোরআন শিখতে আগ্রহ ব্যক্ত করে। ঘটনার পরদিন শেফালী দাস, সোমা দত্ত, জয়ন্তী সাহা, গীতা অধিকারী, পুতুল রানী, কন্নিসহ ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির সাথে সাক্ষাত করে তথাকথিত ছাত্রী সংস্থার ১০ মেয়েকে বহিষ্কারের দাবী করে। ভিসিও তাদের এ ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগীতার আশ্বাস দেন। ভিসি কোরআন অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে উল্টো নামাজী ও ধার্মিক মেয়েদের বহিষ্কারের আশ্বাস দিয়ে প্রমাণ করেন, এ ঘটনার নেপথ্যে তার মদদ ছিল। ২৫ সেপ্টেম্বর পত্রিকান্তরে একটি খবরে বলা হয় যে, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে সুকৌশলে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বানিয়ে নামাজী, ধার্মিক ছাত্রদের ওপর মুজিববাদী ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে'। একই দিন দৈনিক ভোরের কাগজে শিবির কর্মী সন্দেহে ওই ৬ জনকে পিটিয়ে বের করে দেয়ার বিষয়টি প্রকাশের পাশাপাশি উল্লেখ করা হয় যে, 'শামসুন্নাহার হলে ৫১ সদস্যের ছাত্র শিবির কমিটি চিহ্নিত করা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে কাউকে কাউকে শিবির কর্মী আখ্যায়িত করে হল থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে। ছাত্রলীগ ও অন্যান্য বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের

www.pathagar.com

নেতৃবৃন্দ কাউকে বিতাড়নের আগে সে শিবির কর্মী কি-না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য বলেছেন'। নামাজী ও ধার্মিক ছাত্রদের উপর নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করলেও ২৫ সেপ্টেম্বর প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির এক সভায় উস্কানিমূলক একটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্তে বলা হয় 'স্বাধীনতার সূতিকাগার এ বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কোন প্রকাশ্য ও গোপন তৎপরতা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়'।

১৩ অক্টোবর চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা নসু চৌধুরীর মদদপুষ্ট একদল চিহ্নিত সন্ত্রাসী ঐতিহ্যবাহী আবেদিয়া মুজাদ্দেদিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার জায়গায় একটি অবৈধ ক্লাব ঘর নির্মাণ করতে চেষ্টা করলে মাদ্রাসার ছাত্ররা বাধা দেয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সন্ত্রাসীরা মাদ্রাসা ও এতিমখানায় বর্বরোচিত হামলা চালায়। উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামিক চিন্তাবিদ শায়খুল হাদিস মরহুম সৈয়দ মোঃ আবু নসর আবেদ শাহ মোজাদ্দেদী আল মাদানী (রঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত ইমামে রাব্বানী দরবার শরীফটি এই মাদ্রাসা ও এতিমখানা কমপ্লেক্স ছিল। সন্ত্রাসী হামলায় শিক্ষকসহ ২০ জন মাদ্রাসার ছাত্র গুরুতর আহত হয়। হামলার সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে সন্ত্রাসীদের কোনো প্রকার বাধা বা গ্রেফতার না করে নীরব দর্শকের মত দাঁড়িয়ে থাকে। প্রশাসনের এই ন্যক্কারজনক ভূমিকায় হাজীগঞ্জসহ চাঁদপুর জেলার সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ বিরাজ করে। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ মামলা নিতে অপারগতা প্রকাশ করে।

২ অক্টোবর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগে নবাগতদের বরণের নামে ঘটা করে রাখি-তিলক পরতে বাধ্য করা ও মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রীসহ প্রায় ২০ হাজার সদস্যের ৯৫ শতাংশই মুসলমান। অতীতের কোন সময় এখানে রাখি-তিলক বা মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়নি। সেদিন সাংবাদিকতা বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীদের বাধ্যতামূলকভাবে রাখি বন্ধন ও তিলক পরান হয়। পাঁচ পাঁচটি মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু করা হয়। নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণা হয়েছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বোধ হয় এভাবেই শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। এজন্য মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীরা কোন উচ্চবাচ্য করেনি। কিন্তু ক্লাস শেষে তাদের হাতে রাখি বন্ধন ও কপালে তিলক দেখে অন্যান্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা হতবাক হয়ে যায়।

সেপ্টেম্বর (১৯৯৯) মাসে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে নামাজরত মুসল্লীদের উপর পুলিশ হামলা চালায়। ডিসি ট্রাফিক মোস্তাক হোসেন খান জুয়েলের নির্দেশে পুলিশের এই বর্বরোচিত হামলার ঘটনা ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা করেছে। জুয়েলের নির্দেশে দাঙ্গা পুলিশের দুই সদস্য সাব ইন্সপেক্টর সুভাষ ও সুকুমার এই হামলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তারা মসজিদে বুট জুতা পরিহিত অবস্থায় প্রবেশ করে নামাজরত মুসল্লীদের উপর নির্বিচারে গুলি ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। এতে বহু মুসল্লী সিজদায় থাকা অবস্থায়ই গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়েন, গুলির আঘাতে মসজিদের দেয়ালের ইট খসে পড়ে। মুসল্লীদের তাজা রক্তে মসজিদের মেঝে ভিজে যায়। মসজিদের দেয়ালে ছোপ ছোপ রক্ত লেগে থাকে। মুসল্লীদের রক্তে বুটের তলা রঞ্জিত করে পুলিশ এগিয়ে যায়। তারা আহত ও আতংকিত মুসল্লীদের বেধড়ক লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকে। রাইফেলের বাঁট ও বুটের লাথি খেয়ে মানুষ 'আল্লাহ' বলে চিৎকার দিয়ে একে একে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। পুলিশ আহতদের জবজবে রক্তের উপর দিয়ে জানোয়ারের মত টেনে-হিঁচড়ে নামিয়ে নিয়ে যায়। এদিকে বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা

www.pathagar.com

জিয়া জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ শুরু করার পর পুলিশের ব্যারিকেডের ভেতরে রায়ট কারের পাশে দাঁড়ানো কনস্টেবল বিদ্যুৎ কুমারের (কন্সঃ নং-৬৭৭৯) ঘাড়ের পাশ দিয়ে একটি বোমা পড়ে। বোমা পড়ার সাথে সাথেই বিদ্যুৎ কুমার রাস্তায় শুয়ে পড়ে। বোমা বিস্ফোরণের আগেই মোস্তাক হোসেন ফায়ার বলে চিৎকার দেয়। সাথে সাথেই গুলি ও টিয়ারশেল বর্ষণ শুরু হয়। কেউ কেউ মসজিদে ঢুকে পড়ে। এ সময় মসজিদে জোহরের নামাজ হচ্ছিল। তখন মোস্তাক শালাদের ধর বলে চিৎকার দিয়ে তার দল নিয়ে দৌড় দেয়। পুলিশ ফায়ার করতে করতে মসজিদের ভেতরে ঢুকে পড়ে। হামলা শেষে যখন পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে তখন মোস্তাককে ওয়্যারলেস সেটে বলতে শোনা যায়, 'স্যার শালাদের সাইজ করে দিয়েছি'।

৬ নভেম্বর দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য নির্মিতব্য একটি আবাসিক হলের ডিজাইন থেকে মসজিদ বাদ দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫শ' মুসলিম ছাত্রের বসবাসের জন্য প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে এ হলটি নির্মাণ করা হবে। এই হলটিসহ আরেকটি ছাত্রী হল নির্মাণের জন্য শীঘ্রই দরপত্র আহবান করা হবে। কার্জন হল এলাকায় পুরনো জাদুঘরের পাশে ছাত্র হল এবং কুয়েত মৈত্রী হল সংলগ্ন মাঠে নতুন ছাত্রী হল নির্মিত হবে। হল দু'টির ডিজাইন ইতোমধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী নিশ্চিত করে বলেছেন, নতুন ছাত্র হলটির ডিজাইনে মসজিদের স্থান নেই। তবে নামাজঘর হিসেবে একটি কক্ষ রাখা হবে'।

২০ নভেম্বর ৮৮ বছর বয়সে সুফিয়া কামাল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার মৃত্যুর ৩ দিন পর ২৪ নভেম্বর তাকে দাফন করা হয়। ২৩ নভেম্বরের দিবাগত রাত ছিল শবে বরাত। ২৪ নভেম্বর শবে বরাতের কারণে ছিল সরকারি ছুটি। কিন্তু এই দিনটিকে সুফিয়া কামালের স্মরণে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। সুফিয়া কামালের দাফনের বেদনা উপশম হওয়ার আগেই আওয়ামী মদদপুষ্ট মহলটি তার সম্পর্কে এমন সব তথ্য প্রকাশ করে যা মরহুমাকে মুহূর্তের মধ্যেই দারুনভাবে বিতর্কিত করার বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ২৪ নভেম্বরকে শোক দিবস হিসেবে পালন করার পেছনে পবিত্র শবে বরাতের মহিমা এবং ফজিলতকে ক্ষুণ্ন করার যে ষড়যন্ত্র ছিল সেটা বুঝতে বেশি বেগ পেতে হয়নি কারো। সুফিয়া কামালের মৃত্যু হয় ২০ নভেম্বর। শোক দিবস পালন করতেই হয় তাহলে সেটা করা উচিত ছিল যেদিন তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু সেটা না করে ৩ দিন পর যখন তার দাফন করা হয় সেই দিনটিকে শোক দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

ব্রিটিশ আমল থেকে সাতক্ষীরার বৈকারী সীমান্তের কাসিয়ানি ছয়ঘারিয়ার ঈদগাহে দুই গ্রামের বাসিন্দারা নামাজ আদায় করে থাকে। কালক্রমে ঈদগাহটি বিনষ্ট হওয়ায় নতুনভাবে তা নির্মাণের জন্য ২ নভেম্বর কাজ শুরু করা হয়। সীমান্ত এলাকায় নির্মাণাধীন ঈদগাহের কাজ শুরুর হওয়ার পরই ভারতীয় বিএসএফরা প্রথম মৌখিক ও পরে লিখিতভাবে প্রতিবাদ জানায়। এ নিয়ে বিডিআর ও বিএসএফ-এর মধ্যে দুই দফা ফ্ল্যাগ মিটিংও হয়। বিএসএফ বলে, ১৯৭৫ সালের মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি মোতাবেক জিরো লাইনের ১৫০ গজের মধ্যে কোন নির্মাণ কাজ করা যাবে না। বিডিআর এ জবাবে বলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ কাজে বাধা নেই। এরপর বিএসএফএর কর্মকর্তারা বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডে এসে গ্রামবাসীকে শাসিয়ে বলে যায়, 'নির্মাণ কাজ পুনরায় চালু করলে গুলি করা হবে'।

লক্ষাধিক মুসলমানদের কর্মস্থল চট্টগ্রাম ইপিজেডে ঠিকভাবে নামাজ-রোজা আদায় করতে দেয়া হচ্ছে না বলে ২৪ ডিসেম্বর দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশ। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়,

www.pathagar.com

'বাংলাদেশের সকল বৃহৎপ্রতিষ্ঠানে এবাদতখানার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মসজিদের ব্যবস্থা থাকলেও সিইপিজেডের মূল পরিকল্পনায় কোন মসজিদ বা এবাদতখানার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ফলে ইপিজেড চালু হওয়ার পর থেকেই এখানে কর্মরত মুসলমানরা ধর্মীয় কর্তব্য পালনে নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়। বিশেষ করে ইপিজেডের অধিকাংশ বিনিয়োগকারী বিদেশী এবং অমুসলিম হওয়ায় তারা ধর্মীয় কর্তব্য পালনের ব্যবস্থা না করে বরং নামাজ আদায়ে নানাবিধ নিষেধ আরোপ করে। ধর্মীয় কর্মরত মুসলমানরা নানাভাবে এর প্রতিবাদ করলেও চাকরি হারানোর ভয়ে কেউ বেশি দূর আগানোর সাহস পায়নি। ২০ ডিসেম্বর ইপিজেডের সেক্টর-৫ এ অবস্থিত স্পিনিং প্রাইভেট লিমিটেডের শ্রমিকরা আসর নামাজ আদায় করতে চাইলে অনুমতি দেয়া হয়নি। ফলে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা ফ্যাক্টরীতে ভাঙচুর করে এবং মিছিল সহকারে পার্শ্ববর্তী মসজিদে নামাজ আদায়ের চেষ্টা চালায়। এ সময় বেপজা কর্মকর্তারা দ্রুত পুলিশ ডেকে হুমকি-ধমকি চালিয়ে শ্রমিকদের নিবৃত করার চেষ্টা করে। চীনা বিনিয়োগকারীদের এ কারখানায় অন্য শ্রমিকরা ইফতারী তৈরির সময় কর্মকর্তারা লাথি মেরে পানি ও ইফতারী ফেলে দেয় এবং রাত ৯ টার আগে কোন খাওয়া গ্রহণ করা যাবে না মর্মে নির্দেশ জারি করে। পরিস্থিতি অবনতিশীল বুঝতে পেরে কারখানাটি ১৪ ডিসেম্বর থেকে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ইপিজেড কর্তৃপক্ষ এখানেই ক্ষান্ত হয়নি বরং বেপজা কর্মকর্তারা সেদিন উক্ত কারখানার পার্শ্ববর্তী একমাত্র প্রাচীন মসজিদটির মাইক, কারপেট ও জায়নামাজ ছিনিয়ে নিয়ে তালাবদ্ধ করে দেয়। সাথে সাথে মসজিদটিতে নামাজ আদায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

জাকাত ফান্ডের বেহাল অবস্থার বিবরণ দিয়ে ৩১ ডিসেম্বর দৈনিক দিনকালে একটি তথ্যবহুল রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মাওলানা নূরুল ইসলামকে সভাপতি ও ইসলামী ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মাওলানা আব্দুল আওয়ালকে সদস্য সচিব করে দলীয় এমপি ও সমর্থকদের সমন্বয়ে যাকাত বোর্ড পুনর্গঠন করে। দু'একজন ছাড়া বোর্ডের বেশিরভাগ সদস্যের ইসলামী শরীয়তের বিধানে জাকাতের হুকুম-আহকাম সম্পর্কেই বাস্তব জ্ঞান ছিল না। রিপোর্টে প্রকাশিত তথ্যে জানা যায়, ১৯৮২ সালে রাষ্ট্রীয় জাকাত বোর্ড গঠনের পর শুরু থেকেই প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী সরাসরি জাকাতের অর্থ সংগ্রহে উদ্যোগ নিতেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাষ্ট্রীয়ভাবে জাকাত আদায়ের জন্য প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এমনকি ধর্ম মন্ত্রণালয়েরও কোনো উদ্যোগই নেই। সাধারণ বিত্তবানরা অধিক সওয়াবের আশায় পবিত্র রমজান মাসেই জাকাত প্রদান করেন। রাষ্ট্রীয়ভাবে জাকাত আদায়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের সম্মানে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে থাকেন। কিন্তু ১৯৯৯ সালে এ ধরনের কোনো উদ্যোগ বা কর্মসূচি নেয়া হয়নি। জেলা প্রশাসক সভাপতি ও জেলার ইসলামী ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাকে সদস্য সচিব করে যে জেলায় জাকাত কমিটি ছিল তাদের নিকট চিঠি দিয়ে বিত্তবানদের কাছ থেকে জাকাত সংগ্রহের অনুরোধ জানিয়ে জাকাত বোর্ড তাদের দায়িত্বমুক্ত হয়। ১৯৮২ সালের প্রেসিডেন্টের ৬ নম্বর অধ্যাদেশের ৫ নং ধারার আদেশ বলে জাকাত ফান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের ধনী বিত্তবান, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের কাছ থেকে স্বেচ্ছায় প্রদানমূলক পুর্নবাসনের সাহায্যের লক্ষে এই ফান্ড সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে জাকাত বোর্ড ৭ টি প্রকল্প গ্রহণ করে। অসহায়, এতিম ও দুস্থ শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য গাজীপুর জেলার টঙ্গী পৌরসভা এলাকার দত্ত পাড়ায় ১৯৮৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি শিশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমাজের গরীব ও দুঃস্থ অসহায় মানুষের সন্তানদের শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্যসূচির

www.pathagar.com

পাশাপাশি দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করার জন্য ১৯৮৫ সালে ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট থানার যাদুপাড়া গ্রামে যে অবৈতনিক আদর্শ মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অর্থ সংকটের কারণে তা ইসলামী মিশনের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এভাবে গরীব, দ্বীনদার ও নওমুসলিমদের হালাল উপায়ে জীবিকা নির্বাহের লক্ষ্যে রিকশা ও ভ্যান গাড়ি বিতরণের প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যায়। গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক ৬০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান ও দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে হাঁস মুরগি বিতরণ প্রকল্পও অর্থাভাবে আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। পাশাপাশি অর্থের অভাবে দুঃস্থ এতিম, মুমুর্ষূ রোগীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান কর্মসূচিও বন্ধ ছিল।

মক্কা শরীফে ব্যালটি হজ্বযাত্রীদের জন্য বাড়ি ভাড়া নিয়ে পর পর ১৯৯৮-২০০০ সালে ভয়াবহ কেলেঙ্কারি ঘটে। এ জন্য ধর্ম প্রতিমন্ত্রীই দায়ী ছিলেন। সৌদি আরবে বসবাসরত কিছু লোকের কারসাজিতে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী নূরুল ইসলামের আশির্বাদে হজ্বযাত্রীদের জন্য যে বাড়ি ভাড়া করা হয় তা খুবই নিম্নমানের এবং এতে হাজীদের নিদারুন কষ্ট হয়। বাড়ি ভাড়া কেলেঙ্কারীর সঙ্গে ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর জড়িত থাকার অভিযোগ বার বার উত্থাপিত হলেও শেষ পর্যন্ত তা ধামাচাপা পড়ে যায়। হাজার হাজার বয়োবৃদ্ধ হাজীর সীমাহীন কষ্টের কোন উপশম হয়নি। ২০০০ সালের বাড়ি ভাড়া কেলেঙ্কারির জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোরশেদ হোসেন জেদ্দায় বাংলাদেশ মিশনের হজ্ব অফিসার আব্দুল মতিন ভূঁইয়াকে দায়ী করেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি দৈনিক যুগান্তরের পক্ষ থেকে এই অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী হজ্ব অফিসারের অনুকূলে দৃঢ়তার সঙ্গে সাফাই বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, '৮০০ মিটারের দূরে কোন বাড়ি ভাড়া নেয়ার অভিযোগ সর্বৈব অসত্য। আমি গতকালও জেদ্দায় হজ্বঅফিসারের সঙ্গে কথা বলেছি। ৭ হাজার হজযাত্রীদের জন্য এবার যত বাড়ি ভাড়া নেয়া হয়েছে তার সবগুলোই নির্ধারিত ৮০০ মিটারের মধ্যে। পাহাড়ে বাড়ি ভাড়া নেয়ার তো প্রশ্নই আসে না'। অথচ অনুসন্ধানে পাওয়া যায়, ধর্ম সচিব, সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত ও জেদ্দায় কনসাল জেনারেল প্রমুখের সমন্বয়ে গঠিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বাড়ি ভাড়া কমিটি সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর আশীর্বাদপুষ্ট হজ্ব অফিসার 'একতরফা' ১১৪ টি বাড়ি ভাড়া নেন। বাড়ি ভাড়া নিয়ে কেলেঙ্কারির খবর ফাঁস হওয়ার পর ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব হজ্বঅফিসার এএমএম আবদুল মতিন ভূঁইয়াকে বাড়ি ভাড়া চুক্তি বাতিলের নির্দেশ দেন। এ প্রেক্ষিতে ৩০ জানুয়ারি হজ্ব অফিসার ভারপ্রাপ্ত ধর্ম সচিবের কাছে এক ফ্যাক্সবার্তায় ৮০০ মিটারের বাইরে ভাড়ি ভাড়া নেয়ার জন্য ধর্ম সচিবের মৌখিক নির্দেশ ছিল বলে স্মরণ করিয়ে দেন। এই ফ্যাক্সের অনুলিপি ধর্ম প্রতিমন্ত্রীকেও দেয়া হয়। এতে উল্লেখ করা হয়, গত রমজানে আপনার জেদ্দা সফরকালেই তো আমি বলেছি যে, সকল বাড়ি ৮০০ মিটারের মধ্যে নেয়া যাবে না। আর এখন তো আমি সৌদি বাড়িওয়ালাদের সঙ্গে চুক্তি করে ফেলেছি। এখন যদি এ চুক্তি বাতিল করা হয় তাহলে তাদের সমুদয় অর্থ পরিশোধ করতে হবে'। ভ্রাতৃপ্রতিম সৌদি সরকার ও জনগণের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে বলেও হজ্বঅফিসার যুক্তি দেন। এ চিঠি পেয়ে ক্ষুব্ধ ধর্ম সচিব হজ্ব অফিসারকে পরদিন ৩১ জানুয়ারি লেখা এক পত্রে পাল্টা স্মরণ করিয়ে দেন যে, 'আপনি তো বিমানবন্দরে সোনা মিয়া নামে এক লোককে নিয়ে এসেছিলেন। এ সময় আপনি আমাকে আশ্বস্ত করেন যে, ৮০০ মিটারের মধ্যেই সব বাড়ি পাওয়া যাবে'। ধর্ম সচিব এই চিঠি লিখার পর ২ ফেব্রুয়ারি ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান স্বাক্ষরিত এক পত্রে হজ্বব্যবস্থাপনার গুরুতর অনিয়ম সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করা হয়। এতে বলা হয়, 'গত ডিসেম্বরে ধর্ম সচিবের সৌদি আরব

www.pathagar.com

সফরের সময় হজ্ব অফিসার বলেন যে, ৮০০ মিটারের মধ্যে সকল বাড়ি কোনক্রমেই পাওয়া সম্ভব নয়। এ কারণে সর্বোচ্চ ৮৬০ মিটারের মধ্যে কিছু বাড়ি ভাড়া নেয়ার প্রস্তাবে ধর্ম সচিব সায় দেন। কিন্তু পরে ধর্ম সচিবের মনে সন্দেহ দেখা দেয় যে, হজ্ব অফিসার অন্য মতলবে ধর্ম সচিবকে উক্তরূপ প্রস্তাব দিয়েছিলেন'। চিঠিতে বলা হয়, 'হজ্ব ব্যবস্থাপনায় উপযুক্ত ভাড়ি ভাড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি স্পর্শকাতর। যদি ৮০০ মিটারের উর্ধ্বে বাড়ি নেয়া হয় তা হাজীদের মারাত্মক বিপদে ফেলবে। সুতরাং হাজীদের স্বার্থের পরিপন্থী তৎপরতা সরকার মেনে নিতে পারে না। সুতরাং ৮০০ মিটারের উর্ধ্বে যদি বাড়ি ভাড়া নেয়া হয় তাহলে তার দায়-দায়িত্ব এককভাবে হজ্ব অফিসারকেই বহন করতে হবে। এ কারণে যে আর্থিক লোকসান হবে তাও তাকে ব্যক্তিগতভাবে বহন করতে হবে'। এই দুর্নীতির সঙ্গে ধর্ম সচিবের যে কোন সম্পক্তৃতা নেই তা স্পষ্ট করতে চিঠিতে মন্তব্য করা হয়।

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০০ দৈনিক দিনকালে হাজী ক্যাম্পের অভ্যন্তরে চরম অব্যবস্থা, অবস্থানরত হজ্ব যাত্রীদের দুর্দশা এবং নিরাপত্তাহীনতার একটি উদ্বেগজনক খবর প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত তথ্য মতে, 'জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের পূর্বদিকে আশকোনায় স্থাপিত স্থায়ী হাজী ক্যাম্পে এখন নিয়ম-শৃংখলা বলতে কিছু নেই। অসংখ্য মানুষ বিনা বাধায় প্রবেশ করছে হাজী ক্যাম্প প্রাঙ্গণে, এমন কি হজ্ব যাত্রীদের কক্ষগুলোতেও। এ সুযোগে পকেটমার এবং প্রতারক চক্র হাতিয়ে নিচ্ছে হজ্ব যাত্রীদের নগদ অর্থ ও ব্যবহার্য জিনিসপত্র। এর মধ্যে একজন হজ্ব যাত্রীর নগদ ১ হাজার ৩শ' ৮০ রিয়াল তার ব্যাগের তালা ভেঙ্গে দুর্বৃত্তরা নিয়ে গেছে। এভাবে অনেকেই পবিত্র হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রাক্কালে দুঃখজনক ঘটনার শিকার হচ্ছেন। অথচ হাজী ক্যাম্পে ৬০ জন পোষাকধারী ও কয়েকজন সাদা পোশাকের পুলিশ, ২৫ জন স্কাউট ও ২০ জন স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে। উপরন্তু আছেন হজ্ব অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব হচ্ছে হজ্বব্রত পালনের নিমিত্তে সমবেত হজ্ব যাত্রীদের দেখ-ভাল করা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু এর কোনটাই যে তারা করছেন না বা করতে পারছেন না'।

৩ মার্চ দৈনিক মানব জমিনের সম্পাদকীয় অংশ বিশেষে উল্লেখ করা হয়, 'বাংলাদেশী হজ্ব যাত্রীরা পেরেশানিতে। বাড়ি সমস্যা তাদের পিছু নিয়েছে। অসুখ-বিসুখে প্রয়োজনীয় ওষুধ-ডাক্তারের অভাব। বাংলাদেশের হজ্ব মিশনের স্বেচ্ছাসেবকরা লাপাত্তা। হজ্ব যাত্রীরা তাদের সেবা-সহযোগীতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। স্বেচ্ছাসেবকদের অনেকে শপিংয়ে ব্যস্ত-এ ধরনের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। অথচ সৌদি আরবে এখন মাঘের শীত। প্রচন্ড এই শীতে হজ্ব যাত্রীরা স্বাস্থ্যসম্মত বাসা পাচ্ছেন না। এ বছর হাজীদের কাছ থেকে বাড়ি ভাড়া বাবদ সরকার অগ্রিম ১৩ হাজার রিয়াল নিয়েছে। অন্যবারের তুলনায় বাড়ি ভাড়া এ বছর বেশি। তারপরও বাড়ি ভাড়ার ব্যাপারে দূরত্ব ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বিষয় বিবেচনা করা হয়নি। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা মতে-বেশির ভাগ বাড়ি পুরনো, বসবাসের স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থা নেই সেগুলোর। একেকটি ফ্লোরে গাদাগাদি করে অনেক লোকজনের থাকার ব্যবস্থা করায় দুর্ভোগের শিকার হতে হয়েছে হাজীদের। পরিত্যক্ত বাড়ি হওয়ায় স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ন্যূনতম নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নেই সেখানে। পানির মিশন নষ্ট। নিচে গিয়ে খাবার ও গোসলের পানি সংগ্রহ করতে হচ্ছে হাজীদের। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকজন বেশি বয়সে হজ্ব করতে যান। এসব সমস্যা মোকাবিলা করা তাদের জন্য কষ্টকর। অমানবিকও বটে। জানা যায়, হজ্ব মিশনের হাজীদের জন্য ক্যাপসুল আর ট্যাবলেট ছাড়া অসুস্থদের জন্য ওষুধ নেই। একদিকে স্বাস্থ্য সমস্যা,

www.pathagar.com

অন্যদিকে বৃদ্ধ হাজীরা শীত মোকাবিলায় কাতর হয়ে পড়েছেন। শীত নিবারণের জন্য যারা পর্যাপ্ত গরম কাপড় নেননি তাদের কষ্টের পাহাড় আর ও উচ্চ হচ্ছে।'

৪ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশ 'সরকার অত্যন্ত কৌশলে পাঠ্যপুস্তকে ধর্মভিত্তিক রচনায় ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর আঘাত হেনেছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কিছু পোষা আমলা কর্তৃক উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা পাঠ্যবই থেকে পরিকল্পিতভাবে ধর্মভিত্তিক রচনাগুলো বাতিল করে দিয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সংকলন নামের এই পাঠ্যপুস্তকটি বর্তমানে দেশের কলেজে সরকার অনুমোদিত বই হিসেবে চালু রয়েছে। সূত্র জানায়, পূর্বপরিকল্পিতভাবে আওয়ামী লীগ সরকার বইটির নতুন সংস্করণে হাত দেয়। কলেজপড়ুয়া হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মন থেকে ধর্মীয় চেতনা মুছে দেয়ার লক্ষ্যে ধর্মভিত্তিক প্রবন্ধ ও কবিতা বাতিল করার এক সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা মোতাবেক এ কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানা যায়'।

১৩ সেপ্টেম্বর খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ মিলনায়তনে ইতিহাস বিষয়ক এক কর্মশালার প্রথম অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুনতাসির মামুন (মু.তা মামুন)। অধিবেশনে মু.তা মামুন ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাসকে সাম্প্রদায়িক আখ্যায়িত করে বলেন, 'কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামের ইতিহাস থাকবে আর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থাকবে না-এ চলতে দেয়া যায় না'। তিনি দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার কঠোর সমালোচনা করে বলেন, 'ইনকিলাব যখন স্বাধীনতা ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে লেখে, তখন রাষ্ট্রদ্রোহীতার দায়ে তাদের দেশ থেকে বের করে দেয়া উচিত। যাদের ভাল লাগে না তাদের যে দেশ ভাল লাগে সে দেশে চলে যাওয়া উচিত। যারা এসব লেখে তারা বাংলাদেশের শত্রু, পাকিস্তানের মিত্র। প্রয়োজনে তাদের প্রহার করে দেশ থেকে বের করে দেয়া উচিত'। মু.তা মামুনের এ ধরনের বক্তব্যে তাৎক্ষণিক শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও সাংবাদিকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এরপর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজের প্রিন্সিপাল আল মামুন জাহাঙ্গীর তার বক্তব্যে বলেন, 'এখানে রাজনৈতিক বক্তব্য আসা উচিত নয়। আমি এ অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক বক্তব্য আসায় সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এর পরপরই মু.তা মামুন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেন। তেড়ে এসে প্রিন্সিপালের সাথে চরম বাক-বিতন্ডায় লিপ্ত হন। তিনি টেবিল চাপড়ে নানা ধরনের উস্কানিমূলক কথা বলেন। ক্ষীপ্ত মু.তা মামুন বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হবে বলে হুমকি দেন। এ সময় অন্যান্য শিক্ষকরা এসে মু.তা মামুনকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। ক্ষোভের কারণে দ্বিতীয় অধিবেশনে কিছুক্ষণ থাকার পর তিনি বেরিয়ে যান।

২০০১ সালে ৮০ জন হজ্ব যাত্রীর কাছ থেকে টাকা আত্মসাৎ ও প্রতারণার সাথে ধর্মপ্রতিমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন জড়িত ছিল। মক্কামদীনা ট্রাভেল এন্ড ট্যুরস নামে একটি ট্রাভেল এজেন্সিকে ৮০ জন হজ্ব করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি ১ লাখ ৫ হাজার টাকা করে দেয়। এই ট্রাভেল এজেন্সির একজন মালিক ছিলেন চরমোনাই পীর সাহেবের বৈমাত্রেয় ভাই নাসির আহমেদ কাউসার। প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজিং পার্টনার ছিলেন ধর্মপ্রতিমন্ত্রীর ভাতিজা আ.ফ.ম ইদ্রিস তারা। ধর্মপ্রতিমন্ত্রীর ভাতিজার মালিকানার কারণে মক্কা-মদীনা ট্রাভেল এন্ড ট্যুরস প্রতিষ্ঠানটি ধর্মমন্ত্রণালয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয় ও মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নেয়। ৮০ জন ব্যক্তিকে হজ্বে পাঠানোর জন্য আদায়কৃত ৮৫ লাখ টাকা নিয়ে ইদ্রিস তারা উধাও হয়ে গেলে প্রতিষ্ঠানটি বেকায়দায় পড়ে। এ সময় হজ্বে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা ১৬১/মতিঝিল

www.pathagar.com

বাণিজ্যিক এলাকার রহমান ম্যানসনের চতুর্থ তলার অফিসে যেয়ে বিক্ষোভ করে এবং প্রতিষ্ঠানটির ফোনের লাইন কেটে দেয়। ধর্মপ্রতিমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠজনদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি আক্রান্ত হওয়ায় গোয়েন্দা বিভাগ বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে জানায়। পরবর্তীতে হজ্বে পাঠানোর নামে জালিয়াতির সাথে মন্ত্রীর স্বজনরা জড়িত থাকায় দলের ভাবমূর্তি বিপন্ন হয়ে পড়ার আশংকায় বিচলিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগত তহবিল থেকে কয়েকজনকে সফরসঙ্গী করেন। হজ্ব যাত্রীদের সাথে প্রতারণার কারণে মতিঝিল থানায় একটি মামলা হয় যার নম্বর ৯০/২/২০০১। মামলায় ১০ জনকে আসামী করা হলেও পুলিশ এই ১০ জনের কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

www.pathagar.com

সীমান্তে ভারতীয় আগ্রাসন

ভারত বাংলাদেশকে বরাবরই তার বলয়ভূক্ত অধীনস্থ দেশ হিসেবে মনে করে আসছে। প্রভুত্বব্যঞ্জক মনোভাবের কারণে তারা মুজিব ও হাসিনার শাসনামলে অনেক ন্যক্কারজনক ঘটনাও ঘটিয়েছে। হাসিনা সরকার গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের নামে ৩০ বছর মেয়াদী পানি চুক্তি করে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব খর্ব করেছে। বাংলাদেশের জনগণের গলায় বরশি আটকে দিয়েছে ভারতপ্রেমী হাসিনা সরকার। পানি চুক্তি করে হাসিনা সরকার কেবল দেশের স্বার্থকেই জলাঞ্জলি দেয়নি, আমাদের দরকষাকষির পথও ৩০ বছরের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। ভারতকে আন্তর্জাতিক দায় থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যই এ চুক্তি করা হয়েছে। আইনগতভাবে পানি আটকানোর স্বীকৃতি পেয়ে ভারত সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো দখলের চেষ্টা চালিয়েছে। অদক্ষ সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে বারবার সীমান্তে গুলি চালিয়েছে ভারতীয় বিএসএফ। গুলি চালিয়ে আওয়ামী আমলে তারা বেশ কয়েকটি এলাকা অঘোষিতভাবে নিজ আয়ত্বে নিয়ে বসে থাকেনি, সীমান্তে তারা শুরু করেছিল চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ, শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা প্রভৃতি।

২৯ জুন ১৯৯৯ ঝিনাইদহ-২ আসন থেকে নির্বাচিত বিএনপির এমপি মশিউর রহমানের এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম আওয়ামী সরকারের আমলে বিএসএফের অপতৎপরতার বিশদ বর্ণনা দেন। তিনি জানান যে, (ক) ১৯৯৬ সালের জুন মাস থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৬ বার গুলিবর্ষণ করে বিএসএফ বাংলাদেশী নাগরিক ৫ জনকে হত্যা এবং ১১ জনকে আহত করেছে, (খ) ১৯৯৭ সালে ৩৯ বার গুলি করে বাংলাদেশী নাগরিক ১১ জনকে নিহত এবং ১১ জনকে আহত করেছে, (গ) ১৯৯৮ সালে ৫৬ বার গুলিবর্ষণ করে বিডিআর সৈনিক ২ জন ও বাংলাদেশী নাগরিক ২৩ জনকে নিহত এবং ১৯ জনকে আহত করেছে, (ঘ) ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারি হতে ২০ জুন পর্যন্ত মোট ১৯ বার গুলি করে বিডিআর ১ জন ও বাংলাদেশী নাগরিক ১২ জনকে নিহত এবং বিডিআর ২ জন ও বাংলাদেশী নাগরিক ৩০ জনকে আহত করেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন সংসদে আহত-নিহতদের তালিকা প্রদান করছিলেন তখন তিনি ভেবে দেখেননি যে ২৩ এপ্রিল দৈনিক মানবজমিনে বিএসএফের হাতে তিন বছরে ৬২ জন নিহত ও ৮২ জন আহত হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। মন্ত্রী যখন তালিকা প্রণয়ন করছিলেন তখন কি নিহতরা জীবিত হয়ে গিয়েছিলেন?

সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য মতে, ১৯৯৬ সালে বিএসএফের সঙ্গে বিডিআরের সংঘর্ষ হয়েছে ১৩০টি। এতে বিডিআরসহ নিহত হয়েছে ১৮ জন। ১৯৯৭ সালে ৩৯ টি সংঘর্ষে ১১ জন নিহত এবং ১১ জন আহত হয়। ১৯৯৮ সালে ৫৬ টি সংঘর্ষে নিহত হয় ২৩ জন এবং আহত হয় ১৯ জন। ১৯৯৯ সালের ২৩ আগষ্ট পর্যন্ত পরিসংখ্যান মতে, ২৮টি সীমান্ত সংঘর্ষে ২০ জন নিহত এবং ৩৪ জন আহত হয়েছে। প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বিডিআরের খুলনা সেক্টরে এই সাড়ে ৩ বছরে বিএসএফের সাথে ২০ টি গোলাগুলির ঘটনায় ৩ জন নিহত ও ৫ জন আহত হয়। কুষ্টিয়া সেক্টরে ২৯ টি সংঘর্ষে ১০ জন নিহত এবং ২২ জন আহত হয়।

www.pathagar.com

রাজশাহী সেক্টরে ৪৮ টি সংঘর্ষে ৮ জন নিহত এবং ৯ জন আহত হয়। দিনাজপুর সেক্টরে ২৮ টি সংঘর্ষে ১০ জন নিহত এবং ৭ জন আহত হয়। রংপুর সেক্টরে ৪৭ টি সংঘর্ষে ১৬ জন নিহত এবং ৯ জন আহত হয়। মোমেনশাহী সেক্টরে ৩৬ টি সংঘর্ষে ১৪ জন নিহত এবং ১১ জন আহত হয়। সিলেট সেক্টরে ৩২ টি সংঘর্ষে ৪ জন নিহত এবং ১৫ জন আহত হয়। কুমিল্লা সেক্টরে ১০ টি সংঘর্ষে ২ জন নিহত এবং ৩ জন আহত হয়। খাগড়াছড়ি সেক্টরে ১ টি সংঘর্ষে কেউ হতাহত হয়নি। রাঙ্গামাটি সেক্টরে ১ টি সংঘর্ষে ১ জন আহত হয়। (সূত্র ঃ দৈনিক সংগ্রাম ২৮ আগষ্ট ১৯৯৯)

সীমান্তে ভারতীয় আগ্রাসনের ঘটনায় দেখা যায় ২৪ জানুয়ারি ১৯৯৭ রাতে দৌলতপুর থানার মোহাম্মদপুর সীমান্তের কাছে ৬ জন বাংলাদেশী যুবককে হত্যার উদ্দেশ্যে বাউশমারী ক্যাম্পে বিএসএফরা গুলি চালায়। এতে ৩ জন নিহত ও ১ জন আহত হয়। ২ জন পালাতে গিয়ে নিখোঁজ হয়। আওয়ামী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের এক বছর পূর্তি উদযাপন করার তিন মাস পূর্বে মার্চের শেষ সপ্তাহে বিএসএফের সহযোগিতায় সাতক্ষীরা সীমান্তের ভোমরা লক্ষীদাঁড়ি থেকে বৈকারী পর্যন্ত পানি উন্নয়ন বোর্ড ভেড়িবাঁধের পশ্চিমাংশে ১২ কিলোমিটার বরাবর বাংলাদেশের নিজস্ব এলাকায় ভারতীয়রা অবৈধ দখল তৎপরতা চালায়। ভারতীয় নাগরিকরা বহু পূর্বেই এই সীমান্তে বাংলাদেশের মৎস্য প্রকল্প বন্ধ করে দেয়। তারা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশীদের ব্যবহার করা কুমড়ার খাল দখল করে নেয়। বাংলাদেশীদের ব্যবহার করা ধানক্ষেত, পাটক্ষেত ভারতীয়রা জবর দখল করার ফলে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ আব্দুস সালাম, পাউবো নির্বাহী প্রকৌশলী একেএম আলী আজম, কর্মকর্তা আব্দুস সোবহান, থানা মৎস্য অফিসার আবু বকর সিদ্দিক, বৈকারি ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আবু দাউদ, ইউপি সদস্যা এবং সাংবাদিকগণ যখন এই বেড়িবাঁধ পরিদর্শনে যান তখন এলাকার অধিবাসীরা ভারতীয় নাগরিক ও বিএসএফের অবৈধ তৎপরতার বহু অভিযোগ তোলেন। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ২ এপ্রিল ১৯৯৭)

২০ অক্টোবর নওগাঁ ধামুরইরাহাটের তালপুকুর সীমান্ত পিলারের ৪শ' গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর ভারতীয়রা গুলি চালায় ও বেয়নেট চার্জ করে। এতে ১৫ জন বাংলাদেশী মারাত্মকভাবে আহত হয়। ১৪ কার্তিক দৈনিক আজকের কাগজে সিলেট, মৌলভীবাজার ও সাতক্ষীরা সীমান্তের বাংলাদেশের ৭ হাজার ৬শ' একর জমি ভারতে চলে যাওয়ার খবর প্রকাশিত হয়। খবরে বলা হয়, ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে জানানো হলেও বাংলাদেশ এ নিয়ে ভারতের সঙ্গে কোনো কথা বলেনি। জানা গেছে, পরিবর্তনশীল নদী সীমান্তের কারণেই বাংলাদেশের উল্লেখিত এক একর জমি ভারতের দখলে চলে যায়। ভারত ছলে-বলে কৌশলে অনেক জায়গা হাতিয়ে নিয়েছে। বিশেষ করে সীমান্ত চিহ্নিতকরণে ব্যবহৃত পিলার সরিয়ে ভারত বাংলাদেশের জমি দখল করে নিয়েছে।

১ নভেম্বর দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকায় জৈন্তাপুর থানার শ্রীপুর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বিডিআরের হাবিলদার হাতেম আলী পাটোয়ারী নিহত হওয়ার খবর প্রকাশ। খবরে আরো বলা হয়, এ ছাড়া ৮/১০ জন বাংলাদেশী পাথর শ্রমিক আহত হয়েছেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশকারী বিএসএফের ২ জন জওয়ান বিক্ষুব্ধ পাথর শ্রমিকদের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছে। নভেম্বরের প্রথমদিকে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশী ভূ-খণ্ড দখল সম্পর্কে দৈনিক দিনকাল এবং অপর একটি দৈনিকে পৃথক দু'টি খবর ছাপা হয়। দিনকালের খবরে দখলের কথা অবশ্য সরাসরি বলা হয়নি। বলা হয়েছে বিএসএফের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়

www.pathagar.com

কতিপয় ভারতীয় নাগরিক কর্তৃক বাংলাদেশের জমিতে চাষ করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কুড়িগ্রামের পাখিউড়ার চর সীমান্তে তিনদিন যাবত টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিএসএফ সেখানে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করায় বিডিআরকেও সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে। অপর দৈনিকটির খবরে বলা হয়ঃ প্রায় ৫৬ হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশ এখন আর নেই। পরিবর্তিত হয়ে গেছে মানচিত্র। খসে গেছে জমি। সিলেট, মৌলভীবাজার ও সাতক্ষীরা সীমান্তে বাংলাদেশের ৭ হাজার ৬শ' একর জমি এখন ভারতের দখলে। এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে তাগিদ দেয়া হলেও এ পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো আলোচনা হয়নি। খবরে উল্লেখ করা হয়ঃ পরিবর্তনশীল সীমান্ত জটিলতার কারণে গোটা দক্ষিণ এলাকা জুড়ে ভারত কোনো না কোনোভাবে ঢুকে পড়েছে বাংলাদেশের ভেতরে। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ৮ নভেম্বর ১৯৯৭)

২০ জানুয়ারি বৈধ পাসপোর্ট-ভিসা নিয়ে সিলেটের দু'টি নাট্যদল লিটন থিয়েটার ও কথাকলি সিলেট আমন্ত্রিত হয়ে ভারতের আসাম রাজ্যের শিলচরে নাটক মঞ্চায়নের জন্য গিয়ে সেখান থেকে ফেরার পথে বিএসএফএর গুলিতে প্রাণ হারাতে বসেছিলেন। সীমান্ত চৌকির সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে বৈধভাবে ভারতের করিমগঞ্জ থেকে সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্তে পাড়ি জমাবার লক্ষ্যে নৌকাযোগে কুশিয়ারা নদীর মাঝ বরাবর আসার পর এক বিএসএফ সৈনিক তিন রাউন্ড গুলি চালিয়ে তাদের নৌকা ডুবিয়ে দেয়। পানিতে উল্টে পড়া নাট্যকর্মীদের তখন রীতিমত প্রাণ সংশয়। নৌকারোহী ৬ জনের মধ্যে দু'জন ছাড়া আর কেউ সাঁতার জানেন না। সাঁতার জানেন যারা, তারা সাঁতরে বাধ্য হয়ে আবার করিমগঞ্জ কুশিয়ারা ঘাটে গিয়ে পৌছেন। আর অন্যদের উদ্ধার করে নৌকাযোগে ঘাটে নিয়ে আসেন এক ভারতীয় মাঝি। বিকাল ৪-২২ মিনিটে বিএসএফ এই বর্বরোচিত কান্ডটি ঘটায়।

১০ ফেব্রুয়ারি গোদাগাড়ি থানার করচকা সীমান্তে বিএসএফরা গুলি চালিয়ে বাংলাদেশী তিন যুবককে আহত করে। এ ব্যাপারে বিডিআর বিএসএফের কাছে প্রতিবাদ জানায়। ২০ মে হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট থানায় বাল্লা সড়কের চন্দনা গ্রামের কাছে ১৫/১৬ জন যাত্রীবাহী ভারতীয় হেলিকপ্টার বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে। হেলিকপ্টারে যারা ছিল তাদের মধ্য থেকে একজন সাদা পোশাক পরিহিত লোক হেলিকপ্টার থেকে নেমে এসে প্রথমে হিন্দি ও পরে বাংলায় স্থানীয় জনসাধারণকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে। ভারতীয় হেলিকপ্টার অবতরণের ২৩ দিন পর নিকটবর্তী মাগুরছড়া গ্যাসকূপে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে এবং তার ফলে দেশের হাজার হাজার কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আরো উল্লেখ্য, মাগুরছড়া গ্যাসকূপে বিস্ফোরণের মাত্র কয়েক মিনিট আগেও সেখানে অজ্ঞাত পরিচয়ে একটি হেলিকপ্টার দ্রুত এসে চলে যায়।

২০ মার্চ ১৯৯৮ সকালে শ্রীমঙ্গলের সাতগাঁও সীমানার গভীর জঙ্গল দিয়ে ৫/৬ জন বিএসএফ আকস্মিকভাবে গুলি ছুঁড়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। বিডিআর টহল দলের দ্রুত চ্যালেঞ্জ ও বাঁধার মুখে ভারতীয়রা পিছু হটে যায় এবং পরে বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে বলা হয় যে ভারতীয় একটি জঙ্গী সংগঠন একজন স্কুল শিক্ষককে অপহরণ করে বাংলাদেশে প্রবেশ করায় তারা ধাওয়া করে ভুলবশতঃ বাংলাদেশে ঢুকে পড়ে। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে জকিগঞ্জ সীমান্তে বিএসএফ-এর উস্কানী বৃদ্ধি পায়। ২২ মার্চ ভোরে বিএসএফ-এর এমনি এক উস্কানীমূলক গুলিবর্ষণের ফলে বিএসএফ এবং বিডিআর-এর মধ্যে আধঘন্টা ধরে গুলিবিনিময়ে উভয় দেশের বেশ কয়েকজন বেসামরিক লোক আহত হয়। বাংলাদেশের যে ১০ জন গ্রামবাসী

www.pathagar.com

আহত হয়, তাদের মধ্যে গুলিবিদ্ধ গুরুতর আহত অবস্থায় ৪ জনকে সিলেট ওসমানী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার দিন ভোরে জকিগঞ্জ থানা শহর সংলগ্ন কুশিয়ারা নদীর বাংলাদেশ নৌ সীমানায় নৌকাতে পণ্য বোঝাই কালে একদল বিএসএফ স্পীডবোটযোগে এসে বাংলাদেশী মাঝিমাল্লা ও ব্যবসায়ীদের ঘেরাও করে কুশিয়ারার অপর পাড়ে ভারতীয় শহর করিমগঞ্জের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা চালায়। এ সময় বাংলাদেশীদের চিৎকারে নিকটবর্তী বিওপি থেকে একদল বিডিআর তাদের সাহায্যে এগিয়ে এলে কুশিয়ারার ভারতীয় অংশ এবং নদীতে স্পীডবোট থেকে ভারতীয় বিএসএফ এলোপাতারি গুলিবর্ষণ শুরু করে। এই ঘটনার খবর পেয়ে সিলেট থেকে বিডিআর-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অকুস্থলে ছুটে গিয়ে উত্তেজনা প্রশমনের প্রয়াস চালান। বিএসএফ অহেতুক উস্কানীমূলক তৎপরতার দ্বারা সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালায়। এরপূর্বে জকিগঞ্জ সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের বাড়াবাড়ি অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা কারণে-অকারণে সীমান্তে ব্যবসায়ীদের হয়রানি ও বৈধভাবে পারাপারকালে গুলিবর্ষণ করেছিল। উত্তেজনাকর অবস্থার প্রেক্ষিতে উভয় সীমান্তে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ভারতের শিলচর থেকে প্রকাশিত একটি বাংলা দৈনিকে ১ মার্চ প্রকাশিত একটি উদ্ভট খবরে জকিগঞ্জের জনগণের বিস্ময় ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ভারতীয় ঐ পত্রিকাটির প্রকাশিত খবরে বলা হয়, 'তথাকথিত 'মুসলিম লিবারেশন ফ্রন্ট' নামে একটি সংগঠনের ২৩ জন গেরিলা নাকি জকিগঞ্জে প্রশিক্ষণ নিয়ে ভারতে প্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছে। কথিত জঙ্গীরা নাকি প্রখ্যাত বুজর্গানে দ্বীন ফুলতলার পীর সাহেবের বাড়ি ও সীমান্তবর্তী কালিগঞ্জে উপজাতীয়দের বাড়িতে রয়েছে।' বাস্তবে খবরটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ছিল। কেননা, ফুলতলার পীর সাহেবের বাড়িতে কোন জঙ্গী সংগঠনের লোককে স্থান দেয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না এবং গোটা জকিগঞ্জ থানায় কোন উপজাতি বাসিন্দা নেই। অথচ এই উদ্ভট বানোয়াট খবর ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশের ২/৩ দিন পর থেকে জকিগঞ্জ সীমান্তে বিএসএফ-এর শক্তি ও তৎপরতা বৃদ্ধির করা হয়। সীমান্তে গায়ে পড়ে ফ্যাসাদ বাঁধানোর জন্য ভারতীয় এজেন্টরা এ ধরনের কাল্পনিক অভিযোগ প্রচার করে। আর এই সুযোগে বিএসএফ জকিগঞ্জ সীমান্তে তাদের দৌরাত্ম বৃদ্ধি করার একটা অজুহাত খাড়া করার চেষ্টা চালায়।

২২ জুন দুপুর ১-৩০ মিনিটের দিকে আবার বিনা অনুমতিতে ভারতীয় বিমান বাহিনীর পাতা রঙের একটি হেলিকপ্টার হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট থানার আহমেদাবাদ ও গাজীপুর ইউনিয়নের ওপর দিয়ে কয়েকবার চক্কর দেয়। এক পর্যায়ে হেলিকপ্টারটি চুনারুঘাট থানা সদর থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে রাজারবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অবতরণের চেষ্টা করে। এ সময় উৎসুক জনতা ছুটে আসলে হেলিকপ্টারটি অবতরণ না করে সোজা পূর্বদিকে রেমা চা বাগানের ওপর দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যায়।

হিলি সীমান্তের নো-ম্যানসল্যান্ডে আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করে বিপ্লবী ক্লাব নির্মাণের প্রচেষ্টা চালায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। উল্লেখিত ক্লাব নির্মাণে ভারতের অনমনীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে ২২ জুলাই দু'পক্ষের ফ্ল্যাগ মিটিং-এ জিরো পয়েন্ট থেকে ১৫০ গজের মধ্যে কোনো প্রকার নির্মাণ কাজ না করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু ২৭ জুলাই ওই ক্লাবের পক্ষ থেকে আরো ভেতরে ঘর তৈরির উদ্যোগ নেয়া হলে আর-এর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বারবার প্রতিবাদ জানিয়ে সরেজমিনে তদন্ত ও ফ্ল্যাগ মিটিং করে বিষয়টির শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানানো হয়। কিন্তু তারা তা অগ্রাহ্য করে। ২২ আগষ্ট বিপ্লবী ক্লাব আবারো নিষিদ্ধ স্থানে মাটি খনন কাজ শুরু করে এবং বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সকল প্রকার

www.pathagar.com

আইনী প্রতিবাদ ইগনোর করে। ২৫ আগষ্ট বিডিআর কর্তৃক বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় আইন সম্মতভাবে একটি দেয়াল নির্মাণকে কেন্দ্র করে বিকাল পৌনে পাঁচটায় বিএসএফ ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হিলি, সিপি, পয়া, বাসুদেবপুর এবং মংলা বাংলাদেশের এই চারটি সীমান্ত ফাঁড়িতে একযোগে হানা দেয়। বিএসএফের ওই আকস্মিক গুলিবর্ষণে বিডিআর জোয়ান আবদুল আহাদ (২৫) ঘটনাস্থলেই নিহত হন। আহত হয় বেশ ক'জন। ২৬ আগষ্ট সকাল ৭টা থেকে তারা আবারো গুলিবর্ষণ শুরু করে এবং সকাল সাড়ে ৯ টায় হারুনুর রশিদকে হত্যা করে। আহত করে অনেককে।

২৫ ডিসেম্বর বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের পবা থানার খিদিরপুরে বিএসএফের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে একদল ভারতীয় নাগরিক মনিরুল নামক একজন যুবককে হত্যা করে। এ ব্যাপারে বিএসএফ ও বিডিআর-এর মধ্যে কয়েকদফা ফ্ল্যাগ মিটিং হয়। কিন্তু কোনো নিষ্পত্তি হয়নি। বরং ভারতীয়রা নিহত বাংলাদেশী যুবকের ক্ষতিপূরণ দিতে টালবাহানা শুরু করে। ২৯ ডিসেম্বর দৈনিক দিনকালে প্রকাশ, পঞ্চগড় জেলার বোদা, সদর ও দেবগঞ্জ থানার ৭৬৭ নং হতে ৭৭৮ নং সীমান্ত বরাবরে ৭টি মৌজার ১৫৬৯ একর জমি ভারতীয়রা দখল করেছে। দখলকৃত জমিগুলো হচ্ছে পঞ্চগড় সদর থানার শিকারপুর ও আরাজী মৌজার ২শ' একর, তেলধর মৌজার ৫২ একর ও কাজলদিঘী মৌজার ৩৩১ একর, বোদা থানার নাউতরী মৌজার ৪০৫ একর, দেবোত্তর বন্দেশ্বরী মৌজার ১০৪ একর এবং দেবীগঞ্জ থানার চিলাহাটি মৌচার ৩৫ একর। এইসব জমি কাগজ-কলমে বাংলাদেশের হলেও প্রশাসনসহ দেশীয় কোনো লোকজন সেখানে যেতে পারে না। কোন বাংলাদেশের নাগরিক সেখানে গেলে ভারতীয়রা তাদের লাঞ্ছিত করে অথবা বিএসএফের গুলির মুখে পড়তে হয়।

১৯৯৮ সালে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর সীমান্তেই বিএসএফ-এর হাতে ১৭ জন বাংলাদেশী প্রাণ দেয়। প্রতিবারই ফ্লাগ বৈঠক হয়। হয় সমঝোতা। কিন্তু মেলেনি হতভাগ্য পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ। বন্ধ হয়নি ভারতীয় সীমান্তরক্ষীর উস্কানীমূলক হত্যাযজ্ঞ।

সিলেটের জকিগঞ্জ থানায় প্রায় ১০ বর্গমাইল এলাকা ভারতের দখলে চলে গেছে-এ মর্মে একটি বিশেষ প্রতিবেদন ১০ জানুয়ারি ১৯৯৯ দৈনিক দিনকালে প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, কুশিয়ারা নদীর তলদেশে পাথরের গ্রোয়েন নির্মাণ করে নদী তীরে জাহাজ নোঙ্গর করার কারণ দেখিয়ে একটি ঝুলন্ত ব্রীজ নির্মাণ করে নদীর গতিপথ পাল্টে দেয়ার কারণে ওই এলাকার এক বিশাল জনপদ হারিয়ে গেছে নদীতে। জকিগঞ্জ থানার পুরনো জকিগঞ্জ বাজার, ভুঁইয়ার মোড়া, খলাছড়া, গংগারজল, আলীগড়, রাইদ্রাবান, আমলশীদ, উজিরপুর, বড় পাথর লোহাবাদ, পীরনগর, বাঘারশাল প্রভৃতি গ্রাম কুশিয়ারার করালগ্রাসে বিলীন হয়ে গেছে। পরবর্তীতে এসব এলাকা ভরাট হয়ে যুক্ত হয়ে গেছে ভারতের ভূ-খণ্ডের সাথে।

২৫ মার্চ নীলফামারী সীমান্তে ভারতীয়রা বিএসএফ-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশের তিনশ'-পরিবারের তিনশ' বিঘা জমি দখল করে নেয়। ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় তিস্তা নদীর ওপারে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ চরের ঐসব এলাকা প্লাবিত হলে এলাকার তিন শতাধিক পরিবার তখন নদীর ডান পারে অবস্থান নেয়। পরবর্তীতে চর জেগে উঠলে তারা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যায়। কিন্তু ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার মেকলিগঞ্জ থানার গোস্তি চরে অবস্থানরত চাঁদনী বিএসএফ ক্যাম্পের সহায়তায় ভারতীয়রা বাংলাদেশের চরবাসীদের তাড়িয়ে জোর করে দখল করে নেয়। এ ঘটনার পরে ডিমলা থানার যানের জাট বিওপি ক্যাম্পের পক্ষ থেকে ফ্ল্যাগ মিটিং-এর মাধ্যমে ঘটনা সুরাহা করার প্রস্তাব দেয়া হয়। কিন্তু এরপরেও

www.pathagar.com

বিএসএফরা তা অগ্রাহ্য করে বাংলাদেশী চরবাসীদের উচ্ছেদ করে। পরবর্তীতে তারা ভারতীয় চরবাসীদের সেখানকার অবস্থান সুদৃঢ় করে।

১৯ এপ্রিল ১৯৯৯ বিএসএফ-এর গুলিতে ৬ বাংলাদেশী নাগরিক নিহত হয়। কিন্তু এসব হতভাগ্য পরিবারকে ভারতের পক্ষ থেকে দেয়া হয়নি কোন ক্ষতিপূরণ। আওয়ামী সরকারও এগিয়ে আসেনি। ফলে সীমান্তের এ পরিবারগুলোর সদস্যদের ২০ ও ২১ এপ্রিল দু'দিন ধরে দু'বেলা পেট পুড়ে ভাত জোটেনি। কারণ নিহতরাই ছিল হতভাগ্য পরিবারগুলোর একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। এমনকি আহতদের চিকিৎসাতেও কারো সাহায্য-সহযোগিতা মেলেনি। ১৯ এপ্রিল দৌলতপুর-করিমপুর সীমান্তে বিএসএফ-এর উস্কানীমূলক গুলিবর্ষণ এবং এদেশের ১০০ মিটার অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ শেষে ১ জন বাংলাদেশী নাগরিককে ধরে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় উভয়পক্ষের মধ্যে গোলাগুলিতে ১ জন বিডিআর নায়েকসহ ৬ জন বাংলাদেশী নিহত হয়। যদিও এদের ১ জন বেঁচে গেছে বলে শোনা যায়। যাকে বিএসএফরা আটকে রাখে। ২১ এপ্রিল মাথাভাঙ্গা নদীর ওপারে ভারতের নদীয়া জেলার করিমপুর থানার সীমান্তবর্তী গ্রাম নসরিপাড়ায় ফ্ল্যাগ বৈঠকে উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হলেও নিহত ৬ বাংলাদেশীসহ ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ রাজি হয়নি। বিগত ১৬ বছরে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা বেশ কয়েক দফা হামলা চালায় এবং ২০ বারেরও বেশি এ সীমান্তের এপারের ভূ-খন্ডে অনুপ্রবেশ করে। ১৯৯০ সালে ৮ জন, ১৯৯২ সালে ২ জন এবং ১৯৯৩ সালে ১ জন বাংলাদেশীকে বিএসএফ সদস্যরা গুলি করে হত্যা করে। ১৯ এপ্রিল ১৯৯৯ তাদের গুলিতে ৬ জন বাংলাদেশী নিহত হয়। ১৯৯০ সালে বিএসএফ অবৈধভাবে দৌলতপুর সীমান্তের এপারে প্রবেশ করে ৮ জন বাংলাদেশীকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে। এ সময় সীমান্তবর্তী বাংলাদেশীরাও পাল্টা প্রতিরোধে ২ জন বিএসএফ সদস্যকে ঘায়েল করতে সক্ষম হয়। ১৯৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর ওপারের সীমান্ত রক্ষীরা অবৈধভাবে এপারে প্রবেশ করায় গ্রামবাসীরা বাঁশের লাঠি দিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। এ সময় বিএসএফ-এর হামলায় জামালপুর গ্রামের হারুন মোহাম্মদের পুত্র ফকির মোহাম্মদ নিহত হয়। অপরদিকে এপারের গ্রামবাসীরা ২ জন বিএসএফ সদস্যকে আটক করতে সক্ষম হয়। এ সময় সীমান্ত রেখা মাথাভাঙ্গা নদীর ধারে জামালপুর গ্রামে নিহত ফকিরের লাশ সমাহিত করা হয় এবং কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক এ.কে.এম. ফয়জুল হক মিঞা তা একটি স্মৃতিফলকসহ বাঁধিয়ে দেন। উক্ত স্মৃতিফলকটি আজো এ অঞ্চলের জনগণের মধ্যে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় অনুপ্রেরণা যোগায়। তাতে শহীদ ফকিরের বীরত্বের কথা উল্লেখ করে যা লেখা রয়েছে তাহলো 'গত ৯ ডিসেম্বর ১৯৮৩-এর সকালে জন্মভূমির পবিত্র অঙ্গণ থেকে সশস্ত্র বিদেশী হানাদারদের উৎখাত করতে এই বীর সন্তান অকোতভয়ে বাঁশের লাঠি হাতে গ্রামবাসীদের নিয়ে শত্রুর সাথে মুখোমুখি সংগ্রামে শাহাদত বরণ করেন। শত্রুপক্ষ পর্যুদস্ত হয় ও আত্মসমপর্ণ করে। মৃত্যুকে হাসিমুখে আলিঙ্গণ করে বীর শহীদ কৃষক ফকির মোহাম্মদ বীরত্ব ও দেশপ্রেমের এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আজ স্মরণীয় ও বরণীয়।'

২০ এপ্রিল ১৯৯৯ বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া এক বিবৃতিতে কুষ্টিয়া সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশের নিরীহ সাধারণ মানুষ ও বিডিআর হত্যার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'ভারতের প্রতি বর্তমান সরকারের নতজানু নীতিই এসব উসকানীমূলক তৎপরতার জন্য দায়ী।' বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী ৬ জনকে

www.pathagar.com

নির্মমভাবে হত্যা ও ৫০ জনকে জখম করেছে। তাদের তৎপরতায় মনে হয়, স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র ও জনগণকে তারা খোড়াই কেয়ার করে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ ধরনের হত্যাকান্ড ও জুলুম বেড়েই চলেছে। বর্তমান সরকার কখনো এসবের বিরুদ্ধে ভারতের কাছে কার্যকর ও কড়া প্রতিবাদ জানায়নি বলে বিএসএফ এর জুলুম এখন লাগামছাড়া। বিগত কয়েক বছরে তারা বেশকিছু বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে, জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। কিছুদিন আগে একজন বাংলাদেশী ব্যবসায়ীকে অকারণে জুতোপেটা করেছে বিএসএফ। সরকার ছিল নীরব। বরং বাংলাদেশী ব্যবসায়ীরা ধর্মঘটের আশ্রয় নিয়ে বিচার আদায়ে সমর্থ হয়েছিলেন। বর্তমান সরকার সীমান্ত খুলে দিয়েছে, ভারতীয় চোরাপণ্যে ও মাদকদ্রব্যে বাংলাদেশ ছেয়ে গেছে। ভারতীয় ফেনসিডিলের করালগ্রাসে লাখ লাখ বাংলাদেশী যুবকের জীবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এদিকে মনোযোগ না দিয়ে সরকার জাতীয় ও আন্ত র্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে ঢোল পেটাচ্ছে, লেজুড়বৃত্তি করায় গোটা দেশকে তারা পরিণত করেছে ভারতীয় রাষ্ট্রের পরিপূরক রাষ্ট্রে। এসব কারণে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা বাংলাদেশকে গণ্য করছে হত্যাকান্ড ও জুলুমের ক্ষেত্রে হিসেবে। এসব ভয়াবহ বাস্তবতা উপক্ষো করে সরকার চড় খেয়ে শুধু চুপ থাকার নীতিই অবলম্বন করছে না, ভারতের সঙ্গে তারা বিশেষ সম্পর্ক থাকার কথা সার্টিফিকেট হিসেবে চালাবার হাস্যকর চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। আওয়ামী সরকারের এই গোলামীর মনোভাব জাতির গায়ে কলংকের চিহ্ন একে দিচ্ছে। কিন্তু এদেশের জনগণ কারো গোলাম হওয়ার জন্য রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করেনি।' বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'এই তাঁবেদার সরকারের ভারত-তোষামোদ নীতিই বিএসএফ কর্তৃক প্রতিনিয়ত বাংলাদেশীদের হত্যা ও জুলুমের ব্যাপকতা বৃদ্ধির কারণ। এই সরকারের নতজানু নির্দেশের কারণে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষীরা যেখানে ভারতের স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীদের গ্রেফতার করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের হাতে তুলে দিচ্ছে সেখানে বিএসএফ তার বদলে আমাদের ফিরিয়ে দিচ্ছে বাংলাদেশী জনগণ ও বিডিআর এর লাশ। এই হচ্ছে বন্ধুত্বের নমুনা। এই তাঁবেদার সরকারের যোগ্যতাও আজ তিরোহিত।' বিবৃতিতে তিনি ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করে এর প্রয়োজনীয় বিচার ও ক্ষতিপূরণ আদায় এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা থেকে বিরত থাকার ভারতীয় প্রতিশ্রুতি আদায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানিয়ে বলেন, 'অন্যথায় ভারত তোষামোদকারীদের ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা ছাড়া জনগণের আর বিকল্প থাকবে না।' বিবৃতিতে তিনি বিএসএফ-এর বর্বর হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে দেশবাসীকেও এ ব্যাপারে সোচ্চার হওয়ার আহবান জানান। এই হামলাকে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি ভারতীয় আগ্রাসনের নগ্ন হস্তক্ষেপ আখ্যায়িত করে জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম এক বিবৃতিতে দুর্বল ও নতজানু পররাষ্ট্রনীতি পরিহার এবং বিএসএফ-এর ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের কড়া প্রতিবাদ জানানোর জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান। বিএসএফ-এর হামলায় হতাহতদের ক্ষতিপূরণ দানের জন্য তিনি সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান। ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের যুগ্ম মহাসচিব প্রফেসর এটিএম হেমায়েত উদ্দিন, সহকারী মহাসচিব আশরাফ আলী আকন এক বিবৃতিতে বলেন, 'ভারতের তাঁবেদার সরকার জনগণের জীবনের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।' ন্যাশনালিস্ট ডেমোক্রেটিক এলায়েন্স (এনডিএ)-র চেয়ারম্যান এডভোকেট নূরুল হক মজুমদার, মহাসচিব এডভোকেট আব্দুল মবিন, প্রেসিডিয়াম সদস্য আলহাজ্ব ওয়ালিউল্লাহ মিয়া, এডভোকেট আববুবকর সিদ্দিক বলেন, 'বাংলাদেশ সরকারের উচিত ভারতের আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ নীতির প্রতিবাদ করা।'

www.pathagar.com

ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আজিজুল হক বলেন, 'ভারতীয়দের এই একতরফা আক্রমণ প্রমাণ করে আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের তাঁবেদার'। বাংলাদেশ ইসলামী পার্টির সভাপতি ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল বাসেত, সেক্রেটারী জেনারেল এডভোকেট আব্দুল মবিন ভারতের এই ন্যক্কারজনক হামলা আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপনের জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান। বাংলাদেশ মুসলিম মিল্লাত পার্টির নেতৃবৃন্দ বলেন, 'আওয়ামী লীগ সরকারের ভারত তোষামোদের কারণে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখে পড়েছে।' মাওলানা আব্দুর রশিদ মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টির এক সভায় কুষ্টিয়ার সীমান্তে হামলার নিন্দা করে বলা হয়, 'এ সরকার সীমান্ত হামলা প্রতিরোধ ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ হয়েছে।'

১৯৯৯ সালের মে মাসে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপির রোডমার্চ যেদিন পঞ্চগড়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়, তার মাত্র দুদিন আগে বিএসএফ পঞ্চগড় সীমান্তে সমরাস্ত্র ও সৈন্যের ব্যাপক সমাবেশ ঘটিয়ে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করে। ৮ আগস্ট ১৯৯৯ দুপুর ১২টার বৃহত্তর মোমেনশাহীর দুর্গাপুর সীমান্তের ভবানীপুর নামক স্থানে একদল ভারতীয় নাগরিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে গরু-ছাগল, মহিষ ও আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যাচ্ছিল। বিডিআর বাহিনী সময় মতো বাধার সৃষ্টি না করলে তারা সবকিছু লুট করে নিয়ে যেতো। অপরদিকে রাজশাহীর গোদাগাড়ী সীমান্তে ভারতীয়দের উৎপাত বিগত কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে শুরু হলেও বেশ কয়েকদিন দীর্ঘ হয়। ভারতীয়রা প্রায় দিনই সশস্ত্র অবস্থায় বাংলাদেশে ঢুকে এখানকার ফসল কেটে নেয় এবং গরু-ছাগল লুট করে নিয়ে যায়। ভারতীয় নাগরিকদের হাতে অস্ত্রও ছিল। তারা সেই অস্ত্রের মহড়া দিয়ে বাংলাদেশী নাগরিকদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করে। বিএসএফ-এর সহযোগিতায় এসব সশস্ত্র ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশে ঢুকে এখানকার কাঁচা-পাকা ধান কেটে নিয়ে যায়। গোদাগাড়ী সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত প্রহরীদের সহায়তায় বিগত পক্ষকাল ধরে ভারতীয়দের এই উৎপাত চলে। ভারতকে ট্রানজিট দেয়ার প্রতিবাদে দেশের সর্বস্তরের জনগণ যখন সোচ্চার হয়ে উঠে এবং দেশের বিরোধী দলগুলো যখন প্রতিবাদী জনগণকে সংগঠিত করে ভারতের তাঁবেদার সরকারের বিরুদ্ধে মরণপণ আন্দোলন গড়ে তুলেছে, তখন দেশের বিভিন্ন সীমান্ত থেকে এসেছে বিএসএফ-এর উস্কানিমূলক কার্যকলাপের খবর।

বাংলাদেশের উত্তরে একটি অংশ দখল করে সীমান্ত লাইন সমান্তরাল করতে ভারতীয় সামরিক কৌশলের অংশ হিসেবে পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়ার বিএসএফ মাঝিপাড়া, সারিয়াল জোথ, রওশনপুর ও অথরখানা সীমান্তে চা বাগানের পেরিমিটার ড্রেন তৈরির নামে নো-ম্যান্সল্যান্ড পেরিয়ে জিরো পয়েন্টে সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত পরিখা খননের কাজ শুরু করে। ১০ মে বিএসএফ মাঝিপাড়ার জিরো পয়েন্ট বরাবর পরিখা খনন শুরু করলে বিডিআর তার প্রতিবাদ জানায়। এরপর এই বিষয়টি নিয়ে বিডিআর ও বিএসএফের মধ্যে ফ্ল্যাগ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে পরিখা খনন বন্ধে বিডিআর-এর দাবী মানতে বিএসএফ অস্বীকার করে। ১৪ মে থেকে বিএসএফ সীমান্তে অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ও বিপুল সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়ে পরিখা খনন অব্যাহত রাখে। এরপর বিডিআর একাধিকবার ফ্ল্যাগ মিটিং বসার আমন্ত্রণ জানালেও বিএসএফ সাড়া দেয়নি। বাংলাদেশের সীমান্তে জাতিসংঘ নীতিমালা লংঘনের এত বড় ঘটনার প্রতিবাদ রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায় থেকে না জানিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ভারতের ঢাকাস্থ ডেপুটি হাইকমিশনারকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি চিঠি ধরিয়ে দিয়েছে মাত্র। ভারতের বাংলাদেশ

www.pathagar.com

সীমান্তে একতরফা ও বলপূর্বক এই পরিখা খনন ও বিপুল সৈন্য মোতায়েন করা সত্ত্বেও পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র রহস্যজনক নীরবতা পালন করে।

৪ জুলাই রাজশাহীর গোদাগাড়ী থানার খরচাকা সীমান্তে পদ্মা নদীতে মাছ ধরার সময় বেলা ৮ টার সময় ভারতীয় নির্মলচর সীমান্ত ফাঁড়ির ১৮/১৯ জনের বিএসএফের একটি দল বাংলাদেশ অংশে মাছ শিকাররত জেলে নৌকাদের ওপর আকস্মিকভাবে হামলা চালিয়ে জেলে হযরত আলী (৩২), জহিরুদ্দিন, জুয়েল (২০), আরিফুল ওহাব (২০), শরিফুল (২০), নবী (২১), খুদি (৩৪), শুকুরুদ্দিন (২৫), মোস্তাকিন (২৫), শহীদুল (১২), আনসারী রাজু (২৪), শামীম (১৮), আনোয়ারুল (৩০), আলমগীর (১৫), চঞ্চল (১৮), তুহিন (২৪), সাইফুদ্দিন (৩০), সাকিম (১২), মতিন (২৪) ও সাইফুদ্দিনকে (৪০) অপহরণ করে নিয়ে যায়। তারা ৯টি মাছ ধরা নৌকাসহ ৩ লক্ষাধিক টাকার ৬ টি বড় জাল নিয়ে যায়। অপহরণের পূর্বে স্পীডবোট যোগে বিএসএফ দল বাংলাদেশের আড়াইশ থেকে ৩শ' গজ ভিতরে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে বাংলাদেশী জেলে নৌকাগুলোকে অস্ত্রের মুখে নদীর ওপারে ভারতীয় অংশে নেয়। বিএসএফ বাংলাদেশী জেলেদের ব্যাপক মারধর করার পর নির্মলচরে তাদের ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। জাল ও নৌকাগুলো তোলা হয় ডাঙ্গায়। বিএসএফ যখন বাংলাদেশের পানি সীমায় স্পীডবোট নিয়ে জেলেদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছিল, তখন ঘটনাস্থল থেকে ৫শ' গজ দূরের খরচাকা বিডিআর ফাঁড়ির জোয়ানরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই দৃশ্য অবলোকন করে।

৮ আগষ্ট দুপুর ১২ টায় বৃহত্তর মোমেনশাহীর দুর্গাপুর সীমান্তে ভবানীপুর নামক স্থানে একদল ভারতীয় নাগরিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে গরু, ছাগল, মহিষ, ও আসবাবপত্র লুটকালে বিডিআরের বাধার মুখে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। ১৫ আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনকালে আসামের মূখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহান্ত স্বীকারোক্তি দিয়েছেন, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ যৌথভাবে বাংলাদেশের সীমান্তের ভেতরে ১৩ আগষ্ট প্রবেশ করে রাজশাহীর একটি মসজিদ থেকে এক কেজি আরডি বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে। বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি না নিয়ে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এমনকি ভারতীয় সরকারি বেতার দূরদর্শনের কলকাতা কেন্দ্র খাস খবর অনুষ্ঠানে একটানা তিন দিন এ অভিযানের খবর প্রচার করলেও বাংলাদেশের অপদার্থ সরকার চরম ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়নি।

২০ আগষ্ট সংবাদপত্রে এ সংক্রান্ত দুটি খবর প্রকাশ পায়। একটি খবরের শিরোনাম ছিল 'সিলেট সীমান্তে গুলিবিনিময়। বিএসএফ-এর হাতে ৪ বিডিআর আটক। পতাকা বৈঠকের পর মুক্তি লাভ।' অপর খবরটির শিরোনাম ছিল, 'গোদাগাড়ী সীমান্তে উস্কানিমূলক তৎপরতা অব্যাহত। বিএসএফ-এর ফাঁকা গুলিবর্ষণ। ফ্ল্যাগ মিটিং-এর আহবানে সাড়া মেলেনি।' প্রথমোক্ত খবরটিতে বলা হয় যে, ১৯ আগষ্ট বিয়ানীবাজার থানার নয়াগ্রামে ভারতের বিএসএফ বাহনী পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়ে বাংলাদেশের ১৩০ একর ভূমি দখলের চেষ্টা চালায়। এতে সুতারকান্দি থেকে নয়াগ্রাম পর্যন্ত সীমান্তে তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। বিগত কয়েকদিন থেকে বিএসএফ সীমান্ত এলাকায় শক্তি বৃদ্ধি করেছিল। ঘটনার দিন সকাল সাড়ে দশটার দিকে বিএসএফ-এর ছত্রছায়ায় ভারতীয় শতাধিক লোক উপরোক্ত জমি দখলের উদ্যোগ নেয়। এ সময় বিডিআর সদস্যরা তাদের বাধা দিলে বিএসএফ তাদের ওপর চড়াও হয় এবং বিনা উস্কানিতে গুলিবর্ষণ শুরু করে। বিএসএফ এ সময় ৪ জন বিডিআর জোয়ানকে ঘেরাও করে ধরে নিয়ে যায়। ফলে উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পায় এবং উভয়পক্ষে দিনভর থেমে থেমে গুলিবর্ষণ চলতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে নয়াগ্রাম ও সারপার এলাকার লোকজন নিরাপদ

www.pathagar.com

আশ্রয়ের সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে থাকে। এক পর্যায়ে বাংলাদেশে পক্ষ থেকে পতাকা বৈঠকের আহবান করা হলেও সাড়া পাওয়া যায়নি। ঘটনার প্রায় ৮ ঘন্টা পরে সন্ধ্যায় সুতারকান্দি সীমান্তের নো-ম্যান্সল্যান্ডে বাংলাদেশের পক্ষে ২০ রাইফেল ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার ও ভারতের ডেপুটি কমাণ্ডারের নেতৃত্বে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এক ঘন্টা স্থায়ী এই বৈঠকের পর বিএসএফ ৪ জন বিডিআর জোয়ানকে ফেরত দেয় এবং উত্তেজনা সাময়িকভাবে কিছুটা হ্রাস পায়। আর শেষোক্ত খবরটিতে বলা হয় যে, রাজশাহীর গোদাগাড়ী সীমান্তে বিডিআর-এর ফ্ল্যাগ মিটিং-এর আহবান উপেক্ষা করে বিএসএফ ফাঁকা গুলিবর্ষণ ও বোমা বিস্ফোরণসহ বিভিন্ন. উস্কানিমূলক তৎপরতা অব্যাহত রাখে।

১ সেপ্টেম্বর কোম্পানীগঞ্জের উৎমা সীমান্তের উৎমা ছড়ায় বিএসএফ ঢুকে গুলি চালিয়ে ৫টি বারকী নৌকা নিয়ে যায়। ৮ সেপ্টেম্বর বিএসএফের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ভারত থেকে বাংলাদেশে কয়েক কেজি বিস্ফোরক ঢোকানো হয় প্রকাশ্য দিবালোকে। ১৭ সেপ্টেম্বর মেহেরপুর জেলার গাংনী থানার তেতুল বাড়িয়ার বিএসএফ ১৪৩ ও ১৪৪ নং পিলার দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে এলোপাথারি গুলি চালিয়ে মিজানুর রহমান (১৮) নামে এক কৃষককে হত্যা করে লাশ নিয়ে চলে যায়। পরবর্তীতে বিডিআর-বিএসএফের মাঝে দীর্ঘ ফ্ল্যাগ মিটিং-এ নিহত মিজানের লাশ ফেরত দেয়া হয় বিডিআরের নিকট। একই দিনে সকাল ৬ টায় কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারি থানার নওদাপাড়ায় সীমান্তের ১০৬৫ নম্বর পিলারের ১৫০ গজ বাংলাদেশের ভিতরে নিজ জমিতে কাজ করার সময় বিএসএফের গুলিতে আব্দুল হকের পুত্র ফকির চান (২১) নামে এক কৃষক নিহত হয়। অপরদিকে সকাল ১০টায় পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া থানার ভজনপুর মাঝিপাড়া সীমান্তে ৪৩৩ নম্বর পিলারের নিকট বাংলাদেশের ভিতরে বিএসএফ এক কৃষককে লক্ষ্য করে ২ রাউন্ড গুলি করলে আখতার হোসেন (২৫) নামে এক কৃষক গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়। একই থানার জমির আলী (২৭) নামে এক শ্রমিক মহানন্দা নদীতে পার সংগ্রহ করার সময় বিএসএফ দুপুরে অপহরণ করে ভারতে নিয়ে যায়। তাকে ফেরত দেয়ার জন্য বিডিআরের ৪১ ব্যাটেলিয়ানের পক্ষ থেকে দু'বার বিএসএফের সাথে ফ্ল্যাগ মিটিং হওয়ার পরও তাকে ফেরত দেয়া হয়নি।

১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা থানার লাতু সীমান্ত রেখা বরাবর সীমান্তের ওপারে ৫৬ কিলোমিটার ব্যাপী অংশ জুড়ে আকস্মিকভাবে অবস্থানগ্রহণ করে বিএসএফরা। আন্তর্জাতিক নিয়ম কানুন ও বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত বিষয়ক চুক্তিকে রীতিমতো অবজ্ঞা করে সীমান্ত রেখার পাঁচ থেকে ছয় হাজার গজের মধ্যে ঘাঁটি গেড়ে বসে। এর পরপরই তারা সীমান্তের জিরো লাইন বরাবর এগিয়ে আসে এবং মৌলভীবাজারের কুলাউড়া থানার জুড়ি সীমান্তে থেকে শুরু করে সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার সীমান্তের সারোপার-নয়াগ্রাম সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত ৫৬ কিলোমিটার অংশ জুড়ে তারা ছড়িয়ে থাকে।

১৭ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে বিএসএফ উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ জেলার হেমতাবাদ থানার সুখা গ্রামে রকসির উদ্দিন (৪৫) ও দিনাজপুর ফকিরগঞ্জ সীমান্তের উফদইল গ্রামের সাইদুর রহমানকে (২৭) গভীর রাতে ডেকে নিয়ে সীমান্তের কাটাতারের বেষ্টনীর মধ্যেই আগ্নেয়াস্ত্রধারী ভারতীয় সৈন্যরা তাদের গুলি করে হত্যা করে। নিহতরা তখন তাদের জমিতে চাষ করছিল। বিডিআর দিনাজপুরের ব্যাটেলিয়ানের সেক্টর কমান্ডার ও পীরগঞ্জ থানার ওসি প্রথম দিন লাশ ফেরত দেয়ার জন্য বিএসএফের সাথে দেনদরবার করেও লাশ ফেরত আনতে পারেনি। পরে ১৮ সেপ্টেম্বর বিএসএফ লাশ দু'টি হস্তান্তর করে।

www.pathagar.com

১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের সাথে ভারতের প্রায় সবক'টি সীমান্ত পয়েন্টেই বিএসএফ ও ভারতীয় সেনাদের আগ্রাসী তৎপরতা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এই আগ্রাসী তৎপরতার রশদ যোগায়। ভারতীয়দের উত্তেজনা সৃষ্টির পাঁয়তারা প্রশমনের পাল্টা জবাব দিতে বাংলাদেশ সীমান্তে বিডিআর টহল জোরদার ও অতিরিক্ত বিডিআর মোতায়েন করা হয়। বিএসএফ ও বিডিআর-এর মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণের ফলে যে কোন মুহূর্তে সহিংস বিরোধের আশংকায় সীমান্তবর্তী মানুষ আতঙ্কে ছিল। ৩০ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সীমারেখা ও বাংলাদেশে আকাশসীমা লংঘন করে ভারতীয় জঙ্গী বিমান বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডের তেঁতুলিয়া সীমান্তে মহড়া দেয়। এতে এলাকায় আতংক ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা এ ঘটনায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত বলে মন্তব্য করেন। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লাল কৃষ্ণ আদভানীর উস্কানীমূলক নির্দেশে বিএসএফ বাংলাদেশের সীমান্তে মারমুখী অবস্থান নেয়। ২৮ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টা ৫০ মিনিটে বিকট শব্দে একই সাথে ভারতীয় ৫টি জঙ্গী বিমান তেঁতুলিয়া থানা সদরের উপর দিয়ে উড়ে যায়। আকস্মিক শব্দে সবাই দিকবিদিক ছুটাছুটি করতে থাকে। বেশ কয়েকবার আকাশে চক্কর দিয়ে বিমানগুলো আবার ভারতের বাকডোগরা বিমান ঘাঁটির দিকে চলে যায়। ভারতীয় বিমান তাদের আকাশে মহড়া দেয়ার সময় হঠাৎ করেই বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে পড়ে।

৩ অক্টোবর ভারতের আসাম ও পশ্চিমবাংলা রাজ্যে লোকসভার নির্বাজনকে পুঁজি করে কুড়িগ্রামের সীমান্ত ঘেঁষা ভারতের আসাম এবং পশ্চিম বাংলা রাজ্য সীমান্তে বিপুল সংখ্যক বিএসএফ ও সেনাবাহিনী মোতায়েন করে সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টির পাঁয়তারা চালানো হয়। সীমান্তের সম্ভাব্য সহিংস ঘটনা মোকাবেলার জন্যে সীমান্তে বাংলাদেশ রাইফেলস-বিডিআর টহল জোরদার রাখে। এছাড়াও অতিরিক্ত বিডিআর মোতায়েন করা হয়। যে কোন মুহূর্তে ভারতের বিএসএফ এবং বাংলাদেশের বিডিআর এর মধ্যে বিরোধ বাধাতে পারে এই আশংকায় আতংকিত ছিল সীমান্ত ঘেঁষা অঞ্চলসমূহের মানুষ। আসাম রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এই নির্বাচনটি বয়কট করায় সেখানে সহিংস ঘটনা প্রতিহত করতে ব্যাপক বিএসএফ ও সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। অন্যদিকে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এলকে আদভানী এর কয়েকদিন আগে লোকসভা নির্বাচনের প্রচারকার্যে আসাম রাজ্য সফর করেন। এই সফরকালে বিভিন্ন স্থানে জনসমাবেশে বক্তৃতাকালে বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক হারে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে অভিযোগ করলে সীমান্ত ঘেঁষা অঞ্চলসমূহে ভারতীয় বাহিনী বেপরোয়া হয়ে উঠে। এ ধরনের উস্কানীমূলক ও ভিত্তিহীন প্রচারণা চালিয়ে ক্ষমতাসীন বিজেপি নেতারা গোলযোগপূর্ণ আসাম রাজ্যে রাজনৈতিক ফায়দা লুটার অপচেষ্টা চালায়। লোকসভার নির্বাচনকে পুঁজি করে সীমান্তে বিএসএফ ও সেনা মোতায়েন এবং ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উস্কানীমূলক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বিডিআর এবং বিএসএফ-এর মধ্যে টান টান উত্তেজনা বিরাজ করে। এদিকে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে কুড়িগ্রাম ১৬ রাইফেল ব্যাটেলিয়ানের চৌদ্দ কুড়ি বিওপি ক্যাম্পের সদস্যরা ৩ জন ভারতীয় নাগরিককে আটক করে স্থানীয় জেলহাজতে পাঠায়। আটককৃত ৩ ভারতীয় নাগরিকের নাম হচ্ছে কোরবান আলী, পরেশ চন্দ্র রায় ও নেপাল চন্দ্র রায়। এরা তিনজন একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকাযোগে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জেলার নাগেশ্বরী থানায় প্রবেশ করলে কর্তব্যরত বিডিআর নৌকাসহ তিনজনকে আটক করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় বিএসএফরা বাংলাদেশী নাগরিককে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে ওঁৎ পেতে ছিল।

www.pathagar.com

মৌলভীবাজার জেলার বিওপি টিলা-লাঠিটিলা সীমান্ত দিয়ে বিএসএফ পুশইনের অপচেষ্টায় মেতে উঠে। ইতোমধ্যেই তারা করিমগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে বসবাসকারী প্রায় আড়াই হাজার বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম নাগরিককে কদমতলা থানা এলাকায় এনে জড়ো করে। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে জড়ো করা পুরুষ-মহিলা ও শিশুদের মনটিকি, বিওরগোল, কাঠালতলীর উচ্চ বিদ্যালয় ও ৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আটকে রাখা হয়। পুলিশ ও বিএসএফ'র সার্বক্ষণিক পাহারায় বন্দিদশাগ্রস্ত এসব মানুষজন অর্ধাহারে, অনাহারে দিনাতিপাত করলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। বরং প্রায় রাতেই ২০/২৫ জনের একেকটি গ্রুপ বানিয়ে পুশইন করানোর জন্যে সীমান্তবর্তী পাহাড়ি এলাকায় আনা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ সীমান্তে বিডিআর জওয়ানের ব্যাপক তৎপরতার কারণে কোনো পুশইন করতে পারেনি ভারতীয়রা। এদিকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সীমান্ত এলাকায় নতুন করে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করে। ৩০ সেপ্টেম্বের পর্যন্ত কাঠালতলী, ধর্মনগর ও কদমতলা থানা সদরে লোহার এঙ্গেল, খুঁটি, কাঁটাতারের বেড়া আনা অব্যাহত ছিল। দু-চারদিনের মধ্যে যাবতীয় সরঞ্জামাদি সীমান্তবর্তী এলাকায় এনে বেড়া নির্মাণের কাজ শুরু করার আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছিল। একই দিনে কুলাউড়া থানা সদর থেকে ২৫/২৬ কিলোমিটার দূরের লাঠিটিলা সীমান্তে গিয়ে শান্ত ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ২৯ সেপ্টেম্বের গভীর রাতে কচুরগোল-নালাপুঞ্জির ওপারে বিওরগোল এলাকায় ব্যাপক গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়। এতে আতংকিত হয়ে উঠে বাসিন্দারা। বিডিআর কর্মকর্তারা সেখানে বিএসএফ-এর সাথে কোনরকম গুলি বিনিময়ের কথা অস্বীকার করেন। ধারণা করা হয়, সীমান্তের ওপারে বিএসএফ-এর সাথে স্বাধীনতাকামী উগ্রপন্থীদের সংঘর্ষ ঘটেছে। স্থানীয়রা জানায়, 'ভারত সীমান্তে মূলত অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করছে। প্রায়ই সেখানে উগ্রপন্থীদের সাথে গোলাগুলির ঘটনার খবর পাওয়া যায়। উগ্রপন্থীদের সাথে সুবিধা করতে না পারলে বিএসএফ তাদের আশ্রয়দানকারী সন্দেহে বিভিন্ন জনবসতিতে হানা দিয়ে ব্যাপক নিপীড়ন নির্যাতন চালিয়ে থাকে।' লাঠিটিলায় অমিমাংসীত ৮২২ একর সম্পত্তির মধ্যে ৫৩৯ একর সম্পত্তি ইতিমধ্যেই ভারত অপদখলে নিয়েছিল। এই অপদখলীয় জায়গাতেই স্থাপন করা হয় বিএসএফ'র ষ্ট্যান্ডিং ক্যাম্প। সেখানে পাশাপাশি ছিল আইটাইপ ও ভিটাইপ পোষ্ট। তারা সার্বক্ষণিক যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে অবস্থান করেছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ সীমান্তেও বিডিআর সতর্কতামূলক অবস্থান নেয়। প্রতিটি বিওপিতে বাড়ানো হয় বিডিআর জওয়ানদের সংখ্যা। ২৭ সেপ্টেম্বের থেকে সিলেট সেক্টরের আওতায় সকল স্পর্শ কাতর বিডিআর ক্যাম্পে একজন করে ক্যাপ্টেন পদমর্যাদার অফিসারকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

বেনাপোলসহ যশোরের অন্যান্য সীমান্তে বিডিআর-বিএসএফের মধ্যে উত্তেজনা অব্যাহত ছিল। ৩০ সেপ্টেম্বের বেনাপোল সীমান্তের রঘুনাথপুর, সাদিপুর, বড়আচড়া, গাতিপাড়া, দৌলতপুর ও পুটখালী সীমান্ত এলাকাগুলোর সীমান্তের ওপারে বিএসএএফ দিনভর মহড়া দিয়েছে। অতিরিক্ত ফোর্সও ঐ দিন পর্যন্ত প্রত্যাহার করেনি। এপারে বিডিআরও সতর্কাবস্থা বজায় রেখেছে। বেনাপোলের উক্ত সীমান্ত এলাকার কাছ থেকে ভারতীয় বিএসএফ তাদের চৌকি নির্মাণ সামগ্রী সরিয়ে নেয়ার পর দৌলতপুর সীমান্তের মিন্দিরচর নামক স্থানে নতুন করে চৌকি নির্মাণ কাজ শুরু করেছিল তা ২৭ সেপ্টেম্বেরও অব্যাহত ছিল। ব্যাংকারগুলোতে বিএসএফ-এর অবস্থান ছিল। ৮ অক্টোবর বিএসএফ বাংলাদেশের বেনাপোল সীমান্তবর্তী গ্রামে রঘুনাথপুরে ঢুকে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে ৩ জন বাংলাদেশী নাগরিককে নৃশংসভাবে হত্যা

www.pathagar.com

করে। গভীর রাতে ৪০/৫০ জনের একটি চোরাচালান সংঘবদ্ধ দল চোরাই পণ্য নিয়ে ভারতে ঢোকার সময় বিএসএফ কোনরূপ সতর্ক প্রদান করা ছাড়াই হঠাৎ করে এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। এ সময় ঘটনাস্থলেই আঃ সামাদ, বাবার আলী এবং মাস্টার নামে ৩ জন মারা যায়। বিএসএফ তড়িগড়ি লাশ তাদের দখলে নিয়ে যায়। নিহতদের ২ জনের বাড়ি বেনাপোলে, অপর একজনের বাড়ি ফুলতলায়। ঘটনার রাত থেকেই সীমান্তে আতংক বিরাজ করেছে। বাংলাদেশের ২০ ও ২১ নং পিলারের বিপরীতে ভারতীয় অংশে বিএসএফের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। বাংলাদেশেও বিডিআরকে সতর্কাবস্থায় রাখা হয়। ফ্ল্যাগ মিটিং-এর মাধ্যমে বিএসএফ নিহত বাংলাদেশীর লাশ বিডিআরের কাছে হস্তান্তর করে। পঞ্চগড় জেলার ১শ' ৮০ কি. মি. ত্রিমুখী সীমান্ত জুড়ে ভারত তার সামরিক আগ্রাসনসহ পুশইন, হত্যা, গুম, ধর্ষণ এবং ফেনসিডিল ও জাল টাকা পাচার অব্যাহত রাখে। নির্বাচনে বিজেপি জোটের জয়লাভের পর ৬ আক্টোবর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত তিনদিনে উত্তরাঞ্চলের তিন জেলা পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী সীমান্ত দিয়ে ভারত প্রায় ১ হাজার বাংলাভাষী মুসলমান নারী-পুরুষকে পুশইন করেছে। এ সময় অনেক মহিলাকে ধর্ষণসহ তাদের অনাহারে রেখে চরম মানবাধিকার লংঘন করেছে। এরপূর্বে বিএসএফ-বিডিআরসহ ২৭ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করে এবং লাশ টেনে-হিঁচড়ে ভারতে নিয়ে যায়। এদের মধ্যে অনেকের লাশ শেষ পর্যন্ত ফেরত দেয়। পঞ্চগড় জেলার চাকলাহাট, ভজনপুর ও বাংলাবান্ধা সীমান্তে বিএসএফ সদস্যরা শতাধিক রাউন্ড গুলি ছুঁড়েছে। ভারতের এ ধরনের উস্কানিমূলক সামরিক তৎপরতা ছাড়াও সীমান্তে অন্যান্য ঘটনা ছিল দেশের জন্য উদ্বেগজনক। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ২৪ মার্চ ১৯৯৮, দৈনিক দিনকাল ২১ এপ্রিল, দৈনিক মানব জমিন ২৮ মে, দৈনিক সংগ্রাম ১১ আগষ্ট, দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা ১ অক্টোবর, দৈনিক ইনকিলাব ১০ অক্টোবর ও দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা ১১ অক্টোবর ১৯৯৯)

www.pathagar.com

শেখ হাসিনার বিদেশ সফরের খতিয়ান

শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণ করেন ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন। মাত্র ১৫ দিনেরও কম সময়ের মধ্যে তিনি ৮ জুলাই হজ্ব পালনের জন্য ৪ দিনের সফরে ৪২ জনকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় অর্থে সৌদি আরব যান। আল্লাহপাক যেখানে বলেছেন 'কারো কাছ থেকে ধার করে হজ্বব্রত পালন করলে তা কবুল হবেনা'-সেখানে জনগণের অর্থদ্বারা গঠিত রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে বিরাট অংক নিয়ে যাওয়া হয় সৌদি আরবে। যে দেশের মানুষ পেটের ক্ষুধা মেটাতে পতিতা বৃত্তির মতো কাজে লিপ্ত হয় সে দেশের প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় বসেই ৪২ জনকে নিয়ে হজ্বে যান। এ সফরে ব্যয় হয় ৩৬ লাখ ৬৯ হাজার ৮৬৪ টাকা।

১২ সেপ্টেম্বর তিনি কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের অভিপ্রায় নিয়ে ৫ দিনের সফরে ৪৯ জন নিয়ে চীনে যান। এ সফরে ব্যয় হয় ৪৩ লাখ ১০ হাজার ৩৫২ টাকা।

জাতিসংঘকে আমরা জানি বিশ্বের নীতিনির্ধারকদের একমাত্র সংস্থা হিসেবে। সেখানে বাংলাদেশের মতো একটি গরীব দেশের ৭৭ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত নয়। ২১ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রে ৮ দিনের সফরে উল্লেখিত সংখ্যা নিয়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেয়ার জন্য গমন করেন প্রধানমন্ত্রী। এ সফরে ব্যয় হয় ২ কোটি ১৫ লাখ ৬০ হাজার ২১১ টাকা।

যুক্তরাষ্ট্র সফরের কিছুদিন পরে ১৩ নভেম্বর বিশ্বখাদ্য সম্মেলনে ভাষণদানের উদ্দেশ্যে ৫৪ জন নিয়ে ৫ দিনের সফরে ইতালী যান। এ সফরে ব্যয় হয় ১ কোটি ৪৩ লাখ ৫ হাজার ৮৯০ টাকা।

১০ ডিসেম্বর অসম গঙ্গার পানি চুক্তি নিয়ে আলোচনার নামে বাংলাদেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে ২ দিনের সফরে ভারতে গমন করেন। এ সফরে প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী ছিলেন ৩৯ জন, ব্যয় ৫২ লাখ ৪৫ হাজার ৯৬৭ টাকা। শাসনকালের অর্ধ বছর পূর্তির আগেই বিরাট সঙ্গীবাহিনী নিয়ে এতগুলো দেশ প্রধানমন্ত্রী সফর করে দেশের কল্যাণের কোন কাজ বিদেশ থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হননি।

১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসও শেষ হয়নি অথচ ২৯ জানুয়ারি ক্ষুদ্র ঋণ বিষয়ক সম্মেলনে যোগদান করতে ৩৫ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ১২দিন কাটিয়ে আসেন শেখ হাসিনা। এ সফরে ব্যয় হয় ১ কোটি ৮৪ লাখ ৪১ হাজার ৪০০ টাকা। একই বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি ভারতে 'রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ'-শীর্ষক ৩ দিনব্যাপী সম্মেলনে ৩৪ জন সফরসঙ্গী নিয়ে ভারতে যান প্রধানমন্ত্রী। এতে ব্যয় হয় ৪৫ লাখ ৫৪ হাজার ২১৬ টাকা।

২২ মার্চ ওআইসি সম্মেলনে ৩৩ জন সফরসঙ্গী নিয়ে পাকিস্তানে ৩ দিনের সফরে যান প্রধানমন্ত্রী। এতে ব্যয় হয় ৬৯ লাখ ৭৩ হাজার ৭৯৪ টাকা। ২১ জন সফরসঙ্গী নিয়ে ১৪ এপ্রিল হজ্ব পালনে সৌদি আরবে ৪ দিনের সফরে যান প্রধানমন্ত্রী। এতে ব্যয় হয় ৫৮ লাখ ৭৬ হাজার ৭০৯ টাকা।

www.pathagar.com

১১ মে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে মালদ্বীপে ৬১ জন সফরসঙ্গী নিয়ে ৩ দিনের সফরে যান প্রধানমন্ত্রী। এতে ব্যয় হয় ৭১ লাখ ৯৪ হাজার ১৪৫ টাকা। ২৭ জন সফরসঙ্গী নিয়ে ১৪ জুন 'ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনে' তুরস্কে প্রধানমন্ত্রীর ২ দিনের সফরে ব্যয় হয় ১ কোটি ১৪ লাখ ৯০ হাজার ২২৯ টাকা। ৩০ জুন কূটনৈতিক কাজের কথা বলে জাপানে ৯২ জন নিয়ে ৬ দিনের সফরে যান প্রধানমন্ত্রী। এতে ব্যয় হয় ১ কোটি ৮৩ লাখ ৮২ হাজার ২৯৬ টাকা। ১২ জুলাই 'বয়স্ক শিক্ষা সংক্রান্ত সম্মেলনে' জার্মানীতে ৩২ জনকে নিয়ে ৪ দিন কাটান শেখ হাসিনা।

তবে এর পরবর্তী সফর নিয়ে বেশ সমালোচনার সন্মুখীন হতে হয় তাকে। শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রীত্বের এক বছর একমাস পূরণ হওয়ার আগেই দেশ যখন বন্যায় ডুবছিল তখন দীর্ঘমেয়াদি ব্যক্তিগত সফরে বিদেশে অবস্থান করায় বেশ সমালোচনা হয়। ১৫ জুলাই জার্মানী হতে যুক্তরাষ্ট্রে যান তিনি। উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ছিল। তার কন্যার প্রথম সন্তান প্রসব উপলক্ষে আমেরিকার ফ্লোরিডায় ২০ দিন কাটিয়েছেন তিনি। সেখানে তিনি পুত্র, কন্যা, কন্যার স্বামী ও আত্মীয়-স্বজন নিয়ে নিজ হাতে রান্না-বান্না করে খেয়ে বেশ সমালোচনার মুখোমুখি হন। কোন কোন পত্রিকায় তার ঐ দীর্ঘ সফরকে পিকনিক হিসেবে অভিহিত করে উপহাস করার চেষ্টা করে। যুক্তরাজ্যে যাত্রা বিরতিতে মোট ব্যয় হয় ১ কোটি ৭৩ লাখ ৬০ হাজার ৩৯৬ টাকা।

৪ সেপ্টেম্বর কূটনৈতিক কাজে ৪৮ জনকে নিয়ে ৪ দিনের সফরে ইন্দোনেশিয়া, ৮ সেপ্টেম্বর ফিলিপাইন যান প্রধানমন্ত্রী। ফিলিপাইনে সরকারি সফরে মোট ব্যয় হয় ১ কোটি ৬২ লাখ ৩৯ হাজার ৮৬৮ টাকা। ১৩ সেপ্টেম্বর ২২ সফরসঙ্গী নিয়ে মাদার তেরেসার মৃত্যুর কারণে ২ দিনের সফরে ভারত গমন করেন প্রধানমন্ত্রী। এতে ব্যয় হয় ১২ লাখ ৪৬ হাজার ৭৫৫ টাকা।

কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করতে ৪৪ জন নিয়ে ৮ দিনের বৃটেন সফর শুরু হয় ২২ অক্টোবর। তিনি এডিনবরায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যোগদানের বিষয়টিকে 'পারিবারিক' করে ফেলেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে থাকেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ, প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী, অর্থমন্ত্রী শাহ কিবরিয়া, শেখ রেহানা, সায়মা ওয়াজেদ পুতুল (প্রধানমন্ত্রীর কন্যা), খন্দকার মাশরুর হোসেন (পুতুলের স্বামী), সজিব ওয়াজেদ জয় (প্রধানমন্ত্রীর পুত্র), রেদোয়ান মুজিব সিদ্দিকী (রেহানার পুত্র), সাংবাদিক এবিএম মূসা, আবদুল মতিন, আনিসুজ্জামান, মনজুরুল হক, নজীর আহমদ (প্রধানমন্ত্রীর পারসোনাল স্টাফ) প্রমুখ। প্রথমদিকে বাংলাদেশের ডেলিগেশনের তালিকায় 'পারিবারিক' অনেকে স্থান পেলেও শেষ মুহূর্তে সম্মেলনে যোগদানের জন্যে উপস্থিত বাংলাদেশ ডেলিগেশনে পরিবর্তন আনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ১৮ জন পূর্ব নির্ধারিত প্রতিনিধি স্থলে ১২ জনে সীমিত করা হয়। যদিও সরকারি ব্যয়ে অধিকাংশ প্রতিনিধিই এডিনবরায় পৌঁছেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয়দের ডেলিগেশন তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ফারুক সোবহান এবং একান্ত সচিব ওবায়দুর মোক্তাদির চৌধুরীর নামও বাদ দেয়া হয়। সফরসঙ্গীদের মধ্যে চারজন বিশিষ্ট সাংবাদিকও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ পাননি। প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গীতে ডেলিগেশন সদস্য না হয়েও শেখ হেলাল উদ্দিন এমপি এবং মি. ব্রায়ান জন লিউ নামে এক ব্যক্তিকে প্রটোকল সুবিধা দেয়া হয়। তারা দু'জন একত্রে জর্জ ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের একটি রুম বরাদ্দ পান বলে মুদ্রিত সফরসঙ্গী তালিকাতে দেখান হয়। প্রধানমন্ত্রীও একই হোটেলে উঠেন। জনপ্রতিনিধি হিসেবে শেখ হেলালকে সফরসঙ্গী না করে প্রধানমন্ত্রী পুত্র-

www.pathagar.com

কন্যা, জামাতা-বোন, বোনের ছেলেকে সে সুযোগ দেন। প্রধানমন্ত্রীর স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়া ও শেখ রেহানার স্বামী সফিক সিদ্দিকী আর প্রধানমন্ত্রীর বেয়াই-বেয়াইন বাদ পড়েন সফরসূচি থেকে। এদের ইনক্লুড করলে পুরো প্রোগাম ষোলকলায় পূর্ণ হতো। প্রধানমন্ত্রী কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদানের জন্যে যে ডেলিগেশন নেয়া হয় তার মধ্যে দেখা যায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর (রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক) মাথাগুলো গেছেন এডিনবরায়। মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সচিব যান। এ থেকে প্রমাণ হয় কাজে বড়ো নয়, বিদেশ সফরই বড়ো। একটি মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক বা জনপ্রতিনিধি দু'জন এবং সচিব স্বয়ং একই সময় হেড কোয়ার্টার খালি করে বিদেশ সফর করতে পারেননা। শেখ হাসিনার এবং তার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেটা দেখিয়েছে যে, হ্যাঁ পারে। প্রধানমন্ত্রীর এ সফরে ব্যয় হয় ১ কোটি ৪৪ লাখ ১১ হাজার ৪৮৫ টাকা।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে বিদেশ সফরের হিড়িক পড়ে যায়। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী-স্পীকার একা একা, কেউবা পরিবার নিয়ে বিদেশ সফরে গেছেন রাষ্ট্রীয় কাজের নাম করে। এখানে একটি রেকর্ড উল্লেখ করতে চাই। আমার মনে হয়না বিশ্বের কোন দেশ এ রেকর্ড পূর্বে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। রেকর্ড হলো নিউজ মিডিয়ার বরাত দিয়ে ২৯ অক্টোবর দৈনিক জনতার সংক্ষিপ্ত সংবাদে বলা হয়, '৮ জন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বর্তমানে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা বর্তমানে সরকারি সফরে বাইরে রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগ দিয়ে বর্তমানে লন্ডনে অবস্থান করছেন, স্পীকার হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী পাকিস্তান সফরে রয়েছেন, বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমদ জেনেভা সম্মেলনে রয়েছেন, অন্যদিকে ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ ও গৃহায়ন মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম চিকিৎসার্থে সিঙ্গাপুরে রয়েছেন। এর বাইরেও বেশ কয়েকজন প্রতিমন্ত্রী বর্তমানে দেশের বাইরে রয়েছেন'।

প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কমনওয়েলথে তার সাফল্যের বিষয় নিয়ে কথা বলেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি উল্লেখ করেন, 'কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে আমার ছেলে, মেয়ে আত্মীয়-স্বজন আমার সঙ্গেই ছিলেন। অতীতেও এমন হয়েছে, বতর্মানেও বিশ্বের সরকার রাষ্ট্রপ্রধানগণ এ ধরনের অনুষ্ঠানে তাদের আত্মীয়-স্বজন নিয়ে যান। বাংলাদেশের ইতিহাসেও তা আছে এবং এটা করার বিধান রয়েছে। (সূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ ১ নভেম্বর ১৯৯৭)।

প্রধানমন্ত্রী হাসতে হাসতে সাংবাদিকদের বলেন, 'আপনারা একজনের নাম লেখেননি'। তিনমাস ১০ দিনের তার নাতনী তাজমীম হোসেনও প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী ছিল। ৮ ডিসেম্বর ইরানে 'ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে' ২৮ জনের একটি দল নিয়ে ৫ দিনের সফরে যান প্রধানমন্ত্রী। ইরান সফরে ব্যয় হয় ১ কোটি ১১ লাখ ৮৫ হাজার ৭৮৫ টাকা।

শেখ হাসিনা বিশ্বের বিভিন্ন ডিগ্রী ও পুরস্কার পেয়েছেন। সরকারের পক্ষ থেকে ও সংবাদপত্রের তথ্য থেকে জানা যায় এগুলো মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তার স্বর্তস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য দেয়া হয়েছে। তবে বাস্তব সত্য হলো এগুলো পাওয়ার জন্য শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয় করেছেন। একাজে তিনি নিজস্ব সিন্ডিকেট ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের জোরেসোরে তৎপরতা চালানোর জন্য ক্ষমতায় বসেই আদেশ করেছেন। তিনি শান্তি-সেনানী হিসেবে ভাবমূর্তি দাঁড় করাতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিদেশ সফরের চেষ্টাও অব্যাহত রাখেন। তার পক্ষ থেকে নোবেল পুরস্কারের মনোনয়নের জন্য হাস্যকর প্রয়াসও চালানো হয়। তিনি এই পর্যন্ত যতগুলো ডিগ্রী ও পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়েছেন তা বিশ্বের মধ্যে

www.pathagar.com

নন্দিত মানবাধিকার নেত্রী মাদার তেরেসাও পাননি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বিদেশে পঠিয়ে লবিং ও বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে কিছু ডিগ্রী ও পুরস্কার অর্জিত হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়।

ভারত এবং পাকিস্তান পারমাণবিক বোমা দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের শক্তি প্রদর্শনের পর শেখ হাসিনা বিশ্বের কাছে নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সেই দুই দেশের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার ধূয়া তুলে বহু দেন দরবারের পর পাকিস্তান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে থেকে দেশ দু'টি সফরের আমন্ত্রণ আনাতে সক্ষম হন। পারমাণবিক বিস্ফোরণোত্তর পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য ১৬ জুন ১৯৯৮ ভারতে ৪৫ জন সদস্য নিয়ে ১ দিনের সফর করেন শেখ হাসিনা। এতে ব্যয় হয় ২৬ লাখ ৩৪ হাজার ১০৬ টাকা। আওয়ামী লীগের পরম বন্ধু ভারত প্রথমে পারমাণবিক উত্তেজনা নিরসনে বাংলাদেশের দূতিয়ালির উদ্যোগ নাকচ করে দিয়েছিল। তবে শেখ হাসিনার আগ্রহ রক্ষার জন্যে কেবল সফরের আমন্ত্রণ জানাতে সম্মত হয়। ভারতীয় বার্তা সংস্থা পিটিআই এই সংবাদ বিতরণ করে। লন্ডনের টেলিগ্রাফ পত্রিকা এ মর্মে খবর প্রকাশ করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্রগুলোর বরাতে তখন জানা যায়, প্রধানমন্ত্রীর ভারত ও পাকিস্তান সফরের ব্যাপারে বাংলাদেশের কূটনৈতিক উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পর শেখ হাসিনা নিজেই দেশ দু'টি সফরের প্রচেষ্টা চালান। ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সিএম শফি সামী ও ঢাকাস্থ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কূটনৈতিক উদ্যোগ এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে যায়। এরপর প্রধানমন্ত্রীর অফিস বিভিন্ন চ্যানেলে ভারত সফরের ব্যবস্থা করার জন্যে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর আমন্ত্রণ জানানোর ঘোষণা আনতে সক্ষম হয়।

অপরদিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকাস্থ পাকিস্তানের হাইকমিশনার করম এলাহী এবং ইসলামাবাদস্থ বাংলাদেশের বিদায়ী হাইকমিশনার কিউএএম এ রহিমের সেদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে শেখ হাসিনার জন্যে আমন্ত্রণ আনার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। এরপর পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ ফোনে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গওহর আইয়ুব খানের সাথে কথা বলেও এক্ষেত্রে কোনো সফল বয়ে আনতে পারেননি। সর্বশেষ শেখ হাসিনা ৯ জুন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় পাকিস্তানে সদ্য বিদেশ ফেরত প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফকে টেলিফোনে পেয়ে যান। শরীফের বাংলাদেশ সফরসহ বিভিন্ন বিষয় আলোচনার পর তিনি পাকিস্তান সফরের ব্যাপারে সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণ জানানোর সম্মতি গ্রহণে সক্ষম হন। ২৪ জুন ৪৫ জন সফরকারী নিয়ে নওয়াজ শরীফের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য পাকিস্তান ১ দিনের সফরে যান শেখ হাসিনা। এতে ব্যয় হয় ৫৮ লাখ ২১ হাজার ৩৩৯ টাকা।

সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানে মোটামুটি বিশাল বাহিনী রাখেন প্রধানমন্ত্রী। ৪৬ সদস্য বিশিষ্ট বাহিনী নিয়ে ২৮ জুলাই শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত ৩ দিনের সম্মেলনে যোগদান করেন তিনি। শ্রীলংকায় সরকারি সফরে ব্যয় হয় ১ কোটি ৩ লাখ ৩৪ হাজার ৬৪৬ টাকা। আগষ্ট মাসের ৩০ তারিখে ওমরাহ হজ্ব পালন করার জন্য ২ দিন কাটিয়ে আসেন সৌদি আরবে। হজ্ব পালনে প্রত্যেক নর-নারীর জন্য একবার ফরজ। কিন্তু শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর থেকে বেশ কয়েকবার হজ্ব পালন করেছেন। শেখ হাসিনা ২৭ জানুয়ারি ১৯৯৯ কলকাতা'র বই মেলা উদ্বোধন করার জন্য ৪৭ জনকে নিয়ে ৩ দিনের সফরে ভারত যান। এতে ব্যয় হয় ৩৬ লাখ ৫৯ হাজার ৮৯৮ টাকা।

হেগ শান্তি সম্মেলনে যোগদান করতে ১৪ মে নেদারল্যান্ড ৩০ জন নিয়ে ২ দিনের সফরে যান। এতে ব্যয় হয় ১ কোটি ৩৪ লাখ ৯৫৬ হাজার ৫২৭ টাকা।

www.pathagar.com

৫ জুলাই প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ উৎসব উদ্বোধনের জন্য ১০ দিনের সফরে যুক্তরাজ্যে তার প্রথম সরকারি সফরে লন্ডনের হীথ্রো বিমানবন্দরে অবতরণ করলে ব্রিটিশ সরকারের কোনো মন্ত্রীও তাকে স্বাগত জানায়নি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের আমন্ত্রণে সফর হিসেবে বলা হলেও বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানান ব্রিটিশ পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিষয়ক মন্ত্রীর বিশেষ প্রতিনিধি স্যার রজার হার্ভে। ঘটনাটি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর জন্য চরম অসম্মানজনক ঘটনা ছিল। পাশাপাশি এটি ছিল শেখ হাসিনার গলদ কূটনৈতিক সম্পর্ক ও পররাষ্ট্রনীতির ব্যর্থতা। শেখ হাসিনা ৬৫ জনের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে এই সফর করেন। এই ৬৫ জনের মধ্যে বিশিষ্টজনের তালিকায় ৯ জনই ছিল তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। প্রায় সময়ের মতো সেইবারও তিনি তার সফরসঙ্গীদের তালিকায় বোন শেখ রেহানা ও তার ছেলে রিদওয়ান মুজিব সিদ্দিকী, দুই মেয়ে রেজওয়ানা সিদ্দিকী ও আজমিনা সিদ্দিকী, প্রধানমন্ত্রীর মেয়ের জামাই খন্দকার মাশরুর হোসেন, মেয়ে সায়মা হোসেন, দুই নাতনী আমরীন হোসেন ও আলীজি হোসেনকে অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গীদের মধ্যে আরো ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী, বেসরকারিকরণ বোর্ডের চেয়ারম্যান কাজী জাফরুল্লাহ, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডা. এসএ সামাদ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সচিব সিএম শফি সামি, যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার এ এইচ মাহমুদ আলী, প্রধানমন্ত্রীর সচিব জাকিয়া আখতার চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব জাওয়াদুল করিম প্রমুখ। এ জেড এম ওবায়দুল্লাহ খান, আজিজুর রহমান, এডভোকেট সাহারা খাতুন ও অধ্যাপক এ কে এম ফজলুল হক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের তালিকায় ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা দলে ১০ জন কর্মকর্তা ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব ও দু'জন বডিসি ছিলেন। বাণিজ্য প্রতিনিধিদের তালিকায় এফবিসিসিআই-এর সভাপতি আবদুল আওয়াল মিন্টু, সহ-সভাপতি এম এ মুনিম ও সাবেক সভাপতি ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন, বিটিএমএ-এর চেয়ারম্যান সালমান রহমান, এমসিসিআই-এর সভাপতি মাহবুব জামাল, বিসিআই-এর চেয়ারম্যান খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ডিসিসিআই-এর সভাপতি এম এইচ রহমান, সহ-সভাপতি নাসির হোসেন, বিজেএমইএ-এর সভাপতি আনিসুর রহমান সিনহা ও সহ-সভাপতি আনিসুল হক ছিলেন। এদের মধ্যে বিসিআই চেয়ারম্যান খন্দকার মোশাররফ হোসেন প্রধানমন্ত্রীর বিয়াই। বেশ কয়েকজন সাংবাদিকও প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হন। এ সফরে ব্যয় হয় ২ কোটি ৯৫ লাখ ৮৪ হাজার ২৩০ টাকা।

বাদশাহ হোসেনের মৃত্যুতে ২৪ জুলাই ২ দিনের সফরে ২৩ জন নিয়ে শেখ হাসিনা পৌছান মরক্কোয়। এতে ব্যয় হয় ১ কোটি ৪ লাখ ৩ হাজার ৪৮৬ টাকা। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৫৪তম অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা ১৩ সেপ্টেম্বর আমেরিকার নিউইয়র্ক যান। ২৬ সেপ্টেম্বর তিনি ফ্রান্সের প্যারিস হয়ে দেশে ফিরে আসেন। প্যারিসে তিনি ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার গ্রহণ করেন। নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রীর সফরকে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে পরিণত করার তীব্র সমালোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রীর তার নাতনী ও কন্যা, বেয়াই নিয়ে নিউইয়র্কে যা করেন, তার তীব্র সমালোচনা করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা। ১৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক বিমান বন্দরে নেমেই প্রধানমন্ত্রী সেখানে আনীত ফ্লোরিডায় বসাবাসরত তার কন্যা পুতুলকে চুমু খান এবং পুতুলের নবজাত কন্যা এলিসা হোসেনকে কোলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেন। এরপর তিনি পুতুলের অপর কন্যা তাজমীম হোসেনকেও আদর করেন। প্রধানমন্ত্রী নাতনী তাজমীমকে কোলে নিয়েই জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের প্রতিনিধি পি পিটারের সঙ্গে

www.pathagar.com

কথা বলেন। পিটার প্রধানমন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর যে ছবি ছাপার জন্য প্রেসে পাঠানো হয়, তাতেও দেখা যায় যে, প্রধানমন্ত্রীর কোলে তার নাতনী রয়েছে। এতে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত মার্কিন নিরাপত্তা বাহিনী বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে। তাদের অনুরোধ করে নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয় পুতুলকে। পুতুলের শ্বশুরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী ছিলেন। এছাড়া বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন লন্ডনে বসবাসরত শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানা। সঙ্গে তাব পুত্র ববিও ছিল। এই পুরো আয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর নিউইয়র্ক সফর একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। এতে দেশের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয় এবং বিদেশী কূটনৈতিকরা হাসাহাসি করেন। একটি শিশুকে কোলে নিয়ে জাতিসংঘের একজন পদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনা করার দৃশ্য জাতিসংঘ প্রোটোকলের সম্পূর্ণ বাইরে। স্থানীয় পত্র-পত্রিকা বলেছে, 'প্রধানমন্ত্রীর মনে রাখা উচিত ছিল যে, বহির্বিশ্বে তার কর্মকান্ডের সঙ্গে বাংলাদেশের মানসম্মানের প্রশ্ন জড়িত। তিনি যদি হাস্যকর কোনো কাজ করে বসেন, তবে তার পজিশনেরও ক্ষতি হয়'।

২৬ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রীয় তদবিরের মাধ্যমে প্রাপ্ত শান্তি পুরস্কারের জন্য আওয়ামী লীগ পাবর্ত্য কালো চুক্তির জন্য প্রধানমন্ত্রীকে পল্টন ময়দানে গণসংবর্ধনা দেয়। প্রধানমন্ত্রী একদিকে গণসংবর্ধনা গ্রহণ করেছেন অপরদিকে পাবর্ত্য চট্টগ্রামে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলেছে। পাবর্ত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ প্রধানমন্ত্রীর এ পুরস্কার প্রাপ্তির দিনকে কালো দিবস হিসেবে পালন করে। এছাড়া পুরস্কার গ্রহণের প্রতিবাদে ২৩ সেপ্টেম্বর তিনটি পাহাড়ী সংগঠন ঢাকায় মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। পাবর্ত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ এবং তিনটি পাহাড়ী সংগঠনের বক্তব্য ছিল 'এই আওয়ামী লীগ সরকারের তথাকথিত শান্তি, পাবর্ত্য শান্তি চুক্তি করার পর পাবর্ত্যাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান হত্যা, গুম, চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ জনগণ প্রধানমন্ত্রীর এ পুরস্কার গ্রহণ কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না'। তারা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'তথাকথিত শান্তি চুক্তিতে আইনগত জটিলতা রয়েছে, এই কালো চুক্তির ফলে পাবর্ত্য বাঙালি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতীয়দের জীবনে নেমে আসে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা। সরকারের এই কালো চুক্তির ফলে ৬ লাখ পাবর্ত্য বাঙালি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতীয় সর্বস্বান্ত হয়েছে। পাবর্ত্য বাঙালিরা হারিয়েছে ভোটাধিকার থেকে শুরু করে সকল নাগরিক ও মানবিক অধিকার। শান্তি চুক্তির স্থান পাবর্ত্য অঞ্চলেই শুধু অশান্তি তা নয়, সারাদেশেই এখন অশান্তি। রাজপথ উত্তপ্ত হরতাল, বিক্ষোভ, ঘেরাও, প্রতিরোধ, আইন-শৃংখলা অবনতি, হত্যা, অপহরণ, নির্যাতন, ধর্ষণ, মিছিল, পাল্টা মিছিল, রাজপথে টিয়ার গ্যাসের কুন্ডলী, রাবার বুলেট, গরম পানি, লাটিচার্জ, বুটের লাথি, টানাহেঁচড়া, মিছিলে পুলিশ কর্তৃক পকেটমার গ্রেফতার, বাসে অগ্নিসংযোগ, ভাওচুর দেশের সীমান্তে চরম উত্তেজনা, বিএসএফ-এর গুলিতে বিডিআরসহ বাংলাদেশের নাগরিক হত্যা সব মিলে চারদিকে শুধু হতাশা আর অশান্তি। যার ঘরে শান্তি নেই তারই শান্তি পুরস্কার!'

দেশে শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়েছে কয়েকবার তা সরকারের তরফ থেকে প্রমাণসহ বহুবার উপস্থাপন করা হয়েছে। এমনকি জাতীয় সংসদে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে জোর গলায়। কিন্তু বিদেশ থেকে ফেরার পর শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টার একটি মিথ্যা তথ্য দিতে গিয়ে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম সেই পুরাতন কায়দার মিথ্যা সাবোটাজ কাহিনী সকলকে মনে করিয়ে দেন। ৪ অক্টোবর মন্ত্রী তার কার্যালয়ে হরতাল পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে একদল সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপকালে জানান যে 'বিরোধী

www.pathagar.com

দল প্রধানমন্ত্রী ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার গ্রহণ করে প্যারিস থেকে দেশে ফেরার পর পরই হত্যার একটি ঘৃণ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল'। তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক বিরোধীতা কেমন ঈর্ষাপরায়ণ হতে পারে তা এখন আপনারা দেখছেন'।

মন্ত্রী অবশ্য অভিযোগের সমর্থনে কোন প্রমাণ বা উল্লেখযোগ্য তথ্য দিতে পারেননি। তাই বিষয়টি সংবাদপত্রে তেমন গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ পায়নি।

১৭ অক্টোবর দিবাগত রাতে প্রধানমন্ত্রী একত্রিশতম বিদেশ সফরে অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। ৫ দিনের এই সরকারি সফরে ২২ সদস্যের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দলসহ ৫২ জন প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী ছিল। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী তার সফরসঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন। অস্ট্রেলিয়া ছিল বিদেশ সফর তালিকার ২১ তম দেশ। এর আগে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের ২০ টি দেশে ৩০ বার সফর করেন।

প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফরের সময় বাংলাদেশ বিমান পরিচালিত আন্তর্জাতিক চার্টার্ড/ভিভিআইপি ফ্লাইটের জন্য ১৯৯৬ সালে থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সাড়ে ৪ বছরে সরকারের প্রায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে বাংলাদেশ বিমানের ভিভিআইপি ফ্লাইটের জন্য ১৯৯৭ এর নভেম্বর থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বকেয়ার পরিমাণ ছিল প্রায় ২৩ কোটি টাকা। তবে এর সাথে ১৯৯৬ সালের জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এবং ১৯৯৮ সালে প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরসমূহের জন্য পরিচালিত ভিভিআইপি ফ্লাইটের ব্যয় যোগ করলে এ খাতে সরকারের মোট ব্যয় ৩০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। প্রধানমন্ত্রী বিদেশ সফরের ব্যয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ থেকে নির্বাহ করা হয়। কিন্তু 'পরিব্রাজক প্রধানমন্ত্রী' শেখ হাসিনার সপরিবারে এবং সদলবলে ঘন ঘন বিদেশ সফরের কারণে সফরের অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়েই সব সময় বাজেট নিঃশেষ হয়ে যায়। যে কারণে বাংলাদেশ বিমানের ভিভিআইপি ফ্লাইটের বিল যথাসময়ে পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি বলে বকেয়া থেকেছে। বিরাট অংকের বকেয়ার কারণে বাংলাদেশ বিমান নগদ অর্থের (লিকুইডিটি) সংকটে ভুগেছে। ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেয়ার পর পরই শেখ হাসিনা সৌদি আরব সফরে যান। পরে চীন সফর করেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। এ সফরকালীন ভিভিআইপি ফ্লাইটের বিল ৮৯ লাখ টাকা সাড়ে চার বছরে অপরিশোধিত ছিল। ১৯৯৬ সালের জুলাই থেকে এ বছরের আগষ্ট পর্যন্ত ২২ টি ইনভয়েসে প্রধানমন্ত্রীর ভিভিআইপি ফ্লাইট পরিচালনার জন্য বিমানের পাওয়া ছিল ১৯ কোটি ৬২ লাখ ৪৯ হাজার ৮'শ' ৬৩ টাকা। এছাড়া ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রীর ২ দফা যুক্তরাষ্ট্র, পরে নভেম্বর ও ডিসেম্বরে কুয়েত ও কাতার এবং ইতালি, জার্মানি ও সুইজারল্যান্ড সফরের সময়কার ভিভিআইপি ফ্লাইট পরিচালনার জন্য আরো ৩ কোটি ২৫ লাখ টাকা বিল বকেয়া পড়েছে ছিল। ফলে মোট বকেয়ার পরিমাণ ছিল প্রায় ২৩ কোটি টাকা হয়। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ৩ জানুয়ারি ২০০১)

www.pathagar.com

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নমুনা

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সংবাদপত্র অবশ্যই স্বাধীন থাকতে হবে-কথাটি সামনে রেখে সংবাদপত্রকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাসিনা সরকারের আমলে মুখে সংবাদপত্রকে স্বাধীনতা দিলেও বাস্তবে তা কার্যকর ছিল না। দমন-পীড়ন, বিজ্ঞাপন প্রদানে অপারগতা, দলীয়করণ, সাংবাদিকদের নিরাপত্তাহীনতা হাসিনা সরকারের আমলে মুজিব শাসনের মতো চলেছে। পূর্বে বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে গিয়ে হাসিনা সরকার একের পর এক কলংকময় অধ্যায় সৃষ্টি করেছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের দেড় বছরের মধ্যে ২৫ অক্টোবর ১৯৯৭ বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদের সভায় সরকার কর্তৃক ভিন্নমতাবলম্বী সংবাদপত্রসমূহের অস্তিত্ব ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের আশংকা করা হয়েছিল। তখন সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ সরকারকে সকল প্রকার ঐচ্ছিক অবহেলা দূরে ঠেলে সবাইকে এক দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ করেছিলেন। সরকারের পক্ষ থেকে এ বক্তব্যের জবাব ভিন্নভাবে দেয়া হয়েছে। সংবাদপত্র শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন হয় বিজ্ঞাপনের। তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতর (ডিএফপি) সংবাদপত্রকে বিজ্ঞাপন বরাদ্দ করে। হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রদানের নীতি গ্রহণ করে প্রকৃতপক্ষে ভিন্নমতাবলম্বী সংবাদপত্রগুলোকে সাইজ করার সহজ পন্থা বেছে নেয়। সরকারি বিজ্ঞাপনের (ডিএফপি) অর্থ জনগণের পকেট থেকে আদায় হলেও সরকার রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য জনপ্রত্যাশিত সংবাদপত্রকে বিজ্ঞাপন না দিয়ে নিজের সমর্থকদের ঢালাওভাবে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। ডিএফপির বিজ্ঞাপন পেতে হলে যে সকল নীতি মেনে চলতে হয় তা হাসিনার আমলে পুরোপুরি অকার্যকর ছিল। ঢাকার পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ন্যূনতম ৬ হাজার, চট্টগ্রামের ৪ হাজার এবং খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশালসহ অন্যান্য স্থানে ৩ হাজার হতে হবে। নীতি যখন নীতি থাকে না তখন তাকে দুর্নীতি বলাই যুক্তিযুক্ত। হাসিনা সরকারের আমলে সরকারি বিজ্ঞাপন নিয়ে পক্ষপাতিত্ব ও দুর্নীতি অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করতে সক্ষম হয়। মুজিবের গুণগান গাইলেই ক্রোড়পত্র প্রকাশে ডিএফপির বিজ্ঞাপন পাওয়ার কালচার প্রায়ই ঘটেছে। পত্রিকান্তে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে ১৬ নভেম্বর ১৯৯৯ দৈনিক ইনকিলাবের সম্পাদকীয়র প্রথম দিকে উল্লেখ করা হয়, 'ক্রোড়পত্রের টাকা নিয়ে এমন হরিলুট অতীতে কোনো সরকারের আমলে ঘটেনি।'

ঢাকা ও ঢাকার বাইরে দেয়াল সর্বস্ব সরকার সমর্থিত তথা দলীয় নীতির ধারক-বাহক এক শ্রেণীর সংবাদপত্রে এবং দলীয় এমপিদের মালিকানাধীন বাজারে ২/৪ কপি বিক্রিত সংবাদপত্রগুলোতে প্রতিদিন হাজার হাজার কলাম ইঞ্চি বিজ্ঞাপন বরাদ্দ হয়। যেসব সংবাদপত্র সরকারের ভুল-ত্রুটি ধরেছে, সরকারের ভ্রান্ত রাজনীতির সমালোচনা করেছে, সেগুলোতে বিজ্ঞাপন দেয়া হয় অল্প। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন বেসরকারি বিজ্ঞাপনদাতা, ব্যবসায়ী এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানকে চিঠি লিখে ভিন্নমত পোষণকারী সংবাদপত্রকে বিজ্ঞাপন না

www.pathagar.com

দেয়ার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয়েছে, সরকার এমন নীতিই গ্রহণ করেছে যে, 'এখন বিরোধী সংবাদপত্রগুলো এবং সেগুলোর সাংবাদিকরা যত পারে সোচ্চার হোক-কোনো বাধা দেয়া হবে না। তবে আর্থিক সরবরাহ লাইন বন্ধ থাকলে আপনা-আপনিই তাদের বাকরুদ্ধ হয়ে যাবে।'

সরকারের কোপাণলে দৈনিক দিনকাল শুধু বিজ্ঞাপন দিয়েই পড়েনি তা সর্বক্ষেত্রে পড়ার জন্য নিষিদ্ধও করা শুরু হয়েছে। চীফ অব জেনারেল স্টাফের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেনা সদরে সামরিক গোয়েন্দা পরিদফতর থেকে ইস্যু করা সার্কুলারে সেনা সদস্যদের মধ্যে পত্রিকাটির পাঠ রোধ, গ্রহণ, প্রচারণা এবং বিতরণ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। সার্কুলারের অনুলিপি দেয়া হয় দেশের সকল সেনানিবাসসহ সংশ্লিষ্ট সকল দফতর ও ইউনিটে। আওয়ামীরা ক্ষমতায় আসার পর পর বাংলাদেশ বিমান যাত্রীদের নিকট দিনকাল পাঠ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বিমানের ক্রয় তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেয়। এরপর বিদেশী মিশনগুলোতে দিনকাল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়। সেনানিবাস এলাকায় কোন সংবাদপত্রের প্রবেশ বন্ধ করে দেয়ার এ ধরনের ঘটনা স্বাধীনতার পর প্রথম।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য সংবাদপত্রের কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য পঞ্চম বেতন বোর্ড রোয়েদাদ ঘোষণা করার কথা বলা হয় প্রায়। কিন্তু সরকার বেতন বোর্ড রোয়েদাদ কার্যকর করার জন্য নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু, ন্যায়ভিত্তিক পদক্ষেপ না নিয়ে পক্ষপাতিত্ব করে সরকার সমর্থক সংবাদপত্রগুলোতে বেতন বোর্ড রোয়েদাদ কার্যকর হওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছিল। সরকারি বিজ্ঞাপন প্রদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার এমন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছিল, যাতে করে সরকারের সমালোচনাকারী সংবাদপত্রগুলোতে কোনোভাবেই রোয়েদাদ কার্যকর হতে পারনি।

সত্যের অবাধ প্রকাশে প্রতিহিংসায় উন্মত্ত সরকার সংবাদপত্র দলনের আরেকটি উপায় হিসেবে অডিট ব্যুরো অব সার্কুলেশন (এবিসি) রিপোর্ট ব্যবহার করেছে। সরকারি বিজ্ঞাপনের রেট এবং নিউজপ্রিন্ট কোটা এবিসি রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই সাধারণভাবে নির্ধারিত হয়। জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী সংবাদপত্রগুলোকে বাগে আনতে সরকার আরেকটি উপায় হিসেবে নিউজপ্রিন্ট কোটা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। নোটিশ না দিয়ে স্বাধীন মত পোষণকারী সংবাদপত্রগুলোর নিউজপ্রিন্ট কোটা যুক্তিহীন একতরফাভাবে হ্রাস করা হয়েছে। এবিসি রিপোর্টের মাধ্যমে সংবাদপত্রের সার্কুলেশন কমিয়ে দেখানো হয়েছে। এমনকি বিদ্যুতের লোডশেডিং ঘটিয়ে সংবাদপত্রের স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটায় সরকার।

৩ মে ২০০০ অব্যাহত লোকসান, কাঁচামাল, গেওয়া কাঠের কম সরবরাহ, বিশ্ববাজারে ফার্নেস ওয়েলের দাম বৃদ্ধি, বেতন ভাতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বিদেশী পাম্পের দাম বেড়ে যাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলে উৎপাদিত নিউজপ্রিন্টের মূল্য টন প্রতি প্রায় ৫ হাজার টাকা বাড়ানো হয়। জনপ্রিয় সংবাদপত্রগুলোর আর্থিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়ে সংবাদপত্রের অস্তিত্বের ওপর আঘাত আনার কৌশল হিসেবে এ পদক্ষেপটি নেয়া হয়। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ১৪ মে ২০০০)

সরকারি অনুষ্ঠানগুলোতে ভিন্নমতের সাংবাদিকদের প্রবেশ বন্ধ ছিল। সরকার সমর্থক সাংবাদিক ছাড়া রাষ্ট্রীয় কোন অনুষ্ঠানে খুব কম সাংবাদিকই যোগ দিতে পেরেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিদেশ ভ্রমণে সরকার সমর্থক সাংবাদিকরাই সফর সঙ্গী হয়েছিলেন। রেডিও-টেলিভিশনে সরকার সমর্থক সাংবাদিক ছাড়া অন্যরা কোনো অনুষ্ঠানে অংশ নিতে

www.pathagar.com

পারেননি। রেডিও-টেলিভিশনে প্রধানমন্ত্রী এবং অন্য মন্ত্রীদের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে কেবল পছন্দ মাফিক সাংবাদিকদেরই আমন্ত্রণ জানানো হয়।

দিনের পর দিন ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডার ও চিহ্নিত মহলের সন্ত্রাসীদের দ্বারা হামলা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে রক্তাক্ত জখম হন সাংবাদিকরা। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, উড়ো চিঠি বা টেলিফোনে সাংবাদিকদের গুলি করে হত্যার হুমকি দেয়া হয়। সাংবাদিকরা রাজপথে কাজ করতে পারেনি। হরতাল-মিছিলের রিপোর্ট করার সময় পুলিশ ও আওয়ামীদের হাতে তারা হেনস্থা হয়েছেন। মুজিব-হাসিনা বাদে মধ্যবর্তী সরকারগুলোর আমলে সাংবাদিকরা প্রতিপক্ষের নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পুলিশের সাহায্য পেয়েছেন। কিন্তু আওয়ামী সরকারের আমলে পুলিশ সন্ত্রাসীদের সঙ্গ দিয়ে তাল মিলিয়ে সাংবাদিকের রক্ত ঝড়িয়েছে। সম্মিলিতভাবে সাংবাদিকরা এর প্রতিবাদ জানালে উত্তর পান অশ্লীল গালিগালাজ। পুলিশ প্রকাশ্যে বলেছে, 'সাংবাদিকদের গুলি করার হুকুম রয়েছে।' হাবিবের মাথার আঘাত দ্বারা ফটো সাংবাদিকদের ওপর পুলিশের নিপীড়নের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বিশ্ব সম্প্রদায় দেখেছে। তারপরে জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদপত্রগুলোর সাংবাদিকদের ওপর পুলিশের এ্যাকশন, ক্যামেরা ভাংচুর, ধরে নিয়ে নির্যাতন অব্যাহত গতিতে চলেছে। পেশার খাতিরে দায়িত্ব পালনরত ফটো সাংবাদিকরা হাসিনা সরকারের আমলে যেভাবে নির্যাতিত হন তা যুদ্ধ ক্ষেত্রে কর্তব্যরত ফটো সাংবাদিকরা হন কিনা সন্দেহ আছে।

প্রেস কাউন্সিল শক্তিশালী করার কথা বলে কোনো প্রতিবেদনের ব্যাপারে কাউন্সিল আদালতে অভিযোগ দায়ের না করে মন্ত্রী-এমপিরা ফৌজদারী আদালতের আশ্রয় নিয়েছেন। এতে প্রেস কাউন্সিলের অবমাননা তো হয়েছেই, সঙ্গে সঙ্গে বছর বছর ধরে জট বাধা মামলাগুলো সময়ের অভাবে শুনানী বা বিচারকার্য নির্দিষ্ট দিনে করতে পারেনি। সরকার যদি প্রেস কাউন্সিলের এখতিয়ারের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করতো তাহলে সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনো তথ্যের জন্য প্রেস কাউন্সিলই সন্তোষজনক জবাব দিয়ে বিষয়টি মীমাংসা করার সুযোগ পেত। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া আদালতে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন পড়ত না।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিরোধী জঘন্য জননিরাপত্তা আইন পাস করেছে হাসিনা সরকার। জননিরাপত্তা আইন পাশের পূর্ব থেকেই দেশবাসী ও সাংবাদিক সমাজ এর অপপ্রয়োগ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। জননিরাপত্তা গণধিকৃত হওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী সরকার পাস করেছিল। দেশের সাংবাদিক সমাজ বলেছে, 'জননিরাপত্তা আইন মুক্ত সাংবাদিকতার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।' সাংবাদিক এবং কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টদের আহবায়ক আতাউস সামাদ, জাতীয় প্রেসক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি রিয়াজউদ্দিন আহমদ ও আমানুল্লাহ কবির অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন, 'জননিরাপত্তা আইন সরাসরি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চলে যাবে। যে সব বিষয়ে জননিরাপত্তা আইন করা হয়েছে তা বাংলাদেশের পেনাল কোডে বিদ্যমান। এটা অপ্রয়োজনীয় এবং উদ্দেশ্যমূলক। এই আইনের মাধ্যমে শুধু সাংবাদিকই নয়, পত্রিকার সম্পাদক, মালিক থেকে শুরু করে একজন হকারকেও হয়রানি করা হতে পারে। এই আইন দৃশ্যতঃ সংবাদপত্র অ্যাটাক করবে না মনে হলেও আইনের মারপ্যাঁচে সংবাদপত্র এবং সাংবাদিক মারাত্মকভাবে অ্যাটাক হওয়ার চান্স রয়েছে। কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আইন নয়, আইনের প্রয়োগই গুরুত্বপূর্ণ। জননিরাপত্তা আইন প্রেস মিডিয়ার ওপর কতটা খবরদারি করবে তা নির্ভর করবে সরকারি দলের মেজাজ-মর্জির ওপর।' (সূত্রঃ দৈনিক মানবজমিন ১ ফেব্রুয়ারি ২০০০)

www.pathagar.com

হামলা-মামলার পরও সাংবাদিক নিখোঁজ ও হত্যার ঘটনা কম ঘটেনি। হাসিনার আমলে যে ক'জন সাংবাদিক নিখোঁজ বা হত্যার শিকার হয়েছে তাদের পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা দায়ের হলেও একটিরও অগ্রগতি হয়নি। উপরন্তু অভিযোগ রয়েছে পুলিশ স্থানীয় প্রভাবশালী ক্ষমতাসীন নেতাদের চাপে অনেক মামলার গতি ঘুরিয়ে বিরোধী রাজনৈতিকদের সেগুলোতে জড়িয়েছে। দেশের চারিদিকে ছড়িয়ে যাওয়া বিষাক্ত ত্রাসের কারণে জাতীয় বা স্থানীয় সংবাদপত্রগুলোর সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ছিল না। ১৮ মে ১৯৯৯ দৈনিক মানবজমিনে সংবাদ বেরিয়েছে, 'ঝুঁকি, টেনশনের অপর নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা।'

হাসিনা সরকারের শপথ গ্রহণের কয়েক ঘন্টা পূর্বে সাংবাদিকদের উপর নিষ্ঠুর পুলিশী হামলা চালিয়ে সংবাদপত্র দলনের প্রাথমিক যাত্রা শুরু হয়। সংসদ সচিবালয়ে প্রবেশকে কেন্দ্র করে পুলিশ ফটো সাংবাদিকের ওপর নির্মম নির্যাতন চালায়। ফটো সাংবাদিকরা এমপিদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের ছবি তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি চেয়েছিল। এর ফলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে আহত করে ২০ জন ফটো সাংবাদিককে। সে বছরের ৬ মাসে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ওপর হামলার ৪৪ টি ঘটনা ঘটে। ১৯ জুন সাতক্ষীরা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রদূতের সম্পাদক ও সাতক্ষীরা চেম্বারের সভাপতি স.ম. আলাউদ্দিন হত্যাকান্ডের শিকার হন। নিজ অফিস কক্ষের খুব কাছে থেকে বন্দুকের গুলি চালিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। ঐ হত্যাকান্ড নিয়ে সাতক্ষীরায় প্রচন্ড তোলপাড় হয়েছিল। স্থানীয় পুলিশের ভূমিকার ব্যাপারে অনেক অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার পর আলাউদ্দিন হত্যা মামলা সিআইডির কাছে হস্তান্তর করা হয়। দীর্ঘদিন হয়ে গেলেও সে হত্যার রহস্য সম্পূর্ণ উদঘাটিত হয়নি। আলাউদ্দিন আওয়ামী নেতা ছিলেন। তারপরও তাঁর স্বজনরা সুবিচার পায়নি। নভেম্বর মাসে সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হয়েছেন দৈনিক সাতক্ষীরা চিত্রের সম্পাদক আনিসুর রহীম, জন্মভূমির সাংবাদিক মোজাফফর হোসেন ও পথে প্রান্তরের সম্পাদক খালেকুজ্জামান। কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক দেশব্রতীর প্রকাশনা সরকার এই সময় বন্ধ করে দেয়।

১৯৯৭ সালে হামলার ঘটনা ঘটেছে অনেক। লাঞ্ছিতও হয়েছেন সাংবাদিক। ৬ জানুয়ারি চট্টগ্রামে আওয়ামী স্থানীয় নেতার নেতৃত্বাধীন একটি অপরাধীচক্রের বিরুদ্ধে রিপোর্ট লেখায় একটি সমাবেশ থেকে দৈনিক ভোরের কাগজ চট্টগ্রাম অফিস জ্বালিয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়। ১২ জানুয়ারি খুলনার পিকচার পেলেস মোড়ের কাছে যশোরের দৈনিক লোক সমাজের খুলনা প্রতিনিধি আবু তৈয়ব আওয়ামী কর্মীদের হাতে প্রহৃত হন। ১৬ জানুয়ারি বিবিসির সাংবাদিক আফসানা চৌধুরীর বাড়িতে হামলা করা হয়। তার নোট বই ও রাজনীতিবিদের নেয়া সাক্ষাতকারের টেপ হামলাকারীরা নিয়ে যায়। ২৫ জানুয়ারি দৈনিক জনকন্ঠের হবিগঞ্জ প্রতিনিধি রফিকুল হাসান তুহিন হত্যার হুমকির প্রেক্ষিতে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ২৭ জানুয়ারি দৈনিক সংবাদের চট্টগ্রাম অফিসে হামলা হয়। ৩০ জানুয়ারি দৈনিক মিলাতের বার্তা সম্পাদক মাহবুবুর রহমানের সঙ্গে পুলিশ দুর্ব্যবহার করে। দৈনিক আজাদীর ফটোগ্রাফার তাপস বড়ুয়াকে ফোনে ও চিঠি দিয়ে হত্যার হুমকি দেয়া হয়।

১৫ ফেব্রুয়ারি সীতাকুন্ড প্রেসক্লাবে পুলিশী হামলায় দৈনিক বাংলার এএসএম বুরহান, আজকের কাগজের খোরশেদ হায়াত, ভোরের কাগজের মোহাম্মদ সেলিম, দৈনিক কর্ণফুলীর আবুল হাসনাত ও সাপ্তাহিক আজকের সূর্যোদয়ের এম হেমায়েত আহত হন। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাতে ছাত্রলীগ কর্মীরা ভোরের কাগজের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদদাতা তরুণ সরকারকে লাঞ্ছিত করে। ২১ ফেব্রুয়ারি দৈনিক দেশ জনতার শামীম চন্দর, দৈনিক দিনকালের মুসা ও

www.pathagar.com

ডেইলী দ্যা ইনডিপেন্ডেন্টের বুলবুল আহমেদ খালেদা জিয়ার জনসভার ফটো কভার করার সময় একদল ছাত্রের হাতে আহত হন। মার্চের প্রথম সপ্তাহে দৈনিক ভোরের কাগজের কুষ্টিয়া প্রতিনিধি তরিকুল হক তরিককে লক্ষ্য করে একদল সন্ত্রাসীরা গুলি ছুঁড়ে। অল্পের জন্য তিনি রক্ষা পান।

৫ মার্চ পুলিশের বিশেষ শাখার সদস্যরা সাপ্তাহিক হলিডে সম্পাদক এনায়েতুলাহ খানের বাড়িতে চড়াও হয়। ১৩ মার্চ দৈনিক কর্ণফুলীর রাঙ্গামাটি সংবাদদাতা সৈয়দ মাহবুব আহমদ প্রতিবেদন লেখার জন্য লাঞ্ছিত হন। ১৮ মার্চ তিনজন মন্ত্রীর সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে একটি প্রতিবেদন বিস্তারিতভাবে দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকায় ছাপা হয়। তিন মন্ত্রীর মধ্যে অর্থমন্ত্রীও ছিলেন। প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর অর্থমন্ত্রী বিষয়টি সহজভাবে মেনে না নিয়ে পুলিশ পাঠিয়ে সকল কাগজপত্র জব্দ করে বাংলাবাজার পত্রিকার সম্পাদকসহ সাংবাদিকদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। ২৮ মার্চ দেশ জনতার মোমেনশাহী সংবাদদাতা কাদের তালুকদারকে 'শহরের বিউটি সেলুনে যৌন কেলেংকারী সংক্রান্ত' রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পর পুলিশ গ্রেফতার করে। ২১ মে জনকণ্ঠের সংবাদদাতা হরে রাম দাসকে বালিকা ধর্ষণের সংবাদ প্রকাশের দায়ে গ্রেফতার করা হয়।

এপ্রিলের প্রথম দিকে আওয়ামী ঘরানার বুদ্ধিজীবী সুফিয়া কামাল, শওকত ওসমান, কবীর চৌধুরী ও শামসুর রাহমান সরকারের ইঙ্গিতে এক উদ্ভট বিবৃতিতে দেশবাসীকে দৈনিক ইনকিলাব বর্জনের আবেদন জানান। অপরদিকে সরকার দৈনিক বাংলার সম্পাদক আহমেদ হুমায়ূনকে স্বপদ থেকে সরিয়ে মিরপুর থানা আওয়ামী লীগ নেতা গোলামুর রহমানকে সম্পাদক করে। দৈনিক বাংলার সহকারী সম্পাদক ড. রেজোয়ান সিদ্দীকীকে অন্য পত্রিকায় লেখার অভিযোগ এনে সাসপেন্ড করা হয়। জুন মাসে সন্ত্রাসীদের হামলায় গুরুতর আহত হন ভোরের কাগজের মাগুড়া প্রতিনিধি কবীর হোসেন হৃদয়। ৪ জুলাই জনকণ্ঠের নড়াইল প্রতিনিধি রিফাত বিন তুহা সন্ত্রাসীদের হামলায় আহত হন।

১৮ জুলাই রাত সাড়ে ৮ টায় থানার সাচার বাজার থেকে ঢাকায় আসার পথে বিপুল সংখ্যক লোকের সামনে সাচার ইউনিয়ন আওয়ামী সভাপতি কলিমুল্লাহর নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা দিনকালের কচুয়া সংবাদদাতা খোরশেদ আলমকে অপহরণ করে বাজারের পার্শ্ববর্তী পুলিশ ফাঁড়ির সামনে নিয়ে যায়। সেখানে পুলিশের একজন সাব-ইন্সপেক্টরের সামনে আওয়ামী কর্মী তিমির সেন, অনিল সাহা, বটুকৃষ্ণ বসু, মধু ঘোসাইসহ ১০/১২ জন সন্ত্রাসী তার ওপর আক্রমণ করে। তারা খোরশেদের বুকে পিস্তল ঠেকায়। অন্যরা হকিস্টিক এবং লোহার রড দিয়ে পেটাতে থাকে। সন্ত্রাসীরা তার হাতে ছুরিকাঘাত করে। ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করে থেতলে দেয়।

৬ আগষ্ট ঢাকা মহানগরী পুলিশের ধানমন্ডি ট্রাফিক জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার গোলাম কিবরিয়া দৈনিক জনতার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সাইফুল বারীকে এক চিঠিতে ১০ মে জনতায় প্রকাশিত শামসুস সালেহীনের একটি রিপোর্টের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন বলে জানান। ১৩ আগষ্ট সকাল ১০ টায় শামসুস সালেহীনকে ট্রাফিক কার্যালয়ে হাজির করার কথা চিঠিতে উল্লেখ থাকলেও এখানে হাস্যকর বিষয় যে, ১০ মে জনতায় শামসুস সালেহীনের লেখা কোনো রিপোর্ট নেই। ২৪ আগস্ট বিএনপির ডাকে তেলের মূল্য বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবী নিয়ে হরতাল পালনের সময় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিএনপির নেতা-কর্মীদের মিছিলে পুলিশ উস্কানিমূলক হামলা চালালে তার ছবি তোলার চেষ্টা করেন দৈনিক বাংলার ফটো সাংবাদিক

www.pathagar.com

হাবিবুর রহমান হাবিব। এ সময় পুলিশ টিয়ার গ্যাসের সেল প্রেসক্লাবের সামনে মিছিলে নিক্ষেপ করলে সেলের আঘাতে হাবিব মারাত্মক জখমপ্রাপ্ত হয়ে আহত হন।

১০ সেপ্টেম্বর ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন গাজীর মিরপুরস্থ ২৭ নম্বর সাংবাদিক হাউজিং প্রকল্প বাস ভবনে একদল সাদা পোষাকধারী পুলিশ হামলা করে। গভীর রাতে পুলিশ গাজীর অনুপস্থিতিতে বাড়িতে প্রবেশ করে কোনো সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়াই তারা বাড়ি তলাশী করে। দৈনিক সংগ্রামের বিশেষ প্রতিনিধি গাজীর ছোট ভাইকে তারা প্রহার করতে উদ্যত হয় এবং বাসার মালামাল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলে। বাড়ির ফ্লোরে বসবাসকারী ভাড়াটে পরিবারগুলোও পুলিশী হয়রানির শিকার হয়। বাড়ির লোকজনকে পুলিশ ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে। তারা গাজীর নাম উল্লেখ করেও হুমকি দেয়। বাড়ি তলাশীর পর কোনো কিছু না পেয়েও তারা জানিয়ে যায়, 'আবারো অভিযান চলবে।' তল্লাশী অভিযান চালানোর মতো সার্চ ওয়ারেন্ট চাওয়া হলে পুলিশ দল পাল্টা ধমক দেয়। বাসা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে তাদের আগমন, তল্লাশী চালানো বা কোনো কিছু না পাওয়ার বিষয়টি লিখে যেতে বললে তারা বাড়ির লোকজনকে প্রহার করতে তেড়ে যায়।

১১ সেপ্টেম্বর সরকার নিয়ন্ত্রিত ট্রাষ্ট পত্রিকা সাপ্তাহিক বিচিত্রার সহকারী সম্পাদক পদ থেকে আকস্মিকভাবে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের নির্বাহী কমিটির সদস্য আব্দুল হাই সিকদারকে চাকরিচ্যুত করা হয়। আব্দুল হাই সিকদার সকালে তার অফিসে পৌঁছা মাত্র একজন পিয়ন তার হাতে টার্মিনেশন লেটার ধরিয়ে দেয়। ২৪ অক্টোবর সাংবাদিক নাসিমা সুলতানা টুকু প্রতিদিনের মতো রাত ৯ টায় পেশাগত দায়িত্ব পালন শেষে বগুড়া শহরে জনাকীর্ণ প্রাণকেন্দ্র সাতমাথার সুতারপুরস্থ বাড়িতে ফেরার পথে একটি মোটর সাইকেলে ৩ যুবক তার রিকশাটি ফলো করতে থাকে। সাতমাথা পার হয়ে রিকশাটি পার্করোডে যাওয়ার পরপরই মোটর সাইকেলটি রিকশার পথ রোধ করে। মোটর সাইকেলে আরোহীদের মধ্যে ২ জন রিকশায় উঠে চাকু ধরে রিকশাটিকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। আকস্মিক এই ঘটনায় সাংবাদিক নাসিমা হতভম্ব হয়ে চিৎকারের চেষ্টা করা মাত্র এক সন্ত্রাসী তার গলা টিপে ধরে। এভাবে কিছুদূর যাওয়ার পর নাসিমা সন্ত্রাসী ও রিকশাওয়ালাকে কিলঘুষি দিতে থাকেন। এর ফলে সন্ত্রাসীদের হাত আলগা হয়ে যায়। এরপর চিৎকার করে নাসিমা পথচারীদের ডাকতে থাকলে সন্ত্রাসীরা মোটর সাইকেলে পালিয়ে যায়।

১ নভেম্বর সাংবাদিক, প্রেস শ্রমিক, কর্মচারীদের আইনানুগ পাওনা পরিশোধের কোনো ব্যবস্থা না করে সরকার ট্রাষ্টিভুক্ত দৈনিক বাংলা, দৈনিক টাইমস, সাপ্তাহিক বিচিত্রা ও আনন্দ বিচিত্রা বন্ধ করে দেয়। শুধু তাই নয়, বর্বরোচিত পন্থায় পুলিশের মাধ্যমে গলা ধাক্কা দিয়ে রাতের অন্ধকারে সাংবাদিক, প্রেস শ্রমিক, কর্মচারীদের তাদের কর্মস্থল থেকে বের করে অফিসে তালা ঝুলানো হয়।

৬ নভেম্বর রাত সাড়ে ১২ টায় কয়েকজন সন্ত্রাসী প্রবীণ সাংবাদিক প্রফুল্ল কুমার ভক্তকে তার কর্মস্থল সংবাদ অফিসে গিয়ে খোঁজ করে। সেখানে না পেয়ে ঐ দিন রাতেই সন্ত্রাসীরা তার ৯ চামেলীবাগস্থ বাসভবনে হামলা চালায়। হামলায় ভক্ত অক্ষত রক্ষা পান। পরে সন্ত্রাসী ৮ ডিসেম্বর বিকেলে আবার তার বাসভবনে দ্বিতীয় দফা হামলা চালায়। ঐ সময় স্থানীয় জনগণ তাদের ধাওয়া করলে সন্ত্রাসীরা গাড়ী ফেলে পালিয়ে যায়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর থেকে প্রকাশিত দৈনিক প্রতিবেদনের ডিক্লারেশন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একেএম ওয়াহেদুল ইসলাম বাতিল করে দেন। পুলিশ পত্রিকার সম্পাদককে মিথ্যা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে ডিক্লারেশন বাতিলের পূর্বেই ১২ নভেম্বর গ্রেফতার করে।

www.pathagar.com

টাইমস-বাংলা ট্রাস্টের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া নিয়ে প্রবীণ সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ নির্মল সেন পাঁচদিন অনশন করার পর ১৮ নভেম্বর প্রেসিডেন্টের অনুরোধে অনশন ভঙ্গ করেন। নির্মল সেনের সাথে যারা অনশন প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে গিয়েছিলেন তারাও তার অনুরোধে অনশন ভঙ্গ করেন। প্রেসিডেন্ট নির্মল সেন ও অন্যদের দাবী সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনার ঘোষণা দিলে অনশন ভঙ্গ করা হয়। এ থেকে প্রমাণিত হয়, তাদের অনশন কর্মসূচি অযৌক্তিক ছিল না। অথচ তথ্য মন্ত্রণালয় সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দাবীকে অযৌক্তিক বলেছে। ১৯৯৭ সালের শেষের দিকে ঢাকার রাস্তায় সাংবাদিকরা সরকারের বিরুদ্ধে মিছিল করায় সরকার সেই রাতে সাংবাদিক নেতাদের বাড়িতে পুলিশ দিয়ে হানা দিয়েছিল। ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের এবং বিএফইউজের দু'জন নেতার পেছনে গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন লেগেছিলেন।

১৯৯৮ সালে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর চরম আঘাত এসেছে। ৯ জানুয়ারি ঢাকা মহানগরীতে গোয়েন্দা পুলিশ সাপ্তাহিক অপরাধ জগতের সম্পাদক কাজী শামসুল হককে গ্রেফতার করে। ১৫ ফেব্রুয়ারি চাঁদপুর পৌরসভার টেন্ডার বাক্স লুটের ওপর খবর পরিবেশন করায় ২৭ ফেব্রুয়ারি চাঁদপুর প্রেসক্লাবে ঢুকে হামলা করা হয় দৈনিক সংবাদের চাঁদপুর প্রতিনিধি ও সাপ্তাহিক রূপসী চাঁদপুরের সহকারী সম্পাদক শাহ মোহাম্মদ মাকসুদের ওপর। ছাত্রলীগের জাফর ইকবাল মুন্নী নামের এক নেতার নেতৃত্বে রাত সোয়া ৯ টায় জেলা ছাত্রলীগের আহবায়ক কমিটির আশীর্বাদপুষ্ট কতিপয় ছাত্রলীগ কর্মী প্রেসক্লাবের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে হামলা চালায়। প্রাণ বাঁচাতে তিনি দৌড়ে রেডক্রিসেন্ট অফিসে আশ্রয় নিলে সেখানে হামলাকারীরা ঢুকে হামলা চালায়। সেখান থেকে দৌড়ে রাস্তায় গিয়েও রক্ষা পাননি তিনি। সন্ত্রাসীরা মাটিতে শুইয়ে তাকে মারধর করে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চাঁদপুর সদর থানায় চারজনের নাম উল্লেখ করে ২৮ ফেব্রুয়ারি মামলা করলেও পুলিশ আসামীদের গ্রেফতার করেনি। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী সুদৃষ্টি কামনা করে বার বার চিঠি দিয়েও লাভ হয়নি মকসুদের।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক দেশ পত্রিকার ২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রখ্যাত গবেষক বদরুদ্দীন ওমর 'ভাষা আন্দোলনের যথার্থ শহীদ কে বা কারা? সেদিন তাঁদের ভূমিকা- বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস অন্যতম'-শীর্ষক লেখাটি লিখেছিলেন। এ লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর আওয়ামী সরকার দেশ পত্রিকার সংখ্যা বাংলাদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। এমনকি লেখাটি বাদ দিয়ে দেশ পত্রিকার বিশেষ বাংলাদেশ সংস্করণ প্রকাশ করায়। শুধু তাই নয়, দলীয় বুদ্ধি বিক্রেতাদের দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে অপপ্রচার শুরু করে।

৭ মার্চ উপলক্ষ্যে বিকেলে পল্টন ময়দানে প্রধানমন্ত্রীর এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরু থেকেই সাংবাদিকরা বিড়ম্বনার শিকার হন। নিরাপত্তা কর্মীরা মঞ্চের ডান দিকে সংরক্ষিত আসনে সাংবাদিকদের প্রবেশ করার সময় দেহ বেশ গুরুত্বসহকালে তল্লাশী করে। অনেক সাংবাদিকের কাছে তারা এ্যাক্রেডিটেনশন কার্ড দাবী করে। কয়েকজন সাংবাদিকের কাছে মোবাইল টেলিফোন থাকায় তাদের মঞ্চের কাছে পৌঁছতে দেয়া হয়নি। যে সকল সাংবাদিকের কাছে মিনি টেপ রেকর্ডার ছিল তারাও ঢুকতে পারেনি সংরক্ষিত জায়গায়। ফটো সাংবাদিকদের ওপর ছবি না তোলার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়ে পরে তা প্রত্যাহার হলেও নিরাপত্তা কর্মীদের ইচ্ছানুসারে পর্যায়ক্রমে মঞ্চে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ছবি তুলতে হয়। (সূত্রঃ সাপ্তাহিক অগ্রযাত্রা ১৯ মার্চ ১৯৯৮)

www.pathagar.com

৮ মার্চ বাংলাদেশ টেলিভিশনের পরিপ্রেক্ষিত-এর উপস্থাপক ও পরিচালক সৈয়দ বোরহান কবীরের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী সাপ্তাহিক এভিডেন্স পত্রিকা অফিসে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। ১৩ মার্চ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা উপলক্ষে শেরেবাংলা নগরস্থ মেলার একটি কক্ষে অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া, বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল ও শিক্ষামন্ত্রী সাদেক এক প্রেস ব্রিফিংয়ের আয়োজন করেন। রফতানী উন্নয়ন ব্যুরো থেকে এ ব্যাপারে পত্রিকা ও সংবাদ সংস্থা অফিসে চিঠি পাঠানো হয়। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় জাতীয় প্রেস ক্লাব থেকে সাংবাদিকদের মাইক্রোবাসে করে মেলায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু প্রেস ব্রিফিংয়ের নির্ধারিত সময় অতিক্রম করে দীর্ঘ এক ঘন্টা পার হলেও অর্থমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর আগমন ঘটেনি। তবে প্রেস ব্রিফিংয়ের পাশের ঘরে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল এবং আওয়ামী প্রেসিডিয়াম সদস্য আমুকে আড্ডা দিতে দেখা যায়। এতে সাংবাদিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কারণ মেলা কক্ষে আয়োজকরা মন্ত্রীদের নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। কেউ সাংবাদিকদের খোঁজ-খবর নেননি। আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে গিয়ে এ ধরনের আচরণে অনেকেই প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পরে সবাই মিলে ঘোষণা দিয়ে প্রেস ব্রিফিং বয়কট করে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। তখন হুশ হয় আয়োজকদের।

১৮ মার্চ সাপ্তাহিক সুগন্ধা কাগজের প্রধান সম্পাদক আলম রায়হানকে অফিসে কর্মরত অবস্থায় ডিবি পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় কর্তব্যরত পুলিশ কোনো কারণ জানাতে অপারগতা প্রকাশ করে। পরে ডিবি অফিসে যোগাযোগ করা হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গ্রেফতার প্রসঙ্গে কোনো তথ্য দিতে ব্যর্থ হন। ডিবি তাকে মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করে। কোনো সাংবাদিকের সাথে এমনকি আত্মীয়-স্বজনের সাথেও সাক্ষাৎ করতে দেয়নি। একদিন পর পুলিশের জনসংযোগ বিভাগ থেকে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গ্রেফতারের কারণ প্রচার করা হয়। পরবর্তীতে এর সপক্ষে পুলিশ কোনো প্রমাণাদি দেখাতে পারেনি। গ্রেফতারের সময় ৭/৮ জন সাদা পোশাকধারী ব্যক্তি এসে আলম রায়হানের রুমে সরাসরি প্রবেশ করে। মিনিট দশেক অবস্থান করে অফিসে কর্তব্যরত অন্যান্য সাংবাদিকের সাথে কোনো প্রকার কথা বলতে না দিয়ে তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যায়। ১৯ মার্চ সকাল ১২ টার সময় দ্বিতীয়বার ৫/৬ জন সাদা পোষাকধারী ডিবি পুলিশ আবারো সুগন্ধা কাগজ কার্যালয়ে কর্তব্যরত অফিস সহকারীর নিকট থেকে অনেকটা জোর পূর্বক পূর্বে প্রকাশিত কয়েকটি সংখ্যার একাধিক কপি নিয়ে যায়। পুলিশ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সুগন্ধা কাগজে প্রকাশিত প্রতিবেদনে সর্বসাধারণসহ বহির্বিশ্বে সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার কারণ ব্যাখ্যা করে।

৩০ মার্চ নিউইয়র্ক ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা 'কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট' (সিপিজে) সাংবাদিক নির্যাতন, গ্রেফতার, ভীতি প্রদর্শন ও লাগাতার হয়রানির ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে। সিপিজের নির্বাহী পরিচালক উইলিয়াম এ ওরম জুনিয়রের স্বাক্ষরে লেখা চিঠিতে কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ ও পরোয়ানা ছাড়া আলম রায়হানকে গ্রেফতার ও নির্যাতনের ঘটনায় আশংকা প্রকাশ করা হয়। চিঠিতে সিপিজে জানায়, সুগন্ধা কাগজে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের দুর্নীতি উদঘাটিত হয়, এমন নাজুক প্রতিবেদন প্রকাশের কারণেই রায়হানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সিপিজের চিঠিতে বার্তা সংস্থা মিডিয়া সিন্ডিকেটের উপদেষ্টা সম্পাদক মোজাম্মেল হক ও সম্পাদক শওকত মাহমুদকে দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে ডেকে নিয়ে কয়েক ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদের নামে ভীতি প্রদর্শন ও হয়রানির ঘটনা উল্লেখ করা হয়। সিপিজে এই মর্মে আশংকা প্রকাশ করে যে, সরকারের স্বচ্ছতার অভাব, সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিধি-

www.pathagar.com

নিষেধ ও বাংলাদেশের মানবাধিকার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে সরকারের সাফাই প্রচেষ্টা নিয়ে মিডিয়া সিন্ডিকেটের সমালোচনার কারণেই সম্ভবত এই ব্যবস্থাগুলো নেয়া হয়েছে। আলম রায়হান, মোজাম্মেল হক ও শওকত মাহমুদের বিরুদ্ধে গৃহীত এসব পদক্ষেপের পাশাপাশি সাপ্তাহিক বেনাপোল বার্তার সম্পাদক-প্রকাশক জামাল হোসেন, নির্বাহী সম্পাদক বকুল মাহবুব ও রিপোর্টার মোহাম্মদ আলীকে মানহানিকর রিপোর্ট প্রকাশের দায়ে এক বছরের কারাদন্ড দেয়ার কথা সিপিজের পত্রে উল্লেখ করা হয়।

১২ এপ্রিল মোমেনশাহী থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক আল মিনারের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদ হোসেনের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের করা হয়। অপরদিকে পত্রিকার বার্তা ও বাণিজ্য বিভাগে দুস্কৃতিকারীরা হামলা চালিয়ে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। ২০ এপ্রিল দৈনিক মুক্তকণ্ঠ 'প্রশ্নপত্র ফাঁস, ঘরে ঘরে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা'-শীর্ষক প্রতিবেদন ছাপালে সরকার মুক্তকণ্ঠের প্রকাশক ইকবাল আহমেদ ও প্রতিবেদক ইয়াসিন হীরার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। একই অভিযোগে চট্টগ্রামের দৈনিক কর্ণফুলীর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও প্রকাশক আফসার আহমেদ চৌধুরী, বার্তা সম্পাদক মামুনুর রশীদ, কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত কুমিল্লা বার্তার সম্পাদক প্রফেসর একেএম মফিজুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। ১০ মে দৈনিক লোক সমাজের প্রকাশক তরিকুল ইসলামকে জেলা প্রশাসক একটি লেখা ছাপানোকে কেন্দ্র করে 'কেন লোক সমাজ পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করা হবে না'-নোটিশ প্রাপ্তির তিনদিনের মধ্যে জবাব দিতে বলেন। ৩ জুন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা পুনর্বাসন সোসাইটি নামক আওয়ামী সমর্থিত সংগঠন 'জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু' শ্লোগান দিয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবে হামলা চালায়। এ সংগঠনটি প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে সাংবাদিক সম্মেলন করার জন্য ৩ মে বুকিং নেয়। বুকিং দেয়ার পর তাদেরকে ক্লাবের নিয়ম-কানুন বলে দেয়া হয়। ক্লাবের নিয়ম অনুযায়ী সাংবাদিক সম্মেলনে তাদের ৬ জন প্রতিনিধি আসার কথা। কিন্তু তারা চার-পাঁচশ লোককে এক সঙ্গে এনে ক্লাবে ঢুকে পড়ে। এ সময় ক্লাবের নিরাপত্তা কর্মী ও দারোয়ান তাদেরকে বাধা দিলে তারা উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং ক্লাব কর্মচারীদের কিল-ঘুষি মারতে থাকে। ফলে প্রেসক্লাবের কর্মচারী সিরাজ, রহমান, সোহেল, করিম, রফিক ও সামাদ আহত হয়। ক্লাবে অবস্থানরত সাংবাদিকরা তাদেরকে বুঝাতে চাইলেও তারা হৈ চৈ শুরু করে দেয় এবং এটি বিএনপির ক্লাব বলে চিৎকার করতে থাকে এবং এক ঘন্টাব্যাপী তান্ডব চালায়।

২ জুন মৌলভীবাজারের রাজনগরে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা ৪ টি দৈনিকের ৪ জন স্থানীয় প্রতিনিধিসহ ৫ জন সাংবাদিককে লাঞ্ছিত করে। ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা একটি বাস ছিনতাই কালে সংবাদ সংগ্রহের সময় তাদের নির্মমভাবে প্রহার করে। ১২ জুন বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা চলাকালীন রাত ৮ টার দিকে লোডশেডিং হয়েছিল। এ সময় থানা ভবনের সামনে অবস্থিত স্থানীয় প্রভাবশালী সংবাদপত্র পাক্ষিক দিন বদলের কাগজ-এর অফিসে জেনারেটরের সাহায্যে টিভিতে অন্যান্যের সাথে খেলা দেখছিলেন ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সোনালী বার্তার জেলা প্রতিনিধি ও দিন বদলের কাগজের জেলা প্রতিনিধি বজলুর রহমান। এ সময় জনৈক ব্যক্তি এসে বজলুর রহমানকে ডেকে নিয়ে যায়। ঐ দিন তিনি ফিরে না আসায় সম্ভাব্য স্থানগুলোতে খোঁজ করা হয়। বহু খোঁজাখুঁজির পর সাংবাদিক ঐক্যের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়। ১৮ জুন বজলুর রহমানের বাবা মুজিবুর রহমান বাদী হয়ে সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। কিন্তু বজলুর রহমানকে খুঁজে পায়নি

www.pathagar.com

পুলিশ। ১৪ জুন দিনাজপুরের সাপ্তাহিক ফলোআপের প্রকাশনা ও বিতরণ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়।

২৫ জুলাই গাজীপুর প্রেসক্লাবে প্রবেশ করে সন্ত্রাসীরা তাদের বিরুদ্ধে খবর প্রকাশের জন্য সাংবাদিকদের হুমকি প্রদান করে। ৫ আগষ্ট মুক্তকণ্ঠের সাংবাদিক দীপক চৌধুরী দুপুর দু'টায় সচিবালয়ে পাঁচ নম্বর গেট দিয়ে ঢুকছিলেন। গেটে কর্তব্যরত পুলিশ কনস্টেবল এ সময়ে তার পরিচয় জানতে চায়। সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে আইডি কার্ড দেখাতে বলে। দীপক চৌধুরী তার পরিচয়পত্র বের করে কনস্টেবল হাফিজের হাতে দেন। উল্টে-পাল্টে দেখে হাফিজ বলে, 'এই কার্ড থাকলেই ভেতরে ঢুকা যায় না।' উত্তরে দীপক চৌধুরী একটু মনক্ষুণ্ন হয়ে বলেন, 'সাংবাদিকরা সচিবালয়ে ঢুকতে বাধা পান অথচ দশ টাকার একটা নোট পুলিশের হাতে গুজে দিয়ে শয়ে শয়ে সুপারিশকারী, তদবিরবাজ, চিহ্নিত অপরাধী নির্বিঘ্নে সচিবালয়ে ঢুকে গেলেও পুলিশের মাথা ব্যথা থাকে না।' এতেই কনস্টেবল হাফিজ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে আইডি কার্ড ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং দীপককে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। হাফিজ এমনও বলতে থাকে যে, 'এই সাংবাদিক শালাদের জন্য তারা শান্তিতে থাকতে পারে না।' এভাবে নানারকম মুখভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গি করে হাফিজ ও আরো ২/৩ জন পুলিশ একযোগে দীপককে ধাক্কা দিতে দিতে বেশ দূরে নিয়ে যান। সেখানে উপস্থিত লোকজন পুলিশের এই বেআইনী কাজ ও মাস্তানীর ভাব দেখে বিস্মিত হন। অনেকেই এগিয়ে গিয়ে পুলিশের এরূপ ঘাড়বাঁকা আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানান। কিন্তু পুলিশ সদস্যরা সংযত হওয়া দূরে থাক, তারা আশপাশের লোকজনের প্রতিও তীব্র আপত্তিকর বাক্য প্রয়োগ করতে থাকে।

৩০ আগষ্ট যশোরের দৈনিক রানার সম্পাদক সাইফুর আলম মুকুল রাত সোয়া দশটায় রিকশাযোগে বাড়ি ফেরার পথে বেজপাড়ায় ওঁৎ পেতে থাকা সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন। সন্ত্রাসীরা মুকুলের হত্যাকান্ড সংগঠিত করে বীরদর্পে স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। দৈনিক রানারে ইতিপূর্বে ধারাবাহিকভাবে সমাজের অন্যায়, অবিচার, সন্ত্রাস ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় সন্ত্রাসীরা তাঁকে পথের কাঁটা হিসেবে চিহ্নিত করে বহুবার হত্যার হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু মুকুল তার আদর্শ থেকে বিচ্যুৎ হননি। তার পত্রিকার বিরুদ্ধে স্থানীয় একটি মহল সব সময় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। এর প্রতিবাদে তিনি পত্রিকার হেড পিস নিচে নামিয়ে একটি বিশেষ কবিতা ছাপিয়ে ১৫ জুন পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশের তারিখ ছিল ১ সেপ্টেম্বর। কিন্তু তার আগেই তিনি সন্ত্রাসীদের নির্মম শিকারে পরিণত হন।

৪ সেপ্টেম্বর মানবজমিনের 'আজিজ বনাম আগা ইউসুফের ব্যবসায়িক দ্বন্দ্ব, ব্যবহৃত হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর দফতর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আগা ইউসুফের হাতের মুঠোয়' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশের কারণে পত্রিকাটির বিরুদ্ধে ১ শ' কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ মামলা দায়ের করা হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর দিনকালের প্রথম পাতায় প্রকাশিত একটি ছবির প্রতিবাদ জানায় সরকার। তথ্য অধিদফতর থেকে সিনিয়র তথ্য অফিসার মোঃ আব্দুল মান্নানের স্বাক্ষরে পাঠানো প্রতিবাদে বলা হয়, 'নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা গ্যারেজের সামনে ক্ষুধার্ত অবস্থায় জামিলা বেগম খাদ্য সংগ্রহ করছে কুকুরের সাথে পরিচিতি দিয়ে প্রকাশিত ছবিটি ভুয়া ও বানোয়াট। এর সাথে বাস্তবতার আদৌ কোনো মিল নেই। নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা গ্যারেজের সামনের রাস্তা ও ফুটপাত গতকাল পর্যন্ত বন্যার পানিতে নিমজ্জিত ছিল। সুতরাং সেখানে এ ধরনের ছবি ধারণ আদৌ সম্ভব নয়।' অথচ ৮ সেপ্টেম্বর ছবিটি যখন চিত্র সাংবাদিক তোলেন, তখন নারায়ণগঞ্জের বহু নাগরিক তা

www.pathagar.com

দেখেছেন। ছবিটির ক্যাপশন ছিল, 'স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে মানুষকে। নিশ্চিহ্ন করেছে মাথা গোঁজার শেষ সম্বলটুকু এবং গুঁড়িয়ে ফেলেছে আশা-আকাঙ্ক্ষার সকল বাসনা। ছবিতে ৮০ বছরের এই বৃদ্ধা এ বয়সে বানের উপেক্ষা করে দু'মুঠো খাবার সংগ্রহে কোনো আশ্রয় কেন্দ্র অথবা সরকারি ত্রাণ বিতরণে যেতে না পেরে অবশেষে ক্ষুধার জ্বালায় নিতাইগঞ্জ প্রবেশমুখের ডাস্টবিন থেকে খাবার তুলছে।'

১৩ সেপ্টেম্বর কক্সবাজার থেকে প্রকাশিত দৈনিক সৈকতের সম্পাদক মাহবুবুর রহমানকে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা আহত করে। সৈকতে একটি খবর প্রকাশের প্রেক্ষিতে ১০ সেপ্টেম্বর কক্সবাজার ছাত্রলীগের সভাপতির নেতৃত্বে ৬ জনের একটি সন্ত্রাসী দল পত্রিকাটির অফিসে ঢুকে সম্পাদক ও সাংবাদিকদের হুমকি প্রদর্শন করে। ঘটনা সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টকে জানানো হলেও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অবশেষে ১৩ সেপ্টেম্বর দুপুরে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা শহরের প্রধান রাস্তায় জনসমক্ষেই মাহবুবুর রহমানকে আক্রমণ করে মারাত্মকভাবে আহত করে।

১৪ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম নিয়াজ স্টেডিয়ামে পুলিশের অমানবিক ও বর্বরতম হামলায় আহত হন সাংবাদিকসহ শ' শ' দর্শক। আবাহনী-মোহামেডানের খেলাকে কেন্দ্র করে পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে চিত্র সাংবাদিকদের প্রহার করে আহত করে। গুরুতর আহত হন চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদীর ফটোগ্রাফার সুভাষ, ডেইলী লাইফের দিদারুল আলম, পূর্বকোণের মঞ্জুরুল আলম মঞ্জু এবং দৈনিক আবাসের প্রদীপ শীল। ঘটনাস্থলে পুলিশ সাংবাদিকদের গালিগালাজ করে। পুলিশের বেপরোয়া নির্যাতনের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম সংবাদপত্র পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে চট্টগ্রামের সকল দৈনিকে প্রথম পাতায় ৪ ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা খালি রাখা শুরু ও ঐদিন সকল দৈনিকে অভিন্ন সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হয়। নওগাঁ জেলার বিডিআরের সদস্যরা তিন কেজি গরুর গোশত কিনে টাকা না দেওয়ার প্রতিবাদ করার কারণে স্থানীয় দৈনিক সোনার বাংলা পত্রিকার সাংবাদিক মোস্তাফিজুর রহমান বদুলকে বিডিআর ক্যাম্পে এনে নির্যাতন করা হয়। এ কারণে বিডিআরের ৪ সদস্যকে ২৮ সেপ্টেম্বর ক্লোজ করা হয়।

২৮ সেপ্টেম্বর তথাকথিত জেল হত্যা মামলার বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য কে এম ওবায়দুর রহমান, জাতীয় পার্টির নেতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং বিএনপির নেতা নুরুল ইসলাম মঞ্জুরকে গ্রেফতারের পর ২৯ সেপ্টেম্বর সিআইডির এএসপি কাহার আকন্দের নির্দেশে একদল দাঙ্গা পুলিশ বিকালে মালিবাগস্থ সিআইডির সদর দফতরের মূল গেটে সাংবাদিক ও ফটো সাংবাদিকদের ওপর বর্বর হামলা চালিয়ে দু'জন সাংবাদিককে আহত করে। সাংবাদিকদের ওপর পুলিশের এ বর্বর হামলার ঘটনা অসংখ্য লোক প্রত্যক্ষ করে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবাদ জানালে পুলিশ আরো মারমুখী হয়ে ওঠে। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮)

১৪ অক্টোবর সাপ্তাহিক ইকোনমির অফিসে হামলা হয়। ঐদিনই ঢাকা সংবাদপত্র হকার্স ইউনিয়ন ও ঢাকা বহুমুখী সমবায় সমিতি সাংবাদিক সম্মেলনে জানায়, ৭/৮ দিন যাবত পুলিশ সংবাদপত্র বিক্রিতে বাধা দিয়ে আসছে। অনেক সময় হকারদের থানায় নিয়ে নির্যাতন করা হয়। উইলস ইন্টারন্যাশনাল কাপের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে ক্রীড়া সাংবাদিকদের হয়রানি করা হয়। প্রতিযোগিতায় অনিয়মের খবর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় পত্রিকাগুলোকে অ্যাক্রিডেটেশন কার্ড না দেয়ার হুমকিও দেয়া হয়। এমনকি কোনো কোনো পত্রিকায় কার্ড সংখ্যা কমিয়ে দেয়া হয়। ২৩ অক্টোবর প্রেস ব্রিফিংয়ের এক পর্যায়ে ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি

www.pathagar.com

সাবের হোসেন চৌধুরী বাংলাবাজার পত্রিকার সাংবাদিককে বের করে দেয়ার হুমকি দেন। তিনি এক পর্যায়ে বলেন, 'আই থিংক দি পিপল গুড জাস্ট বি থ্রোন আউট।' এর আগে বিসিবি সভাপতি ক্রীড়া ম্যাগাজিন ক্রীড়ালোকের ক্রীড়া সাংবাদিকদের অনিয়মের কথা লেখার জন্য মাফ না চাওয়া পর্যন্ত কার্ড দেয়া হবে না বলে জানান। অতীতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সময় স্থানীয় সাংবাদিকদের তথ্য সরবরাহের গড়িমসি এবং প্রেস কার্ড প্রদানে হয়রানি করা হয়। এ সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য অনেক আগে বিসিবিকে অনুরোধ জানানো হলেও বিসিবি কর্মকর্তারা কোনো কর্ণপাত করেননি। বিসিবির প্রিন্ট মিডিয়া সাব কমিটি কার্ড প্রদানে গড়িমসি করে। প্রতিযোগিতার আয়োজক বাংলাদেশ হলেও দেশের সকল পেশাদার ক্রীড়া সাংবাদিককে কার্ড দিতে আপত্তি জানায়।

জোর করে টাইমস-দৈনিক বাংলা গ্রুপের সকল পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েও সরকার শান্তি পায়নি। ঐ গ্রুপের বিচিত্রা ছিল লাভজনক ও জনপ্রিয় সাপ্তাহিক। গ্রুপের পত্রিকা বন্ধ হওয়ার পর বিচিত্রা কিনে নেওয়ার জন্য বহু আগ্রহী প্রকাশক গ্রুপও ছিল। তাদের বিমুখ করে বিচিত্রাকে পরিবারের তত্ত্বাবধানে এনে শেখ রেহানাকে সম্পাদক পদে বসিয়ে দেয়া হয়। অনভিজ্ঞ শেখ রেহানা ২২ অক্টোবর থেকে মাত্রাতিরিক্ত সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে বিচিত্রার প্রকাশনা অব্যাহত রেখেছেন।

৭ নভেম্বর পল্টন ময়দানে বিএনপির সমাবেশে পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের হামলার পর দৈনিক মানব জমিনের ফটো সাংবাদিক বোরহানউদ্দিনের গাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এ দিন ইত্তেফাক, ইনকিলাব, বাংলার বাণী অফিসে হামলা চালানো হয়। এতে ১ জন আহত হয়। ৯ নভেম্বর হরতাল চলাকালে মালিবাগে দুপুর বেলা আওয়ামী সন্ত্রাসীরা দৈনিক সংগ্রামের সাংবাদিক মুজতাহিদ ফারুকীকে জিজ্ঞেস করে 'আপনার সাংবাদিক লাইসেন্স কোথায়।' ফারুক কার্ড দেখিয়েও নিস্তার পাননি। সন্ত্রাসীরা তাঁকে অনেক অপমানজনক কথাবার্তা বলে। পরে তিনি অনেক কষ্টে অনুরোধ-উপরোধ করে রেহাই পান। ১০ নভেম্বর সকাল ১০ টায় তাঁতীবাজার মোড়ে সন্ত্রাসীদের ককটেলে আহত হন ইনকিলাবের ফটো সাংবাদিক শফিউদ্দীন বিটু ও নিউনেশনের ফরহাদ উদ্দিন। ডেমরার শ্যামপুরে সন্ত্রাসীরা ইত্তফাকের একটি বেবীটেক্সিতে অগ্নি সংযোগ করে।

একই দিনে যাত্রাবাড়ির শহীদ ফারুক সড়কে লাঞ্ছিত হন জনকণ্ঠের নুরুন্নবী রবি, আজকের কাগজের শামীম নূর, মুক্তকণ্ঠের সঞ্জীব বসাক, ডেইলী স্টারের আনিসুর রহমান। হরতালের দিনে ঝুঁকি নিয়ে এই সব ফটো সাংবাদিকরা যাত্রাবাড়িতে গিয়েছিলেন পেশাগত দায়িত্ব পালনে। এ সময় পুলিশের এসআই হারেস ফটো সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ শুরু করেন। হারেস চিৎকার করে বলতে থাকে, 'আমাদের পিটালে তোমরা ছবি তুলতে পার না, শুধু পুলিশের পেটানোর ছবি তোল।' পরে ওসি আব্দুল হাকিম এসে তাদের ধমক দিয়ে গালমন্দ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন। বেলা ১১ টায় বিএনপি ও আওয়ামী লীগের কর্মীদের মাঝে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। স্থানীয় আওয়ামী লীগের লোকজন সাংবাদিক সাংবাদিক বলে চিৎকার করতে শুরু করে। এর পূর্বে ইত্তেফাকের মীর মহিউদ্দিন সোহেল ও ইন্ডিপেন্টেন্টের তারিক রহমানের সাথে প্রথমে শ্রমিক লীগের কর্মীদের কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে শহীদ ফারুক সড়ক থেকে তাদের তাড়িয়ে দেয়া হয়। এর কিছুক্ষণ পর চারজন সাংবাদিক এগিয়ে গেলে এক পর্যায়ে অমল নামে একজন গজারী কাঠ দিয়ে আজকের কাগজের শামীম নূরকে মারধর করে। ৪ জনকে প্রায় ৪০ মিনিট যুবলীগ

www.pathagar.com

নেতাদের আড্ডাস্থল স্থানীয় একটি ক্লাবে আটক রাখে। সাংবাদিক পরিচয় জানার পরও তারা দুর্ব্যবহার করতে থাকে। সাংবাদিকদের হরতাল বিরোধী গাড়ি চলাচলের ছবি তুলতে বলে কিন্তু কর্তব্যের তাগিদে সাংবাদিকরা তাদের নিষেধ মানেনি। সাংবাদিকদের সাথে এ ধরনের আচরণের বিচার স্থানীয় এমপির কাছে চাওয়া হলে এমপি জবাবে বলেন, 'আপনারা বুঝে-শুনে ছবি তুলবেন।'

১৮ নভেম্বর মাসিক জাগো মুজাহিদ পত্রিকার সম্পাদক-প্রকাশক মুফতি আব্দুল হাই ও নির্বাহী সম্পাদক মঞ্জুর আহমেদকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার করা হয়। ২৩ ডিসেম্বর চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা জনকণ্ঠের পাবনাস্থ নিজস্ব সংবাদদাতা মীর্যা আযাদের প্রাণনাশের চেষ্টা চালায়। ২৪ ডিসেম্বর দুপুরে সাতক্ষীরা বাস টার্মিনালে হাসিনা নামের একজন মহিলার কাছ থেকে কনস্টেবল ওহাব বৈধ কাগজ থাকার পরও পাঁচটি প্রেসার কুকার কেড়ে নিতে চায়। এ সময় কনস্টেবল ও মহিলার ধস্তাধস্তির ছবি মুক্তকণ্ঠের সাংবাদিক সাইফুল্লাহ আজাদ ক্যামেরা বন্দী করলে পাশে দন্ডায়মান দারোগা আক্তারুজ্জামানের উস্কানীতে টার্মিনালের কতিপয় সন্ত্রাসী ওই সাংবাদিকের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে মারপিট, ক্যামেরা ও টাকা ছিনতাই করে নেয়। এ ব্যাপারে সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবে পরের দিন এব জরুরী সভার আয়োজন করা হয়। সভায় জেলার কর্মরত সাংবাদিকদের সর্বসম্মতিক্রমে সংশ্লিষ্ট দারোগাসহ ৪ জন পুলিশ ও টার্মিনালের দু'জন সন্ত্রাসীর নামে মামলা দায়ের করা হয়। ২৬ ডিসেম্বর জনকণ্ঠের সিনিয়র রিপোর্টার সুনীল ব্যানার্জী ও শংকর কুমার দে সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়ে গুরুতর আহত হন। বার্তা সংস্থা আবাসের ক্রীড়া রিপোর্টার জাকারিয়া হোসেনের গোপালগঞ্জের বাড়িতে সন্ত্রাসীরা আক্রমণ চালিয়ে তাকে গুরতর আহত করে। তার মাকেও সন্ত্রাসীরা জখম করে।

১৯৯৯ সাল শতাব্দীর শেষ বছর। এ বছর সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় কম হস্তক্ষেপ হয়নি। ২৪ জানুয়ারি কবি শামসুর রাহমানের বাস ভবনে কথিত হামলার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত সমাবেশে ইনকিলাবের কপিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে কলকাতা বইমেলা উদ্বোধন করার সময় প্রধানমন্ত্রীকে অনুষ্ঠানের উপস্থাপক মূখ্যমন্ত্রী হিসেবে অভিহিত করলে বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলো এ ধৃষ্ঠতার তীব্র সমালোনা করে। সমালোচনার জবাবে প্রধানমন্ত্রী কলকাতা থেকে ফিরে ২৯ জানুয়ারি গণভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'কলকাতায় আমাকে যখন মূখ্যমন্ত্রী বলা হচ্ছিল আমার তখন হাসি পাচ্ছিল। তারা ভুল করে এটা করেছে। পরে সংশোধনও করেছে। কিন্তু এ ভুলকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা খর্ব করার কথা লেখা এবং বাংলাদেশকে ভারতের অঙ্গরাজ্য বানানোর কথা লেখা ধৃষ্ঠতা।' দৈনিক দিনকালের এ সংক্রান্ত একটি লেখার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী দিনকালের প্রতিনিধিকে বলেন, 'আপনাদের পত্রিকায় দেখেছি এ ধরনের লেখা জ্ঞান পাপীরাই লিখে।'

দিনকালের বিরুদ্ধে কটুক্তি করার পরদিনই ৩১ জানুয়ারি বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) নাম নিয়ে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা সাংবাদিকতার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তবে চাই বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ। মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর সংবাদ থেকে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়। তাই যারা মিথ্যা, উদ্দেশ্যমূলক ও বিভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশন করেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।' বিএফইউজের নাম নিয়ে অনুষ্ঠিত এই অবৈধ কার্যক্রমে প্রধানমন্ত্রী নিজেকে জড়িত করায় সাংবাদিকদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করেছে। ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের এই গ্রুপের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার প্রতিবাদে সাংবাদিকরা তাকে কালো পতাকা প্রদর্শন করেছিল।

www.pathagar.com

১১ ফেব্রুয়ারি সকালে হরতালের সমর্থনে জামায়াতের একটি মিছিল মগবাজার চৌরাস্তা প্রদক্ষিণ করে কেন্দ্রীয় অফিসের কাছে এক সমাবেশের আয়োজন করে। এ সময় মগবাজার ওয়্যারলেসের কাছ থেকে আওয়ামী লীগের সশস্ত্র মিছিল পুলিশের ছত্রচ্ছায়ায় গুলি করতে করতে সমাবেশকারীদের ধাওয়া করে। দৈনিক সংগ্রামসহ আশেপাশের বাসা ও প্রতিষ্ঠানে হামলা চালালে স্থানীয় জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। হামলায় সংগ্রাম অফিস, বিভিন্ন দোকান ও বাড়ি আক্রান্ত হওয়ায় স্থানীয় জনতা তাদের ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলার জন্য রাস্তায় নামে। ফলে হামলাকারীরা গুলি ও বোমা নিক্ষেপ করতে করতে ওয়্যারলেসের দিকে পালিয়ে যায়। এক পর্যায়ে গণপ্রতিরোধ থেকে সন্ত্রাসীদের উদ্ধার করার জন্য পুলিশ স্থানীয় জনগণের উপর উপর্যুপরি ১৮ টি টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। জনতা রাস্তায় কাগজের স্তূপ জমা করে আগুন ধরিয়ে টিয়ার গ্যাসের ঝাঁঝ থেকে রক্ষার চেষ্টা করে। বেপরোয়া টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে হামলা কারীদেরকে রক্ষা করার জন্য পুলিশ তাদেরকে প্রোটেকশন দিয়ে ওয়্যারলেসের প্রান্তে সরিয়ে নিয়ে রেলগেটে অবস্থান গ্রহণ করে। সন্ত্রাসীদের গুলিবর্ষণে দৈনিক সংগ্রাম অফিসের সামনে ৪ জন বুলেট বিদ্ধ ও বেশ কয়েকজন আহত হয়।

২২ ফেব্রুয়ারি দিনকালের বরিশাল ব্যুরো চীপ মোঃ হুমায়ূন কবির ছাত্রলীগের হামলার শিকার হয়ে রক্তাক্ত জখম হন। ২৪ ফেব্রুয়ারি বিরোধী দলের দেশব্যাপী ৬৬ ঘন্টা হরতালের দ্বিতীয় দিনে বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ঢাকা-গাজীপুর রুটের (জ-০৪০০৯০) একটি মিনিবাস থেকে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এ সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাধারণ মানুষ আতংকিত হয়ে দিকবিদিক ছুটাছুটি করতে থাকলে ফটো সাংবাদিকরা তাদের ছবি তোলার জন্য মিনিবাসটির কাছে গেলে পুলিশ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাদের উপর নির্বিচারে বেধড়ক লাঠিচার্জ করতে থাকে। এতে পুলিশ কনস্টেবল আনোয়ার শফি, মাসুম এবং হাবিলদার আবদুল মজিদসহ অন্যদের লাঠির আঘাতে মানব জমিনের তরুণ, বাংলার বাণীর সাইফুল, বাংলাবাজারের জয় এবং ডেইলী স্টারের ইমরানসহ ২০ জন সাংবাদিক আহত হন। এই ঘটনার প্রতিবাদ করে প্রেসক্লাব থেকে অন্য সাংবাদিকরা ছুটে এলে উপস্থিত পুলিশ তাদের সাথে তুমুল বাকবিতন্ডায় লিপ্ত হয়।

অপর একটি ঘটনা ঘটে যাত্রাবাড়ি এলাকায় বেলা ১১ টার দিকে। এ সময় পিকেটাররা যাত্রাবাড়ি এলাকায় একটি রিকশায় পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই সংবাদ শুনে জনকণ্ঠের ফটো সাংবাদিক সোহরাব আলম ও সংবাদের আব্দুস সামাদ জুয়েল পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে ঘটনাস্থলের দিকে রওয়ানা দেন কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌছার আগেই হরতাল বিরোধী ছাত্রলীগের মিছিল থেকে খোকন নামের একজন কর্মী ছুটে এসে তাদের গতিরোধ করে এবং দু'জন সাংবাদিককের ওপর চড়াও হয়। অন্য কর্মীদের সহযোগিতায় দু'জনকে শারীরিকভাবে নাজেহাল করে জুয়েলের সাথে থাকা নাইকোন এফ এম-২ ক্যামেরা ছিনিয়ে নেয় এবং অপর একটি ক্যামেরা ভেঙ্গে ফেলে।

একই দিন রাত ৯টা ৩০ মিনিটে জয় বাংলা শোগান দিয়ে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা অতর্কিতে দৈনিক সংগ্রাম অফিসে আবার হামলা চালিয়ে স্টাফ রিপোর্টার শাহীন হাসনাতকে আহত করে। এ সময় রমনা থানা পুলিশকে খবর দেয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে ১৫ মিনিট পরে পৌছায়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার নামে সংগ্রাম অফিসের ভিতরে টিয়ারগ্যাসের সেল নিক্ষেপ করে। সংগ্রামে কর্মরত সাংবাদিকসহ অন্য স্টাফকে টিয়ারগ্যাসের যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাবার

www.pathagar.com

জন্য কাজ বন্ধ রাখতে হয়। তারা কাগজে আগুন জ্বালিয়ে টিয়ারগ্যাস থেকে রক্ষা পাবার চেষ্টা করেন।

১ মার্চ দ্বিতীয় ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষ্যে কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়। তথ্য মন্ত্রণালয় নিজের পছন্দমতো সংবাদপত্রে ক্রোড়পত্র প্রদান করে। ৫ মার্চ রাতে কোনো রকম অভিযোগ ছাড়াই সাদা পোশাকের পুলিশ ইংরেজি সাপ্তাহিক এভিডেন্স অফিসে হামলা করে ৩ জন কর্মচারীকে গ্রেফতার করে। মোহাম্মদপুর থানার কাটাসুর এলাকায় অবস্থিত এভিডেন্স অফিসে কয়েকবার সরকারি দলের অস্ত্রধারী যুবকরা মহড়া দেয়। শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকলেও পুলিশ এবং সন্ত্রাসীরা কর্মচারীদের ভয় দেখিয়ে অফিস খুলতে বাধ্য করে এবং অফিসের ক্ষতি সাধন করে।

রাজশাহী থেকে প্রকাশিত ট্রাস্টের মালিকানাধীন দৈনিক বার্তার ৭ মার্চ সংখ্যায় আলাউদ্দিন আহমেদের 'রাজনীতির লক্ষণ রেখা ও আওয়ামী লীগ'-শীর্ষক উপ-সম্পাদকীয় ছাপা হয়। এই উপ-সম্পাদকীয় ছাপানোর জন্য সরকারের রোষাণলে পড়ে দৈনিক বার্তা। তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে দৈনিক বার্তার মিডিয়া তালিকাভুক্তি বাতিল করে সরকারি বিজ্ঞাপন সরবরাহ ও মুদ্রণ নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং নিউজপ্রিন্টের কোটা কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই বন্ধ করা হয়। ১০ মার্চ যশোরে প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলন ও জনসভায় সিকিউরিটি পাসদানে বৈষম্যের আশ্রয় নেয়া হয়। কট্টর সরকার সমর্থক ছাড়া কোনো পত্রিকার প্রতিনিধিদের কার্ড দেয়া হয়নি। কার্ড দিয়েও সাংবাদিক সম্মেলনে ঢুকতে দেয়া হয়নি দু'জন সম্পাদককে।

১১ মার্চ সিলেট রেঞ্জ রিজার্ভ পুলিশ মাঠে বিকেল ৩টায় ৮ দিনব্যাপী বাণিজ্য মেলা ১৯৯৯-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া নির্দিষ্ট মঞ্চে না উঠে সিলেটের সিনিয়র সাংবাদিকদের নির্ধারিত আসন থেকে উঠিয়ে দিয়ে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট আবু নসর ও সাধারণ সম্পাদক আ.ন.ম. শফিককে নিয়ে বসে পড়েন। (সূত্র ঃ দৈনিক দিনকাল ১৩ মার্চ ১৯৯৯)

১৩ মার্চ ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠীর পদক প্রদান অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রীর আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছেন পুরস্কারপ্রাপ্ত গুণীজন ও দর্শকরা। সে অনুষ্ঠানে দৈনিক মানব জমিনের সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীকে সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়। যথাসময়ে পুরস্কার নেয়ার জন্য মতিউর রহমান মঞ্চে উঠে আসেন। কিন্তু অর্থমন্ত্রী তাঁকে পুরস্কার প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করেন। বারবার মাইকে ফকির আলমগীর অর্থমন্ত্রীকে মতিউর রহমানের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়ার অনুরোধ করলে অর্থমন্ত্রী তা শুনেননি। অবশেষে ফকির আলমগীর নিজের হাতে মতিউর রহমানকে পুরস্কার দিতে চাইলে মতিউর রহমান পদক না নিয়ে পদকটি সশব্দে টেবিলে রেখে অনুষ্ঠানস্থল থেকে বেরিয়ে যান। তাঁর এ প্রতিবাদকে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানান অনেক শ্রোতা। বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে আয়োজকরা। ফকির আলমগীর তার বক্তৃতায় ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেও অর্থমন্ত্রী তার অবস্থানে অনড় থাকেন।

১৪ মার্চ নোয়াখালী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কেএমডি আবুল কালাম এক জরুরী আদেশে স্থানীয় সাপ্তাহিক উপমা; দিশারী, সময়কাল বার্তা ও দৈনিক নতুন দিশারীর ডিক্লারেশন বাতিল করেন। ১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা ডিক্লারেশন আইনের ৯ (৩) ধারার বিধান উদ্ধৃত করে উল্লিখিত নির্দেশ দেয়া হয়। জেলা প্রশাসনের আদেশে বলা হয়, পত্রিকাগুলো বিনা অনুমতিতে ফের ছাপানো হলে ২২ ও ২৩ ধারায় আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

www.pathagar.com

২১ মার্চ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সিলেট জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দাওয়াত পত্র বিলি-বন্টন নিয়ে ব্যাপক অনিয়ম ও পক্ষপাতিত্বের প্রতিবাদে স্থানীয় দুইটি দৈনিকসহ জাতীয় কয়েকটি দৈনিকের সাংবাদিকরা প্রধানমন্ত্রীর এই অনুষ্ঠান বয়কট করেন। যশোর থেকে প্রকাশিত দৈনিক লোকসমাজের সরকারি মিডিয়া তালিকাভুক্তি বাতিল করে দেয়া হয় তথ্য প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশে। মন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর লোক সমাজের মিডিয়া তালিকাভুক্ত বাতিল করে পত্রিকার সম্পাদক বরাবরে ২১ মার্চ চিঠি পাঠায়। অতঃপর লোক সমাজকে যাতে সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের বিজ্ঞাপন না দেয়া হয় তার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নির্দেশ দেয়। পত্রিকাটি তার অনুকূলে বরাদ্দকৃত নিউজপ্রিন্ট কোটা পাওয়ার অযোগ্য বলে ডিএফপি ঘোষণা করে।

১ এপ্রিল রাজশাহী থেকে প্রকাশিত ট্রাষ্টি বোর্ড পরিচালিত উত্তরবঙ্গের একমাত্র জাতীয় সংবাদপত্র দৈনিক বার্তার মিডিয়া লিষ্ট এবং নিউজ প্রিন্টের কোটা কোনো কারণ ব্যতীত সরকার বাতিল করে দেয়। ৩ এপ্রিল বিএফইউজের সভাপতি আমানুল্লাহ কবীর ও মহাসচিব এম.এ. আজিজ এক যুক্ত বিবৃতিতে ২৫ ফেব্রুয়ারি র বিরোধী দল আহুত হরতাল চলাকালে অন্যান্যদের সঙ্গে ডিইউজের সভাপতি আবু সালেহ প্রকাশ্য রাজপথে বৃষ্টির মতো বোমা বর্ষণ করেছেন বলে যে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার হিংস্র থাবা বিস্তার করে দৈনিক ইনকিলাবের অগ্রযাত্রা রোধে বারবার ব্যর্থ হয়েছে এ সরকার। প্রথমে সরকারি বিজ্ঞাপন কমিয়ে দিয়ে ইনকিলাবের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করেছে কিন্তু এ সত্ত্বেও যখন ইনকিলাব জনপ্রিয়তার শীর্ষ স্থানে পূর্বের মতো থাকে তখন এক শ্রেণীর পরশ্রীকাতর বুদ্ধিজীবী মাধ্যমে বক্তব্য-বিবৃতি দিয়ে প্রাইভেট বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে ইনকিলাবকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করা হয়। এর আগে ইনকিলাবের নিউজপ্রিন্টের কোটা হ্রাস এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকের সহায়তা থেকে ইনকিলাবকে বঞ্চিত করা হয় কিন্তু এসব সব চক্রান্ত সত্ত্বেও ইনকিলাবের কোনো ক্ষতি হয়নি। সরকারের নানা ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতার প্রতিশোধ নেয়ার আরেকটি ঘটনা ঘটে ৪ এপ্রিল। ঐ দিন ইনকিলাব কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন ব্যুরো সোনালী ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণকে কেন্দ্র করে একটি মিথ্যা ভিত্তিহীন মামলা দায়ের করে।

১২ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়ন আন্দোলনের নেত্রী ও দৈনিক মাতৃভূমির রিপোর্টার ফারজানা রূপা রাত ৯ টায় অফিস থেকে বাসায় ফেরার পথে ফার্মগেটে জনৈক পুলিশ কর্তৃক শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হন। ১৮ এপ্রিল ভোরের কাগজে প্রকাশ, 'খাগড়াছড়ি অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক পাঠক ভোরের কাগজ পাঠ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ফেনীতে ভোরের কাগজের বান্ডিল ছিনতাই হয়ে যাওয়ার কারণে গত চারদিন এ সংকট সৃষ্টি হয়। জানা গেছে, ফেনীতে সরকারি দলের এক এমপির ভাড়াটে দুর্বৃত্তরা জনৈক মাহফুজের নেতৃত্বে গত চারদিন ধরে ভোরের কাগজের খাগড়াছড়ির বান্ডিল ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ভোরের কাগজ পরিবহনে নিয়োজিত বাস কর্মচারীরা পত্রিকার বান্ডিল দিতে অস্বীকার করলে দুর্বৃত্তরা বাস শ্রমিকদের মারধর করেছে বলে খাগড়াছড়ি সংবাদপত্র এজেন্ট রতন কুমার দে জানিয়েছেন।'

১২ মে প্রকাশ্যে দিবালোকে রাজপথে মহিলা রাজনৈতিক কর্মীকে বিবস্ত্র করার পুলিশী অপচেষ্টা ও তার ছবি তোলার অপরাধে পুলিশের হাতে সাংবাদিকদের যে আনুমানিক নির্যাতন সইতে হয়েছে, তা নিয়ে সারাদেশেই জনমনে তোলপাড় ঘটেছে। এই ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে গেছে মানুষ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পর্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করতে হয়েছে। শুধু সে ঘটনাই নয়, বিএনপি

www.pathagar.com

অফিসের সামনে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে বিদ্ধ হয়েছেন সাংবাদিক ও সাধারণ নাগরিকরা। পুলিশ প্রহারে আহত সাংবাদিকরা বলেছেন, 'আমাদের অপরাধ আমরা পুলিশ কর্তৃক মহিলা লাঞ্ছনা, শাড়ি টানাটানির দৃশ্যটি তুলবার চেষ্টা করেছি। আমাদের দোষ, আমরা পেশার তাগিদে ছবি তুলে তা পাঠকদের কাছে হাজির করতে চেয়েছি। আর এ জন্যই শুনতে হয়েছে পেটাও, আক্রমণ করো ইত্যাদি নির্দেশ।'

১৬ মে হেগের শান্তি সম্মেলন থেকে ফিরে গণভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী দিনকালের প্রতি কটাক্ষ করে মন্তব্য করে বলেন, 'প্রতিদিন ভোরেই বিভিন্ন দৈনিক পত্র-পত্রিকা আমার কাছে পাঠানো হয়। নামাজ পড়ে এসে প্রথমেই আমি এগুলো দেখি। দিনের শুরুতে এতো মিথ্যা দেখলে মন ভালো থাকে না। তাই দিনকাল দেখি না।' একই সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ১১ মে হরতালের দিন নিপীড়িত মনি বেগমের বস্ত্রহরণে প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, মনি বেগম নাকি আঁচল খুঁলে দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। মনি বেগমের বস্ত্র খোলার ঘটনা সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য নাশকতামূলক কাজ। এ কথাগুলো বলেই প্রধানমন্ত্রী থেমে যাননি, সাংবাদিকদের অভিযুক্ত করে তিনি বলেন, 'সংবাদপত্রগুলো ওই ছবিকে পণ্য হিসেবে দেখেছে এবং পত্রিকার কাটতি বাড়ানোর জন্য ওই ছবিটি ছেপেছে।'

১১ জুন শেরে বাংলা নগরস্থ পরিকল্পনা বিভাগের সম্মেলন কক্ষে বাজেট-উত্তর সাংবাদিক সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া, বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল ও কৃষিমন্ত্রী মতিয়ার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল ইনকিলাব, দিনকাল, সংগ্রাম ও জনতা। অর্থমন্ত্রী সরাসরি ইনকিলাব ও দিনকালকে আক্রমণ করে বলেন, ও এরা দিনকেলাবী করে। এ ধরনের দিনকেলাবীতে আমরা অভ্যস্থ।' বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনাদের লেখার যোগ্যতার কথা আমরা জানি। তাই এখন দৈনিক জনতা, ইনকিলাব, দিনকাল ও সংগ্রাম পত্রিকা বাদ দিয়ে অন্য পত্রিকায় সাংবাদিকদের প্রশ্ন করার সুযোগ দিন।'

১২ জুন প্রধানমন্ত্রীর বরিশাল বেতার কেন্দ্র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য স্থানীয় সাংবাদিকদের নিরাপত্তা কার্ড প্রদান করা সত্ত্বেও তাদেরকে অনুষ্ঠান থেকে বের করে দেয়া হয়। নিরাপত্তা কার্ড প্রাপ্ত সাংবাদিকদের উদ্বোধনের আগে বেতার কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেয়া হয় কিন্তু উদ্বোধনের পূর্বে তাদের সেখান থেকে বের করে দেয়া হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা কার্ড বিতরণের ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হয়। বেশ কয়েকজন স্থানীয় সাংবাদিককে কার্ড দেয়া হয়নি।

১৩ জুন দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশ, 'একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় বান্দরবন জেলা ছাত্রলীগ সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করায় বান্দরবান জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি কাজী মুজিবুর রহমান ও ছাত্রলীগ সভাপতি লক্ষপদ দাস ১২ জুন বান্দারবান বাজারে প্রকাশ্যে সাংবাদিকদের অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ, হত্যা ও মারধরের হুমকি প্রদান করেন এবং আগামীতে এ ধরনের সংবাদ পরিবেশন কিংবা প্রতিবাদ ছাপানো হলে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সাংবাদিককে রাস্তায় পিটিয়ে হত্যা করার হুমকি প্রদান করেন।'

১৯ জুন বিকেলে গণভবনে হাসিনার সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশী সাংবাদিকদের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করা হয়। দু'দেশের যৌথ নিরাপত্তা টিমের মধ্যে আধিপত্য ছিল ভারতীয় নিরাপত্তা কর্মীদের। দু'প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক কভার করার জন্য ফটো সাংবাদিক সেখানে অপেক্ষারত ছিলেন। বৈঠক শেষে ব্রিফিং দেয়া হবে বলে নিরাপত্তা পাসধারী সাংবাদিকদের গণভবনে অনেক চেকিং ও অনুমতির পর ভেতরে প্রবেশ

www.pathagar.com

করতে দেয়া হয়। তাও প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবনের কিচেন রুমের গেট দিয়ে বাংলাদেশী সাংবাদিকদের প্রবেশ করতে দেয়া হয়। ভারতীয় সাংবাদিকদের সদর দরজা দিয়ে সেখানে আনা হয়। অবশ্য কিছু ভারতীয় সাংবাদিককেও কিচেনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকানো হয়। প্রায় ২ ঘন্টা সাংবাদিকদের বসিয়ে রেখে ব্রিফিং-এর নামে দুটি কথা বলে বৈঠকের ফলাফল না জানিয়েই সাংবাদিকদের বিদায় দেয়া হয়। ভারতীয় ফটো সাংবাদিকদের নিরাপত্তা কর্মীরা ভেতরে নিয়ে গিয়ে দু'প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের ছবি তুলতে দেয়। বাংলাদেশী সাংবাদিকদের সব অনুরোধ উপেক্ষিত হয়। নিজ দেশেই তারা ভারতীয় সুপিয়রর নিরাপত্তা কর্মীদের কড়াকড়িতে দু'প্রধানমন্ত্রীকে কভার করতে ব্যর্থ হন। দু'দেশের সাংবাদিকদের সঙ্গে দু'রকম ব্যবহার উপস্থিত সবাইকে বিস্মিত করে। অবশ্য কয়েকজন ভারতীয় সাংবাদিক বলেন, 'আমাদের সবাইকে নয় ৮ জন ভারতীয় ফটো সাংবাদিককে এ সুযোগ দেয়া হয়েছে।' দৈনিক দিনকালের ফটো সাংবাদিককে কেবল ঢাকা শেরাটন হোটেলে দু'প্রধানমন্ত্রীর পরের দিনের যৌথ বৈঠক কভার করার জন্য নিরাপত্তা পাশ দেয়া হয়। অথচ অন্যান্য পত্রিকার ফটো সাংবাদিকদের বিমানবন্দর, স্মৃতিসৌধ, ওসমানী মিলনায়তন ও গণভবনের অনুষ্ঠানগুলো কভার করতে নিরাপত্তা পাশ দেয়া হয়।

অনিয়ম ও দুর্নীতির ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ করায় সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচিস্থ দৈনিক সংগ্রাম সংবাদদাতা আব্দুস সামাদ খানকে ২৩ জুন রাত ৮ টায় বেতিল থেকে রিকসা যোগে বাড়ি ফেরার পথে এনায়েতপুর হাই স্কুলের কাছে এলে কয়েকজন মুখোশধারী লোক রিকশা থামিয়ে তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। তারা তাকে অস্ত্রের মুখে রিকশা থেকে নামিয়ে স্কুলটির পেছনে নিয়ে যায় এবং পঞ্চাশ টাকা মূল্যের একটি সাদা স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। (সূত্রঃ দৈনিক সংগ্রাম ৭ জুলাই ১৯৯৯)

লন্ডন থেকে ফিরে কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রধানমন্ত্রীর ছেলে জয়ের বিয়ের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় ১৫ জুলাই গণভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমার ছেলে জয়ের বিয়ে হয়নি। পত্র-পত্রিকা ডাহা মিথ্যা লিখেছে। যেসব পত্রিকা এই মিথ্যা সংবাদ ছাপিয়েছে, আমাকে ডালাসে পাঠিয়েছে ও আমার ছেলের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে আমি তাদের বিরুদ্ধে মামলা করবো। আমি কোর্টে যাবো। তাদের ছাড়বো না।'

১৭ জুলাই গ্রেফতারকৃত দৈনিক ইনকিলাবের খাগড়াছড়ি জেলা সংবাদদাতা প্রফুল্লময় দত্ত অপর ৪ জনের ডিটেনশন আদেশ চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রীট পিটিশন দায়েরের জন্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলে খাগড়াছড়ি পৌর যুবদলের সভাপতি মোহাম্মদ বেলাল খাগড়াছড়ি বাস স্ট্যান্ডের কাছে কতিপয় আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হন। সন্ত্রাসীরা তার কাছ থেকে মামলার সকল কাগজপত্র, টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে গুরুতর জখম করে।

লক্ষ্মীপুর জেলার উত্তর-পূর্ব অংশে সংগঠিত খুন, জখম, ডাকাতি, ছিনতাই, চুরি, চাঁদাবাজি, জমি দখল নিয়ে সংঘর্ষ, অপহরণ, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার বিবরণ ঢাকায় ফ্যাক্সযোগে জাতীয় পত্রিকার প্রতিনিধিরা পাঠাতে পারছে না বলে ৬ আগষ্ট দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশ। সংগ্রামের রিপোর্টে বলা হয়, '২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মাস পর্যন্ত লক্ষ্মীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসীদের হাতে মোট ১২ জন খুন হয়। খুনের আসামীদের গ্রেফতারে পুলিশের নীরবতার সংবাদ যাতে ঢাকায় না পৌছে তার জন্য পুলিশ টেলিফোন ফ্যাক্স পর্যন্ত উঠিয়ে নেয়ার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। ফলে তিন মাস লক্ষ্মীপুরে অনেকগুলো খুনসহ বহু সন্ত্রাসী ঘটনা

www.pathagar.com

ঘটলেও জাতীয় পত্রিকায় সে খবর তেমন প্রকাশিত হয়নি। পুলিশের রহস্যজনক নীরবতা পালন অব্যাহত থাকায় সন্ত্রাসের খবর পত্রিকায় প্রকাশের দায়ে ইতিপূর্বে স্থানীয় নতুন পথ সম্পাদক ও দৈনিক ইনকিলাবের জেলা প্রতিনিধিকে দৈহিক লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। ২৫ মে ভোরের কাগজ প্রতিনিধির সংবাদ প্রেরণের ফ্যাক্সটি পুলিশ এসে নিয়ে যায়। ৩০ মে নতুন পথ অফিসের একটি ফ্যাক্স নিয়ে যাওয়া হবে বলে থানা থেকে টেলিফোনে জানানো হয়। ফ্যাক্সটি তাৎক্ষণিক পত্রিকার সম্পাদক হোসাইন আহম্মদ হেলাল এমএমসি প্রতিনিধির হাতে ন্যস্ত করেন। ফ্যাক্সটি এমএমসি প্রদান করেছিল। এর মাধ্যমে লক্ষ্মীপুরে কমপক্ষে ২০ জন সাংবাদিক নিজ নিজ জাতীয় পত্রিকায় নিয়মিত সংবাদ প্রেরণ করতেন। এছাড়া অনেক সাংবাদিকের নিজস্ব এবং অনেক দোকানের টেলিফোনের টেলিফোন সেটও থানা থেকে ক্লোজ করা হয়েছে। এসব টেলিফোনের মাধ্যমে সাংবাদিকরা নিয়মিত সংবাদ পাঠাতেন।'

১০ জুলাই দৈনিক দিনকালে খাগড়াছড়ি জেলার সংবাদদাতা সুকুমার বড়ুয়া প্রেরিত সংবাদ 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কৌশলে বাঙালিদের চাকরিচ্যুত করছেঃ নব্বই শতাংশ নিয়োগ পাচ্ছে চাকমারা'-প্রকাশিত হলে প্রকাশিত সংবাদের বিরুদ্ধে বিনা প্রতিবাদে বোর্ড কর্তৃপক্ষ খাগড়াছড়ি সংবাদদাতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

১ আগষ্ট চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসী, ছিনতাইকারীসহ দাগী আসামী ও মাদক বিক্রেতাদের দমনের অভিপ্রায়ে বিদেশ হতে আনা ডগ স্কোয়াডের কুকুরগুলোকে লেলিয়ে দেয়া হয় সচিবালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলন দমনের কাজে। এ দৃশ্য সাংবাদিকরা তাদের ক্যামেরাবন্দী করতে চাইলে সচিবালয়ে প্রবেশে বাধা প্রদান করে পুলিশ। শুধু বাধা দিয়েই শেষ নয়, সাংবাদিকদের সচিবালয়ের গেট থেকে এক পর্যায়ে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় পুলিশ। ৬ আগষ্ট নারায়ণগঞ্জ জেলা পরিষদ ডাকবাংলাগুলোতে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ড. মোজাম্মেল হোসেনের অভিপ্রেত মন্তব্য, 'সাংবাদিকরা টাকা খেয়ে টানবাজার ও নিমতলী পতিতা পল্লীর যৌনকর্মী ও পতিতা পুনর্বাসনের বিরুদ্ধে লেখালেখি করছে। ফলে দেশে-বিদেশে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এতে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের জবাবদিহি করতে হচ্ছে।'

৬ আগস্ট দৈনিক দিনকালসহ বিভিন্ন পত্রিকায় 'চট্টগ্রামে চাঁদা আদায়কালে ভুয়া ডিবি কর্মকর্তাকে গণধোলাই' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর গণধোলাইয়ের শিকার অভিযুক্ত ভুয়া ডিবি কর্মকর্তা সেলিম প্রকাশ, সাইফুল ইসলাম ঘটনাস্থল ডবলমুরিং থানার ঈদগাঁ, বউবাজার এলাকার কয়েকজন নিরীহ যুবকসহ সাংবাদিক সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে ৩২৬ ও ৩৭৯ ধারার মারধর, জখম এবং ছিনতাইয়ের অভিযোগ এনে ডবলমুরিং থানায় একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করে।

১৬ আগষ্ট চট্টগ্রাম ইস্পাহানী স্কুল ও কলেজের ছাত্রী সৈয়দা আতিয়া বেগম নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান করে মাথায় স্কার্ফ পড়ে ক্লাসে যায়। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ স্কার্ফ পরার অপরাধে তাকে ক্লাস হতে বের করে দেয়। এ সংক্রান্ত সংবাদ সকল সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রচার হওয়ায় কলেজের অধ্যক্ষ হাসিনা জাকারিয়া পরবর্তী সংবাদ সংগ্রহকালে সাংবাদিকদের হুমকি প্রদান করেন। মুসলিম অধ্যুষিত দেশে এরকম গর্হিত কাজ ও সাংবাদিকদের হুমকি দেয়া হলেও সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)

www.pathagar.com

১৯ আগষ্ট জাতীয় দৈনিক ও বার্তা সংস্থাগুলোর সম্পাদকের সঙ্গে মতবিনিময়কালে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আদালতের বিচারক, আইনজীবী এবং সাংবাদিকদের জন্য জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে।' মতবিনিময় সভায় এরশাদ সাহেবের পক্ষাবলম্বনের অপরাধে একজন সম্পাদকের সঙ্গে কৌতুক করেছেন তিনি। ২৮ আগষ্ট সন্ধ্যায় খুলনা থেকে প্রকাশিত দৈনিক জন্মভূমি ও সান্ধ্য দৈনিক রাজপথের দাবী অফিসে কতিপয় অজ্ঞাত পরিচয় দুর্বৃত্ত বোমা হামলা চালায়। কিন্তু সন্ত্রাসীদের নিক্ষেপিত ২টি বোমা বিস্ফোরিত হয়নি। বৃষ্টির কারণে বোমা দুটি ভিজে যাওয়ায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা হতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়।

৩০ আগষ্ট খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপির গণমিছিল কর্মসূচি পালনকালে দৈনিক জনকণ্ঠে কতিপয় সন্ত্রাসী ক্ষমতাসীনদের মদদে হামলা চালায়। আওয়ামীরা এ হামলার জন্য বিএনপিকে দায়ী করলেও প্রকৃত ঘটনা যে তাদের সাজানো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর হরতাল চলাকালে ফকিরাপুল মোড়ে এসে মাসুম রাব্বানী ও ডিএমপি এসি রুহুল ইমন সাংবাদিক বহনকারী বেবী টেক্সী থামিয়ে তল্লাশী চালায়। ১৫ সেপ্টেম্বর দুপুরে একটি দৈনিকের সাংবাদিক বহনকারী বেবী চালক মনসুরকে পুলিশ প্রহার করে এবং উপস্থিত সাংবাদিকদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। (সূত্রঃ দৈনিক সংগ্রাম ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)

চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে. এম. আব্দুলাহ কর্তৃক মোটা অংকের উৎকোচ গ্রহণ, দুর্নীতি, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতিসহ বিভিন্ন ধরনের অপকর্মের অভিযোগ অব্যাহতভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার ক্ষোভ মিটাতে গিয়ে ৫০১ ও ৫০২ ধারায় চকরিয়া ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১৮ সেপ্টেম্বর কক্সবাজার প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক কক্সবাজার পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, দৈনিক জনকণ্ঠের কক্সবাজার স্টাফ রিপোর্টার তোফায়েল আহমদ, দৈনিক পূর্বকোণ ও দৈনিক কক্সবাজার পত্রিকার চকরিয়া সংবাদদাতা এম জাহেদ চৌধুরীকে আসামী করে একটি কথিত মানহানির ফৌজদারী মামলা দায়ের করেন। ১৯ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের ম্যারিয়ট হোটেলে ডা. এনায়েতুর রহীমের সভাপতিত্বে যুক্তরাষ্ট্রের সার্বজনীন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ভাষণদানকালে এক পর্যায়ে বলেন, 'আমাকে সাইজ করার জন্যে পত্রিকাগুলো আমার বিরুদ্ধে লিখতে পারে। তবে তা একদিন নিজেদের গায়েই পড়বে।'

২২ সেপ্টেম্বর দৈনিক শ্যামবাজার পত্রিকায় তাদের ক্রাইম রিপোর্টার এস.এম. নওরোজ হীরা ও জিএম প্রবীণ সাংবাদিক আতাউল হককে রমনা থানার ওসি কর্তৃক হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলায় গ্রেফতারের নিন্দার সংবাদ প্রকাশ করেছে। ২৪ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর শহরে আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতির কথা ও বিভিন্ন সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কথা দৈনিক ইনকিলাবে নিয়মিত প্রকাশ হওয়ার কারণে প্রশাসন সন্ত্রাসীদের ধরার জন্য তৎপর হওয়ায় সন্ত্রাসীদের অসুবিধা ঘটে। এতে সন্ত্রাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ইনকিলাবের ফরিদপুর জেলা সংবাদদাতা আনোয়ার জাহিদের বাসায় একটি বেনামী চিঠিতে ১২ ঘন্টার মধ্যে ফরিদপুর ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়। অন্যথায় হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয়। ২৪ সেপ্টেম্বর পার্বত্য জেলা বান্দরবনে বিকেলে শহরের বাস স্টেশন এলাকায় পরিবেশগত মারাত্মক বিপর্যয়ের দিক বিবেচনা না করে জেলার প্রভাবশালী এক আওয়ামী লীগ নেতা ফিলিং স্টেশন তৈরি করায় জাতীয় দৈনিকের দু'সাংবাদিক বুদ্ধজ্যোতি চাকমা ও সাদেক হোসেন চৌধুরী ছবি তুলতে গেলে ঐ নেতা তাদের লাঞ্ছিত করে এবং প্রাণনাশের হুমকি প্রদান করে।

২৬ সেপ্টেম্বর দৈনিক মানব জমিনের প্রথম পৃষ্ঠায় 'সুনামগঞ্জের সম্রাট মুকুট'-শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করায় সুনামগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ প্রকাশ

www.pathagar.com

করা হয়েছে, এ অভিযোগ এনে সুনামগঞ্জে আমল গ্রহণকারী প্রথম শ্রেণীর হাকিম আদালতে ২৯ সেপ্টেম্বর সুনামগঞ্জ জেলা যুব লীগের যুগ্ম আহবায়ক জসিম উদ্দিন ফারুক দন্ডবিধির ৫০০ ও ৫০১ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার প্রেক্ষিতে আদালত, দৈনিক মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক জনাব মতিউর রহমান চৌধুরী, সম্পাদক ও প্রকাশক বেগম মাহবুবা চৌধুরী এবং সিলেটের বিভাগীয় ব্যুরো প্রধান চৌধুরী মুমতাজ আহমেদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন।

২৭ সেপ্টেম্বর ডিগবাজির রাজনীতির দুই মন্ত্রী আলাউদ্দিন-স্বপনের ফ্লোর ক্রসিং মামলা শেরে বাংলা নগরস্থ নির্বাচন কমিশনে চলাচালে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করে গুটিকয়েক বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দকে প্রবেশাধিকার দেয়া হলেও ভেতরে ঢোকার সময় মেটার ডিটেক্টর দিয়ে কয়েকবার তল্লাশী করা হয়। অনুরূপভাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে নিরাপত্তা রক্ষীরা অশোভন আচরণ করে। দেহ তল্লাশীতে বাধা দিলে পুলিশ কর্মকর্তারা সাংবাদিকদের জানায়, 'নিরাপত্তার জন্য নির্বাচন কমিশন থেকে আমাদের নিয়োগ করা হয়েছে। উপরের নির্দেশেই আমরা এ কাজ করছি।'

৩ অক্টোবরের হরতাল চলাকালে সকাল ১০টার দিকে বরিশাল শহরের গীর্জা মহলা এলাকায় একটি পটকার বিস্ফোরণ ঘটে। এ সময় আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ অফিসের দিক থেকে একদল যুবক দৌড়ে এসে প্রথমে একটি চায়নীজ রেষ্টুরেন্টের কর্মীদের মারধর করে। পরে তারা স্থানীয় পূবালী ব্যাংক ও মকবুল মার্কেটে গিয়ে বোমা নিক্ষেপকারীদের খুঁজতে থাকে। সে সব স্থানে কাউকে না পেয়ে তারা পার্শ্ববর্তী দৈনিক ইনকিলাব-ব্যুরো অফিসে চড়াও হয়। সন্ত্রাসীদের হাতে ইনকিলাব ব্যুরোর বড়গুনা জেলা সংবাদদাতা জাহাঙ্গীর কবির মৃধা শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হন। সন্ত্রাসীরা অফিসে প্রবেশ করে টেলিফোন সেট, রেডিও, ক্যাসেট রেকর্ডার, আসবাবপত্র ও বিভিন্ন সরঞ্জাম ভাঙচুর করে। মাত্র তিন মিনিটের কমান্ডো স্টাইলের হামলায় অফিসের বিভিন্ন সরঞ্জামের ব্যাপক ক্ষতি করে ৬-৭ জন সন্ত্রাসী দল নিরাপদে সরে পড়ে। ৮ অক্টোবর ঢাকার ইস্কাটনস্থ দৈনিক জনকণ্ঠ অফিসের নিচ তলায় অভ্যর্থনা কেন্দ্রে এক ব্যক্তি একটি ব্রিফকেস রেখে 'আসছি বলে' চলে যায়। বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলেও ব্রিফকেসটির বাহকের কোন হদিস না পাওয়া গেলে জনকণ্ঠ কর্মচারীদের সন্দেহ হয়। রমনা থানাকে জানালে ওসিসহ একদল পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্রিফকেসটি খুলে দেখেন। ব্রিফকেসটির ভেতরে আসলে কি রয়েছে তা পরীক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞদের খবর দেয়া হয়। রাত সোয়া ৯ টার দিকে বিশেষজ্ঞ এসে ব্রিফকেসে ট্যাংক বিধ্বংসী মাইন পান। দেশের ক্রমাবনতিকর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে কর্মরত সাংবাদিক, শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবনের যে কোন নিরাপত্তা ছিল না এটা তারই প্রমাণ।

১২ অক্টোবর দৈনিক ইনকিলাবের সম্পাদক এএমএম বাহাউদ্দিন ও যশোর ব্যুরো চীপ মিজানুর রহমান তোতার বিরুদ্ধে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শরীফ আব্দুর রাকীব সদর থানা হাকিম 'ক' অঞ্চলের আদালতে ৫০০ ও ৫০১ ধারায় মামলার আবেদন করেন। বিজ্ঞ বিচারক মোঃ গোলাম রহমান মিঞা বিষয়টি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আক্তারুজ্জামানকে দায়িত্ব দেন। একই ধারায় শরীফ আব্দুর রাকীব দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক আবুল আসাদ, স্থানীয় প্রতিনিধির বিরুদ্ধে মামলার আবেদন করেন। তিনি অভিযোগ করেন, গত ৮ অক্টোবর দৈনিক ইনকিলাবে উদীচী বোমা বিস্ফোরণ মামলার নতুন মোড়, বিব্রতকর অবস্থায় তদন্ত কর্মকর্তারা, জয়েন্ট ইন্টারোগেশন থেকে জেলা

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ নেতা শরীফ আব্দুর রাকীবের জড়িত থাকার খবর'-পরিবেশন ও সরবরাহ করে মান-মর্যাদার ক্ষতি হয়েছে। উল্লেখ্য, দৈনিক ইনকিলাব জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলে চোরাচালানী সিন্ডিকেটের ক্যাশিয়ার সিরাজের দেয়া জবানবন্দীতে শরীফ আব্দুর রাকীবের নাম অন্যান্যের সাথে উদীচীর ঘটনায় উল্লেখ করেছে বলে তদন্ত সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করে। এ রিপোর্টে শরীফ আব্দুর রাকীবের প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ করা হয়।

১৩ অক্টোবর গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য, ৫ টি বাম ছাত্র সংগঠন এবং পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের আহবানে ধর্মঘট পালিত হয়। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানায়। ধর্মঘট চলাকালে জোর করে পরীক্ষা নিতে গেলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বেলা ১০ টার দিকে বিক্ষুব্ধ কয়েকজন ছাত্র কলা ভবনের সামনে কিছু পরিত্যক্ত কাগজে অগ্নিসংযোগ করলে পুলিশ সাধারণ ছাত্রদের উপর বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। এ সময় অন্তত ২০ জন ছাত্র আহত হয়। পুলিশ এ সময় ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি জোনায়েদ সাকী, ছাত্র মৈত্রী নেতা শাহজাহান কবির রিন্টু, ছাত্র ইউনিয়ন নেতা বাকী বিল্লাহ ও ইংরেজি বিভাগের ছাত্র আসাদকে গ্রেফতার করে। এছাড়া পুলিশ ছাত্রফ্রন্ট নেতা মমতাজুল আলা ইলু ও সাধন দত্ত নান্টুকে গ্রেফতার করলেও পরে ছেড়ে দেয়। পুলিশের লাঠিচার্জে আজকের কাগজের বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার সাইফুল ইসলাম রিপন, ছাত্র ফেডারেশন নেতা উজ্জ্বল বালো, ইফতেখার আইয়ুব, ছাত্রফ্রন্ট নেতা সাজ্জাদ হোসেন ও মিলন গুরুতর আহত হয়। সাইফুল ইসলাম রিপন বারবার সাংবাদিক পরিচয় দিলেও পুলিশ কর্ণপাত করেনি। এ সময় পাশে দাঁড়ানো সহকারী প্রক্টর সেলিম মাহমুদ পুলিশকে বলেন, 'সাংবাদিক-টাংবাদিক বুঝিনা সবাইরে পেটাও।' এ সময় এসআই ইকবাল উৎসাহী হয়ে সাংবাদিকদের উপর চড়াও হয়। পুলিশের এডিসি মোরশেদ ও ডিসি কাশেম কয়েকজন সাংবাদিকের দিকে ইশারা করলে পুলিশ তাদের খোঁজাখুঁজি করে।

১৭ অক্টোবর টিকাটুলি-হাটখোলা এলাকায় কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট বিকালে ইনকিলাব ভবনের সামনে ধৃষ্ঠতাপূর্ণ আচরণ করে। সে নিরাপত্তা বিভাগের শিফট ইনচার্জ মীর হাশেমকে দু'দফা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও হুমকি-ধমকির পর অপরাধী পুলিশ সার্জেন্ট তার ইউনিফর্ম-জামার পকেটে লাগানো নাম পেটটি লুকিয়ে ফেলে এবং তার কৃতকর্ম ঢাকার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়। এলাকার এসি বকস ও এসে তার পক্ষ সমর্থন করে। শতাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর জটলা শুরু হলে ডিসি ট্রাফিক মুশতাক, এডিসি (পূর্ব) মোরশেদ ঘটনাস্থলে আসেন। সার্জেন্টের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ২২ অক্টোবর বরিশাল প্রেসক্লাবে সন্ত্রাসীদের হামলা ও পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার ঘটনায় ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মুখে চীপ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর নির্দেশে পুলিশ আওয়ামী যুবলীগ নেতা ফারুকসহ ২৬ জনকে গ্রেফতার করে।

২২ অক্টোবর সর্বস্তরের তৌহিদী জনতার আল-মারকাজুল ইসলামীর চেয়ারম্যান মুফতি শহীদুল ইসলামের মুক্তির দাবীতে আয়োজিত শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশ নির্বিচারে গুলি, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ করলে দেশের প্রখ্যাত আলেম শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হকসহ শতাধিক মুসল্লি আহত হন। তৌহিদী জনতার ওপর পুলিশের বর্বরোচিত হামলার ছবি তুলতে গেলে পুলিশ কর্তৃক কর্তব্যরত ফটো সাংবাদিকদের ওপরও বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। লাঠিচার্জ ও পুলিশের বর্বরোচিত রাইফেলের বাটের আঘাতে ১০ জন ফটো সাংবাদিক আহত হন। মারাত্মক আহত অবস্থায় দৈনিক দিনকালের ফটো সাংবাদিক বাবুল তালুকদার, দৈনিক জনতার ফটো সাংবাদিক মিন্টোকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

www.pathagar.com

এছাড়াও দৈনিক ভোরের কাগজের ফোরকান মামুন আবেদীন, দৈনিক অর্থনীতির সুবীর কুমার, বাংলাবাজারের আনোয়ার হোসেন, আজকের আওয়াজের কামাল, সোনালী বার্তার মোবারক হোসেন, মুক্তকণ্ঠের এনামুল কবীর, সাপ্তাহিক এভিডেন্সের ফটো সাংবাদিক মতিউর রহমান টুকু আহত হন। ৩০ অক্টোবর মুন্সিগঞ্জ জেলা শহরে বিএনপির মশাল মিছিল বের করলে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা বোমা, পিস্তল, কাটা রাইফেল নিয়ে হামলা করে। এতে বিএনপির ৪ জন কর্মী ও দুই পুলিশ কনস্টেবল আহত হয়। স্থানীয় সাপ্তাহিক মুন্সিগঞ্জ পত্রিকার ফটোগ্রাফার ও ঐ হামলার ছবি তুলতে গেলে আওয়ামী লীগের সভাপতি মহিউদ্দিনের ভাই মাহমুদ উক্ত ফটোগ্রাফারকে আক্রমণ করে তার ক্যামেরা কেড়ে নেয় এবং মারধর করে। শুধু তাই নয়, এরপর ওই সাপ্তাহিক পত্রিকার অফিসে গিয়ে হামলা করে অফিস তছনছ করে।

৪ নভেম্বর আওয়ামী সমর্থক বুদ্ধিজীবী ও ঘাদানিক নেতা সৈয়দ হাসান ইমাম ৩০ অক্টোবর দৈনিক দিনকালের প্রথম পাতায় 'অধ্যাপক মান্নান চৌধুরী ও হাসান ইমামের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের ১৬ একর জমি লুট' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশের জন্য ঢাকা মেট্রো পলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নজরুল ইসলামের আদালতে দৈনিক দিনকালের সম্পাদক আখতারুল আলম, বার্তা সম্পাদক রেজোয়ান সিদ্দিকী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক একেএম মোশারফ হোসেন, নির্বাহী সম্পাদক আফজাল এইচ খান, প্রকাশক অধ্যাপক মাজেদুল ইসলামের বিরুদ্ধে মানহানিকর মামলা দায়ের করেন।

প্রধানমন্ত্রী ইউনেস্কো পুরস্কার পাওয়ায় সাংবাদিকদের একটি গ্রুপ তাকে সংবর্ধনার আয়োজন করে। অপরদিকে সাংবাদিকদের ওপর পুলিশের অব্যাহত হামলার প্রতিবাদে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন তার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ৬ নভেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবে প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষ্যে তার নিরাপত্তার নামে সমস্ত প্রেসক্লাব চত্বরে এক ধরনের ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়। প্রধানমন্ত্রী সেখানে যাওয়ার কয়েক ঘন্টা আগ থেকে পুরো প্রেসক্লাব অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। এ উপলক্ষে প্রায় ৫ ঘন্টা পুরো তোপখানা রোডে পুলিশ কোনো যানবাহন চলতে দেয়নি। সেনাবাহিনী, পুলিশ, কুত্তা বাহিনী, আর্মড পুলিশ, মাস্তান বাহিনী, ক্যাডার বাহিনী এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা এসবি, এনএসআই, ডিএফআই ও এসএসএফ-এর লোকজন সকাল থেকে প্রেসক্লাবে এসে অবস্থান নেয়। দুপুরে ডগ স্কোয়াডের কুকুর এনে গোটা প্রেসক্লাব চষে বেড়ানো হয়। এ সময় প্রেসক্লাবের সদস্য ও সিনিয়র সাংবাদিকরাও ব্যাপক হয়রানির শিকার হন। গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা প্রেসক্লাব চত্বর থেকে সাংবাদিকদের গাড়ি বের করে দেয় এবং ক্লাবের সদস্যদের ঢুকতে বাধা প্রদান ও নানা ভাবে নাজেহাল করে। প্রধানমন্ত্রী সংবর্ধনার জন্য আওয়ামী সমর্থক সাংবাদিকদের অনুষ্ঠানস্থল ছিল ক্লাব ভবনের সামনে খোলা চত্বর। সেখানে অনুষ্ঠানের জন্য বিশাল প্যান্ডেল করা হয়। কিন্তু গোয়েন্দা সংস্থা ও নিরাপত্তা সংস্থার লোকজন পুরো প্রেসক্লাব ভবনই অবরুদ্ধ করে রাখে। প্রেসক্লাবের ছাদ, গেস্টরুম, সিঁড়ি, লাইব্রেরীর সামনে, দোতলার করিডোর, হলরুম, টিভি রুম, প্রভৃতি স্থানে গোয়েন্দা এবং পুলিশ ও সেনাবাহিনীর লোকজন দাঁড়িয়ে যায়। প্রতি ২/৩ গজ অন্তর অন্তর নিরাপত্তার লোকদের ডিউটি দেওয়া হয়। এ অবস্থায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সদস্যরা বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়েছেন। শুধু গোয়েন্দা সংস্থা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যই নয়, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের অসংখ্য কর্মী এনে প্রেসক্লাব চত্বরে জড়ো করা হয়। অনুষ্ঠানস্থল এবং প্রধান ফটকই নয়, প্রেসক্লাবের মূল ভবনের ভিতরে সদস্যদের যাতায়ত পথেও মেটাল ডিটেক্টর যন্ত্র বসালে প্রেসক্লাবের সদস্যরা এর প্রতিবাদ

www.pathagar.com

করেন। এ সময় গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন ক্লাব সদস্যদের সঙ্গে অশোভন আচরণ করেন। এ ঘটনায় ক্লাবের সাধারণ সদস্যরা ক্ষিপ্ত হয়ে একযোগে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। প্রেসক্লাব সদস্যদের সম্মিলিত প্রতিবাদের মুখে অবশেষে গোয়েন্দারা মেটাল ডিটেক্টর যন্ত্র সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন প্রেসক্লাব ক্যান্টিনে ঢুকেও অনেক সদস্যের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হন। ক্যান্টিনে ঢুকে তারা হলিডে সম্পাদক এজেড এম এনায়েতুল্লাহ খান এবং ইনডিপেন্ডেন্টের সাংবাদিক এএসএম সাহাবুদ্দীনকে প্রেসক্লাব চত্বর থেকে তাদের গাড়ি সরিয়ে নিতে চাপ দেয়। এ অবস্থায় হলিডে সম্পাদক অপমানিতবোধ করে প্রেসক্লাব থেকে চলে যান। এক পর্যায়ে প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক স্বপন কুমার সাহার মাধ্যমে বিভিন্ন রুমের চাবিও গোয়েন্দা সংস্থার হাতে নিয়ে নেয়। সাংবাদিকদের ওপর দফায় দফায় পুলিশী হামলা ও গুলিবর্ষণের প্রতিকার চাইলে প্রধানমন্ত্রী ফটো সাংবাদিকদের বললেন, 'আপনাদের যারা মেরেছে তারা বিএনপির পুলিশ।'

৮ নভেম্বর দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত সংবাদ, 'চাঁপাই নবাবগঞ্জ বীর বার্তা সম্পাদক শহীদুল্লাহ চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার ২টি থানার মাঝখানে ঝুলে আছেন। তার মামলাটি কেউ নিচ্ছে না। একদল প্রতারক ২ নভেম্বর মোঃ শহীদুল্লাহর একটি মাইক্রোবাস ভাড়ার নামে নিয়ে নওগাঁ ও পত্নীতলা থানায় যায়। সেখানে ড্রাইভারকে অজ্ঞান করে প্রতারক দল মাইক্রো নিয়ে চম্পট দেয়। পুলিশ ড্রাইভারকে একদিন অচেতন থাকার পর উদ্ধার করে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করে এবং শহীদুল্লাহকে খবর দেয়। পরদিন শহীদুল্লাহ এ ব্যাপারে পত্নীতলা থানায় মামলা করতে চাইলে তারা চাঁপাইনবাবগঞ্জ থানায় যেতে বলে। নবাবগঞ্জ থাকায় গেলে তারা পত্নীতলায় যেতে বলেন। এভাবে শহীদুল্লাহ ঝুলেন দুই থানার মাঝখানে।'

৮ নভেম্বর বিরোধী দলের হরতাল চলাকালে সায়েদাবাদ ব্রীজে পুলিশের গুলিতে দৈনিক গণজাগরণ পত্রিকার ফটো সাংবাদিক জেমস রক্তাক্ত জখম হন। ১৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় রামপুরার পলাশবাগের পলাশ কমিউনিটি সেন্টারে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের স্মরণসভায় প্রধান অতিথি স্পীকারের উপস্থিতিতে পুলিশ আলোচক দৈনিক ইনকিলাবের সহকারী সম্পাদক ও ডিইউজের নির্বাহী কমিটির সদস্য কবি আব্দুল হাই সিকদারকে গ্রেফতার করে। ২৬ নভেম্বর মুক্তাগাছার দৈনিক দিনকালের প্রতিনিধি মনোনেশ দাসকে পূর্বে (২৪ সেপ্টেম্বর ও ২৬ নভেম্বর) প্রকাশিত সংবাদের জন্য থানা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইউপি চেয়ারম্যান হান্নান ও সন্ত্রাসীরা হামলা ও মিথ্যা মামলা দায়েরের হুমকি দেয়।

২৮ নভেম্বর ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয় থেকে জারি করা চিঠিতে সাপ্তাহিক এভিডেন্সের প্রকাশক বেগম আরজুমান্দ আরা চৌধুরীকে সরকার কর্তৃক পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করার কথা জানানো হয়। চিঠিতে স্বাক্ষর করেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একান্ত সচিব। বিশেষ পুলিশ সুপার, সিটি এসটি ঢাকা, উপ-পুলিশ কমিশনার ডিবি, উপ-পুলিশ কমিশনার (পশ্চিম) ডিএমপি, ওসি মোহাম্মদপুর থানা ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে দেয়া হয়। চিঠিতে বলা হয়, আপনি সাপ্তাহিক এভিডেন্স পত্রিকার ঘোষিত প্রকাশনার স্থান ও মুদ্রণ স্থান ২৯ জুলাই ১৯৯৩ থেকে পরিবর্তন করা সত্ত্বেও ১০ ধারা অনুযায়ী পরিবর্তিত স্থান সম্পর্কে নতুন কোনো ঘোষণাপত্র সত্যায়ন করেননি। ফলে দি প্রিন্টিং প্রেসেস এন্ড পাবলিকেশন্স (ডিক্লারেশন এন্ড রেজিস্ট্রেশন) এ্যাক্ট, ১৯৭৩-এর ধারা অনুযায়ী আপনার এভিডেন্স পত্রিকার পূর্বের ঘোষণাপত্রটি (৯/৮২) ২৯ জুলাই ১৯৯৩ তারিখ হতে বাতিল হয়ে গিয়েছে এবং উক্ত তারিখ হতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক এভিডেন্স পত্রিকার প্রকাশনা বা মুদ্রণ অননুমোদিত ও

www.pathagar.com

বেআইনী হয়ে পড়েছে। তাই ইংরেজি সাপ্তাহিক এভিডেন্স পত্রিকার প্রকাশনা ও মুদ্রণ হতে বিরত থাকার জন্যে এতদ্বারা আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে উল্লেখিত আইনের ৩২ ধারার বিধান মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

সরকার যখন এভিডেন্সের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে তার বহু পূর্বে প্রকাশকের পক্ষ থেকে ঢাকার ডিসির কাছে ১৮ নভেম্বর প্রেরিত চিঠিতে বলা হয়েছিল, ইংরেজি সাপ্তাহিক এভিডেন্সের প্রকাশনা অফিস ২৬ ধানমন্ডি (পুরাতন-৮৬), রোড নং-৫, ঢাকা-১২০৫-এ অবস্থিত ছিল। কিন্তু উক্ত অফিসের জমি নিয়ে মিসেস পারভীন আহম্মদের সাথে মামলা নং-১৫৯/৯৩ তৃতীয় সাব জজ আদালতে বিচারাধীন থাকার কারণে অফিসটি ৩০, প্রমিন্যান্ট হাউজিং, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭-এ স্থানান্তর করা হয়েছে। এমতাবস্থায় এভিডেন্স প্রকাশনা অফিস ৩০ প্রমিন্যান্ট হাউজিং মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭-এ ঠিকানায় স্থানান্তরের অনুমতির জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।' ২৩ নভেম্বর পত্রিকার মুদ্রাকার পরিবর্তনের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবরে প্রকাশক পত্র দেন। পত্রে বলা হয়, আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পত্র নং-৯/৮২ তারিখ ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ মোতাবেক ইংরেজি সাপ্তাহিক এভিডেন্স পত্রিকা প্রকাশের ঘোষণাপত্র পেয়েছিল এবং সে মোতাবেক নিয়মিতভাবে পত্রিকা প্রকাশ করে আসছি।

অত্যাধুনিক মুদ্রণজনিত সুবিধা না থাকায় এবং যোগাযোগের অসুবিধার কারণে বর্তমানে আমি শাহানা প্রিন্টিং-এর পরিবর্তে এভিডেন্স লিঃ, ৩০ প্রমিন্যান্ট হাউজিং, ৩ পিসি কালচার রোড, মোহাম্মদপুর-এ ছাপাতে ইচ্ছুক। উল্লেখিত প্রকাশিত পত্রিকায় মুদ্রাকর পরিবর্তনের অনুমতিদানে বাধিত করবেন।'

১ ডিসেম্বর বিকেল সোয়া ৫টার দিকে দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার সাংবাদিক আজহার আলী সরকার ডাক্তার দেখিয়ে রিকশাযোগে বাসায় ফিরছিলেন। রিকশাটি ইস্কাটনের সেঞ্চুরী আর্কেডের সামনে ক্রসিং দিয়ে রং সাইডে যাবার সময় কর্তব্যরত ট্রাফিক কনস্টেবল ওহাব রিকশাটি থামায় এবং রিকশা চালককে ঘুষি ও লাথি মারতে থাকে। সাংবাদিক আজাহার ট্রাফিক কনস্টেবলকে নিবৃত্ত করতে গিলে তাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয়। এ সময় পাশেই অবস্থিত পুলিশের ডিসি (সাউথ) অফিস থেকে সাদা পোশাকে ৩/৪ পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে আজহারকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে। আজাহার নিজের পরিচয় দেন এবং পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে অভিযোগ করবেন বলে তিনি মারমুখী পুলিশদের জানান। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশের দল আজহারকে টেনে হেঁচড়ে রিকশা থেকে নামায় এবং পেটাতে পেটাতে ডিসি (সাউথ) অফিসের নিজ তলায় একটি কক্ষে নিয়ে যায়। সেখানে তার উপর অমানুষিক নির্যাতন করা হয়। ৭/৮ জন পুলিশ তাকে লাঠিসোটা দিয়ে মারধরসহ কিলঘুষি মারতে থাকে। ইতিমধ্যে অন্যান্য সাংবাদিকদের কাছে এ সংবাদ পৌছে গেলে তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং সেখান থেকে আজহারকে উদ্ধার করে রমনা থানায় নিয়ে যান। রমনা জোনের এসি হুমায়ূনকে অভিযোগ করা হয়ে হলে তিনি ব্যাপারটি হেসে উড়িয়ে দেন।

২৭ নভেম্বর দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকায় 'সাভারে প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয় পরিচয় দিয়ে চাঁদাবাজি-জনমনে তীব্র ক্ষোভ' এবং ২৯ নভেম্বর একই পত্রিকায় 'হুমকির মুখে প্রতিবাদকারীরা-শেখ সেলিমের নাম ভাংগিয়ে সাভার থানা যুবলীগ সভাপতির সীমাহীন চাঁদাবাজি'-শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় বাংলাবাজার পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক মোঃ জাকারিয়া খান ও সাভার এলাকার রিপোর্টার সৌমিত্র মানবের বিরুদ্ধে ২ ডিসেম্বর ঢাকার সিএমএম আদালতে পৃথক দু'টি মানহানির মামলা দায়ের করেন সাভার থানা আওয়ামী যুব

www.pathagar.com

লীগের সভাপতি আবু আহমেদ নাসীম ও আশুলিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি মোঃ ইয়াকুব আলী দেওয়ান। ৫ ডিসেম্বর একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা টেম্পোযোগে এসে ভোরে দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকায় উপর্যুপরি বোমা হামলা চালিয়ে পালিয়ে যায়। ৫ দিন ব্যাপী অষ্ট্রেলিয়া সফর শেষে দেশে ফিরে ২৩ অক্টোবর গণভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী আবারো মন্তব্য করেন, 'জবাবদিহিতা থাকলে বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকবে না কেন? সাংবাদিকতারও তো জবাবদিহিতা থাকা দরকার। সংবাদপত্রে মিথ্যা, বানোয়াট নিউজ যদি কেউ ভুল করেও ছাপায় সেটার ক্ষতিপূরণ হবে কিভাবে? জবাবদিহিতা শুধু আমাদেরই থাকবে অন্যদের থাকবে না এটা হতে পারে না।'

কিশোরগঞ্জের পূর্বাচল হিমাগারের আলু কেলেংকারি এবং নির্বাচনের আগের দিন আইন লংঘন করে ডেপুটি স্পীকারের প্রচারণা চালানো নিয়ে কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ সংবাদ প্রকাশের পর একটি মহল সাংবাদিকদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়। ওই মহল তাদের ইচ্ছামত সংবাদ পরিবেশনের জন্য সাংবাদিকদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। কর্তব্যের তাগিদে সাংবাদিকরা চাপের কাছে নতী স্বীকার না করার অপরাধে ৮ ডিসেম্বর উপ-নির্বাচনের ফলাফল পাঠানোর সময় ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ৫০/৬০ জন সন্ত্রাসী সাংবাদিকদের লাঞ্ছিত ও অবরুদ্ধ করে রাখে। পরে পুলিশ এসে সাংবাদিকদের উদ্ধার করে। গৌওরাঙ্গ বাজারস্থ একটি ফ্যাক্স ফোনের দোকান থেকে দৈনিক মানবজমিনের সালেহউদ্দিন, জনকণ্ঠের মনির হায়দার, আজকের কাগজের মুহম্মদ আলম নির্বাচনের সংবাদ পাঠানো কালে ডেপুটি স্পীকারের সমর্থকরা তাদেরকে নাজেহাল করে। ফ্যাক্সের দোকান থেকে তাদেরকে জোরপূর্বক নিকটস্থ জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ আব্দুর রশিদের চেম্বারে আটকিয়ে রাখা হয়। যুবকদের মধ্যে ১০/১২ জন ছিল মাতাল। অতিরিক্ত মদ্যপান করে তারা সাংবাদিকদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। এ সময় তারা ভোরের কাগজের অম্লান দেওয়ানকে খোঁজাখুঁজি করে। তারা বলতে থাকে 'তোদের কারণে আমাদের ডেপুটি স্পীকারের সম্মান হানী হয়েছে।' এক পর্যায়ে তারা সাংবাদিকদের ডেপুটি স্পীকারের বাসায় তুলে নিয়ে যেতে চায়। এ সময় কিশোরগঞ্জ জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতিসহ একদল পুলিশ এসে সাংবাদিকদের উদ্ধার করে।

১২ ডিসেম্বর নগর ভবনে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের গুলি বিনিময়কালে ঘটনা, নানা অনিয়মের অভিযোগসহ এ বিষয়ে সংবাদপত্রে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হয়। ১৫ ডিসেম্বর সন্ত্রাসী দ্বারা মৃত্যুর হুমকি পেয়ে দৈনিক ঝিনাইদহ বাণী সম্পাদক কাজী গিয়াস আহমদ এবং দৈনিক অধিবেশনের সম্পাদক কাজী কদর পলাশ পুলিশ নিরাপত্তা কামনা করেন। মগবাজার, নয়াটোলা, মধুবাগ, মালিবাগ, টিএন্ডটি কলোনী এলাকায় সংঘটিত সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি সম্পর্কে মাসিক বিশেষ সংবাদ পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন প্রকাশ পায়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সন্ত্রাসীরা ১৪ ডিসেম্বর পত্রিকা অফিসে হামলা চালায় এবং তাদের মাদক ব্যবসায় ক্ষতি হওয়ার অজুহাতে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবী করে। সন্ত্রাসীরা পত্রিকা অফিস লক্ষ্য করে দু'রাউন্ড গুলিও বর্ষণ করে। বিষয়টি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমকে জানানো হলে মন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ কমিশনার ও আইজিপিকে নির্দেশ দেন। এ সংবাদ পেয়ে সন্ত্রাসীরা ১৭ ডিসেম্বর পুনরায় পত্রিকা অফিসে হামলা চালিয়ে প্রায় দু'লাখ টাকার মালামাল ক্ষতিসাধন করে। সন্ত্রাসীরা পত্রিকার সম্পাদক সায়েদুল ইসলাম বাদলের বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে হত্যার চেষ্টা চালায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্দেশ দেয়ার পরও পুলিশের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয় বলে ২৩ ডিসেম্বরের দৈনিক দিনকালে প্রকাশ।

www.pathagar.com

২৪ ডিসেম্বর সশস্ত্র সন্ত্রাসের তান্ডব চালিয়ে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের সাঙ্গ-পাঙ্গরা ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট চত্বরে অনুষ্ঠানরত কাদের সিদ্দিকীর কনভেনশনে হামলা চালায়। কাটা রাইফেল, পিস্তল, রিভলবার ও বন্দুকের মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণ এবং খইয়ের মতো অবিরাম বোমা ফাটিয়ে কনভেনশন পন্ড করে দেয়। কনভেনশনে এলোপাথাড়ী গুলিবর্ষণ ও হামলা করলে কাদের সিদ্দিকী সমর্থক দীন মোহাম্মদ, সুমন, শামসুদ্দিন, আব্দুর রশিদ, মোঃ রেজা, রইছ উদ্দিন, কামাল উদ্দিন আহমেদ, মোস্তাফিজ ইব্রাহীম, কাদেরসহ অন্তত ২০ জন গুলিবদ্ধ হয়। ছাত্রলীগের ক্যাডাররা কাদের সিদ্দিকীকে লক্ষ্য করে মঞ্চে গুলি ছুড়লে পাশে প্রেস গ্যালারিতে কর্তব্যরত দৈনিক খবরের স্টাফ রিপোর্টার তিমির দত্ত হাতে গুলিবিদ্ধ হন। এছাড়াও দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার সিদ্দিক, ইসলাম, দৈনিক বাংলার বাণীর রফিকুল ইসলাম সবুজ, দৈনিক মানবজমিনের শেখ মামুনুর রশীদ আহত হন। কনভেনশনে গুলি ও বোমা বর্ষণের তান্ডব শুরু হলে সেখানে উপস্থিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, কূটনৈতিক, সাংবাদিক ও ডেলিগেটবৃন্দ প্রাণ বাঁচাতে মাটিতে শুয়ে পড়েন। হামলার এক পর্যায়ে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা মঞ্চে রাখা মওলানা ভাসানীর প্রতিকৃতি লক্ষ্য করে গুলি করে। তারা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শামছুল হকের ছবিও ভাঙচুর করে।

২৯ ডিসেম্বর রাত আনুমানিক ১২টার পর পুলিশের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে একদল সন্ত্রাসী সাপ্তাহিক এভিডেন্স সম্পাদক মঞ্জুর এবং কনসাল্টিং এডিটর সাদেক খান অফিস কক্ষের গাস, কম্পিউটার রুম, এভিডেন্স অফিসের গাস, পত্রিকার গাড়ির পাকা গ্যারেজ ভেঙ্গে চুরমার করে। এমনকি পত্রিকা সাইবোর্ড ভাংচুর করে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং একটি গাড়ি ভাংচুর ও লুট করে।

৩০ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকসহ বেশ কিছু সংবাদপত্রে নিজ দলীয় ক্যাডারদের হাতে ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সাজ্জাদ হোসেন প্রহৃত হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত সংবাদের জের ধরে ১ জানুয়ারি ২০০০ দৈনিক ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার আনোয়ার আলাদীন দুপুর দেড়টার দিকে একাকী ডাকসু ভবনের সামনে দিয়ে মধুর ক্যান্টিনের দিকে যাবার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র, পাপ্পু ও জনৈক ছাত্রলীগ ক্যাডার তার পথরোধ করে দাঁড়ায় এবং প্রকাশিত সংবাদের জন্য তাকে চার্জ করে মারধর করে।

১ জানুয়ারি দৈনিক ইনকিলাবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ হানিফ সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য বিভ্রান্তিকর উল্লেখ করে মন্তব্য কনের, 'নগর ভবনের ঘটনা নিয়ে পত্রিকাগুলো নাটক করছে।' ১৬ জানুয়ারি ঝিনাইদহ থেকে প্রকাশিত দৈনিক বীর দর্পণ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক মীর ইলিয়াস হোসেন দিলীপ রাত ৮টায় শহরের পাগলাকানাই মোড়ে একটি চায়ের দোকানে বসে চা পান করার সময় একদল সন্ত্রাসীর গুলিতে দেহরক্ষী আলফাজসহ নিহত হন।

১৯ জানুয়ারি দৈনিক সংগ্রামের চট্টগ্রাম আনোয়ারা প্রতিনিধি মোঃ মুজাম্মেল হকের 'আনোয়ারা চোরাচালানীদের রাজত্ব ৫০ লক্ষ্যাধিক টাকার পচা চাল খালাস-পুলিশের বিরাট বখরা' শীর্ষক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর আনোয়ারা থানা ওসি ও সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে যায়। তাকে উক্ত সংবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছাপানোর চাপ প্রয়োগ করে এবং তাকে হুমকি প্রদর্শন করতে থাকে। মুজাম্মেল কর্তৃক উল্লেখিত সংবাদের প্রতিবাদ না ছাপানোর কারণে ২৬ জানুয়ারি হরতাল চলাকালে মুজাম্মেলকে

www.pathagar.com

গ্রেফতার করে। শত শত জনতার অনুরোধ উপেক্ষা করে পুলিশ তাকে বেদম প্রহার করে। পরে তাড়াতাড়ি করে তাকে কোর্ট হাজতে প্রেরণ করা হয়।

২২ জানুয়ারি সকালে দৈনিক দিনকালের গোপালগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি মাহাবুর হোসেন সালমাতকে সদর থানার কলাকৈড় গ্রামের একদল অস্ত্রধারী পূর্ব পরিকল্পিতভাবে রামদা ও রড দিয়ে মাথায় আঘাত করে গুরুতর আহত করে। এ সময় সন্ত্রাসীরা তার সোনার চেইন ও পরিচয়পত্র ছিনিয়ে নেয়।

২৯ জানুয়ারি দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশ, 'সড়ক ও জনপথ বিভাগ সুনামগঞ্জের নির্বাহী প্রকৌশলী এসডিও এবং সুনামগঞ্জ পৌরসভা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে বোল্ডার পাথর আত্মসাতের অভিযোগ এনে স্থানীয় সাপ্তাহিক স্বজন পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ফজলুল রহমান ফোরকান স্পেশাল ২/২০০০ নম্বর মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়েরের পর ২৩ জুলাই ১৯৯৯ মামলাটি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দুর্নীতি দমন বিভাগকে আদেশ দেয়া হয়। মামলার সংবাদ প্রচার হবার পর সাংবাদিক ফোরকান ও সংশ্লিষ্ট আইনজীবীকে টেলিফোনে অনবরত প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয়। সাপ্তাহিক স্বজনে সংশ্লিষ্ট মুসলিম সাংবাদিকদের কাফনের কাপড় ও হিন্দু সাংবাদিকদের কাষ্টের কাঠ সংগ্রহ করে রাখার জন্য বলা হয়।'

৩১ জানুয়ারি রাতে পেশাগত দায়িত্ব পালন শেষে বাগেরহাট প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক ভোরের কাগজের জেলা প্রতিনিধি শাহাদাত হোসেন বাচ্চু রিকশাযোগে বাড়ি ফিরলে বাড়ির পাশে একদল মুখোশধারী সন্ত্রাসী রিক্সা থেকে নামিয়ে তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়িভাবে কুপিয়ে জখম করে।

৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের আটতলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থান ও মিলনায়তন উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর আঘাত করে মন্তব্য করেন, 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মানে স্বেচ্চাচারিতা নয়-সাংবাদিকদেরও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকা উচিত।'

৮ ফেব্রুয়ারি দুপুর সাড়ে বারোটায় জাতীয় প্রেসক্লাব হতে পল্টন ময়দানে বিরোধী দলীয় এমপিদের অনশন কর্মসূচির প্রতি সংহতি প্রকাশের উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ, বিএফইউজের সভাপতি আমানুল্লাহ কবীর, মহাসচিব এমএম আজিজ, ডিইউজের সভাপতি আবু সালেহ, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন গাজী, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার মনিরুল আলম, সাবেক সভাপতি মোজাম্মেল হক, বিএফইউজের সাবেক সভাপতি সৈয়দ জাফর, সাবেক প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ দিদার বখতসহ ১৫/২০ জন সাংবাদিক নেতা ক্লাবের পূর্ব দিকের গেট দিয়ে বের হলে ডিএমপির ইউনিফর্মে একদল পুলিশ ক্লাব সংলগ্ন ফুটপাতে তাদের বাধা দেয়। নেতৃবৃন্দ ৭/৮ জন করে পৃথকভাবে হেঁটে দক্ষিণ দিকে যেতে থাকলে পুলিশ তাদের লাঠি দিয়ে পেটাতে উদ্যত হয়। নেতৃবন্দ তাদের বাধা দেয়ার কারণ জানতে চাইলে পুলিশ জানায়, 'উপরের নির্দেশ আছে। আপনারা এই পথে যেতে পারবেন না।' পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে নেতৃবৃন্দ সামনে এগুতে গেলে পুলিশ তাদের লাঠি দিয়ে পিটাতে উদ্যত হয়। এ সময় ফটো সাংবাদিক আসাদুজ্জামান আসাদ এ ছবি তুললে পুলিশ তার ক্যামেরা ছিনিয়ে নেয় এবং সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ তা উদ্ধার করেন। কথা কাটাকাটি ও বাধার মুখে নেতৃবৃন্দ ক্লাবের দক্ষিণে ডেসা অফিসের প্রায় কাছে গেলে একজন পুলিশ কর্মকর্তা সেখানে উপস্থিত হন এবং ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন। এরপর তিনি পুলিশকে পিছু হটান এবং সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ গন্তব্যে যেতে সক্ষম হন।

www.pathagar.com

একই দিনে দুপুর ১২ টায় দিলকুশা এলাকায় বঙ্গভবনের তিন নম্বর গেইটে পুলিশ দু'জন সাংবাদিককে নির্যাতন করে। ঘটনার বিবরণ হলো, পুলিশের একটি রিকুইজিশন করা মিনিবাসের ড্রাইভার বেপরোয়াভাবে বাস চালিয়ে ডেইলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার খাদেমুল ইসলাম হৃদয় ও দৈনিক বাংলার বাণীর বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার নুরুল করিম ভুঁইয়াকে ধাক্কা দেয়ার পর কিছুদূর গিয়ে এক বৃদ্ধ পথচারীকেও ধাক্কা দেয়। এ সময় ঐ সাংবাদিকদ্বয় বেপরোয়া গাড়ি চালানোর কারণ জিজ্ঞাসা করলে কয়েকজন পুলিশ কনস্টেবল তাদের কলার ধরে বাসের ভেতরে নিয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। সাংবাদিক পরিচয় পাবার পর মঞ্জু ও সাইদুর নামে দুই পুলিশ বলে ওঠে, 'সাংবাদিক পেটানোর মজাই আলাদা। এই দুইটারে রাজারবাগ নিয়া দু'মাস আটকাইয়া রাখা দরকার।' পরে তারা সাংবাদিক দু'জনকে বঙ্গভবনের মূল গেটে নিয়ে যায়। সেখানে এসআই সাঈদ ও এসআই কাসেমের কাছে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেবার পর তারা তাদের ছেড়ে দেয়।

১৭ ফেব্রুয়ারি ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা আওয়ামী সরকারের আমলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কতটুকু নাজুক ছিল তার প্রমাণ বহন করে। ভোর রাতে কুমিল্লা কতোয়ালী থানাধীন সুয়াগাজী এবং চৌদ্দগ্রামের ফকির বাজার নামক স্থানে দৈনিক ইনকিলাব ও যুগান্তর পত্রিকাবাহী বাসে দুর্ধর্ষ ডাকাতি হয়। ডাকাতরা পত্রিকা দু'টির সাংবাদিক, কর্মচারী ও যাত্রীদের মারধর করে নগদ লক্ষাধিক টাকাসহ মালপত্র নিয়ে যায়। ইনকিলাববাহী বাসে ডাকাতরা ভাংচুর করে। ডাকাতরা রাস্তায় গাছের গুড়ি ফেলে বাসের গতিরোধ করে পিস্তল, পাইপগান ও ছুড়ি নিয়ে বাসের ভেতরে ঢুকে পড়ে। ডাকাতদের দু'টি দলের প্রতিটিতেই ১০/১২ জন করে ডাকাত ছিল। তারা অস্ত্রের মুখে বাসের আরোহীদের কাপড়-চোপড়, মালপত্র ও টাকা ছিনিয়ে নেয়। ইনকিলাব প্রতিনিধি ও সাপ্তাহিক পূর্ণিমার স্টাফ রিপোর্টার মাহমুদ কাসেমের হাত ঘড়ি, জ্যাকেট, মানিব্যাগসহ নগদ ২২শ' টাকা, ফটো সাংবাদিক ওয়াজেদ আহসান খোকনের স্যুয়েটার ও নগদ ৮৫০ টাকা, যুগান্তর পত্রিকার ক্রাইম রিপোর্টার পিনাকি দাস গুপ্ত, ফটো সাংবাদিক এসএম গোর্কির ৪৭শ' টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ফেনীতে বিষাক্ত স্পিরিট পানে মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত করতে পত্রিকাবাহী বসে করে সাংবাদিকরা সেখানে যাচ্ছিলেন। ডাকাতরা ইনকিলাববাহী বাসের কন্ডাক্টরকে আটক করে। বাসের অন্যান্য যাত্রীদের সবার কাছ থেকেই মালামাল কেড়ে নেয়।

১৮ ফেব্রুয়ারি দৈনিক দিনকালে 'সন্ত্রাসের জনপদ নারায়ণগঞ্জ' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত আরেকটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, 'আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছুই নেই, প্রতি সাড়ে চারদিনে একজন খুন হচ্ছে।' অব্যাহতভাবে নারায়ণগঞ্জের প্রকৃত অবস্থা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ পাওয়ায় স্থানীয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক একে এম শামীম ওসমান মনক্ষুণ্ণ হন। ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কোনো প্রতিবেদনে এমপির সংশ্লিষ্টতার কথা উল্লেখ করে কোনো তথ্য প্রকাশ না পেলেও তিনি নারায়ণগঞ্জের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট (দক্ষিণ) আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট অশোক কুমার বিশ্বাসের আদালতে দৈনিক দিনকালের সম্পাদক আখতার-উল-আলম, ব্যবস্থাপক সম্পাদক একেএম মোশাররফ হোসেন, প্রকাশক অধ্যাপক মাজিদুল ইসলাম এবং সংবাদদাতা শামসুল আলম লিটনের বিরুদ্ধে দন্ডবিধি আইনের ৫০০/৫০১/১০৯ ধারায় একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করেন। মিথ্যা, অসত্য, বিভ্রান্তিকর ও মানহানীকর সংবাদ পরিবেশনের অভিযোগে আদালত বাদীর জবানবন্দী গ্রহণক্রমে সকল আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলে গ্রহণ করে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন।

www.pathagar.com

২৩ ফেব্রুয়ারি তেজগাঁও রেললাইন সংলগ্নে বস্তি উচ্ছেদ অভিযানকালে প্রায় ৪ ঘন্টাব্যাপী পুলিশ ও বস্তিবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষে কাওরান বাজার থেকে মহাখালী পর্যন্ত পুরো তেজগাঁও এলাকা এক রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পুলিশের গুলি, টিয়ারগ্যাস, লাঠিচার্জ আর বস্তি বাসীদের বোমা ও ইটপাটকেলের আঘাতে ৬ জন গুলিবিদ্ধসহ অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। আহতদের মধ্যে দৈনিক আজকের কাগজের ফটো সাংবাদিক আকতার হোসেন, যুগান্তরের শামীম নূর, ভোরের কাগজের সাইফুল ইসলাম ছিলেন।

২ মার্চ এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে শাহজাদপুর উপজেলার পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে শাহজাদপুর স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্য অধ্যাপক আবুল কাশেমের পুত্র কর্তৃক নকল সরবরাহের ছবি তোলার কারণে দৈনিক ভোরের কাগজের প্রতিনিধি কবির আজমল বিপুল এবং সংবাদের নিজস্ব সংবাদদাতাকে আটক রাখা হয়। আটকের এক পর্যায়ে স্থানীয় জাতীয় সংসদ সদস্যের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচয়দানকারী অধ্যাপক আবুল কাশেম ও মহাদেব সাহা সাংবাদিক দু'জনের ওপর চড়াও হয়। খবর পেয়ে অন্য সাংবাদিকগণ ঘটনাস্থলে এসে আটককৃত দুইজনকে উদ্ধার করে। (সূত্র ঃ দৈনিক জনতা ১২ মার্চ ২০০০)

৭ মার্চ রাত ২ টায় নারায়ণগঞ্জের বিশিষ্ট সাংবাদিক মোঃ জাকির হোসেনের টানবাজার বেনী বাগানস্থ বাড়িতে নারায়ণগঞ্জ থানার এসআই আক্তারুজ্জামানের নেতৃত্বে স্থানীয় কতিপয় আওয়ামী সন্ত্রাসী একযোগে হামলা চালায়। তারা বাড়ি ঘরের দরজা-জানালা ও আসবাবপত্র ভাংচুর করে। বিএনপি সমর্থক সাংবাদিক জাকিরের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনো গ্রেফতারী পরোয়ানা দেখাতে পারেনি। নারায়ণগঞ্জ আইন কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্রী জাকিরের ছোট বোন হামিদা খাতুন লিজার সাথে পুলিশ ও সন্ত্রাসীরা দুর্ব্যবহার করে। ঘটনার সময় সাংবাদিক জাকির বাসায় ছিলেন না। একই দিকে নারায়ণগঞ্জে দৈনিক দিনকালের প্যাকেট লুট করে সরকারি দলের লোকেরা হকাররা যাতে দিনকাল বিক্রি না করে সে জন্য হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়।

৮ মার্চ রমনা থানার একজন সাব ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে একদল পুলিশ ৪৪১/১ তেজগাঁও শিল্প এলাকায় অবস্থিত দৈনিক দিনকাল অফিসে হামলা করে। কোনো রকম অনুমতি না নিয়ে এসআই আব্দুন নুরের নেতৃত্বে পুলিশের ১৩/১৪ জন সদস্য দিনকাল অফিসে ঢুকে পড়ে। সশস্ত্র পুলিশ সদস্যদের বেশির ভাগই ছিল সাদা পোশাকে। বেলা আড়াইটার দিকে পুলিশ গেটে আসলে কর্তব্যরত দারোয়ান তাদের বাধা দেয়। দারোয়ান তাদের আসার কারণ জানতে চায়। দারোয়ান পুলিশদের জানান, অফিসে প্রবেশ করতে হলে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাগবে। কিন্তু এসআই ও পুলিশরা দারোয়ানকে ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে অফিসে ঢুকে পড়ে। পুলিশরা মুহূর্তের মধ্যে বার্তা কক্ষ, কম্পিউটার কক্ষসহ অফিসের বিভিন্ন কক্ষে ঢুকে পড়ে। তারা পত্রিকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক একেএম মোশাররফ হোসেন এমপি, প্রকাশক অধ্যাপক মাজিদুল ইসলাম এবং স্টাফ রিপোর্টার শামসুল আলম লিটনের নাম উল্লেখ করে তাদের উদ্দেশ্য করে অশোভন মন্তব্য করে। এক পর্যায়ে বার্তা কক্ষে ঢুকে কয়েকজন পুলিশ আসবাবপত্র তছনছ করে। কয়েকজন পুলিশ কম্পিউটার কক্ষে প্রবেশ করে তছনছ করে। পুলিশ দারোয়ানের বাধা ডিঙ্গিয়ে বার্তাকক্ষে প্রবেশ করলে কর্তব্যরত সাংবাদিকরা তাদের আগমনের কারণ জানতে চায়। তারা এ সময় সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। এক পর্যায়ে পুলিশ জানায়, তারা নারায়ণগঞ্জে শামীম ওসমানের দায়ের করা একটি মামলায় অভিযুক্ত সাংবাদিক ও পরিচালনা কর্তৃপক্ষের লোকদের গ্রেফতার করতে এসেছে। পুলিশ প্রায় ১ ঘন্টা দৈনিক দিনকাল অফিস অবরোধ করে রাখে। পুলিশী হামলায় পত্রিকার কাজের পরিবেশ

www.pathagar.com

বিঘ্নিত হয়। দিনকালের নির্বাহী পরিচালক তারেক রহমান এ সময় অফিসে ছিলেন। খবর পেয়ে তিনি বার্তা কক্ষের দিকে এগিয়ে যান। এসআইকে তিনি দিনকালে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে এসআই জানান, 'তারা জনাব মোশাররফ এবং শামসুল আলমকে গ্রেফতার করতে এসেছেন।' এ সময় জনাব তারেক রহমান বলেন, 'সংবাদপত্র অফিসে প্রবেশ করতে গেলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হয়। আপনারা অনুমতি না নিয়ে কেন প্রবেশ করলেন?' তিনি এও বলেন যে, 'দিনকালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক একজন সংসদ সদস্য। তাকে গ্রেফতার করতে কি সংবাদপত্র অফিসে হামলা করতে হবে? এ ছাড়া দিনের বেলায় রিপোর্টাররা অফিসে থাকেন না।' তারেক রহমান বলেন, 'আপনারা এসব না জেনেই অফিসে ঢুকে পড়েছেন।' রমনা থানার অফিসার হওয়া সত্ত্বেও তিনি তেজগাঁও কেন এলেন এ প্রশ্নের জবাবে এসআই জানান, তার সঙ্গে তেজগাঁও থানার পুলিশও রয়েছে। এক পর্যায়ে এসআই পুলিশদের নিয়ে দিনকাল অফিস ত্যাগ করেন।

৯ মার্চ দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত তথ্য, 'ইংরেজি এভিডেন্সের কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছেন যে, পত্রিকাটি সচিবালয়ে প্রদান করতে দেয়া হচ্ছে না। পূর্বে সচিবালয়ের পদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়মিতভাবে এভিডেন্সের সৌজন্য সংখ্যা দেয়া হতো। কিন্তু আকস্মিকভাবে পত্রিকাটি সচিবালয়ে বন্টন করতে বাধা দেয়া হচ্ছে।

১২ মার্চ ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় দৈনিক মানবজমিনের রূপগঞ্জ প্রতিনিধি এসএ সোহেলকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ২০ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জাপান টাইমসের ঢাকাস্থ সংবাদদাতা ও দৈনিক দিনকালের কূটনীতিক প্রতিনিধি মোখলেছুর রহমান চৌধুরী ক্লিনটনকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন প্রশ্নের জবাব দেন। মোখলেস সরকারি সিদ্ধান্ত অমান্য করে ক্লিনটনকে প্রশ্ন করছিলেন। অঘোষিত সরকারি সিদ্ধান্ত ছিল তাদের মনোনীত দু'জন সাংবাদিক প্রশ্ন করার সুযোগ পাবেন। একজন সুযোগ পান। অন্যজন পাননি মোখলেসের কারণে। কারণ চারটি প্রশ্নের মধ্যে দুটো ঢাকার, দু'টি বাইরের সাংবাদিকদের করার কথা ছিল। মোখলেস যখন প্রশ্ন করতে দাঁড়ান তখন প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তার প্রেস সেক্রেটারী জাওয়াদুল করিম বার বার তাকে বসতে বলেন। এ কারণে তাকে মাইকও দেয়া হচ্ছিলো না। বিষয়টি ক্লিনটনের নজরে পড়লে তিনি মোখলেসকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেন। সাথে সাথে তাকে ক্লিনটনের প্রেস সেক্রেটারীর পক্ষ থেকে মাইকও দেয়া হয়। সরকারি কর্মকর্তারা যে বিষয়টিকে সহজে নেননি তা ক্লিনটনের বুঝতে বিন্দুমাত্রও কষ্ট হয়নি। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি ঢাকাস্থ মার্কিন কূটনীতিকদেরকে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের ওপর দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দেন। পরদিন রাষ্ট্রদূত জন সি হোলজম্যান মোসলেমকে দূতাবাসে ডেকে নিয়ে সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হন। মোখেলেস জানান, তাকে হুমকি দেয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রদূত বলেন, 'দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি।' (সূত্র ঃ দৈনিক মানব জমিন ২৫ মার্চ ২০০০)

১ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলে ২/৩ দিন যাবত পানি না থাকায় হলের ছাত্রীরা ঢাকা মহানগরীতে বোতল, জগ ও গ্লাস নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি নিউমার্কেট, নীলক্ষেত ও ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে ভিসি আজাদ চৌধুরীর ভবনের সামনে অবস্থান নেয় এবং একঘন্টা ঘেরাও করে রাখে। এরপরও ভিসি ছাত্রীদের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে না আসায় ছাত্রীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং গেট ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকার চেষ্টা চালায়। এ সময় পুলিশ ছাত্রীদের ওপর লাঠিচার্জ শুরু করে। লাঠিচার্জের ছবি তুলতে গেলে

www.pathagar.com

পুলিশ সার্জেন্ট হায়দার আলী মানবজমিনের ফটো সাংবাদিক বোরহানউদ্দিনকে ওয়্যারলেস সেট দিয়ে নাক ফাটিয়ে দেয় এবং দৈনিক সংবাদের ফটো সাংবাদিক সোহরাবকে উপর্যুপরি কিল-ঘুষি মারে। এ ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে ছাত্রীরা চেয়ার ও জুতা ছুঁড়ে পুলিশকে ধাওয়া করে। এক পর্যায়ে পুলিশ ছাত্রীদের ধাওয়া খেয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

দৈনিক দিনকাল 'সন্ত্রাসের আরেক জনপদ লক্ষ্মীপুর' শীর্ষক একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। ধারাবাহিক প্রতিবেদনের শেষ কিস্তি প্রকাশিত হয় ২৪ মে। শেষ কিস্তির এক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'মন্ত্রী-এমপিদের মাসে প্রায় ১৫ লাখ টাকা দিতে হয়। এর মধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমকে ৫ লাখ, হারুন অর রশীদ এমপিকে ২ লাখ, যুবলীগের কেন্দ্রীয় নেতা কাজী ইকবালকে ১ লাখ টাকা দেয়া হয়। এছাড়া মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরকে নানাভাবে খুশি রাখা, পৌরসভার চেয়ারম্যানশীপ টিকিয়ে রাখতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী জিল্লুর রহমানকে প্রতি মাসে ভ্যাট প্রদান ছাড়াও প্রতিরাতে জেলা সার্কিট হাউস মদ-নারীর আসর জমিয়ে রাখতে হয়। কাজেই কেন্দ্রকে খুশী রেখে যা করা দরকার সবই করা হবে।' দিনকালে প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী যিনি মন্ত্রী-এমপিকে সংশ্লিষ্ট করে মন্তব্য করেছেন তিনি হলেন স্বঘোষিত লক্ষ্মীপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান। প্রতিবেদনের তথ্য মতে, 'গডফাদারের কুকীর্তি সম্পর্কিত কোনো সংবাদ পরিবেশন করা হলে তার সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে স্থানীয় সাংবাদিকদের প্রতিনিয়ত হুমকি দেয়া হয়। বহুল প্রচারিত একটি জাতীয় দৈনিকের সাংবাদিক ছাড়া অন্যরা গত ৩ বছর এই পরিস্থিতির শিকার হন।

২৯ মে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের বিদেশ থেকে দেশে ফেরার ৩ ঘন্টার মধ্যেই কোনো মামলা বা ওয়ারেন্ট ব্যতীত দৈনিক আজকের কাগজের সিনিয়র রিপোর্টার আমিনুর রহমান তাজকে প্রতারণামূলক নাটক ও অভিনয়ের মধ্যদিয়ে গ্রেফতার করে পুলিশ। ১৮ মে দৈনিক আজকের কাগজে 'পুলিশ প্রশাসনে দু'বান্ধবীর ৪ কোটি টাকার মিশন' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের কারণে এ নির্যাতন নেমে আসে তাজের ওপর।

আমিনুর রহমান তাজের 'পুলিশ প্রশাসনে দু'বান্ধবীর ৪ কোটি টাকার মিশন' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছিল, 'এই দুই বান্ধবীর একজন ক্ষমতাসীন সরকারের এক মন্ত্রীর স্ত্রী। অন্যজন ঢাকা মহানগর পুলিশের শীর্ষ পর্যায়ের এক কর্মকর্তার পত্নী। এরাই দু'জন ঢাকা মহানগর পুলিশের ওসি পদে রদবদলের নেপথ্যে ভূমিকা পালন করছে। শুধু রদবদল নয়, পুলিশের দারোগা ও কনস্টেবল নিয়োগেও এর বড় ধরনের ভূমিকা পালন করছে। মোটা অংকের লেনদেনের বিনিময়ে এরা এসব অপকর্মগুলো করে বেড়াচ্ছে।' রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, ৪ কোটি টাকার টার্গেট নিয়ে এই দু'বান্ধবী মাঠে নেমেছে। ইতোমধ্যেই ১ কোটি টাকারও বেশি অর্থ তারা পকেটস্থ করেছে। ৮ জন ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে ঢাকা মহানগর পুলিশের পদস্থ করার জন্য এই দুই বান্ধবী ৪০ লাখ টাকা উৎকোচ নিয়েছেন। এদের মধ্যে ৪ জনকে মতিঝিল, তেজগাঁও, উত্তরা ও রমনার ওসি পদে পদস্থ করা হয়। এই দু'বান্ধবীর মিডলম্যান হিসেবে কাজ করছে ঢাকা রেঞ্জের ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার এক কর্মকর্তা। এ কারণে তাকেও ৫ লাখ টাকা দেয়া হয়। প্রকাশিত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, ঢাকা মহানগর পুলিশের এই শীর্ষ কর্মকর্তা পটুয়াখালী জেলার এসপি থাকাকালে তার মহিলা সিভিল স্টেনোর সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। পরে ওই স্টেনোকে পটুয়াখালী পুলিশ লাইনে প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে বিধি বহির্ভূতভাবে নিয়োগ দেন।

www.pathagar.com

ঘটনার দিন ডিবির মিন্টো রোডস্থ অফিস থেকে ডাক পড়ায় তাজ ভেবেছিলেন পেশাগত কোন কাজে তার ডাক এসেছে। সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে জনৈক রোগীকে তাজের রক্ত দেয়ার কথা ছিল। এ কারণে তিনি তাড়াতাড়ি ডিবি অফিসে গিয়ে এসি পিআরের কক্ষে যান। এসি পিআর তাজকে তার রুমে বসিয়ে রেখে ডিসি ডিবির সাথে টেলিফোনে কথা বলেন। টেলিফোনের কথা শেষ করে তিনি তাজকে তার কক্ষে কিছুক্ষণ বসে থাকার অনুরোধ করেন। কিন্তু তাজ এসি পিআরের কক্ষে বসে না থেকে সরাসরি ডিসি ডিবির সাথে দেখা করতে যান। এ সময় তার সাথে একজন পুলিশ কর্মকর্তা ও দু'জন কনস্টেবলও ছিলেন। তারা তাজকে ডিবির এক নম্বর টিমের কক্ষে নিয়ে যায়। এ সময় তিনি সাথে থাকা পুলিশদের জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনারা আমার সাথে সাথে আসছেন কেন?' উত্তরে তারা বলেন, 'ডিসি স্যার আপনাকে তার কাছে নিয়ে যেতে বলেছেন।' এক পর্যায়ে তাজ বিষয়টি বুঝতে পেরে ডিবি অফিস থেকে চলে যাওয়ার জন্য রুম থেকে বেরিয়ে আসেন। ঠিক তখনই ডিবির ইন্সপেক্টর ওয়াহিদুজ্জামান তাকে জানান, 'উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আপনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।' এরপরই তাকে সকল ১১টায় ডিবি পুলিশের ডিসি মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান এবং এসি পিআর মোরশেদ আলম ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে জোরপূর্বক পুলিশের গাড়িতে তুলে রমনা থানায় নিয়ে যান। তাজ মামলা দায়ের-এর কাগজপত্র বা কারণ জানতে চাইলে পুলিশ তা দেখাতে পারেনি।

তাজের গ্রেফতারের সংবাদ পেয়ে সাংবাদিকরা দুপুর ১টায় রমনা থানায় হাজির হন। সাংবাদিকরা রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমানের রুমের সামনে ডিউটি অফিসারের কক্ষে বসে অবরোধ গড়ে তোলেন। তারা গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। তারা বারবার পুলিশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দিতে থাকে। বিক্ষুব্ধ হয়ে ওসির কাছে জানতে চান তাজকে কি কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওসি জানান, '৫৪ ধারায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে।' সাংবাদিকরা কি অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, '১৮ মে দৈনিক আজকের কাগজে প্রকাশিত সংবাদের কারণে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।' ওসি জানান, 'এ ব্যাপারে আমি আর কিছুই জানি না। ডিবি পুলিশ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাকে গ্রেফতার করে আমাদের কাষ্টডিতে পাঠিয়েছেন।' এ সময় সাংবাদিক এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের সাথে পুলিশের কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে ওসি ওয়ারলেস সেটে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান। এদিকে সাংবাদিকদের এই গ্রেফতারের কারণ জানাতে ব্যর্থ হয়ে পুলিশ কমিশনার এম মতিউর রহমান দুপুর পৌনে ২টায় নিজে বাদী হয়ে সিএমএম কোর্টে তাজসহ ২ জনকে আসামী করে দন্ডবিধি ৫০৯/৫০১/৫০২/৫০৩ ধারায় মামলা দায়ের করেন। দায়েরকৃত মামলায় বলা হয়, 'প্রকাশিত সংবাদে পুলিশের মানহানিকর ঘটনা ঘটেছে।' মামলা দায়ের করার পর পর তিনি রমনা থানার ওসিকে ওয়্যারলেসে জানিয়ে দেন তাজকে এই মানহানির মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে। এরপর ওসি সাংবাদিকদের জানান 'তাজকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করা হয়নি। তার বিরুদ্ধে সুস্পষ্টভাবে মামলা থাকায় ডিবি পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে।' এ সময় বিক্ষুব্ধ সাংবাদিকরা পুলিশের বিরুদ্ধে চিৎকার করে শ্লোগান দিতে থাকেন। এক পর্যায়ে থানায় পুলিশ ছুটে এসে সাংবাদিকদের বাধা দেন। এ সময় সাংবাদিক ও পুলিশের দুই পক্ষের ধাক্কাধাক্কির এক পর্যায়ে থানার দু'টি জানালার কাঁচ ভেঙ্গে যায়। যা পুলিশ সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে করে এবং

www.pathagar.com

সাংবাদিকদের জননিরাপত্তা আইনে মামলায় ঢুকিয়ে জেলে আটকে রাখার হুমকি দেয়। যার অংশ হিসেবে এ ঘটনার ব্যাপারে রমনা থানায় জিডি করে রাখা হয়।

বিকাল ৫টায় সাংবাদিকরা রমনা থানা থেকে মিছিল সহকারে প্রেসক্লাবে যান। তারা রাস্তার ওপর অবস্থান নেন। সেখানে ঘোষণা করা হয়, তাজের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত তারা রাস্তা ছাড়বেন না। এ সময় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিট ও ক্রাইম রিপোর্টার্স এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। অবস্থান ধর্মঘট চলাকালীন অবস্থায় সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ খবর আসে তাজ জামিনে মুক্তি পেয়েছেন।

৩১ মে আজকের কাগজের ক্রাইম রিপোর্টার আমিনুর রহমান তাজের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ষড়যন্ত্রমূলক মামলা প্রত্যাহার এবং মহানগর পুলিশ কমিশনার মতিউর রহমানকে অপসারণের দাবীতে ক্রাইম রিপোর্টার্স এসোসিয়েশনের একটি প্রতিনিধি দল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের কার্যালয়ে স্মারকলিপি দিতে গেলে তিনি বলেন, 'আজকের কাগজ পত্রিকায় আমার স্ত্রীকে জড়িয়ে রিপোর্ট করা হয়েছে। এরই নাম হলুদ সাংবাদিকতা।' আজকের কাগজের সিনিয়র রিপোর্টার তাজকে গ্রেফতার করার কথা পরোক্ষভাবে স্বীকার করে মন্ত্রী বলেন, 'পুলিশের দুর্নীতির খবর লিখলে আমি কিছুই বলতাম না। এটা পুলিশের ব্যাপার। কিন্তু আমার ঘর ও আমার স্ত্রীকে জড়ানো হয়েছে।' সাংবাদিকদের দেয়া স্মারকলিপির জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'কমিশনার অপসারণে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত দরকার। তবে আপনারা আমার বিষয় দেখুন, আমিও আপনাদের দাবী বিবেচনা করব।' তিনি বলেন, 'আজকের কাগজ ১৮ মে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে সেটি দিনকাল প্রকাশ করলে মেনে নিতে পারতাম। কিন্তু কাজী শাহেদের পত্রিকাতেই ছাপলো।' মন্ত্রী বলেন, 'হলুদ সাংবাদিকতা বন্ধ করুন। এর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতকারী প্রতিনিধি দলে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা জাকারিয়া মিলন, সভাপতি পারভেজ খান, সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম কাঞ্চন, সাংগঠনিক সম্পাদক মনওয়ার জাহান, নির্বাহী সদস্য সালেহ শিবলী, মোহসিন করিম লেবু, সাধারণ সদস্য মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম ছিলেন।

ডাক ও টেলি যোগাযোগ এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ২৬ এপ্রিল থেকে ৪ মে পর্যন্ত 'টিএন্ড টি মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি' সম্পর্কে ৮টি প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য প্রতিবাদ না পাঠিয়ে মামলার হুমকি দিয়ে দৈনিক দিনকালের সম্পাদক আখতার-উল-আলম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক একেএম মোশাররফ হোসেন, বিশেষ সংবাদদাতা রেজা রায়হান এবং প্রকাশক অধ্যাপক মাজিদুল ইসলামকে লিগ্যাল নোটিশ পাঠান (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ২ জুন ২০০০)

বিনা ওয়ারেন্টে ক্রাইম রিপোর্টার্স এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি তাজকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদানকালে সাংবাদিকদের কটাক্ষ করে মন্তব্য করায় দু'দফা ইস্যুতে আন্দোলন করায় বিভিন্ন দৈনিকের সাংবাদিকদের অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তিরা প্রাণনাশের হুমকি দেয়। ৪ জুন এসোসিয়েশনের সভাপতি পারভেজ খান (প্রথম আলো), সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম কাঞ্চন (যুগান্তর), সহ-সভাপতি শামসুল সালেহীন (জনতা), সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ মনওয়ার জাহান (দিনকাল), গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক শেখ নজরুল ইসলাম (ডেইলী স্টার), কার্য নির্বাহী কমিটির সদস্য মহসিনুর করিম লেবু (মুক্তকণ্ঠ), আজকের কাগজ পত্রিকার চীফ রিপোর্টার মেজবাহ আহমেদ, জনকণ্ঠের সিনিয়র রিপোর্টার শংকর কুমার দে, দৈনিক সংবাদের রিপোর্টার হারুন-উর-রশিদ, ভোরের কাগজের রিপোর্টার মর্তুজা হায়দার লিটন ও বাংলার বাণীর রিপোর্টার মাহমুদুর রহমানকে হুমকি দেয়ার কারণে মতিঝিল থানায় সাধারণ ডাইরী করেন।

www.pathagar.com

দৈনিক আজকের কাগজের সিনিয়র ক্রাইম রিপোর্টার হিসেবে কাজ করার অপরাধে গণপূর্ত অধিদফতরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (প্রকল্প বিভাগ-২) আমিনুর রহমান তাজকে ৭ জুন সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। এ নির্দেশ ২৯ মে থেকে কার্যকর হওয়ার কথা অধিদফতরের প্রধান প্রকৌশলী এ.কে.এম. মুকিতুর রহমান বাসসকে ৬ জুন জানান।

১১ জুন প্রধানমন্ত্রীর ঝালকাঠি সফরকে কেন্দ্র করে ঝালকাঠিতে ব্যাপক চাঁদাবাজি সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করার কারণে একদল ছাত্রলীগ কর্মীরা রাত ৯টার দিকে সদর রোডের চৌমাথা এলাকায় দৈনিক মানব জমিনের ঝালকাঠি প্রতিনিধি এম.এ. মোতালেবকে বেদম প্রহার করে। গুরুতর আহত অবস্থায় সাংবাদিক মোতালেবকে ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানেও চড়াও হয় ছাত্রলীগ কর্মীরা। তারা আহত সাংবাদিককে হাসপাতাল থেকে বের করে দেয়। প্রাণ রক্ষায় সাংবাদিক মোতালেব আত্মগোপন করতে বাধ্য হন।

২০ জুন 'আমার ফাঁসি চাই'-গ্রন্থের লেখক মতিউর রহমান রিন্টুকে হত্যার চেষ্টা চালানো হয়। একদল সন্ত্রাসী ফরাশগঞ্জের ৯ বিকে দাস রোডের একটি দোকানে গুলি করে রিন্টুর শরীরের অংশ বিশেষ ঝাঝরা করে দেয়। অল্পের জন্য তিনি প্রাণে রক্ষা পান। ২৬ জুন যশোরের মনিরামপুরের সাংবাদিকদের থানায় প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল থানার ওসি আলী আযম। পেশাগত দায়িত্ব পালনে বাধা পেয়ে সাংবাদিকরা জোটবদ্ধ ভাবে থানার খবরাদি প্রকাশ থেকে বিরত থাকেন। ফলে ওসি ক্ষিপ্ত হন। ক্ষিপ্ততার জের হিসেবে ওসি স্থানীয় দৈনিক রানারের সাংবাদিক আব্দুল মতিনকে থানায় ডেকে এনে বেধড়ক মারপিট করে।

২৮ জুন দুপুরে সদর পোস্ট অফিসের সামনে থেকে বরিশালের হিজলা থানা পুলিশ কোনো কারণ ছাড়াই বিনা ওয়ারেন্টে দৈনিক দিনকালের হিজলা সংবাদদাতা মোশাররফ হোসেন কামালকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পর থানার ওসি নেসার উদ্দিন দিনকালের সংবাদদাতার ওপর থানায় বেদম প্রহারসহ অমানবিক নির্যাতন চালায়।

গুলশান থানায় রুজু করা তরুণ ব্যবসায়ী ইফতেখার আহমদ শিপুর হত্যাকান্ডের অভিযুক্ত শফিউল সন্দেহে ১৪ জুন দৈনিক প্রথম আলোর রিপোর্টার সাইফ ইসলাম দিলালকে কলকাতা পুলিশ গ্রেফতার করে। দিলাল হৃদ রোগের চিকিৎসার জন্য একদিন পূর্বে নাইট কোচে ঢাকা থেকে বাসযোগে কলকাতায় যেয়ে তালতলা থানার কাছে নিউ সিটি লজ হোটেলে উঠেছিলেন। ঢাকায় সাইফুলের কাছ থেকে এ তথ্যটি জেনে নিয়েছিলেন আওয়ামী লীগের জনৈক প্রভাবশালী সংসদ সদস্যের এক পুত্র। অবশ্য কামাল আহমদ মজুমদার নন। ঢাকা থেকে গোয়েন্দা পুলিশ শিপু হত্যা মামলার আসামী শফিউলের ছবি কলকাতা পুলিশকে সরবরাহ করেছিল। দিলালের পাসপোর্টে সাইফুল ইসলাম নামের আগে এমডি কথাটি রয়েছে। কিভাবে পুলিশের মাধ্যমে বিকৃত হয়ে কলকাতা পুলিশের কাছে এসেছিল তা গ্রেফতারের খবর শুনে বোধগম্য হয়নি দিলালের। ১৪ জুন রাতে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করার পর তিনি তার সমস্ত কাগজপত্র দেখিয়ে সাংবাদিক পরিচয়ও দিয়েছিলেন। এমনকি তার পাসপোর্টে এনডোর্স করা ৬শ' ডলারও দেখান। তবুও পুলিশ বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী শিপু হত্যা মামলার আসামী সন্দেহে তাকে গ্রেফতার করে। আওয়ামী লীগের এমপি কামাল আহমেদ মজুমদারের পুত্র জুয়েলসহ শফিউল এই হত্যা মামলায় অভিযুক্ত। কোলকাতা গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেফতারের ব্যাপারে বার বার জানিয়েছে যে, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করার পরই দিলালকে গ্রেফতার করা হয়েছে।' একজন সাংবাদিককে কলকাতায় আটক করা

www.pathagar.com

সত্ত্বেও ঢাকা থেকে দূতাবাসে কোনো নির্দেশ পাঠানো হয়নি খবর জানার জন্য। ঘটনার সাতদিন পর কলকাতাস্থ বাংলাদেশের উপ-দূতাবাস থেকে বলা হয়েছে, 'খোঁজ নেয়া হচ্ছে।'

১৬ জুলাই রাত ৮টা ২০ মিনিটে অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা দৈনিক জনকণ্ঠের যশোর জেল রোডস্থ অফিসে ঢুকে স্থানীয় প্রতিনিধি ও সিনিয়র সাংবাদিক শামছুর রহমানকে গুলি করে হত্যা করে। ২৯ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর চট্টগ্রাম সফর কার্যক্রমে স্থানীয় কর্মরত জাতীয় পত্রিকার সাংবাদিকদের বয়কট করা হয়। ফলে অধিকাংশ সাংবাদিক প্রধানমন্ত্রীর সফরসূচি কভার করতে ব্যর্থ হয়। প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীর সফর কার্যক্রম কভার করতে কর্তব্যরত সাংবাদিকদের জন্য তথা দফতরের লিষ্ট অনুযায়ী পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ ইস্যু করে সিকিউরিটি পাস। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে নিরাপত্তায় নিয়োজিত এসএসএফ হঠাৎ আবিষ্কার করে চট্টগ্রামের সাংবাদিকরা প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ। তাই এসএসএফ সিদ্ধান্ত নেয় স্থানীয় সংবাদপত্রের ২/৩ জন সাংবাদিক ছাড়া অন্য কোনো সাংবাদিককে প্রধানমন্ত্রীর সফর কার্যক্রমের খবর সংগ্রহ করার জন্য অনুষ্ঠান স্থলে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। এসএসএফের নির্দেশ পেলে স্পেশাল ব্রাঞ্চ সিকিউরিটি চট্টগ্রামে কর্মরত জাতীয় পত্রিকার রিপোর্টারদের নামে পাস ইস্যু থেকে বিরত থাকে। এসএসএফ সাংবাদিকদের প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান কভার করতে দেয়নি তথাকথিত নিরাপত্তার নামে, অথচ সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রীর দু'টি অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা পাস নিয়ে উপস্থিত ছিল হত্যা মামলাসহ একাধিক মামলার যুবলীগ ও ছাত্রলীগ নামধারী বেশ কিছু নেতা-কর্মী, ক্যাডার ও অস্ত্রবাজ। (সূত্র ঃ দৈনিক মানবজমিন ২ জুলাই ২০০০)

৬ আগষ্ট দৈনিক সংগ্রামের চাঁদপুর-সংবাদদাতা শাহজাহানের উপর আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে গুরুতরভাবে আহত করে। সন্ধ্যায় মাগরিবের নামায শেষে মসজিদ থেকে বের হলে তার উপর আওয়ামী সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে তার মাথা ফাটিয়ে দিলে তাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

১৩ আগষ্ট দিনগত গভীর রাতে দৈনিক ইনকিলাবের যশোর ব্যুরো চীফ মিজানুর রহমান তোতাকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতারে করা হয়। দৈনিক জনকণ্ঠের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়েরের মাত্র ১৪ ঘন্টার মাথায় সিআইডি পুলিশ যশোরস্থ নিজ বাসভবন থেকে ঘুমন্ত তোতাকে ডেকে তুলে গ্রেফতার করে। যশোরে সাংবাদিক শামছুর রহমানের প্রকৃত হত্যাকারীদের আড়াল করতে নোংরা রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে উক্ত হত্যাকান্ডের কথিত পরিকল্পনাকারী সাজিয়ে এই গ্রেফতার অভিযান চালানো হয়। পরের দিন বিকেলে তোতাকে ৬ দিনের রিমান্ডে আনা হয়। তোতা গ্রেফতার হওয়ার খবরে যশোর ও খুলনা অঞ্চলের সাধারণ মানুষ, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা বিস্মিত ও হতবাক হন। তারা প্রচন্ড ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং তীব্র ধিক্কার ও নিন্দা জ্ঞাপন করেন। সাংবাদিক শামছুর রহমান হত্যাকান্ডের একদিন পর থেকেই জনকণ্ঠ মূল হত্যাকারীদের বাদ দিয়ে যশোরের স্থানীয় সাংবাদিকদের ওপর কালো থাবা বিস্তার করে। তারা সাংবাদিকদের ওই হত্যা মামলার সাথে জড়িয়ে বিভ্রান্তি কর মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন শুরু করে। এরই জের ধরে তোতাকে গ্রেফতার করা হয়। প্রতিদিনের ন্যায় তোতা রাতে তার অফিসের কাজ শেষ করে শহরের নতুন খয়ের তলার বাসায় যান। গভীর রাতে তিনি যখন ঘুমিয়ে ছিলেন তখন ১০ জন ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিশ ও সাদা পোশাকে সিআইডির ২ জন অফিসার তার বাসায় হানা দেয়। পুলিশ নিচতলায় ঘুমন্ত তোতার ছেলে সাহিদুর রহমানকে জানালা দিয়ে ডেকে তুলে। এরপর তোতাকে ডেকে তুললে তিনি

www.pathagar.com

দোতলা থেকে নিচে নেমে আসেন। গেটের বাইরে থেকেই পুলিশ বলে, আমরা অপারেশনে যাব। আপনাকে কিছু তথ্য দিতে হবে। এই কথা শুনে তোতা গেট খুলে দিলে তারা ভেতরে ঢুকে ড্রইংরুমে বসে কথা বলে এক পর্যায়ে তারা তোতার গায়ে হাত দিয়ে বলে, 'আপনাকে আমাদের সাথে যেতে হবে'। তখন তোতা ও তার স্ত্রী রেবা রহমান বলেন, 'আপনারা চলে যান। সকালে সিআইডি অফিসে দেখা করব'। কিন্তু পুলিশ বলে, 'আপনাকে এখনই যেতে হবে। আমাদের বড় সাহেব আপনার জন্য বসে আছেন'। তোতা কাপড় পরে পুলিশের সাথে বের হয়ে যান। একটি গাড়ি ও একটি মোটরসাইকেলসহ তোতাকে সিআইডি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। রাত ৩ টায় তাকে স্থানীয় কোতওয়ালী থানায় পাঠানো হয়। সারা রাত তাকে থানায় চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়। সকাল ৯ টায় তোতার স্ত্রী থানায় যান। খবর পেয়ে বিভিন্ন পত্রিকার স্থানীয় সাংবাদিকরা থানায় যান। তারা তোতার গ্রেফতারের কারণ থানার ওসিকে জিজ্ঞেস করলে ওসি বলেন, 'উপরের নির্দেশে গ্রেফতার করা হয়েছে'। সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে সাড়ে ১১টায় চোরাচালানের মাফিয়া গডফাদারদের অন্যতম সহযোগী ও বহু কুকর্মের হোতা একজন স্থানীয় সাংবাদিক ওসিকে হুমকি দেন। তিনি বলেন, 'তোতাকে এখনও হ্যান্ডকাপ পরানো হয়নি কেন। লকআপ-এ ঢোকানো হয়নি কেন। মেরে তার হাড্ডি খুলে ফেলা হয়নি কেন'। এরপর দুপুর ১২ টায় সিআইডি তাকে কোর্টে নিয়ে যায়। সিআইডি ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানালে ম্যাজিস্ট্রেট রামচন্দ্র দাস তাকে ৬ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। তোতার পক্ষে জামিনের আবেদন জানান এডভোকেট কাজী তৌহিদুর রহমান, মাহাবুব আলম বাচ্চুসহ প্রায় ২০ জন আইনজীবী। এরপর বিকাল সাড়ে ৫ টায় তোতাকে হ্যান্ডকাপ লাগিয়ে সিআইডি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সকালে নাস্তার পর থেকে পরেরদিন রাত ৯ টা পর্যন্ত তাকে এক ফোটা পানিও খেতে দেয়া হয়নি। তোতা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতরাতে থাকলেও পুলিশের মনে সামান্য দয়া হয়নি। সিআইডি অফিসে নেয়ার পর পুলিশ কর্মকর্তাদের কাছে একের পর এক গডফাদারদের টেলিফোন আসতে থাকে। তাদের নির্দেশে শুরু হয় তোতার ওপর দুর্ব্যবহার ও নির্যাতন।

দৈনিক ইনকিলাবের সাতক্ষীরা জেলা সংবাদদাতা আবদুল ওয়াজেদ কচিকে কে বা কারা টেলিফোনে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। ১৩ আগষ্ট গভীর রাতে অজ্ঞাত এক ব্যক্তি কচির বাসায় ২২১২ নম্বর টেলিফোনে ফোন করলে কচি ফোন ধরেন। অপরপ্রান্ত থেকে বিভিন্ন গালিগালাজ করার পর বলা হয় যে, আর যদি কোন দুর্নীতি এবং শাসক দলের সংবাদ প্রকাশ করা হয় তাহলে এসএ রব এবং শামছুর রহমানের মত গুলি করে হত্যা করা হবে। এ ব্যাপারে সাতক্ষীরা সদর থানায় একটি সাধারণ ডাইরী করা হয়।

ওয়াশিংটনে জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি জ্যাক কুশম্যান দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক জনাব বাহাউদ্দীনের বিরুদ্ধে কথিত রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলার নিন্দা করেন। কুশম্যান তার বিবৃতিতে বলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট আহবান জানাই, তিনি যেন দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক বাহাউদ্দীনের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত থাকেন'। তিনি আরো বলেন, 'গণতন্ত্র শক্তিশালী হয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ভিত্তিতে। বাংলাদেশ একটি ভাল গণতান্ত্রিক জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে এবং আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অনুরোধ করব তিনি যাতে জনগণের অধিকার খর্ব এবং সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ না করেন'। তিনি বলেন, 'সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষাকারী আন্তর্জাতিক কমিটিতে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টি উত্থাপন করব। আমি আশা করব, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ভব্যতা বহাল থাকবে'। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ১৩ অক্টোবর ২০০০)

www.pathagar.com

৩১ অক্টোবর ছিনতাইকারীরা দৈনিক দিনকালের কূটনৈতিক রিপোর্টার মোখলেছুর রহমান চৌধুরীর ঘড়ি ছিনতাই করে নিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটে সন্ধ্যা ৫টা ৫৫ মিনিটে রাজধানীর পল্টন মোড়ে। তিনি জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে পল্টনে এসে দিনকালের উদ্দেশ্যে তিব্বত আসার জন্যে দূরন্ত এ উঠছিলেন। এ সময় এক সাথে ৪/৫ জন ছিনতাইকারী তার বাম হাত থেকে সিকো-৫ ঘড়িটি খুলে নেয়ার সাথে সাথে তারা গাড়িটির দরজায় একটি ঘড়ি ফেলে দেয়। তখন দেখা যায় ওই গাড়িটি আরেকজন যাত্রী স্বপন কুমার সরকারের। তিনি .ন তার ঘড়িটি গাড়ির দরজা থেকে তুলছিলেন তখন ছিনতাইকারীরা স্বপন কুমার সরকারের প্যান্টের পকেট থেকে তার মানিব্যাগটি ছিনতাই করে নিয়ে যায়। মানিব্যাগে ১ হাজার ২শ' টাকা ছিল।

৪ নভেম্বর দৈনিক খবরের কুমিল্লা জেলা সংবাদদাতা আবুল কাসেমের ক্যাসিও হাত ঘড়িটি ফার্মগেট এলাকায় ছিনতাই হয়। সন্ধ্যার দিকে তিনি যাত্রীবাহী বাসে ফার্মগেট এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। যাত্রীবাহী বাসটি সিগন্যালে পড়লে বাসের জানালা দিয়ে ছিনতাইকারীরা তার হাতে থাকা ঘড়িটি ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

নরসিংদী পুলিশ সুপার কার্যালয়ে সাংবাদিকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার সফিউল্ল ইসলাম সফি এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। ১৮ নভেম্বর বেলা ১১ টায় স্থানীয় একটি সাপ্তাহিকের জনৈক সংবাদদাতা পুলিশ অফিসে প্রবেশ করতে গেলে গেটে কর্তব্যরত হাবিলদার তাকে বাধা দেয় এবং পুলিশ সুপারের জারিকৃত নিষেধাজ্ঞার কথা প্রকাশ করে। অভিযোগে প্রকাশ, সফিউল ইসলাম সফি স্থানীয় সাংবাদিকদেরকে ঘায়েল করার জন্য বিভিন্ন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে মৌখিক নির্দেশ প্রদান করেন। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ১৯ নভেম্বর ২০০০)

১৩ জানুয়ারি ২০০১ প্রধানমন্ত্রী পাবনার পাকশী সফরে যান। প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষ্যে জেলা পুলিশের বিশেষ শাখা কর্তৃক সাংবাদিকদের জন্য ইস্যুকৃত নিরাপত্তা পাস প্রদানে বৈষম্য করা হয়। দেশের ২০ টি গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক পত্রিকা ও সংবাদ এজেন্সীর কর্মরত সাংবাদিকদের বাদ দিয়ে পক্ষপাতমূলকভাবে হাতে গোনা কয়েকটি পত্রিকার নামে সর্বত্র উল্লেখ করে নিরাপত্তা পাস প্রদান করা হয়। অপরদিকে ১৮টি পত্রিকা ও এজেন্সীর নামে ইস্যুকৃত নিরাপত্তা পাসে শুধু জনসভাস্থল উল্লেখ করা হয়। এই বৈষম্যমূলক কার্ড বিতরণ নিয়ে পাবনার সাংবাদিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দেয়। ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সাংবাদিকরা বলেন, 'দেশের প্রধানমন্ত্রী যেহেতু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সেহেতু তার জনসভার সংবাদ সংগ্রহের জন্য নিরাপত্তা পাসের দরকার হয় না'। এই বৈষম্যমূলক কার্ডের বিষয় নিয়ে পাবনা প্রেসক্লাবের সেক্রেটারী ও দৈনিক প্রভাতের জেলা প্রতিনিধি রবিউল ইসলাম রবি পাবনা পুলিশ সুপার আছাদুজ্জামান মিয়াকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'আমার বাড়ির দাওয়াত যদি না দেই, আপনি জোর করে নেবেন কি'? বৈষম্যমূলক কার্ড প্রদান করা হয় সংবাদ সংস্থা ইউএনবি, বাসস, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক মাতৃভূমি, মানবজমিন, পিপ বার্তা সংস্থা, বাংলাবাজার, ভোরের কাগজ, ইনডিপেন্ডেন্ট, আরশী, রূপালী, আল আমিন, সমাচার, নবচেতনা, আজকের আওয়াজ, ইছামতি, চাঁদনী বাজারসহ মোট ২০টি সংবাদপত্র ও নিউজ এজেন্সীকে।

২৫ জানুয়ারি ফেনীর ট্রাংক রোড থেকে একদল সন্ত্রাসী বার্তা সংস্থা ইউএনবির ফেনী জেলা সংবাদদাতা টিপু সুলতানকে জোরপূর্বক ধরে একটি রিকশায় তুলে মিজান রোডস্থ জেলা পরিষদের ভবনের পিছনের নিয়ে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে তাঁর হাত-পা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে

www.pathagar.com

দেয়। ঐ সময় টিপুকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতেও জখম করে। পরে সন্ত্রাসীরা তাঁকে একটি রিকশায় তুলে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। সন্ত্রাসীদের বর্বরোচিত হামলার শিকার টিপু সুলতানকে ফেনী হাসপাতাল থেকে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ২৮ জানুয়ারি রাতে তেজগাঁও থানায় টিপু একটি মামলা দায়ের করেন। থানা এটি সাধারণ ডায়েরী হিসেবে রেকর্ড করে। মামলায় জয়নাল হাজারীর পত্রিকা হাজারিকার নির্বাহী সম্পাদক বিধান মজুমদার সুমন, জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও হাজারীর ক্লাস কমিটির সচিব শাহজাহান সাজু এবং ওয়ার্ড কমিশনার কোহিনূর সহ ১৪/১৫ জনকে আসামী করা হয়। এজাহারে টিপু বলেন, 'ওমরপুরস্থ সুলতান মেমোরিয়াল জুনিয়র গার্লস স্কুল সন্ত্রাসী দ্বারা ভাংচুরের ঘটনা ইউএনবির বরাত দিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকসহ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হলে হাজারী ক্ষুব্ধ হয়ে তাকেসহ আরও সাংবাদিক হত্যাসহ বিভিন্ন রকম ভয়ভীতির হুমকি দেয়। ২৫ জানুয়ারি সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে এক সহকর্মীর কাছে যাওয়ার জন্য ফেনী ট্রাংক রোডস্থ পেট্রোল পাম্পের সামনে রিকশার জন্য অপেক্ষা করার সময় হাজারী একটি লাল গাড়ি ও সাদা মাইক্রোবাসে তার দলবল নিয়ে এসে সুমনকে হুকুম দেয় টিপুকে ধরে নিয়ে মেরে বস্তায় ভরে ফেলে দেয়ার জন্য'। টিপু এজাহারে আরও উল্লেখ করে যে, 'এরপর হাজারীর সন্ত্রাসীরা তাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে হকিস্টিক, রড ও রোলার দিয়ে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে মৃত মনে করে ফেলে চলে যায়'। জয়নাল হাজারীর আর্মড ক্যাডারদের অব্যাহত হুমকির মুখে সাংবাদিক টিপু সুলতানের পিতা জয়নাল আবেদীনও ফেনী ছাড়তে বাধ্য হন। টিপুকে নির্মম নির্যাতনের মাধ্যমে পঙ্গু করার পরবর্তী পরিস্থিতিতে জয়নাল আবেদীন কিছুদিন ফেনী ছেড়ে চট্টগ্রামে আত্মগোপন করেছিলেন। এরপর ফেব্রুয়ারি প্রথম সপ্তাহ থেকে তিনি ঢাকায় আশ্রয় নেন। এই সময়কাল হাজারীর অন্যতম আর্মড ক্যাডার আবদুর রউফের নেতৃত্বে মোটর সাইকেল আরোহী সন্ত্রাসীরা প্রতিরাতেই শহর থেকে ২ কিলোমিটার দূরে সোনপুরে অস্ত্রের মহড়া দেয়। তারা ঐ গ্রামে টিপুদের বাড়িতে গিয়ে টিপুর মা-বাবা, ভাই-বোনের খোঁজ করে। তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবারও হুমকি দেয়। টিপুর মা ও ভাই-বোনরা ফেনীতে আশ্রয়হীন অবস্থায় বিভিন্ন গ্রামে আত্মগোপন করে দিন কাটান। টিপুর বোন ফেনী কলেজের ছাত্রী। কিন্তু সন্ত্রাসীদের ভয়ে টিপুর ঐ বোন কলেজে যেতে সাহস করেননি। টিপুর বড় ভাইয়ের কর্মস্থল কুমিল্লা। তিনি বিবাহিত ও এক সন্তানের জনক। টিপুর ঐ ভাই ফেনীর বাড়ি থেকেই কর্মস্থলে যাতায়াত করতেন। কিন্তু হাজারী বাহিনীর হুমকির মুখে তিনিও স্ত্রী-সন্তানসহ প্রাণভয়ে পালিয়ে বেড়ান। (সূত্রঃ দৈনিক মানবজমিন ৯ ফেব্রুয়ারি , ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০১)

৬ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুরের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও দৈনিক ইনকিলাবের ফরিদপুর জেলা সংবাদদাতা আনোয়ার জাহিদ সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ফরিদপুর রেলস্টেশন বাজার সংলগ্ন আল-মদীনা সিমেন্ট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে বসে ছিলেন। এ সময় ফরিদপুরের বহু মামলার আসামী, সন্ত্রাসী মিলনের নেতৃত্বে ৮/১০ জন অস্ত্রধারী তাঁকে ঘিরে ফেলে। তারা প্রথমে ২/৩ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে। এ সময় লোকজন ভয়ে পালাতে থাকে। সন্ত্রাসীরা তখন আনোয়ারকে এলোপাতাড়ি কোপাতে শুরু করে। তার আর্তচিৎকারে আশপাশ থেকে লোকজন ছুটে এলে মিলন ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে ত্রাস সৃষ্টি করে স্থান ত্যাগ করে। লোকজন ক্ষত-বিক্ষত আনোয়ারকে দ্রুত সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসগণ একটানা তিনঘন্টা তাঁর দেহে অস্ত্রোপাচার করেন। সন্ত্রাসীরা আনোয়ারের ডান পায়ের ৮ টি ও বাম পায়ের ৪ টি রগ কেটে দেয়। আনোয়ারের উপর নির্মম হামলার সংবাদ শহরে ছড়িয়ে পড়লে সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী,

www.pathagar.com

রাজনীতিবিদগণ হাসপাতালে ছুটে যান। তারা এ ন্যক্কারজনক ঘটনার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে এর সাথে জড়িত চিহ্নিত অস্ত্রধারীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবী করেন। ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক আশফাক হামিদ এবং পুলিশ সুপার আনোয়ারকে দেখতে হাসপাতালে যান। পুলিশ সুপার এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। কিন্তু সচেতন মহল অভিযোগ করেন যে উক্ত সন্ত্রাসী হামলার সাথে ফরিদপুর পুলিশের একজন কর্মকর্তা জড়িত ছিল।

২৫ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবে এম এ পরীক্ষার্থীদের একটি সংবাদ সম্মেলন ভন্ডুল করতে পুলিশ স্থানীয় সাংবাদিকদের বেধড়ক পিটিয়েছে। এতে সাংবাদিকসহ ২৫ জন আহত হন। প্রেসক্লাব চত্বর থেকে ৫০ জনেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রীকে পুলিশ আটক করে। টাঙ্গাইলের করটিয়া সাদ'ত কলেজে ২৪ ফেব্রুয়ারি এমএ পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষা কক্ষে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট গণহারে বহিষ্কার ও নকল প্রতিরোধ করলে পরীক্ষারত ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। একই দিনে এ কেন্দ্রে বহিষ্কার করা হয় ৪৯২ জন পরীক্ষার্থীকে। এরই প্রতিবাদে বিকেলে কলেজের বাসযোগে শতাধিক পরীক্ষার্থী প্রেসক্লাবে এসে একটি সংবাদ সম্মেলন করছিলেন। বিকেল সাড়ে ৫ টার দিকে সংবাদ সম্মেলন চলাকালে অর্ধশতাধিক পুলিশ আচমকা নিরালার মোড় এলাকার প্রেসক্লাবে হামলা চালায়। ছাত্র-ছাত্রীদের পুলিশ লাঠি ও বন্দুকের বাঁট দিয়ে বেধড়ক পেটায়। এ সময় সাংবাদিকরাও পুলিশের হামলার শিকার হন। পুলিশের পিটুনিতে আহত হন প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক যুগান্তরের প্রতিনিধি জাফর আহমেদ, জনকণ্ঠ প্রতিনিধি ফিরোজ মান্না, ইনকিলাবের প্রতিনিধি আতাউর রহমান আজাদ, সাপ্তাহিক প্রযুক্তির সম্পাদক কাজী জাকেরুল মওলা, আব্বাসের প্রতিনিধি শামীম আলম মামুন, প্রভাতের আওয়াল মিয়া, ইফতেখারুল অনুপম, আল মুজাদ্দেদের আলরুহী, মূল স্রোতের মিজানুর রহমান। ঘটনাস্থল থেকে ৫৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে তাৎক্ষণিকভাবে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের গাড়ীতে এসব ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করা হয়। মেয়েদেরও অমানবিকভাবে পেটানো হয়।

৩ মার্চ বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক মাজিদুল ইসলাম এবং মহাসচিব আবুল কাসেম মজুমদার এক বিবৃতিতে টিপু সুলতানের ওপর সন্ত্রাসী বাহিনীর বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান। বিবৃতিতে তারা উল্লেখ করেন, 'গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত হচ্ছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। আর সাংবাদিকদের জীবনের নিরাপত্তা না থাকলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। সারাদেশে সাংবাদিকদের উপর নির্যাতন ও সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়েছে। বহুমতের গণতান্ত্রিক সমাজে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা সংবিধান ও মানবাধিকার বিরোধী'। নেতৃবৃন্দ বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী একাধিকবার বলেছেন, বর্তমানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। অথচ সরকার ও প্রশাসনের ছত্রছায়ায় দেশের বিভিন্নস্থানে সাংবাদিকদের ওপর দমন-পীড়ন ও বর্বরোচিত হামলা পরিচালিত হচ্ছে। সাংবাদিককে হত্যার উদ্দেশ্য নিপীড়ন করে মুমূর্ষু ও পঙ্গু করে দেয়ার এই লোমহর্ষক ঘটনা সরকারের পরমত অসহিষ্ণুতারই নামান্তর'। বিবৃতিতে তারা আরো উল্লেখ করেন যে, 'শুধুমাত্র ভিন্ন মতের কারণেই সরকার কয়েকটি পত্রিকার বিজ্ঞাপন কোটা বাতিল এবং হ্রাস করে দিয়ে স্বাধীন সংবাদপত্র বিকাশে বিরোধী মহলকেই সাংবাদিকদের ওপর হামলার দুঃসাহস জুগিয়েছে। (সূত্রঃ দৈনিক সংগ্রাম ৩ মার্চ ২০০১)

www.pathagar.com

যুবলীগের সন্ত্রাসীদের ভয়ে ঘর ছাড়া হন চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার লোকসমাজ পত্রিকার প্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল আলম। তাদের বিরুদ্ধে পত্রিকার প্রতিবেদন প্রকাশ করার জন্য ১ মে শফিকুলকে দামুড়হুদায় খুঁজে বেড়ায়। এতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি দামুড়হুদা থেকে চুয়াডাঙ্গা শহরে পালিয়ে আসেন। ৩০ এপ্রিল ও ১ মে লোকসমাজ পত্রিকায় স্থানীয় 'রাজনীতি ও মিথ্যা আশায়' নিয়ে খাস জমি ইজারা নেওয়ার বিষয়ে দু'টি প্রতিবেদন প্রকাশ পেলে কুখ্যাত লাল্টু বাহিনীর সশস্ত্র ক্যাডার যুবলীগ নেতা গাছ চুরী, টেন্ডারবাজী ও ছিনতাইয়ের হোতা দামুড়হুদা দশমীপাড়ার জুরুজহার মন্ডলের ছেলে ইউসুফ ও নূরুন্নবী, জামান আলীর ছেলে সাঈদ এবং ফকির মোহাম্মদের ছেলে বংশসহ ১৫-২০ জন ক্ষিপ্ত হয়ে শফিকুলকে খুঁজতে থাকে। অবস্থার বেগতিক দেখে বিকেলে তিনি চুয়াডাঙ্গা শহরে এসে ঘটনাটি স্থানীয় সাংবাদিকদের জানান। এরপর চুয়াডাঙ্গা থেকে দু'জন সাংবাদিক দামুড়হুদা থানায় গিয়ে শফিকুলের জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে একটি সাধারণ ডায়রী করেন। ডায়রী করতে গিয়ে সাংবাদিকদ্বয় দেখতে পান অভিযুক্তরা থানায় পুলিশের সঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছে। (সূত্রঃ দৈনিক ভোরের কাগজ ৫ মে ২০০১)

৫ মে দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সাংবাদিকতা নিষিদ্ধ করেছে ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগের একটি গ্রুপের অনবরত প্রাণনাশের হুমকির প্রেক্ষিতে সাংবাদিকরা ক্যাম্পাসে অতি শংকিত হয়ে বিচরণ করছে। ছাত্রলীগ বলেছে 'চট্টগ্রাম শহরে বর্তমানে যে রকম সাংবাদিকতা চলছে, সে রকম সাংবাদিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলবে না। এখানে সাংবাদিকতা চলবে আমাদের কথা মতো। এর অন্যথায় কয়েকজন সাংবাদিক মেরে ফেললেও কিছু হবে না'।

৮ মে সকাল ১১ টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিবাদে বাংলাদেশ মানবাধিকার সাংবাদিক কমিশন সিলেটের উদ্যোগে জিন্দাবাজার সড়কে আয়োজিত মানববন্ধন কর্মসূচি শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাদদেশে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা বলেন, 'পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকার কারণে একের পর এক সাংবাদিক হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। জাতির বিবেক সাংবাদিক ও জাতির দর্পণ সংবাদপত্রে যারা হামলা চালায় তাদের যে কোন মূল্যেই হোক রুখতে হবে'। সমাবেশে দৈনিক শ্যামল সিলেটের ফটো সাংবাদিক ইকবাল মঞ্জুরকে অপহরণের নিন্দা জানানো হয়।

www.pathagar.com

শিক্ষা ক্ষেত্রে দলীয়করণ

আওয়ামী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরই শুরু হয় ছাত্রলীগ ক্যাডারদের দ্বারা দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দখলের প্রক্রিয়া। তারা একে একে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো থেকে বিরোধী দল সমর্থিত নেতা-কর্মীদের বের করে দিয়ে সেগুলো দখল করতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো দিয়ে তারা উদ্বোধনী যাত্রা শুরু করে। ১৯৯৬ সালের আগষ্ট মাসে দখল করে জহুরুল হক হল। সেপ্টেম্বর মাসে ফজলুল হক হল, স্যার এফ রহমান হল এবং অক্টোবর মাসে হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হল, নভেম্বর মাসে মাস্টারদা সূর্যসেন হল দখল করে নেয়। হল দখলের প্রতিবাদে ছাত্রদল ক্যাম্পাসে লাগাতার ধর্মঘট ডাকলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েই সূর্যসেন হলে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা করে।

বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রাম। এর ১৬ কিলোমিটার উত্তরে পাহাড়ঘেরা ঝরনার কলকলানিতে মুখরিত সবুজের সমারোহ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। বছর বছর ধরে জ্ঞানতাপস শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মিলনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছিল এক স্বর্গীয় পরিবেশ। কিন্তু আওয়ামীরা পছন্দ করতে পারেনি এই নৈসর্গিকতা। আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে ক্যাম্পাস। ছাত্রলীগের অব্যাহত সন্ত্রাসের কারণে দেশের উচ্চ শিক্ষার দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবন ধ্বংসের পথে পতিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে ছাত্রলীগের অব্যাহত সন্ত্রাসের কারণে সৃষ্ট অচলাবস্থায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ভেঙে পড়ে। ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ১২০ দিনেরও বেশি অনির্ধারিত বন্ধের সম্মুখীন হয়। ১৯৯৯ সালের আগষ্ট পর্যন্ত ৮ মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ৩৭ দিন ক্লাস হয়। বাকী ২০৯ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্লাস হয়নি। এসব অনির্ধারিত বন্ধের ফলে সেশনজটের সৃষ্টি হয়। প্রলম্বিত হয়ে পড়ে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর মূল্যবান শিক্ষা জীবন। সেশনজটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো বিভাগে একই বর্ষে দু'টি করে ব্যাচের সৃষ্টি হয়। অনার্সসহ মাষ্টার্স পাস করে বের হতে ৫ বছরের জায়গায় ৭/৮ বছর সময় ব্যয় হয়। তাছাড়া প্রতিবছর একজন ছাত্রের পেছনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রায় ২৯ হাজার টাকা ব্যয় হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের প্রলম্বিত শিক্ষা জীবনের কারণে বাড়তি ব্যয় বহন করতে গিয়ে কর্তৃপক্ষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও চরম দলীয়করণ করা হয়। ভিসি, প্রো-ভিসি ও প্রক্টর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রশাসনিক পদে দলীয় লোকদের নিয়োগ দেয়ার পর পরই বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। প্রশাসনের একচোখানীতি ও ছাত্রলীগের অব্যাহত সন্ত্রাসের কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবন বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পূর্বের ২০ বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ টি হত্যাকান্ড সংগঠিত হলেও তাদের শাসনের প্রথম তিন বছরে ৫ জন ছাত্র নিহত হয়। বড় ধরনের সংঘর্ষ হয় অন্তত ২০ বার। ফলে সেশনজট ক্রমেই ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ১৯৯৬ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ট্রেনের সীটে বসাকে কেন্দ্র করে দু'ছাত্রের মধ্যকার কথা কাটাকাটি থেকে ছাত্রলীগ-শিবির সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ ঘটনার জের ধরে

www.pathagar.com

২২ সেপ্টেম্বর ছাত্রলীগ-শিবিরের মধ্যে পুনরায় সংঘর্ষ হয়। এ সময় ছাত্রলীগের তান্ডবে ১৮ দিন ক্যাম্পাস বন্ধ থাকে। এরপর কিছুদিন পরিবেশ শান্ত থাকলেও ১৯৯৭ সালের আগষ্ট মাস থেকে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা আবার তান্ডব শুরু করে দেয়। চর দখলের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো দখল করার জন্য ১৫ আগস্ট দক্ষিণ ক্যাম্পাসের একটি বাসাতে বসে নীল নকশা প্রণয়ন করা হয়। ঐ সময় ছাত্রলীগের অছাত্র সভাপতি ও সেক্রেটারী ছাড়াও আরো ৬ জন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন, যাদেরকে ১৯৯০ সালের ২২ ডিসেম্বর ছাত্রফ্রন্ট নেতা ফারুকুজ্জামান হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী হিসেবে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। ৬ জন শিক্ষকের মাঝে প্রশাসনের সর্বোচ্চ ২ ব্যক্তিও ছিলেন। হলগুলোতে ছাত্র লীগের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হয় ১ টি লাশের। এই প্রয়োজন মিটাতে গিয়েই ৩ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় রেলস্টেশনে শহর থেকে ট্রেনে করে আসা ছাত্রনেতা মিয়া মোহাম্মদ তৌফিকের ওপর গুলিবর্ষণ করে সন্ত্রাসীরা। তৌফিকের গুলি না লেগে দুর্ভাগ্যক্রমে তা ঝাঝড়া করে ১ ম বর্ষ গণিতের মেধাবী ছাত্র নিরীহ আমিনুল ইসলাম বকুলের দেহকে। সন্ত্রাসীরা বকুলকে হত্যা করেছে এ কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হলেও প্রশাসন উল্টো শিবির কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে ১৫ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করান। ৫ সেপ্টেম্বর অনার্সে ভর্তি ইচ্ছুকদের শুভেচ্ছা জানানোকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ছাত্রলীগ ১ নং গেট অবরোধ করে ১৮ দিন ক্যাম্পাস অচল করে রাখে। সন্ত্রাসীরা আকস্মিকভাবে ১৯৯৮ সালের ২৬ এপ্রিল শাহজালাল হল শিবিরের সাংগঠনিক সম্পাদক ইব্রাহীমকে ছুরিকাঘাতের মধ্য দিয়ে গোটা ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের এক তান্ডবলীলা চালায়। ঐ দিন শিবির সেক্রেটারী মুজিবুর রহমান মঞ্জুসহ প্রায় ৩০ জন শিবিরের নেতা-কর্মী আহত হয়। এই সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ২৮ এপ্রিল ক্যাম্পাসে ছাত্র ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে শিবিরের শান্তিপূর্ণ মিছিলে আক্রমণ চালায় ছাত্রলীগ। আহত হয় শত শত শিবির কর্মী। সন্ত্রাসীরা দখল করে নেয় আমানত ও শাহজালাল হল। ভাংচুর, লুটপাট ও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় শিবিরি কর্মী সহ সাধারণ ছাত্রদের ৩ শতাধিক কক্ষ। ঐ দিনের ঘটনায় পুলিশ উল্টো গ্রেফতার করে শিবিরের ১৮ জন নেতা-কর্মীকে। ঘটনার প্রতিবাদে শিবির লাগাতার অবরোধের ডাক দেয়। ঐ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ ম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা চলছিল। ৬ মে রাতে ভর্তি পরীক্ষার ফরম জমা দিতে পটুয়াখালী থেকে আসা মাদ্রাসা ছাত্র আইয়ুবকে আমানত হলের ৪১৯ নং কক্ষ থেকে ধরে নিয়ে পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে গুলি করে হত্যা করে ছাত্রলীগ। ১৫ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মার্কেটিং বাস শহরে যাওয়ার সময় মদনহাট এলাকার জনৈক ছাত্রনেতার নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী মাইক্রোবাসযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসটির পিছু নেয় এবং ট্যানারী বটতলা এলাকায় পৌছলে পেছন থেকে বাস লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে। এ সময় বাসে বসে থাকা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ১ম বর্ষের ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান কাজী আহমদ নবীর ছেলে মুশফিক-উস সালেহীন গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়। একইদিনে যে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের উদ্বোধনী দিনে ক্লাস পরীক্ষা শেষে ছাত্রছাত্রীরা যার যার আবাসস্থলে ফিরছিল। অন্যদের মত রিকশাযোগে কলেজে ফিরছিল ছাত্র শিবির নেতা হাশেম। ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সামনে হাশেমের গতিরোধ করে এবং রিকশা থেকে নামিয়ে চাইনিজ কুড়াল ও রামদা দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করে। হাশেমকে আহত করার মধ্য দিয়েই ঐ দিন শুরু হয় সন্ত্রাসীদের নারকীয় তান্ডব। টিউটোরিয়াল পরীক্ষা শেষে অন্যদের মত হলে ফিরছিলেন শিবির নেতা অর্থনীতি শেষ বর্ষের ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অফিস ও প্রচার সম্পাদক জোবায়ের হোসেন। এ সময় ১০/১২ জন

www.pathagar.com

সন্ত্রাসী জোবায়ের ও রাজনীতি বিজ্ঞানের ছাত্র শিবির নেতা মাঈনুদ্দিনকে দুপুর ২টায় বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ব্যাংকের সামনে থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ফরেষ্ট্রার জিপে করে তাদেরকে ফরেষ্ট্রি হোস্টেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ফরেষ্ট্রি হোস্টেলের ১০২ নং কক্ষে আটক রাখা হয় জোবায়েরকে। মাঈনুদ্দিন জানালার রড ব্যাকা করে ঐ কক্ষ থেকে রাতে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। জোবায়েরের অপহরণের ঘটনা জীপের ড্রাইভার আহমদ ছফা ফরেষ্ট্রার ডাইরেক্টর ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রো-ভিসিকে অবহিত করেন। কিন্তু তিনি জোবায়েরকে উদ্ধারের ব্যাপারে উদ্যোগী হননি। সন্ত্রাসীরা সন্ধ্যা ৬ টায় ফরেষ্ট্রি হোস্টেলের পেছনে জোবায়েরের বুকের বাম পাশে কাটা রাইফেল দিয়ে গুলি করে। ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা দেখা দিলে ১৫ মে থেকে দু' দফায় ভার্সিটি ৩১ মে পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ১ জুন বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিলে ক্যাম্পাসে আবারও উত্তেজনা দেখা দেয়। ফলে কর্তৃপক্ষ ১ জুলাই থেকে ১ মাস বর্ষাকালীন ছুটি ঘোষণা করে। অথচ ১৯৯৮ সালে বর্ষাকালীন ছুটি ছিল না। আগষ্টের ১ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর বিশ্ববিদ্যালয় বাস বন্ধ করে দেয়াকে কেন্দ্র করে ছাত্র সংগঠনগুলোর সাথে কর্তৃপক্ষের বিরোধের কারণে কয়েকদিন ক্লাস হয়নি। এরই মধ্যে ১২ আগষ্ট ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধের পর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। একই মাসে ট্রেনে করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পথে বটতলি ষ্টেশন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ট্রেনে উঠে পড়ে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা। সে সময় ঐ বগিতে থাকা দাড়িওয়ালা চারুকলা ২ য় বর্ষের ছাত্র ছাত্রফ্রন্ট কর্মী mÄq তলাপাত্রকে শিবির কর্মী সন্দেহে গুলি করে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দেয়। মেডিকেল নেয়ার পূর্বে সে মারা যায়।

আওয়ামী সরকারের আমলে দরপত্র আহবান, কাজ বন্টন ও কারিকুলাম পরিবর্তনে বিলম্ব, কাগজ বিতরণে অনিয়ম ও স্কুল সমূহে বই প্রেরণে গাফলতির কারণে প্রতিবছরই শিক্ষার্থীরা শিক্ষাবর্ষের শুরুতে পাঠ্যপুস্তক থেকে বঞ্চিত হয়। এমনকি বোর্ডের একটি মহলের সাথে পুস্তক ব্যবসায়ীদের যোগসাজশে স্কুলগুলোতে পাঠ্যপুস্তক সংকট সৃষ্টি করে বিনামূল্যে বিতরনের বই খোলাবাজারে চড়াদামে বিক্রি করা হয়। ১৯৯৬ সালের শেষের দিকে পাঠ্যপুস্ত কে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কারিকুলাম পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়। যার কারণে ইউনিসেফের খরচে মুদ্রিত প্রায় ৫০ লাখ টাকার বই প্রত্যাহার করে নিতে হয়। ডিসেম্বরে থানা শিক্ষা অফিস স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পুরান বই সংগ্রহের নোটিশ পাঠায়, কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষা শেষে ছুটিতে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে এক/তৃতীয়াংশ বইও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৯৬ সালে দাতাসংস্থা নোরাডের টাকায় পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের সময় জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশনের কাছ থেকে কাগজ কেনার উদ্যোগ নেয়া হয় কিন্তু দেশীয় পুস্তক মুদ্রণ সমিতির আন্দোলনে তা রদ করা হয়। উদ্ভূদ জটিলতার সমন্বিত সংকটের কারণে ১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীরা বছরের শুরুতে পাঠ্যপুস্তক থেকে বঞ্চিত হয়। ১৯৯৭ সালেও এনসিটিবি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য টেন্ডার আহবানে দেরী করে। বোর্ড চেয়ারম্যান ১৬ জন পদোন্নতি প্রাপ্ত সহ ২৯ জন কর্মকর্তাকে বোর্ডের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় বদলি করলে বোর্ডের কার্যক্রমে অচলাবস্থা তৈরি হয়। প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের ৭০ শতাংশ বই বাঁধাই নিয়ে পুস্তক বাঁধাই সমিতির সাথে বোর্ডের বিরোধ বাধে। এই বিরোধের এক পর্যায়ে ২৩ জুলাই বোর্ডে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। ১৯৯৭ সালেই দরপত্র নিয়ে নতুন সংকট সৃষ্টি হয়। বোর্ড কর্তৃপক্ষ টেন্ডার আহবান করলেও মুদ্রক ও প্রকাশকদের কাছে থেকে কোন প্রতিযোগিতামূলক দর আহবান করেনি এবং নিজেরাই বইয়ের মূল্য নির্ধারণ করে কে

www.pathagar.com

কতো কপি বই ছাপাতে পারবে সে বিষয়ে আবেদন করে। প্রতিযোগিতামূলক দর নির্ধারণ না হওয়ায় পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে বাড়তি ২৫ কোটি টাকা গচ্চা যায় যা কিনা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উচ্চ মূল্যে বই বিক্রি করে-আদায় করা হয়। টেন্ডারের নামে মুদ্রণ কাজ বরাদ্দ করা হলেও মানরক্ষার জন্য কোন নীতিমালা ছিল না। অত্যন্ত নিম্নমানের বই ছাপানো হলেও বোর্ড জানুয়ারির প্রথম দিকে বই বিক্রয়ের আদেশ দেয়নি। ৩১ জানুয়ারি বোর্ড বিক্রয়ের আদেশ দিলেও ঈদের ছুটির কারণে এই আদেশ কার্যকর বাধাগ্রস্ত হয়। যার কারণে বিনামূল্যের পাঠ্যবই খোলা বাজারে চড়া দামে বিক্রি হতে থাকে। রাজধানীর স্কুলগুলোতে বই পৌঁছাতে ফেব্রুয়ারি (১৯৯৮) মাস পার হয়ে যায়। খোলা বাজারে বোর্ডের বই বিক্রি করার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৮ জন শিক্ষা অফিসার ও ১২ জন বিভাগীয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা হয়। বগুড়া, পাবনা, রাজশাহীতে বই পাঠানো হয় মার্চ মাসে। ১৯৯৮ সালে ১৯৯৯ সালের পাঠ্যপুস্ত ক মুদ্রণ প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক টেন্ডার আহবানের নামে মুদ্রণের কাজ ভারতের হাতে তুলে দেয়ার চক্রান্ত হয়েছিল কিন্তু দেশীয় মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানসমূহের চাপে এই উদ্যোগ পন্ড হয়ে যায়। এ বছরও পুরাতন বই সংগ্রহের উদ্যোগ ফলদায়ক হয়নি। যেসব পুরাতন বই সংগ্রহ করা হয়েছিল তা ছিল ব্যবহারে অযোগ্য। কিন্তু বোর্ড পক্ষ থেকে বই বন্টন নিয়ম করা হয় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৩টি নূতন, ১টি পুরাতন, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে ৪টি নতুন, ২টি পুরাতন ও পঞ্চম শ্রেণীতে ৩টি নূতন, ৩টি পুরাতন বই দেয়ার। পুরাতন বইগুলো ব্যবহার অযোগ্য হওয়ায় স্কুলের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনুপাতে বইয়ের সেটের সংখ্যা বাড়িয়ে বোর্ডে জানানো হয়। বর্ধিত আবেদনের সংখ্যানুপাতে বই সরবরাহ নিয়ে বোর্ড বেকায়দায় পড়ে যার কারণে ১৯৯৯ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীদের বই পেতে বিলম্ব হয়।

২০০০ সালের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের শর্তারোপের কারণে দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ দরপত্র প্রদান প্রত্যাখ্যান করে। ৬৫ কোটি টাকার এই প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের সহায়তা দেবার কথা ছিল মাত্র সাড়ে সাত কোটি টাকা। কিন্তু এই সহায়তার বিপরীতে যে শর্ত জোড়ে দেয়া হয় তাহলো এই প্রকল্পের দরপত্রে যেসব দেশের উপর বিশ্বব্যাংকের নিষেধাজ্ঞা নেই তারা অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং ১১১টি প্যাকেজে বিভক্ত এই কাজের মধ্যে ৪টি প্যাকেজ রয়েছে প্রায় ৪টি কোটি মূল্যমানের। এই বিশাল অংকের প্যাকেজ বাস্তবায়ন বাংলাদেশের কোন একক মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এই মুদ্রণ দরপত্র জমা না দেয়ার জন্য মুদ্রণ শিল্প সমিতি সিদ্ধান্ত নেয়। এসব প্যাকেজ নির্ধারণের মূল উদ্দেশ্য দেশের মুদ্রণ কাজকে ভারতের হাতে তুলে দেয়া। পরবর্তীতে মুদ্রণ শিল্প সমিতি-বোর্ডের মধ্যে সমঝোতা হলেও এনসিটিবি অর্থপ্রদান ও কাগজ সরবরাহে জটিলতা সৃষ্টি করে, অবশেষে ২০০০ শিক্ষাবর্ষের বই তাড়াহুড়া করে ছাপানোর ফলে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ে থাকে অসঙ্গতি, ভুল আর বিভ্রান্তির ছড়াছড়ি। বাক্যগঠন, বানান, প্রশ্নোত্তর, যুক্তবর্ণ, ব্যাকরণ, সব ক্ষেত্রেই থাকে অসংলগ্ন ভুলে ভরা। এসব বই থানা শিক্ষা অফিসের গুদামে স্তূপাকারে পড়ে থাকে। স্কুলের বই স্কুলে না যেয়ে চলে যায় বইয়ের দোকানে। ২০০০ শিক্ষাবর্ষের এপ্রিল মাস নাগাদ দেশের উত্তরাঞ্চলের ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী পাঠ্যবই থেকে বঞ্চিত হয়। থানা শিক্ষা অফিস থেকেই এ বছর বই বন্টনে অনিয়ম ঘটে।

আওয়ামী সরকারের ৫ বছরে দেশের উল্লেখযোগ্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী সংসদের নির্বাচন হয়নি। আওয়ামীরা বিশ্ববিদ্যালগুলোতে শিক্ষার্থীদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেনি। অথচ প্রতিবছর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা ফি

www.pathagar.com

আদায় করা হয়। প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব ও নিজের পছন্দসই ব্যক্তি বা দলকে নির্বাচনের মাধ্যমে ভোট দিতে না পারায় স্থবির হয়ে পড়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সুকুমার বৃত্তি ও সৃজনশীলতার চর্চা। ক্ষমতায় আসার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদ (ডাকসু) ভেঙ্গে দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলা হলেও নির্বাচনে ছাত্রলীগ হেরে যাবে এই ভয়ে আর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা, ছাত্রলীগের দখলদারিত্বের ছাত্র রাজনীতিতে কোণঠাসা হয়ে পড়ে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা। ডাকসু ছাড়াও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদ (রাকসু), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদ (জাকসু), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদ (বাকসু) সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন নির্বাচন হয়নি। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে কখনো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদ (ইকসু) নির্বাচন হয়নি। দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের করুণ অবস্থার কারণে কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা কাজ করেনি। ডাকসুর সর্বশেষ নির্বাচন হয় ১৯৯০ সালে। নির্বাচনে ছাত্রদলের আমান-খোকন-আলম পরিষদ নির্বাচিত হয়েছিল। বিএনপি সরকারের আমলে ১৯৯১, ১৯৯২ ও ১৯৯৪ সালে নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়া হয় কিন্তু বিরোধী ছাত্র সংগঠন হিসেবে ছাত্রলীগের বিরোধিতার মুখে নির্বাচন হয়নি। আওয়ামী শাসনামলে ১৯৯৮ সালের ২৭ মে ভিসি অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী ডাকসু ভেঙ্গে দেন। তখন সিনেট ডাকসুর গঠনতন্ত্রও সংশোধন করে। সেখানে প্রতিবছর নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান রাখা হয়। আর এ কার্যকারিতা নির্ধারণ করা হয় ১ বছর। পরবর্তীতে ৯০ দিনের মধ্যে আপনাআপনি ডাকসু ভেঙ্গে যাবে বলে বিধান রাখা হয়। নির্বাচন না হলে জনপ্রতি ১১০ টাকা হারে প্রতি বছর লাখ লাখ টাকা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে নেয়া হয়। এমনকি খরচও দেখানো হয়। ১৯৯৬-১৯৯৭ ১লাখ ৩০ হাজার টাকা ডাকসু বাবদ খরচ দেখানো হয়। এতো টাকা কোথায় খরচ হয়েছে এ নিয়ে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে প্রশ্ন দেখা দেয়। ডাকসু ভবনসহ হল সংসদের রুমগুলো ছাত্রলীগের কাজে, বিভিন্ন সভা-সমাবেশের প্রস্তুতির জন্য অফিস রুম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের এখানে বিচরণ অলিখিতভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। রাকসুর সর্বশেষ নির্বাচন হয় ১৯৯০ সালের প্রথমার্ধে। এরপর ৩ বার নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু কোন নির্বাচন হয়নি। অথচ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে প্রতিবছরই এ বাবদ ফি নেয়া হয়। চাকসু সর্বশেষ নির্বাচন হয়েছিল ১৯৯০ সালে। এরপর কোন নির্বাচন হয়নি। জাকসুর সর্বশেষ নির্বাচন হয় ১৯৯২ সালে। ছাত্রলীগের ক্যাম্পাসে একক আধিপত্য থাকলেও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের কতটুকু সমর্থন দিবে এ নিয়ে তাদের সন্দেহ ছিল বলে কোন নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বাকসুর সর্বশেষ নির্বাচন হয় ১৯৯৫ সালে। এরপর আর কোন নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সময়ই ছাত্রলীগের আধিপত্য ছিল না। নিজেদের নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলেই সরকারের কোন সবুজ সংকেত পাওয়া যায়নি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংসদের নির্বাচন করার।

ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকে ৫ বছরের অব্যাহত দলীয়করণের পরিণতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আওয়ামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচিতি লাভ করে। শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ থেকে শুরু করে, সন্ত্রাস দমন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন কাজ, হলে ছাত্র-ছাত্রীদের সীট বরাদ্দ, আইন-শৃংখলা বজায় রাখা, শিক্ষকদের আবাসিক সুবিধা দান, সিনিয়রিটি প্রদান, স্কলারশিপ মনোনয়ন, সাংস্কৃতিক ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, ক্লাস নেয়া, ছুটি নির্ধারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়ে মোড়ে মূর্তি স্থাপন এমনকি বিভিন্ন অফিস, ক্লাস ও সেমিনার কক্ষে

www.pathagar.com

সংবাদপত্র রাখা না রাখা পর্যন্ত প্রতিটি কাজে দলীয়করণের ছাপ স্পষ্ট ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি এমাজউদ্দীন আহমদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করে প্রহসনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভিসি পদে একে আজাদ চৌধুরীকে বসানো হয়। একে আজাদ তার কাজকর্মে আওয়ামী সমর্থিত নীল দলের শিক্ষক এবং আওয়ামী লীগের নেতা-নেত্রী ও দলীয় ক্যাডারদের মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। দলীয়করণে অতিষ্ঠ সাদা দলের শিক্ষকরা তার কাজকর্মকে স্রেফ তোঘলকি কর্মকান্ড বলে অভিহিত করেন। ১৯৯৯ সাল থেকে আওয়ামী শাসনের শেষ পর্যন্ত সাদা দলের শিক্ষকরা ভিসির কাছে ৩টি খোলা চিঠি দেন। এসব চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দলীয়করণের আংশিক চিত্র প্রকাশ পায়। প্রথম চিঠি দেয়া হয় ২৮ নভেম্বর। সে চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দলীয়করণ এবং বিধি-বহির্ভূত কিছু কাজের উদাহরণ উল্লেখ করা হয়। ভিসি সেই চিঠি অনুযায়ী বিধি-বহির্ভূত কাজের প্রতিবিধানের ব্যবস্থা নেননি। বরং তিনি খোলা চিঠিতে বর্ণিত অভিযোগ অস্বীকার করে অন্য একটি চিঠি সাধারণ শিক্ষকদের মাঝে বিতরণ করেন। সাদা দলের চিঠিতে বর্ণিত অভিযোগগুলোর পক্ষে যে তথ্য প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয় তা খন্ডন করা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় ২০০০ সালের ১০ জুলাই ভিসিকে দ্বিতীয় খোলা চিঠি দেয়া হয়। এতেও কাজের কাজ কিছু না হওয়ায় ২০০১ সালের মে মাসে তৃতীয় খোলা চিঠি দিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ সম্পর্কে ভিসির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়। যে সব ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অনিয়ম হয় তা হলো শিক্ষক, প্রাধ্যক্ষ, ওয়ার্ডেন ও আবাসিক শিক্ষক নিয়োগে দলীয়করণ, আর্থিক অব্যবস্থা, ছাত্রলীগের ক্যাডারদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, ছিনতাই, চাঁদাবাজী, টেন্ডারবাজি, অপহরণের অভিযোগ সম্পর্কে সব জেনেও না জানার ভান করা, বিভাগীয় সমন্বয় ও উন্নয়ন (সিএন্ডডি) কমিটির মতামতকে তোয়াক্কা না করে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনায় শিক্ষক নিয়োগ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্বাচনী সভা না ডেকে বিপক্ষ মতের শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রাখা, বিধি-বহির্ভূতরূপে সিনিয়রিটি প্রদান, স্কলারশিপ মনোনয়ন, হলে আবাসিক-দ্বৈতাবাসিক হিসেবে বরাদ্দের ক্ষেত্রে দলীয় বিবেচনাকে প্রাধান্য দেয়া। ৫ বছরে বিভিন্ন বিভাগে কম করেও ৫০ জন শিক্ষককে আওয়ামী লীগের পরিচয়ের জন্য বিধি বহির্ভূতভাবে নিয়োগ দেয়া হয়। রাসয়ন বিভাগে এ ধরনের নিয়োগ হয় সবচেয়ে বেশি। এ বিভাগে মেধাক্রমে প্রথম থেকে অষ্টম স্থান অধিকারীদের বাদ দিয়ে নবম থেকে ১৪তম স্থান অধিকারী ৫ জনকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। একই ধরনের ঘটনা ঘটে সমাজ বিজ্ঞান, আইন বিভাগ, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান ইন্সটিটিউটসহ অন্যান্য বিভাগে। এ বিষয়ে খোলা চিঠিতে বলা হয়, 'শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সিএন্ডডি কমিটির মতামতকে বারবার অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। শূন্যপদ বিজ্ঞাপিত করার ও নির্বাচনী বোর্ড ডাকার ক্ষেত্রে দলীয় স্বার্থ সামনে রেখে কোন কোন ফাইল মাসের পর মাস ফেলে রাখা হচ্ছে। আবার ক্ষেত্র বিশেষে অত্যন্ত দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। দৃষ্টান্ত চাইলে বিভাগ ইন্সটিটিউট থেকে অনেক নজীর হাজির করা যায়।' ভিসিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়, তার সময়ে অনিয়মই নিয়মে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক সরকারের তোষণনীতির মাধ্যমে দায়িত্বশীলতা ও নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার অভিযোগও তার বিরুদ্ধে আনা হয়। খোলা চিঠিতে আরো বলা হয়, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ টি হলের মধ্যে ১২ টি হলের প্রাধ্যক্ষ নীল দলের। সাদা ও গোলাপী দলের ১ জন করে প্রাধ্যক্ষ রয়েছেন। সাদা দলের প্রাধ্যক্ষ বর্তমান ভিসির পূর্বের আমলে ২/১টি ব্যতিক্রম ছাড়া কোন হলেই নীল দলের বাইরের কোন শিক্ষককে আবাসিক শিক্ষক হিসেবে

www.pathagar.com

নিয়োগ দেয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সিদ্ধান্তের বিপরীতে কোন কোন হলের আবাসিক শিক্ষকদের কোনরূপ কারণ ছাড়াই মেয়াদ বৃদ্ধি না করে আবাসিক শিক্ষক পদ থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। তার স্থলে নীল দলীয় শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর আগে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে সলিমুল্লাহ হলের প্রাধ্যক্ষকে সরিয়ে তার হলেই তিনজন শিক্ষককে অন্যায়ভাবে আবাসিক শিক্ষক পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছিল।' আর্থিক অনিয়ম সম্পর্কে সাদা দলের শিক্ষকরা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন সেক্টরের নিয়ন্ত্রণকর্তা হল অবাঞ্ছিত ঘোষিত একজন অছাত্র-যার বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শৃংখলা পরিষদ ও সিন্ডিকেট-এর সিদ্ধান্ত হয়েছে। সে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহণ খাতে কোটি টাকা নিয়ন্ত্রণ করছে তাই নয়, উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন রুটের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। কিছুদিন আগে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ কোটি টাকার খরচের কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবী ছিল শিক্ষকদের। কিন্তু সেই শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হয়নি। বিগত বছরগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে উন্নয়ন কাজ হয়েছে, তাতে সরকার কত টাকা দিয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল থেকে কত টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে-তাও জানানো হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অবাঞ্ছিত ঘোষিত একজন অছাত্রের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি বাস পানির দামে বিক্রি করে দেয়া, এই অছাত্রের মাধ্যমে পরিবহন খাতের তেল ক্রয় করা, গাড়ি মেরামতের যাবতীয় নিয়ন্ত্রণসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন ব্যবস্থাকে তার হাতে তুলে দেয়ার অভিযোগ রয়েছে আগে থেকেই। শিক্ষক-কর্মচারীদের পরিবহনের জন্য বিগত চার বছর কোন গাড়ি কেনা না হলেও ভিসি মহোদয়ের স্ত্রীর জন্য সার্বক্ষণিক ড্রাইভারসহ গাড়ি দেয়ার ব্যতিক্রম ঘটনা সম্পর্কেও শিক্ষকরাও প্রশ্ন তোলেন। সাদা দলের দ্বিতীয় খোলা চিঠিতে বলা হয়, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হল আজ সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। চাঁদাবাজ, ছিনতাইকারী, টেন্ডারবাজ, ড্রাগ ব্যবসায়ী, মুক্তিপণ আদায়কারী ও ধর্ষণকারীদের এক অভয়ারণ্য আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল। নগর ভবনে ফাইভস্টার গ্রুপ, সেভেনস্টার গ্রুপ, শিক্ষাভবনে সন্ত্রাসী কার্যকলাপসহ ঢাকা শহরের অনেক এলাকার চাঁদাবাজী ও সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িতদের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে অবস্থানরত সন্ত্রাসীদের যোগসূত্রের খবর অহরহই পত্রিকায় ছাপা হয়। কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল এলাকা থেকে ছাত্রী ধরে হলে নিয়ে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ছাত্রলীগের চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধেই এ অভিযোগ উঠেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ ক'জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রী ধর্ষণের অভিযোগ শোনা গেছে বর্তমান ভিসির আমলে।' ভিসির উদ্দেশ্যে লেখা সাদা দলের তৃতীয় চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, বর্তমান ভিসির আমলে বিভিন্ন হল থেকে বৈধভাবে অবস্থানরত অনেক ছাত্রকে বহিরাগত সন্ত্রাসীরা বের করে দিয়েছে। ছাত্রী হলে অনুরূপ ঘটনার নজির আছে। দুটি হলের প্রভোস্ট স্বয়ং এ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অভিভাবক হিসেবে ভিসি এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেননি। গত বছর জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রীন রোডস্থ গ্রীন সুপার মার্কেটের পিছনে প্রায় ৩.৬৩ একর খালি জায়গায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল/ সুপারমার্কেট/ আবাসিক ব্লক / অফিস ব্লক/ ফাইভস্টার হোটেলের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণের বিনিয়োগ প্রস্তাব আহ্বান করে। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ কাজ শুরু হয় তা ওপেনলি হয়নি এবং সে জন্য এর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন শিক্ষকদের একাংশ। এসব সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া নীতি ও আদর্শিক প্রশ্নে ৫ বছরে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন হয়েছে। ৫ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের পরিবেশকে মূর্তিময় করে সাজানো হয়েছে। মূর্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে

www.pathagar.com

আগেও ছিল। কিন্তু আওয়ামী শাসনামলে মূর্তির সংখ্যা নজীরবিহীনভাবে বেড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে কোন ছাত্র দাড়ি-টুপি শোভিত ইসলামী বেশ-ভূষায় অভ্যস্ত হলে বা কোন ছাত্রী বোরখা পরলে তাকে নীরব ভর্ৎসনার শিকার হতে হয়। এমন কি কোন শিক্ষক ক্লাসরুমে পর্যন্ত আওয়ামী ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির পক্ষে প্রোপাগান্ডা চালান। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ছাত্রদের নিরাপদে থাকার জন্য ছাত্রলীগ করাটা বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ ছাত্ররা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছাত্রলীগের মিছিলে যেতে বাধ্য হয়। ছাত্রলীগের ক্যাডারদের ভয়ে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা সন্ত্রস্ত থাকে। নিরাপত্তার প্রশ্নে সাধারণ ছাত্র-শিক্ষকরা স্বনামে সাংবাদিকদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করতে সাহস পাননি। জাতীয় সংগীত সম্পর্কে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে গিয়ে ২০০০ সালের ডিসেম্বরে নানামুখী আক্রমণের শিকার হন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক আফতাব আহমাদ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দিয়েছিলেন এবং ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা তার কক্ষে আগুন লাগিয়েছিল। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ২৭ মে ২০০১)

২২ জানুয়ারি ১৯৯৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের কম্পিউটার ক্রয়ের ২৫ লাখ টাকার টেন্ডার নিয়ে ছাত্রলীগের শামীম গ্রুপ ও রতন-তমি গ্রুপের মধ্যে ভয়াবহ বন্দুক যুদ্ধে ৫ জন আহত হয়। সংঘর্ষের জের ধরে পরের দিন ইলিয়াস উদ্দিন রাজু নামে রতন গ্রুপের এক কর্মী শামীম গ্রুপের চাপাতির কোপে মারাত্মক জখম হয়। পুলিশের সহায়তায় ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ২২ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হল, ২৩ এপ্রিল জসীম উদ্দিন হল, জিয়া হল ও মুজিব হল দখল করে অস্ত্রের মুখে ছাত্রদলের প্রায় ৩ হাজার নেতা-কর্মীকে হল থেকে বের করে দেয়। হল দখলের সময় পার্থ প্রতিম আচার্য ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সামনে অগ্রসর হলে নিজ সংগঠনের প্রতিপক্ষ গ্রুপের এক ক্যাডার পিছন থেকে গুলি করলে সে নিহত হয়। অপরদিকে সাধারণ ছাত্রদের ওপর পুলিশের নগ্ন হামলায় ২ শতাধিক ছাত্র আহত হয়। আহতদের রক্তে রঞ্জিত হয় জসীম উদ্দিন হলের করিডোর। পুলিশ জসীম উদ্দিন হল থেকে ছাত্রদলের ৬৫ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে। সাধারণ ছাত্রদের বুক ফাঁটা আর্তনাদে ক্যাম্পাসের বাতাস ভারী হয় ওঠে। হল দখলের প্রতিবাদে ছাত্রদলের সভাপতি শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানির নেতৃত্বে ছাত্রদল ২৬ এপ্রিল নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। পুলিশ মিছিলটিকে ঘিরে কাকরাইল মোড় থেকে এ্যানি সহ ৭৩ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ কন্ট্রোল রুমের সামনে নিয়ে যায় এবং তাদের প্রখর রৌদ্রে খালি গায়ে বসিয়ে রাখে।

৭ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খ' ইউনিটের অধীনে ১৯৯৮-৯৯ সেশনের প্রথম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষার ১ নম্বর সেটের প্রশ্নপত্রে সাধারণ জ্ঞান অংশের ৬ নং প্রশ্নে সংযোজন করা হয়, 'আওয়ামী লীগের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন, (ক) শেখ মুজিবুর রহমান, (খ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, (গ) এ. কে ফজলুল হক, (ঘ) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী?'

২১ মে শহীদুল্লাহ হল দখলকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষে ১০ জন আহত হয়। ৬ জুন অভ্যন্তরীণ কোন্দলে শামীম গ্রুপের ৫ কর্মী প্রহৃত হয়।

বিসিএস ২০ তম ব্যাচের সাধারণ জ্ঞানের বাংলাদেশ বিষয়াবলী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ৭ জুন। ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় ৭ টি প্রশ্ন ছিল এবং ৭ টিরই উত্তর দিতে হয়। প্রশ্নটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করা হয়। ১ নং প্রশ্নে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব সম্বন্ধে

www.pathagar.com

আলোচনা করতে বলা হয়। অথচ সংবিধানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ স্বীকৃত। রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির অন্যতম এই নীতির পরিবর্তিত নাম বাঙ্গালী সংযোজন করে সংবিধানকে অবমাননা করা হয়। ৫ নং প্রশ্নে বলা হয়, 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের পাবর্ত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির (২ ডিসেম্বর ১৯৯৭) গুরুত্ব আলোচনা করুন'। সর্বশেষ প্রশ্ন অর্থাৎ ৭ নং প্রশ্নটি ছিল বাধ্যতামূলক। ৭ নং প্রশ্নের মধ্যে মোট ১০ টি ছোট প্রশ্ন ছিল। ৭ এর (ক) নং প্রশ্ন হলো, 'ইনডেমনিটি কী? ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর জারিকৃত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ কখন ও কি কারণে বাতিল হয়ে যায়?' শেখ মুজিবের হত্যাকান্ড বিষয়ক ইনডেমনিটি বিল নিয়ে প্রশ্ন করার কোন প্রয়োজন ছিল না। আওয়ামী লীগাররাই এটি সংসদের মাধ্যমে জারী করেছে। আবার তারাই তা বাতিল করেছে।

১ সেপ্টেম্বর বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দিনকে লক্ষ্যবস্তু করে গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার সাধারণ গণিত প্রশ্নপত্রের ৬ নং প্রশ্ন ছিল, 'মনে করা যাক, খালেদা জিয়া বিক্রিত মূল্যের উপর ১০% কমিশন পাওয়ার আশায় ভারতের কাছে বাংলাদেশ ৯৫ হাজার কোটি ডলারে বিক্রি করার একটি চুক্তি করলো, যদি প্রকৃতই তার আশার বাস্তবায়ন ঘটে, তবে খালেদা জিয়া ভারতের কাছ থেকে কত ডলার পাবেন'। এ প্রশ্নের প্রতিবাদের সর্বমহল ধিক্কার দেওয়ার পর সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করেছে, এর পূর্বে নয়। উক্ত প্রশ্নের প্রণেতা ছিলেন অংক শিক্ষক আব্দুল মতিন।

বিশ্ববিদ্যালয় হলো সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যত স্বাধীন জীবন পায় তা কলেজ জীবনেও পায়না। সেই বিশ্ববিদ্যালয় যখন ছাত্রলীগারদের ধর্ষণ কেন্দ্র হয়ে যায়, শিক্ষক নামধারী কিছু অপদার্থের যৌন নিপীড়নের কেন্দ্র হয়ে যায় আর আওয়ামী ভিসি কর্তৃক ব্যবস্থা নেয়ার বদলে অভিযুক্তদের পক্ষে সাফাই গাইতে শুনা যায় তখন বিবেক কোন কিছু মন্ত ব্য করার ভাষা হারিয়ে ফেলে। ১৯৯৯ সালের প্রথম দিনে দৈনিক মানবজমিনের চিঠিপত্র কলামে 'যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান' শীর্ষক একটি আবেদনপত্র প্রকাশিত হয়। আবেদনপত্রের শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'যৌন নিপীড়ন বিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' কথাটি উল্লেখ ছিল। আবেদনপত্রের বিবরণ পড়লে বুঝা যায় আওয়ামী সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ কত ভয়াবহ, বির্পযয়গ্রস্থ।

১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভোলার থেকে দৈনিক জনতার সংবাদদাতা লালমোহন উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন তার পাঠানো এক সংবাদ প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, 'প্রাথমিক শিক্ষকদের দুর্নীতি ও কর্তব্যে অবহেলার কারণে লালমোহন উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের প্রায় সব কয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে চলেছে। উপজেলার প্রায় সব ক'টি বিদ্যালয়েই কর্মরত শিক্ষকগণ সময় মত স্কুলে আসেন না এবং নির্ধারিত স্কুল-সময়টুকুও তারা স্কুলে থাকেন না। যেটুকু স্কুলে থাকেন সে সময়টুকুও পাঠদানের কাজে ব্যবহার করেন না। মূলত প্রতিটি স্কুলের প্রায় প্রতিটি শিক্ষকই ব্যস্ততায় সময় কাটান শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য আনার কাজে। অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী দেখিয়ে কাগজপত্র ও রেজিষ্ট্রার তৈরি করেন এবং সে হিসেবে গম তুলে আনেন। তাদের এ ধরনের অপকর্মের মদদ দিয়ে যায় স্থানীয় শিক্ষা বিভাগের এক শ্রেণীর দুর্নীতি পরায়ন কর্মকর্তা, কর্মচারী। প্রাপ্ত গম বেহাত করার মাধ্যমে যে অর্থাগম ঘটে তার একটি অংশ যায় ঐসব দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা, কর্মচারীদের পকেটে। দুর্নীতিপরায়ণ শিক্ষকরা অধিক ছাত্র-ছাত্রী দেখিয়ে আনুপাতিক গম তুলে আনেন। অন্যদিকে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের যে

www.pathagar.com

পরিমাণ গম দেয়ার কথা সে পরিমাণ গমও তাদের দেয়া হয় না। বেশি আনেন যেমন তেমনি বন্টন করেন কম। এই উভয় দিকের পাওয়া গম তারা নিজেরা ভাগাভাগি করে নেন, কালোবাজারে বিক্রি করে দেন। ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া কতটুকু হচ্ছে সেদিকে তাদের নজর একেবারেই নেই। এভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির গম অবৈধভাবে বাজারে বিক্রির অভিযোগে বেশ কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু স্থানীয় শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের একটি অংশ এই দুর্নীতির সাথে জড়িত সেহেতু বহু শিক্ষক দুর্নীতি করেও আইনের হাতের বাইরে বহাল তবিয়তে আছেন। শিক্ষকদের এ ধরনের দুর্নীতি স্থানীয় অভিভাবকদের ক্ষুব্ধ করলেও দুর্নীতি ঠিকই চলছে। ২৫ জানুয়ারি লালমোহন উপজেলার নির্বাহী অফিসার সরেজমিনে উপজেলার সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলো পরিদর্শনে শিক্ষকদের কর্তব্য অবহেলা এবং দুর্নীতির অনেক ঘটনাই তার নজরে আসে। অনেক স্কুলে গিয়ে তিনি শিক্ষক-ছাত্র-ছাত্রী কাউকেই পাননি। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই স্কুলগুলো ছুটি হয়ে যাওয়াতে তিনি শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী কাউকে পাননি। স্থানীয় অভিভাবকদের কাছে তিনি শিক্ষকদের সময়মতো স্কুলে না আসা, নির্ধারিত সময়ে স্কুলে উপস্থিত এবং যথারীতি পাঠদান না করার প্রবণতা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হন। তার কাছে অভিযোগ আসে যে, শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাপ্য নির্ধারিত পরিমাণের গম যথাযথভাবে বন্টন করেন না। (সূত্র ঃ দৈনিক জনতা ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯)

নকল বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়ে শুরু হয়েছিল ১৯৯৯ সালের এসএসসি পরীক্ষা। নকল বন্ধ হওয়া দূরে থাকুক, নকলের গণজোয়ার এসেছে পরীক্ষায়। নকল উৎসবে শিক্ষক থেকে শুরু করে প্রায় সকলেই অংশগ্রহণ করেন। নকলের গণজোয়ার এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছে যে, রাস্তায় পরীক্ষার খাতাও পাওয়া যায়। মানিকগঞ্জের শিবালয় এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রের বইরে জীববিজ্ঞান পরীক্ষার উত্তর লেখা একটি খাতা পাওয়া যায়। খাতাটির পুরো চার পাতার এপিঠ-ওপিঠ জীববিজ্ঞান পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর লেখা। খাতাটি কোন পরীক্ষার্থীর নামে ইস্যু করা হয় এমন কোন রেকর্ড কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের কাছে ছিলনা। তবে এটা স্পষ্ট যে, খাতাটি যেভাবেই হোক সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং তাতে প্রশ্নের উত্তরও সঠিকভাবে লেখা হয়েছিল। (সূত্রঃ দৈনিক মানব জমিন ২৪ মার্চ ১৯৯৯)

৬ এপ্রিল জাতীয় সংসদে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস নেই, এখন আর ক্যাম্পাসে গুলির শব্দ হয় না-'মর্মে শিক্ষামন্ত্রী এএস এইচকে সাদেকের ভাষণের পর ৮ এপ্রিল মদ, গাজা, ফেনসিডিল ব্যবসা, ছিনতাই, অপহরণসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ তালিকাভুক্ত ১২ জন ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীকে ধরতে ভোর ৫ টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলে যায়। হলের গেট বন্ধ থাকায় কলাপনসিবল গেট টপকে এডিসি মোর্শেদের নেতৃত্বে কয়েকজন পুলিশ হলের ভিতরে প্রবেশ করে এবং বিপুল সংখ্যক পুলিশ হলের চারদিক ঘিরে অবস্থান নেয়। গোপন সূত্রে তথ্যানুযায়ী পুলিশ প্রথমে হলের টপটেরর এবং ছাত্রলীগের বহিরাগত ক্যাডার টোকাই মিজানকে ধরতে সরাসরি ২০৩ নম্বর কক্ষে গিয়ে নক করে। দরজায় পুলিশের ধাক্কাধাক্কি সত্ত্বেও মিজান দরজা খুলতে অস্বীকৃতি জানিয়ে পুলিশকে চলে যেতে বলে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে গুলি করা হবে বলেও সে পুলিশকে হুমকি দেয়। ভিতরে ঢুকতে চাইলে মিজান কক্ষের ভিতর থেকে সরাসরি তাকে উদ্দেশ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে। একটি গুলি এডিসি মোর্শেদর হাতের কুনইতে বিদ্ধ হয়ে অপর প্রান্ত দিয়ে বের হয়ে যায়। এ সময় পুলিশ বিক্ষুব্ধ হয়ে পাল্টা গুলিবর্ষণ শুরু করে কিন্তু কক্ষের

www.pathagar.com

ভিতরে ঢুকতে কেউ সাহস পায়নি। পুলিশের এই কাপুরুষতার সুযোগ নিয়ে অস্ত্রসহ মিজান রুমের জানালা দিয়ে হলের বাইরে লাফ দেয় এবং হলের চারপাশে অবস্থানরত পুলিশকে উদ্দেশ্য করেও কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে। প্রাণ বাঁচাতে হলের বহির্বিভাগের অবস্থানরত পুলিশরাও নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেয়। এসময় পুলিশের উদ্দেশ্যে 'এইতো আমি পালিয়ে গেলাম' দম্ভোক্তি করতে করতে মিজান পুলিশের নাগালের বাইরে চলে যায়। এ ঘটনার পর পুলিশ ২০৩ নম্বর কক্ষে ঢুকে ২১ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে। তবে পুলিশ আরো কয়েকটি রুমে তল্লাশি চালিয়ে কাউকে গ্রেফতার বা কোনো অস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি। পুলিশ চলে যাওয়ার পর সকালে হলের ছাত্রলীগ ক্যাডাররা হল গেটে নিয়মিত অবস্থানকারী পুলিশদের মাধর করে হল থেকে বের করে দেয়।

২৯ এপ্রিল ১৯৯৯ দৈনিক দিনকালে একটি ছবি প্রকাশ করে একটি ছোট্ট খবরে বলা হয়, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অস্ত্রধারীরা কারা? গতকাল বুধবার ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের বিক্ষোভ সমাবেশ চলাকালে এই অস্ত্রধারীদের ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া দিতে দেখা যায়। অস্ত্রধারীরা ছাত্রদলের সমাবেশস্থল ও ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান নেয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে'।

৫ মে বেসরকারি শিক্ষক সমিতির সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ঘটে যায় তুলকালাম কান্ড। ওইদিন শিক্ষকদের সম্মেলনে তাদের দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী কোনো কথা না বলায় সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকবৃন্দ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। বক্তব্য শেষে প্রধানমন্ত্রী মঞ্চ ত্যাগ করার সাথে সাথে শিক্ষকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং শিক্ষক সমিতির সভাপতি আওয়ামী লীগ নেতা কামরুজ্জামানকে ঘিরে ধরেন। তারা চেয়ার ভাংচুর এবং সম্মেলনে বহন করে আনা ব্যানারসমূহ স্তূপ করে তাতে অগ্নিসংযোগ করেন। বিক্ষুব্ধ শিক্ষকরা নানা শ্লোগান দিয়ে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এক পর্যায়ে পুলিশ বিক্ষুব্ধ শিক্ষকদের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং শুরু করে বেধড়ক পিটুনী। পুলিশের লাঠির আঘাতে প্রায় শতাধিক শিক্ষক আহত হন। 'শিক্ষকদের সব দাবী পূরণ করা হবে এবং প্রধানমন্ত্রী সে ঘোষণা দেবেন-'এ কথা বলে সারাদেশ থেকে শিক্ষকদের সম্মেলনে এনে জড়ো করা হয়। কিন্তু সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী কিংবা প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে কোনো কথা না বলায় শিক্ষকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উপরোক্ত ঘটনা ঘটায়। শিক্ষকদের দাবীর মধ্যে তাদের বেতনের ১০০ ভাগ সরকারি তহবিল থেকে প্রদান, ২০ ভাগ বাড়িভাড়া এবং দু'টি উৎসব ভাতা বোনাস ছিল অন্যতম।

নবাগত আওয়ামী লীগ নেতা এস.এম. এ রবের পুত্র হওয়ার সুবাদে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রে রসায়ন প্রথম পত্রের পরীক্ষা শুরু হওয়ার ২ ঘন্টা পরে জোর করে পরীক্ষা দিতে সক্ষম হয় এস এম আশফাকুর রহমান (রোল নং ২০৬৭২৫)। কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ প্রথমে বাধা দিলেও পরে তা আর রুখতে পারেনি। ১৯ মে যথারীতি সকাল ১০ টায় এইচ এসসি পরীক্ষা শুরু হয়। দুপুর ১২ টার সময় আশফাকুর রহমান রসায়ন প্রথম পত্রের পরীক্ষা দিতে আসে। এ সময় কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ ও কলেজ অধ্যক্ষ অধ্যাপক মাযহারুল হান্নান বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। পরে অধ্যক্ষ খুলনা জেলা প্রশাসকের নিকট বিষয়টি জানান। জেলা প্রশাসক অধ্যক্ষকে বিধি অনুযায়ী করণীয় পরামর্শ দেন এবং বোর্ড কন্টোলারকে জানাতে বলেন। বিধি অনুযায়ী একজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা শুরু হওয়ার আধা ঘন্টা পরে গেলে তাকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেয়ার নিয়ম নেই। তারপরও কলেজ কর্তৃপক্ষ আওয়ামী নেতার পুত্রের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হন।

www.pathagar.com

লক্ষীপুরের কুশাখালী ইউনিয়ন ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট মাওলানা আব্দুস সালাম এক বছর ধরে শিক্ষা ভবনের এ-দুয়ার থেকে ওই দুয়ারে ঘুরে বেড়ান। বন্ধ রাখা অনুদান পুনরায় চালু করার একটি ফাইল স্বাক্ষর করানোর জন্য তার এই ভোগান্তি হয়। ফাইলটি এ টেবিল থেকে ওই টেবিল ঘুরে এপ্রিলে (১৯৯৯) পরিচালকের টেবিলের ডান পাশে ফ্লোরে আটকা পড়ে ছিল। প্রায় এক সপ্তাহ আগে ফাইলটি পরিচালকের রুমে এলেও দেখার সুযোগ হয়নি পরিচালক প্রফেসর একে শাহজাহান কবিরের। ফাইলের খবর নেয়ার জন্য সুপারিনটেনডেন্ট শিক্ষা ভবনের বারান্দায় বারান্দায় কাটিয়ে দেন দিনের পর দিন। ১ জুন শিক্ষা ভবনে দৈনিক দিনকালের কাছে আব্দুস সালাম জানান, '১৯৯৫ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত এ তিন বছর তাদের মাদ্রাসায় দাখিল পরীক্ষার্থী না থাকায় অনুদান বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৯৯৮ সালের দাখিল পরীক্ষায় ওই মাদ্রাসা থেকে ৭১ ভাগ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়। এরপর ১৯৯৮ সালের মে মাসে অনুদান পুনরায় চালু করার জন্য মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন। তাদের এ ফাইলটি শিক্ষা ভবনের বিভিন্ন টেবিল ঘুরে ২৭ মে পরিচালকের টেবিলে আসে। এ ফাইলের খবর নিতে যখনই আসা হয়, তখনই শোনা যায় পরিচালক সাহেব মন্ত্রণালয়ে বৈঠকে আছেন।' ঐ দিন পরিচালকের কক্ষে গিয়ে দেখা যায় অনেকগুলো ফাইল তার টেবিলের ডানপাশে ফ্লোরে পড়ে আছে। অফিসের পিয়ন জানালেন স্যার কিছুদিন ধরে খুবই ব্যস্ত আছেন-তাই ফাইল দেখার সময় পাচ্ছেন না। পরিচালকের অফিস রুমের সামনে ছিল প্রচন্ড ভীড়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা তাদের সমস্যা নিয়ে আসেন পরিচালকের সঙ্গে কথা বলতে। ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করে পরিচালক না আসায় তাদের ফিরে যেতে হয়। পরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী জানান, 'সকাল সাড়ে দশটার দিকে পরিচালক সাহেব অফিসে এসে কিছুক্ষণ পর চলে গেছেন মন্ত্রণালয়ে, অর্ধদিবস ছুটি থাকায় তিনি আজ আর আসবেন না।' অনেকেই অভিযোগ করেন গত ৩/৪ দিন ধরে ঘুরাঘুরি করেও পরিচালকের সঙ্গে দেখা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পরিচালক অফিসে এসে কয়েক মিনিট নিজ কক্ষে থাকেন। এরপর চলে যান। ব্যক্তিগত সহকারীর কাছে জানতে চাইলে প্রতিদিন একই জবাব দেয়া হয়, স্যার মন্ত্রণালয়ে মিটিং-এ আছেন।

৩০ জুন সিলেটের ঐতিহ্যবাহী মদন মোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের উপাধ্যক্ষ শ্রী প্রণব কুমার সিংহ-এর চাকরীর মেয়াদ বর্ধিতকরণের জন্য আবেদন জানালে কলেজ পরিচালনা পরিষদ তা নাকচ করে দিলে উপাধ্যক্ষ পদটি শূন্য হয়। পদটি শূন্য হবার পর পত্রিকায় পদের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এই শূন্য পদে অত্র কলেজের ছয়জন শিক্ষক আবেদন করেন। ছয় জনের মধ্যে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান মুহিবুর রহমান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান আক্রাম আলী ছিলেন উপাধ্যক্ষ পদের অন্যতম প্রার্থী। উপাধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য পরিচালনা পরিষদ একটি বাছাই কমিটি গঠন করে। এই বাছাই কমিটির সদস্যরা হলেন কলেজ পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান সৈয়দা জেবুন্নেছা হক এমপি, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু নছর এডভোকেট, সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মোদাব্বির আলী, কুমিল্লা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ এটিএম নূরুল ইসলাম ও মদন মোহন কলেজের অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম চৌধুরী। বাছাই কমিটি ৯ অক্টোবর বাছাই পরীক্ষার মাধ্যমে অত্র কলেজের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান মুহিবুর রহমানকে উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগের জন্য পরিচালনা কমিটির নিকট প্রস্তাব পেশ করে। ১৬ অক্টোবর পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান বাছাই

www.pathagar.com

কমিটির মনোনয়ন অনুমোদন করে ১৯ অক্টোবর মুহিবুর রহমানকে উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দান করেন। কিন্তু এ নিয়োগের বিরুদ্ধে আক্রাম আলী উপাধ্যক্ষ নিয়োগে অনিয়ম ও দলীয়করণের অভিযোগ আনেন এবং এ নিয়ে সিলেট সহকারী জজ আদালতে এক মামলা দায়ের করেন। বিজ্ঞ আদালত বাছাই কমিটিকে কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করেন। আক্রাম আলীর অভিযোগ ছিল, 'বাছাই কমিটি বিধি মোতাবেক গঠিত হয়নি। বৈধ সদস্যকে বাদ দিয়ে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে কুমিল্লা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষকে বাছাই কমিটিতে এনে দল ভারী করা হয়েছে। অথচ শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আব্দুল আজিজ ভিসি'র প্রতিনিধি হিসেবে কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্য। নিয়ম মোতাবেক তারই বাছাই কমিটিতে থাকার কথা। কিন্তু তাঁকে ইচ্ছাকৃত বাদ দেয়া হয়েছে'। আক্রাম আলী অভিযোগে আরও বলেন, '৬ জন প্রার্থীর মধ্যে মুহিবুর রহমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা সর্বনিম্ন পর্যায়ের। ১৯৯৬ সালের সরকারের জনবল কাঠামো অনুযায়ী স্নাতক (পাস) ডিগ্রীধারী অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এমন কি প্রভাষক পদে নিয়োগ পেতে পারেন না। কিন্তু একমাত্র আওয়ামী লীগের লোক হওয়ায় বাছাই কমিটি ও পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান সকল নিয়মনীতি উপেক্ষা করে মুহিবুর রহমানকে উপাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দান করেছেন।' আক্রাম আলী আরও বলেন, 'মুহিবুর রহমানের যোগ্যতা হলো তিনি এমপি সৈয়দা জেবুন্নেছা হকের দলের লোক আর আমার যোগ্যতা হলো আমি আওয়ামী লীগের লোক নই।' ২৪ অক্টোবর দৈনিক সিলেটের ডাক পত্রিকার এক বিবৃতিতে মদন মোহন কলেজ শিক্ষক পরিষদের নেতৃবৃন্দ মুহিবুর রহমান কলেজের উপাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ লাভ করায় তাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। কিন্তু পরদিন দৈনিক জালালাবাদে শিক্ষক পরিষদের অভিনন্দনে বিস্ময় প্রকাশ করেন কলেজের ৪৫ জন শিক্ষক। তারা বিবৃতিতে বলেন, '১৪ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত কলেজ বন্ধ। বন্ধের সময় কলেজ শিক্ষক পরিষদের কোন সভা হয়নি। তাই শিক্ষক পরিষদের অভিনন্দনমূলক বিবৃতি বিভ্রান্তিমূলক'।

৬ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শাঃ ৮/১০-এম-১/৯৫/৩৭৩১(৮) শিক্ষা পরিপত্রে দেশের সরকারি/বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহের জন্য এক নির্দেশ জারি করায় দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৭ টি নির্দেশ জারি করা হয়। এই নির্দেশের (ঙ) নম্বরে বলা হয়, 'বিদ্যালয়/কলেজে ৯ টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত শিক্ষকগণকে বাধ্যতামূলক উপস্থিত থাকতে হবে। সে অনুযায়ী প্রয়োজনে ক্লাস রুটিন পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে'। ঢাকাসহ দেশের বেশিরভাগ স্কুল-কলেজে প্রভাতী ও দিবা (ডবল) শিফ্‌ট চলে। প্রভাতী শিফ্‌ট সকাল ৭ টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত আর দিবা শিফ্‌ট দুপুর ১২ টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪ টা পর্যন্ত চলে। সকল শিক্ষককে ৯ টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত বিদ্যালয়ে থাকার নির্দেশের কারণে দু'শিফট ক্লাস নেয়া সম্ভব ছিল না।

আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের প্রথম ৩ বছরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কেও সরকারি করেনি। বিএনপির আমলে প্রায় দু'হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারি করা হয়। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে প্রাথমিক শিক্ষাকে এনজিওদের হাতে তুলে দেওয়ার নীল নকশা তৈরি করে। এরই অংশ হিসেবে ১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থ বছরে ২০ কোটি টাকা এনজিওদের দেয়া হয়। পরবর্তী অর্থ বছরের জন্য আরও ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। বিএনপি সরকারের শেষ সময় পর্যন্ত ৩৭ হাজার ৭শ' ১০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে আর কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করেনি। ১৯৯৯ সালের জুলাই পর্যন্ত

www.pathagar.com

বেসরকারি রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ১৯ হাজার এবং রেজিস্ট্রেশনবিহীন ৪ হাজার। এ সময়ে নতুন কোনো স্কুলকে রেজিস্ট্রেশনও প্রদান করা হয়নি। ১০৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় দীর্ঘদিন থেকে নদীগর্ভে বিলীন হওয়া সত্ত্বেও বছরের পর বছর এসব স্কুলের শিক্ষকদের বেতন উঠানো হয়। ২ জুন ১৯৯৯ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব ডঃ সাদত হুসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় জানানো হয়, নদীগর্ভে বিলীন সরকারি ও বেসরকারি রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৪১। এর মধ্যে সরকারি বিদ্যালয়ের সংখ্য ১৭৬। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ১৭ জুলাই ১৯৯৯)

ছাত্রী ধর্ষণের দায়ে বহিস্কৃত ছাত্রলীগের সশস্ত্র ক্যাডার এবং তাদের বহিরাগত সহযোগীরা ১ আগষ্ট পর্যন্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি হল কামালউদ্দিন হল, সালাম-বরকত হল, ভাসানী হল এবং মীর মোশাররফ হলের দখল না ছাড়ার প্রেক্ষিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নীরব ভূমিকার কারণে ধর্ষণকারী দখলদার ও তাদের সহযোগীদের গ্রেপ্তার এবং বিচারের দাবিতে সাধারণ ছাত্রঐক্যের ব্যানারে ছাত্র-ছাত্রীরা ঐ দিন ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। সকালে ক্যাম্পাসে মিছিল করে তারা সকাল ১০ টায় ডেইরী ফার্ম ২নং গেটের সামনে ভাঙা দালানের ইট-সিমেন্টের বড় বড় অংশ ফেলে মহাসড়কেতে অবরোধ তৈরি করে।

১০ আগষ্ট রাতে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এস এম হল (১২৬ নং রুম, আবাসিক) থেকে ইংরেজী বিভাগের মাষ্টার্স পরীক্ষার্থী রোকনুজ্জামানকে মারধর করে বের করে দেয়। মধ্যরাতের পর ছাত্রলীগের ক্যাডাররা রোকনুজ্জামানকে হলের মাঠে লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করে এবং হল ছাড়তে বাধ্য করে। রোকন ছাত্রদলের কর্মী ছিল, এ অভিযোগ এনে ছাত্রলীগের জুনিয়র ক্যাডাররা তাকে বেধড়ক পিটিয়ে আহত অবস্থায় হল থেকে বের করে দেয়। এক সপ্তাহ পরেই তার মাস্টার্স পরীক্ষা ছিল। এ অবস্থায় তাকে বইপত্র সাথে না নিয়েই হল ছাড়তে হয়। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বা হল কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটেছে। ভেঙে পড়া শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং অধঃপতিত শিক্ষার মান জাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এমন আশংকা ১৯৯৯ সালে প্রকাশ করে বাংলাদেশের প্রধান উন্নয়ন সহযোগী বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংক বলে, 'শিক্ষা ক্ষেত্রে এই অবস্থা অব্যাহত থাকাটা হবে দেশ ও জাতির আত্মহত্যার শামিল'। বিশ্বব্যাংক এ মর্মেও হুশিয়ারি উচ্চারণ করে যে, 'উদ্ভূত শিক্ষার নিম্নমান ও বিপর্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা চলতে থাকলে বাংলাদেশ আগামী কয়েক দশকও টিকবে না'। বিশ্বব্যাংক প্রণীত বাংলাদেশ এডুকেশন সেক্টর রিভিউ'তে আরও বলা হয়, 'বিশ্বে শুধু বাংলাদেশেই ছাত্র প্রতি খরচ অত্যন্ত কম। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ অর্থাৎ প্রতিটি স্তরেই রয়েছে এই সর্বনিম্ন ব্যয়'। আরও বলা হয়, 'এই সর্বনিম্ন ব্যয়ের মধ্যেও প্রচুর অর্থ অপচয় হচ্ছে। যেসব ছাত্র ড্রপ আউট করে তাদের জন্য ব্যয়িত অর্থ নিঃসন্দেহে অপচয়ের মধ্যে পড়ে। মাধ্যমিক ও ডিগ্রী স্তরে যেসব ছাত্র প্রবেশ করে, সে সব ছাত্রও চূড়ান্ত স্তরে ঠিক থাকে না। শিক্ষার মান উন্নয়নে উচ্চতর শিক্ষার লক্ষ্যে যে পাঠ্যক্রম দেয়া হয় তাতেও কোনো সুফল হয় না। সরকারি ও বেসরকারি খাতের শিক্ষা ব্যবস্থায় এভাবেই হচ্ছে অর্থের অপচয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয়েরও যথাযথ সুফল পাওয়া যাচ্ছে না'। এজন্য বিশ্বব্যাংক গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনতে কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার পরামর্শ দেয়। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)

www.pathagar.com

আওয়ামী দুঃশাসনের মাত্র ৩৮ মাসের মধ্যে একটা জাতির শিক্ষার মানে এহেন মারাত্মক ধস এবং বিশ্বব্যাংকের এ ধরনের মন্তব্য জাতির জন্য যেমন চরম লজ্জার তেমনি তা মর্মান্তিকও।

১৩ সেপ্টেম্বর দৈনিক দিনকালের সম্পাদকীয়তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংকটের একটি তথ্য প্রকাশ। সম্পাদকীয়তে বলা হয়, 'অনুমোদিত ১ হাজার ৪শ' ৫১টি পদের মধ্যে ১শ'৫টি পদ শূণ্য রয়েছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট অনুমোদিত অধ্যাপকের সংখ্যা ৫শ' ৭টি, আছেন ৪শ' ৮৪ জন। শূন্য পদ ২৩টি। সহযোগী অধ্যাপক পদের সংখ্যা ২শ' ৯৭টি, শিক্ষক আছেন ২শ' ৮১ জন। শূন্য পদ ১৬টি। সহকারী অধ্যাপকের পদে ৩শ' ৬১ জনের মধ্যে রয়েছেন ৩২৪ জন, খালি রয়েছে ৩৭টি পদ এবং প্রভাষক পদে ২শ' ৮৬টি পদের মধ্যে ২৯টি খালি রয়েছে। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, উর্দু ও ফার্সি বিভাগ, অর্থনীতি বিভাগ, বাংলা বিভাগ, পদার্থ বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান বিভাগ, গণিত বিভাগ, প্রাণ রসায়ন বিভাগ, মাইক্রো বায়োলজি বিভাগ, ফার্মেসী বিভাগ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ, ভাষাতত্ত্ব বিভাগসহ বেশ কয়েকটি বিভাগে দীর্ঘকাল যাবত শিক্ষক সংকট চলছে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় পাঁচ শতাধিক শিক্ষক বাইরে কনসালটেন্সি ও পার্ট টাইম চাকরীতে ব্যস্ত থাকার কারণে পড়াশোনার ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে মারাত্মক সংকট। দীর্ঘ দিন থেকে উল্লেখিত পদগুলো শূন্য থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কেন তা পূরণের উদ্যোগ নিচ্ছেন না, সেটাও একটা বিরাট প্রশ্ন।'

২১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সরকার ঘেঁষা তিনটি পত্রিকায় প্রকাশিত তিনটি খবরের শিরোনাম ছিল যথাক্রমে 'ক্যাম্পাসে অপহরণকারী সন্ত্রাসীদের কেউ গ্রেফতার হয়নি-কাশিফের পরিবার মুখ খুলছে না', 'হলে হলে ছাত্রলীগ কর্মীদের তল্লাসী-ক্যাম্পাস থেকে শিবির পালাচ্ছে' এবং 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের একদলীয় আচরণে সবাই অতিষ্ঠ'। পক্ষান্তরে একই দিন সরকার ঘেঁষা তিনটি পত্রিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা নিয়ে যে সম্পাদকীয় ছাপা হয় তার শিরোনাম ছিল যথাক্রমে 'হলগুলো কেন সন্ত্রাসীদের আখড়া?' 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : অপহরণ ও নির্যাতন শিবির' এবং 'বিশ্ববিদ্যালয়ে অপহরণ-বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার আইনকে প্রবেশ করতে দিন'। আর এদিন দৈনিক দিনকালে এ সংক্রান্ত খবরের শিরোনামে ছিল, 'জড়িত ছাত্রলীগ নেতারা গতকালও গ্রেফতার হয়নি', 'ছাত্রদলের বিক্ষোভ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনায় সর্বমহলে আতংক'।

শিক্ষানীতি বহির্ভূত সরকারি নির্দেশের কারণে দেশের ১২ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৩৬ লাখ ছাত্র-ছাত্রী, দু'শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী এবং লাখ লাখ অভিভাবক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কোনো কারণ ছাড়া ১৯৯৯ সালের নির্বাচনী ও বার্ষিক পরীক্ষার সময়সূচি তিনবার পরিবর্তন করা হয়। ফলে শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের কাছে বিভিন্নভাবে সমালোচিত হন। আর মারাত্মক বিপাকে পড়ে স্কুল এবং পরীক্ষার্থীরা। কিছু প্রচার মাধ্যম সরকারের নীতি বহির্ভূত সিদ্ধান্তকে আড়াল করার জন্যেই ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা সমস্যার বিষয়টিকে বিরোধী দলের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে দেয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর নাইয়ার সুলতানা স্বাক্ষরিত পত্রে (স্মারক নং ওএম-৪/সম/৯৩/৩০১৪৭/৮৬৪৩০০ তারিখ ২৭/১২/৯৮) সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে '৯৯ সালের নির্বাচনী পরীক্ষা (টেষ্ট) ৪ নভেম্বর শুরু ও ১৪ নভেম্বর শেষ এবং বার্ষিক পরীক্ষা ২২ নভেম্বর শুরু ও ২ ডিসেম্বর শেষ করার নির্দেশ দেয়া হয়। অপরদিকে

www.pathagar.com

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এক পত্রে (স্মারক নং ৪৭/মাধ্য-পরী/৭৮/৯৯/৪০০ (৪০০০) তারিখ ৬/৯/৯৯) নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশের শেষ তারিখ ১৫ নভেম্বর বলে নির্দেশ দেয়া হয়। আবার ৩ অক্টোবর ১৯৯৯ তারিখে স্বাক্ষরিত একপত্রে (স্মরক নং ওএম-১৬৭-সম/৯৪/১১৭৮৫/৮০) অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর নাইয়ার সুলতানা ৭ নভেম্বর বার্ষিক পরীক্ষা শুরু এবং ১৮ নভেম্বর পরীক্ষা শেষ করার নির্দেশ দেন। তৃতীয়বার আরো একটি চিঠি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয় ৯ নভেম্বর থেকে পরীক্ষা শুরুর জন্যে। শিক্ষা অধিদপ্ততর এবং বোর্ডের বার বার পরীক্ষার সময় পরিবর্তন করার কারণে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়কেও ৩য় বার পরীক্ষার রুটিন পরিবর্তন করতে হয়। এতে শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকের মধ্যে মারাত্মক ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। শিক্ষক-কর্মচারীরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন পরীক্ষা নিতে। ছাত্ররা পড়ে বিপাকে।

১৯ অক্টোবর দৈনিক মানবজমিনে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে আওয়ামী সরকারের অবহেলা ও খামখেয়ালীপনার চিত্র ফুটে উঠে। প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র সন্তোষজনক নয়। জেলার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু প্রতি বছর বিদ্যালয়ে ভর্তির আওতা বহির্ভূত থাকছে। আবার প্রতি বছরই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়ে শিক্ষার চিত্রকে উদ্বেগজনক স্থানে নিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক এক জরিপ রিপোর্টে দেখা যায়, জেলার প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষার গন্ডি অতিক্রম করতেই ব্যর্থ হচ্ছে। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার পর তারা বিদ্যালয়ের চৌহদ্দি থেকে দূরে সরে পড়ছে। জেলার ১৩টি থানায় ৮০৮টি সরকারি, ৪০৫টি রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত ও ১২৫টি রেজিস্ট্রেশনবিহীন প্রাইমারী স্কুল রয়েছে। উল্লেখিত মোট ১৩৩৮টি বিদ্যালয় হতে ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮ এ পাঁচ বছরে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার বিভিন্ন ধাপে মোট ৩৩ হাজার ৮১৬ জন শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়েছে। এ ঝড়ে পরার হার শতকরা ৩৯.৯২ ভাগ। জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার এ করুণ চিত্র জেলার হাওরাঞ্চলে আরো বেশি। পশ্চাৎপদ হাওরে শিক্ষার গুণগত মান নিম্ন পর্যায়ে। জেলার হাওরের ৪টি থানা মিটামইন, ইটনা, অষ্টগ্রাম ও নিকলীতে প্রাইমারী শিক্ষা প্রশ্নের সম্মুখীন। নানাবিধ অসুবিধার পাশাপাশি প্রাকৃতিক কারণেও শিক্ষার পরিবেশ সুষ্ঠু নয়। বর্ষাকালে ৪/৫ মাস সমুদয় অঞ্চলে পানিতে ডুবে থাকায় শিক্ষার পরিবেশ থাকে না। যাতায়াতের অসুবিধা ও ঢেউয়ের ভয়ে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। বর্ষাকালে হাওরে প্রায় অধিকাংশ স্কুল বন্ধ থাকে। শিশুরা শিক্ষার আমেজ থেকে বঞ্চিত থেকে পড়াশুনার প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। তাছাড়া অভিভাবকদের সচেতনতার অভাব শিশুদের শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহী করে তুলে।

২৮ নভেম্বর চরম অব্যবস্থা, অনিয়ম-বিশৃংখলা ও নকলের মহোৎসবের মধ্য দিয়ে সারাদেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৯ সালের ডিগ্রী পাস ও সাব-সিডিয়ারী পরীক্ষা শুরু হয়। বিভিন্ন হলে কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে পরীক্ষার্থীরা বই খুলে পরীক্ষা দেয়। ফলে ডিগ্রী পরীক্ষাটি প্রহসনে পরিণত হয়। শুধুমাত্র একটি পরীক্ষা কেন্দ্রেই ১০৯ জন পরীক্ষার্থীকে সিক বেড়ে পরীক্ষা নেয়া হয়। সিক বেডে দেয়া পরীক্ষার্থীদের অধিকাংশ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী ছিল।

১৭ ডিসেম্বর পুলিশ বিক্ষোভ মিছিলে মধ্যযুগীয় কায়দায় বর্বর ও নৃশংস হামলা চালিয়ে ছাত্রদল, জাতীয় ছাত্র সমাজ, ইসলামী ছাত্র শিবির ও ছাত্র মজলিসের সহস্রাধিক নেতা-কর্মীকে আহত করে এবং মিছিলে অর্ধশতাধিক টিয়ার সেল নিক্ষেপ, ৩০/৪০ রাউন্ড রাবার বুলেট ছুঁড়ে

www.pathagar.com

ও লাঠিচার্জ করে ভেঙে দেয়। হরতালের সমর্থনের ছাত্রদল বিকেলে নয়াপল্টনস্থ বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে একটি মিছিল বের করে। ২ সহস্রাধিক ছাত্রের বিশাল মিছিলটি বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে একটু এগিয়ে গেলে এডিসি (পূর্ব) গোলাম মোর্শেদ, রমনা থানার ওসি রফিক ও মতিঝিল থানার ওসি হানিফের নেতৃত্বে সহস্রাধিক পুলিশ অতর্কিত চারদিক দিয়ে মিছিল ঘেরাও করে ফেলে। পুলিশ ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের রাস্তায় ফেলে বুট-জুতা দিয়ে লাথি, রাইফেলের বাঁট দিয়ে গুতো ও বেধড়ক লাঠিপেটা করে। ছাত্রদল কর্মীদের লক্ষ্য করে পুলিশ বৃষ্টির মত টিয়ারসেল ও গুলিবর্ষণ করে। এ সময় ছাত্রদল কর্মীদের আর্তনাদে গোটা নয়াপল্টন এলাকার আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। পুলিশ ছাত্রদল সভাপতি হাবিব-উন নবী সোহেলকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক লাটিপেটা করে। পুলিশের বর্বরোচিত হামলায় হাবিব-উন-নবী সোহেলের কোমড় ভেঙে যায়। মারাত্মক আহত অবস্থায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টুর ওপর ৮/১০ জন পুলিশ হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা পিন্টুকে পেটাতে পেটাতে রাস্তার ওপর শুইয়ে ফেলে। এ সময় রমনা থানার ওসি রফিক ও এডিসি (পূর্ব) মোর্শেদ বুট জুতা দিয়ে পিন্টুর চোয়ালে লাথি মারলে তার নাক ও মুখ দিয়ে দরদর করে রক্ত ঝড়তে থাকে। পুলিশ তাকে পিটিয়ে শরীরের প্রতিটি অংশ ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে। আহত পিন্টুকে পুলিশ বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে হেঁচড়ে হেঁচড়ে গাজী ভবনের সামনে নিয়ে যায়। সেখানে পুলিশের ভ্যানে তুলে তাকে মতিঝিল থানায় নিয়ে যায়। পুলিশের হামলায় ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মঞ্জুর-ই-এলাহী মারাত্মক আহত হন। পুলিশ পিটিয়ে তার হাত, পা ও কোমড় ভেঙে দেয়। এ সময় ছাত্রদলের সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন রানা, আবদুল খালেক হাওলাদার, মাহবুবুল হক নান্নুসহ শতাধিক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে। বিরোধী দলের ছাত্র সংগঠনগুলো ঢাকায় আহূত পরের দিনের অর্ধদিবস হরতালের সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল বের করেছিল। কিন্তু মিছিল শুরু হতেই সরকারের লেলিয়ে দেয়া পুলিশ বাহিনী হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পরে ছাত্র সংগঠনগুলোর ওপর। দলীয় ও অনুগত ভাইস চ্যান্সেলকে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে ডক্টরেট ডিগ্রী কুড়ান, সেই বিতর্কিত ডক্টরেট ডিগ্রীর কনভোকেশন অনুষ্ঠানের প্রতিবাদে ছাত্রদল, শিবির, ছাত্রসমাজ, ছাত্র মজলিস ১৮ ডিসেম্বর ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল আহবান করেছিল। এ হরতালের সমর্থনেই বিক্ষোভ মিছিল ছিল। কিন্তু এ প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ছাত্ররা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হয়। তাদের ওপর চলে অত্যাচারের স্টীম রোলার। ছাত্র সংগঠনগুলোর ডাকা হরতালে বিরোধী দলগুলোর সমর্থন জানায়।

১৮ ডিসেম্বর ছাত্রলীগ ছাড়া সকল ছাত্রসংগঠন ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের অবরুদ্ধ রেখে এবং অধিকাংশ শিক্ষকের বর্জনের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০তম বিতর্কিত সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী পন্থী শিক্ষক ও ছাত্রলীগের কর্মীরা ছাড়া এ সমাবর্তনে অংশ নেয় বহিরাগত আওয়ামী পন্থী বিভিন্ন সংগঠনের লোকজন। এমনকি আওয়ামী লীগ এমপি হাজী সেলিম, ডাঃ ইকবাল বস্তি থেকে লোকজনের মিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ে আসে। এর ফলে গোটা অনুষ্ঠানটিই ছিল আওয়ামী লীগের একটি দলীয় রাজনীতির অনুষ্ঠান। এ সমাবর্তনের বিরুদ্ধে ক্যাম্পাসে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন কালো পতাকা মিছিল করে। নজিরবিহীন নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবিহীন এ অনুষ্ঠানে বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অর্মত্য সেন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রীর সনদ প্রদান করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দিন আহমদ। এর আগে ঢাকা

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭০ সালে। বিএনপি সরকারের সময় একটি বর্ণাঢ্য বিশেষ সমাবর্তন হয়। এ সমাবর্তনে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালামকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী দেয়া হয়। প্রফেসর সালামের হাতে এ সম্মাননা তুলে দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। প্রেসিডেন্টে সাহাবুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে সকাল ১০ টা থেকে দু'টি পর্বে বিকাল সাড়ে ৪ টা পর্যন্ত সমাবর্তনের কার্যক্রম চলে। প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে ক্যাম্পাস এলাকায় সাড়ে ৫ হাজার পুলিশ, বিডিআর মোতায়েন করা হয়। শাহবাগ মোড় থেকে ক্যাম্পাসের ভেতরে কোনো গাড়ি আসতে দেয়নি পুলিশ। পথচারী এমনকি সাংবাদিক পর্যন্ত ক্যাম্পাসে পুলিশ ঢুকতে দেয়নি। সকাল ৭ টায় ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় ছাত্রী বিষয়ক সম্পাদিকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শাম্মী আকতার শিপা ক্যাম্পাসে আসার সময় পুলিশ শাহবাগ মোড়ে তাকে আটকিয়ে রাখে। প্রায় দেড়ঘন্টা আটক রাখার পর সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। সকাল ৭ টার দিকে ছাত্রদলের ৮/১০ জন ছাত্রী দোয়েল চত্বর দিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে চাইলে পুলিশ তাদের ফিরিয়ে দেয়। সকাল ৯ টায় দিকে সায়েন্স ল্যাবরেটরীর কাছে ছাত্রদলের শতাধিক নেতা-কর্মী জড়ো হয়ে ক্যাম্পাস অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে আসতে চাইলে পুলিশ তাদের ধাওয়া করে। ছাত্র-ছাত্রীদের অবরুদ্ধ করার বিরুদ্ধে রোকেয়া হলের ছাত্রীরা গর্জে উঠে। ভোর ৬ টা থেকে প্রায় ৩ শতাধিক পুলিশ রোকেয়া হলগেটে অবস্থান নেয়। পুলিশ হলগেটে তালা লাগিয়ে দিয়ে কয়েকশ' ছাত্রীকে অবরুদ্ধ করে রাখে। সকাল ৮ টায় ছাত্রদলের ছাত্রী কর্মীরা হল থেকে বের হতে চাইলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। পর রেহানা আকতার রানু ও শাম্মী আকতার শিপার নেতৃত্বে ছাত্রদলের ছাত্রী কর্মীরা হলের ভিতরে কালো পতাকা বিক্ষোভ মিছিল বের করে। একই সময় গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য ও ৫ টি সংগঠনের ছাত্রী কর্মীরাও হলে ভিতরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। সকাল ১০ টার দিকে ছাত্রদলের ছাত্রীকর্মীরা হলগেটে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং হলগেট খুলে দেয়ার দাবী জানায়। ছাত্রীরা হল থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ হলের বাইরের গেটে তালা লাগিয়ে দিয়ে অবস্থান নেয়। এক পর্যায়ে ছাত্রীরা গেটের উপরে উঠে কালো পতাকা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এ সময় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকনের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা ছাত্রীদের লক্ষ্য করে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করলে এক পর্যায়ে ছাত্রীরা ছাত্রলীগ ক্যাডারদের লক্ষ্য করে বৃষ্টির মত ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। ছাত্রীদের ধাওয়া খেয়ে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা সরে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর সামনে আশ্রয় নেয়। ছাত্রীরা হলের বাইরের গেট ভাঙ্গার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। এ সময় ছাত্রীদের সাথে পুলিশের আরেক দফা সংঘর্ষ হয়। ছাত্রীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে পচা ডিম ছুঁড়লে একটি ডিম এসে ইন্সপেক্টর শফিকের মুখে পড়ে। ছাত্রীদের ধাওয়া খেয়ে পুলিশ হলের দেয়ালের পাশে আশ্রয় নেয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্রীরা দ্বিতীয় গেট ভেঙে রাস্তায় নেমে আসে এবং মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি কেড়ে নিয়ে পদদলিত করে। পরে মহিলা পুলিশ ছাত্রীদের হলগেটে ঘেরাও করে রাখে। এ সময় ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের ছাত্রী কর্মীরা পরস্পর বিরোধী শ্লোগান দেয়। পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যে থেকে ছাত্রদলের ছাত্রী কর্মীরা প্রতিবাদ সমাবেশ করে। ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদিকা রেহানা আক্তার রুনুর সভাপতিত্বে এ সমাবেশে শাম্মী আকতার শিপা, রুখসানা খানম মিতুয়া, ফরিদা জাফরিন, মনিরা আকতার রিক্তা, শারমিন রুমা, নাঈমা সুলতানা প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সমাবেশে ছাত্রীরা ভিসির পদত্যাগ, ছাত্রদল সভাপতি সোহেল ও সাধারণ সম্পাদক পিন্টুর নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেন। পুলিশ ছাত্রীদের শামসুন্নাহার হল,

www.pathagar.com

কুয়েত মৈত্রী হল সহ ১১ টি হলে তালা লাগিয়ে দিয়ে অবরুদ্ধ করে রাখে। দুপুর ১২ টায় প্রধানমন্ত্রী চলে যাবার পর তালা খুলে দেয়া হয়। সমাবর্তনে আওয়ামী লীগের দলীয়করণ এবং সন্ত্রাস, দুর্নীতির পৃষ্টপোষক শেখ হাসিনাকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করে। এ উপলক্ষে ছাত্রঐক্য সকাল ১১ টায় মধুর ক্যান্টিন থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি কলাভবন প্রদক্ষিণ শেষে অপরাজেয় বাংলা সংলগ্ন গেট দিয়ে বাইরে যেতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। এখানে ছাত্রঐক্য সমাবেশ শুরু করলে পুলিশের সামনে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা ছাত্রঐক্য নেতৃবৃন্দকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি ও নানা হুমকি প্রদর্শন করে। ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হুমকি উপেক্ষা করে ছাত্রঐক্য সমাবেশ চালিয়ে যায়। সমাবেশে ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মঞ্জুর-এ খোদা টরিক, ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি দীপংকর সাহা দীপু, ছাত্রফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান তপন, বাসদ ছাত্রলীগের সভাপতি ইমাম গাজ্জালী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অনুষ্ঠান শুরুর পর সকাল পৌণে ১১ টার দিকে ছাত্রলীগের কয়েকশ' নেতা-কর্মী একযোগে অনুষ্ঠানের প্যান্ডেলে ঢুকে পড়ে। বুকে শেখ মুজিবের ছবি সম্বলিত ব্যাস লাগানো ওই সব নেতা-কর্মীকে সকাল থেকেই দোয়েল চত্বর এলাকায় সদলবলে মহড়া দিতে দেখা যায়। সমাবর্তনের কার্যক্রম শুরু হতেই তারা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে। প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর স্পেশাল নিরাপত্তা বাহিনী ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের ভেতরে ঢুকতে বাধা দেয়নি। অথচ প্যান্ডেলের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথি দাঁড়িয়ে থাকলেও নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার অজুহাতে নিরাপত্তা কর্মীরা তাদের ঢুকতে দেয়নি। সমাবর্তনের বিশাল প্যান্ডেলে কোটি টাকা ব্যয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার মারাত্মক ত্রুটি সকল মহলকে আহত করে। প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দিন সকাল সাড়ে ১০ টায় সমাবর্তনের উদ্বোধনী ঘোষণা করার পর একে একে কোরআন, গীতা, ত্রিপিটক ও বাইবেল পাঠ করা হয়। এরপর প্রথমেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডক্টর অব লজ ডিগ্রীর সনদ প্রদান করা হয়। ভিসি এ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পারিবারিক ঐতিহ্য, কর্মময় জীবন ও গৌরবময় অর্জনের বিশাল ফিরিস্তি তুলে ধরেন। এরপর প্রেসিডেন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডক্টর অব সায়েন্স সনদ গ্রহণের জন্য অর্মত্য সেনের নাম ঘোষণা করেন। কিন্তু মঞ্চে উপস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিসহ সকলেই প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে এতটাই মেতে ছিলেন যে অর্মত্য সেনের সনদপত্র এবং সাইটেশনের কপিটি তাদের হাতের কাছে ছিল না। এ অবস্থায় প্রায় ৫ মিনিট কেটে যায়। প্রেসিডেন্ট উত্তেজনায় ফেটে পড়েন। তিনি উচ্চস্বরে বলেন, 'শিক্ষামন্ত্রী কোথায়?' এ ধরনের একটি অনুষ্ঠান করার আগে রিহার্সেল দেয়া হলো না কেন। উত্তেজিত কণ্ঠে প্রেসিডেন্ট আরও অনেক কথা বলেন। কিন্তু পাশের সীটে বসা প্রধানমন্ত্রী দ্রুত প্রেসিডেন্টের সামনের মাইক স্পীকারটি সরিয়ে ফেলার কারণে পরবর্তী কথাগুলো শোনা যায়নি। এ অবস্থায় স্মরণিকা থেকে অর্মত্য সেনের সাইটেশন পড়ে শোনানো হয়। এই স্মরণিকা নিয়েও অনুষ্ঠানে ব্যাপক হট্টগোল সৃষ্টি হয়। প্যান্ডেলে প্রায় আড়াই হাজার অতিথির মধ্যে স্মরণিকা বিতরণ করা হয় মাত্র ১ হাজার। স্মরণিকা না পাওয়া অতিথিরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা ছাড়া সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের স্মররিণকা দেয়া হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন বছরে যারা কৃতিত্বপূর্ণ ফল লাভ করেন সমাবর্তনের বিশেষ পোশাক পরে তারা অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। কিন্তু যথাযথ মর্যাদা না পেয়ে তাদের মধ্যেও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রেসিডেন্টের হাত থেকে তারা সনদপত্র নেবেন। কিন্তু তা হয়নি। অনুষ্ঠানে কেবল নাম ঘোষণা করা ছাড়া তাদের

www.pathagar.com

জন্য আর কোনো আয়োজন ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা দলের শিক্ষকরাও সমাবর্তন বর্জন করায় অনুষ্ঠান জমেনি। প্রধানমন্ত্রী ডক্টরেট ডিগ্রীর সনদ গ্রহণের পর বক্তৃতায় বলেন, 'অমর্ত্য সেনের মত একজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একই মঞ্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী প্রাপ্তি সৌভাগ্য অর্জনের সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি।'

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস, সেশন জট ও ছাত্র রাজনীতিমুক্ত গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ছাত্রলীগের দলীয় প্রভাব বৃদ্ধির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে একযোগে প্রতিবাদ করেছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী কিছু নেতা-কর্মী ও প্রশাসনের কতিপয় কর্মকর্তা ছাত্র রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত হলে সাধারণ ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং তাদের এই তৎপরতা বন্ধ করার দাবী জানায়। 'ডোমার ক্লাব' নামে একটি সংগঠনের মাধ্যমে আওয়ামীরা তাদের দলীয় রাজনীতি ও মতাদর্শ প্রচারকালে ক্লাবের প্রসপেক্টাসে 'জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু' শ্লোগান ব্যবহার করে। এ ঘটনা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ পাঁয়তারার প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ক্লাবটি বন্ধের দাবী জানিয়ে ভিসির কার্যালয় ঘেরাও করে। এ সময় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী মতের ট্রেজারার 'জয় বাংলা ও জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগানকে জাতীয় শ্লোগান হিসেবে আখ্যা দানে দোষ নেই' বলায় ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং ভিসি সিনেট ভবনের সম্মেলন কক্ষ থেকে উঠে যাবার চেষ্টা করলে ছাত্ররা তার কক্ষে তালা লাগিয়ে দেয়। একপর্যায়ে চাপের মুখে ট্রেজারার তার বক্তব্যকে ব্যক্তিগত বলে আখ্যা দিয়ে তা প্রত্যাহার এবং সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ট্রেজারার ও ভিসি তিন ঘন্টা অবরুদ্ধ থাকার পর ভিসি 'ডোমার ক্লাবকে' বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদিত নয় বলে ঘোষণা করেন এবং এই ক্লাবের কর্মকান্ড তদন্তের আশ্বাস দিলে প্রতিরোধ প্রত্যাহৃত হয়। (সূত্র ঃ দৈনিক সংগ্রাম ২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৯)

হাসিনার আমলে রাজধানীর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর লেখাপড়ার মানের অস্বাভাবিক নিম্নগতির কারণে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের সরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তি করাতে ক্রমেই আগ্রহ হারান। তারা নগরীর নামী-দামী স্কুলগুলোতে ভীড় জমান। সেখানে ভর্তি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অনেক অভিভাবক সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তাদের ভারতে নিয়ে সেখানকার স্কুলগুলোতে ভর্তি করান। ২০০০ সালে প্রাইমারী পর্যায়ের বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভারতের বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি হয়। আগে বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ যেতো। কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে শিশু শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাইমারী লেভেলের অনেক ছাত্র-ছাত্রী ভারতের আবাসিক স্কুলগুলোতে ভর্তি হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া ভারতের কয়েকটি শহরে বেশ কিছু নতুন আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। সেখানে অনেক স্কুল-কলেজে চলেছে বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর নির্ভর করে। প্রাইমারী লেভেলের বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের আকৃষ্ট করতে এদেশের অনেক পত্র-পত্রিকায় নানা সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথা উল্লেখ করে বিজ্ঞাপনও দেয়া হয়। বিজ্ঞাপনে কোমলমতি ছাত্র/ছাত্রীদের আকৃষ্ট করতে নানা ধরনের লোভনীয় সুযোগ-সুবিধার কথা উল্লেখ করা হয়। এর মধ্যে পাঠদান, আকর্ষণীয় পরিবেশে অবস্থান, ভালো শিক্ষক দিয়ে পড়াশোনা, চিকিৎসা, পাঠ্য বহির্ভূত বিনোদন, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নিয়মিত অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এছাড়াও বৃত্তি অনুদান, পুরস্কার প্রভৃতি ঘোষণার মাধ্যমে অভিভাবকদেরকে তাদের সন্তানদের ভর্তিতে অনুপ্রাণিত করা হয়। বাংলাদেশে নিম্নমানের শিক্ষা দান, নকল প্রবণতা, ভালো স্কুলের অভাব, নামীদামী স্কুলগুলোতে আসন সংখ্যার

www.pathagar.com

অপ্রতুলতা প্রভৃতি কারণে প্রতি বছর ব্যাপকহারে বাংলাদেশী ছেলে-মেয়েরা ভারতে যায় লেখাপড়া করার জন্য। বহু স্বচ্ছল অভিভাবক তাদের সন্তানকে ভারতের কিন্ডার গার্টেন পদ্ধতির আবাসিক স্কুলগুলোতে ভর্তির দিকে ঝুঁকে পড়েন। আওয়ামী আমলে প্রতিবছর গড়ে ৩০/৩৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিদেশে যাবার জন্য সংশ্লিষ্ট দূতাবাসগুলোতে আবেদন করে। এদের মধ্যে ৭০ ভাগ ভারতে পড়তে যায়। বিদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্তানকে পড়াতে গিয়ে অভিভাবকদের প্রতি বছর প্রায় এক হাজার কোটি টাকা খরচ হয়। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ১৭ জানুয়ারি ২০০০)

দেশের ২৩ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯২ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা অর্থাভাবে অত্যন্ত মানবেতর জীবন-যাপন করলেও আওয়ামীরা তাদের দিকে ফিরেও তাকায়নি। অথচ ১৯৯৫ সালে বিএনপি সরকারের আমলে শিক্ষকরা যখন তাদের দাবী-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন তখন আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনা শিক্ষক প্রতিনিধিদের বলেছিলেন, 'আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে বেসরকারি শিক্ষকদের সকল দাবী মেনে নেবেন।' সে সময় বিএনপি সরকার বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন স্কেলের ৭১ শতাংশ প্রদান করেছিল। বিএনপি সরকার শিক্ষকদেরকে আরো আশ্বাস দেন যে, পর্যায়ক্রমে তারা শিক্ষকদের সকল দাবী পূরণ করবেন। বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকরা সরকারের এ ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন শুরু করলে আওয়ামী লীগ পূর্ণ সমর্থন জানায়। কিন্তু ক্ষমতায় এসে তারা সবকিছু ভুলে যায়। শিক্ষকরা প্রথমে সরকারের সাথে আলোচনা করে তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। সরকার শিক্ষকদের দাবী প্রতি কর্ণপাত না করায় এক পর্যায়ে তারা রাজপথে নামতে বাধ্য হন। ১৯৯৯ সালে শিক্ষকরা কাফনের কাপড় পরে মিছিল বের করলে সরকার পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে তাদের ওপর বর্বরোচিত হামলা চালায়। এতে বেশ কয়েকজন শিক্ষক জখম হন। শিক্ষকরা তাদের চাকরি জাতীয়করণ, ছাত্র সংখ্যা হারে শিক্ষক নিয়োগ, বাড়িভাড়া, চিকিৎসা, উৎস, প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদানসহ শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন স্কেল প্রদানের দাবী জানান। সরকারের কাছে চাকরী জাতীয়করণের দাবী জানিয়ে স্বাভাবিক সকল পন্থায় ব্যর্থ হওয়ার পর শিক্ষকরা ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হয়। ২৩ জানুয়ারি ২০০০ থেকে শুরু হওয়া দেশের সব বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকরা তাদের চাকরি জাতীয়করণের একদফা দাবিতে ঢাকার ওসমানী উদ্যানে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান ধর্মঘট চালিয়ে যান। এর আগে প্রথমে তারা মিছিলযোগে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সরকারের পুলিশ তাদের অনেক আগেই বাধা দেয় এবং সম্মুখভাগের শিক্ষকদের সঙ্গে অভদ্রচোতি আচরণ করে। শিক্ষকরা এরপর অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেন। প্রায় ১৫ সহস্রাধিক শিক্ষক মাঘের প্রচন্ড শীতের মধ্যে খোলা আকাশের নিচে চাদরমুড়ি দিয়ে রাত কাটান। ধর্মঘট শুরু হওয়ার রাতে তারা বৃষ্টিতেও ভিজেন। রাতে অবস্থার অবনতি ঘটলে সৈয়দা শামসুন্নাহার নামে এক শিক্ষিকাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বৃষ্টিতে ভিজে ও শীতের কারণে অর্ধশতাধিক শিক্ষক ডায়রিয়া, জ্বর, সর্দি, কাশিও মাথাব্যথায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন। অবস্থার অবনতি ঘটলে ২৫ জানুয়ারি সিরাজগঞ্জের জামাল উদ্দিন, আহমেদ, আবু তালেব, আবদুর রহমান, মাদারীপুরের গণপতি বৌদ্ধ, ঈশ্বরদীর আবদুল বারী ও আবু তালেবকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগে ভর্তি করা হয়। এছাড়াও কিশোরগঞ্জের রুহুল আমিন, টাঙ্গাইলের আবদুল জব্বার, চাঁদপুরের মনসুর আলী, লক্ষ্মীপুরের করিম বক্স, মেহেরপুরের নূর মোহাম্মদ প্রাথমিক চিকিৎসা নেন। ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ বেসরকারি

www.pathagar.com

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শামসুল আলম দৈনিক দিনকালের সঙ্গে সাক্ষাতকারে জানান যে, 'আমাদের যে ন্যূনতম বাঁচার দাবী তা থেকে পেছনে ফেরার কোন সুযোগ নেই। দাবী না মানা পর্যন্ত ঢাকা ছাড়বো না। প্রয়োজনে আরো কঠিন কর্মসূচি দেয়া হবে।' তিনি অভিযোগ করেন যে, শিক্ষকদের খাওয়ার জন্য ওয়াসার পানির জন্য আবেদন করলেও সরকার পানি সরবরাহ করছে না। এমন কি ওসমানী উদ্যানের সকল বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। রাতে ওসমানী উদ্যানে ভুতুরে পরিবেশ বিরাজ করে।' ২৫ জানুয়ারি কর্মসূচির তৃতীয় দিন অতিবাহিত হলে শিক্ষকদের দাবী ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আলোচনা বা সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হয়নি। তবে দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটে বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ওসমানী উদ্যানে শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘটে গিয়ে একাত্মতা প্রকাশ করেন। ২৫ জানুয়ারি ভোরে ওসমানী উদ্যানে গিয়ে দেখা যায় অধিকাংশ শিক্ষক হাড়কাঁপা শীতে থর থর করে কাঁপেন। অনেকেই চাদর মুড়ি দিয়ে শীত থেকে রক্ষার চেষ্টা করেন। কেউ কেউ খড়কুটোর আগুন জ্বালিয়ে শরীর গরম করে নেন। রোদ উঠলে অনেকেই চাদর কাঁথা শুকাতে দেন।

২০০০ সালের শিক্ষা বর্ষে দেশের ২০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ডাবল শিফটে ছাত্র ভর্তি বন্ধ করে দেয়ায় ৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার কোর্সে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও শিক্ষামন্ত্রীর অবহেলার কারণে পলিটেকনিক শিক্ষা সংকোচনের এই অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে। দেশে-বিদেশে কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে ১৯৯৫ সালে পাঁচ বছরের জন্য পলিটেকনিকে ডাবল শিফট চালুর অনুমতি দেয়া হয়। ১৯৯৯ সালে এই মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পর সরকার তা আর সম্প্রসারণ করার কোনো উদ্যোগ নেয়নি। ফলে দেশের ২০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ১৯৯৯ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে শ' শ' নবীন ছাত্র-ছাত্রী ডাবল শিফটে ভর্তি হওয়ার সুযোগ না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যায়। এতে ছাত্র ও অভিভাবকদের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি তলিয়ে দেখার কোনো প্রয়োজন অনুভব করেনি। নিয়ম অনুযায়ী কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে ডাবল শিফটের মূল্যায়ন রিপোর্ট জমা দিয়ে নতুন ভর্তির অনুমতি চাইবার কথা থাকলেও রহস্যময় কারণে ডিজি এসব ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করেন। ডাবল শিফট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এই তথ্য পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতি ও আইডিবির পক্ষ থেকে বারবার সরকারকে জানানো সত্ত্বেও সরকার ডাবল শিফট অব্যাহত রাখতে ব্যর্থ হয়। প্রতি শিক্ষা বর্ষে ১৯টি পলিটেকনিকে ৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়। এর মধ্যে ঢাকা পলিটেকনিকে ৬শ' আসন। অন্যান্য পলিটেকনিকে ১৬০ থেকে ৩৪০টি আসন রয়েছে। এর মধ্যে একটি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। পাস করার এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে ৭৫ ভাগ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার চাকরি বা কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়ে যান। যা সাধারণ শিক্ষায় একেবারেই অকল্পনীয়। তাছাড়া বিদেশে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সাধারণ গ্র্যাজুয়েটদের চাইতে পলিটেকনিক ডিপ্লোমাধারীরা চারগুণ বেশি বেতন পান। শুধু তাই নয় বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রধান ফ্যাক্টর হচ্ছে মিড লেভেল ইঞ্জিনিয়ার। কারণ মধ্যস্তরের এই দক্ষ কারিগর শ্রেণীই মাঠ পর্যায়ে প্রযুক্তির প্রয়োগ ও বিকাশ ঘটায়। জাপানে মোট শিক্ষার ৬০ শতাংশ হচ্ছে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত। এতে তাদের মাথাপিছু আয় ৩৫ হাজার মার্কিন ডলার। অন্য দিকে বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষার হার ডিপ্লোমা ভকেশনাল মিলিয়ে ৩ শতাংশের

www.pathagar.com

বেশি হবে না। বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় ২৭০ মার্কিন ডলার। কারিগরি শিক্ষার হার সিঙ্গাপুরে ৪০ শতাংশ, মালয়েশিয়ায় ৪০ শতাংশ ও দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৭ শতাংশ। ভারতে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ৯৬০টি, পাকিস্তানের ৫৮টি, বাংলাদেশে মাত্র ২০টি। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ২৪ জানুয়ারি ২০০০)

২০০০ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত চলে যায় অথচ দেশের বহু বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পাঠ্যবই হাতে যায়নি। পাঠ্যবই অনুপস্থিতিতেই ঢাকার নামকরা বিভিন্ন স্কুলে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা সমাপ্ত হয়। ২৩ মার্চ ২০০০ দৈনিক দিনকালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, 'জাতীয় কারিকুলাম ও টেক্সট বুক বোর্ডের (এনসিটিবি) হিসেব অনুযায়ী এখনো প্রায় ২৮ শতাংশ বই ঢাকা থেকে জেলা সদরে পাঠানো হয়নি। সাড়ে ৫ কোটি বই-এর মধ্যে ১ কোটি এখনো প্রেস মালিকদের কাছেই রয়েছে'। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অনেক বিদ্যালয় ১৯৯৯ সালের পুরনো ভেতরের অংশ ছেঁড়া বই যোগাড় করে ছাত্র-ছাত্রীদের বইয়ের চাহিদা পূরণ করে। ফেব্রুয়ারি মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সভায় ১৫ ফেব্রুয়ারি র মধ্যে বই সরবরাহ শেষ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগকে অবহিত করতে বলা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে মার্চও চলে যায়, কিন্তু বই বিতরণের কাজ শেষ হয়নি, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সব বই ছাপাও হয়নি।

১৪ জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয় যে, সারাদেশে ৮৫১৯ টি প্রাথমিক শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। অন্যদিকে ১৬ ফেব্রুয়ারি সহযোগী দৈনিকে প্রকাশিত একটি সংবাদ-প্রতিবেদনের সারমর্ম ছিল, 'অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতার অভাব, দারিদ্র, চাহিদার তুলনা কম বই বিতরণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্বল্পতা, শিক্ষক স্বল্পতা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে কক্সবাজার জেলার সাতটি থানার প্রায় দেড় লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা হতে বঞ্চিত হচ্ছে।' সরকারি হিসাব মতেই দেশের প্রায় পাঁচশত গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। টেকনাফ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ হাজার ৭০০ ছাত্র-ছাত্রীর জন্যে শিক্ষক আছেন মাত্র পাঁচজন। মাত্র পাঁচজন শিক্ষক প্রায় দুই হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা দিচ্ছেন। (সূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০০)

২ মার্চ পর্যন্ত দেশের ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী সমর্থিত শিক্ষকরা ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ পান। এমন নজীরবিহীন দলীয়করণ কোনো সরকারের আমলেও ঘটেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী এবং চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সদস্য অধ্যাপক আব্দুল মান্নান ভাইস চ্যান্সেলর হন। এছাড়া রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর, ইসলামী, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, খুলনা, জাতীয়, উন্মুক্ত ও মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু পরিষদের সঙ্গে জড়িত অধ্যাপকগণ ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। ঐ সময়কাল পর্যন্ত সর্বশেষ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন ড. আনোয়ারুল ইসলাম। রাজনৈতিক দিক দিয়ে তিনি ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ জেলা শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি ।

২ মার্চ সারাদেশে ব্যাপক গণটোকাটুকির মধ্য দিয়ে এসএসসি (ইংরেজি প্রথম পত্র) পরীক্ষার প্রথম দিন অতিবাহিত হয়। কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষা চলাকালীন শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় কুমিল্লার জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিতভাবে বিডিআর মোতায়েনের অনুরোধ জানান। জেলার চৌয়ারা কলেজ কেন্দ্রে নকল সরবরাহকারীদের বাধা দেয়ায় কলেজের পিওন আনিসুর রহমান ছুরিকাহত হয়। হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু

www.pathagar.com

হয়। পরীক্ষার দিনে ৬ জন শিক্ষক ও মোট ১ হাজার ২৯৯ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।

২৭ এপ্রিল এইচএসসি পরীক্ষার উদ্বোধনী দিন (ইংরেজি ১ম পত্র) পর্যবেক্ষণ করে মনে হয়েছে এ যেন শুধু নকলেরই পরীক্ষা। কেন্দ্রের ভেতরে-বাইরে কেবল নকল আর নকল। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক, বন্ধু-বান্ধব সবাই ব্যস্ত ছিল নকল নিয়ে। হলে হলে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকদের নিরাপদ ছায়ায়, নির্ভয়ে বাইরে থেকে পাঠানো নকলের 'চোতা' দেখে লিখেছে। কেউবা বইয়ের ছেঁড়া পাতাটি খাতার নিচে রেখেই লিখেছে শিক্ষকদের সামনে। আর হল পরিদর্শক শিক্ষকটি শুধু উচ্চ স্বরে কথা না বলার জন্য সবাইকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং ভিজিল্যান্স টীম বা ম্যাজিস্ট্রেট এলে সবাইকে আগে-ভাগে সতর্ক করে দিয়ে কিছু সময়ের জন্য বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করেন। ওদিকে পরীক্ষার্থীদের চেয়ে দু'তিন গুণ বেশি লোক হলের বাইরে চারপাশে ভিড় জমিয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে দ্রুত প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখে লিখে বাহক মারফত হলের ভেতরে পাঠাচ্ছিল বাধাহীনভাবে। বাইরে মাঠ জুড়ে নকলের বিশাল হাট বসেছিল। কেউ ভেতরে ঢুকে সরাসরি, কেউ জানালা দিয়ে, কেউ পায়খানার ভেন্টিলেটার দিয়ে, কেউবা দোতলায় লম্বা বাঁশের মাথায় কাগজের 'চোতাটি' বেঁধে নকল পাঠাতে সারাক্ষণ ব্যস্ত ছিল। আওয়ামী লীগের স্থানীয় ছাত্রনেতারাও কেন্দ্রের পিয়ন-দারোয়ানের সাথে মিলেমিশে শৃঙ্খলা রক্ষার নামে নকল আদান-প্রদান করে যায়। প্রহসনের ১৪৪ ধারা জারির পর পুলিশ, এমনকি বিডিআরও ছিল উদাস ভঙ্গিতে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে। রাজধানী ঢাকা এবং জেলা শহরের বাইরে মফস্বলের অধিকাংশ কলেজ কেন্দ্রগুলোতে এভাবেই চলে এইচএসসি পরীক্ষা। থানা পর্যায়ের বেশিরভাগ কেন্দ্রে উৎসবমুখর পরিবেশে খোদ শিক্ষকদের সহযোগিতায় কে কত বেশি নকল করে এবং অন্যেরটা দেখে নিজ নিজ খাতা ভরাতে পারে, তারই প্রতিযোগিতা ছিল পুরো তিনটি ঘন্টা ধরে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৩ টি প্রকল্পে ১৪০ কোটি টাকার অনিয়ম, ঘাপলা ও দুর্নীতি চিহ্নিত করে সংসদের অনুমিত হিসাব কমিটি। প্রায় ৮০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পগুলোর মেয়াদ দফায় দফায় বাড়ানো হলেও বেশিরভাগ প্রকল্পেরই কাজের অগ্রগতি ছিল খুবই হতাশাব্যঞ্জক। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন, পর্যাপ্ত তদারকি ও প্রকল্প বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাব এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণেই বেহাল দশার সৃষ্টি হয় এই প্রকল্পে। তাছাড়া ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, সমন্বয়হীনতা ও ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের সঙ্গে প্রকল্প পরিচালকদের রশি টানাটানির ফলে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যই ভেস্তে যায়। হিসাব কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩ টি উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়ম, ঘাপলা ও দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পগুলো হল ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সরকারি ও বেসরকারি), নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবায়ন ও উন্নয়ন, ১৬ টি সরকারি কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটের উন্নয়ন, নির্বাচিত কলেজ সমূহের উন্নয়ন (সরকারি ও বেসরকারি), নির্বাচিত সরকারি কলেজে কম্পিউটার বিজ্ঞান কোর্স চালুকরণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ, নতুনভাবে জাতীয়করণকৃত সরকারি মহিলা কলেজসমূহের উন্নয়ন, সাধারণ শিক্ষার জন্য অভ্যন্তরীণ মেধাবৃত্তি, নির্বাচিত ৩৬৫ টি সরকারি কলেজের উন্নয়ন, বৃহত্তর সিলেট, ফরিদপুর ও উত্তরবঙ্গের কোন উপযুক্ত স্থানে একটি করে তিনটি সরকারি টিটিসি স্থাপন ও উচ্চ শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, চট্টগ্রাম বিভাগীয় সদরে গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ প্রতিষ্ঠা, নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডবল শিফট

www.pathagar.com

চালুকরণ ও সম্প্রসারণ (সরকারি ও বেসরকারি), স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য পুরাতন জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি কলেজের বিশেষ উন্নয়ন এবং মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজসহ শিক্ষা কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা প্রকল্প। কমিটির প্রাথমিক তদন্তে দেখা যায়, নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নবায়ন ও উন্নয়ন প্রকল্পে ৫০ কোটি টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়। নির্বাচিত কলেজ সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পে ক্ষতির পরিমাণ ১৫ কোটি টাকা। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন প্রকল্পে অনিয়ম হয় ২২ কোটি টাকা। ১৬ টি সরকারি কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট উন্নয়নে ঘাপলা ৫ কোটি টাকা। সরকারি কলেজে কম্পিউটার বিজ্ঞান কোর্স চালুকরণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রকল্পে দুর্নীতি হয় ২ কোটি ৩৮ লাখ টাকা, নতুনভাবে জাতীয়করণকৃত সরকারি মহিলা কলেজ সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পে ক্ষতির পরিমাণ ২ কোটি ৫০ লাখ টাকা, সাধারণ শিক্ষার জন্য অভ্যন্তরীণ মেধা প্রকল্পে অপচয় ১ কোটি টাকা, নির্বাচিত ৩৬৫ টি বেসরকারি কলেজের উন্নয়ন প্রকল্পের দুর্নীতির পরিমাণ ১ কোটি টাকা, নির্বাচিত বেসরকারি কলেজের উন্নয়ন প্রকল্পের দুর্নীতির পরিমাণ ২৫ কোটি টাকা, বৃহত্তর সিলেট, ফরিদপুর ও উত্তরবঙ্গের কোন কোন স্থানে তিনটি সরকারি টিটিসি স্থাপন ও উচ্চ শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রকল্পে ঘাপলা হয় ২১ লাখ টাকা, চট্টগ্রাম বিভাগীয় সদরে গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ প্রকল্পে আর্থিক ক্ষতির পরিমান ২ কোটি টাকা, নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডাবল শিফট চালুকরণ ও সম্প্রসারণ প্রকল্পে ৫ কোটি টাকা এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য পুরাতন জেলা সদরের সরকারি কলেজের বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১০ কোটি টাকাসহ মোট ১৪০ কোটি টাকা দুর্নীতি হয়। ২৮৯ কোটি ৫০ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নবায়ন ও উন্নয়ন প্রকল্পে সংঘটিত আর্থিক কেলেঙ্কারি নিয়ে হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। ১৯৯১ সালের এই প্রকল্পটি ১৯৯৯ সালে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও অনুমিত কমিটির তদন্ত করা পর্যন্ত তা শেষ হয়নি। অথচ ব্যয় হয় বরাদ্দের অতিরিক্ত ২৬৭ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণের ফলে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ফাটল দেখা দিয়েছে। বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পর্যন্ত গড়ালেও কোন ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়নি। কম্পিউটার বিজ্ঞান কোর্স চালুকরণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রকল্প ২৬ কোটি ৬৮ লাখ টাকা ব্যয়ে ১৯৯৫ সালে শুরু হওয়ার কথা ও ২০০০ সালে শেষ হওয়ার কথা ছিল। প্রকল্পে ১৫৪ টি নির্বাচিত সরকারি কলেজের তিনতলা ফাউন্ডেশনের উপর দুই কক্ষবিশিষ্ট কম্পিউটার ল্যাবঃ তৈরির জন্য বরাদ্দ ছিল ১০ কোটি টাকা। বাস্তবে এর তেমন অগ্রগতি না হলেও ৮০ ভাগ টাকা ব্যয় হয়ে যায়। কিন্তু অনুমিত কমিটির তদন্ত করা পর্যন্ত কোন কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়নি। এ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কয়েকবার ক্রয় কমিটি বাতিলসহ নানা পদক্ষেপ নিয়েও কোন সুরাহা করতে পারেনি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডাবল শিফট চালুকরণ ও সম্প্রসারণের প্রকল্পে সারাদেশে ৩০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভৌত অবকাঠামো কাজের মধ্যে শেষ হয় মাত্র অর্ধেক। অথচ খরচ হয় ৫৬ কোটি ৩৩ লাখ টাকা। (সূত্রঃ দৈনিক যুগান্তর ৬ মে ২০০০)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৯ সালের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষার বাণিজ্য শাখার খাতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা না দেয়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে পরীক্ষার খাতা ফিরিয়ে আনার পর নতুন পরীক্ষকের মধ্যে পুনরায় খাতা বন্টন করে। একাধিকবার তাগাদা দিয়েও খাতা দেখার কাজ শেষ হয়নি। আওয়ামী সরকারের আমলে দেরীতে পরীক্ষার খাতা জমা দেয়া এক শ্রেণীর পরীক্ষকের অভ্যাসে পরিণত হয়। অদৃশ্য খুঁটির জোরে তারা কোন

www.pathagar.com

নিয়মনীতিকে তোয়াক্কা করেনি। পরীক্ষা খাতা দেখায় বিলম্বের জন্য সেশনজট বৃদ্ধিসহ নানাবিদ জটিলতা দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত এর খেসারত দিতে হয় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে। পরীক্ষা সংক্রান্ত করণীয় সম্পাদন শিক্ষকতারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। তদুপরি এ কাজের জন্য পারিশ্রমিকের ব্যবস্থাও ছিল। খাতা দেখার কাজ সময়মত শেষ না করা তাই সব বিবেচনাতেই দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের কাছ থেকে পরীক্ষার খাতা ফিরিয়ে এনে ত্বরিত গতিতে বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে বিতরণ করে তাদেরকে ৩/৪ দিনের মধ্যে খাতা দেখার কাজ সম্পন্ন করতে বলেন। কিন্তু এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়াও যুক্তিযুক্ত ছিলনা। তড়িঘড়ি করে ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ গিয়ে পরীক্ষার্থীদের প্রতি অবিচার হয়নি তা নিশ্চিত করে বলা যায়না। (সূত্র ঃ দৈনিক দিনকাল ২ জুন ২০০০)

৪ জুন দৈনিক দিনকালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একটি অনিয়মের চিত্র তুলে ধরে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে কয়েকজন শিক্ষক ও অফিসারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, 'ডিজির অফিস মানেই ঘুষের আড্ডা। এখানকার দারোয়ান-পিয়ন থেকে শুরু করে চেয়ার টেবিল পর্যন্ত টাকা চায়। টাকা না দিলে পিয়নরা ফাইল লুকিয়ে রাখে। কর্মকর্তারাও যেন কেরানীর কাছে জিম্মি। কর্মকর্তারা আজ কাল করে শিক্ষকদের ঘুরাতে ঘুরাতে জুতার তলা পর্যন্ত ক্ষয় করে দেয়। বেতন বৃদ্ধি, নিয়োগ জটিলতা, পেনশন ও বদলীসহ বিভিন্ন প্রকার অভিযোগের কারণে ডিজি অফিসের প্রায় সাড়ে চার হাজার ফাইল দীর্ঘদিনেও ছাড়া পাচ্ছে না। এসব ফাইল ছাড়াতে শিক্ষক ও কর্মকর্তারা টাকা দিয়েও কিনারা পাচ্ছেনা'।

১৯৯৯ সালের ডিগ্রী পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষার ফল ১০ জুন প্রকাশিত হয়। এতে পাসের হার ছিল ৪৪.৩৯। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আমিনুল ইসলাম তার ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য প্রকাশ করেন। ১৯৯৯ সালে নিয়মিত ডিগ্রি পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষায় ২,২৯,০৬৬ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে পাস করে ১,০১,৬৯১ জন। ১৯৯৮ সালে ডিগ্রি পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষায় এক বিষয়ে যারা অকৃতকার্য হয়েছিল তাদের ৪০২৮৬ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ২৯৯৭১ জন পাস করে। পাসের হার ৭৪.৩০। বিএ পাস পরীক্ষায় নিয়মিত শিক্ষার্থী ছিল ১০৫৩৮১ জন। এর মধ্যে ৪৩৯৩১ জন পাস করে। পাসের হার ৪১.৬৯। বিএসএস পরীক্ষায় ৬৯৪৬৩ জন নিয়মিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করে ৩০১৮৩ জন। পাসের হার ৪৩.৪৫। বিএসসি পরীক্ষায় ১৭২২২ জন নিয়মিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করে ৯৬৮২ জন। পাশের হার ৫৫.৯১। বি.কম পরীক্ষায় ৩৪০৫০ জন নিয়মিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করে ১৬৫৭৩ জন। পাশের হার ৪৮.৬৭ ভাগ। সংগীত বিভাগে ২৩ জন নিয়মিত পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১১ জন পাস করে। পাশের হার ৪৭.৮৩। সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষায় ২৯২৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৩৬৫ জন পাস করে। পাসের হার ৪৬.৬৩।

১১ জুন ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী, যশোর ও চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের ২০০০ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফল একযোগে প্রকাশিত হয়। এসএসসি পরীক্ষায় ৫ বোর্ডে পাসের গড় হার ছিল ৪১.১২ শতাংশ। ৫টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৯ লাখ ২৮ হাজার ৩শ' ৯১ জন।

কর্তৃপক্ষীয় ভুলের কারণে ১৩ টি বিদ্যালয়ের সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী ২০০০ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ফেলের শিকার হয়। একাধিক দৈনিকে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, ২০০০

www.pathagar.com

সালের এসএসসি পরীক্ষায় মুন্সীগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ি পরীক্ষা কেন্দ্রে ইসলাম ধর্ম বিষয়ে 'ক' সেট প্রশ্নপত্রে (কোড নং ২০৭) পরীক্ষা নেয়া হয়। কিন্তু ঢাকা বোর্ডের সকল পরীক্ষক ইসলাম ধর্ম বিষয়ে 'খ' সেটের প্রশ্নের ওপর ভিত্তি করে খাতা মূল্যায়ন করে। ফলে ইসলাম ধর্ম বিষয়ে টঙ্গীবাড়ি থানা কেন্দ্রের ৯০ শতাংশ পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়। এ বিষয়ে 'ক' ও 'খ' সেটের দু'টি প্রশ্নে সামঞ্জস্য থাকায় ভাগ্যক্রমে ১০ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করে। এই কেন্দ্রে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১ হাজার ২৬০ জন। হিন্দু ধর্ম বিষয়ে অংশগ্রহণকারীসহ পরীক্ষার্থীদের মোট পাসের হার ২৫ শতাংশ। অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৭৫০ জনই ইসলাম ধর্মে ফেল করে। কোনো কোনো পরীক্ষার্থী স্টার মার্কসহ প্রথম বিভাগে পাস করেও শুধুমাত্র ইসলাম ধর্ম বিষয়ে নম্বর কম পাওয়ায় পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ২৬ জুন ২০০০)

২৬ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ ক্যাডার মহসীন হল শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি শফিকুল ইসলাম গণধোলাইয়ের পর পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তার সাথে গণধোলাইয়ের পর ধরা পড়ে মিজান, শিমুল ও আশরাফ নামের তিন ছাত্রলীগ সশস্ত্র ক্যাডার। বেলা ১১ টার দিকে ছাত্রলীগ নেতা শফিকুল ইসলাম ও তার সঙ্গীরা ২টি ছিনতাই করা প্রাইভেট কার নিয়ে শিক্ষা ভবনে যায়। শফিকের পিতা বাগেরহাটের একটি মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল। ওই কলেজের একজন শিক্ষকের বেতন স্কেল বৃদ্ধি সংক্রান্ত ব্যাপারে সশস্ত্র ক্যাডাররা ঘটনাস্থলে যায়। শিক্ষাভবনের পিছনে পশ্চিম পাশে নব নির্মিত প্রকল্প ভবনের সামনের সঙ্কীর্ণ রাস্তার ওপর শফিক তার গাড়িটি দাঁড় করিয়ে রাখে। এ সময় গার্ড জাহাঙ্গীর আলম বিনয়ের সাথে গাড়িটি সরাতে বলে। এ সময় শফিক জাহাঙ্গীরের গালে থাপ্পর মেরে বলে, 'গাড়ি রেখেছি তাতে কি হয়েছে'। জাহাঙ্গীর সাথে সাথে শফিকের হাত ধরে ফেলে। এ সময় শফিক একটি পিস্তল বের করে। এদৃশ্য দেখে শিক্ষা ভবনের কর্মচারীরা সাহাসিকতার সাথে এগিয়ে আসে তাকে প্রতিহত করতে। সন্ত্রাসীরা (সংখ্যায় ৮/১০ জন) এ সময় কর্মচারীদের প্রথমে মারধর করতে থাকে। কর্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখে সন্ত্রাসীরা তিনটি পিস্তল ও রিভলবার থেকে প্রথমে ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে। আতঙ্কগ্রস্ত কেউ কেউ পালিয়ে গেলেও প্রায় অর্ধশত কর্মচারী সন্ত্রাসীদের ব্যবহৃত ছিনতাই করা গাড়ি ভাঙচুর ও ৪ ক্যাডার শফিক, মিজান, শিমুল, আশরাফকে মারধর করে। খবর পেয়ে রমনা থানার ওসি এবিএম সুলতান দলবল নিয়ে শিক্ষা ভবনের সামনে প্রহার করা সন্ত্রাসীদের আটক করতে যান। পুলিশ তাদের দখল থেকে ১টি ৯ এমএম অত্যাধুনিক পিস্তল ও পয়েন্ট ২২ বোরের একটি নতুন রিভলভার আটক করে। তাদের সঙ্গে থাকা ঢাকা শহরের টপটেরর লেদার লিটন, ইমনের শ্যালক টিটন, খোকন ও জয় প্রাইভেট কারযোগে পালিয়ে যায়। ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। ছাত্রলীগ নেতা শফিক, মিজান, শিমুল ও আশরাফকে পুলিশ প্রহরায় এবং সন্ত্রাসীদের গুলিতে আহত শিক্ষা ভবনের হিসাব রক্ষক শফিউল্লাহ, গার্ড রওশন আলী, গাড়ি চালক শফিকুল ইসলাম, পিয়ন আক্তার হোসেনকে ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। জাহাঙ্গীরসহ ১৫/১৬ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়। পুলিশ সন্ত্রাসীদের ব্যবহৃত ছিনতাই করা ক্ষতিগ্রস্ত প্রাইভেট কার (ঢাকা মেট্রো-গ-১২-৪০৩১ নম্বর প্লেট লাগানো) এবং কারের ভিতরে (ঢাকা মেট্রো অ-০০-৩৯০ সহ) ৩টি নম্বর প্লেট উদ্ধার করে। ছাত্রলীগ নেতা শফিকের হাতে রমনা থানার সাব ইনস্পেক্টর মাহবুর হ্যান্ডক্যাপ পরাতে গেলে সে তাকে ধাক্কা মেরে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। শফিক হাতের মোবাইল ফোন দিয়ে ফোন করার চেষ্টা করে। পুলিশ ফোনটি ছিনিয়ে নেয়। এ সময় শফিক চিৎকার করে পুলিশকে গালিগালাজ করে সে

www.pathagar.com

বলে, 'আমাকে দুই ঘন্টাও কেউ আটকে রাখতে পারবে না।' সে ওসিকে লক্ষ্য করে ধমক দিয়ে বলেন, 'ডাঃ এস এ মালেক, এমপি হেলাল ও বাহাউদ্দিন নাসিমকে ফোন করেন।' কিন্তু ওসি তার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে আহত সন্ত্রাসীদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার উদ্দেশ্যে পুলিশ ভ্যানে তোলেন। ক্যাডার শফিকের গ্রেফতারের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে অনেক সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন নীলক্ষেত মার্কেট, বাকু শাহ মার্কেট, পলাশী মার্কেট ও কাঁটাবন ফুল-পাখির মার্কেটে ব্যবসায়ীরা শোকরানা আদায় করে মোনাজাত করেন। শফিক ও তার নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসী বাহিনী নীলক্ষেত, কাঁটাবন, পলাশী, নিউমার্কেট, গাউছিয়া মার্কেট, এলিফ্যান্ট রোড, হাতিরপুল, শাহবাগ, রমনা ভবন, চানখাঁরপুলসহ বিভিন্ন মার্কেটে গিয়ে নিয়মিত চাঁদাবাজি করত। এরা এতটাই ভয়ংকর যে, কেউ চাঁদা না দিতে পারলে সন্ত্রাসীরা দোকান লুট, অপহরণ, ভাঙচুর করত। চাঁদাবাজির সাইন বোর্ড হিসেবে তারা ব্যবহার করত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম।

ছাত্রলীগের সূর্যসন্তানরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেও ছাত্রী ধর্ষণের একই রেকর্ড তৈরি করে। ২ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ধর্ষণকারী ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের আড়াল করতে ও ধর্ষণকারীদের বিচারের দাবিতে গড়ে ওঠা ছাত্র অসন্তোষকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে এক নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত ভিসি অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী সিন্ডিকেটকে দিয়ে পাস করিয়ে নেন। কোন তদন্ত ছাড়াই ছাত্রদলের কার্যক্রম নিষিদ্ধকরণ এবং একই সংগঠনের ২০ জন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আসলে ঘটনাটি আগে থেকে সাজানো ছিল বলে ঘটনা ঘটার মাত্র ৫ ঘন্টার মধ্যে ভিসি সিন্ডিকেটের সভা ডেকে উপরোক্ত বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যবস্থা করেন। একই সঙ্গে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের সকল হল থেকে বের করে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, পুলিশ ও ছাত্রলীগের চমৎকার সমন্বয় একদিকে ধর্ষক ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের আড়াল করে, অন্যদিকে ক্যাম্পাস থেকে বিরোধী ছাত্র সংগঠনকে নিশ্চিহ্ন করার প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জন করে। এদিকে ভিসি বিবিসি'র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা প্রসঙ্গে স্পষ্ট উত্তর দিতে ব্যর্থ হন। তবে ভিসি ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের ধর্ষণের ঘটনাবলি সম্পর্কে কোনো কথা বলেননি।

২৯ আগষ্ট প্রাথমিক স্তরের কোমলমতি শিশু-কিশোরদের জন্য 'ছোটদের মহানায়ক হিটলার' নামের একটি বই তালিকাভুক্তির বিস্ময়কর সংবাদ প্রকাশিত হয় একটি জাতীয় দৈনিকে। অবশ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি এই অন্তর্ভুক্তিকে হটকারী আখ্যা দিয়ে বলেছে, 'এই গ্রন্থ শিশুদের পড়ানোর খবর জানাজানি হয়ে গেলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কেলেংকারী হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে'। শুধু তাই নয়, পত্রিকায় আরো প্রকাশিত হয়েছে যে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে সম্পূরক পঠন হিসেবে যে ৮শ' ৯০ টি গ্রন্থ প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে কমপক্ষে ২শ' ২০টি গ্রন্থ অতিনিম্নমানের ও বিভিন্ন মারাত্মক দোষে দুষ্ট। নোরাড-এর সাহায্যপুষ্ট ৮০ টি বই ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় বিশেষজ্ঞ কমিটি সেগুলো বাতিলের প্রস্তাব করেছে। এর বাইরে প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য তালিকাভুক্ত ৩শ' ৯৪ টি বইয়ের মধ্যে ১শ' ৪০টি বাতিলের সুপারিশও করেছে বিশেষজ্ঞ কমিটি। নোরাড সাহায্যপুষ্ট ৪শ' ৯৬টি বই পিটিআই, নেপ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর ও মডেল স্কুলের জন্য নির্বাচিত হয়। বইগুলোতে মূল্য উল্লেখ না থাকায় দুর্নীতির

www.pathagar.com

যথেষ্ট সুযোগ থাকে। তালিকায় ৯টি ভারতীয় বাংলা বই সরাসরি ভারতীয় প্রকাশকের নামে অন্তর্ভুক্ত হয়। অথচ ভারতীয় এসব বইয়ের সমমানের বই বাংলাদেশে ছিল। একটি প্রকাশনা সংস্থা বিদেশী ৩৪ টি বই জমা দিয়ে অনুমোদন লাভ করে। মূল দেশের বাতিল করা এসব বই কম দামে কিনে এনে তালিকাভুক্ত করা হয়। যে প্রতিষ্ঠান এটা করে দেশীয় প্রকাশনার জগতে এঁদের কোনো বিনিয়োগ বা তেমন নাম নেই। নোরাড সাহায্যপুষ্ট বিভিন্ন তালিকায় ১০ টি নকল বইও ছিল। তালিকায় ২২ টি নিম্নমানের বই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ছোটদের মজার জোকস বইটি অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত। এছাড়া বিভিন্ন বইয়ের রচনার মান, কাগজ, ডিজাইন, মুদ্রণ ও বাঁধাই খুবই নিম্নমানের। একটি শিশুতোষ বইয়ে এমন ছবি ছিল যা প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দেশের বহু মানসম্মত বই তালিকাভুক্ত না করে বিদেশী নিম্নমানের বই তালিকাভুক্ত করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ৩শ' ৯৪ টি তালিকা অন্তর্ভুক্ত বইয়ের মধ্যে ছিল কতিপয় অজ্ঞাত লেখক ও পূর্ব পরিচিতিহীন ব্যক্তির রচিত ও সম্পাদিত বইয়ের আধিক্য। অখ্যাত তিনজন লেখকের ছিল ১৫ টি বই। অনেক ভারতীয় বইয়ের লেখকের নাম মুছে সেখানে জুড়ে দেয়া হয় অজ্ঞাত বাংলাদেশী লেখকদের নাম।

১২ নভেম্বর একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সহকারী প্রক্টরের উপস্থিতিতে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা ছাত্রদলের ৬টি কক্ষ ভাংচুর ও নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা করে। ঘটনায় ৭/৮ জন ছাত্রদল নেতা আহত হয়। দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আল বেরুনী হলের ডাইনিংয়ে ছাত্রলীগ ক্যাডার জাকির (নাটক ও নাট্যতত্ত্ব) ও শিবলী (ইতিহাস ২য় বর্ষ) নির্দিষ্ট সময়ের পরে খেতে চাইলে ম্যানেজার অপারগতা প্রকাশ করলে তারা ম্যানেজারকে বেধড়ক প্রহার করে। এ সময় প্রহৃত ম্যানেজারের কাছে ঘটনা জানতে চাওয়ায় হলের ছাত্র ও ছাত্রদল কর্মী কাওসারকেও (ভূ-তাত্ত্বিক বিজ্ঞান বিভাগ) তারা রড দিয়ে প্রহার করে রক্তাক্ত করে। কাওসারের প্রহারের খবর জানাজানি হলে তার ব্যাচের ছাত্ররা তাৎক্ষণিকভাবে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের ধাওয়া করে এবং হলের বাথরুমে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় জাকিরকে ধরে এনে গণপিটুনি দেয়। দলীয় ক্যাডার গণপিটুনির ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ছাত্রলীগ বিকেলে হলের ৩০৪, ৪১০, ২১৫, ৪১৭, ৪৩২ ও ১০৭ নম্বর কক্ষ ভাঙচুর করে এবং ছাত্রদল কর্মী জাহিদ, রুশু, পল্লব, সুমন, সুজনসহ ৭/৮ জনকে মারাত্মকভাবে আহত করে। আহতদের মধ্যে জাহিদ ও রুশুকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ওই সময় ছাত্রদল সভাপতি জুয়েল, সেক্রেটারি আরমান ও সহ-সভাপতি মতিউর রহমানকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হাতে ম্যানেজার প্রহৃতসহ কাওসারকে মারধরের সময় সহকারী প্রক্টর সানোয়ার হোসেন উপস্থিত থাকলেও তিনি কোনো ভূমিকা নেননি।

১৮ নভেম্বরর শেখ মুজিবের নামে এক হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীর চেয়ে নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যাই ছিল বেশি। ছাত্রদল ও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান বর্জন করে। প্রধানমন্ত্রী যে সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন তা অনেকটা দলীয় সমাবেশে রূপ নেয়। সেখানে উপস্থিত বেশির ভাগ শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী ছিল আওয়ামী সমর্থক ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী। প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে বিগত কয়েক দিন ধরে ক্যাম্পাসে গোয়েন্দা বিভাগের অসংখ্য লোকের উপস্থিতি শুরু হয়। শত শত দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়। অনুষ্ঠানের সময় ক্যাম্পাস ছিল একেবারে ফাঁকা। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা আগের দিন ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য পূর্ব নির্ধারিত

www.pathagar.com

একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করার চেষ্টা করলে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন অফিসের কাছে তাদের মিছিলে বাধা প্রদান করে। ফলে তারা মিছিল করতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে যাতে নিরাপত্তা ব্যবস্থার সামান্যতম বিচ্যুতি না ঘটে সে জন্য ক্যাম্পাসের সকল দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ কাপড়ের দোকানগুলো বন্ধ থাকে। ফলে ক্যাম্পাসে যে কয়জন ছাত্র-ছাত্রী ছিল তারা অবর্ণনীয় কষ্টে সময় অতিবাহিত করে। প্রধানমন্ত্রী তার দীর্ঘ বক্তৃতার এক পর্যায়ে যখন বিরোধী দলীয় কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য করতে থাকেন তখন সাধারণ জনগণ সমাবেশ বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের ভয়ে তারা তা করতে পারেনি। সম্পূর্ণ একদলীয় সুধী সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশ অনুষ্ঠান বর্জনসহ প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে স্বাগত জানাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের দাবী-দাওয়াগুলোকে তার বক্তৃতায় তুলে ধরলেও তাতে আশ্বাসের মাত্রা ছিল খুব নগণ্য।

আওয়ামী সরকার নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের মাধ্যমে এদেশের হাজার হাজার শিক্ষককে বেকার করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। ১২ ডিসেম্বর দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, সরকারের প্রণীত শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হলে সারাদেশের উচ্চ বিদ্যালয়গুলো থেকে ২ লক্ষাধিক শিক্ষক ছাঁটাই হয়ে যাবে। দীর্ঘদিন যাবত চাকরী করে আসা এসব শিক্ষকদের বিকল্প চাকরির অভাবে বেকার হওয়া ছাড়া আর কোন পথ থাকবে না। নয়া শিক্ষানীতিতে যে ৩ স্তরবিশিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে তাতে মাধ্যমিক পর্যায়ে অর্থাৎ উচ্চ বিদ্যালয়গুলো ৬ষ্ট, ৭ম ও ৮ম শ্রেণী গুলো থাকবে না। এই শ্রেণীগুলো প্রাথমিক স্তরে যুক্ত হবে। এর ফলে উচ্চ বিদ্যালয়গুলোর পুরনো শ্রেণীগুলোর মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে শুধু ৯ম ও ১০ শ্রেণী। সেই সাথে বর্তমানে প্রচলিত উচ্চ মাধ্যমিক স্তর বিলুপ্ত হয়ে কলেজের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী উচ্চ বিদ্যালয়ে যুক্ত হবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ বলে আর কিছু থাকবে না। সরকারি পর্যায়ের অধিকাংশ কলেজগুলোতে এ প্রক্রিয়ায় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী তুলে দেয়া হয়। উচ্চ বিদ্যালয়গুলো হতে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ ম শ্রেণী তুলে দেয়া হলে সরকারি নিয়ামানুযায়ী স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কমে যাবার সাথে সাথেই আনুপাতিক হারে শিক্ষক সংখ্যাও ছাঁটাই হয়ে যাবে। এসব শিক্ষক এমপিওভুক্ত হলেও তারা বাধ্যতামূলকভাবে বাদ পড়বে। যদিও উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে নতুনভাবে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী খোলা হবে, কিন্তু এর ফলে ঐসব শিক্ষকদের চাকরিতে বহাল থাকার কোন অবকাশ থাকবে না। কারণ কলেজ পর্যায়ের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য ১ শ্রেণীর এম এ পাস বা ২য় শ্রেণীর অনার্সসহ ২য় শ্রেণীতে এম এ পাস করা বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক প্রয়োজন হবে। সে ক্ষেত্রে উচ্চ বিদ্যালয়তে বর্তমানে কর্মরত গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক বা পাস কোর্সে ডিগ্রি নিয়ে ২য় শ্রেণীতে এম এ পাস করা শিক্ষকরাও একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য বহাল থাকার সুযোগ পাবেন না। এই দুই শ্রেণীর জন্য উপরোক্ত শিক্ষাযোগ্যতার নতুন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। আবার ৬ষ্ট, ৭ম ও ৮ম শ্রেণী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে যোগ হওয়ায় সরকার নিয়মানুযায়ী এখানে নতুন শিক্ষক নিয়োগ করবে। সেখানে উচ্চ বিদ্যালয়গুলো থেকে বাদপড়া ত্রিশোর্ধ্ব বয়সের কোন শিক্ষককে নিয়োগের সম্ভাবনা নেই। যদিও এই ৩টি শ্রেণী চালুর ফলে প্রাথমিক স্কুলেও খুব বেশি শিক্ষক লাগবে। এদিকে শিক্ষানীতিতে এ ধরনের বাদপড়া শিক্ষকদের বিকল্প চাকরির কথা বলা হয়নি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তারাও বর্তমানে এ বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা দিতে বা মন্তব্য করতে পারেনি। তবে ২৪ আগষ্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দের একটি অংশের

www.pathagar.com

স্বাক্ষরিত চুক্তিনামার ৯ দফা শর্ত অনুযায়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের সিংহভাগ শিক্ষকই যে জাতীয় শিক্ষানীতির ফলে আগামীতে বাদ পড়বেন, সে ব্যাপারে তারা দ্বিমত প্রকাশ করতে পারেনি। শর্তানুযায়ী স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা অনুপাতেই এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক সংখ্যা নির্ধারিত হবে এবং ছাত্র-ছাত্রী বাড়লে শিক্ষক বাড়বে বা ছাত্র-ছাত্রী কমে গেলে পরে যোগ দেয়া জুনিয়র শিক্ষকরা আপনা আপনি আনুপাতিক হারে ছাঁটাই হয়ে যাবেন। দেশের বেসরকারি পর্যায়ে বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে ১৩ হাজার উচ্চ বিদ্যালয়, ৯ হাজার উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ এবং ৮ হাজার মাদ্রাসা। উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম পর্যন্ত মোট ৫টি শ্রেণীর সর্বমোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৮০% থাকে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে। এই ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনের ওপর ভর করেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ হয়। ৯ম-১০ম শ্রেণীতে খুব একটা ছাত্র-ছাত্রী থাকে না। এখানে নতুন করে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী খোলা হলে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা তেমন কিছুই বাড়বে না। এ অবস্থায় ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণী উঠে গেলে দেশের ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত বহু উচ্চ বিদ্যালয় অর্থনৈতিক কারণেই বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ ইউনিয়ন পর্যায়ে কোন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় নেই এবং নিম্নমাধ্যমিক শ্রেণীর বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর বেতনের ওপর নির্ভর করেই ওসব বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হয়। ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণী উঠে গেলে প্রতিটি উচ্চ বিদ্যালয়ে বর্তমান শিক্ষক সংখ্যা মাত্র এক-চতুর্থাংশ নামিয়ে আনতে হবে এবং বাকী তিন-চতুর্থাংশ শিক্ষক ছাঁটাই করে দিতে হবে। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর নামে বাড়তি দু'টি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী খুলে তারা এতে অতিরিক্ত ২৫/৩০ জনের বেশি ছাত্র-ছাত্রী পাবে না। কারণ ইউনিয়ন পর্যায়ে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ অর্থাৎ একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা খুবই কম। বর্তমানে ৮/১০ ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত একটি উপজেলায় এ ধরনের মাত্র একটি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর) রয়েছে, সেখানে ঐ শ্রেণীতে সর্বমোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা গড়ে এক/দেড়শ'র বেশি নয়। ডিগ্রী কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী তুলে উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে পাঠানো হলে ঐ ছাত্র-ছাত্রী ভাগ হয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রতিটি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভাগ হয়ে ২০/২৫ জনের বেশি যাবে না। সঙ্গত কারণেই উচ্চ বিদ্যালয়ে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী চালু করেও শিক্ষক সংখ্যা বাড়ানোর সুযোগ থাকবে না। আবার প্রয়োজনীয় শিক্ষক জোগাড় না করেও ঐ শ্রেণী দুটো খোলার উপায় নেই। কিন্তু স্বল্পসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য কলেজমানের শিক্ষক পোষা তাদের জন্য হবে আত্মহত্যার শামিল। আবার গ্রাম পর্যায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণী খোলা হলেও সেখানে ছাত্র-ছাত্রী খুব একটা বাড়বে না। কারণ ৩য় শ্রেণীর পর থেকে প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কমতে থাকে। ইউনিয়ন পর্যায়ের উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা ভাগ হয়ে প্রতি গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে চলে এলে সে ক্ষেত্রে প্রাইমারীতেও ছাত্র-ছাত্রী তেমনভাবে বাড়বে না। এতে করে সেখানে বাড়তি শিক্ষকও তেমন প্রয়োজন হবে না। আর এর ফলে প্রাইমারীতে অতিরিক্ত শিক্ষক যদি নিয়োগ করাও হয়, তাহলে সরকারি আইনানুযায়ী এর ৬০% হবে মহিলা এবং এসব শিক্ষককে অবশ্যই বিষয়ভিত্তিক হতে হবে। সরকারের শিক্ষানীতি প্রণেতারা কেবল রাজধানী, বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নয়া শিক্ষানীতির জন্য বিবেচনা করেছেন। উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে তারা কোন চিন্তা-ভাবনা করেননি। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৯৫ ভাগই বেসরকারি।

www.pathagar.com

বেসরকারি শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টকেও আওয়ামী লীগ সরকার দলীয়করণ করার উদ্যোগ নেয় বলে ২৩ ডিসেম্বর দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশ। বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষকদের সঞ্চিত অর্থে ইতোমধ্যে গড়ে উঠছিল দেড়শ' কোটি টাকার তহবিল। এই তহবিল লুটপাটের জন্য আওয়ামী লীগের একজন প্রেসিডিয়াম সদস্যকে কল্যাণ ট্রাস্টের সচিব নিয়োগের জোর তৎপরতা শুরু হয়। আর সেটা করতে যাওয়ার কারণে অবসর নেয়া অথবা মৃত ১৮ শ' শিক্ষকের নামে বরাদ্দকৃত অর্থের চেক লেখা হয়ে গেলেও সচিবের স্বাক্ষর সংক্রান্ত আওয়ামী জটিলতার কারণে ঈদের আগে অর্থ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হন। তাদের ভাগ্যে ঈদের আনন্দ জুটেনি। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা অপরাপর সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় অবসর ভাতা, গ্রাচুইটি, সার্ভিস বেনিফিট ইত্যাদি পেয়ে থাকেন। কিন্তু বেসরকারি স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষকরা চাকরি থেকে যেদিন বিদায় নেন সেদিন শূন্য হাতেই বিদায় নেন। ফলে অবসর জীবনে তাকে পুরোপুরি পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে করুণার পাত্র হয়ে থাকতে হয়। এজন্যই শিক্ষক সমাজ দীর্ঘদিন ধরে বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য একটি কল্যাণ ট্রাস্ট গঠনের দাবী করে আসছিলেন। পল্লীবন্ধু এরশাদের শাসনামলের শেষদিকে এই দাবী বাস্তবে রূপ লাভ করে। পল্লীবন্ধু এরশাদ সরকার তাদের দাবীকে যৌক্তিক বলে মেনে নেন। আর সেজন্যই ১৯৯০ সালের মে মাস থেকে বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন ও ভাতার শতকরা ২ ভাগ কর্তন করা শুরু হয়। কিন্তু কয়েক মাস পরেই মাঝ পথে এসে শিক্ষকদের বেতন কর্তন থেমে যায়। পরে ১৯৯৭ সালে আবার শুরু হয় বেতন কর্তন। কাজী ফারুক আহমেদ এই দীর্ঘ সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। তার এই সংগ্রামী ভূমিকার কারণেই আওয়ামী আমল হওয়া সত্ত্বেও তাকে ট্রাস্টের সচিব পদে নিযুক্ত করা হয়। সেই থেকে তিনি সচিব হিসেবে কল্যাণ ট্রাস্টের দায়িত্ব পালন করে চলেন একরকম একাই। ট্রাস্টের কাজ করার জন্য মাত্র ১ জন সহকারী প্রোগ্রামার দেয়া হয়। বাকী কাজ তিনিই করেন। তিনিই অবসরপ্রাপ্ত বা মৃত কোনো শিক্ষকের কত টাকা পাওনা তা পর্যন্ত হিসেব করে দেন। দীর্ঘপথ পরিক্রমার পর ২০০০ সালের এপ্রিল মাস থেকে প্রথম শুরু হয় বেসরকারি শিক্ষকদের মধ্যে মারা গেছেন অথবা অবসর নিয়েছেন তাদেরকে এককালীন অর্থ প্রদান করার কাজ। এপ্রিলে অবসরপ্রাপ্ত ও মৃত ৩৪ জন শিক্ষকের পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর হাত দিয়ে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে এই অর্থ প্রদানের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে আরো ৫৪৫ জন অবসরপ্রাপ্ত অথবা মৃত শিক্ষকের পরিবারকে অর্থ সাহায্য প্রদান করা হয়। একজন শিক্ষক এক্ষেত্রে এককালীন ৪০ থেকে ৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ সহযোগিতা পান চেকের মাধ্যমে। অক্টোবর মাসে কল্যাণ তহবিলের আরেক সভায় ১ হাজার ৮শ' শিক্ষকের তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়। এককালীন অর্থ প্রদানের জন্য এদের কে কত টাকা পাবেন তার হিসাব পর্যন্ত করে দেন সচিব। ঈদের আগেই শিক্ষকরা টাকা পেয়ে যাবেন এমন একটি পরিকল্পনা ছিল সরকারি মহলের। সে অনুসারে কয়েক সপ্তাহ আগেই তাদের প্রাপ্ত অর্থের হিসাব অনুসারে চেক পর্যন্ত লেখা হয়। নিয়ম অনুসারে ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং ট্রাস্ট সচিবের এই চেকে স্বাক্ষর করার কথা। কিন্তু এই চেকগুলোতে স্বাক্ষর হয়নি। ফলে ঈদের আগে শিক্ষকরা অর্থ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হন।

ঝিনাইদহ কলেজ কেন্দ্রের ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষায় নকল ধরার কারণে ছাত্রলীগ নেতাদের হাতে দু'জন প্রভাষক লাঞ্ছিত হন। ৩ জানুয়ারি ২০০১ দুপুর ১২টার দিকে ইসলামিক শিক্ষা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও পরীক্ষা কমিটির সদস্য প্রভাষক

www.pathagar.com

আলাউদ্দিন আজাদ দেখতে পান যে, একজন পরীক্ষার্থী (নজরুল ইসলাম, রোল নং ২০৩৫৯৩) বেঞ্চের ওপর বই রেখে প্রকাশ্যে নকল করছে। এ সময় তিনি ওই পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে বই ও খাতা কেড়ে নিলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সে প্রভাষক আজাদকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং খাতা ফেরত না দিলে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রভাষক আজাদ খাতা ফেরত দিতে বাধ্য হন। নজরুল ছাত্রলীগের জেলা শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক। পরীক্ষা শেষে নজরুলের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের ১০-১২ জন ক্যাডার অতর্কিতে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কক্ষে প্রবেশ করে প্রভাষক আজাদকে খুঁজতে থাকে। তাকে না পেয়ে গালিগালাজ করে ফিরে আসে। পরদিন ইসলামের শিক্ষা ৩য় পত্রের পরীক্ষা শেষে দু'পুর সোয়া ১টায় তারা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কক্ষে ঢুকে প্রভাষক আজাদ ও প্রভাষক তোফাজ্জল হোসেনকে এলোপাথারী মাথা, হাতে, মুখে, বুকে কিল-ঘুষি মারতে মারতে ফ্লোরে ফেলে দেয়। এ সময় শিক্ষকদ্বয়ের আর্ত-চিৎকার শুনে অন্যান্য শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীরা এগিয়ে এলে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে দায়েরকৃত মামলা তুলে নেয়ার জন্যও তারা দু'শিক্ষককে চাপ দেয়। মামলা তুলে না নিলে তাদের হত্যা করবে বলে ছাত্রলীগ ক্যাডারা হুমকি দেয়। শিক্ষকদ্বয় বাধ্য হয়ে আত্মগোপন করেন।

২৩ জানুয়ারি পুরনো বইয়ের কভার পরিবর্তন করে বাজারজাত করার অভিযোগে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান সহ দু'জনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অশোক কুমার ঘোষ বাদী হয়ে ঢাকার সিএমএম আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নূরুল ইসলাম বাদীর জবানবন্দি নিয়ে মামলাটি তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য দুর্নীতি দমন ব্যুরো মহাপরিচালককে নির্দেশ দেন। বাদী মামলার আর্জিতে বলেন, 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. তপন কান্তি চৌধুরী ও পুস্তকার নির্বাহী পরিচালক ইকবাল আহমদের পাঠ্যপুস্তক নিয়ে যে প্রতারণা হচ্ছে তা সবই জানেন। তারা বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে ২০০০ সালের পাঠ্যবই যা ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল সেই সিলেবাসের বা পাঠ্যসূচির পরিবর্তন না করে শুধু বইয়ের কভার পরিবর্তন করে বাজারজাত করেছেন। ষষ্ঠ শ্রেণীর নিম্ন মাধ্যমিক গণিত, ইংলিশ ফর টুডে, নবম শ্রেণীর ইংলিশ ফর টুডেসহ প্রকাশিত অন্যান্য বই-এর উদাহরণ।' মামলার বাদী আর্জিতে আরও বলেন, 'তিনি ২২ জানুয়ারি বিকেলে ষষ্ঠ শ্রেণীর একটি পাঠ্যবই হাতে নিয়ে ২০০০ ও ২০০১ সালের বোর্ড অনুমোদিত বইগুলোর সঙ্গে তুলনা করে প্রতারণার বিষয়টি ধরতে পেরে আদালতে মামলা করেন।'

একইদিনে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাজারজাত করতে ব্যর্থতার জন্য পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ও বেক্সিমকোর ৩টি প্রেসের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক বিক্রেতা সমিতি প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে। সমিতির মহাসচিব আবদুর রাজ্জাক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরিত এক পত্রে এ আবেদন জানান।

২৫ জানুয়ারি বিকেলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. তপন কান্তি চৌধুরীর কাছে জানতে চাওয়া হলে একদল সাংবাদিকের সঙ্গে তিনি দুর্ব্যবহার করেন। ড. তপন খুবই রাগত স্বরে বলেন, 'আমি সাংবাদিকের সঙ্গে কোন কথা বলব না। আপনারা কি আমাকে জোর করে কথা বলাতে চান? আপনারা যান এখান থেকে'। এ কথা বলেই তিনি শিক্ষা সচিবের কক্ষের বাইরে করিডোরে দিয়ে দ্রুত হেঁটে লিফটে উঠে চলে যান। পাঠ্যপুস্তক নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা সম্পর্কে অফিসিয়াল বক্তব্য জানার জন্য বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকার

www.pathagar.com

১০/১২ জন সাংবাদিক জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে যান। সেখান থেকে জানা যায়, চেয়ারম্যান ও কন্ট্রোলার সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গেছেন। সাংবাদিকরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এ সময় চেয়ারম্যান সচিবের কক্ষ থেকে বের হয়ে যান। অপেক্ষমান সাংবাদিকরা করিডোরেই তাকে পাঠ্যপুস্তক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে অনুরোধ করেন। সাংবাদিকদের দেখেই ড. চৌধুরী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি কোন ধরনের সৌজন্যতা না দেখিয়ে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতেই অত্যন্ত রাগত স্বরে উচ্চ কণ্ঠে সাংবাদিকদের সম্পর্কে নানা আপত্তিকর মন্তব্য করেন। এ ঘটনার সময় সচিবালয়ের ৬ নম্বর ভবনের ১৮ তলার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লিফটের সামনে বহু লোকের ভিড় জমে যায়। পরে সাংবাদিকরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. সাদত হুসেনের সঙ্গে দেখা করলে তিনি বলেন, 'শিক্ষামন্ত্রী এখন যশোরে রয়েছেন। তিনি ফিরলেই এ বিষয়টি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন'।

একইদিন দুপুরে বাংলাবাজারে পুস্তক প্রকাশন, মুদ্রণ ও বিপণন সমিতির নেতৃবৃন্দ এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে সৃষ্ট পরিস্থিতির জন্য দায়ী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়ে বলেন, 'এ মুহূর্তেও যদি সরকার আমাদের কাজ ওপেন করে দেয় তবে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বাজার স্থিতিশীল হয়ে যাবে'। নেতৃবৃন্দ বলেন, '৩০ নভেম্বরেই আমরা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে বই ছাপার কাজ ওপেন করে দিতে অনুরোধ করেছিলাম। ১৯ ডিসেম্বর সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে সমিতির পক্ষ থেকে পুস্তকা ও বোর্ডের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরে সব ধরনের সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। কিন্তু কেউ আমাদের কথা শোনেনি। পাঠ্যবই নিয়ে এবারের মতো পত্রপত্রিকায় এর আগে এত লেখালেখি হয়নি'। বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক বিক্রেতা সমিতি, বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতি ও বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিপণন সমিতির পক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মোঃ আবু তাহের, মোঃ রব্বানী, জব্বার, শহীদ সেরনিয়াবাত প্রমুখ।

২৮ জানুয়ারি জাতীয় সংসদের অধিবেশনে জাতীয় শিক্ষানীতি অনুমোদিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে আনীত একটি প্রস্তাবের উপর শিক্ষামন্ত্রীকে আলোচনার সুযোগ না দিয়েই প্রস্তাবটি পাস হওয়ার পর সকল নিয়মরীতি উপেক্ষা করে পুনরায় শিক্ষামন্ত্রীকে আলোচনার সুযোগ দেয়ার মত একটি নজীরবিহীন ঘটনা ঘটে। আর এই বিষয় নিয়ে সংসদে রীতিমত নাটকীয় ঘটনা ঘটে। প্রস্তাব পাস হওয়ার পর আলোচনার সুযোগ দেয়া যায় না-একথা ঘোষণার পর স্পীকারের আসনে সমাসীন প্যানেল চেয়ারম্যান পুনরায় শিক্ষামন্ত্রীকে আলোচনার সুযোগ দেয়ায় সরকারি দলের সদস্যরাই বিস্মিত হন। আর ডেপুটি স্পীকার হন বিক্ষুব্ধ। সরকারি দলের সদস্য আব্দুল লতিফ মির্জা ধন্যবাদ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। এ নিয়ে প্রায় এক ঘন্টা আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক আব্দুল মান্নান, ড. আলাউদ্দিন, হাফিজ উদ্দিন মজুমদার, ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু ও উপাধ্যাক্ষ আব্দুস শহীদ। এই আলোচনা ছিল এতটাই নিস্প্রাণ যে, হাউজে কোরাম পর্যন্ত ছিলনা। ৪৬ জন এ সময় উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু ডেপুটি স্পীকার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা করে প্রস্তাবটি ভোটে দেন এবং তা পাস হয়। ভোটাভুটির প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর্যায়েও কেউ আপত্তি তোলেননি। ভোট সম্পন্ন হওয়ার পর হুইপ উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ ও প্রস্তাব উত্থাপনকারী আব্দুল লতিফ মির্জা উঠে দাঁড়িয়ে ডেপুটি স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

www.pathagar.com

লতিফ মির্জা শিক্ষানীতির উপর আলোচনায় শিক্ষামন্ত্রীকে আলোচনার সুযোগ কেন দেয়া হলো তা জানতে চান। জবাবে ডেপুটি স্পীকার আব্দুল হামিদ বলেন, 'প্রস্তাব পাস হয়ে গেছে। এখন আর আলোচনার সুযোগ নাই'। এরপর ডেপুটি স্পীকার প্রেসিডেন্টের ভাষণের উপর আলোচনার এজেন্ডা হাতে নেন। স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডাঃ আমানুল্লাহ আলোচনা শুরু করলে ডেপুটি স্পীকার প্যানেল চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ সিদ্দিকীকে চেয়ারে বসিয়ে বিদায় নেন। শিক্ষামন্ত্রীকে আলোচনার সুযোগ না দেয়ায় সরকারি দলের সদস্যরা কানাঘুষা করতে থাকেন। হুইপ আব্দুস শহীদ ছুটে যান শিক্ষামন্ত্রীর কাছে। বেশকিছু সময় তারা কথাবার্তা বলেন। শিক্ষামন্ত্রী তার কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। হুইপ শহীদ নিজ আসনে ফিরে গিয়ে বেঞ্চ অফিসার উপসচিব (আইন)-কে ডেকে আনেন। তাকে কিছু নির্দেশ দিয়ে হুইপ পুনরায় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে যান এবং আলাপ শেষে হাউজ থেকে বেরিয়ে ডেপুটি স্পীকারের কাছে যান। তার আগেই অতিরিক্ত সচিব ছুটে যান ডেপুটি স্পীকারের চেম্বারে। তাকে জানান, শিক্ষামন্ত্রী আলোচনার সুযোগ না পেয়ে ক্ষুব্ধ। তাকে প্রেসিডেন্টের ভাষণের ওপর আলোচনার সুযোগ দিলে এ ক্ষোভের প্রশমন করা যায়। ডেপুটি স্পীকার তাতে সায় দেন। কিন্তু তিনি ফিরে আসার আগেই প্যানেল চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্টের ভাষণের ওপর আলোচনা স্থগিত রেখে শিক্ষামন্ত্রীকে শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনার আবেদন জানিয়ে বলেন, 'ভুল স্বীকার করায় লজ্জার কিছু নেই। শিক্ষানীতির ওপর আলোচনাকালে ভুলবশত মন্ত্রী বাদ পড়ে গেছেন তাকে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি বক্তব্য রাখার জন্য।' প্যানেল চেয়ারম্যানের এই ঘোষণার নতুন করে সবাই হতবাক হন। ভোটাভুটির পর কোন প্রস্তাবের ওপর আলোচনা নজীরবিহীন। প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেন ও মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন মন্তব্য করেন, 'প্রস্তাব পাস হওয়ার পর আলোচনার সুযোগ কিভাবে দেয়া হয়।' শিক্ষামন্ত্রী বক্তব্য শুরুর আগে বলেন, 'ভুলটা কার তা চিহ্নিত করা ঠিক হবে না। স্পীকারের আসনটা অনেক বড়।' সরকারি দলের সদস্যদের মধ্যে কানাঘুষা অব্যাহত থাকলে সুরঞ্জিত সেন উঠে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদের পাশে গিয়ে বসেন। সামাদ আজাদ তখন ঘুমাচ্ছিলেন। তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে সুরঞ্জিত সেন পরিস্থিতি অবহিত করেন কিন্তু সামাদ আজাদ এ নিয়ে কোন কথা বলেননি। হুইপ আব্দুস শহীদ ডেপুটি স্পীকারের চেম্বারে আলাপ করতে গেলে ডেপুটি স্পীকার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'আগে শিক্ষামন্ত্রীর নাম দেননি। এখন প্রস্তাব পাস হওয়ার পর বিধিবহির্ভূত আলোচনা করছেন শিক্ষামন্ত্রী। আপনারা যেভাবে ইচ্ছা সংসদ চালান।' ডেপুটি স্পীকার হাউজে আর ফিরে আসেননি। শিক্ষামন্ত্রীকে শুধু বিধিবহির্ভূত আলোচনার সুযোগই দেয়া হয়নি, প্রেসিডেন্টের ভাষণের ওপর আলোচনাকালে অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা-বিতর্ক চলাও বিধিবহির্ভূত হলেও এ ক্ষেত্রেও বিধি লংঘন করা হয়। এ বিষয়ে সাংবাদিকরা ডেপুটি স্পীকারকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'সংসদ তো ইচ্ছামত চলতে পারেনা। হুইপ এর পক্ষ থেকে যে পাসের তালিকা দেয়া হয় তাতে শিক্ষামন্ত্রীর নাম ছিল না। তাছাড়া এ আলোচনায় তাকে সুযোগ দেয়ার কোন বাধ্যবাধকতা বিধিতে নেই। তাছাড়া ভোটাভুটির পর্যায়ে কেউ দৃষ্টি আকর্ষণও করেনি।'

নির্ধারিত সময়ে প্রায় ৩ মাস পর জানুয়ারি মাসে প্রাথমিক ও হাইস্কুলের সাড়ে ৫ কোটি বইয়ের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ের মাত্র ১০ ভাগ বই সরবরাহ করায় সর্বত্র কাড়াকাড়ি শুরু হয়। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ঢাকাসহ ৬ টি বিভাগীয় শহরের মাত্র ১৪৯ টি দোকানে বই সরবরাহের কথা প্রচার করা হলেও সেসব স্থানে বই পাওয়া যায়নি। সারাদেশের গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা,

www.pathagar.com

জেলা, বিভাগ ও ঢাকাসহ সর্বত্র বইয়ের তীব্র সঙ্কটে স্কুলের লেখাপড়া বিঘ্নিত হয়। হাইস্কুলের ৬০ টির মধ্যে ১৪ টি বিষয়ে যে সামান্য বই বাজারে ছাড়া হয় তাতেও থাকে নানা অনিয়ম ও ভুল ভ্রান্তি। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ খুবই কম থাকায় তারা কয়েকগুণ বেশি মূল্যে বই বিক্রি করে। এমনিতেই ২০০১ সালে অবৈধভাবে বইয়ের মূল্য আগের বছরের চেয়ে ১৮ থেকে ২৬ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়। চট্টগ্রামে একটি পেট্রোল পাম্পে, ঢাকায় হোমিওপ্যাথিক ও রাজশাহীতে অ্যালোপ্যাথিক ঔষদের দোকানে, সিলেট ও খুলনায় ট্রান্সফোর্স কাউন্টারসহ বইয়ের দোকানের বাইরে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ২০০১ সালের বই সরবরাহ করা হয়। প্রাথমিক স্তরের বইয়ের বেলাতেও ঘটে একই ব্যর্থতা। জানুয়ারি পর্যন্ত বই ছাপা শেষ হয় ১৫ ভাগ। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে কিছু কিছু বই স্কুলগুলোতে সরবরাহ করা হলেও অধিকাংশ স্কুলের পুরনো বই দেয়া হয়। ২০০১ সালে ২৩ লাখ টাকা খরচ করে পরিমার্জনের নামে বইয়ের শুধু প্রচ্ছদ পাল্টে ও কিছু শব্দ, অক্ষর, কমা, সন-তারিখ ইত্যাদি সংযোজন করে নতুনভাবে ছাপানো হয়।

১৫ ফেব্রুয়ারি দৈনিক সিলেটের ডাকে 'বানিয়াচঙ্গে পাঠ্যবই সংকট। ৪ হাজার শিক্ষার্থী বিপাকে' এই শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরে জানা যায়, 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত বইয়ের পরিমাণ কম হওয়ায় প্রায় ৪ হাজার শিক্ষার্থী এখনো পাঠ্যবই পায়নি। ফলে শিক্ষার্থীদের লেখাপাড়া বিঘ্নিত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন শিক্ষক-অভিভাবক। শিক্ষাবর্ষের প্রায় দুই মাস অতিবাহিত হলেও শিক্ষার্থীদের হাতে বই না পৌঁছায় তাদের শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বানিয়াচং থানার প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা ১৬৯টি। এর মধ্যে রয়েছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্যাটেলাইট বিদ্যালয়, কমিউনিটি বিদ্যালয় এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসা। এই সকল বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীর ৬ হাজার ৭শ' শিক্ষার্থীদের জন্য এসেছে ৫ হাজার ৩শ' সেট বই, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৬ হাজার ৮শ' শিক্ষার্থীদের জন্য পাওয়া গেছে ৫ হাজার ৫শ' সেট বই। তৃতীয় শ্রেণীর ৫ হাজার ৯শ' শিক্ষার্থীদের জন্য বই পাওয়া গেছে ৫ হাজার ৫শ' সেট। চতুর্থ শ্রেণীর ৪ হাজার ৪শ' শিক্ষার্থীদের জন্য মোটামুটি প্রয়োজনীয় বই পাওয়া গেলেও পঞ্চম শ্রেণী ৩ হাজার ২শ' ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বই দেয়া হয়েছে ২ হাজার ৭শ' সেট। এছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণীতে কয়েকটি বিষয়ে বই বরাদ্দই হয়নি। সেই হিসেবে থানার কমপক্ষে ৪ হাজার শিক্ষার্থী বই পায়নি এখনো।'

১৮ মার্চ মাস্টার্স শেষ পর্বের চতুর্থ বিষয়ের পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে এক নজীরবিহীন তান্ডব চালানো হয় ফরিদপুর সরকারি রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে। নকলে বাধা দেওয়ায় (ছাত্রলীগ নেতা) একজন পরীক্ষার্থীর নেতৃত্বে উত্তেজিত ছাত্রদের উপর্যুপরি হামলায় ৫ জন শিক্ষক আহত হন। কলেজের ১০ লাখ টাকার সম্পদের ক্ষতি হয়। কলেজ ক্যাম্পাসের উত্তেজনা গোটা শহরে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। এই তান্ডবের পরিণামে রাজেন্দ্র কলেজের মাস্টার্স পরীক্ষা ভন্ডুল হয়ে যায়। কলেজটির ৮০০ ছাত্র মাস্টার্স পরীক্ষা দিতে পারেনি। দেশের একটি সুপরিচিত ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট এই কেলেঙ্কারির মূল হোতা হচ্ছে ছাত্রলীগের একজন নেতা ও কলেজ ইউনিয়নের ভিপি। এই নজীরবিহীন কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটেছে তার নেতৃত্বে ও ইন্ধনে এবং তার জন্য। উক্ত ছাত্রনেতা মাস্টার্স শেষ পর্বের পলিটিক্যাল সায়েন্স বিষয়ের পরীক্ষা দিচ্ছিল। পরীক্ষা নয়, সে টুকলিফাই করছিল। দায়িত্বরত শিক্ষক তাকে বাধা প্রদান করেন। এতেই ঘটে বিপত্তি। একে তো কলেজের ভিপি তাহার উপর আবার সরকারি দলের আশীর্বাদপুষ্ট ছাত্র সংগঠনের নেতা। কাজেই আর সবকিছুর মতোই পরীক্ষা কেন্দ্রটিকেও

www.pathagar.com

সে মগের মল্লুক হিসেবেই বিবেচনা করে। তাকে নকল করতে না দেওয়ায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে শিক্ষকদের উপর চড়াও হয়। কক্ষের অন্যান্য পরীক্ষার্থীর খাতা ছিঁড়ে ফেলে এবং পরীক্ষকের নিকট রক্ষিত লুজ শিট ও অন্যান্য কাগজপত্র ছিনিয়ে নিয়ে যায়। অতঃপর সদলবলে সশস্ত্র মাস্তানদের নিয়ে কেন্দ্রে হামলা চালিয়ে এক ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞের সূচনা ঘটায়। তার মতলব হাসিল হয়। রাজেন্দ্র কলেজের মাস্টার্স পরীক্ষা ভন্ডুল হয়। এই ধরনের ভয়াবহ সন্ত্রাস সংঘটিত করার পরও পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেনি।

শেখ হাসিনা ডিগ্রী আনার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে বিদেশে ছুঁটেছেন আর দেশের মধ্যে মতিঝিল মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজের ১৩২ জন ছাত্রী আন্দোলন করেও তার হস্তক্ষেপ পায়নি। কলেজ কর্তৃপক্ষের দোষে ১৩২ ছাত্রীর পরীক্ষা দেওয়া প্রায় অনিশ্চিত ছিল। ১৯৯৯-এর শুরুতেই যখন রেজিস্ট্রেশন ইনফরমেশন ফরম পাওয়া যায় তখন থেকেই মতিঝিল মডেল স্কুলের এই সমস্যাটির ব্যাপারে জানা যায়। তখনই বোর্ডের পক্ষ থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষকে চিঠির মাধ্যমে বিষয়টি সংশোধনের জন্য বলা হয়। তখন দু'বার চিঠি পাঠানো সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কোন যোগাযোগ করেনি। এ অবস্থায় ১৩২ জন অনিশ্চিত পরীক্ষার্থী বিষয়টি জানতে পারে মার্চ মাসে। তখন থেকেই তারা ব্যাপারটি সুরাহার জন্য চেষ্টা চালানোর এক পর্যায়ে ৬ এপ্রিল পরীক্ষার্থীরা মতিঝিল কলেজের কলাপসিবল গেট ও আসবাবপত্র ভাংচুর করে। এরপর ছাত্রী ও অভিভাবকরা পুলিশী হামলার শিকার হন। পুলিশের লাঠিচার্জের পর ছাত্রীরা প্রেসক্লাবে এসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে এবং গাড়ি ভাংচুর করে। ৭ এপ্রিল ছাত্রী ও অভিভাবকরা সাংবাদিক সম্মেলন করে অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কমিটি গঠন করে। ৯ এপ্রিল ছাত্রীরা বিক্ষোভ মিছিল করে। অপরদিকে অভিভাবকরা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি দেন। শিক্ষামন্ত্রী তাদের নিরাশ করেন। ১১ এপ্রিল মুক্তাঙ্গণে অভিভাবক ও ছাত্রীরা প্রতীক অনশন পালন করে। ১৫ এপ্রিল চোখে কালো কাপড় বেঁধে মুক্তাঙ্গণে প্রতীকী প্রতিবাদ পালন করে অধ্যক্ষের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। এরপরে তারা অবস্থান ধর্মঘট, মিছিল, মিটিং করেও বোর্ড কর্তৃপক্ষ কোন সিদ্ধান্ত জানতে না পারায় তারা আমরণ অনশনের ডাক দেয়। ১৭ এপ্রিল অভিভাবক ফয়েজ উল্লাহ ভুঁইয়া জানান, ইতিমধ্যে এ বিষয়ে মতিঝিল থানায় মামলা হয়েছে। ১৮ এপ্রিল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আব্দুল মতিন আত্মপক্ষ সমর্থন করে জামিন নেন, এর আগে তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল। ২০ এপ্রিল ছাত্রীরা মুক্তাঙ্গণে আমরণ অনশন শুরু করে। মুক্তাঙ্গণে সবার চোখের সামনে এসব ছাত্রীরা তাকিয়ে ছিল প্রধানমন্ত্রীর দিকে। প্রধানমন্ত্রী বিদেশ. থেকে দেশে ফেরার পর ছাত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছিল 'অন্যের অবহেলার কারণে বিধি-বিধানের অক্টোপাশে বেঁধে তাদের যেন পরীক্ষা দানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা না হয়'। কিন্তু তাদের জন্য ঐ দিন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী কিছুই করেননি। রাত পৌনে ৯ টায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া সরবত পান করিয়ে ওদের অনশন ভঙ্গ করেন। ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে খালেদা জিয়া বলেন, 'সরকার দেশপ্রেমিক হলে এবং ছেলে-মেয়েদের প্রতি তাদের ভালবাসা থাকলে পরীক্ষার ব্যবস্থা করবে'। এ সময় বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব মির্জা আব্বাস, মহানগর বিএনপির সভাপতি সাদেক হোসেন খোকা, বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মুক্তাঙ্গণে ১৩২ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়ার অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হয়ে আমরণ অনশনে বসে। সারাদিন অনশনের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে পপি, মুনমুন, ঝরনা, মেহেলি, সুইটিসহ আরও অনেকে। শুধু ছাত্রীরাই নয় অভিভাবকদের মধ্যে কেউ কেউ গরমে অসুস্থ হয়ে

www.pathagar.com

পড়েন। 'কি অপরাধ করেছিল আমাদের মেয়েরা, তারা কেন এইচএসসি পরীক্ষা দিতে পারবে না, কর্তৃপক্ষের গাফলতির করণে ১৩২ জন মেয়ে কেন এই মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করবে, এর উত্তর কে দেবে-'এই জাতীয় নানা প্রশ্নের উল্লেখ করেন পরীক্ষার্থী সোনিয়ার মা গুলশান আরা তামান্না। গুলশান আরা তামান্না আরও জানান, 'গত কয়েকদিন ধরে বোর্ড কর্তৃপক্ষসহ সবাই পরীক্ষা দেয়ার ব্যাপারে আশ্বাস প্রদান করলেও শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে তারা কোন আশা পাননি। তাই তারা প্রধানমন্ত্রীর দিকে শেষ আশা নিয়ে তাকিয়ে আছেন। প্রধানমন্ত্রী মানবিক দিক দিয়ে বিবেচনা করবেন এবং এই অচলাবস্থার সমাধান হবে বলেও তারা আশা করছেন।'

'যে কোন সিলেবাসে হোক না কেন আমরা পরীক্ষা দিতে চাই-'এ বক্তব্য প্রদান করে নাহিদা ইসলাম, হাবীবা সুলতানা, আমেনা মেহবুবাসহ আরও অনেকে। এই আমরণ অনশনে সংহতি প্রকাশ করেন দেশের বিভিন্ন সংগঠন। বিএনপি মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া অনশনরত ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা করেন। এছাড়াও সংহতি প্রকাশ করেন উদীচীর সভাপতি সৈয়দ হাসান ইমাম, সিগমা হুদা, গোলাম কুদ্দুস, রাশেদ খান মেনন, অধ্যাপিকা মাহফুজা খানম, হেনা দাস, গিয়াস কামাল চৌধুরী, ছাত্র ইউনিয়নের মঞ্জুর-এ-খোদা টরিক, মতিঝিল কলোনী সমাজকল্যাণ সমিতি, বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থাসহ আরও অনেকে। অপরদিকে বার্তা সংস্থা ইউএনবির সঙ্গে টেলিফোনে আলাপের সময় শিক্ষামন্ত্রী এসএসএইচকে সাদেক বলেন, 'মন খারাপ করোনা। আগামী বছরের জন্য ভালো করে প্রস্তুতি নাও।' তিনি আরো বলেন, ১৩২ জন ছাত্রীর অভিভাবকদের তাদের ছেলে-মেয়েদের বোঝানো এবং সংগ্রামের পথ থেকে সরে আসা উচিত কেননা এতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে।' তিনি বলেন, 'অভিভাবকরা পরিস্থিতিটা ভালোভাবেই জানেন এবং তারা যখন আমার কাছে স্মারকলিপি দিতে এসেছিলেন তখন সব মেনেও নিয়েছেন। আমি তাদের বলেছি ছাত্রীরা আগামীবছর আরও ভালো প্রস্তুতি নিয়ে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে এবং তারা আমার কথা মেনে নেন'। ২৩ এপ্রিল ১৩২ ছাত্রী বিশেষ ব্যবস্থায় তাদের পরীক্ষা গ্রহণের আবেদন সংবলিত একটি স্মারকলিপি দিতে গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে। স্মারকলিপি গ্রহণ করে একটু সমবেদনা জানানো তো দূরের কথা, মেয়েদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেননি তিনি। ওদের কান্নায় বাতাস ভারি হয়েছে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর হৃদয়ের পাষাণ গলেনি। প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী এবং ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের অমানবিক আচরণের ক্ষুব্ধ ছাত্রীরা কলেজে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে পুলিশ লেলিয়ে তাদের পেটানোর মত ন্যক্কারজনক ঘটনাও ঘটিয়েছে কর্তৃপক্ষ। প্রধানমন্ত্রী ছাত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের স্মারকলিপিটি গ্রহণ করলে এবং সান্ত্বনাসূচক দু'চারটি কথা বললে কলেজ কর্তৃপক্ষ পুলিশ দিয়ে মেয়েদের পেটানোর অসভ্য আচরণ করতে সাহস পেতো না। ২৪ এপ্রিল ১৩২ জনের সঙ্গে অষ্টম ও নবম শ্রেণীর ছাত্ররা একাত্মতা প্রকাশ করে। কলেজ ভবনে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ ঘোষিত হয়। ২৫ এপ্রিল হাইকোর্টে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দানের জন্য রীট করা হয়।

২৬ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মইনুর রেজা চৌধুরী ও বিচারপতি মোজাম্মেল হোসেন সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ একজন ছাত্রীর রিট আবেদনের ভিত্তিতে এক অন্তর্বর্তী আদেশে ১৩২ জন ছাত্রীর মধ্যে এ ১২৮ জনকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান শরিফ উল্লাহ ভূঁইয়াকে নির্দেশ দেন। তারা তাদের দাখিল করা রেজিস্ট্রেশন ফরমে উল্লেখ থাকা বিষয় অনুযায়ী পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পায়। তবে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাদের ফলপ্রকাশ না করারও নির্দেশ দেয়া হয়। অপর চারজন

www.pathagar.com

ছাত্রীকে আগেই বোর্ড পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দিয়ে প্রবেশপত্র সরবরাহ করে। অন্তর্বর্তী আদেশ দিয়ে রুলনিশি জারি করা হয়। রুলে মতিঝিল মডেল স্কুল ও কলেজের মানবিক বিভাগের ছাত্রীদের ২৭ এপ্রিল থেকে শুরু এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রবেশপত্র ইস্যু না করা সম্পর্কিত কার্যক্রম কেন বাতিল করে তাদের পরীক্ষায় বসতে বা অপর কোন আদেশ দেয়া হবে না-চার সপ্তাহের মধ্যে কারণ দর্শাতে বলা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও মতিঝিল মডেল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষের ওপর জারি করা এই রুল হাইকোর্ট থেকে ঐ দিন বিকেলেই সংশ্লিষ্টদের কাছে পৌঁছে দিতে নির্দেশ দেয়া হয়। মানবিক কারণে অন্তর্বর্তী আদেশ দেয়া হচ্ছে বলে এ সময় আদালত থেকে বলা হয়। প্রবীণ আইনজীবী খন্দকার মাহবুব উদ্দিন পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দিতে আদালত থেকে আদেশ প্রদানের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে এর আগে বলেন, 'এই ছাত্রীদের কোনো ক্রটি নেই। তারা রেজিস্ট্রেশনের জন্য যে ফরম পূরণ করে তাতে তাদের পড়ার বিষয়গুলো উল্লেখ করেছে। পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণকালেও একই পাঠ্য বিষয় উল্লেখ করার আগে দু'টি বছর সে অনুযায়ী পড়াশুনা করে এবং এসব বিষয়ে নির্বাচনী পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়। তাদের কোন ক্রটি কখনও কেউ ধরিয়ে দেয়নি। অথচ বোর্ড চলতি বছরের ১৯ মার্চ কলেজ কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে এ বিষয়ে জানিয়েছে। কিন্তু রেজিস্ট্রেশন নম্বর ইস্যু করার আগে এগুলো পরীক্ষা করা দরকার ছিল। পরীক্ষা দেয়ার জন্য তারা যে ফরম পূরণ করেছে তা পরীক্ষা করার পর ক্রটির কথা বলা হচ্ছে। প্রথমে ১৩২ জনের কথা বলা হলেও পরে চারজনকে সুযোগ দেয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, কম্পিউটারে পরীক্ষার পর এগুলো ছাড়া অন্যগুলোতে ক্রটি ধরা পড়ে।' তিনি বলেন, 'একই সঙ্গে যারা ফরম পূরণ করেছে তাদের নম্বরের ক্রমিক অনুসরণ করে রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়। ক্রটি কিছু থাকলে তা বোর্ড বা কলেজ কর্তৃপক্ষের ক্রটি। ছাত্রীদের নয়। তাদের পরীক্ষা দেয়ার জন্য নির্দেশ দিলে আইন ভঙ্গ হবে না।' এর বিপক্ষে এটর্নি জেনারেল মাহমুদুল ইসলাম বলেন, 'দেশে এখন নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা তা ভঙ্গ করতে পারি না। এই ছাত্রীরা ইচ্ছাকৃতভাবে বেশি নম্বর পেতে এই বিষয়গুলো নিয়ে ফরম পূরণ করেছে। অথচ বিষয়গুলো তাদের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের ঐচ্ছিক বিষয়ের গ্রুপ থেকে একটি বিষয় নেয়ার কথা। কিন্তু নিয়েছে তিনটি। তাদের পরীক্ষা দিতে দেয়া যায় না। তাহলে ১৯৯৩ সালের কারিকুলাম এ্যাক্টের বিধান ভঙ্গ হবে। কালিকুলামের ভেতর থেকে পরীক্ষা গ্রহণ করা বোর্ডের দায়িত্ব। সেটাই বোর্ডের জন্য আইনানুগ পথে চলা।' আদালত আইনের বাইরে বোর্ডকে চলতে বলতে পারে কিনা তিনি জানতে চান। তিনি বলেন, 'সিলেবাসের বাইরে পরীক্ষা নিতে বলতে পারলে কোর্ট বলবে। আইনের লঙ্ঘন হবে না মনে করলে আদালত নির্দেশ দিতে পারে'। তিনি ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, 'এ ধরনের আদেশ দিতে হলে আদালতকে নিশ্চিত হতে হবে তারা আইনত বৈধ আদেশ দিচ্ছেন।' এ সময় আদালত এটর্নি জেনারেলকে বেশ কিছু বিষয়ে প্রশ্ন করে তার কাছ থেকে বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেন। পরে খন্দকার মাহবুব পাল্টা বক্তব্যে বলেন, 'তারা যে বিষয়গুলো নিয়েছে সে বিষয়গুলো বোর্ডের বক্তব্য অনুযায়ী আগে পাঠ্যক্রমে ছিল, পরে পরিবর্তন করা হয়েছে।' কোন আইনের আওতায় কিভাবে তা পরিবর্তন করা হয়েছে জানতে চেয়ে তিনি বলেন, 'কোন আইন ফেস না করলে এই পরিবর্তনটাই অবৈধ হয়েছে। তাহলে কেন এই ছাত্রীদের পরীক্ষা দিতে দেয়া হবে না।' এটর্নি জেনারেল বলেন, 'কারিকুলাম রেগুলেশনে [illegible] সময়ে সময়ে পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করতে পারে এবং সে অনুযায়ী করা

www.pathagar.com

হয়েছে।' খন্দকার মাহবুব সংশ্লিষ্ট আইন থেকে উদ্ধৃত করে দেখান যে, 'কোন ত্রুটি হয়ে গেলে চেয়ারম্যান তা সংশোধন করতে পারেন। বিধানেই তাকে সে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।' বোর্ডের চেয়ারম্যান এই নির্দেশের পর মাত্র কয়েক ঘন্টায় পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে কিভাবে কি করেছেন জানতে চাওয়ায় দৈনিক যুগান্তরকে বলেন, 'হাইকোর্টের নির্দেশ পালন করা হবে।' এর আগে নিজেরা কেন করেননি জানতে চাওয়ায় তিনি বলেন, 'আইনের বাধা ছিল বলেই ব্যবস্থা নিতে পারিনি।' আদালতে উপস্থিত ছাত্রীরা আনন্দে অশ্রুসিক্ত হয়ে বলে, 'পরীক্ষা কি দেব জানিনা। তবে পরীক্ষা দেয়ার অধিকার পেয়ে খুশি হয়েছি। আর কোন ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে যেন ভবিষ্যতে এমন আচরণ করা না হয় এটাই আমাদের চাওয়া।'

এইচএসসি পরীক্ষার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে চট্টগ্রামের বিভিন্ন কলেজের পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা অবৈধ চাঁদা আদায় করার অভিযোগ ২৫ এপ্রিল দৈনিক জনকণ্ঠ প্রকাশ করেছে। ২৭ এপ্রিল থেকে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষার্থীদের মূল প্রবেশপত্র আটকে রেখে কলেজ ছাত্র সংসদ ও ছাত্রসংগঠনের নামে জোরপূর্বক এ টাকা আদায় করা হয়। টাকা প্রদানে অনিচ্ছুক পরীক্ষার্থীরা প্রতিদিন ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের হাতে নাজেহাল ও লাঞ্ছিত হয়। এমনকি প্রবেশপত্র ছিঁড়ে ফেলার মতো ঘটনাও ঘটে। ২২ এপ্রিল থেকে পরীক্ষার্থীদের মাঝে প্রবেশপত্র বিতরণ শুরু হয়েছিল। চট্টগ্রামের হাতেগোনা কয়েকটি সরকারি-বেসরকারি কলেজ ছাড়া অন্য সব কলেজেই পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক ১০০ থেকে ৩০০ টাকার এ অবৈধ চাঁদা আদায় করা হয়। বোর্ডের নির্ধারিত ফি পরিশোধ করে ফরম পূরণের পরও পরীক্ষার্থীরা প্রবেশপত্র বাবদ মোটা অংকের টাকা দিতে বাধ্য হয়। ক্ষেত্র বিশেষে কিছু ছাত্র-ছাত্রী এ অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করলে তাদের কপালে জুটেছে চড়-থাপ্পর ও অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ। কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করেও কোন ফায়দা হয়নি। ওমরগনি এম ই এস কলেজ, সিটি কলেজ, কমার্স কলেজ, ইসলামিয়া ডিগ্রী কলেজ, পাহাড়তলী কলেজ, মোস্তফা হাকিম ডিগ্রী কলেজ, নাজিরহাট কলেজ, হাটহাজারী কলেজ, রাউজান কলেজের নির্দিষ্ট কাউন্টারে বসে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা এ টাকা গ্রহণ করেছে।

২৯ এপ্রিল দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত হয় একটি চমক পদক প্রতিবেদন। প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষার উন্নয়ন বাদ দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রচার কাজে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করছে। ইতোমধ্যে 'শিক্ষাই শক্তি' শিরোনামে প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর ছবি সম্বলিত পোস্টার ছেপে বিতরণ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ। শিক্ষামন্ত্রীর ছবিযুক্ত পোষ্টার খুলনা বিভাগে এবং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর ছবিযুক্ত পোষ্টার রাজশাহী বিভাগে সরবরাহ করা হয়। শুধু তাই নয়, ১ লাখ ৩৪ হাজার টাকা ব্যয়ে ১০ হাজার বর্ষপঞ্জী ছাপানোর পর তাতে শিক্ষামন্ত্রীর ছবি ভালোভাবে মুদ্রিত না হওয়ায় তা জনগণের মধ্যে বিতরণ না করে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ইউনিটের ষ্টোর রুমে গুদামজাত করে রাখা হয়। ইতিপূর্বে কোন সরকারের আমলে এভাবে সরকারি সম্পদের অপচয় ও ক্ষমতার অপব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখা যায়নি। সরকারি অর্থে শিক্ষামন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিজেদের নাম প্রচারে আগ্রহী হলেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ইউনিটের সমস্যা সমাধানে মোটেই আগ্রহী নয়। প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে মার্চ পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৫০% বইও পৌঁছাতে পারেনি। সরকার মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত মাত্র ৪০ থেকে ৫০% বই সরবরাহ দিতে সক্ষম হয়। তৃতীয় শ্রেণীর বাংলা,

www.pathagar.com

বিজ্ঞান ও ধর্ম বই মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত কোন শিক্ষার্থীর হাতেই পৌঁছেনি। স্কুলগুলোতে মাত্র দুই মাস পর প্রথম সাময়িক পরীক্ষার (রুটিন) জন্য সময় নির্ধারিত থাকলেও ছাত্র-ছাত্রীরা কিভাবে সে পরীক্ষায় অংশ নেবে, তা নিয়ে শিক্ষক ও অভিভাবক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য নিয়োজিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের এ নিয়ে কোন উদ্বেগ ছিলনা। বিগত সরকারগুলোর আমলে প্রতি ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ উপজেলা শিক্ষা অফিসে বই পাঠিয়ে দিত, আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর থেকেই এই বই সরবরাহ নিয়ে একের পর এক সমস্যা চলতেই থাকে। বিএনপি সরকারের আমলেও পাঠ্যবই বিতরণ করা হত প্রতিবছর ১ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত শিক্ষা পক্ষ পালনের সময়। কিন্তু ১৯৯৭ সাল থেকে এই নিয়ম ভেঙ্গে পড়ে। শিক্ষা অফিসগুলোয় ফেব্রুয়ারি /মার্চ পর্যন্ত বই সরবরাহ নেয়ার জন্য লাইন দেয়া শুরু হয়। চলতি বছর সে রুটিনও রক্ষা করতে পারেনি সরকারের শিক্ষা বিভাগ। উপরন্তু শিক্ষকদের বেতন প্রদানের ক্ষেত্রেও চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। জানুয়ারি মাস থেকে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এপ্রিল পর্যন্ত কোন বেতন পাননি। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, 'শিক্ষকদের প্রতি মাসের বেতন প্রতি মাসে দেয়া হবে।' প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা সত্ত্বেও শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপের কারণে বেতন প্রদানে বিলম্ব ঘটে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে বর্ধিত হারে শিক্ষকদের বেতন নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বেতনশীট তৈরি করলেও শিক্ষামন্ত্রী তাতে দস্তখত করেননি। বরং তিনি পুরনো বেতন কাঠামো অনুযায়ী বেতনশীট প্রস্তুত করতে নির্দেশ দেন। বেসরকারি শিক্ষক সমিতি এ নিয়ে তীব্রভাবে প্রতিবাদ এবং বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। বেসরকারি শিক্ষক সমিতির সভাপতি শামছুল আলম বলেন, 'ছাত্রদের হাতে বই নেই, শিক্ষকদের পকেট শূন্য, চার মাস ধরে বেতন নেই। বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এমন সংকট অতীতে কখনো প্রত্যক্ষ করতে হয়নি'। সমিতির মহাসচিব আক্কাছ আলী এ প্রসঙ্গে অভিযোগ করেন, '১৯৯৬-এর নির্বাচনের আগে বেসরকারি প্রাইমারী স্কুলগুলো জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শিক্ষকদের তার দলের পক্ষে কাজ করিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষমতায় এসে তিনি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছেন না।'

www.pathagar.com

বিচার বিভাগ পৃথক করা হয়নি

বৃটিশরা সমস্ত বিশ্ব শাসন করে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করলেও তাদের দেশের বিচার ব্যবস্থাকে তারা প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রেখেছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রের সপ্তম অনুচ্ছেদে সার্বজনীনভাবে আইনের দৃষ্টিতে সমতার বিষয় উল্লেখ রয়েছে। সমতা বলতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে বুঝানো হয়েছে। এ ঘোষণা পুরাপুরি কার্যকর করতে হলে জাতিসংঘভুক্ত সকল সদস্য রাষ্ট্রে স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। জাতিসংঘভুক্ত রাষ্ট্র হওয়াও স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশ এ নিয়মাবলির মধ্যেই রয়েছে।

গণতান্ত্রিক রীতিনীতিতে কোনোদিনই বিচার বিভাগ আর প্রশাসনিক বিভাগ একই হাতে থাকে না। বিশ্বের যতগুলো দেশে গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়া বিরাজমান ততোগুলোতে প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগ পৃথক রয়েছে। গণতন্ত্রের বিকাশের পূর্বশর্ত হলো এ দুই বিভাগের পৃথক অবস্থান। বিচার বিভাগ আর প্রশাসনিক বিভাগ একই হাতে থাকে একমাত্র রাজতন্ত্রে, স্বৈরতন্ত্রে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রদানের দাবীটি অনেক দিনের। পাকিস্তান আমলে ১৯৫৪ সালের সংসদে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের একটি বিল পাস হয়েছিল। পাসকৃত বিলে উল্লেখ ছিল 'এই আইন যেদিন গেজেট আকারে প্রকাশিত হবে সেদিন থেকেই কার্যকর হবে'। কিন্তু গেজেট আকারে সেই আইন প্রকাশিত না হওয়ার কারণে তা কার্যকর হয়নি। বিএনপির শাসনামলে পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিরোধী দল আওয়ামী লীগের সালাউদ্দিন ইউসুফ বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে পৃথকীকরণের জন্য বিল এনেছিলেন। বিলটি বাছাই কমিটিতে প্রেরণের পর তা ফিরে আসার পূর্বেই পঞ্চম সংসদের আয়ু শেষ হয়ে যায়।

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ১০ মে ২১ দফা সম্বলিত যে ইশতেহার ঘোষণা করেছিলেন তার ৮ নম্বর দফার উপ-শিরোনাম ছিল বিচার বিভাগ। এতে বলা হয়, 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলনীতি অনুসারে বিচার বিভাগকে নির্বাহী থেকে পৃথক করা হবে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে'। শুধু নির্বাচনপূর্ব ইশতেহারেই নয়, ক্ষমতা গ্রহণের পর পর জনসভা, সেমিনারসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত একাধিক ভাষণে শেখ হাসিনা অনুরূপ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

দেশের বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণের প্রতিশ্রুতি আওয়ামী শাসনের ৫ বছরেও বাস্তবায়িত হয়নি। এ সংক্রান্ত একটি বিল জমা দেয়ার পরও তা সংসদে উত্থাপিত হয়নি, আদালত সংবিধানের সংশোধনী ছাড়াই বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে পৃথক করার বিষয়ে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিলেও সরকারের টনক নড়েনি।

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে 'প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের উপর সুপারিশ পেশের জন্য' একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার একটি মূলনীতি বাস্তবায়নের জন্য

www.pathagar.com

সংবিধানের মোট ৪টি অনুচ্ছেদ ৯৯, ১০৯, ১১২ ও ১১৬ সংশোধনের সুপারিশসহ একটি খসড়া বিল সংসদে উত্থাপনের জন্য পেশ করে। এছাড়া আইনজীবীদের মুখপাত্র হিসেবে সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনও সরকারের কাছে এ সংক্রান্ত পৃথক একটি প্রস্তাব পেশ করে।

তিনদিন ধরে বিচারপতি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ হাসান আমিন সমম্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ ৭ মে ১৯৯৭ এক ঐতিহাসিক রায়ে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে সুপ্রীম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সম্পূর্ণ ও কার্যকরভাবে পৃথক করতে সংবিধানের ৮, ২২, ১০৯, ১১৫, ১১৬ ও ১১৬ (ব) অনুচ্ছেদের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন। আদালত এই রায়ের কপি প্রধানমন্ত্রী এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেন। সিনিয়র আইনজীবি ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম আবেদনকারীদের পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেছিলেন। তাদেরকে সহায়তা করেন এডভোকেট ইদ্রিসুর রহমান, ব্যারিস্টার তানিয়া আমির ও এডভোকেট সাহজিয়া বেগম। সরকার পক্ষে এটর্নী জেনারেল ব্যারিস্টার কে এস নবী, অতিরিক্ত এটর্নী জেনারেল আবুল ওয়াদুদ ভূইয়া ও ডিএজি কায়সর উদ্দিন আহমদ আদালতে উপস্থিত ছিলেন। একটি পৃথক জুডিসিয়াল সার্ভিস গঠন, স্বতন্ত্র পে-কমিশন এবং সংবিধানে বর্ণিত বিচার বিভাগের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের নিম্ন আদালতে কর্মরত ৪৪১ জন বিচারক ১৯৯৫ সালের ১৯ নভেম্বর সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ একটি রীট মোকদ্দমা (রীট পিটিশন নং ২৪২৪/১৯৯৫) দায়ের করেন। রীট পিটিশনে তারা উল্লেখ করেন যে, তারা একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন বিচার বিভাগে কাজ করার জন্য বিচার বিভাগে যোগদান করেন। কিন্তু ১৯৮০ সালে সার্ভিসেস রি-অরগানাইজেশন অর্ডার নামক এক আদেশ বলে সরকার জুডিসিয়াল সার্ভিসকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের অন্যান্য ক্যাডারের মত একটি ক্যাডারে পরিণত করে। অথচ সংবিধানের ১১৫, ১১৬ ও ১৫২ অনুচ্ছেদের বর্ণনামতে জুডিসিয়াল সার্ভিস বা বিচারকার্যে কর্মরত বিচারকদের একটি আলাদা সার্ভিস হিসেবে পরিণত হওয়ার কথা। রীট পিটিশনে বিচারকরা আরো উল্লেখ করেন যে, তাদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এমনভাবে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে যে স্ব স্ব জেলার বন বিভাগ, পশু বিভাগ, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের চেয়ে বিচারকদের অবস্থান আরো নাজুক। এর ফলে বিচারকদের মান সম্মান ও তাদের স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এজন্য বিভিন্ন জেলায় কর্মরত বিচারকগণ তাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রাখার প্রার্থনা জানান। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত তার রায়ে ঘোষণা করেন যে, বিচার বিভাগের পৃথকীকরণকে কার্যকর করতে সংবিধানে কোনো সংশোধনীর প্রয়োজন হবে না। রায়ে আরো ঘোষণা করা হয়, সহকারী জজ থেকে জেলা জজ পর্যন্ত কাউকে তাদের চাকরির শর্ত হিসেবে কোনো ক্ষোভ বা প্রতিকারের জন্য আর প্রশাসনিক ট্রাইবুনালের কাছে যাবার দরকার নেই। কারণ আদালত কোনো ট্রাইবুনালের অধীনস্থ নয়। এছাড়া বিচারকার্যে নিযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটরা সংবিধানের ১১৫, ১১৬ ও ১১৬ (ক) অনুচ্ছেদ মোতাবেক পরিচালিত হবেন। আদালত তার দীর্ঘ রায়ে ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (রি-অরগনাইজেন) অর্ডার ১৯৮০-এর ২ (এক্স) বিসিএস (বিচার ক্যাডার) সংবিধান পরিপন্থী। রায়ে আরো বলা হয়েছে, সহকারী জজ ও সিনিয়র সহকারী জজরা যথাযথ বিধি প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত বর্তমানে যে বেতনভাতা পাচ্ছেন তাই তারা পাবেন।

www.pathagar.com

প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করার প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ প্রকাশ্যে কয়েকবারই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু কাজ হয়নি। ২১ মার্চ ১৯৯৮ সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির রজতজয়ন্তী উৎসবে প্রেসিডেন্ট উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'বিচার ব্যবস্থা জনগণের আস্থা হারালে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে'।

এ ব্যাপারে উচ্চ আদালতের মাননীয় বিচারপতিরাও সময়ে সময়ে জোর গুরুত্বারোপ করে এসেছেন। ৩ জুন ১৯৯৮ প্রধান বিচারপতি মোস্তাফা কামাল তার দায়িত্বভার গ্রহণের সময় সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে খোলামেলাভাবেই বলেন, 'শাসন বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ বিলম্ব না করে বাস্তবায়ন করা উচিত'।

২৩ জুন আওয়ামী লীগ সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা দানের ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশ করে দৈনিক সংবাদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'হাইকোর্ট থেকে এক রায়ে বলা হল, বিচার বিভাগ পৃথক করার ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের কোন প্রয়োজন নেই। এখন হাইকোর্ট ঠিক করুক কিভাবে সেটি করা হবে'।

৭ ডিসেম্বর দুপুরে প্রেসিডেন্ট যশোর জেলা আইনজীবী সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময় শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করতে আইনজীবী সমিতিগুলোকে জনমত সৃষ্টির আহবান জানিয়ে বলেছিলেন, 'যারা বিরোধী দলে থাকেন তারা দুইয়ের পৃথকীকরণের দাবিতে সোচ্চার হন। কিন্তু ক্ষমতায় এলেই দাবীর কথা ভুলে যান আবার'। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আইনজীবী ও বিচার বিভাগের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, 'রাজনীতিকদের ওপর সবসময় ভরসা করা ঠিক হবে না। সংবিধানের ১১৬ নং ধারা সংশোধনের মাধ্যমে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণে দরকার ২২২ জন সংসদ সদস্যের সমর্থন। আইনজীবী সমিতিগুলো যদি একযোগে সরকার ও বিরোধী দলের ওপর চাপ প্রয়োগ করে তাহলে সংবিধানে সংশোধনে এ বিল আনা ও পাস করা সম্ভব। সুপ্রীম কোর্টের হাতে গোটা বিচার ব্যবস্থাকে ন্যস্ত করা দরকার'।

৮ জুন ১৯৯৯ বিকেলে বার কাউন্সিল মিলনায়তনে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম আয়োজিত 'আইনের শাসন, বিচার, বিভাগের স্বাধীনতা ও মানবাধিকার'-শীর্ষক এক সেমিনারে বিএনপি চেয়ারপারসন ও প্রধান বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, 'বিচার বিভাগের স্বাধীনতা শীর্ষক বিল সংসদে আনা হলে আমরা সমর্থন দেবো'। তিনি উল্লেখ করেন, 'পঞ্চম সংসদে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিল তোলা হয়েছিল। সে বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চূড়ান্তও করা হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন বিরোধী দল সংসদ থেকে পদত্যাগ করায় সে বিল পাস করা সম্ভব হয়নি'।

২৩ জুন সরকারের নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের জন্য সংবিধান সংশোধন করার প্রয়োজন নেই-এ মর্মে হাইকোর্ট বিভাগের রায় দেয়ার পর তার বিরুদ্ধে আপীল করার জন্য সুপ্রীমকোর্ট সরকারকে অনুমতি দেন। এর্টনী জেনারেল রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করার জন্য অনুমতি চেয়ে আবেদন করার প্রেক্ষিতে এ অনুমতি দেওয়া হয়। এর্টনী জেনারেল সরকারের পক্ষে আর্জি পেশ করে বলেন, 'বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের জন্য সংবিধান অনুসারেই সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সর্মথনের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। এক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন না করার অর্থাই হলো সংবিধান লংঘন করা'। অপর দিকে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম ও ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ হাইকোর্ট বিভাগের রায়কে সর্মথন করেন এবং সংবিধানের ১০৯, ১১৫ ও ১১৬ নং ধারার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,'

www.pathagar.com

বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের জন্য সংবিধান সংশোধন করার প্রয়োজন নেই। তদুপরি বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের জন্য যে সংবিধানিক নির্দেশনা রয়েছে, তার বাস্তবায়নে বিলম্ব করাই সংবিধান লংঘনের শামিল বলে গণ্য হওয়া উচিত'।

ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের যে ঢাক বাজাচ্ছিল-এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়েরের ফলে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ওয়াদা অনুযায়ী বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে পৃথক করার বিষয়ে তাদের আন্তরিকতা ছিলনা, তারা আসলে চায় না বিচার বিভাগ স্বাধীন হোক, আসল কথা ওয়াদাটি সময় উপযোগী সংলাপ ছিল তা প্রমাণিত হয়। রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়েরের মাধ্যমে দীর্ঘসূত্রীতা সৃষ্টি করে তারা।

বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন সি হোলজম্যান মানবাধিকার ঘোষণার ৫০ বছর পূর্তি স্মরণে আমেরিকান চেম্বার অব কর্মাস বাংলাদেশ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্যদানে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'সরকারি স্বচ্ছতা হতে দলীয় স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাধীন বিচার বিভাগ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম'। আদালত সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এখানে আদালতে বছরের পর বছর মামলা ঝুলে রয়েছে। এর সংখ্যা ২ লাখেরও বেশি হবে'।

২৩ অক্টোবর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং বিচারকদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে ব্রিটিশ কাউন্সিল মিলনায়তনে বাংলাদেশ আইন সমিতির আবু মুহাম্মদ মুরতাইশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে আইন কমিশন সদস্য বিচারপতি নইম উদ্দিন আহমেদ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সুপ্রীম কোর্ট আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠতম বিচারপতি মোহাম্মদ লতিফুর রহমান। আলোচনায় অংশ নেন সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, ঢাকা আইনজীবী সমিতির সভাপতি আব্দুর রেজাক খান ও দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার সম্পাদক মতিউর রহমান। স্বাগত ভাষণ দেন সমিতির সম্পাদক মোঃ শাহজাহান এবং সেমিনার পরিচালনা করেন সমিতির কর্মকর্তা আনিসুর রহমান।

সেমিনারে বিচারকদের জবাবদিহিতা, রাষ্ট্রীয় নির্বাহী বিভাগের সঙ্গে বিচার বিভাগের সংঘাত সৃষ্টিতে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে বক্তারা মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। প্রবন্ধকার বিচারপতি নইম উদ্দিন আহমেদ বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে বলেন, এ দেশে প্রকাশ্য আদালতে সকল বিষয়ের শুনানি ও নিস্পত্তি হয়। একজন বিচারকের কাজের কোনে কিছু গুপ্ত বা গোপনীয় নয়। একজন বিচারকের কাজ সকল দিক থেকেই স্বচ্ছ ও জনদৃষ্টিতে উম্মোচিত এবং এই স্বচ্ছতাই জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। একজন বিচারক তার সিদ্ধান্তের জন্য তার নিজের বিবেক, শপথ এবং আপিল আদালত ব্যতীত অন্য কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। বিচারক তাঁর বিচারিক সিদ্ধান্তের জন্য রাষ্ট্রের অন্যান্য নির্বাহীর মত জনগণ, সংবাদ মাধ্যম বা অন্য কারও নিকট দায়বদ্ধ নন। বিচারকগণ যদি আইনের পরিবর্তে জনমত অনুসারে মামলার সিদ্ধান্ত নেন তবে আইনের শাসনের অস্তিত্ব এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলে কিছু থাকবেনা। রাষ্ট্রের আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ এই তিনটি অংশ হলো একটি একক সাংগীতিক স্বরলিপির তিনটি বাদ্যযন্ত্র এবং তাদের অবশ্যই একে অন্যের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হয়। কিন্তু এই তিনটি অংশ যদি তাদের সংবিধানে নির্ধারিত ভূমিকা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে সংঘাতপূর্ণ সুরধ্বনি সৃষ্টি করে তাহলে সঙ্গীতের সুর-মূর্ছনার সৃষ্টি হবে না, কেবলমাত্র বিশৃঙ্খলা ও শব্দ দূষণের কারণ ঘটবে।

www.pathagar.com

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় বিচারপতি লতিফুর রহমান বলেন, স্বাধীনতা মানে দায়িত্বহীনতাকে বুঝায় না। বিচারকদের কোনো না কোনোভাবে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে। ভারতের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, জনগণের কাছে জবাবদিহিতা ছাড়া উচ্চ আদালতের সীমাহীন ক্ষমতা গণতন্ত্রের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। তিনি বলেন, সন্ত্রাস ও সহিংসতা, রাজনৈতিক বিবাদ এবং অত্যাধুনিক অস্ত্রসস্ত্র ব্যবহারের ফলে নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসার সময় এসেছে। সমাজের এ অবস্থায় বিচারকগণ চোখ বুঁজে থাকতে পারে না। তিনি আরো বলেন, কোনো মামলার ব্যাপারে আলামত বিনষ্ট করা হলে বা সাক্ষীরা নিরাপত্তার ভয়ে সাক্ষ্য না দিলে বিচারের কাজ জটিল হয়ে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে সহিংস গ্রুপগুলোর কাছে আইনের শাসন নিজেই জিম্মি হয়ে পড়ে।

আদালত ও বিচারপতিদের সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বিতর্কিত বক্তব্য এবং সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উত্তেজনাকর বক্তব্য সম্পর্কে মতিউর রহমান বলেন, নির্বাহী ও বিচার বিভাগের মধ্যে যে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল সেটা এখনো সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। যে কোনো সময় আবারো ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে। তিনি বলেন, বিশেষ ক্ষমতা আইনের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালত বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। বিএনপির চার নেতাকে হাইকোর্ট মুক্তি দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি সরকারকে এক লাখ টাকা করে জরিমানা করেছে। এছাড়া ঋণখেলাপীসহ বিভিন্ন ইস্যুতে উচ্চ আদালত বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার কারণে উচ্চ আদালতের মর্যাদা সমুন্নত হয়েছে। তিনি বলেন, সরকার চাইলে বিচার বিলম্বিত, প্রলম্বিত ও প্রভাবিত করতে পারে এবং সরকার সেটা করছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, সংবিধান সংশোধন ছাড়াই বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা যাবে। হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে সরকার আপিল এবং দীর্ঘদিন আপিল ঝুলিয়ে রেখে সরকার প্রমাণ করেছে তারা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা চায় না। যদিও তাদের নির্বাচনী ম্যানফেস্টোতে এই প্রতিশ্রুতি গুরুত্বসহকারে উল্লেখ ছিল।

আবদুর রেজাক খান বলেন, বিচার বিভাগ স্বাধীন হলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রশ্ন উঠবে না। কারণ এ দু'টি বিষয় স্বাধীনতার মধ্যেই নিহিত।

২ জানুয়ারি ২০০০ এটর্নী জেনারেল এবং সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতির দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিচার বিভাগের স্বাধীন মর্যাদা বাস্তবায়ন করার জন্য নতুন পর্যায়ে তাগিদ দেন নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান। তিনি বলেন, 'আইনের শাসন ছাড়া গণতন্ত্রের সফল চর্চা সম্ভব নয়। আবার স্বাধীন বিচার বিভাগ ছাড়া আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না'। তিনি আরো বলেন, 'আইনের শাসন ছাড়া গণতন্ত্র নিরর্থক এবং যে সমাজে আইনের শাসন নেই সেই সমাজকে সভ্য সমাজ বলা যায় না। আর সে কারণেই বলা হয়, আইনের শাসনের যেখানে শেষ, সেখান থেকেই সূচনা হয় স্বৈরশাসনের'।

www.pathagar.com

বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতা

আওয়ামী লীগের পাঁচ বছর শাসনামলে বিদ্যুৎ খাতের দৈন্যদশা একটুও ঘোচেনি। ১৯৯৬ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৯৯ সালের সর্বোচ্চ চাহিদার মৌসুমে (এপ্রিল-আগষ্ট) দেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি আগের দু'বছরের চেয়েও খারাপ ছিল। এজন্য মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগ এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি), পাওয়ার সেল, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। পরিকল্পনা মতো কাজ না হওয়া এবং কাজের চেয়ে কথা বেশি হওয়ায় বিদ্যুৎ খাতে উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি হয়নি। আওয়ামী লীগের সরকার পরিচালনার মাত্র ৯ মাস বয়সে অর্থ্যাৎ ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ, পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ডকে দিয়ে যৌথভাবে দৈনিক সংবাদপত্রগুলোতে 'কেন এত বিদ্যুৎ সংকট' শিরোনামে বিশাল বিশাল বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করে জনগণকে অনেক আশার বাণী শুনানো হয়। বিজ্ঞাপনে বলা হয়, 'প্রিয় দেশবাসী, এই দেশ আমার, আপনার, আমাদের সবার। দেশের সমস্যা ও সাফল্যে আপনিও সমান অংশীদার। তাই আপনাকে জানাতে চাই কেন এই বিদ্যুৎ সংকট। বিগত বছরগুলোতে ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি। যার ফলে আজ সারাদেশে লোডশেডিং হচ্ছে। এই সংকট মোকাবিলায় বর্তমান সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে। এপ্রিল মাসের মধ্যে ৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ আশুগঞ্জ-বাখরাবাদ গ্যাস পাইপ লাইনের কাজ সমাপ্ত হচ্ছে। এরফলে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গ্যাস চট্টগ্রাম অঞ্চলে সরবরাহ সম্ভব হবে এবং গ্যাস চালিত বন্ধ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো পুনরায় চালু হবে। ফলশ্রুতিতে মে মাসে বিদ্যুৎ উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। মনোহরদী-নরসিংদী এবং হোমনা-বাখরাবাদ এই দু'টি গ্যাস পাইপ লাইনের নির্মাণ কাজ দ্রুত সমাপ্তির পথে। কৈলাশটিলার একট নতুন কূপের গ্যাস শিগগিরই সরবরাহের আওতাভুক্ত হবে। ফলে গ্যাস চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এ বছরের (১৯৯৭ সালের) জুলাই মাসে রাউজানের নতুন দ্বিতীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালু এবং বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের পুর্নবাসন সমাপ্ত হলে শিগগিরই আরো অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হবে। এছাড়াও সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে ....এ সংকট কাটবেই।'

একই বছর মার্চ মাসের শেষ ভাগে জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত আরেকটি বিজ্ঞাপনে বলা হয়, 'গত ১৪ মার্চ শুক্রবার রাতে পাবনার মালিগাছার পূর্ব-পশ্চিম আন্তঃসংযোগ বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের ২৩০ কেভি ক্ষমতার ২টি টাওয়ার নাশকতামূলক কাজের ফলে ভেঙ্গে পড়ে। ফলে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা সমূহে বিদ্যুৎ সরবরাহ দারুণভাবে বিঘ্নিত হওয়ায় জনগণকে অশেষ দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এই নাশকতামূলক কাজের সাথে জড়িত দুস্কৃতকারীদের সঠিক তথ্যসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে ধরিয়ে দিতে পারলে তাকে/তাদেরকে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করবে।'

শেখ হাসিনা বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেন ১৯৯৮ সালের ২৯ মার্চ। বিদ্যুৎ খাতে যতোরকম বিশৃঙ্খলা ছিল প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের সময় তা কিছুটা

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণেই ছিল। কিন্তু জাতীয় গ্রীডে নতুন বিদ্যুৎ সরবরাহের সরকারি পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি ছিল হতাশাজনক। ১৯৯৬ সালে গৃহীত ৪টি মাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতিতে ছিল মন্থর গতি। পরিকল্পনা অনুযায়ী পরের বছর মার্চ-এপ্রিল মাসেই ৪টি বার্জ মাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদনে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত মাত্র ১টি ছাড়া অন্যগুলো স্থাপনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ছিল না বরং বিষয়গুলো নিয়ে, মন্ত্রণালয়, পিডিবি এবং পাওয়ার সেলের মধ্যে তীব্র সমন্বয়হীনতা, ক্ষেত্র বিশেষে রেষারেষি চলেছে। বিদ্যুত সেক্টরে বিরাজমান অব্যবস্থার সূত্র ধরেই প্রধানমন্ত্রী জেনারেল নূরউদ্দিন খানের উপর ব্যর্থতার বদনাম চাপিয়ে দিয়ে তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে নিজেই দায়িত্ব বুঝে নেন।

২ এপ্রিল ১৯৯৮ জাতীয় সংসদে নজিরবিহীনভাবে ১০ মিনিট বিদ্যুৎ ছিল না। অন্ধকারাচ্ছন্ন সংসদ কক্ষে মোমবাতি জ্বালিয়ে সরকারের এই ব্যর্থতার প্রতিবাদে প্রধান বিরোধীদল সংসদের বৈঠক থেকে প্রতীকী ওয়াক আউট করে। বিএনপি সদস্যরা বিদ্যুৎ ও জ্বালানী মন্ত্রী এবং তার সরকারের পদত্যাগের দাবী করেন। তারা বিদ্যুৎ না আসা পর্যন্ত সংসদের বৈঠক মূলতবী রাখার জন্য বারবার অনুরোধ করেন। বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও এই মন্ত্রণালয় থেকে অপসারিত দফতরবিহীন মন্ত্রী নূরউদ্দিন খান তখন সংসদে ছিলেন। সকাল ১১টা ৩৩ মিনিটে সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে হঠাৎ সংসদ ভবন থেকে বিদ্যুৎ চলে বিশালকায় এ ভবনটি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে জেনারেটরও চালু হয়নি। এ ধরনের ঘটনা সংসদে ইতিপূর্বে আর ঘটেনি। ১১টা ৪২ মিনিট পর্যন্ত সংসদ ছিল বিদ্যুৎ বিহীন। ১২টায় এয়ারকুলার সচল হয়। বিএনপির সদস্য ফজলুর রহমান পটল, শহীদুল ইসলাম ও রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু মোমবাতি নিয়ে আসেন অন্ধকার হাউজে। শামসুজ্জামান দুদু বলেন, এই ব্যর্থতার জন্যে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর পদত্যাগ চাই। লে. কর্ণেল আকবর হোসেন (অব.) বীর প্রতীক বলেন, এই ব্যর্থ সরকারের পদত্যাগ চাই। বিএনপি'র এম সাইফুর রহমান, ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন ও শেখ রাজ্জাক আলীসহ অনেক সদস্য তখন সংসদ কক্ষে ছিলেন। সংসদের বৈঠকে তখন সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি স্পীকার আব্দুল হামিদ। আওয়ামী লীগের শামীম ওসমান বলেন, বিরোধী দলের সদস্যরা আগে থেকেই জানতেন। এজন্যেই তারা মোমবাতি নিয়ে এসেছেন। জেনারেটর চালু না হওয়ায় তিনি বলেন, তারা ষড়যন্ত্র করছেন। আলমগীর মোঃ মাহফুজুল্লাহ ফরিদ মোমবাতি বিষয়ে সম্পূরক প্রশ্ন করতে চাইলে ডেপুটি স্পীকার তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, এটি সম্পূরকের বিষয় নয়। তিনি বলেন এখানে মোমবাতি লাগবে কেন? এম সাইফুর রহমান কিছু বলতে চাইলেও তাকে ফ্লোর দেয়া হয়নি। সকাল ১০টা ৫৫ মিনিটে সংসদের বৈঠক বসে। বিরোধী দলের উপনেতা প্রফেসর একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী লবিতে ব্রিফিংকালে বলেন, প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেয়ার পর লংকাকান্ড হচ্ছে। এ পরিস্থিতি অসহনীয়। বিদ্যুৎ নাটকে আমরা অতিষ্ঠ। তিনি বলেন, সরকার সবকিছুতেই সাবোটাজ দেখে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে আমরা সব সময় মোমবাতি রাখি। অন্ধকারে আত্মরক্ষার্থে আমরা মোমবাতি রাখি। তিনি বলেন, সংসদের সেবা শাখা আমাদেরকে মোমবাতি দিয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম সংসদে বিদ্যুৎ চলে গেছে। এই প্রতিবাদে আমরা প্রতীকী ওয়াক আউট করেছি। তিনি বিদ্যুৎ আসার পর পুনরায় সংসদের বৈঠক শুরু করার আহবান জানান।

বি.চৌধুরী বলেন, আমাদের পার্লামেন্টারিয়ান সাইফুর রহমানকে পর্যন্ত ফ্লোর দেয়া হয়নি। আওয়ামী লীগ সরকার এতদিন বিদ্যুতের লোডশেডিংয়ের জন্য বিএনপিকে দায়ী

www.pathagar.com

করতো। এই অভিযোগ যে অসত্য তা এখন প্রমাণিত হয়েছে। বিএনপি মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া বলেন, অন্ধকারে অনেকে সংসদে আসতে পারেনি। বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে অপসারণ করে সরকার ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়েছে।

১৭ এপ্রিল ১৯৯৯ বিকেলে পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের মুজিবনগর দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'কোন এলাকায় কতখানি লোডশেডিং করা হবে তা আগে থেকেই নির্ধারণ করা থাকে। কিন্তু কিছু এলাকায় এর ব্যতিক্রম ঘটছে। কৃত্রিম লোডশেডিং করা হচ্ছে। এর কারণ কি? কারা এসব কর্মকান্ডে জড়িত?' দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা করতালির মধ্যে ঘোষণা করেন যে 'কৃত্রিম লোডশেডিংয়ের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের চিহ্নিত করুন। তাদের ধরিয়ে দিন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

শেখ হাসিনা সরকার গঠনের পর থেকে ১৯৯৯ সালের আগষ্ট পর্যন্ত ছয় দফায় বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৯৬ সালের অক্টোবরে প্রথম দফায় আবাসিক খাতে ১ থেকে ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুতের দাম ১টাকা ৭৫ পয়সা, ৩০১ থেকে ৫০০ ইউনিট পর্যন্ত ২ টাকা ৯৫ পয়সা, ৫০১ থেকে ৭০০ ইউনিট পর্যন্ত ৩ টাকা ৫৫ পয়সা এবং ৭০০ ইউনিটের ওপরে ৪ টাকা ৯৫ পয়সা বৃদ্ধি করা হয়। একই বছরের ডিসেম্বরে বিভিন্ন ধাপ ঠিক রেখে আবার ৫ পয়সা দাম বাড়ানো হয়। এরপর ১৯৯৭ সালের মার্চে ৫ পয়সা, সেপ্টেম্বরে ৫ পয়সা, ১৯৯৮ সালের মার্চে ৫ পয়সা এবং ১৯৯৯ সালের জুলাইয়ে আরো ৫ পয়সা দাম বাড়ানো হয়। শিল্পখাতে ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের গড় মূল্য ছিল ২ টাকা ৭৫ পয়সা। ওই বছরে অক্টোবরে প্রতি ইউনিটের গড় মূল্য ২৫ পয়সা বেড়ে দাঁড়ায় ৩ টাকায়। একই বছরের ডিসেম্বরে ১৫ পয়সা দাম বাড়ে। এরপর ১৯৯৭ সালের মার্চে ৫ পয়সা, সেপ্টেম্বরে ৫ পয়সা এবং ১৯৯৮ এর মার্চে ৫ পয়সা বাড়ানো হয়। ১৯৯৭ সালের আগষ্টে আরো ৮ পয়সা দাম বাড়ানো হয়। বাণিজ্যিক খাতে ১৯৯৬ সালের অক্টোবরে প্রতি ইউনিটে গড় মূল্য ৪০ পয়সা বেড়ে দাঁড়ায় ৪ টাকা ১০ পয়সা। একই বছরের ডিসেম্বরে ২০ পয়সা, ১৯৯৭ সালের মার্চে ৫ পয়সা এবং ১৯৯৯ সালের জুলাইয়ে আরো ৮ পয়সা করে দাম বাড়ানো হয়। ১৯৯৬ সালের জুন মাসে আওয়ামী লীগের ক্ষমতাগ্রহণকালে প্রতিটি ইউনিট বিদ্যুতের দাম ছিল আবাসিক খাতে '১ টাকা ৬৫ পয়সা, শিল্পখাতে ২ টাকা ৭৫ পয়সা (গড়মূল্য) এবং বাণিজ্যিক খাতে ৩ টাকা ৭০ পয়সা (গড়মূল্য)। (সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো ২২ মার্চ ও ২১ আগষ্ট ১৯৯৯)

প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নেয়ার পর সারাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের কাজ সন্তোষজনক ছিলনা। সারাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণে যখন বিরাজ করছিল চরম অব্যবস্থা তখন বিদ্যুৎ ও জ্বালানী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ও আমলার দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। এ নিয়ে এ সময় সংবাদপত্রে বেশ লেখালেখি হয়েছে। দেশের অর্থনীতিতে সামগ্রিকভাবে বিদ্যুৎ অব্যবস্থাপনার একটি নেতিবাচক প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। এর মধ্যে বিদ্যুৎ জ্বালানী মন্ত্রণালয়ের স্থবিরতা শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থায় সৃষ্টি করে এক নাজুক পরিস্থিতির।

ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ সংকটের কারণে দেশের গার্মেন্টস শিল্পসহ উৎপাদনমুখী শিল্প কারখানার যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা ভঙ্গুর অর্থনীতির উপর আরেকটি বড় ধরনের আঘাত। বিদ্যুতের অভাবে ওয়াসা তাদের ক্ষমতার এক-তৃতীয়াংশ কম পানি সরবরাহ করতে পেরেছে, যার ফলে জনজীবনে যোগ হয়েছে এক দুর্বিসহ যন্ত্রণা। লোডশেডিংয়ের নামে দিনরাত

www.pathagar.com

নির্বিশেষে ঘন্টার পর ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহে বেহাল অবস্থার কারণে ঢাকাসহ গোটা দেশের জনসাধারণ যখন অতীষ্ঠ হয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে তখন কয়েকবার জাতীয় গ্রীডে বিপর্যয় ঘটেছে। জরাজীর্ণ সাব ষ্টেশন ও ত্রুটিপূর্ণ সঞ্চালন লাইনের কারণেও প্রায়ই লাইন ট্রিপ করে বিদ্যুৎ বিপর্যয় দেখা দেয় অহরহ। প্রধানমন্ত্রী নাশকতা থিওরীর কাহিনী সুপার ফ্লপ হওয়ায় এ ধরনের বিপর্যয়কে অবশ্য কোন নামে সম্বোধন করেননি।

১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে খুলনাসহ দেশের পশ্চিমাঞ্চলের ২১ ও উত্তরাঞ্চলের ১৬ টি জেলাসহ গোটা দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। চৈত্রের প্রচন্ড দাবদাহ, দীর্ঘ খরা এবং সীমাহীন লোডশেডিংয়ে একদিকে জনজীবন বিপর্যস্ত অন্যদিকে সেচ সংকটে ফসলের মাঠ পুড়েছে। বিদ্যুতের অব্যাহত লোডশেডিংয়ের কারণে দেশব্যাপী গভীর-অগভীর নলকূপে পানি উত্তোলন সম্ভব হয়নি। সেচের অভাবে ইরি-বোরো ফসল প্রচন্ড খরায় পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঐ সময় উত্তরাঞ্চলের ১৬ টি জেলায় প্রতিদিন ২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা থাকলেও মাত্র ১০ মেগাওয়াট সরবরাহ করা হয় যা প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র ৩৪ ভাগ। অন্যদিকে গ্যাস, টারবাইন চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকেও প্রায়াজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। ভয়াবহ লোডশেডিং ও খরা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতির কারণে উত্তরাঞ্চলের ১০ লাখ হেক্টর জমির ইরো-বোরোর ফসল অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। গঙ্গা চুক্তির সামান্যতম পানি না আসায় ছোট-ছোট নদী-নালা-খাল-বিল ছিল পানি শূন্য। বিদ্যুতের ঘন ঘন লোডশেডিং-এ সেচ যন্ত্রগুলোও অচল হয়ে পড়ে। ইরি-বোরোর ভরা মৌসুমে পানিবিহীন জমিতে সেচ দিতে না পারায় মাটি ফেলে চৌচির হয়ে যায়। অনেক স্থানে রোদে পুড়ে যায় ধান গাছ। বাম্পার ফলন উৎপাদনের অন্যতম স্থান চলনবিল এবং বরেন্দ্র অঞ্চলসহ উত্তরের সর্বত্রই এ অবস্থা বিরাজ করে। চলনবিল এলাকায় বিদ্যুৎ চাহিদা ১৮ থেকে ১৯ মেগাওয়াট ছিল। কিন্তু ন্যাশনাল গ্রীড থেকে সেখানে সরবরাহ করা হয় মাত্র ৭ থেকে ৮ মেগাওয়াট। যা চাহিদার তুলনায় নগন্য। রাজশাহী, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জের বরেন্দ্র এলাকাসহ নওগাঁ জেলা সাপাহার, আয়হার, পাতারি, ধনপুতি, খঞ্জনপুর ও বশিপুরে কম বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। গোয়ালপাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৬ টি মধ্যে ৫ টি ইউনিট দীর্ঘদিন ধরে অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে মাত্র ৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়নি। ফলে দু'লাখ হেক্টর জমির ধান সেচের অভাবে শুকিয়ে যায়। দীর্ঘ খরা ও অনাবৃষ্টির কারণে মাঠ-ঘাট, বিল-ঝিল শুকিয়ে কাঠ হওয়ায় এবং পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় খুলনায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার অগভীর নলকূপে পানি উঠেনি। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার রবিশস্যসহ বিভিন্ন ফসলের চাষ করা সম্ভব হয়নি। পানি বা সেচের অভাবে খুলনার ৩ লাখ হেক্টর জমিতে আউশ বা পাট বীজ বোনাও সম্ভব হয়নি। ফরিদপুর থেকে বরিশাল হয়ে সাগরপাড়ায়-পটুয়াখালী-বরগুনা পর্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলের ১১টি জেলায় ১৯৯৯ সালের প্রথম চার মাসে বৃষ্টি না হওয়ার পরও কৃষকরা ইরি-বোরো আবাদে ব্যাংক ঋণ ছাড়াও বিভিন্ন মহাজনের কাছ থেকে টাকার ধার নিয়ে পুরোদমে কাজ শুরু করে। কিন্তু দীর্ঘ খরা পরিস্থিতির কারণে বপণকৃত ধান নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়। বিদ্যুতের অভাবে ভূ-গর্ভ থেকে পানি উত্তোলন বাধাগ্রস্ত হয়। ভূ-গর্ভে পানির স্তর আশংকাজনকভাবে নিচে নেমে যায়। ভয়াবহ বিদ্যুৎ সংকটের ফলে দক্ষিণাঞ্চলের ২১টি জেলায় রাত ১১টার পর সেচ পাম্প চালানোর জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ কৃষকদের পরামর্শ দিলেও গভীর রাতে লোডশেডিং অব্যাহত থাকে।

www.pathagar.com

ঢাকায় এক মাসের কম সময়ের মধ্যে দুইবার বিদ্যুৎ সরবরাহে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে। ৮ মার্চ ১৯৯৯ সিদ্ধিরগঞ্জে জাতীয় গ্রীডের ২টি সার্কিট ব্রেকার জ্বলে গেলে রাজধানীবাসী প্রায় সপ্তাহ জুড়ে বিদ্যুৎ ও পানির অসহনীয় কষ্টে পতিত হয়। ঐ বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে বজ্রাঘাতকে দায়ী করা হলেও মাত্র ২৬ দিনের মাথায় ৪ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় একই ধরনের বিপর্যয়ে ঢাকায় সিংহভাগ এলাকা আলো-বাতাসহীন দুঃসহ অবস্থায় পতিত হয়। ঝড়ো হাওয়ায় দেশের বিদ্যুৎ সঞ্চালনের হৃৎপিন্ড হিসেবে পরিচিত সিদ্ধিরগঞ্জে ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের একটি তার ছিঁড়ে এই বিপর্যয় ঘটে। ফলে ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিকল্প ব্যবস্থায় টঙ্গী থেকে সীমিত বিদুৎ এনে রাজধানীর বঙ্গভবন, বিশেষ বিশেষ এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে বন্টন করে দেয়া হলেও প্রায় সকল এলাকা ঘন্টার পর ঘন্টা বিদ্যুতহীন থাকে। রাতে পুরনো ঢাকার প্রায় সম্পূর্ণ এলাকা এবং গোটা নগরীর অধিকাংশ এলাকা অন্ধকারে ডুবে ছিল। প্রচন্ড গরমে আলো-বাতাসহীন নগর জীবনে নেমে আসে অবর্ণনীয় দুর্দশা। বিশেষ করে মাত্র একদিন পর ৬ মে অনুষ্ঠেয় এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্ভোগ ছিল বর্ণনাতীত। অসহ্য গরমে ছটফট করে পরীক্ষার্থীসহ দুর্ভাগা নগরবাসী। বিকেলে ঢাকায় আর্ন্তজাতিক সংস্থা সিরডাপের সদর দফতরে এক গোলটেবিল আলোচনায় অংশ নিতে গিয়ে বেশ কয়েকজন বিদেশী রাষ্ট্রদূত, সংসদ সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের কবলে পড়েন। বেলা পৌণে ৫টা থেকে এক ঘন্টার বেশি সময় বিদ্যুৎ না থাকায় প্রচন্ড গরমে তারা অতীষ্ঠ হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে কয়েকজন কূটনীতিক অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন। এ বৈঠকে সরকার ও বিরোধী দলের ৭ জন এমপি এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ ও কানাডার হাইকমিশনার, জার্মানীর রাষ্ট্রদূত, ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি, নেদারল্যান্ড দূতাবাস, ইউএসএইউ মিশন ও ইউসিসের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বিদ্যুৎ বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ সংকটের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়ী করেন। বৈঠকে তিনি বলেন, 'বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কোনো ত্রুটি ছিল না, এখনো নেই। কিন্তু লাল ফিতার দৌরাত্ম্য এক্ষেত্রে এগুতে দেয়নি।' ১১ এপ্রিল দেশের অব্যাহত বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের ফলে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানের সংঘটিত হয় গণবিক্ষোভ। রাজধানীর যাত্রাবাড়ি, সায়েদাবাদ এলাকায় হাজার হাজার নারী-পুরুষ-শিশু কলস-হাড়ি-পাতিল নিয়ে রাস্তা অবরোধ করে রাখে। ফলে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বিদ্যুতের দাবীতে বিক্ষুব্ধ জনতা ইংলিশ রোডস্থ ডেসা অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয়। বিক্ষোভকারীরা কয়েকটি যানবাহনের ক্ষতি সাধন করে। তারা ট্রেন পর্যন্ত আটকে রাখে। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপরে গুলিও চালায়। আহত হন অনেক।

অব্যাহত বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী অনেক কথা বলেছেন। প্রকৃত সত্যকে আড়াল করেছেন। কিন্তু ১৯৯১-১৯৯৬ সাল সময়ের বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেছেন আসলে সরকারের উদ্দেশ্যটা কি? ৩০ মে ১৯৯৯ দৈনিক ইনকিলাবের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'এই সরকার ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানী করে তাদের আরও বেশি আস্থাভাজন হতে চেয়েছিল, কিন্তু ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানী যে সম্ভব নয়-অন্তত তাতে এ সরকারের কোন লাভ নেই তা বুঝতে প্রায় ৩ বছর সময় লেগেছে। আর এ ভুলের খেসরাত হিসেবে দেশের মানুষকে বছরের পর বছর লোডশেডিং এর দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে।' বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে এই বিপর্যয় ও জনগণের এই দুর্ভোগের কারণ কি বলে মনে করেন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদার

www.pathagar.com

প্রতি লক্ষ্য রেখে বিএনপি সরকারের আমলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল এবং যেসব প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল তর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখলে আজকে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে এই বিপর্যয় নেমে আসতো না। ১০৯ মেগাওয়াটের সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এবং ময়মনসিংহের আরপিসি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ শুরু হয় ১৯৯৫ সালের জুন মাসে এবং ১০৯ মেগাওয়াটের হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে শুরু হয়। বিএনপি আমলে শুরু হওয়া এসব কাজ চলছে অত্যন্ত ধীরলয়ে। যদি সরকার দ্রুত এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে আগ্রহী হত তাহলে বিদ্যুৎ এর অভাবে জনগণের এই দুর্ভোগ হত না। তাছাড়া আমাদের সরকারের আমলে ৩০০ মেগাওয়াট উৎপাদান শক্তিসম্পন্ন বড়পুকুরিয়া কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ৪৫০ মেগাওয়াট উৎপাদন শক্তিসম্পন্ন মেঘনাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ২১০ মেগাওয়াটের উৎপাদন শক্তিসম্পন্ন খুলনা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ৬০ মেগাওয়াট উৎপাদন শক্তিসম্পন্ন শাহজিবাজার গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য একনেকসহ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন স্তরে অনুমোদন পায়। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার প্রায় ৩ বছর গত হলেও তারা কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এডভাইজার নিয়োগের প্রক্রিয়াও এখনও শেষ করেনি। তাদের এই ব্যর্থতা ও সিদ্ধান্তহীনতার ফলে সাধারণ মানুষ দুঃসহ গরমে কষ্ট পাচ্ছে। কলকারখানার উৎপাদনে ধস নেমেছে। এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রী একবার বলেছেন মাত্র ১৫% মানুষ বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন, এ নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। এ কথায় জনগণের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখে তারা দমে গিয়ে কতগুলো মিথ্যা তথ্য জাতির সামনে তুলে ধরে বিএনপির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে পার পেতে চাইছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তের রাজনীতির মাঠে দাঁড়িয়ে দেশের মানুষকে এ বোকা ভাবা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।'

আওয়ামী লীগের শাসনামলের শেষ কয়েকদিন বিদ্যুৎ বিপর্যয় চরমে পৌঁছেছে। ৫ জুন ২০০১ সকাল ৯ টা থেকে পরেরদিন সকাল ৯টা পর্যন্ত বিদ্যুতের অভাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং নার্সিং ইনস্টিটিউটে টর্চলাইট এবং মোমবাতি জ্বালিয়ে সিজারিয়ানের মাধ্যমে তিনটি বাচ্চার প্রসব এবং জেনারেটর চালিয়ে ছয়টি জরুরী অপারেশন করা হয়। এছাড়া, বিদ্যুৎ না থাকায় গোটা এলাকায় অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। জরুরী বিভাগের অনেক রোগীকে অন্যান্য হাসপাতাল ও ক্লিনিকে স্থানান্তর করা হয়। বিদ্যুতের অভাবে পানি সরবরাহ বন্ধ থাকায় পুরো এলাকায় হাহাকার সৃষ্টি হয়। রোগীদের জন্য বাইরে থেকে কিনে আনতে হয় পানি। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বৈদ্যুতিক সাব স্টেশনের ট্রান্সফরমারটি বিস্ফোরণ ঘটে অকেজো হয়ে যাওয়ায় ঐ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে। বিদ্যুতের অভাবে জরুরী বিভাগ, ক্যাজুয়ালটি বিভাগ এবং গাইনী বিভাগসহ হাসপাতালের সকল বিভাগের চিকিৎসা ব্যবস্থা কার্যত অচল হয়ে পড়ে। জরুরী বিভাগের অনেক রোগীকে মিটফোর্ড ও সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে প্রেরণ করা হয়। বেলা ১১টার দিকে জেনারেটর চালিয়ে জরুরী বিভাগের ছয়টি অপারেশন করা হয়। জেনারেল বিভাগে প্রতিদিন ১৫/১৬ টি অপারেশন হলেও বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকায় এই অপারেশনগুলো হয়নি। হাসপাতালের লাইনটি ত্বরিৎগতিতে মেরামত করতে উদ্যোগী হয়নি আওয়ামী সরকার।

৮ জুন শেরেবাংলা নগরের এনইসি সভাকক্ষে আয়োজিত বাজেট উত্তর সাংবাদিক সম্মেলনে হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হন অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া, শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, পানিসম্পদমন্ত্রী আবদুর

www.pathagar.com

রাজ্জাক, বাণিজ্যমন্ত্রী আবদুল জলিল, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর ও তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ। অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যের পর বেলা ১০টা ৪০ মিনিটে শিল্পমন্ত্রী যখন সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিবরণ দিচ্ছিলেন তখন সেখানে প্রথম দফা বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে। দ্বিতীয়বার বিদ্যুৎ চলে যায় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রীর বক্তৃতা করার সময়। আলোকিত সভাকক্ষে হঠাৎ অন্ধকার নেমে এলে কয়েকজন সাংবাদিক উচ্চস্বরে টিপ্পনী কাটেন, 'পাঁচ বছরের উন্নয়ন, অন্ধকারে সাংবাদিক সম্মেলন' এবং 'পাওয়ার ছাড়াও আগেই পাওয়ার চলে গেল।' কিন্তু বক্তা তোফায়েল আহমেদ অন্ধকারেই মাইক ছাড়া বক্তব্য অব্যাহত রাখেন। প্রসঙ্গ পাল্টে মন্তব্যের রেশ ধরে তিনি বলেন, 'পাওয়ার সেক্টরে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমরা রেকর্ড সৃষ্টি করেছি। এখন মোট চাহিদার বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। কিন্তু সঞ্চালন লাইনের কারণে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ঠিকমতো পৌঁছানো যাচ্ছে না।' মিনিট দুই বাদে জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়। বেলা ১২টা ১৬ মিনিটে দ্বিতীয় দফা বিদ্যুৎ চলে গেলে শিল্পমন্ত্রী এর পেছনে কোন দুরভিসন্ধি কাজ করছে কিনা সে ইঙ্গিত করে বলেন, 'সংসদে একবার বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিএনপির সংসদ সদস্যরা সবাই মোমবাতি জ্বালিয়ে সংসদ কক্ষে হাজির হয়েছিলেন। তারা কিভাবে আগাম জানতেন সংসদে পাওয়ার ফেল করবে, আর তাই আগে থেকেই মোমবাতি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলার জন্য বিদ্যুৎ নিয়ে এই ৫ বছরে অনেক কিছু হয়েছে। ঘরে ঘরে আওয়ামী লীগ, বিএনপি। কাকে কি বলা যায়। সেখানে দলীয় মানসিকতার প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা উচিত নয়।' অর্থমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে তার একটি অভিজ্ঞতা সাংবাদিকদের কাছে বিবৃত করেন। অর্থমন্ত্রী হিসেবে প্রথম চট্টগ্রাম সফরের সময় সেদিন তিনি দিবারাত্রি পূর্বনির্ধারিত ৫টি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রতিটি অনুষ্ঠানেই তার উপস্থিতির ১০ মিনিটের সময় বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটেছিল।

www.pathagar.com

দুর্নীতি দমন ব্যুরোর স্বাধীনতা দেয়া হয়নি

শেখ হাসিনা অঙ্গীকার করেছিলেন যে, দুর্নীতি দমন ব্যুরো সরকারের বাইরে থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করবে। কিন্তু দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে দিয়ে একই অভিযোগে পছন্দের লোকদের বাদ দিয়ে আওয়ামী সরকার বিভিন্ন মামলা দায়ের শুরু করে। ১৯৯৮ সালের মধ্যভাগে প্রধানমন্ত্রীর অধীনে আনা দুর্নীতি দমন ব্যুরো সরকার প্রধান ও তার ঘনিষ্ঠজনদের ইচ্ছা অনুযায়ী মামলা সাজায়। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ইসলাম উদ্দিন মালিক এবং খাদ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (অতিরিক্ত ও ভারপ্রাপ্তের দায়িত্ব পালনকারী) একেএম নূরুল আফসারকে খাদ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত একটি মামলায় আসামী না করে সাক্ষী করা হয়। আর কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই যে দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে দিয়ে মামলা করানো হয় এবং অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন এর জ্বলন্ত প্রমাণ হলো প্রধানমন্ত্রীকে লেখা মামলার সাক্ষী মালিকের এক চিঠি। খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন ঠিকাদারের দাবী নিষ্পত্তি সংক্রান্ত এ মামলা সম্পর্কে মামলার সাক্ষী আই,ও মালিকের ৯ আগষ্ট প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে বলা হয়, 'আপনি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ভুল তথ্য দিয়ে ও সত্য গোপন করে আপনার হাত দিয়ে বেআইনী কাজ করিয়ে নেয়া হচ্ছে। এই মামলা তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এর ফলে আপনার সরকারের ভাবমূর্তিই কেবল ক্ষুণ্ন হচ্ছে না; সরকারি অর্থের অপচয় হবে এবং প্রশাসনে এর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।' মামলাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে, খাদ্য অধিদপ্তরের আওতায় মেসার্স এ ডাব্লিউ খান এন্ড কোং লি. চট্টগ্রাম সাইলোতে ষ্টিভিডোরিং এবং চট্টগ্রাম বন্দর ও সাইলোতে হ্যাচ লেবার ঠিকাদার হিসেবে ১৯৮১ থেকে ১৯৮৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নিয়োজিত ছিল। এই দীর্ঘ সময়ে বন্দর কর্তৃপক্ষের কয়েক দফা শ্রমিকদের মজুরির হার বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের উদ্দেশ্যে চুক্তিকৃত দর বৃদ্ধির জন্যে ঠিকাদার দাবী করেন। ১৯৯৪ সালে নথিপত্র ফিরে পাওয়ার পর চুক্তির সরকার পক্ষ অর্থাৎ চট্টগ্রামের আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক বিষয়টি পরীক্ষান্তে ঠিকাদারের সকল দাবির সাথে একমত না হয়ে কতিপয় আংশিক দাবি মেটানোর জন্যে সুপারিশ করে। অতঃপর খাদ্য অধিদপ্তর আঞ্চলিক অফিসের সুপারিশকৃত দর বৃদ্ধির হারকে হ্রাস করে একটি দর নিষ্পত্তির জন্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে দাখিল করে। দুর্নীতি দমন ব্যুরো উল্লেখিত মামলায় সাবেক খাদ্যমন্ত্রী লেঃ জেঃ মীর শওকত আলী (অবঃ), খাদ্য অধিদপ্তরের তৎকালীন মহাপরিচালক মেজর মমতাজ উদ্দিন আহমেদ (অবঃ), খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন যুগ্ম সচিব শাহ মোহাম্মদ নাজমুল আলম এবং উপ-সচিব (সরবরাহ) মোঃ আবদুল মান্নানকে আসামী করা হয়। আশ্চর্যজনকভাবে এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ মতামতদানকারী পোর্ট কন্ট্রোলার আরিফ মাহমুদ ও নাজমুল হুদাকেও মামলার আসামী থেকে বাদ দেয়া হয়। দুর্নীতি দমন ব্যুরো প্রশ্ন তুলে, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উল্লেখিত ফাইলটি কেন উপ-সচিব সূচনা করলেন। সংশ্লিষ্ট কমিটিতে সর্বনিম্ন কর্মকর্তা হচ্ছেন উপ-সচিব। এখানে সহকারী সচিব কি করে যুক্ত হবেন। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব এ প্রসঙ্গে বলেন, 'খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিযুক্ত ষ্টিভিডোর ও অন্য সকল ধরনের ঠিকাদারদের সঙ্গে খাদ্য বিভাগের সম্পর্কে

www.pathagar.com

একমাত্র চুক্তি আইনে নিয়ন্ত্রিত এবং আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত এক মডেল চুক্তির ফরম রয়েছে। চুক্তিপত্রে একটি শর্ত আছে যে, খাদ্য অধিদপ্তর ও ঠিকাদারের মধ্যে কোনরূপ বিবাদ বা মত পার্থক্য দেখা দিলে তা একমাত্র সালিশরূপে বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে প্রেরিত হবে এবং সচিবের সিদ্ধান্ত উভয়পক্ষের ওপর চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক হবে। একমাত্র সালিশিতে প্রেরণ না করে চুক্তি হতে উদ্ভূত কোনো বিবাদ বা মতপার্থক্য মীমাংসা জন্যে কোনো আদালতে মামলা দায়ের করা যাবে না।' তিনি বলেন, 'চিরাচরিত পদ্ধতি অনুযায়ী নথিপত্র বিস্তারিতভাবে পরীক্ষান্তে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত ও সুপারিশ বিবেচনাক্রমে আমি খাদ্য সচিব হিসেবে চুক্তি অনুযায়ী সালিশি ক্ষমতাবলে সিদ্ধান্ত প্রদান করি এবং এ নিয়ে আইনত কোনো দুর্নীতির মামলা চলে না। আমার জানা মতে, সালিশকারীর ওপর অতীতে কোনো দুর্নীতি মামলা হয়নি।' উল্লেখিত দুর্নীতির মামলাটি ১৯৯৭ সালের ৩০ জুন রমনা থানায় রুজু করা হয়। সরকার পক্ষ থেকে উল্লেখিত সিদ্ধান্তের ফাইলের প্রতি পাতায় সচিব স্বাক্ষর করেন। সচিব ফাইলে লিখেন মন্ত্রীর দেখার পর তা বাস্তবায়ন করা যাইতে পারে। এ ব্যাপারে তৎকালীন মন্ত্রী মীর শওকত আলী বলেন, 'আমার তো সেখানে কিছু করার ছিল না। ফাইল যেভাবে এসেছে আমি তাতে সেভাবে স্বাক্ষর করে দিয়েছি। সরকারের যুগ্ম সচিব শাহ মোঃ নাজমুল আলম প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখেছেন যে, তিনি ফাইলে মধ্যবর্তী কর্মকর্তা হিসেবে স্বাক্ষর করেছেন মাত্র।' তিনিও প্রধানমন্ত্রী বরাবরে দেয়া আবেদনপত্রে এই মামলা না চলার কারণ বিবৃত করেন। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮)

৯ মে ১৯৯৯ দৈনিক প্রথম আলোতে বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন ব্যুরো দুর্নীতি প্রতিরোধের দায়িত্বে নিয়োজিত। আপনি কি মনে করেন এই প্রতিষ্ঠানটি যথাযথভাবে এর দায়িত্ব পালন করতে পারছে? প্রশ্নের জবাবে দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে নিয়োজিত সাবেক কর্মকর্তা এম. হাফিজ উদ্দিন খান বলেছেন, 'এই বিভাগ থাকার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমার মনে হয় না। দুর্নীতি দমনে বা প্রতিরোধে এই বিভাগ কোনো কার্যকর ভূমিকা রেখেছে বলে আমি মনে করি না। এককালে এই বিভাগের কার্যাবলি দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। তখন আমি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে চাকরি করতাম। তখন থেকে আরম্ভ করে আমি এ পর্যন্ত দেখেছি হাজার হাজার দুর্নীতির মামলা ঝুলে আছে। দুর্নীতি দমন ব্যুরো নিজেই অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত। তারপরে তাদের এই যে কার্যপদ্ধতি দুর্নীতির কেইস তদন্তে আসে অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারী। অনেক সময় তারা কিছু বোঝেও না ভালো করে। এখানে মানুষের হয়রানি বেশি হয়। তারপর মামলা যদি কোর্টেও যায় সেখানেও অনেক ফাঁক ফোকর থাকে। আমি জানি না যতোগুলো মামলা দায়ের হয় তার মধ্যে কতো শতাংশ শাস্তি পাওয়ার ঘটনা ঘটে। এটা খুঁজে দেখার ব্যাপারে আছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এই সংস্থা কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখছে না এবং এর সংস্কার দরকার।'

দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে অভিযোগের পাহাড় জমেছে। কিন্তু মামলা করে এসবের নিষ্পত্তি করা যায়নি। তদন্তই করা হয়নি। কোন ক্ষেত্রে তদন্ত করে মামলা করা গেলেও তা বন্ধ করে দেয়া হয় রীট করে। উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশে দুর্নীতির শতকরা ৯৫ ভাগ অভিযোগেরই বিচার হচ্ছে না। মামলার আট-দশ বছর পর বিচার শেষ করতে গেলে সাক্ষীর অভাবে দুর্নীতিবাজরা নিষ্কৃতি পেয়ে যাচ্ছে। দুর্নীতি দমন ব্যুরো থেকে পাওয়া হিসাব অনুযায়ী, দেশের দুর্নীতির বিচারাধীন মামলার পরিমাণ জানুয়ারি ২০০১ মাসের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল ৪

www.pathagar.com

হাজার ৮৪৮টি। মে মাসে বিচার সম্পন্ন হয় মাত্র ৩৮টি মামলার। এর মধ্যে মাত্র ১৪টিতে সাজা হয়। বাকী ২৪টিতেই আসামীরা বেকসুর খালাস পায়। ফেব্রুয়ারি মাসে ৩১টি মামলার বিচার সম্পন্ন হয়, সাজা হয় মাত্র ৭টি মামলার। ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী জানুয়ারি মাস পর্যন্ত দুর্নীতির ৭ হাজার ২৩৫টি অভিযোগ তদন্তাধীন ছিল। জানুয়ারিতে তদন্ত শেষ হয় ২২০টির। নতুন অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছিল ৩৪০টি। ফেব্রুয়ারিতে নতুন অভিযোগ গ্রহণ করা হয় ৪২৭টি এবং এ সময়ে তারা তদন্তাধীন ১৭৬টি অভিযোগের কাজ শেষ করে। তদন্ত শেষে জানুয়ারিতে মামলা রুজু করা হয় ৪৯টি এবং ফেব্রুয়ারিতে ৫১টি। অপরদিকে আগের রুজু করা মামলায় ব্যুরোর তদন্ত কর্মকর্তা চার্জশীট দিতে পেরেছে জানুয়ারিতে ৪৭টি মামলায় এবং পরের মাসে ২৪টিতে।

একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত তথ্য থেকে আরো জানা যায়, 'প্রায় ৫২ হাজার দুর্নীতির মামলা অনিষ্পন্ন থাকায় দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সার্বিক কার্যক্রমে মারাত্মক অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। ১৯৯৪ সাল হতে ২০০০ সাল পর্যন্ত গত ৭ বছরে দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে তদন্তাধীন এবং আদালতে বিচারাধীন এ বিপুল সংখ্যক অনিষ্পন্ন মামলার পাহাড় জমেছে। এ অবস্থায় দুর্নীতি দমন করার পুরো প্রক্রিয়াই শেষ পর্যন্ত প্রহসনে পরিণত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো এক গোপন প্রতিবেদনে এ পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, শুধু আদালতেই বিচার নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ৩১ হাজার ৪৩৮টি মামলা বছরে পর বছর ঝুলছে। প্রতিবছর আদালতে দুর্নীতি মামলার যে চার্জশিট দেয়া হয় গড়ে তার ৯১ শতাংশই শেষ পর্যন্ত অনিষ্পন্ন থাকায় স্বাভাবিক বিচার বিলম্বিত হচ্ছে। পাশাপাশি একই সময়ে দুর্নীতি দমন ব্যুরোতেও রাজনৈতিক চাপ, তদন্ত জটিলতা ও অবহেলায় ২০ হাজার ১৩৩টি মামলা ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে আছে। দেখা গেছে, প্রতি বছরই আদালতে বিচারাধীন ও ব্যুরোতে তদন্ত াধীন গড়ে সাড়ে ৭ হাজার মামলা অনিষ্পন্ন থাকছে। দুর্নীতি দমন ব্যুরোর অনসন্ধান, তদন্ত মামলারুজু, চার্জশিট দাখিল, বিচার ও আদালতের রায় পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, দুর্নীতি দমন ব্যুরো প্রতি বছর যে সংখ্যক অভিযোগ তদন্ত করে তার ৫৬ শতাংশই বিভিন্ন অজুহাতে অনিষ্পন্ন থাকে। নিষ্পত্তিকৃত এই ৪৪ শতাংশ অভিযোগের মধ্যে প্রাথমিক তদন্ত শেষে থানায় মাত্র ৯ শতাংশ অভিযোগের ক্ষেত্রে মামলা দায়ের হয়। বাকী ৩৫ শতাংশ অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় নথিভুক্ত করা হয়। মজার বিষয় হচ্ছে, এত সাধ্য সাধানার পর থানায় যে ৯ শতাংশ মামলা দায়ের হয় নিয়ম অনুযায়ী চূড়ান্ত তদন্তের পর এসব মামলায় আদালতে চার্জশিট দাখিলের কথা। কিন্তু দেখা গেছে, এরপরও বিভিন্ন অজুহাতে তদন্ত ঝুলিয়ে রাখায় চূড়ান্ত তদন্ত াধীন গড়ে ৭৭ শতাংশ মামলা প্রতিবছর আর আলোর মুখ দেখেনা। সুষ্ঠু তদারকি, পরিকল্পনা ও জবাবদিহিতার অভাবে এসব মামলার ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কি ঘটে তা কেউ তলিয়ে দেখেনা। ১৯৯৪ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মামলায় পরবর্তী তদন্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, এ সময়ে প্রাথমিক অনুসন্ধান শেষে ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরো হতে দেশের বিভিন্ন থানায় ২৫ হাজার ৪৩২টি দুর্নীতির মামলা দায়ের করা হয়েছে। এরপর চূড়ান্ত তদন্ত শেষে ঘটনা প্রমাণিত হলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আদালতের চার্জশিট দেয়া কথা। কিন্তু দেখা গেছে, থানায় যে সংখ্যক মামলা দায়ের করা হয় তার বিপরীতে আদালতে চার্জশিট দাখিলের হারে আকাশ পাতাল ব্যবধান। দেখা গেছে, আলোচ্য সময়ে মাত্র ৪ হাজার ৫৯৫ টি মামলায় আদালতে চার্জশিট দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিবছর গড়ে মামলা হয়েছে ৩ হাজার ৭৫২টি। কিন্তু আদালতে

www.pathagar.com

চার্জশিট দেয়া হয়েছে মাত্র ৬৫৭ টি। এ হিসেবে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৩ হাজার মামলা পেন্ডিং থেকে যাচ্ছে। যা মোট মামলার ৭৭ শতাংশ। এ বিপুল সংখ্যক মামলা অনিষ্পত্তি থাকার কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্নীতি মামলার তদন্ত কর্মকর্তার সাথে আসামীদের অবৈধ যোগসাজশ, অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ও রাজনৈতিক প্রভাবে চূড়ান্ত তদন্তের নামে চার্জশিট প্রদান বিলম্বিত করা হয়। তবে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর দায়িত্বশীল সূত্রে মতে, মূলত ৫টি কারণে তদন্তাধীন বিপুল মামলা পেন্ডিং থাকছে। কারণগুলো হচ্ছে, তদন্ত কর্মকর্তার অবহেলা, তদন্তকাজে অহেতুক সময়ক্ষেপণ, তদন্তকালে সঠিক পরিকল্পনার অভাব, তদন্ত চলাকালীন সংশ্লিষ্টকর্মকর্তাকে অন্যত্র বদলী করা এবং তদন্তকাজে অনুমতি প্রদানে অহেতুক সময়ক্ষেপণ। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে তদন্তকালীন নতুন নতুন নির্দেশ এবং নথি আটকিয়ে রাখার ঘটনায়ও বহু মামলার তদন্ত বছরের পর বছর বিলম্বিত হয়। এছাড়া সুষ্ঠু তদারকি ও যথাযথ জবাবদিহিতার অভাবেও বহু মামলার ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। (সূত্রঃ দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা ২৪ এপ্রিল ২০০১)

দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মহাপরিচালক বদিউজ্জামান দৈনিক যুগান্তরের সঙ্গে আলাপকালে উল্লেখ করেন, 'বড় ধরনের দুর্নীতির মামলার বিচার সম্পন্ন হওয়ার নজির খুব একটা নেই। দুর্নীতির অভিযোগে তদন্তের পর্যায়েই অধিকাংশ ভিআইপি বা সামর্থবান কর্মকর্তা উচ্চ আদালতে রীট আবেদন করে স্থগিতাদেশ জারি করান। সম্পদ অর্জনে সংবিধানের দেয়া অধিকারকে ভিত্তি করে এই রীট আবেদনে দুর্নীতির মামলাকে হয়রানিমূলক বলে দাবি করা হয়। কিন্তু তার সম্পত্তি অর্জন বেআইনী পথে কিনা তা দেখার জন্য অভিযোগ তদন্তের প্রক্রিয়াও এসব স্থগিতাদেশ বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি দুর্নীতি দমন ব্যুরোর পক্ষ থেকে আদালতে বক্তব্য দেয়ারও সুযোগ হয় না। অন্তবর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা পাওয়ার পর রীটের শুনানি অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অজুহাতে সময় নেয়া হয়। এতে তদন্ত বা মামলার বিচার বিলম্বিত হয়ে পড়ে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তথ্য প্রমাণ কিংবা সাক্ষী হারিয়ে যায়। উপযুক্ত সাক্ষীদের অনেকে চাকরি থেকে অবসরে পর্যন্ত চলে যায়। এতে দীর্ঘদিন পর কোন মামলার বিচার হলেও অধিকাংশ দুর্নীতির মামলায় আসামীরা খালাস পেয়ে যাচ্ছে। মামলা বিচার নিষ্পত্তির পথে বাধা অনেক। তার মধ্যে বড় বাধা তদন্ত কিংবা বিচার পর্যায়ে উচ্চ আদালত থেকে কার্যক্রম স্থগিত রাখার অন্ত র্বতীকালীন আদেশ। এই আদেশের কারণে শতকরা ৯৫ ভাগ মামলা বা অভিযোগ স্থগিত হয়ে থাকে বছরে পর বছর।' বর্তমানে উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশে কতগুলো অভিযোগের তদন্ত স্থগিত রয়েছে ব্যুরোতে এর কোন পরিসংখ্যান নেই। এ সম্পর্কে ব্যুরোর মহাপরিচালক বলেন, 'স্থগিতাদেশ জারী সম্পর্কিত তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তে গেলে আদেশ দেখিয়ে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এ অবস্থায় ব্যুরোর লিগ্যাল শাখা উচ্চ আদালত থেকে স্থগিতাদেশের কাগজপত্র সংগ্রহ করে আদেশ বাতিলের জন্য শুনানির ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট হয়। তবে সেক্ষেত্রেও সমস্যা রয়েছে। মামলা না হওয়া পর্যন্ত প্রক্রিয়া গ্রহণের বৈধতা সম্পর্কেও অডিট আপত্তি উঠতে পারে কিনা সে বিষয়েও খতিয়ে দেখতে হয়। দুর্নীতি মামলার বিশেষ আদালতের সংখ্যা এর মধ্যে পাঁচটি থেকে বাড়িয়ে ১৯ টিতে উন্নীত করা হয়েছে। তাছাড়াও যেসব স্থানে বিশেষ আদালত নেই সেসব জেলায় জেলা জজদের দুর্নীতি দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া আছে। তারাও জেলায় দায়ের হওয়া দুর্নীতি মামলার বিচার করেন। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বিশেষ আদালত বাড়িয়ে কতটা লাভ হবে জানতে চাওয়ার কোন আশা বা হতাশা

www.pathagar.com

প্রকাশ করতে চাই না বলে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মহাপরিচালক মন্তব্য করেন। (সূত্রঃ দৈনিক যুগান্তর ৪ এপ্রিল ২০০১)

ক্ষমতায় থাকতেই আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরুর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন ব্যুরো তদন্ত শুরু করে। মন্ত্রীর নির্দেশে গৃহীত একাধিক সিদ্ধান্ত কিভাবে নেয়া হয়েছে তা জানতে চেয়ে দুর্নীতি দমন ব্যুরো আইন মন্ত্রণালয়ের একাধিক নোটিশও পাঠায়। দুর্নীতি দমন ব্যুরোর বিভিন্ন নথি তলব এবং ব্যুরোর কর্মকর্তা ও ইন্সপেক্টরের নানা ধরনের দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলা তৈরির হুমকি প্রদান আইন মন্ত্রণালয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় কোন কেবিনেট মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর তদন্তের দৃষ্টান্ত বিরল বলে ব্যুরোর উচ্চ পর্যায় উল্লেখ করে। আওয়ামী প্রভাবশালী একটি মহলের ইঙ্গিতে আইনমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মহলটি এর আগে আইনমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরকার প্রধানের কাছে একাধিকবার অভিযোগ করে কোন ফল না হওয়ায় নতুন কৌশল গ্রহণ করে। এর সাথে আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেতে ইচ্ছুক মন্ত্রী পদমর্যাদার এক সংসদ সদস্যের হাতও ছিল। আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর সারাদেশে নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগের বিদ্যমান নীতিমালা পরিবর্তন করা হয়। সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩টি ওয়ার্ড এবং থানা ক্ষেত্রে ৩টি ইউনিয়নের বেশি এলাকা থাকলে তা কর্তন করে নতুন নিকাহ রেজিষ্ট্রার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পূর্ববর্তী সরকারের আমলে যেখানে উপ-সচিব বা যুগ্ম সচিব পর্যায়ে নিকাহ রেজিষ্ট্রার নিয়োগের কার্যক্রম শেষ করা হত সেখানে আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রতিটি নিকাহ রেজিস্ট্রারের নিয়োগ দেয়া হয় আইনমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে। গৃহীত নীতিমালার ভিত্তিতে মন্ত্রীর নির্দেশ বা সিদ্ধান্তক্রমে নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগের সংক্ষুব্ধ নিকাহ রেজিস্ট্রারের অনেকেই সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তিকৃত প্রায় সব মামলায় রীট আবেদনকারীরা হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগ উভয় ক্ষেত্রে হেরে যায়। মামলার হেরে গিয়ে সরকারি সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ নিকাহ রেজিস্ট্রারদের কেউ কেউ ক্ষমতাসীন একটা প্রভাবশালী মহলের মদদে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর আশ্রয় নেয়। তারা আইনমন্ত্রীর সিদ্ধান্তক্রমে দেশের বিভিন্ন স্থানে নিকাহ রেজিস্ট্রারের সিদ্ধান্তে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ পরিকল্পিতভাবে দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে পেশ করে। বিশেষ মহলের ইঙ্গিতে দুর্নীতি দমন ব্যুরো যথারীতি আইন মন্ত্রণালয়ে এর আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করে। দুর্নীতি দমন ব্যুরোর চট্টগ্রাম দুর্নীতি দমন অফিসার জাহিদ হোসেন খানের স্বাক্ষরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরশনের ভেতরে ও বাইরে বেশ কয়েকজন নিকাহ রেজিস্ট্রারের নিয়োগের কাগজপত্র প্রেরণের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে একাধিক নোটিশ প্রেরণ করা হয়। এসব নিকাহ রেজিস্ট্রারের সবাইকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে আইনমন্ত্রীর নির্দেশে।

www.pathagar.com

হাসিনার নিরপত্তায় কুকুর আমদানী

দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং মাদকদ্রব্যের ব্যবহার, বিস্ফোরক দ্রব্য, অস্ত্র সনাক্তকরণ, অপরাধীদের ত্বরিত ভিত্তিতে চিহ্নিতকরণের জন্য পুলিশ বাহিনীর সহায়ক শক্তি হিসেবে পুলিশ বাহিনীর সাথে ডগ স্কোয়াড সংযোজন করার কথা বলা হলেও শেখ হাসিনার নিরাপত্তা কাজে ব্যবহারের জন্য ১৯৯৮ সালের ১৮ নভেম্বর যুক্তরাজ্য থেকে ২৫ টি কুকুর আমদানি করা হয়। এগুলোর মধ্যে পাঁচটি ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর। পাঁচটি কুকুর দিয়েই অপর ২০ টি কুকুরকে ট্রেনিং দেয়ার কথা। কিন্তু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাঁচটি কুকুরের মধ্যে তিনটি হিংস্র ও অবাধ্য হয়ে পড়ায় প্রশিক্ষণ কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। ডগ স্কোয়াডের ২৫ টি কুকুরের মধ্যে ১২ টি জার্মানি শেফার্ড ও ১৩ টি ল্যাব্রাডার ছিল। ইংল্যান্ডের চিলপোর্ট কোম্পানি কুকুরগুলো সরবরাহ করেছে। ল্যাব্রাডার খাতের কুকুর অত্যন্ত হিংস্র স্বভাবের হয়। এদের হিংস্রতার কাছে অপরাধী হার মানতে বাধ্য হয়। গন্ধ শুকে যে কোন জিনিস এরা সনাক্ত করতে সক্ষম। আর জার্মান শেফার্ড তুলনামূলকভাবে ঠান্ডা মেজাজের তবে এরা খুব দ্রুত গতিতে ছুটতে পারে। এদের সাথে দৌড়ে পাল্লা দিয়ে অপরাধী পার পেতে পারে না। আমদানিকৃত ২৫ টি কুকুরের মধ্যে ২০ টি পুরুষ ও ৫টি স্ত্রী কুকুর। একটি স্ত্রী কুকুর বছরে ৭ থেকে ১১ টি বাচ্চা জন্ম দিতে পারে। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান চুক্তি শর্ত ভঙ্গ করে। চুক্তি অমান্য করে বয়স্ক কুকুর সরবরাহ করে। গড়ে কুকুরের বয়স ১১ থেকে ১২ মাস ছিল। অধিকাংশ কুকুরই দুর্বল ও ক্ষীণ স্বাস্থ্যের ছিল। স্বল্প ট্রেনিং এ এগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়ে। খাবার গ্রহণেও চরম অনীহা ছিল। ঢাকায় আনার কিছুদিন পরই কুকুরগুলো অসুস্থ হয়ে পড়ে। জ্বর, রক্ত, আমাশয়, ডায়রিয়া, সর্দি, অনিদ্রা ইত্যাদি নানা রোগে আক্রান্ত হয়। কোম্পানি যে খাবার সরবরাহ করে তা মানসম্মত ছিল না। নিম্নমানের এই খাবার খেয়ে কুকুরগুলো রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। খাবার তৈরির প্রক্রিয়াও ছিল অস্বাস্থ্যকর। সরু চাল, ভেজিটেবল ও গরুর মাংস দিয়ে খাবার তৈরি করা হয়। খাবার তৈরির জন্য একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ পাচক পাওয়া যায়নি। অনভিজ্ঞ পাচকের রান্না খেয়ে কুকুরগুলো পেটের পীড়ায় ভুগে।

কুকরগুলো আমদানি করার পর ২৫টি কুকুরের পেছনে এই প্রকল্পে সরকার প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয় নির্ধারণ করে। এতে করে প্রতিটি কুকুরের পেছনে গড়ে প্রায় ২০ লাখ টাকা ব্যয় হয়। খাবার খাতে প্রতিটি কুকুরের জন্য প্রতিমাসে খরচ হয় চার লাখ টাকা। আর প্রতিদিনের গড় ব্যয় হয় ১৮৯৫ টাকা। এছাড়া রয়েছে কুকুরের তদারকির জন্য প্রশিক্ষক, পুলিশ কর্মকর্তা, ডাক্তার, বাবুর্চি, আয়া, ড্রাইভার, সব মিলিয়ে ১৯৯৮ সালের শেষে ডগ স্কোয়াডের পেছনে ব্যয় হয় প্রায় আড়াই কোটি টাকা। নির্মাণাধীন (মিরপুর ১৪ নাম্বারে ৩ বিঘা জমির উপর) কমপ্লেক্স নির্মাণ ও ডেকোরেশনসহ আরো ব্যয় হয় ৩ কোটি টাকা। সেখানে প্রতিটি কুকুরের জন্য আছে আলাদা শয়নকক্ষ, খাবার রুম, শরীরচর্চা কেন্দ্র ও খেলাধুলার স্থান। এছাড়াও আছে প্রজনন কক্ষ, চিকিৎসা কক্ষ এবং চলাচলের জন্য ৩টি এসি মাইক্রোবাস। এই কুকুর বাহিনীর সাথে ৪০জন পুলিশ কর্মকর্তাও ছিলেন। কুকুরের খাবারের বিশেষ তালিকা আসে লন্ডন থেকে।

www.pathagar.com

এদের খাবার-দাবার বেশ রাজকীয়। সকালের নাস্তা হিসেবে দেয়া হয় ২টি করে প্রোটিন সমৃদ্ধ বিস্কুট, দুপুরবেলা প্রত্যেকের জন্য আধা কেজি মাংস, ভাত ও সবজি আর রাতের জন্য স্যুপ ও জ্যুস।

কুকুর বাহিনী নিয়ে আওয়ামী সরকার বেকায়দায় পড়ে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরাপত্তার জন্য কুকুর বাহিনী আনা হলেও ২৪ নভেম্বর পুলিশ এ সম্পর্কে কিছুটা ভিন্ন বক্তব্য দেয়। কুত্তা বিষয়ক সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশের এডিশনাল আইজি ফজলুল হক বিষয়টি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপর দিয়ে চালিয়ে দেয়। পুলিশ বাহিনীতে কুত্তা বিষয়ে পদও করা হয়। এসব পদ হচ্ছে এসি (কুকুর) ও ডিসি (কুকুর)। কুত্তাদের জন্য কোটি কোটি টাকার বাজেট তৈরি হয়। এগুলোকে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় এবং বাসভবন, গণভবন এবং বঙ্গভবনে নিয়ে গিয়ে সেখানকার পরিবেশ সম্পর্কে পরিচিত করে তোলা হয়। ডগ স্কোয়াড নিয়ে পুলিশ কর্মকর্তাদের বক্তব্য অস্বচ্ছতা ও স্ববিরোধিতায় ভরা ছিল। এই স্কোয়াডের ক্রয় মূল্য, প্রশিক্ষণ ব্যয়, কমপ্লেক্স নির্মাণ এমনকি তাদের কার্যক্রমসহ কোন বিষয়েই পুলিশ কর্মকর্তারা কোন স্পষ্ট জবাব দিতে পারেননি। ডগ স্কোয়াড নিয়ে পুলিশ ভবনে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নবানের মুখে এ চিত্র পাওয়া যায়। এডিশনাল আইজি ফজলুল হক ও সহকারী আইজি সৈয়দ বজলুল করিম প্রেস ব্রিফিংয়ে বক্তব্য রাখেন। প্রেস ব্রিফিংয়ের প্রচলিত নিয়মমাফিক ডগ স্কোয়াড সম্পর্কে কোন লিখিত বক্তব্য সাংবাদিকদের সরবরাহ করা হয়নি, মৌখিক বক্তব্য ও বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে এডিশনাল আইজি ফজলুল হক বলেন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রথম থেকেই ডগ স্কোয়াড সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। এর মধ্যে দিয়ে তার আকাংক্ষা পূর্ণ হলো।' তিনি বলেন, 'থাইল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তান, ইংল্যান্ড, সৌদি আরব সহ বিশ্বের অনেক দেশেই ডগ স্কোয়াড আছে।' তিনি আরো বলেন, 'কুকুরেরা ঘ্রাণের ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। তাদের যে ক্ষমতা আছে, সেটা আমাদের নেই। তাদের এ ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে আমরা যদি সফল হতে পারি, সেটাই হবে কল্যাণকর।' ডগ স্কোয়াডের ভূমিকা কি হবে? এ সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'মাদকদ্রব্য, অবৈধ অস্ত্র এবং তৃতীয়ত বিস্ফোরক উদ্ধার।' ভিআইপি প্রোটেকশনে ব্যবহৃত হবে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমার মনে হয় না।' একজন উর্ধতন পুলিশ কর্মকর্তার এ সংক্রান্ত উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি আমতা আমতা করে প্রশ্ন এড়িয়ে যান। হরতাল, ধর্মঘটসহ রাজনৈতিক কর্মসূচিতে স্কোয়াড ব্যবহৃত হবে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'আমার মনে হয় না।' ডগ স্কোয়াড কত টাকার কেনা হয়েছে। কমপ্লেক্স নির্মাণে কত ব্যয় হবে, প্রশিক্ষক ও মাসিক ব্যয় দাঁড়াবে কত ইত্যাদি প্রশ্নের জবাবে সমন্বিত জবাব না দিয়ে বলা হয়, '২৫ টি কুকুর কেনা হয়েছে ৫৬ লাখ টাকায়। কমপ্লেক্স নির্মাণে এক দেড় কোটি, প্রশিক্ষণে প্রতি মাসে মাথাপিছু সাত হাজার ইত্যাদি।' এক সঙ্গে এ খাতে কত ব্যয় হচ্ছে এ প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে বলা হয়, 'কুকুরের সঙ্গে আসা ৭ জন বিশেষজ্ঞের থাকা-খাওয়াসহ তাদের জন্য ব্যয় হবে ৮০ লাখ টাকা। কুকুর সরবরাহকারী চিলপোর্ট কোম্পানীর বক্তব্যের উদ্ধৃতি কুকুর বিষয়ে তাদের দেড় কোটি টাকা প্রাপ্তি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ফজলুল হক জানান, 'ক্রয় ও প্রশিক্ষণ খাতে খরচ দাঁড়াচ্ছে এক কোটি ৩৬ লাখ টাকা।

ডগ স্কোয়াডের কুকুর সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান চিলপোর্টের প্রশিক্ষকরা চুক্তি ভঙ্গ করে ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ দেশে ফিরে গেছেন। চুক্তি ছিল পাঁচটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরসহ ২৫টি কুকুর সরবরাহ করবে। কুকুরের বয়স হবে ৬ থেকে ৮ মাস। কিন্তু চিলপোর্ট এই চুক্তির শর্ত

www.pathagar.com

মানেনি। তারা দেয় বয়স্ক কুকুর। যেগুলোর বয়স ১১ থেকে ১২ মাস। আবার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাঁচটি কুকুরের মধ্যে তিনটিকে কাজে লাগানো যায়নি। কুকুর তিনটি হিংস্র ও অবাধ্য। এগুলোকে প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহার না করতে পারায় ট্রেনিং প্রোগ্রামে বিঘ্ন ঘটে। ২৪ ফেব্রুয়ারি বৃটিশ ৮ ট্রেনারের দেশে ফেরার কথা ছিল। কিন্তু ১০ দিন আগে তারা বাংলাদেশ ত্যাগ করেন। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিটি কুকুরের দাম যখন ২৫/৩০ হাজার টাকা তখন চিলপোর্ট বিক্রি করেছে আড়াই লাখ টাকা করে। উপরন্তু কুকুরগুলো রুগ্ন ও দুর্বল। কর্তৃপক্ষ তিনটি কুকুর মেরে ফেলার চিন্তা করেছিলেন। এ তিনটি কুকুর ছিল খুবই হিংস্র ও অবাধ্য। ফেব্রুয়ারি মাসেই হিংস্র কুকুরগুলো পাঁচজন হ্যান্ডেলারকে কামড়ে দেয়। কুকুর তিনটি জার্মান শেফার্ড প্রজাতির পুরুষ। এগুলো হচ্ছে রুস্টি, বারনি এবং কেসি। ২১ ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনীর মেজর পদমর্যাদার একজন ডগ এক্সপার্ট হিংস্র ও বদ মেজাজি কুকুরগুলো পর্যবেক্ষণ করেন। বিশেষজ্ঞরা ধারণা পোষণ করেন, 'কুকুর তিনটি মানসিক সমস্যায় ভুগছে।' পেট এনিম্যাল ক্লিনিকে চিকিৎসা দেয়ার পর অবস্থায় উন্নতি না হলে এগুলোকে মেরে ফেলা কথা ভাবা হয়। এ বিষয়ে ডগ স্কোয়াডের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা পুলিশ সদর দফতরের এআইজি সৈয়দ বজলুল করিমের বক্তব্য ছিল, 'কুকুর তিনটিকে মেরে ফেলা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। কারণ কুকুর সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ইউকে চিলপোর্ট কুকুর তিনটি ফেরৎ নেবে না বলে জানিয়েছে। কুকুর ফেরৎ পাঠানো যথেষ্ট ব্যয়বহুল। সাধারণত কোনো এয়ারলাইন্স কুকুর বহন করতে চায় না। বিশেষ আবেদনের প্রেক্ষিতে এ ব্যাপারে অনুমতি পাওয়া যায়।' কুকুর তিনটি নিয়ে পুলিশ প্রশাসন বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে। এ ব্যাপারে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে স্পেশাল নোট দেয়া হয়। ওই নোটে তিনটি কুকুর সম্পর্কে পৃথক পৃথক বর্ণনা দেয়া হয়। বর্ণনায় বলা হয়, 'রুস্টি নামের কুকুরটি খুবই শীর্ণকায় ও দুর্বল। আনার পর থেকেই এটি এরকম ছিল। এখন পর্যন্ত অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। এটিকে দিয়ে কোনো ট্রেনিং করানো যাচ্ছে না।' বারনি সম্পর্কে বলা হয়, 'এই কুকুরটি খুবই হিংস্র, এটিকে দিয়ে ট্রেনিং করানো অসম্ভব। বেশিরভাগ সময়ই এটির মেজাজমর্জি ভালো থাকে না। ইতোমধ্যে এটি তার হ্যান্ডেলারকে কামড়ে দিয়েছে। অপর হ্যান্ডেলার তার কাছে যেতে সাহস করেন না। বিদেশ থেকে আনার পর থেকে এটিকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। খাবার গ্রহণেও চরম অনীহা রয়েছে।' কুকুরগুলো হত্যার সিদ্ধান্ত নিতে কর্তৃপক্ষ কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলেন। কুকুরগুলো যেন হত্যা করা না হয়, এই জন্য চিলপোর্ট কোম্পানির ট্রেনাররা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। ঢাকা ত্যাগের আগেও তারা কুকুর হত্যা করতে নিষেধ করেন। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ২৫ নভেম্বর, সাপ্তাহিক অর্চি ৩০ নভেম্বর, দৈনিক মানবজমিন ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯)

www.pathagar.com

৫৪ ধারা আইনের অপপ্রয়োগ

স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ভাটা সৃষ্টির জন্য অত্যাচারী মুজিবী শাসক গোষ্ঠী বারংবার নতুন নতুন কালো আইনের জন্ম দিয়েছে, ব্যবহার করে কাংক্ষিত স্বার্থ অর্জন করেছে। বিশ্বের মানচিত্রে নতুন একটি রাষ্ট্রের অবির্ভাবের ফলে স্বাভাবিকভাবে জনস্বার্থের প্রতি খেয়াল রেখে আইন প্রণয়ন করার রীতি একক কোনো দেশের নয়, সারা বিশ্বের প্রচলিত রীতি। সেই রীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে মুজিবী সরকার বৃটিশ আমলে তৈরি করা সহজ নিপীড়নের হাতিয়ার ৫৪-ধারা আইনকে কোনো সংশোধন ছাড়াই বাংলাদেশের একটি আইন করেছে।

আইনের ম্যার-প্যাঁচে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় পুলিশকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী করা হলেও প্রকৃতপক্ষে ধারাটির উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিরপরাধ ব্যক্তিদের ৫৪ ধারায় গ্রেফতারের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ ছাড়া যদি কাউকে হয়রানির জন্য গ্রেফতার করা হয় তবে পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করার বিধান রয়েছে। কোনো আইনই কাউকে নিজের ইচ্ছামাফিক নির্যাতন করার অধিকার দেয়নি। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭ ধারাতে ১৫ দিনের বেশি কাউকে আটক রাখা যাবে না। এই ১৫ দিনের জন্য তাকে জেল অথবা পুলিশে সোপর্দ করতে হলে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ থাকতে হবে।

৫৪-ধারা আইনের সহজ ব্যাখ্যা হচ্ছেঃ গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়া শুধুমাত্র যুক্তিসঙ্গত তথ্যভিত্তিক কারণে পুলিশ কাউকে সন্দেহ করতে পারবে এবং সন্দেহ যদি যুক্তিসঙ্গত হয় তবেই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা যাবে। যে সব শর্তের ভিত্তিতে পুলিশ ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করতে পারে তার মধ্যে রয়েছে, কোনো গুরুতর অপরাধে যুক্ত, যার কাছে ঘর ভাঙ্গার যন্ত্র আছে, সংবাদপত্র অথবা গেজেটে ঘোষিত অপরাধী, যার কাছে চোরাইমাল আছে, পুলিশের কাজে বাধা অথবা পুলিশের হেফাজত থেকে যারা পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে, প্রতিরক্ষা বাহিনী থেকে পলাতক, বাংলাদেশের বাইরে অপরাধ করে দেশে এলে, অন্য থানা থেকে গেফতারের জন্য অনুরোধ করা হলে প্রভৃতি।

আওয়ামী আমলে পুলিশ অনেক ক্ষেত্রেই ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারার অপপ্রয়োগ করে। তারা যেসব কাজ করে তা ৫৪ ধারার দিকনির্দেশনার সম্পূর্ণ বিপরীত। পুলিশ যাকে-তাকে গ্রেফতার করে নির্যাতন করে, অবৈধ সুযোগ হাতিয়ে নেয়। নির্যাতনের মাধ্যমে জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়ার ঘটনায় পুলিশ চ্যাম্পিয়নতো হয়েছে ১৯৯৬ সালের জুলাই থেকে ২০০১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত।

হাসিনার আমলে আইন-কানুন, ধারা-উপধারা, মানবাধিকারের বাধানিষেধ সব কাগজে কার্যকর ছিল, শুধু কার্যকর ছিল না আওয়ামী সরকারের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী। কে কিভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, নিহত হচ্ছে তা নিয়ে ভাববার ফুসরৎ সরকারের হাতে ছিল না। তাদের অবিমৃশ্যকারীতার জন্য পুলিশের নির্যাতন বৃটিশ-পাকিস্তান সরকারের আমলকে ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী গ্রেফতারের সাথে সাথে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির দুটি অধিকার

www.pathagar.com

সৃষ্টি হয়। একটি হচ্ছে কি কারণে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে সেটি তার জানার অধিকার এবং দ্বিতীয়ত তার মনোনীত আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করার অধিকার। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে তা মানা হয়নি। অনেক সময়ে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে হাজির করা হয়নি এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করা হলেও সাথে সাথে রিমান্ডের আদেশ চাওয়া হয় এবং নির্যাতনের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় অথবা স্বীকারোক্তি আদায়ের অজুহাতে নির্যাতন করা হয়। অথবা তাকে আটক করা সত্ত্বেও গ্রেফতার দেখানো হয়নি।

পুলিশের অমানবিক নির্যাতন থেকে অসহায়দের রক্ষার জন্য জাতীয় সংসদের বৈঠকে বিএনপির এমপি আবদুল মান্নান ৯ নভেম্বর ১৯৯৮ পুলিশ রিমান্ডে আটককৃত বা গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের নিয়ে তাদের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তথ্য আদায় বা তাদেরকে সাক্ষ্যদানে বাধ্য করার বিধান সংশোধন করার উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিক শাসনামলে প্রণীত শতাব্দীর পুরনো আইন কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের ৫ নম্বর আইন)-এর কয়েকটি ধারায় সংশোধন করার জন্য একটি বিল আনেন। তার বিলটির বিরুদ্ধে সরকার তাৎক্ষণিকভাবে কোন আপত্তি না জানানোর ফলে বিলটি বিনা বাঁধায় সংসদের বৈঠকে উত্থাপনের পর বেসরকারি সদস্যদের বিল সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে আবার সংসদের বৈঠকে পেশের জন্য পাঠানো হয়েছিল। প্রস্তাবিত বিল সর্ম্পকে আবদুল মান্নানের বক্তব্য ছিল, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য পুরাতন আইনের দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে প্রচলিত আইনকে বাস্তবামুখী করা প্রয়োজন। সুষ্ঠু তদন্ত কার্য ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হলে কোন মামলায় আটককৃত ব্যক্তিকে যাতে পুলিশ কর্তৃক অযথা হয়রানি হতে না হয় সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে হবে এবং এটা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে একদিকে পুলিশ প্রশাসনের ওপর জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে; অন্যদিকে অনেক নিরীহ লোক পুলিশের অযথা হয়রানির হাত হতে রক্ষা পাবেন। বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী রেকর্ড করার ক্ষেত্রে এবং ফৌজদারী মামলায় আটক ব্যক্তিকে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদকালে পুলিশ কর্তৃক হয়রানির হাত থেকে রক্ষার জন্য আদালত কর্তৃক স্থান নির্ধারণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনোনীত আইনজীবী/প্রতিনিধির উপস্থিতির বিধান করার উদ্দেশ্যেই এই আইনে প্রস্তাব করা হয়েছে। বিলের মাধ্যমে কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর ১৮৯৮-এর ১৬৭ নম্বর ধারায় সংশোধনী এনে বলা হয়, (১) এই ধারার অধীন কোন ফৌজধারী আদালত কর্তৃক কোন আটক ব্যক্তিকে কোন মামলার তদন্তের স্বার্থে পুলিশ হেফাজতে নেয়ার অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আদালত (ক) আটক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য স্থান নির্ধারণ করে দেবেন, (খ) আটক ব্যক্তির মনোনিত প্রতিনিধি কিংবা যে ক্ষেত্রে আটক ব্যক্তি কর্তৃক কোন প্রতিনিধি মনোনয়ন দেয়া হয়নি সেই ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক মনোনিত একজন আইনজীবীর উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দিতে পারবেন। (২) এই ধারার অধীন পুলিশ হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদ দিনের বেলায় করতে হবে এবং জিজ্ঞাসাবাদের সময়সীমা দৈনিক আট ঘন্টার অধিক হবে না।

মোট পাঁচটি ধারা সম্বলিত প্রস্তাবিত বিলে আরো কতিপয় সংশ্লিষ্ট বিধান সংযোজনের প্রস্তাবও ছিল। আওয়ামী লীগ জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে এই বিলটি পাশের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে না বলে আশা করা গেলেও বিলটি তাদের মেয়াদকালে সংসদে উপস্থাপনই করা হয়নি।

www.pathagar.com

৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে বর্বরোচিতভাবে ও নির্দয়ভাবে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে রুবেলকে পুলিশ পিটিয়ে হত্যা করার পর রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের বিরুদ্ধে সকল দল তথা সারা জাতি ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। সরকার এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের নামে রুবেল হত্যা মামলায় গঠন করে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন। সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি হাবিবুর রহমান খানের সমন্বয়ে এক সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। তদন্ত কমিশনকে ১৫ দিনের মধ্যে রিপোর্টটি প্রদানের জন্য বলা হয়েছিল। বিচারপতি হাবিবুর রহমান তদন্ত করে সরকারের কাছে যে রিপোর্টটি প্রদান করেছিলেন তার সারসংক্ষেপ ছিল, পুলিশ অহরহ ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারার অপপ্রয়োগ করছে। মানুষকে রক্ষা করার পরিবর্তে অহেতুক হয়রানি করার উদ্দেশ্যে অনেক সময় এই বিধানকে ব্যবহার করছে পুলিশ। বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করার অর্থ এই নয় যে, যাকে তাকে যত্রতত্র যখন তখন ইচ্ছেমতো গ্রেফতার করা যাবে এবং গ্রেফতার করেই অহেতুক মারধর করা যাবে অথবা মারধরের পরির্বতে টাকাকে বিনিময় হার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। পুলিশি নির্যাতন বাংলাদেশের সংবিধানে (অনুচ্ছেদ-৫), সার্বজনীন মানবাধিকারের সনদে (অনুচ্ছেদ-৫) নিষিদ্ধ। এমনকি দেশের প্রচলিত পুলিশি আইন (পুলিশ প্রবিধান ৩৩ (খ) ধারা এবং পুলিশ অর্ডিন্যান্সের ৫৫ ধারা) অনুসারে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ক্ষেত্রে পুলিশ কর্তৃক কার্যবিধি ৫৪-এর উপধারাসমূহ লংঘন করে আইনের অপব্যবহার করার সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। এ রকম অবস্থা চলতে থাকলে দেশ অচিরেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিবর্তে পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত হবে এবং একই সাথে অরাজকতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ৫৪ ধারায় পুলিশকে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে। যদিও যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের অজুহাতে পুলিশ যেকোনো সময়ে যেকোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার ক্ষমতা রাখে, তবে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ থাকার পেছনে অবশ্যই দৃঢ় ভিত্তি বা বিশ্বাসযোগ্য বা যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে হবে। কিন্তু পুলিশ প্রায়ই নিরীহ ব্যক্তিদের কোনো কারণ ছাড়াই কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে আটক করে ২৪ ঘন্টা তাদের হেফাজতে রেখে হয়রানি ও নির্যাতন করে এবং পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদের নামে রিমান্ডে এনে নির্যাতন করে বলে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। কমিশন ৫৪ ধারার অপব্যবহারের উদাহরণ দিয়ে জানায়, ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ঢাকার ১৫টি থানা ও গোয়েন্দা বিভাগ ৫৪ ধারায় ১ হাজার ৫৮৫ জনকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠায়। অথচ এদের মধ্যে মাত্র ১৮৯ জনের বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করা যায়নি বা কোনো অপরাধের কোনো অভিযোগ নেই।

৫৪ ধারার অপপ্রয়োগ রোধ ও ধারাটির প্রয়োগ আরো সুসংহত করার জন্য কমিশন যে সুপারিশগুলোর উল্লেখ করেছে সেগুলো হলো

(ক) ৫৪ ধারার বিধান মতে কাউকে গ্রেফতার করতে হলে গ্রেফতারকারী পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেফতার করার পূর্বেই আসামী বা অভিযুক্ত ব্যক্তির পূর্ব ইতিহাস জানার চেষ্টা করবেন এবং ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিরূপ কোনো সংবাদ থাকলে তার বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করবেন অথবা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ থাকলে এ ধারায় আটক করতে পারবেন,

(খ) ৫৪ ধারার বিধানমতে গ্রেফতার করার সময় গ্রেফতারকারী পুলিশ তার নিজের পদমর্যাদা সম্বলিত শনাক্তকারী 'ট্যাগ' প্রদর্শন করবেন,

(গ) ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করার পরপরই গ্রেফতারের সময়, গ্রেফতারের স্থান ও কারণ সংবলিত একটি বিবরণী তৈরি করে তা গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে প্রদান করবেন,

www.pathagar.com

(ঘ) ৫৪ ধারার আওতায় কোনো ব্যক্তিকে আটক করলে আটককারী কর্মকর্তা তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে তাৎক্ষণাৎ জানাবেন। তখন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা গ্রেফতারের বিষয় ও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির প্রাক-পরিচিতি খতিয়ে দেখবেন এবং বিষয়টি তদারকি করবেন। গ্রেফতারের পর গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে কি কারণে এবং কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়কে জানাতে হবে অথবা তার মনোনিত আইনজীবীকে সংবাদ দেয়ার অধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন

(ঙ) গ্রেফতারের পর গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে থানায় আনার পর অবশ্যই তা সাধারণ ডাইরির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যেখানে তার নাম, পূর্ণ ঠিকানা, গ্রেফতারের কারণ এবং কোন আত্মীয়কে খবর দেয়া হয়েছে তার নাম উল্লেখ করতে হবে,

(চ) যদিও ৫৪ ধারার বিধানটিতে ধৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা আছে তবু স্থান ও কাল ভেদে অধিক সময় থানা হাজতে রাখার প্রয়োজন না থাকলে ১২ ঘন্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে,

(ছ) গ্রেফতারের সময় গ্রেফতাকৃত ব্যক্তি কোনো আঘাতজনিত কারণে অসুস্থ বা জখমপ্রাপ্ত হলে তাকে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে সার্টিফিকেট সংরক্ষণ করতে হবে এবং এর একটি অনুলিপি আসামির সাথে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাতে হবে,

(জ) প্রতি থানা, জেলা ও মহানগরী ডিসি'র দফতরে যেন আসামীদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিদিন যেসব ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে থানা বা ডিবি দফতরে আনা হবে তাদের একটি তালিকা প্রণয়ন করে প্রকাশ্যে টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে,

(ঝ) গ্রেফতারের পর জিজ্ঞাসাবাদের নামে নিষ্ঠুর বা অমানবিক আচরণ করা যাবে না। জিজ্ঞাসাবাদের সময় মনস্তাত্বিক চাপ ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে তথ্য বের করতে হবে।

কমিশন ৫৪ ধারার অপপ্রয়োগ উল্লেখের পাশাপাশি বলেছে, কেউ কেউ এ ধারার বিলোপ চান। তবে বাংলাদেশের মতো একটি দেশে এ ধারা রহিত করা সম্ভব নয়, কিন্তু এর অপব্যবহার রোধ সম্ভব। আইনে ঠিক যেভাবে বিধানটি প্রয়োগের কথা, ঠিক সেভাবে, কঠোর নিয়মতান্ত্রিকভাবে এ ধারা ব্যবহার করা হলে এবং উচ্চ পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তা ও ম্যাজিস্ট্রেটের সঠিক ও নিয়মিত তদারকি, পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ করা হলে অনিয়ম ও অঘটন বহুলাংশে হ্রাস পাবে। (সূত্র ঃ দৈনিক মানবজমিন ৮ অক্টোবর ১৯৯৮)

রুবেল হত্যার মামলায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে যে সমস্ত দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা কেন বাস্তবায়ন করা হবে না বা তা বাস্তবায়নের কেন নির্দেশ দেয়া হবে না-এ মর্মে কারণ দর্শানোর জন্য বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি এ এম মাহমুদুর রহমান ও বিচারপতি এমডি মোজাম্মেল হোসেন সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ ৩০ নভেম্বর ১৯৯৮ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিস ট্রাস্টের প্রতিনিধি সাদহীন মল্লিক, আইন ও সালিস কেন্দ্রের প্রতিনিধি সালমা সোবহান, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের প্রতিনিধি তারেক আলী, সবিতা রানী চক্রবর্তী, আলহাজ সৈয়দ আনোয়ারুল হক, সুলতানুজ্জামান খান এবং মনিরুজ্জামান হায়াত মাহমুদ রীট পিটিশন দায়ের করলে আদালত শুনানি শেষে 'বিচারপতি হাবিবুর রহমান খানের রুবেল হত্যায় তদন্ত রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে ফৌজদারী মামলায় পুলিশ রিমান্ড ও তদন্তের ক্ষেত্রে তার দিক নির্দেশনা কেন প্রযোজ্য হবে না-এ মর্মে সরকারকে কারণ দর্শানোর' নির্দেশ প্রদান করেন। 'কার্যবিধির উপরোক্ত ধারা দুটো ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে নিবৃত্ত করা হবে না এবং গ্রেফতার বা তদন্তের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে আইন মেনে চলার

www.pathagar.com

নির্দেশ দেয়া হবে না। পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় নির্যাতন, ধর্ষণ ও মৃত্যুবরণ করলে ভিকটিমকে বা তার পরিবারকে কেন ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেয়া হবে না'-এ মর্মেও কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেয়া হয়। বিচারপতিদ্বয় বিবাদীদের উপর রুলনিশি জারি করে ৮ সপ্তাহের মধ্যে জবাব দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, পুলিশের আইজি, পুলিশের ডিআইজি ও ডিবিকে রীটে পিটিশনে বিবাদী করা হয়। রীটটি ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, এডভোকেট ইদ্রিসুর রহমান শুনানি করেন। রীট পিটিশন শুনানিকালে ড. কামাল হোসেন বলেন, 'একশ' বছর পূর্বেকার ফৌজদারী আইন নিয়ে আমরা এখনো দেশ পরিচালনা করছি। দেশের সংবিধান, গণতন্ত্র তথা সমাজের চাহিদা অনুসারে এখনো আইন পরিবর্তন করা হয়নি'। তিনি বলেন, 'যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন'। তিনি আরো বলেন, 'পুলিশের নির্যাতনে মেধাবী ছাত্র রুবেল নিহত হয়েছে। এই অভিযোগে মামলা হয়েছে। বিচার চলছে। কিন্তু আমরা রুবেলকে আর ফেরত পাব না'। ড. কামাল বলেন, 'বিগত কয়েক বছরে পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় অনেকের মৃত্যু হয়েছে। অনেকের সাথে অসদাচরণ করা হয়েছে'। তিনি বলেন, '৫৪ ধারার যথাযথ প্রয়োগ ব্যতিরেকে পুলিশ অনেককে গ্রেফতার করে এবং কার্যবিধির ১৬৭ ধারায় পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করে'। তিনি বলেন, 'পুলিশ উক্ত ধারা দুটো যথেচ্ছা ব্যবহার করছে। উক্ত ধারা দুটো অপব্যবহার করে পুলিশ জনগণের মৌলিক অধিকার খর্ব করছে'। তিনি এ প্রসঙ্গে বেশ কিছু নজির আদালতে উপস্থাপন করেন।

১৯৯৯ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের ১৯৯৮ সালের মানবাধিকার রিপোর্টের অনুচ্ছেদ-১-এর প্রথম কলামে স্থান পায় ২৩ জুলাই গোয়েন্দা পুলিশের হাতে নির্মমভাবে সংঘটিত মেধাবী ছাত্র রুবেল হত্যাকান্ডের বিবরণ। রিপোর্টে বলা হয়, 'ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৫৪ নম্বর ধারার অধীনে কোন ওয়ারেন্ট অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে অপরাধ তৎপরতায় জড়িত থাকার সন্দেহে আটক করা যেতে পারে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জুলাই মাসে নিজেই সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করেন যে, পুলিশ ৫৪ ধারার অপব্যবহার করছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং তাদের পরিবারকে হয়রানি করা এবং ভয় প্রদর্শনের জন্য সরকার মাঝে মাঝে ৫৪ ধারা ব্যবহার করে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ৭ জুন জামালুদ্দিন কাদের চৌধুরী নামে একজন ব্যবসায়ীকে, যিনি সংসদের দু'জন বিরোধী দলীয় এমপি'র ছোট ভাই, নাশকতামূলক কার্যকলাপের জন্য ৫৪ ধারার অধীনে আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে কোনরকম অভিযোগ দায়ের না করেই পাঁচদিন পর তাকে মুক্তি দেয়া হয়। মাঝে মাঝে পুলিশ ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেয়ার জন্যেও লোকজনকে গ্রেফতার করে।'

www.pathagar.com

বিশেষ ক্ষমতা আইনে নিপীড়ন

বিশেষ ক্ষমতা আইন নিয়ে এ যাবতকালে কম সমালোচনা হয়নি। ১৯৭৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান নিবর্তনমূলক বিশেষ ক্ষমতা আইন জারী করেন। বিশেষ ক্ষমতা আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে এর বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা-সমালোচনা হয়, মওলানা ভাসানীসহ একমাত্র সরকারি দলের বুদ্ধিজীবী ছাড়া সবাই দাবী জানিয়েছিলেন আইনটি বাতিল করার জন্য। কিন্তু কারো কথা আমলে আনেনি মুজিব সরকার। তখন জামিনের আবেদনের সুযোগ না রেখে বিশেষ ক্ষমতা আইনে যখন খুশি যে কাউকে বিনাকারণে গ্রেফতার করার বিধান সন্নিবেশিত করা হয়। সংবিধান বিরোধী ও মৌলিক মানবাধিকার পরিপন্থী এ আইনে সরকার ও প্রশাসনের মর্জিমাফিক গ্রেফতার করা যায়। ১৯৭৪ সালে এই আইনে ৫শ' ১৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

এই আইনে মোট ৩৬টি ধারা আছে। তবে কয়েকটি ধারা ইতোমধ্যে বিলুপ্ত করা হয়েছে। এই আইনের ২ (চ) ধারায় বলা হয়েছে, অনিষ্টকর বা ক্ষতিকর কার্য বলতে বুঝায় এমন কোন কাজ বা অভিপ্রায়-

(১) যাহা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বা প্রতিরক্ষায় ক্ষতিকর।

(২) বাংলাদেশের সঙ্গে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রতি হানিকর।

(৩) বাংলাদেশের নিরাপত্তা, জননিরাপত্তা ও জন শৃঙ্খলার ক্ষতিকর।

(৪) বিভিন্ন সম্প্রদায়, শ্রেণী অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণাবোধ বা উত্তেজনা সৃষ্টি করা।

(৫) আইনের প্রয়োগ অথবা শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে কোন কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি বা বাঁধা সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান বা প্ররোচিত করা।

(৬) জনসাধারণের সেবা ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহে ক্ষতি করা।

(৭) জনসাধারণ কিংবা কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীতি বা আতংক সৃষ্টি করা।

(৮) রাষ্ট্রের আর্থ সামাজিক স্বার্থে ক্ষতিকর।

এই আইনের ৩ ধারায় বর্ণিত আছে-কতিপয় ব্যক্তিকে আটক অথবা বহিষ্কারের আদেশ দানের ক্ষমতাঃ

(১) সরকার যদি কোন ব্যক্তির বিষয়ে এই মর্মে নিশ্চিত হন যে তাহাকে কোন অনিষ্টকর কার্য করা হতে বিরত রাখা প্রয়োজন তাহলে নিম্নোক্ত আদেশ দিতে পারেন-

(ক) উক্ত ব্যক্তিকে আটকের নির্দেশ; (খ) বাংলাদেশ ত্যাগের নির্দেশ দিতে পারেন। তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশের কোন নাগরিকের বেলায় বহিষ্কারাদেশ দেয়া যাবে না।

(২) কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কোন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, কোন অনিষ্টকর কার্য থেকে তাকে বিরত রাখা প্রয়োজন তাহলে অনুরূপ ব্যক্তিকে আটকের আদেশ দিতে পারেন।

(৩) যখন আদেশ দানকারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ করেন তখন তিনি সাথে সাথে আটকাদেশের হেতু এবং তাঁর মতে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির একটি প্রতিবেদন সরকারের

www.pathagar.com

নিকট প্রেরণ করবেন এবং ত্রিশ দিন অতিক্রান্ত হবার পর এই আদেশের কোন কার্যকারিতা থাকবে না যদি ইত্যবসরে সরকার কর্তৃক ইহা অনুমোদন প্রাপ্ত না হয়।

এই আইনের ৪ ধারায় বর্ণিত হয়েছে-আটকাদেশে কার্যকরীকরণ : আটকাদেশ বাংলাদেশের যে কোন স্থানে ফৌজদারী কার্যবিধিতে ব্যবস্থাপিত গ্রেফতারী পরোয়ানার কার্যকরণের পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি হতে পারে।

৬ ধারা : কতিপয় কারণে আটকাদেশ অবৈধ ও অকার্যকর হবে না : যে ব্যক্তিকে আটক করা হচ্ছে তিনি সরকার অথবা আদেশকারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ারাধীন স্থানীয় এলাকার বাইরে অবস্থান করেছেন অথবা ঐ ব্যক্তির আটকের স্থান উক্ত এখতিয়ারাধীন এলাকা বহির্ভূত শুধুমাত্র এইসব কারণে আটকাদেশ অসিদ্ধ বা অকার্যকর হবে না।

৭ ধারা : পলাতক ব্যক্তি সম্পর্কিয় ক্ষমতা : ক্ষেত্র বিশেষে সরকার অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের যদি বিশ্বাস করার হেতু থাকে যে, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে আটকাদেশ দেওয়া হয়েছে সেই ব্যক্তি ফেরারী অথবা আত্মগোপন করেছে যাতে আটকাদেশ কার্যকর করা যাচ্ছে না, সেই ক্ষেত্রে সরকার অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-

(ক) লিখিতভাবে ঘটনা বিবৃতি করে আটকাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তি সাধারণতঃ যে স্থানে বসবাস করেন সেই স্থানের এখতিয়ারের অন্তর্গত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন এবং তদাবস্থায় ফৌজদারী কার্যবিধি ৮৭/৮৮/৮৯ ধারা ঐ ব্যক্তি এবং তার সম্পত্তির উপর কার্যকর হবে যেন আটকাদেশটি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রেরিত একটি গ্রেফতারী পরোয়ানা।

৮ ধারা : আটকাদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যথাশীঘ্র সম্ভব আদেশে ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে যে সব হেতুর উপর আটকাদেশ প্রদান করা হয়েছে তা উল্লেখ করে ১৫ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে জানাবেন। তবে শর্ত থাকে, যে সমস্ত ঘটনা জনস্বার্থ বিরোধী বলে কর্তৃপক্ষ মনে করেন সেই সমস্ত ঘটনা কর্তৃপক্ষ জ্ঞাপনে বাধ্য নহে।

৯ ধারা : উপদেষ্টা পরিষদ গঠন ঃ আবশ্যক বোধে সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন। উপদেষ্টা পরিষদ তিন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত হবে। যাদের মধ্যে দু'জন এমন ব্যক্তি হবেন যাঁরা হাইকোর্ট বিভাগের জজ ছিলেন বা আছেন বা উক্তপদে নিয়োগ প্রাপ্তিযোগ্য এবং অন্যজন হবেন প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে নিয়োজিত একজন জেষ্ঠ্য কর্মকর্তা এবং তারা সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। সরকার উপদেষ্টা পরিষদের একজনকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করবেন।

১০ ধারা : উপদেষ্টা পরিষদের নিকট প্রেরণ : এই আইন অনুসারে প্রদত্ত প্রতিটি আটকাদেশের ক্ষেত্রে আদেশ দানে ১২০ দিনের মধ্যে সরকার উপদেষ্টা পরিষদের নিকট আটকাদেশের কারণসমূহ এবং আদেশে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির নিবেদন থাকলে, তা সোপর্দ করবেন।

১১ ধারা : উপদেষ্টা পরিষদের কার্যপদ্ধতি : উপদেষ্টা পরিষদ তার নিকট পেশকৃত তথ্যাবলি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট থেকে অতিরিক্ত তথ্য তলব করে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ দিয়ে আটকাদেশের ১৭০ দিনের মধ্যে উপদেষ্টা পরিষদ সরকারের নিকট তার রিপোর্ট পেশ করবেন।

১২ ধারা : উপদেষ্টা পরিষদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কার্যউপদেষ্টা পরিষদের মতে কোন ব্যক্তিকে আটক রাখার পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল হলে সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির

www.pathagar.com

আটকাদেশ অনুমোদন করে পরবর্তী যে কোন মেয়াদে আটক রাখতে পারবেন। উপদেষ্টা পরিষদের মতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আটক রাখার প্রয়োজন নেই মর্মে প্রতিবেদন দাখিল হলে সরকার আটকাদেশটি প্রত্যাহার করবেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবিলম্বে মুক্তি দিবেন।

১৩ ধারা : আটকাদেশ যে কোন সময় সরকার কর্তৃক প্রত্যাহার বা সংশোধিত করা যেতে পারে।

১৪ ধারা : সরকার যে কোন সময় আটকাবদ্ধ ব্যক্তিকে শর্তাধীনে বা নিঃশর্তভাবে সাময়িক মুক্তি দিতে পারেন।

১৫ ধারা : অন্তর্ঘাতমূলক কাজ : নিম্নলিখিত সম্পদের কার্যক্ষমতা ব্যাহত করা বা সম্পদগুলির ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি কোন কাজ করতে পারবে না।

(ক) কোন ভবন, গাড়ী, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি বা অন্য সম্পত্তি বা সরকারি কাজে ব্যবহারের জন্য জিনিসপত্র বা সরকার বা স্থানীয় সংস্থা বা রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প বা বাণিজ্য সংস্থার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বা ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত দ্রব্যাদি বা জিনিসপত্র।

(খ) কোন রেলপথ, ঝুলন্ত রজ্জু পথ, রাস্তা, খাল, সেতু-কালভার্ট, বাঁধ-সেতু, বন্দর, ডকইয়ার্ড, বাতিঘর, বিমান ঘাঁটি, টেলিগ্রাফ লাইন বা খুঁটি বা টেলিভিশন বা বেতার প্রতিষ্ঠান।

(গ) কোন রেলওয়ে, জাহাজ বা বিমানের গাড়ি।

(ঘ) কোন ভবন বা অন্য সম্পত্তি যা অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন, বিতরণ ও সরবরাহের জন্য বা কোন ময়লা নিষ্কাশন কাজে ব্যবহৃত সম্পত্তি।

(ঙ) কোন নিষিদ্ধ বা সংরক্ষিত স্থান বা এলাকা।

(চ) পাট, পাটজাত দ্রব্য, পাটের গুদাম, পাটকল বা পাট বেলিংপ্রেস।

যদি কোন ব্যক্তি এই ধারার কোন বিধানের লংঘন করে তাহলে মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা চৌদ্দ বছর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদে কারাদন্ড হবে এবং তদুপরি তাকে অর্থদন্ডেও দন্ডিত করা যাবে।

১৯ ধারা : ধ্বংসাত্মক সমিতিসমূহ নিয়ন্ত্রণ : সাময়িকভাবে বলবৎ অন্য কোন আইনে কোন কিছু থাকা সত্ত্বেও, যেই ক্ষেত্রে সরকার কোন সংঘ বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সন্তুষ্ট হন যে, ঐ সংঘটি এমনভাবে কাজ করতে পারে বা জনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষতিকর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে বা এমন বিপদ সংঘটন করতে পারে, সেই ক্ষেত্রে সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে শুনানী করে সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উক্ত সংঘকে যেভাবে আদেশে উল্লেখ করেন ঐভাবে, ছয়মাস এর ঐরূপ কার্যকলাপ স্থগিত রাখার নির্দেশ দিতে পারেন। এই ধারার প্রদত্ত আদেশ লংঘন করলে তাকে তিন বছর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অর্থ দন্ড বা উভয় দন্ডই প্রদান করা যাবে।

২০ ধারা : কতিপয় সংঘ বা সমিতি গঠনে নিষিদ্ধকরণ :

(১) রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে কোন ব্যক্তি ধর্মের নামে বা ধর্মের উপর ভিত্তি করে কোন সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোন সংঘ বা ইউনিয়ন গঠন করতে বা উহার সদস্য হতে বা অন্যভাবে উহার কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

(২) সরকার যে ক্ষেত্রে নিশ্চিত হন যে, এই ধারার বিধান লংঘন করে কোন সংঘ বা ইউনিয়ন গঠন করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য শুনে সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উক্ত সংঘ বা ইউনিয়ন বাতিল করে দিতে পারেন এবং উহার সমস্ত তহবিল ও সম্পত্তি সরকার বরাবরে বাজেয়াপ্ত হবে।

www.pathagar.com

(৩) একটি সংঘ বা ইউনিয়ন ভেঙ্গে দেবার পর যদি কোন ব্যক্তি ঐ সংঘ বা ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হিসেবে নিজেকে পরিচিত করেন বা তেমন সংঘ বা ইউনিয়নের পক্ষে কাজ করেন বা অন্য কোনভাবে উহার কাজে অংশগ্রহণ করেন, তবে তিনি তিন বছর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ডে বা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

২১ ধারা : সংরক্ষিত স্থান সমূহ।

২২ ধারা : সংরক্ষিত এলাকা।

২৩ ধারা : ২১ এবং ২২ ধারার বিধানসমূহ বলবৎ করণ।

২৪ ধারা : সান্ধ্য আইন।

২৫ ধারা : মজুতদারী বা কালোবাজারী ব্যবসার নিমিত্ত দণ্ড।

২৫ (ক) ধারা : টাকার নোট এবং সরকারি স্ট্যাম্প জাল করার জন্য দন্ড।

২৫ (খ) ধারা : চোরাচালানের জন্য দন্ড।

২৫ (গ) ধারা : খাদ্য, পানীয়, ওষুধ বা প্রসাধনী দ্রব্যে ভেজাল দেয়া বা বিক্রয়ের জন্য দন্ড।

২৬ ধারা : অত্র আইনের অপরাধসমূহ এবং কতিপয় অপরাধ বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন।

২৭ ধারা : বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কার্য পদ্ধতি।

২৮ ধারা : বিশেষ ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতাসমূহ।

২৯ ধারা : বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কার্যক্রমে বিধির প্রয়োগ।

৩০ ধারা : আপীল ও মৃত্যুদন্ড অনুমোদন।

৩০ (ক) ধারা : সরকারের দন্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করার ক্ষমতা।

৩১ ধারা : নতুন করে বিচারে বাঁধা।

৩২ ধারা : অপরাধসমূহ আমলযোগ্য এবং জমিনে অযোগ্য।

৩৩ ধারা : সরকার সমীপে পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক রিপোর্ট।

৩৪ ধারা : আদালতের এখতিয়ারের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা।

৩৫ ধারা : বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা।

৩৬ ধারা : বাতিল ও সংরক্ষণ।

উপরোল্লিখিত আইনের ব্যাপকাকৃতির সংজ্ঞাগুলো আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মানবাধিকার লংঘনের পথকেই সব সময় আরো প্রশস্ত করেছে। বিনা বিচারে আটক রাখার আইন তথা নিবর্তনমূলক আইনের অস্তিত্ব দীর্ঘদিনের। ১৯৩৯ সালে ভারত রক্ষা আইন ও বিধিও প্রণীত হয়েছিল। ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারি তে বৃটেনে কমিউনিস্টদের বড় ধরনের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের পরও তথায় বিনা বিচারে আটক রাখার আইন জারী করা হয়নি। এই উপমহাদেশে বরাবরই শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থে ও প্রয়োজনে নিবর্তনমূলক আইনের অপপ্রয়োগ ঘটে আসছে এবং এই উপমহাদেশের বিভিন্ন হাইকোর্ট ও সুপ্রীমকোর্ট তাদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য বরাবরই অক্ষুণ্ন রেখেছে। নিবর্তনমূলক আইনে আটকাদেশের বিরুদ্ধে জেলা পর্যায়ের ফৌজদারী বা দায়ের আদালতগুলির বিচার এখতিয়ার নেই। সেজন্যই বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি আশ্রয় নিয়েছে হাইকোর্টে ও সুপ্রীম কোর্টে। ব্যারিস্টার শওকত আলী খানের আটকাদেশের বিরুদ্ধে তাঁর স্ত্রী মিসেস রওশন বিজয়া খান কর্তৃক আনীত মোকদ্দমায় পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্ট ১৯৫৮ সালের ইষ্ট পাকিস্তান পাবলিক সেফটি অর্ডিন্যান্স এর ৪১ ধারাকে এখতিয়ার বহির্ভূত ও বাতিল বলে ঘোষণা করেছিলেন।

www.pathagar.com

বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রসঙ্গে হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের কয়েকটি নজির বা রুলিং উল্লেখযোগ্য।

(১) আটকাদেশের কারণ সুস্পষ্ট ও যথেষ্ট হতে হবে, অন্যথায় আটকাদেশ বেআইনী ও অন্যায়কর হবে। ২৮ ঢাকা ল' রিপোর্ট (ডি.এল.আর.) ৪৮।

(২) আটকাদেশকারী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা বহির্ভূত আটকাদেশ বেআইনী ও অনিয়ম। আটকাদেশ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে। ২৮ ডি.এল.আর. ৪২৮।

(৩) মূল আটকাদেশ বেআইনী হলে সরকার কর্তৃক পরবর্তী অনুমোদন ইহা আইনানুগ করতে পারে না। ২৭ ডি.এল.আর. ৪৯৬।

(৪) আটককৃত ব্যক্তির ক্ষতিকর বক্তৃতার সারসংক্ষেপ আদালতে উপস্থিত করা না হলে আটককৃত ব্যক্তির অস্বীকৃতি আটকাদেশের বৈধতা অপ্রমাণ করে। ২৭ ডি.এল.আর-২৯১।

(৫) আটকাদেশের সঙ্গে আটকের কারণ উল্লেখ করতে হবে। আটকাদেশের ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা বেআইনী। ৩৮ ডি.এল.আর-৯৩।

(৬) আটকাদেশ পুর্ণনিরীক্ষণের জন্য উপদেষ্টা পরিষদ গঠনে ব্যর্থ হলে ১২০ দিনের পর কোন ব্যক্তিকে আটকাবদ্ধ রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। ৩৯ ডি.এল.আর-৫১।

(৭) আইনের অবশ্য পালনীয় বিধান উপেক্ষা করে কোন আটকাদেশ দেয়া হলে ফৌজদারী কার্যবিধি ৪৯১ ধারা মতে সেই আদেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার এখতিয়ার আদালতের আছে। ৩৮ ডি.এল.আর. ৯৩।

(৮) বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২ (চ) (৮) ধারা অনুসারে ব্যাংক ঋণ পরিশোধ না করা রাষ্ট্রীয় ক্ষতিকর কার্য নহে বিধায় ঋণ পরিশোধ না করলে কোন ব্যক্তিকে আটক করা চলবে না। ৭ বাংলাদেশ কেস রিপোর্ট (বি.সি. আর) ২৫১।

হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ তাদের পূর্বসূরীর আমলে জারী করা আইনটি বাতিলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। সংসদ নির্বাচনের আগে জনগণের কাছে ওয়াদা করেছিল যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করা হবে। কিন্তু ক্ষমতার তাজ পরে তারা প্রতিশ্রুতি থেকে দূরে সরে যেতে বেশি সময় নেয়নি। তাদের দুঃশাসন বিরোধী আন্দোলন যাতে সংগঠিত হতে না পারে তার জন্য কৌশলে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আইনের নজিরবিহীন অপব্যবহার শুরু করে। এক্ষেত্রে প্রথমে বিরোধী দলে নেতা-কর্মীকে গ্রেফতারের জন্য 'নাশকতামূলক কাজে জড়িত'-কাহিনী প্রচার করে দমন অভিযানের সূচনা করে। প্রথম থেকেই সরকার রাজনৈতিক আক্রোশ মেটাবার হাতিয়ার হিসেবে বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে আইনটির অপপ্রয়োগ করা আব্যাহত রাখে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন, দাতা সংস্থা, পশ্চিমা দেশসমূহের চাপ সত্ত্বেও আইনের অপপ্রয়োগ কমেনি বরং বেড়েছিল।

পাবনার কাশীনাথপুরে বিদ্যুতের টাওয়ার ভেঙ্গে পড়ার কারণে বেশ কয়েকদিন সেখানে বিদ্যুত সরবরাহ বন্ধ ছিল। জার্মানীর ফ্যাসিস্ট শাসক এডলফ হিটলারের নীতি ছিল প্রতিপক্ষকে নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা। হত্যাকান্ডকে জনগণের কাছে জায়েজ করার লক্ষ্যে মিথ্যা প্রচারণা করার জন্য তিনি প্রচার সচিব গোয়েবলসীকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। গোয়েবলসী মিথ্যাকে এমনভাবে সাজিয়ে প্রচার করতেন যা মিথ্যা বলে জনগণের কাছে মনে হতো না। তখনকার টাওয়ার ভেঙ্গে পড়ার ঘটনাকে নাশকতামূলক কাজ অভিহিত করে গোয়েবলসী কায়দায় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল বিরোধী দল এগুলো করেছে। আর এ

www.pathagar.com

ঘটনায় জড়িয়ে সরকার ২০ মার্চ ১৯৯৭ বিশেষ ক্ষমতা আইনে বিএনপির চার নেতা খন্দকার মোশারফ হোসেন, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, মীর্জা আব্বাস ও আব্দুল মান্নানকে গ্রেফতার করেছিল। কিন্তু হাইকোর্টে বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হক ও মোঃ হাসান আমীন সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ চার নেতার আটকাদেশকে অবৈধ, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বেআইনী বলে রায় দেন। নজিরবিহীন রায়ে ৭ এপ্রিল রাত সাড়ে ৮ টায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তারা মুক্তি পান। অন্য একটি মামলা থাকার কারণে গয়েশ্বর চন্দ্র রায় মুক্তি পাননি। ১৯ মার্চ বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২৩ মার্চ হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। হরতাল বানচাল করার জন্যে সরকার তাদের গ্রেফতার করেছিল-এ রায় থেকে তা প্রমাণিত হয়। বিএনপির চার নেতাকে গ্রেফতারের ব্যাপারে দেশে-বিদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে নিয়ে জানতে চায়, কি কারণে তাদেরকে আটক করা হয়েছে। রাষ্ট্রদূতের জবাব মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর গ্রহণ করেনি। লন্ডনভিত্তিক অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল এই গ্রেফতারের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে। বিচারকদের রায়ে মামলাটি অসৎ উদ্দেশ্যে ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার হীন উদ্দেশ্যে রুজু করায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে আটক চারজনকে ১ লাখ টাকা করে প্রদান করার জন্যে সরকারের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তান থেকে ফিরে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, হরতালের কারণে তাদের গ্রেফতার করা হয়নি। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। আদালতে এটর্নী জেনারেল ব্যারিস্টার কেএস নবী তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণে সক্ষম হননি। তাই আদালত নির্দেশ দেন অন্য কোন মামলা না থাকলে তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার জন্যে।

চার নেতার মুক্তি আদেশ সম্পর্কে দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা ৮ এপ্রিল 'ব্যতিক্রমী রায়' শীর্ষক সম্পাদকীয় নোটে উল্লেখ করে বলে, 'কোর্ট থেকে একটি ব্যতিক্রমী রায় এসেছে। এর আগে বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের আটকাদেশ অবৈধ এবং অন্য মামলা না থাকলে মুক্তি দেয়া হোক-এরকম রায়ই দেয়া হয়েছে। গতকাল বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হক ও বিচারপতি মোঃ হাসান আমীন বিএনপির চার নেতা খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মির্জা আব্বাস, আব্দুল মান্নান ও গয়েশ্বর রায়ের আটকাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে ব্যতিক্রমী রায়টি দিয়েছেন। বলা হয়েছে, চার নেতাকে মুক্তি দিতে হবে এবং এদের আটক রাখার জন্যে জনপ্রতি এক লাখ টাকা করে জরিমানা সরকারকে পরিশোধ করতে হবে। সরকারের অবস্থা দাঁড়িয়েছে, 'কিছু না খেয়ে গ্লাস ভেঙে জরিমানা দেয়ার মতো'। গত ক'বছরে বাংলাদেশের সুপ্রিম/হাইকোর্ট কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ রায়/সিদ্ধান্ত দিয়েছে। ১৪৭ এমপি'র পদত্যাগ সংক্রান্ত রায়, স্পীকারের রুলিং সম্পর্কে সিদ্ধান্ত, প্রেসিডেন্ট প্রেরিত রেফারেন্স সম্পর্কে রায়-এগুলো বাংলাদেশের বিচার বিভাগের সজীবতা, নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতার পরিচায়ক। গতকাল কোর্ট থেকে যে সিদ্ধান্ত এসেছে এটিও যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব পাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রধানমন্ত্রী ক'দিন আগে বলেছিলেন '৭৪-এর বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিলের প্রশ্নই আসে না। অনেকে বলছেন, প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যই সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে আওয়ামী লীগপন্থী আইনজীবীদের পরাজয়ের কারণ হয়েছে। সরকার বলেছিল, সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিএনপির চার নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মুখে বললেও কার্যত তাদের আটক দেখানো হয়েছে বিশেষ ক্ষমতা আইনে। এই আইন প্রথম থেকেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রয়োগ হয়ে এসেছে। আজকের প্রধানমন্ত্রীর দলের নেতা-কর্মীরাও একসময় এই আইনে নিগৃহীত হয়েছেন। বলা হয়েছে, আইন ভালো না মন্দ সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা

www.pathagar.com

হলো কিভাবে, কার হাতে সেটা প্রয়োগ হচ্ছে। চীনের সদ্যপ্রয়াত নেতা দেং-এর সেই বিখ্যাত সাদা-কালো বিড়াল ও উন্নয়ন সম্পর্কিত মন্তব্যের মতো। দেং বলেছিলেন, বিড়াল সাদা না কালো এটা বড় কথা নয় আসল কথা হলো ইঁদুর ধরে কিনা। চীনে দেং-এর মন্তব্য সঠিক প্রমাণিত হলেও বাংলাদেশে বিশেষ ক্ষমতা আইন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক উক্তি যে যথার্থ হয়নি তা সম্ভবত কোর্টের গতকালের রায় থেকে স্পষ্ট হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে তার আন্তরিকতার, ব্যক্তিগত সততা ও আত্মবিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটলেও 'সিষ্টেমের' কাছে ব্যক্তির সততা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনেক সময়ই অকার্যকর হয়ে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী হয়তো ব্যক্তিগতভাবে কাউকে অত্যাচার করতে চান না। কিন্তু হাতিয়ারটি হাতের কাছে থাকলে অনেকেই তা ব্যবহার করতে যে সুযোগ মতো প্ররোচিত করেন এই দৃশ্যও বাংলাদেশে বারবার দেখা যাচ্ছে। বিশেষ ক্ষমতা আইন একটি কালো আইন। আজকে যারা এই আইনে অত্যাচারিত হচ্ছেন তারাও এক সময় অন্যের বিরুদ্ধে এটি প্রয়োগ করেছেন। কোর্টের গতকালের রায় এই অন্ধ আইন বাতিলের প্রয়োজনীয়তার প্রতি আবারো একটি ইঙ্গিত দিয়েছে'।

ড. মোশাররফ হোসেন গং ব্যক্তিদের আটকাদেশকে অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের প্রদত্ত আদেশটি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। যদিও আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল দায়ের করা হয়, তবুও বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এ.টি.এম. আফজাল ২৮ মে ১৯৯৭ বার কাউন্সিলের রজত জয়ন্তী উৎসবে এ ধরনের আদেশকে বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ যে ঐতিহাসিক রায় দিয়েছিল এরপরও সরকারের টনক নড়েনি। বরং প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে আবারো জোর গলায় বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল না করার খায়েশের কথা উচ্চারণ করেন। যুক্তি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যেহেতু পূর্ববর্তী কোনো সরকারই আইনটিকে বাতিল করেনি, সেহেতু বুঝতে হবে যে, এর মধ্যে অবশ্যই ভালো অনেক কিছু রয়েছে। 'ভালো অনেক কিছু'-নীতিকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ আইনটি বাতিল না করে এর প্রয়োগ করেছে প্রয়োজন দেখা দেয়া মাত্র।

শরীয়তপুর জেলার একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দু'টি মামলায় দেখা গেছে, এখানে বিশেষ ক্ষমতা আইনের অপপ্রয়োগ করা হয়েছে। জাজিরা থানার ওসি কর্তৃক পরপর দায়েরকৃত দু'টি মামলায় ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ আসামীদের জামিন মঞ্জুর করার লক্ষ্যে শুনানির জন্য উত্থাপিত হলে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ওসির বাড়াবাড়িতে বিরক্তবোধ করেন। আসামীদের জামিন মঞ্জুরের আদেশ প্রদান করে তিনি এই উপলক্ষে তার আদেশে যে মন্তব্য করেন, তা বস্তুত দেশব্যাপী হয়রানিমূলক মামলা-মোকদ্দমারই একটি চিত্র। প্রথম মামলায় দেখা যায়, ছয়জন আসামীর বিরুদ্ধে ডাকবাংলোয় তাস খেলার অভিযোগ রয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে আইনের ধারা প্রয়োগ করতে গিয়ে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে ওসি বিশেষ ক্ষমতা আইনের ধারা বসিয়ে দিয়েছেন। অপর মামলার বিষয়বস্তু ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশামায় উল্লেখ নেই। দু'টি মামলার আসামীদের জামিনের বিষয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রথম মামলার জামিন আদেশে ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করেছেন এই বলে যে, 'রাষ্ট্রপক্ষ জানান যে, ডাকবাংলোর খ্যাতি নষ্ট করতে আসামীগণ জুয়া খেলছিল। এজাহারে দেখা যায় যে আসামীগণ রান্নাঘর থেকে ধৃত হয়। আসামীগণ রান্নাঘরে ঢুকতে গিয়ে বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল কিনা, ডাকবাংলোতে দায়িত্বে নিয়েজিত চৌকিদারের সহায়তা গ্রহণ করেছিল কিনা তা উল্লেখ নেই'। তিনি আরো মন্তব্য করেন, 'সমগ্র আরজি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, আসামীগণের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

জেরা আইনের ৩,৪ ধারায় অপরাধ বর্ণনাপূর্বক আকস্মিকভাবে বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫ (১) (ক) এর ৩ ধারা সংযোজিত হয়েছে ... কিন্তু বিশেষ ক্ষমতা আইনের আকস্মিক সংযোজনের প্রেক্ষিতে অনুমতিমূলক কোন আলামত জব্দ কিংবা কোথাও কোন আলামত আসামীগণ লুকায়িতভাবে রেখেছে কি-না এ বিষয়ে কিছুই উল্লেখ নেই। সম্পূর্ণ সঙ্গতিবিহীনভাবে আকস্মিক ও কোন সাজুয্য ব্যতিরেকে বিশেষ ক্ষমতা আইন সংযোজন সম্পূর্ণরূপে সন্দেহকৃত একটি প্রভাব তুলে ধরে'। তিনি আরো মন্তব্য করেন, 'আসামীগণ হেবিচুয়াল অফেনডার নয়। এমতাবস্থায় বিশেষ ক্ষমতা আইনটির প্রয়োগ একটি অপপ্রয়োগ বিশেষ বলে প্রতীয়মান হয়'।

ডিটেনশন দেওয়ার ক্ষেত্রে কতটুকু অনিয়ম করা হয়েছে তা একটি পরিসংখ্যান দেখলেই সহজে অনুমেয়। ১৯৯৮ সালের নভেম্বর মাসে দেশের সবগুলো কারাগার থেকে পাওয়া হিসাব অনুযায়ী দেখা যায়, ১ নভেম্বরে দেশের কারাগারগুলোতে ডিটেনশনপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ছিল ৭৭৫ জন। অথচ এর আগের মাসে ডিটেনশনপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ছিল ৬৯২ জন। শতকরা ৯০টি ডিটেনশন ফাইলের কেসে স্বরাষ্ট্র সচিব সফিউর রহমান লিখেন, 'আটকাদেশের মেয়াদ বাড়ানো যাবে না'। কিছু জেলা প্রশাসক বিশেষ ক্ষমতা আইনে এমন সব ব্যক্তিকে 'ডিটেনশন' দেন যাদের বিরুদ্ধে থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা রয়েছে। এসব মামলা তদন্তাধীন বা বিচারাধীন। স্বরাষ্ট্র সচিব বিনা বিচারে আটকাদেশ আইনের যথাযথ ব্যবহারের না করার নির্দেশ দিয়ে এ আইনের অপব্যবহার না করার জন্য ডিসিদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন। কয়েকজন ডিসির সতর্কতার অভাবে চুরি মামলার আসামীকে পর্যন্ত ডিটেনশন দেয়া হয়। টঙ্গী থানা এলাকার ফ্যাক্টরী শ্রমিক কাজী শামসুল হককে ১২ নভেম্বর ডিটেনশন দেয়া হয়। তার বিরুদ্ধে একটি চুরি মামলা ছিল থানায়। ডিসি তাকে এক মাসের ডিটেনশন আদেশ দেন। এরপর তার ডিটেনশন আদেশ বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। ১০ ডিসেম্বর শামসুল হকের ফাইলে স্বরাষ্ট্র সচিব লিখেন, 'এর বিরুদ্ধে যে মামলা রয়েছে তাতে আর আটকাদেশ মেয়াদ বাড়ানোর অবকাশ আছে কি?' এছাড়া ডিটেনশনের প্রথম দিকে বেশ কয়েকটি ফাইলে আটকাদেশ বাড়ানোর ব্যাপারে তীব্র আপত্তি প্রকাশ করা হয়। মাদারীপুর জেলা ও পুলিশ প্রশাসন তিনজন ডিটেনশপ্রাপ্ত আসামীর মুক্তির জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানান। যথারীতি এই তিনজনের মেয়াদ বাড়ানো হয়নি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা ঐ তিনজন ডিটেনশনপ্রাপ্ত আসামীর ফাইল খতিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। হাসিনার আমলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডিটেনশনপ্রাপ্ত আসামীদের ফাইল ও তথ্য আসলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডিটেনশন ফর্ম যথারীতি পূরণ করেননি জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা। এতে এসব ফাইল রিভিউ করার সময় নানারকম আইনী জটিলতায় পড়তে হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে। জেলা প্রশাসন থেকে ডিটেনশনপ্রাপ্ত ব্যক্তির ফাইল ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর বিধান রয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হবার পরও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পৌঁছানো হয়নি। টেলিফোনে তাগিদ দিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আনাতে হয়েছে।

বিশেষ ক্ষমতা আইনে ১৯৯৮ সালে গ্রেফতার করা হয় ৬ হাজার ৭ শ' ৪০ জনকে। জুলাই ও আগষ্ট (১৯৯৯) দু'মাসে প্রায় ১ হাজার ১শ' ৮১ জনকে গ্রেফতার করা হয় বলে ২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ দৈনিক দিনকাল উল্লেখ করেছে। ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত বিএনপির চেয়ারপার্সনের তথ্য উপদেষ্টা, বিশিষ্ট সাংবাদিক আনোয়ার জাহিদকে তিনবার বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৯৮ সালের অক্টোবর মাসে ২৯ মিন্টো রোডের বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকারি বাসভবন বসে ঢাকা স্টেডিয়াম উড়িয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র

www.pathagar.com

করেছেন অভিযোগে আনোয়ার জাহিদ ও জাগপা নেতা শফিউল আলম প্রধানকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৯৯ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর ৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী '১৯৯৮ সালের মানবাধিকার চর্চা সম্পর্কিত প্রতিবেদন' প্রকাশ করে। বাংলাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য সার্ভিসের (ইউসিস) পরিচালক কিন ক্যানন এই বার্ষিক প্রতিবেদনের বাংলাদেশ অংশটি একটি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে বিতরণ করেন। বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার ও আটকাদেশ প্রসঙ্গে রিপোর্ট বলা হয়, 'সরকার নাগরিকদের বিরুদ্ধে কোনরকম আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা ছাড়াই তাদেরকে আটক করার জন্য জাতীয় নিরাপত্তা আইন, বিশেষ ক্ষমতা আইন ব্যবহারসহ জোরপূর্বক লোকজনকে গ্রেফতার এবং আটক করা অব্যাহত রেখেছে। সংবিধানে বলা হয়েছে যে, তার পছন্দের আইনজীবী নিয়োগের সুযোগ দিতে হবে, ২৪ ঘন্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেট আটকাদেশ অব্যাহত রাখার বিষয়টি অনুমোদন না করলে তাকে মুক্তি দিতে হবে। এই সমস্ত চাহিদা পূরণের কথা থাকলেও সাংবিধানিক নির্দিষ্ট রক্ষাকবচসহ নিবর্তনমূলক আটক অনুমোদন করে। বাস্তবে কর্তৃপক্ষ প্রায়ই এমনকি-নিবর্তনমূলক আটকের ক্ষেত্রেও এসব সংবিধানক ধারা লংঘন করে থাকে'।

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের (ব্লাস্ট) লিগ্যাল এডভাইজার ড. শাহদীন মালিক ১৯৯৯ সালের জুনে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, 'দেশে প্রতি মাসে গড়ে ৩শ' ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার হয়ে ডিটেনশনপ্রাপ্ত হচ্ছে। বিশেষ ক্ষমতা আইনটি জারীর আগে বলা হয়েছিল এই আইনটি কতগুলো বেআইনী কার্যকলাপ বন্ধের উদ্দেশ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনে দ্রুত বিচার এবং কার্যকর সাজা প্রদানের উদ্দেশ্যে জারী করা হলো। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে বিশেষ ক্ষমতা আইনটি একদিকে বিভিন্ন শাসক দল তাদের প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য ব্যবহার করেছে আর অন্যদিকে পুলিশ এ আইনের সুযোগে নিরীহ জনসাধারণকে হয়রানি করে কালো টাকা উপার্জন করেছে। অভিযোগ রয়েছে জেলা প্রশাসকের গাড়ির চালকের সাথে কলহ অথবা জেলা প্রশাসকদের নানা দুর্নীতির প্রতিবাদ করে অনেকেই ডিটেনশনের শিকার হয়েছেন। সম্প্রতি হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে একটি ফুটবল খেলার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে ফুটবল খেলোয়াড় কাছম আলী ডিটেনশনের শিকার হয়েছেন। তাকে পুলিশ ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে ডিটেনশন দিয়েছে। ডিটেনশন জায়েজ করার জন্য তার বিরুদ্ধে ডাকাতির মামলাসহ একাধিক পুরনো মামলায় জড়িয়ে দিয়েছে। উচ্চ আদালতে দায়েরকৃত ডিটেনশনের মামলাগুলো পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ না এনে ঢালাও অভিযোগ দাখিল করেছে। তাছাড়া কোন পরস্থিতিতে উচ্চ আদালতকে জামিন বা আটকাদেশকে অবৈধ ঘোষণা করতে হয়, তা সম্প্রতি আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত কাজী এবাদুল হকের একটি রায়ে স্পষ্ট। প্রণজিৎ বড়ুয়া বনাম রাষ্ট্র মামলার রায় (১৯৯৮) বিচারপতি বলেন, প্রণজিতের আটকাদেশে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ আসামীকে জঘন্য অপরাধী, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, হাইজ্যাকার হিসেবে বর্ণনা করেছে। এমনও বলেছে, তার ভয়ে তার বিরুদ্ধে কোর্টে কেউ সাক্ষ্য দিতে সাহস পায় না। অথচ এসব অভিযোগের সপক্ষে স্থানীয় থানা, গোয়েন্দা সংস্থা বা সিআইডির কোনো রিপোর্ট নেই। এই সাক্ষ্য প্রমাণহীন অবস্থায় সরকার কাউকে সন্ত্রাসী হিসেবে উল্লেখ করে বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক রাখতে পারে না। তাই প্রণজিতের আটকাদেশকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়।

www.pathagar.com

১২ জুলাই ১৯৯৯ ব্যারিস্টার ওমর সাদাত সরকারের ধারাবাহিক সংবিধান লঙ্ঘনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে নিজেই আবেদনকারী হয়ে বিশেষ ক্ষমতা আইনকে অবৈধ ও অসাংবিধানিক ঘোষণা করার আবেদন জানিয়ে হাইকোর্ট ডিভিশনের বিচারপতি ফজলুল করীম ও বিচারপতি মোহাম্মদ আলী আসগর খানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে রীট পিটিশন পেশ করলে আদালত ধৈর্য্য সহকারে দীর্ঘ আড়াই ঘন্টা আবেদনকারীর বক্তব্য শোনার পর এ ব্যাপারে এটর্নী জেনারেলকে জবাবদানের নিদের্শ দেন। এ সময় সরকারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি এটর্নী জেনারেল গোলাম মোস্তফা। রীট পিটিশনে বিশেষ ক্ষমতা আইনের প্রতিরোধমূলক আটকাদেশ সম্পর্কিত ধারাসমূহ তথা ২/ছ এবং ধারা ৩ থেকে ১৪/ক অবৈধ এবং অসাংবিধানিক ঘোষণা করার আবেদন করা হয়। ওমর সাদাত বিশেষ ক্ষমতা আইনকে সংবিধানের ২৭, ৩১ এবং ৩২ ধারার লঙ্ঘন হিসেবে উল্লেখ করে উক্ত আইনটিকে সংবিধানের ২৬ নং ধারা অনুসারে বাতিল ঘোষণার আবেদন জানান। আবেদনকারী উল্লেখ করেন, আইনটি গত ২৫ বছরে প্রতিটি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হয়রানি ও নিজস্ব দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে অপব্যবহার করে এসেছে এবং ক্ষমতাসীন হলে এই আইন রদ করার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বারংবার ভঙ্গ করে এসেছে। ওমর সাদাত ১৯৭৪-১৯৯৮ সালের একটি পরিসংখ্যান আদালতের সামনে তুলে ধরে বলেন যে, শতকরা ৯৯ ভাগ ক্ষেত্রে হাইকোর্ট সরকারকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিয়েছেন এবং শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রে আটকাদেশসমূহকে অবৈধ অথবা আইনের পরিপন্থী হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আইনের অবৈধ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন যে, গত তিন বছরে শতকরা ১ ভাগ আটকাদেশও বৈধ ঘোষণা করা হয়নি। এটি বিচার বিভাগীয় অনুমোদনের একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। আবেদনে আরো বলা হয়, বিশেষ ক্ষমতা আইন জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ, আইনের দৃষ্টিতে ক্ষমতা সমতা, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার প্রভৃতি সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং মৌলিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় রদ ঘোষিত হবার যোগ্য।

১৯৯৭ সালে বিএনপির সংসদ সদস্য সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী বিশেষ ক্ষমতা আইন সংশোধন করে এই আইন অপব্যবহারকারীদের অর্থদন্ড আরোপের প্রস্তাব করে একটি বেসরকারি বিল জমা দেন সংসদে। এ বিলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য বেসরকারি সদস্যদের বিল এবং প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটির উদ্যোগে একটি সংসদীয় সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই সাব-কমিটির রিপোর্টসহ মূল কমিটির রিপোর্ট ৭ সেপ্টেম্বর ২০০০ সংসদে উপস্থাপন করে বিলটি সংসদে অনুমোদন না করার সুপারিশ করে সংসদীয় কমিটি।

কমিটির রিপোর্টে দেয়া তথ্য থেকে দেখা যায়, ১৯৭৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি প্রণীত ও বলবৎ হওয়ার দিন থেকে ১৯৯৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে এ আইনের আওতায় মোট ৯১ হাজার ৭৬৫ জনকে আটক করা হয়েছে। কিন্তু আটককৃতদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ থাকার কারণে হাইকোর্টের আদেশে মুক্তি পেয়েছে ২০ হাজার ৬৯৩ জন এবং সরকারি আদেশে মুক্তি পেয়েছে ২৮ হাজার ৭১৪ জন। উল্লেখিত সময় পর্যন্ত উপদেষ্টা বোর্ডের সামনে হাজির করা হয় ২২ হাজার ১০৫ জনকে। এদের মধ্যে ১৬ হাজার ৯৫ জনকে উপদেষ্টা বোর্ড মুক্তির আদেশ দেয়। বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক ব্যক্তিদের মধ্যে আটকাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মোট ৯ হাজার ৫৭৩ জন মামলা করেন। হাইকোর্ট ৯ হাজার ১৭৬ জনের আটকাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে মুক্তির আদেশ দেন। কমিটির রিপোর্টের পরিসংখ্যানে জানানো

www.pathagar.com

হয়, ১৯৯৬-১৯৯৮ সাল পর্যন্ত তিন বছরের ১১ হাজার ৭৩৩ জনকে আটক করা হয়, এই সময়ে হাইকোর্টের আদেশে ৮ হাজার ৫৫৬ ব্যক্তিকে মুক্তি দেয়া হয়।

কমিটি আটকাদেশ অবৈধ ঘোষিত হওয়ার ১৬টি কারণও চিহ্নিত করে। নির্বাচিত ১০০টি মামলার পর্যালোচনায় দেখা গেছে, সর্বোচ্চ ৩৮টি আটকাদেশ বাতিল হয়েছে অস্পষ্ট, অনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট নয়-এমন অভিযোগের কারণে। রাজনৈতিক কারণে ১১টি আটকাদেশের পর্যালোচনায় বেরিয়ে এসেছে ৪টি বিশেষ কারণ-ভিত্তিহীন কারণে আটক করা, রাজনৈতিক সমালোচনার জন্য আটক করা, আটকের কারণ ও সরকারি বক্তব্যে অমিল এবং আটকাদেশের সমর্থনে সরকারি বক্তব্য হাইকোর্টে উপস্থাপন না করা।

রিপোর্টে ১৯৭৪-১৯৯৮ সালের মার্চ পর্যন্ত কারাগারে বন্দীদের মৃত্যুবরণ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে বলা হয়, ৭০৪ জন হাজতী, ৫৪৯ জন কয়েদী ও ৩১ জন ডিটেনু মৃত্যুবরণ করেছে। ফাঁসিতে মৃত্যুদন্ড কার্যকর হয়েছে ৩৫৪ জনের। স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে ১ হাজার ৫৪৯ জনের এবং অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে ৮৯ জনের। অস্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারীদের ৭৩ জন কারা বিদ্রোহে, ৪ জন গুলিবর্ষণে, ৫ জন আত্মহত্যা করে, ৭ জন আঘাতজনিত কারণে মৃত্যু হয়। ফাঁসিতে যাদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয় তাদের মধ্যে সামরিক অফিসার ১৪ জন, সৈনিক ২৩১ জন, কর্পোরেল ২৬ জন এবং বেসামরিক ও অন্যান্য ব্যক্তি ৮০ জন। ১৯৭৪-১৯৯৮ পর্যন্ত ১৩১ বন্দী কারাগার থেকে পলায়ন করে। এদের মধ্যে ৭৬ জন হাজতী, ৫০ জন কয়েদী ও ৫ জন ডিটেনু।

কমিটির সুপারিশমালায় বলা হয়, বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রয়োগকালে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ গভীরভাবে মনোনিবেশ ও যথেষ্ট সতর্ক দৃষ্টি না দেয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু লোক হয়রানির শিকার হয়েছে, যা উপদেষ্টা বোর্ড ও হাইকোর্টের প্রাপ্ত তথ্য হতে প্রতীয়মান হয়। সেটা যাতে আর না হয় সে জন্য বর্ণিত আইনটি প্রয়োগকালে প্রয়োগকারী কর্মকর্তাগণ যাতে অধিক যত্নবান হন। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া হাইকোর্টে রীট আবেদনকারী প্রায় সকলের আটকাদেশ অবৈধ ঘোষণা করা সত্ত্বেও সংসদীয় কমিটি এই আইন বহাল রাখার পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেছে, সমাজে বিশেষ কিছু অপরাধ ও অপরাধী আছে যে, অপরাধ ও অপরাধীকে নিবৃত্ত করার জন্য রাষ্ট্র পরিচালনাকারীদের নিকট বিশেষ কিছু আইন-বিধান থাকা প্রয়োজন।

সংসদীয় কমিটিতে আইনটির পক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত বলেছেন, 'আমরা অপরাধ ও অপরাধীকে অপরাধী হিসেবে গণ্য না করে এটাকে রাজনৈতিক রূপ দিতে অভ্যস্ত। রাজনীতি যখন সংঘাত ও দ্বন্দ্বমূলক অবস্থায় পৌছেছে তখন রাষ্ট্রের হাতে এ ধরনের ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন কেবলমাত্র অপরাধীদের অপরাধ সংঘটিত না করার জন্য।'

এতে আরো বলা হয়, বিল প্রণয়নকারী সদস্য অর্থদন্ড আরোপের যে প্রস্তাব করেছেন তা গৃহীত হলে আইনটি প্রয়োগের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাঝে অনাহূত ভীতির সঞ্চার হতে পারে। এতে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে যে ক্ষেত্রে আইনটির যথোপযুক্ত প্রয়োগে শিথিলতা দেখা দিতে পারে। ফলে রাষ্ট্র পরিচালনায় জটিলতা দেখা দিতে পারে।

১৭ ডিসেম্বর ২০০০ ঢাকাস্থ বৈদেশিক সংবাদদাতা সমিতির সদস্যের সঙ্গে আলোচনাকালে শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'বিশেষ ক্ষমতা আইনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমরা এ আইন তৈরি করেছিলাম। তাই এ আইন বাতিলের প্রশ্নই উঠেনা। আমরা বাতিলের চিন্তা-ভাবনাও করছি না।'

www.pathagar.com

সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ সরকারের একটি লীভ পিটিশন খারিজ করে সাবেক প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান পল্লীবন্ধু এরশাদের জামিনের আদেশ বহাল রাখেন। প্রধান বিচারপতি মাহমুদুল আমীন চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত আপীল বিভাগের ফুল বেঞ্চ ২৮ মার্চ ২০০১ এ আদেশ প্রদান করেন। একই সাথে আদালত সরকারকে চরমভাবে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করেন। জনতার টাওয়ার মামলায় আপীল বিভাগ পল্লীবন্ধু এরশাদের বিরুদ্ধে সাড়ে ৫ কোটি টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে ৬ মাসের কারাদন্ড প্রদান করে। ৩ মাস কারাভোগের পর পল্লীবন্ধু এরশাদ জরিমানার অর্ধেক পরিমাণ টাকা পরিশোধ করে মুক্তি পাওয়ার জন্য আদালতের কাছে প্রার্থনা করলে আদালত তা মঞ্জুর করে। পল্লীবন্ধু এরশাদের পক্ষে পৌণে ৩ কোটি টাকা জমা দেয়া হলে আদালত থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশ প্রদান করে। কিন্তু সরকার পল্লীবন্ধু এরশাদকে মুক্তি না দিয়ে মঞ্জু হত্যা মামলাসহ দু'টি মামলায় আটকাদেশ প্রদান করে। আদালত এ দু'টি মামলাও পল্লীবন্ধু এরশাদকে জামিন প্রদান করে। সরকার এরপরও পল্লীবন্ধু এরশাদরকে মুক্তি দেয়নি। বরং আদালতের আদেশকে অমান্য করে সরকার পল্লীবন্ধু এরশাদকে কোন কারণ ছাড়াই বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটকাদেশ প্রদান করে ১ মাসের ডিটেনশন দেয়। পল্লীবন্ধু এরশাদের পক্ষ থেকে এ ডিটেনশনের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট রীট পিটিশন দায়ের করা হলে আদালত সরকারের প্রতি কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করে এবং পল্লীবন্ধু এরশাদকে মুক্ত দেয়ার নির্দেশ দেয়। সরকার হাইকোর্টের এ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগে লীভ টু আপীল পিটিশন দাখিল করে। আপীল বিভাগ উভয়পক্ষের আইনজীবীদের শুনানি গ্রহণের পর সরকারের দাখিল করা আপীল খারিজ করে দেয় এবং পল্লীবন্ধু এরশাদের ব্যাপারে হাইকোর্টের জামিনের আদেশ বহাল রাখে। এ আপীলের শুনানিকালে প্রধান বিচারপতি সরকার পক্ষের আইনজীবীদের তিরস্কার ও র্ভৎসনা করেন। পল্লীবন্ধু এরশাদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে সরকারের আটকাদেশ প্রদানকে মানবাধিকার পরিপন্থী, বেআইনী ও সংগতিপূর্ণ নয় বলে প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন। প্রধান বিচারপতি সরকার পক্ষের আইনজীবী এডিশনাল এটর্নী জেনারেল মাহবুবে আলমকে আটকাদেশের কারণ জানাতে বললে তিনি বলেন, 'আমি আটকাদেশের কারণ সম্পর্কে জানি না। তা না দেখে কিছু বলতে পারব না।' প্রধান বিচারপতি বলেন, 'এরশাদতো আগে থেকেই কারাগারে রয়েছেন। তার দ্বারা দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার তো কোন কথা নয়। তারপরও তার বিরুদ্ধে আটকাদেশ প্রদান করাটা সরকারের সংকীর্ণ মনের পরিচায়ক।'

www.pathagar.com

এমপির বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ

১৫ মার্চ ১৯৯৯ আওয়ামী নেতা সুনামগঞ্জ-৫ আসন থেকে নির্বাচিত এমপি মুহিবুর রহমান মানিকের ছাতকের মণ্ডলীভোগের ২০০ উদয়াচল আবাসিক এলাকার বাসায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছিল। এই বিস্ফোরণে তাৎক্ষণিকভাবে মারা যায় সিলেটের যুবলীগ কর্মী আরিফ হায়দার ও আবুল কালাম আজাদ। মানিকের মামাতো ভাই আবু লেইছ গুরুতর আহত হয়। ঘটনার দিন সাংসদ মানিক ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। সেনাবাহিনীর বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ দল মানিকের বাসভবন অনুসন্ধান শেষে বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে উল্লেখ করে রিপোর্ট দেয়। এ রিপোর্টের পরপরই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার প্রেক্ষিতে ছাতক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুস সালাম বাদী হয়ে ২৬ মার্চ বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩, ৪ ও ৬ ধারায় একটি মামলা করেন। মামলা নম্বর ১১। পুলিশ চাইলে সেনাবাহিনীর বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ দল (এ সময় বিশেষজ্ঞ দল প্রশিক্ষণে বাইরে থাকায়) তখন অনুসন্ধানে আসতে পারেনি। ফলে ১৬ মার্চ পুলিশ লাশ দুটো উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়। এ সময় পুলিশ বেশ কিছু বোমা তৈরির উপকরণ উদ্ধার করে এবং বিস্ফোরণস্থল বাসার দোতলা সীল করে দেয়। ২৩ মার্চ সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞ দল ছাতক যায় এবং ২৪ তারিখ পর্যন্ত তাদের অনুসন্ধান চালায়। ৯ সদস্যের এ বিশেষজ্ঞ দলের নেতৃত্ব দেন মেজর মোহাইমিন। অনুসন্ধানকালে সেনাবাহিনীর সদস্যরা বেশ কিছু বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করে বাইরে নিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। এছাড়া বিনষ্ট বোমা তৈরির উপকরণ ও তিনটি কিরিচ উদ্ধার করে। বিশেষজ্ঞ দল ২৪ তারিখই ফিরে যায়। সেনাবাহিনীর বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ দল ফিরে গিয়েই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট প্রদান করে। রিপোর্টের বিষয়বস্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পুলিশ সদর দপ্তরকেও অবহিত করা হয়। বোমা বিস্ফোরণ ঘটনায় দায়ের করা মামলার এজাহারে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে, 'গত ১৬ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ ঘটনাস্থল থেকে প্রাপ্ত ও জব্দকৃত আলামত, ঘটনাস্থলের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, নিহত ২ জনের এবং জখমীদের দেহের জখমী স্থানের বিবরণ ও ঘটনার সময় ইত্যাদির প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনাস্থলে বিস্ফোরক দ্রব্য সংরক্ষণ করে ককটেল প্রস্তুতকালে এ ঘটনা ঘটেছে।' এজাহারে আরো বলা হয়, 'ঘটনাস্থল হলো এমপি মুহিবুর রহমান মানিকের বাসভবন। তিনি ছাতক-দোয়ারাবাজার এলাকা থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং আওয়ামী লীগের সদস্য। তার বিপক্ষ গ্রুপের প্রভাবের কারণে ইতিপূর্বে তিনি থানা সদরে সভা-সমাবেশ করতে ব্যর্থ হন। বোমা বিস্ফোরণে নিহত আবুল কালাম ওরফে বাবুল ২০ বছর ধরে এমপি মানিকের ভাই পরিচয়ে একই ভবনে বসবাস করলেও বাবুল প্রকৃত অর্থে এমপি'র কোনো আত্মীয় নয়। আর নিহত অপরজন আরিফ হায়দার এমপি'র গ্রুপের লোক। তার সাথে নিহত বাবুলের সম্পর্ক ছিল। সে একজন কুখ্যাত সন্ত্রাসীও। এই ঘটনার পর থেকে গোপাল নামে এমপি মানিকের একজন ঘনিষ্ঠ লোক রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়েছে। নিহত বাবুলের সঙ্গে গোপালকে চলাফেরা করতে দেখা যায়। আর আহত আবু লেইছ চৌধুরী এমপি মানিকের মামাতো ভাই। এই ৩ জন ছাড়া অজ্ঞাত অপর এক ব্যক্তি এমপি'র বাসভবনের দ্বিতল কক্ষে অন্যের জান-মালের ক্ষতি করে প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক দ্রব্য সংরক্ষণ করে এবং

www.pathagar.com

ককটেল প্রস্তুতকালে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে বোমার বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হয়ে বাবুল ও আরিফ দু'জনই ঘটনাস্থলে মারা যায়।'

২৭ মার্চ মানিক এক সংবাদ সম্মেলনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং সুনামগঞ্জের পুলিশ সুপারের অপসারণ দাবী করেন। বিকালে সিলেট সার্কিট হাউসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মানিক আবারো বলেন, তাকে হত্যার জন্যই পরিকল্পিতভাবে এই বোমা হামলা করা হয়েছে। তিনি এ ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করে বলেন, তাতে তিনি ন্যায় বিচার পাবেন। মানিক বলেন, ২০/২৫ বছর ধরে তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত কিন্তু কখনো এমন বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হননি। একটি বিশেষ মহল দীর্ঘদিন ধরে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। কিন্তু এই বিশেষ মহলটি কে তা তিনি সরাসরি না বললেও তার দলেরই একাংশের প্রতি ইঙ্গিত করেন। ছাতকের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কথা উল্লেখ করে মানিক বলেন, এ জন্য সুনামগঞ্জের পুলিশ সুপার দায়ী। তিনি বলেন, সুনামগঞ্জের বর্তমান পুলিশ সুপারের বিষয়ে ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদসহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করলেও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বরং পুলিশ সুপারকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। মানিক বলেন, তাকে রাজনৈতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সুনামগঞ্জের পুলিশ সুপার উঠে পড়ে লেগেছে। মানিকের বাসভবন থেকে পুলিশ যে বোমা তৈরির উপাদন এবং সর্বশেষ সেনাবাহিনীর অনুসন্ধানে বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার হয়েছে সে সম্পর্কে তার মতামত জানতে চাইলে মানিক 'নতুন করে একেকটা নাটক মঞ্চস্থ করা হচ্ছে' বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'আমার বাড়ি কোনো অস্ত্রাগার নয়। এ বাসায় আমি ১০ বছর ধরে বসবাস করি।' এ সবই পুলিশের কারসাজি উল্লেখ করে মানিক বলেন, পুলিশ সুপার উদ্দেশ্যমূলকভাবে এসব ঘটনার অবতারণা করছেন। তার মতে, পুলিশ বাইরে থেকে এনে এসব তার বাসভবনে রেখেছে। সাংসদ মানিক বলেন, তার বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র চলছে তা তিনি আগামী সংসদ অধিবেশনে উত্থাপন করবেন। বোমা বিস্ফোরণে নিহত আরিফ হায়দার কেন তার বাসায় গিয়েছিল সে প্রশ্নের জবাবে মানিক বলেন, তিনি তা জানেন না। আরিফের পারিবারিক সূত্রে বলা হয়েছে, বিয়ের দাওয়াত দিতে আরিফ সেখানে গিয়েছিল। এ ব্যপারে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, 'আরিফকে আমি জীবনেও দেখিনি। তাছাড়া আমার পরিবারের কারো সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।' পুলিশ বাদী হয়ে চারজনের বিরুদ্ধে মামলার ব্যাপারে তার মতামত জানতে চাইলে মানিক বলেন, এ মামলার দরকার কি? তিনি বলেন, মামলা করলে এসপিকে আসামী করে মামলা করা উচিত। এদেরকে আসামী করা হবে কেন? এ মামলাকে পুলিশের 'থ্রেট' হিসেবে তিনি আখ্যায়িত করেন। সংবাদ সম্মেলনে থানা আওয়ামী লীগের এক গ্রুপের সভাপতি, বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য নেতা উপস্থিত ছিলেন।

২৯ জুলাই মানিকের বাসায় বোমা বিস্ফোরণে হতাহতের মামলায় সিআইডি মানিকসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জশীট প্রদান করে। এই ঘটনার পৌর কমিশনার জগদীশকে চার্জশীট থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। সিআইডি'র কুমিল্লা অঞ্চলের এএসপি ও এসআই মামলার তদন্তকারী অফিসার আমিনুল ইসলাম সুনামগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এই চার্জশীট দাখিল করেন। এই মামলার চার্জশীট ভূক্ত আসামীরা সবাই মানিকের নিকটাত্মীয়। এরা হচ্ছে মামাতো ভাই আবু লেইছ চৌধুরী, মানিকের দূর সম্পর্কের ফুফাতো ভাই বিপ্লব, বেল্লা ও গোপাল। এই ঘটনার ৩০টি আলামত জব্দ করা হয়। এই মামলায় বাদীসহ ৪১ জন সাক্ষী রয়েছে। মামলার চার্জশীটে বলা হয়, 'এমপি মানিক ছাতকে রাজনৈতিকভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য বোমা তৈরির সময় বোমা বিস্ফোরণে

www.pathagar.com

দু'জন নিহত এবং ১ জন গুরুতর আহত হয়।' চার্জশীটে আরো বলা হয়, 'এই মামলার আসামীরা মানিকের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও আপনজন। কিন্তু বোমা তৈরিতে এদের কোন স্বার্থ ছিল না। এমপি মানিকের রাজনৈতিক স্বার্থে বোমা তৈরি ও সংরক্ষণ করা হয়। তার অনুমতি এবং আর্থিক সাহায্য ছাড়া কোন অবস্থাতেই নিজ বাড়িতে বোমা বানানো সম্ভব নয় বলে চার্জশীটে উল্লেখ করা হয়। সিআইডি'র প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি নূরুল হুদা ও ডিআইজি কাজী নজরুল ইসলাম এবং এস এস (চট্টগ্রাম) কাজী বজলুর রহমানের তদারকিতে আইও আমিনুল ইসলাম, ইন্সপেক্টর এনায়েত রহমান চৌধুরী, ইন্সপেক্টর গোপাল চন্দ্র চৌধুরী, দারোগা রাকিব, দারোগা ইসমাইল ও দারোগা সগিরে নেতৃত্বে একটানা ২ মাস ২৭ দিন এই তদন্তকার্য চলে। ঘটনার পর সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসকসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনার পরদিন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে জর্দার কৌটা, মার্বেল পাথর, স্কচটেপ, প্যারাগসহ বিস্ফোরক তৈরির নানা উপকরণ এবং লাশ দু'টি উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়। অপরদিকে এই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় মানিক বাদী হয়ে আরো একটি মামলা দায়ের করেন। পরবর্তীতে দু'টি মামলাই সিআইডিতে স্থানান্তর করা হয়। এই মামলা দু'টির আইও নিয়োগ করা হয় এএসপি আমিনুল ইসলামকে। মামলাটি সিআইডিতে স্থানান্তর হবার পরপরই সিআইডি'র প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি নূরুল হুদা ঘটনাস্থলে সিআইডি'র একজন উর্ধ্বতন অফিসারের নেতৃত্বে একটি বিশেষ দল পাঠান। এরপর দলটি ফেরত আসার পর তাদের প্রদত্ত তথ্যের প্রেক্ষিতে সিআইডি'র প্রধান নূরুল হুদার নির্দেশে তদন্তকারী দল এমপি মানিককে দু'দফায় সিআইডির সদর দফতরে নিয়ে আসেন। সিআইডি'র সদর দফতরে প্রথম দিনে অতিরিক্ত আইজিপি নূরুল হুদা নিজেই এবং দ্বিতীয় দিনে সিআইডি'র ডিআইজি কাজী নজরুল ইসলাম ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এই দু'অফিসারের কাছে এমপি মানিকের প্রদত্ত তথ্যের বিরাট গরমিল ধরা পড়ে। এরপর সিআইডি'র প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আবু লেইছ চৌধুরীকে পুলিশ রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করার নির্দেশ দেন আইও আমিনুল ইসলামকে। কিন্তু আবু লেইছ চৌধুরী গুরুতর অসুস্থ থাকায় তাকে কিছুটা বিলম্বে পুলিশ রিমান্ডে নেয়া হয়। এর মধ্যে সিআইডি'র তদন্তকারী দল জাকারিয়া, বিপ্লব, বেল্লা ও জগদীশসহ ৪জনকে পৃথক পৃথকভাবে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য এমপি মানিকের প্রদত্ত তথ্য এবং স্বাক্ষ্য প্রমাণের প্রেক্ষিতে মানিককেও সিআইডি'র তদন্তকারি দল গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। ২৭ মে ভোরে সিআইডি মানিককে ছাতকে তার বাসা থেকে গ্রেফতার করে। বাসায় বোমা তৈরির সময় দু'মাস আগে ঘটা বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়। নিজের বাসায় বোমা তৈরির ব্যাপারে মানিকের সংশ্লিষ্ট থানায় যথেষ্ট প্রমাণাদি পাওয়ার পরই তাকে গ্রেফতার করা হয়। রাতে ৩টার দিকে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সিআইডির এএসপি আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে একদল পুলিশ মানিকের বাসাটি ঘিরে ফেলে এবং মানিকের বাসার টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ভোর পৌনে ৫টার দিকে মানিককে ঘুম থেকে তুলে গ্রেফতার করা হয়। এরপর সকাল ৬টার দিকে তাকে সুনামগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হয়। সকাল সোয়া ৭টায় সুনামগঞ্জের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট সঞ্জয় কুমারের সামনে হাজির করা হলে ম্যাজিস্ট্রেট মানিককে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। প্রথমে তাকে সুনামগঞ্জ কারাগারে পাঠানো হয় এবং বেলা দেড়টার সময় নেভি ব্লু পাজেরো (নং সুনামগঞ্জ গ-১১-০০৫) গাড়িতে করে কুমিল্লা কারাগারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় পুলিশের একটি লরি ও চারটি পিকআপ মানিকের গাড়ির আগে-পিছে ছিল। রাত ১০টা ২৫ মিনিটে পুলিশ তাকে নিয়ে কুমিল্লা কারাগারে পৌঁছে।

www.pathagar.com

মানিককে কুমিল্লা কারাগারের ৪নং কক্ষে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদায় রাখা হয়। সিআইডি বোমা বানানোর ঘটনার সঙ্গে মানিকের সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার পরই মানিককে গ্রেফতার করে। সিআইডি তদন্তে প্রমাণিত হয়, বাসায় বোমা তৈরির বিষয়টি মানিক জানতেন এবং তাতে তার প্রত্যক্ষ মদদ ছিল। এছাড়া বোমা বিস্ফোরণে নিহত আরিফ হায়দারকে মানিক চিনেন না বলে মন্তব্য করলেও তার সঙ্গে যে আরিফের সুসম্পর্ক ছিল এবং তার বাসায় নিয়মিত যাতায়াত করতো তাও তদন্তে প্রমাণিত হয়। বোমা বিস্ফোরণে নিহত আরিফ হায়দার পুলিশের খাতায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী হলেও সিলেটের যুবলীগ নেতা জগদীশ দাশ এবং মানিকের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মূলত আরিফ ছিল জগদীশ দাশের ক্যাডার। আর রাজনীতিতে মানিক ও জগদীশ একই গ্রুপে থাকায় দুজন মিলেই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে বাড়িতে বোমা তৈরির কারখানা গড়ে তোলেন। মানিককে গ্রেফতারের আগের দিন সিআইডি মানিকের চাচাতো ভাই ও মামাতো ভাইকে গ্রেফতার করে। এ দুজন স্বীকার করে যে, ঘটনার দিন নিহত আরিফ, বাবুল ও আহত আবুল লেইছ একসঙ্গে দোতলায় অবস্থান করছিল। একই দিন সিআইডি মানিকের বাসার কাজের মেয়ে মাজেদাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। পরে মাজেদা আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দেয়। মাজেদার বক্তব্য থেকেই পরিষ্কার হয় যে, মানিকের জ্ঞাতসারেই তার বাড়িতে বোমা তৈরি হতো। ঘটনার পরপরই মাজেদা দোয়ারাবাজার থানায় তার বাড়িতে চলে গিয়েছিল। মানিক গ্রেফতার হওয়ার সংবাদে আওয়ামী লীগ ছাতক কমিটির নেতা-কর্মীরা সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কের ধারণবাজারের কাছে রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে যানবাহন চলাচলে বাধা দেয়। জাউয়াবাজার-ধারণবাজার এলাকায় বিক্ষুব্ধ লোকজন যানবাহন ভাঙচুর করে। সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ছাতক শহরে ও সুনামগঞ্জ-সিলেট রোডে দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়। মানিকের সমর্থকরা সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কের কায়স্থকোণা এলাকাতেও রাস্তায় গাড়ি আটকিয়ে গাড়ির চাবি ছিনিয়ে নেয় এবং যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ সময় শত শত গাড়ি পথে আটকা পড়ে। প্রায় তিন ঘন্টা পর পুলিশ গিয়ে রাস্তার যান চলাচলের সুযোগ করে দিলে মানুষের দুর্ভোগের অবসান ঘটে। মানিককে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ছাতক থানা আওয়ামী লীগের মানিক গ্রুপ বিকেলে থানা সদরে প্রতিবাদ মিছিল বের করে। পরে বিকেল ৫টায় নাগরিক ফোরাম মানিককে গ্রেফতার করায় আনন্দ মিছিল বের করে। আনন্দ মিছিল কাস্টমস রোড এলাকায় যাওয়া মাত্র মানিক গ্রুপের লোকজন ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে। এ সময় দু'পক্ষের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষে কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়। হামলায় ছাতক থানার দারোগা রূপক ও সহকারী দারোগা মোশারফও আহত হয়। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে দু'গ্রুপকে দু'দিকে সরিয়ে দেয়। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মানিক গ্রুপ পুলিশের অবস্থানে হামলা চালায়। এ সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হলে পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে এবং দক্ষিণ খুরমা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আজরফ আলী, দোলার বাজার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল আজিজ, ডা. এম এ গণি, শামসুজ্জামান রাজা ও আজাদ মিয়াসহ আরো পাঁচজনকে গ্রেফতার করে। মানিককে গ্রেফতারের পর ছাতক থানা আওয়ামী লীগের মানিক বিরোধী গ্রুপ ও নাগরিক ফোরাম মিষ্টি বিতিরণ করে। পরের দিন নাগরিক ফোরাম মসজিদে ও উপাসনালয়ে শোকরানা প্রার্থনা করবে বলে ঘোষণা দেয়। এরই মধ্যে মানিকের সমর্থকরা ক্ষমতাসীন দলের এক শীর্ষ নেতাকে ছাতকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। তাদের নেতা মানিকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে তারা সুনামগঞ্জের পুলিশ সুপার আসাদুজ্জামানকেও অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে।

www.pathagar.com

নিরাপত্তা রক্ষায় গোয়েন্দা সংস্থার ব্যর্থতা

রাজনৈতিক স্বার্থে আওয়ামী সরকারকে খুশি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের কথা আবিষ্কারের বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করলেও সার্বিক জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে এসেছে। আওয়ামী শাসনের শেষ দিকে শুধুমাত্র সরকারি দলকে তোষামোদ ও সকল অঘটনে বিরোধী দলকে চিহ্নিত করার প্রাগৈতিহাসিক ধ্যান-ধারণার বাইরে গোয়েন্দা সংস্থা এমন কোন ইতিবাচক তৎপরতার সুসংবাদ জনগণের কাছে উপস্থাপন করতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার মৌলবাদীদের ষড়যন্ত্র, বোমা বিস্ফোরিত হলেই তালেবান-হরকাত কানেকশন, বিদ্যুৎ চলে গেলে বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের স্যাবোটাজ আবিষ্কারের মতো অতি উৎসাহী ভূমিকা পালন ছাড়া কোন গোয়েন্দা সংস্থাই সরকারের নয়-রাষ্ট্রের সংস্থা হিসেবে ভূমিকা রেখেছে এমন নজীর কোনক্ষেত্রেই নেই। দেশে যেভাবে একটির পর একটি বিশৃংখল পরিস্থিতি, বিশেষ করে স্যাবোটাজ, সাবভার্সনের ঘটনা ঘটেছে তাতে গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রের চোখ ও কান হিসেবে স্বীকৃত গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কেন সময়মত সতর্ক সংকেত প্রদান ও সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে পেশাদারিত্বের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয় সে ব্যাপারে স্বয়ং সরকারের উচ্চ মহল পর্যন্ত সন্দিহান হয় উঠে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ব্যর্থতাকে নিরেট বাস্তব হিসেবে মেনে নিলেও নিরপেক্ষ বিশ্লেষকগণ এক্ষেত্রে গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের যোগ্যতার চেয়ে সুনির্দিষ্ট ইন্টেলিজেন্স নীতিমালার অনুপস্থিতি ও সরকারি পর্যায়ে গোয়েন্দা সংস্থাকে অপব্যবহারের প্রসঙ্গকেই সকল বিতর্কের উৎস বলে চিহ্নিত করেন। কারণ, স্বাধীনতা লাভের ৩০ বছর পেরিয়ে গেলেও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়নি। তাই দেশের অন্যতম দুটি গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই ও এনএসআইসহ অপরাপর সংস্থাগুলো চলেছে সমন্বয়হীনভাবে।

আওয়ামী শাসনামলে পুলিশ বিভাগের ৩টি গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে দুর্নীতি ও ব্যর্থতার শীর্ষে ছিল ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি)। মামলা তদন্তের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিচিত এই সংস্থার অদক্ষতা ও গতিহীনতায় প্রায় স্থবির হয়ে পড়ে প্রতিষ্ঠানটি। অথচ অন্য সংস্থাগুলো ব্যর্থ হলে বা মামলা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলে সেসব অপরাধ তদন্ত করার কথা সিআইডিরই। নিয়মিত চাঁদা আদায় থেকে শুরু করে ছিনতাইয়ের অভিযোগও ছিল সিআইডির বিরুদ্ধে। যেহেতু এই সংস্থা সর্বশেষ আশ্রয়স্থল সেহেতু ক্ষতিগ্রস্তদের অন্য কোথাও আর যাওয়ার সুযোগ থাকে না। ফলে বাধ্য হয়েই তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়। প্রায় ৫ হাজার সদস্যের বহর রয়েছে এই সংস্থায়। সংস্থার প্রধান একজন এডিশনাল আইজি। এর পরেই রয়েছেন একজন ডিআইজি। তারপরেই রয়েছেন পুলিশ সুপার পদমর্যাদার সাতজন কর্মকর্তা। যারা এসএস (স্পেশাল সুপার) হিসেবে পরিচিত। এই সাতজন এসএসকে সহযোগিতা করেন সাতজন অতিরিক্ত এসএস। সাতজন এসএস এর মধ্যে এসএস-ওয়ান প্রশাসনিক বিষয় দেখেন। ঢাকা মহানগরীসহ চট্টগ্রাম বিভাগের জন্য রয়েছেন এসএস চট্টগ্রাম। তেমনিভাবে

www.pathagar.com

এসএস রাজশাহী এবং এসএস খুলনা রয়েছেন। এছাড়াও এসএস ক্রাইম এবং সিলেট বিভাগ মিলে একজন এবং এসএস বিজ্ঞান পদে একজন কর্মরত রয়েছেন। এরা সবাই ঢাকার সিআইডি প্রধান কার্যালয়ে বসে তাদের কাজ নিয়ন্ত্রণ করেন। অতিরিক্ত এসএসগণও ঢাকায় বসেন। এছাড়া সিআইডির বৃহত্তর জেলা পর্যায়ে একজন করে সহকারী পুলিশ সুপার এবং ছোট জেলায় একজন করে ইন্সপেক্টর দায়িত্ব পালন করেন। সিআইডির এসব সদস্য মূলত অপরাধ নিয়ন্ত্রণের চেয়ে অপরাধ সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর তদন্তের বিষয়ে বেশি কাজ করে থাকেন। সিআইডি ১৪ ধরনের তফসিলভুক্ত মামলা তদন্ত করে থাকে। এগুলোর মধ্যে ডাকাতি, মুদ্রা অথবা স্ট্যাম্প জাল, বিষ প্রয়োগ, প্রতারণা, অবৈধ লাভের জন্য খুন, ইন্সুরেন্স প্রতারণা, ব্যাংক জালিয়াতি, নারী শিশু পাচার, অপহরণ, পুরাকীর্তি পাচার, মাদকদ্রব্য অপব্যবহার উল্লেখযোগ্য। সিআইডি তফসিলভুক্ত অপরাধের বাইরের মামলা বেশি তদন্ত করে থাকে। সিআইডির ফটোগ্রাফি, ফিঙ্গার প্রিন্টের ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় সব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, যা অন্য সংস্থার নেই। বরং অন্য সংস্থা মামলার তদন্তের প্রয়োজনে সিআইডির সাহায্য নিয়ে থাকে। তদন্তের ক্ষেত্রে সিআইডির দক্ষতা সাধারণ থানার চেয়েও খারাপ এবং বর্তমানে এটি একটি স্থবির প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে। তা ছাড়াও সিআইডি তদন্তের মামলা চার্জশিটভুক্ত আসামীদের সাজার হার যেমন কম তেমনি চার্জশিটের হারও কম। ফলে প্রায় ৮০ ভাগ মামলা আদালতে গিয়ে টেকে না। আওয়ামী শাসনামলে সিআইডি আদালত প্রাঙ্গণে শিশু তানিয়া ধর্ষণ মামলায় মরা নামের একজনকে গ্রেফতার করে বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া সিআইডির বিরুদ্ধে লন্ডন প্রবাসী এক বাঙালিকে আটকে রেখে টাকা আদায়, বিমানের টিকিট তৈরির সঙ্গে সিআইডির সদস্যদের জড়িত থাকা, লালবাগের অবৈধ কারখানা, হোটেলে নারী ব্যবসায়ী, নারী-শিশু পাচারকারীদের কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা আদায়ের ভুরি ভুরি ঘটনা ছিল।

বিভাগীয় মামলা তদন্তে অসদাচরণ, অদক্ষতা ও সীমাহীন দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেলেও সিআইডির দায়িত্বে নিয়োজিত অতিরিক্ত আইজিপি ফজলুল হকের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি আওয়ামী সরকার। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এলাকার লোক বলে ফজলুল হক অব্যাহতভাবে পদোন্নতি পেয়ে এ পদে আসীন হন। তিনি অতিরিক্ত আইজিপি প্রশাসন ও ভবিষ্যত আইজিপি হওয়ার স্বপ্নও দেখেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এলাকার লোক সুবাদে। অথচ হকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ যথাযথ তদন্ত হলে তার চাকরিই থাকার কথা নয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইনকিলাবে 'সার্জেন্ট সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগ ও এএসআই পদোন্নতি ক্ষেত্রে কয়েক কোটি টাকা ঘুষ গ্রহণ' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের পর সিআইডির নাম উল্লেখ করে ইনকিলাবের একজন সিনিয়র রিপোর্টারকে টেলিফোনে অজ্ঞাত ব্যক্তি অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও হুমকি প্রদর্শন করে। ফজলুল হক ১ মার্চ তার স্বাক্ষরিত প্রতিবাদলিপি শিরোনামে একটি ব্যাখ্যা পাঠান। যাতে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খন্ডন না করে তার সাফাই গেয়েছেন। ওই উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদে বা একই পদে চাকরি করার সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব ছাড়াও ডিজিএফআই-এরও তদন্ত প্রতিবেদনে তাকে অভিযুক্ত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশও কার্যকর হয়নি। ফজলুল হকের বিরুদ্ধে ১৯৮৮ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে (এনবিআর) উপ-পরিচালক পদে কর্মরত থাকার সময় তার বিরুদ্ধে অসদাচরণ, অদক্ষতা ও দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হয়। সুনামগঞ্জ ও ফরিদপুরের পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালেও দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ১৯৮৭

www.pathagar.com

সালের ১৪ জুন হকের বিরুদ্ধে আইজিপি'র প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ১৯৮৫ সালের সরকারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৩ (এ), ৩ (বি) ও ৩ (সি) ধারার বিধান অনুযায়ী একটি বিভাগীয় মামলা দায়ের করা এবং ৩ সদস্যের একটি তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়। এ প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র সচিব মোহাম্মদ আলী ১৯৮৮ সালের আগষ্ট মাসে এক চিঠিতে উল্লেখ করেন যে, উল্লেখিত তদন্ত কমিটি বিধিবহির্ভূতভাবে সুর্নির্দিষ্ট সময়সীমা ১৫০ দিন উত্তীর্ণ হওয়ার পরে তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করেছেন। ফলে হকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সময়মত নেয়া সম্ভবপর হয়নি। সচিব তার প্রতিবেদনে এই মর্মে উল্লেখ করেন যে, জনাব হকের বিরুদ্ধে গঠিত তদন্ত কারী বোর্ডের সদস্যের গাফলতি ও অবহেলার জন্য আইনের ব্যবহারিক প্রয়োগে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে অভিযুক্ত ওই পুলিশ কর্মকর্তা শাস্তি ব্যতিরেকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু অভিযুক্ত কর্মকর্তার General reputation ভাল নয়। অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় যথাসময় তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সবদিক বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর হত। স্বরাষ্ট্র সচিব উল্লেখিত অবস্থার প্রেক্ষিতে তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, অভিযুক্ত ফজলুল হককে কোন সাজা না দিতে পারলেও কেইসটির গুরুত্ব বিবেচনা করে অভিযোগপত্রটিও কেন তাকে শাস্তি দেয়া গেল না সে সম্পর্কে প্রতিবেদন তার (জনাব হক) ACR Dossier-এর রেকর্ডভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। একই সচিব ১৯৮৯ সালের ২৮ জানুয়ারি আর একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, উল্লেখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে কর্মকর্তা ফজলুল হককে চাকরি থেকে কেন বরখাস্ত করা হবে না এই মর্মে কারণদর্শাতে বলা হয় কিন্তু তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খন্ডনার্থে তিনি গ্রহণযোগ্য যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেননি এবং তদন্তকারী কর্মকর্তারা কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৭ (৪) ধারা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট দাখিল না করায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া যায়নি। একই কারণে বিধিমালার ৭ (৯) এর বিধান অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র সচিব কর্মকর্তাকে অভিযোগ থেকে আপনি আপনা মুক্ত বলে সরকারি একটি আদেশে স্বাক্ষর করেন। ফজলুল হক খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার থাকাকালে তার বিরুদ্ধে বিবিধ অব্যবস্থা ও অনিয়মসহ দুর্নীতির কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে ১৯৯৬ সালের ২৪ এপ্রিল প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদফতরের (পত্র নং ১৩০০/৬০/৩ প্যাঃ মিঃ) একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয় স্বরাষ্ট্র সচিব সৈয়দ রেজাউল হায়াতের কাছেও অনুলিপি দেয়া হয় আইজিএম আজিজুল হককে। ডিজিএফআই-এর একজন কর্ণেল স্বাক্ষরিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, কেএমপির কমিশনার জনাব ফজলুল হকের দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার উৎকোচ গ্রহণ এবং পুলিশ প্রশাসনে গ্রুপিং/লবিংসহ বিভিন্ন অবৈধ কার্যকলাপের কারণ অধীনস্থ পুলিশ সদস্যদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষের সঞ্চার হয়েছে এবং এ সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, কেএমপি কমিশনার থাকাকালে হক পুলিশ ফোর্সের কল্যাণ ফান্ড/প্রাইভেট ফান্ডের টাকা দিয়ে মেট্রো ভবনে ডিশ এন্টেনা, কার্পেট, ক্রোকারিজ, বিছানার চাদর এবং পর্দাসহ বিবিধ গৃহস্থালী সামগ্রী ক্রয় করেছেন ও ক্রয়কৃত কিছু সামগ্রী ঢাকাস্থ নিজস্ব বাসভবনে পাঠিয়েছেন। তিনি বিভাগীয় পরীক্ষা শেষে পদোন্নতিপ্রাপ্ত এসআই, এএসআই এবং কনস্টেবলদের মধ্যে উৎকোচ প্রদানের শর্তারোপ করেন এবং উৎকোচের টাকা প্রদানে বিলম্ব হওয়ায় তাদের পদোন্নতি প্রায় দুই মাস বিলম্বিত করেন। কেএমপির কমিশনার দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে হক এসআই ও কনস্টেবলদের বদলিসহ ডিসি নর্থ, ডিসি সাউথ এবং ডিসি সদর এর সব ধরনের আর্থিক ক্ষমতা লোপ করে অধীনস্থ পদস্থ কর্মকর্তাদের প্রায় সব ক্ষমতা

www.pathagar.com

কুক্ষিগত করেন। তিনি পুলিশ হাসপাতালের জন্য ওষুধ, খাদ্যসামগ্রী, পুলিশ মেসের লাকড়ি ও বিভিন্ন সামগ্রীক্রয়সহ কেএমপির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ কৌশলে তার মনোনীত ব্যক্তিদের (ঠিকাদার) মাধ্যমে করিয়ে শতকরা ৪০ ভাগ কমিশন নিতেন এবং কেএমপির অধিকাংশ যানবাহন মেরামতকারী রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত খুলনা নিউমার্কেটের অপর পার্শ্বে অবস্থিত দু'টি ওয়ার্কশপ থেকেও তিনি সরাসরি শতকরা ৫০ ভাগ দাবী এবং অন্যথায় বিল প্রদান না করার হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়াও প্রতিবেদনে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে নির্বাচনী ব্যয় উপলক্ষে কেএমপির বরাদ্দকৃত ৯ লাখ টাকার বিরাট অংশ ফজলুল হক তেল ক্রয়, ষ্টেশনারী ক্রয়, গাড়ি রিকুইজিশনসহ প্রভৃতি খাতের ভুয়া ভাউচার তৈরি করে আত্মসাৎ করেছেন বলে ডিজিএফআই-এর তদন্তে প্রমাণিত হয়। উল্লেখিত ও প্রমাণিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ও সার্বিকভাবে সরকারের ভাবমূর্তি রক্ষাকল্পে পুলিশ কমিশনার ফজলুল হককে অন্যত্র বদলি এবং তার পুরাতন কার্যকলাপের খতিয়ান এবং বিভিন্ন সম্পত্তির উৎস ও পরিমাণ নিরূপন করে নিরপেক্ষ তদন্তপূর্বক যথাযথ শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। ফজলুল হকের খুঁটির জোরের কারণে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাতো নেয়া হয়নি উপরন্তু শেষের দিকে তিনি অতিরিক্ত আইজিপি হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে পুলিশ সদর দফতরে গুরুত্বপূর্ণ অর্থেরই দায়িত্ব পান। সিআইডিতে বদলির পূর্বেও প্রায় দেড় বছরে তিনি তার পূর্বপ্রক্রিয়া অনুযায়ী বিপুল অঙ্কের অর্থ অসদুপায়ে উপার্জন করেন। সিআইডিতে এসে সার্জেন্ট ও সাব ইন্সপেক্টর নিয়োগের ক্ষেত্রেও তিনি একই দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন।

আওয়ামী আমলে পুলিশ বিভাগের অন্যতম গোয়েন্দা সংস্থা ডিকেটটিভ ব্রাঞ্চ (ডিবি) অন্য দুটি সংস্থার মতো আয়তনে বড়ো না হলেও দুর্নীতির এবং অবৈধ কাজের পরিধি অনেক বড়ো ছিল। মানুষ খুন থেকে শুরু করে চাঁদাবাজি, ছিনতাই, সাজানো মামলায় ফাঁসিয়ে অর্থ আদায়, টাকার বিনিময়ে চার্জশিট সাজানো এবং নিয়মিত টোল আদায়সহ এমন কোনো অপকর্ম নেই যা ডিবির তালিকায় ছিল না। ডিসি ডিবি সৈয়দ বজলুল করিমের দাপটে অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তারা কেঁপে উঠতেন। আর তার দাপটের প্রধান উৎস ছিল দলীয় সম্পৃক্ততা। সিনিয়র এসি ডিবি আকরাম হোসেনও ছিলেন অভাবনীয় ক্ষমতার অধিকারী। রুবেল হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে তার অহমিকার পতন ঘটে। দেশের প্রতিটি জেলা এবং মহানগরীতে ডিবির কার্যক্রম রয়েছে। ডিবি মূলত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পরে গুরুত্ব অনুযায়ী ঐ সব অপরাধের মামলা তদন্ত করে থাকে। ডিবির কাজ কিছুটা সিআইডির মতো। তবে সবক্ষেত্রে নয়। এসবি বা সিআইডি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থা। ঐ দুটি সংস্থার সারা দেশের কার্যক্রম ঢাকার প্রধান কার্যালয় থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু ডিবির ক্ষেত্রে তা নয়। ডিবির কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট জেলা বা মহানগরীতেই সীমাবদ্ধ। এই সংস্থার প্রতিটি জেলার পুলিশ সুপার এবং মহানগরীগুলোতে পুলিশ কমিশনার (অতিরিক্ত আইজি) ডিবির প্রধান হিসেবে কাজ করে থাকেন। কেবল মাত্র মহানগরীতে কিছুটা ব্যতিক্রম রয়েছে। এই মহানগরীতে ডিবির প্রধান পুলিশ কমিশনার হলেও ডিবির জন্য পৃথক একজন পুলিশ সুপার পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা রয়েছেন। যা অন্য তিন মহানগরীতে নেই। চট্টগ্রাম এবং খুলনা মহানগরীতে ডিবির একজন করে সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তা রয়েছেন। তিনিই পুলিশ কমিশনারের অধীনে থাকেন। এ ছাড়া অন্য এলাকায় এসপির অধীনে একজন করে ইন্সপেক্টর ডিবির দায়িত্ব পালন করেন। এই ইন্সপেক্টরের অধীনে রয়েছেন একাধিক সাব ইন্সপেক্টর এবং

www.pathagar.com

কনস্টেবল। রাজধানীর মিন্টু রোডে অবস্থিত ডি.বি.র পৃথক কার্যালয় রয়েছে। এখানে ডিসি ডিবি এবং তিনজন অতিরিক্ত ডিসি ডিবি বসেন। তাদের অধীনে রয়েছেন আটজন সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি)। এদের মধ্যে একজন জনসংযোগ কর্মকর্তা। বাকি সাতজনকে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকা ভাগ করে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া দুই ইন্সপেক্টরকে দিয়ে একটি বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে। যা সরাসরি ডিসির নিয়ন্ত্রণে। আওয়ামী শাসনামলে ঢাকা মহানগরীর ডিবি আর আগের মতো ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রুবেলকে পিটিয়ে হত্যা এবং এরপরই জালাল নামে এক ড্রাইভারকে হত্যার পর ডিবি অফিসের ছাদে পানির ট্যাঙ্কের ভিতর লাশ গুম করে হত্যার ঘটনায় ডিবি নতুন করে আলোচিত হয়ে ওঠে। এরপরেই ডিবিকে নতুন করে সাজানো হলেও তারা চরিত্র পাল্টায়নি। ডিবি সাধারণ লোককে ধরে এনে পিটিয়ে টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেয়। তাছাড়া ছিনতাই মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে বলে টাকা আদায়, চার্জশিটে টাকার বিনিময়ে নতুন কাউকে যুক্ত করা বা কাউকে বাদ দেওয়ার বিষয়টিও তারা করেছে। গুলশানের এক ব্যবসায়ীকে আটকে রেখে টাকা আদায়, মামলায় গ্রেপ্তারকৃত এক আসামীকে রিমান্ডে এনে তাকে নিয়ে ব্যাংকে গিয়ে টাকা উঠানোর ঘটনাও ঘটিয়েছে এই ডিবি। ট্রাক বোঝাই মালামাল আটকের পর গভীর রাতে ছেড়ে দেওয়া, দূতাবাসের নামে আনা কন্টেইনার মামলার তদন্তের নামে সাধারণ ব্যবসায়ীদের কাছে গিয়ে মামলায় ফাঁসানোর নামে টাকা আদায়, মতিঝিলে এক সাধারণ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৪ লাখ টাকা আদায়ের ঘটনাটি সর্বজনবিদিত।

বাংলাদেশের দুই প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই) এবং জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই)-এর ক্ষমতাবর্হিভূত বাড়াবাড়ি আওয়ামী শাসনামলে সবার নজর কাড়ে। আওয়ামী লীগও বিভিন্ন সময়ে কড়া সমালোচনা করে এই দুই গোয়েন্দা সংস্থার। তাছাড়া এই দুই গোয়েন্দা সংস্থার বাড়াবাড়িতে ক্ষোভ প্রকাশ করে বাংলাদেশ সরকারের সচিবরা। ২৩ মার্চ ১৯৯৯ অনুষ্ঠিত সচিবদের মাসিক সভায় সমালোচকরা বলেন, 'ডিজিএফআই এবং এনএসআই এর কাজের এলাকা সীমাবদ্ধ থাকলেও তারা সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়।' সচিবরা এই দুই সংস্থার চার্টার অফ ডিউটিজ নিয়ে প্রশ্ন তুলেন। তারা গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর বাজেট ও কার্যক্রমের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা আনার কথাও বলেন। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বা ব্যবস্থা গ্রহণের নানা বিষয়ে ডিজিএফআই এবং এনএসআইর ওপর সরকার নির্ভরশীল থেকেছে। বিএনপির নেতা আবদুল খালেককে আওয়ামী লীগে যোগদান প্রহসন নাটকের মূল প্রণেতা ছিল ডিজিএফআই এর কর্মকর্তারা। এ ধরনের নোংরা রাজনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য ডিজিএফআই অতীতে সমালোচিত হয়েছে ভীষণভাবে। এ রকম নানা কাজে তারা অধিক ব্যস্ত ছিল। এতে করে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাদের মূল দায়িত্ব জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা সন্ত্রাসী ঘটনাগুলোর অগ্রিম বা পরেও কোনো সঠিক তথ্য উপস্থিত করতে সক্ষম হয়নি। ধারণা করতে অসুবিধা হয় না যে, তাদের সকল তৎপরতার মূল লক্ষ্যই ছিল আওয়ামী সরকারের সন্তুষ্টি বিধানে সক্ষম রিপোর্ট প্রদান বা সরকারের পছন্দমতো এবং শুধু তাদের চাহিদা অনুযায়ী তৎপরতা চালিয়ে যাওয়া। তা না হলে কাজী আরেফ হত্যা, যশোরের উদীচী মঞ্চে বোমা হামলা ইত্যাদি ঘটনাগুলো কী করে ঘটতে পারতো? আওয়ামী সরকারের শাসনামলে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সামরিক-বেসামরিক দুই গোয়েন্দা সংস্থার ওপর তাদের বিশেষ নির্ভরশীলতার বেশ কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। যদিও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০

www.pathagar.com

ডিসেম্বর ১৯৯৮ এক সভায় বলেছিলেন, 'আমাদের প্রশাসনের গোয়েন্দা সংস্থার ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।' এখানে আরো উল্লেখ্যযোগ্য যে, শেখ হাসিনার রচিত বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৩০) তিনি উল্লেখ করেন যে, '(রাষ্ট্রপতি জিয়া) গোয়েন্দা সংস্থাকে নিয়ে দল গঠন করা এবং রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রক্রিয়া শুরু করেন ... গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআই ও ডিজিএফআই যা কি না পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এর মডেলে তৈরি করেন।' ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে শেখ হাসিনা আরো লিখেছেন, 'আজও দেশের রাজনীতি গোয়েন্দা সংস্থার নিয়ন্ত্রণে।' (সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো ২৫ মার্চ ১৯৯৯, দৈনিক ভোরের কাগজ ৯ ও১০ অক্টোবর, দৈনিক ইনকিলাব ৪ নভেম্বর ২০০০ ও দৈনিক ইনকিলাব ৭ এপ্রিল, দৈনিক ইনকিলাব ২৩ মে ২০০১)

www.pathagar.com

গণনিপীড়নমূলক জননিরাপত্তা আইন

হাসিনা সরকার 'বিদ্যমান আইনকে যুগোপযোগী করা প্রয়োজন'-বলে ১৯৯৬ সালে আইন সংস্কার কমিশন গঠন করেছিল। ১৯৯৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর কমিশনের চেয়ারম্যান পদ থেকে বিচারপতি এফ কে এম এ মুনিম পদত্যাগ করলে পরের বছর ১ মার্চ বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেনকে এই পদে নিযুক্ত করা হয়। কমিশন যে উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল তা রিপোর্টটি প্রকাশ দ্বারা সম্পাদন হয়েছিল। কমিশন তাদের রিপোর্টে ফৌজদারী কার্যবিধি আইন সংশোধনের সুপারিশ করেছিল কিন্তু তার অনেকগুলোই কার্যকর করা হয়নি। কমিশনের সুপারিশে দেরিতে বিচার হওয়ার যে ১০টি কারণ উল্লেখ করা হয়, তাতে প্রচলিত আইনের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছিল আইনের যথাযথ প্রয়োগ নেই বলে অথবা অন্য আরো কিছু কারণে বিচারে বিলম্ব হয়। ৩০ জানুয়ারি ১৯৯৯ জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কিত ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, 'চাঁদাবাজি, ছিনতাই, গাড়ি ভাংচুর ও টেন্ডারবাজি নিয়ে সবাই লিখেছে, সন্ত্রাস দমন করতে দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করতে বলছে, এর জন্য দ্রুত বিচারের বিধান করে আইন করা ছাড়া উপায় নেই।' কমিশনের সুপারিশ এড়িয়ে সরকার জননিরাপত্তা আইন পাস করেছে। প্রধানমন্ত্রী অপরাধ নিয়ন্ত্রণে দ্রুত বিচারের ব্যবস্থার যে কথা বলেছিলেন একই কথা বলেছে আইন কমিশন। কিন্তু কমিশনের সুপারিশকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি।

দেশে বিভিন্ন কালো আইনের কার্যকারিতা থাকা সত্ত্বেও হাসিনা সরকার বিতর্কিত ও নিবর্তনমূলক জননিরাপত্তা আইন-২০০০ নামক যে নিপীড়নের হাতিয়ার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল তা প্রথম থেকেই বিতর্কিত ছিল। আওয়ামী লীগ সংসদে মেজরিটির জোর দেখিয়ে জননিরাপত্তা আইনটি পাস করে। গোড়াতে আইনটি মন্ত্রীসভা অনুমোদন করলেও সবার সমালোচনার মুখে পরে তা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছিল। আপাতত আইনটি পাস হচ্ছেনা এ রকম অনুমান জন্মেছিল সবার মনে। কিন্তু পল্টনের জনসভায় বেগম খালেদা জিয়া 'চোরাবালীর আপোষ-আলোচনার প্রস্তাব' প্রত্যাখান করে এক দফা আন্দোলনের ডাক দিলে সংসদে বেসরকারি সদস্য দিবসে বিধিবহির্ভূতভাবে বিলটি আনা হয়।

৩০ জানুয়ারি ২০০০ জাতীয় সংসদে জননিরাপত্তা আইনের সমর্থনে বক্তব্যকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, জনগণের জন্যই এই আইন করা হয়েছে। সন্ত্রাস দমন করে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যত নির্মম হওয়া দরকার আমরা তা হতে চাই। আজকে যে আইন করছি তা হলো অপরাধীর বিচারের জন্য। বিলম্বিত বিচারের জন্য আমরা আইন করেছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আইন হলো জনগণের জন্য। শতবর্ষ ধরে জনগণের জন্যই আইন হচ্ছে। জনগণের অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমাদের। আজকে যে আইন দ্বারা আমরা দেশ পরিচালনা করছি, এই আইন অনেক পুরনো। এ জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। বিরোধী দলের বিরুদ্ধে, এমনকি কারো বিরুদ্ধে এই আইন ব্যবহার করা হবে না, আমরা এই আইন করছি জনগণের জন্য, সাধারণ মানুষের জন্য। এই আইন ব্যবহার করা হবে চাঁদাবাজ, টেন্ডারবাজদের বিরুদ্ধে। সুব্রত বাইনকে আমরা গ্রেফতার করেছিলাম। তাকে আটক রাখতে

www.pathagar.com

পারিনি। জামিন হয়ে যায়। উচ্চ আদালত তাকে আর গ্রেফতার না করতে নির্দেশ দেন। এসব ফাঁক-ফোকর বন্ধ করতে প্রচলিত অনেক আইন থাকা সত্ত্বেও আমরা এই আইন করছি। তিনি বলেন, দুনিয়ার কোনো দেশ নেই যেখানে মিলাদ মাহফিল পাহারা দিতে পুলিশ দিতে হয়। দেশের এ অবস্থায় এই আইনটি আমরা পাস করতে চাই। বস্তি থেকে সন্ত্রাসীরা বের হয়ে খুন করে। দেশের মানুষ এসব অবৈধ বসবাসকারী বস্তিওয়ালাদের দেখতে চায় না। উচ্চ আদালত সম্পর্কে আমি কিছু বলবো না। কিন্তু বস্তি উচ্ছেদ করতে গিয়ে আমার হাত-পা বেঁধে দেয়া হয়েছে।

জননিরাপত্তা আইন পাসের সময় কতিপয় মন্ত্রীসহ আওয়ামী লীগের ৪৫ জন সদস্য ও আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন আজ্ঞাবাহী দলটিও আইনের বিরোধীতা করে। আইনটি মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার অবশ্যই খর্ব করবে আজ্ঞাবাহী দলটির বিরোধীতায় তা স্পষ্ট হয়।

১ ফেব্রুয়ারি দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত সম্পাদকীয় বক্তব্য ছিল, 'সংসদে বিরোধীদলের অনুপস্থিতিতে বিতর্কিত জননিরাপত্তা বিল পাস করানো হইল। ইহা যে মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী একটি কালাকানুন এবং রাজনৈতিক কারণে ইহার অপপ্রয়োগ হইবে একমাত্র শাসক দল আওয়ামী লীগ ছাড়া সকল রাজনৈতিক দলই এই আশংকা করিয়াছে। সঙ্কটজনক রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে গৃহীত এই আইনটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইবে না এই আশ্বাসে কেহ আশ্বস্ত হইতে পারিতেছে না। বিশেষ ক্ষমতা আইনের যথেচ্ছ অপপ্রয়োগ হইতেছে.....আমরা মনে করি, সন্ত্রাস দমনে দেশে বিদ্যমান আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা গেলে এই জাতীয় আইনের কোন প্রয়োজন পড়ে না। কালাকানুনের খড়্গ আমাদের মাথার উপর হইতে কোনও সরকারই সরাইয়া নেয় নাই। ক্ষমতা পাকাপোক্ত করিবার হাতিয়ার হিসেবে সকলেই কালাকানুনেরই ব্যবহার করিয়াছে। যাহারাই ক্ষমতায় গিয়াছে তাহারাই সন্ত্রাসী, মস্তানদের নিজেদের দলে আশ্রয় দিয়া, প্রশ্রয় দিয়া সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ করিয়া তুলিয়াছে। সুশীল সমাজে সৃষ্টি করিয়াছে ভয়ভীতি, শঙ্কা! প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে এবং সাংবাদিকদের নিকট এই আইনের সাধু উদ্দেশ্য সম্পর্কে যত ভালো কথাই বলুন অতীতের দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতা আমাদের কিছুতেই আশ্বস্ত করিতে পারে না। এই আইনকে কেন্দ্র করিয়া বিরোধী দল প্রলম্বিত হরতালের ডাক দিয়াছে। আমরা সন্ত্রাস মুক্ত বাংলাদেশ চাই। আমরা চাই নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তা। আমাদের এই প্রত্যাশা কখনোই পূরণ হয় নাই। 'সন্ত্রাসী যে দলেরই হউক রেহাই নাই'-সরকারের শীর্ষ নেতাদের এই ঘোষণা যদি বাস্তবায়ন করা যাইত তাহা হইলে সন্ত্রাস এইভাবে মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে পরিত না। বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এই বিলে সম্মতি না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা জনগণের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া জননিরাপত্তা আইনটি বাতিল করিবার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছি।'

২ ফেব্রুয়ারি ২০০০ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক জনসভায়, জননিরাপত্তা আইনে বিএনপিকেই আগে শায়েস্তা করার হুঙ্কার করেন। একই জনসভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'খালেদা জিয়া, এরশাদ এবং গোলাম আযমদের ভয় পাইয়ে দেয়ার জন্যই নতুন আইন করেছেন শেখ হাসিনা।'

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী এডভোকেট আব্দুল মতিন খসরু ১০ ফেব্রুয়ারি দৈনিক ইনকিলাবকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেন, জননিরাপত্তা আইনের অপব্যবহার প্রতিরোধে ৩টা রক্ষাকবচ এই আইনের মধ্যেই রয়েছে। যে কোন আইন ব্যক্তি বা দল

www.pathagar.com

নির্বিশেষে সমভাবে প্রযোজ্য। জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতার কারণে অপরাধীদের দ্রুত বিচারের সার্বজনীন দাবীর প্রেক্ষিতে জননিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি বলেন, ভালো আইনও খারাপ হতে পারে, যদি এর অপপ্রয়োগ হয়। এ বিষয়টি চিন্তা করেই আইনটির অপব্যবহার রোধে রক্ষাকবচের বিধান রাখা হয়েছে।

জননিরাপত্তা আইনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অপব্যবহার করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে বলে বিরোধীদলসহ বিভিন্ন মহল যে সমালোচনা করেছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে আইনমন্ত্রী বলেন, আশংকা কোন যুক্তি নয়। তা সত্ত্বেও জননিরাপত্তা আইনটির অপব্যবহার হতে পারে এমন আশংকা থেকেই আইনে ৩টি রক্ষাকবচ রাখা হয়েছে; যাতে অপব্যবহার প্রতিরোধ করা যায়। এ তিনটি রক্ষাকবচ আইনের ১১, ১৩ (৫) ও ১৮ (৬) ধারায় রয়েছে।

১১ ধারায় উল্লেখ আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনে কোন মামলা বা অভিযোগের জন্য কোন ন্যায্য বা আইনানুগ কারণ নেই জেনেও এই আইনের অধীন কোন মামলা দায়ের করেন বা করান অথবা উক্ত ব্যক্তি অন্য কোন অপরাধ করেছেন বলে মিথ্যাভাবে তাকে অভিযুক্ত করেন, তাহলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি সর্বোচ্চ সাত বছর পর্যন্ত মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

১৩(৫) ধারায় উল্লেখ আছে যে, যদি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্তির পর ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্তকারী কর্মকর্তা কোন ব্যক্তিকে অপরাধের দায় থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বা তদন্ত কার্যে ইচ্ছাকৃত গাফিলতির মাধ্যমে অপরাধটি প্রমাণে ব্যবহারযোগ্য কোন আলামত সংগ্রহ বা বিবেচনা না করে বা উক্ত ব্যক্তিকে আসামীর পরিবর্তে সাক্ষী করে বা কোন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীকে পরীক্ষা না করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন, তাহলে উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্তে উক্তরূপ কোন কার্য বা অবহেলা প্রতীয়মান হলে তা অদক্ষতা বা অসদাচরণ হিসেবে চিহ্নিত করে ট্রাইব্যুনাল ঐ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করতে পারবে।

১৮(৬) ধারায়ও অনুরূপ বিধান করা হয়েছে। জননিরাপত্তা আইনকে 'কালো আইন' বলে যে সমালোচনা করা হচ্ছে তার জবাবে খসরু বলেন, আইন কালো কিংবা সাদা তা নির্ভর করে প্রয়োগের উপর। একটি ভালো আইনও খারাপ হতে পারে যদি এর অপপ্রয়োগ হয়। যে আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যেই হলো কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করা সেটাই কালো আইন।

সিআরপিসিসহ বিদ্যমান আইনে সকল ধরনের অপরাধের বিচারের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন জননিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করা হলো প্রশ্ন করা হলে আইনমন্ত্রী বলেন, বিদ্যমান আইনে বেশ কিছু অপরাধের দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা নেই। বিদ্যমান আইনে সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি বিনষ্ট করার মত অপরাধের বিচার করতে হলে অপরাধীর কেয়ামত পর্যন্ত সাজা হবে না। টেন্ডারবাজি একটি নতুন ধরনের অপরাধ। এ অপরাধের দ্রুত বিচার ও শাস্তি না হলে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পাবে না।

আইনমন্ত্রী বলেন, জননিরাপত্তা আইনে ৯টি অপরাধের বিচার করা হবে। এর মধ্যে ৭টি মূল বা প্রত্যক্ষ অপরাধ। এগুলো হলো ছিনতাই, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, গাড়ি ভাংচুর ও সম্পদের ক্ষতিসাধন, যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা এবং মুক্তিপণ দাবী-আদায় ও ত্রাস সৃষ্টি। বাকী ২টি পরোক্ষ অপরাধ। এ ২ টি হলো মিথ্যা মামলা ও অভিযোগ দায়ের এবং অপরাধে প্ররোচনা ও সহায়তা প্রদান। তিনি বলেন, এ সকল অপরাধের দ্রুত বিচার এখন সার্বজনীন দাবী। সাংবিধানিকভাবে আমরা জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানে দায়বদ্ধ।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, অপরাধীদের মানবাধিকার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু নিরস্ত্র ও নিরীহ জনসাধারণের মানবাধিকার জান-মালের নিরাপত্তা বিনষ্টকারী অপরাধীদের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

জননিরাপত্তা আইনে অপরাধের প্ররোচনাদানকারীর শাস্তি বিধানের যে ধারা আছে তার ব্যাপকভাবে অপপ্রয়োগ হবে বলে যে আশংকা করা হচ্ছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে আইনমন্ত্রী বলেন, বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এটা করা হয়েছে। অপরাধীদের 'গড ফাদাররা' প্রায়শই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকে। তাদেরও বিচারের কাঠগড়ায় আনার জন্য এ বিধান করা হয়েছে। এ বিধানের অপপ্রয়োগ হলে ৪৩ (৬) ধারা তো আছেই রক্ষাকবচ হিসেবে।

আইনমন্ত্রী বলেন, আদালতের কাছে অপরাধ কোন দলের তা বিচার্য নয়, তার অপরাধটাই বিচার হবে। মিথ্যা মামলা করে হয়রানি করা হলেও শাস্তির বিধান আছে। আমাদের উদ্দেশ্যে খারাপ হলে আইনে ১১, ১৩(৫) ১৮(৬) ধারা সংযুক্ত করতাম না। বিএনপি আমলের মত আইনের মেয়াদ ২ বছর পর্যন্ত করতে পারতাম।

জননিরাপত্তা আইনের কার্যকারিতা শুরু দিন ১৫ ফেব্রুয়ারি পল্টন ময়দানে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া নিয়ে গণফোরাম সভাপতি ও বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ড. কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে ১১ দলের আয়োজিত জনসভায় ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন, সিপিবির মঞ্জুরুল আহসান খান, গণতন্ত্রী পার্টির আজিজুল ইসলাম খান, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের নির্মল সেন, কমিউনিস্ট কেন্দ্রের অজয় রায়, বাসদের আব্দুল্লাহ সরকার, সাম্যবাদী দলের দিলীপ বড়ুয়া, গণতান্ত্রিক মজদুর পার্টির এ্যাডভোকেট আবদুস সালাম, বাসদের (মাহবুব) আ ফ ম মাহবুবুল হক ও গণআজাদী লীগের আলহাজ্ব আবদুস সামাদ বক্তব্য রাখেন।'

ড. কামাল হোসেন জননিরাপত্তা আইনের বিভিন্ন বিধানের সমালোচনা করে বলেন, দেশে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে গ্যারান্টি প্রদানের মতো বিধি-বিধান বিলোপ করতে সরকার মত্ত হয়ে উঠেছে। তার মতে, এটা সামরিক আইনেরও চেয়েও কালো আইন। সংবিধান এ ধরনের আইনের অস্তিত্ব স্বীকার করে না বলেই জননিরাপত্তা আইন সংবিধানের পরিপন্থী, বে-আইনী ও বাতিলযোগ্য। ড. কামাল হোসেন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য গোটা জাতির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, প্রশাসন নগ্নভাবে দলীয়করণের শিকারে পরিণত হচ্ছে। প্রশাসনিক ও পুলিশী ক্ষমতার চরম অপব্যবহার হচ্ছে। এ ধরনের ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ ও সংশোধনের জন্য বিচার বিভাগের এসব কাজের জন্য সরকার বিচার বিভাগকে প্রশংসা করার পরিবর্তে সমালোচনা করছে। তিনি বলেন, আইনের শাসন ও আইন আদালতকে অবজ্ঞা করার সর্বশেষ প্রয়াস হচ্ছে সংসদে জননিরাপত্তা আইন পাস করা।

রাশেদ খান মেনন জননিরাপত্তা আইন থেকে আপিল পর্যায়ে জামিন না দেয়া সংক্রান্ত বিধান তুলে নেয়া হবে বলে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রদানের কথা স্মরণ করে বলেন, এর মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন তাদের কাজটি কতটা খারাপ হয়েছে। মেনন বলেন, প্রধানমন্ত্রী মজুরি কমিশন ঘোষণা করার কথা বলেছিলেন। অথচ ৩ বছরেও করেননি। দেশের সম্পদ লুট করে এখন প্রাকৃতিক সম্পদ, মাটির নিচের গ্যাস সম্পদ লুট করতে যাওয়ার আগে তারা এই আইন তৈরি করেছেন, যাতে তাদের এসব কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দেশের মানুষ রুখে দাঁড়াতে না পারে।

মঞ্জরুল আহসান খান সরকারের সমালোচনা করে বলেন, লুটপাটের অর্থনীতি, ঋণখেলাপি, চাঁদাবাজি, ঘুষ-দুর্নীতি সন্ত্রাস-বেআইনি অস্ত্র লালন করতে এই সরকার বার বার

www.pathagar.com

নিজেদের ব্যর্থতা অন্যের ওপর চাপিয়ে পার পেতে চেয়েছে। তেল-গ্যাস প্রাকৃতিক সম্পদ, শক্তি খাত ও চট্টগ্রাম বন্দর বিদেশী মালিকানায় দিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নির্বিঘ্নে করার জন্য আট-ঘাট বাধছে। জননিরাপত্তা আইনসহ সব কালাকানুন তারই অংশ।

নির্মল সেন বলেন, সাড়ে ৩ বছরে সরকার প্রমাণ করেছে সংবিধান সম্মত আইন দিয়ে তারা দেশ চালাতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার পর ক্ষমতায় থাকার আর কোন নৈতিক অধিকার তাদের থাকে না। এ অবস্থায় ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে এই আইন করা হয়েছে।

১৬ ফেব্রুয়ারি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু (২০ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত) ডেইলী স্টারে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'জননিরাপত্তা আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার ব্যাপারে আমি আস্থাশীল।' মন্ত্রীর সাক্ষাৎকারটি প্রদানের দিনেই অর্থাৎ ১৫ ফেব্রুয়ারি জননিরাপত্তা আইন কার্যকরের একদিন পর ১৬ ফেব্রুয়ারি ডেইলী স্টারে পাশাপাশি দু'টি ছবি ছাপা হয়। তাতে দেখা যায় যে, পুলিশ বিএনপির মিছিল ঠেকাতে জননিরাপত্তা আইন ব্যবহার করছে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের একটি মিছিলকে পুলিশ প্রোটেকশন দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যা নগরীর স্বাভাবিক ট্রাফিক ব্যবস্থায় প্রচন্ড বাধা সৃষ্টি করে। জননিরাপত্তা আইনে যানবাহন চলাচলে বাধাদানের সর্বোচ্চ শাস্তির বিধানে বলা হয় যে, 'যদি কোন ব্যক্তি বেআইনী বল প্রয়োগ বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করে জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থলপথ, জলপথ বা রেলপথে যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন বা এরূপ কোন যান চালকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সাধারণ পথ পরিবর্তন করেন বা পরিবর্তনে উক্ত চালককে বাধ্য করেন, তাহলে তিনি অনধিক ১৪ বছর অন্যূন ৩ বছর সশ্রম কারাদন্ডে এবং তার অতিরিক্ত অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হবে।'

আওয়ামী সরকারের পাশ করা জননিরাপত্তা আইনে মিথ্যা মামলা দায়ের হওয়ার ফলে বিয়ের পিড়িতে বসতে পারেনি সদা হাস্যোজ্জ্বল সুমি। যশোর সদর থানার সীতারাপুর গ্রামের আব্দুর রশীদ ও নাসরিন বেগমের প্রগতি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীতে পড়ুয়া কিশোরী মেয়ে সুমি ভাইবোনদের মধ্যে ছিল সেজো। বড় দুই বোন সেলিনা ও রেহেনার বিয়ে হওয়ায় 'মেয়ে বড় হয়েছে ভেবে'-বিয়ে ঠিক করেছিলেন বাবা। চাষাবাদ করে তেমন একটা সুবিধা করতে না পারায় ছোট মেয়ে সাথি ও ছোট ছেলে বাবুলের বড় বোন সুমিকে বিয়ে দিতে উঠেপড়ে লাগেন তিনি। ঘটক দিয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি সুমির বিয়ে ঠিক করেন মনিরামপুর থানার ফয়তাবাজ গ্রামের ভিডিও ব্যবসায়ী ফরিদুজ্জামানের সঙ্গে। ১৬ ফেব্রুয়ারি ছেলে পক্ষ থেকে মেয়ের হাতে আংটি পরিয়ে আশীর্বাদ দেওয়ার পর ১৮ ফেব্রুয়ারি ছেলেকে আশীর্বাদের দিন নির্ধারিত হয়। একই দিনে সুমির গায়ে হলুদ ছিল। বিয়ের কেনাকাটা করার জন্য ১৭ ফেব্রুয়ারি দুপুর ২টার দিকে ছেলে ফরিদকে নিয়ে মনিরামপুর বাজারে যান বাবা আকামত সরদার। প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে কেনাকাটা করে তিনি ফরিদকে বাড়ি পাঠিয়ে নিজে তরিতরকারি ও ছাগল কিনতে যান। ফরিদ বিয়ের জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি আসার সময় মনিরামপুর থানা পুলিশ থানার মোড় থেকে ঐদিন হরতালকালে বিরোধী দল, পুলিশ ও আওয়ামী লীগের মধ্যে যে রণক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছিল ফরিদ তাতে জড়িত থাকার কারণ দেখিয়ে গ্রেফতার করে। ফরিদ বিয়ের কথা বলে আকুতি-মিনতি করে বাঁচতে পারেনি। বিয়ের জিনিসপত্র ছুড়ে ফেলে দিয়ে পুলিশ ফরিদকে থানা হাজতে আটকে রাখে। সরকারি দলের সৃষ্টি করা পরিকল্পিত সন্ত্রাসের ঘটনায় থানা বিএনপির সভাপতি আবু মুসা, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ইকবাল হোসেন, জামায়াতের থানা আমীর মাওলানা মিজানুর রহমানসহ ৩১ জনকে গ্রেফতার করে। বিএনপি, জামায়াত ও জাতীয় পার্টি মোট ৬৮ জন নেতা ও কর্মীর বিরুদ্ধে পৌর কশিনার ও আওয়ামী লীগ নেতা গৌর কুমার ঘোষ বাদী হয়ে

www.pathagar.com

জননিরাপত্তা আইনের ৭(ক)(খ)১০/১২ নং ধারায় মামলা দায়ের করেন। বিএনপির পক্ষ থেকে অভিযোগে বলা হয়, একই সময়ে আওয়ামী লীগ কর্মীরা বিএনপি অফিসে হামলা এবং প্রভাষক আব্দুল হালিমের ফ্যাক্স-ফোনের দোকান ভাংচুর করে। এইসব ঘটনায় বিএনপি থানায় মামলা দায়ের করতে গেলে পুলিশ মামলা গ্রহণ করেনি। দায়েরকৃত মামলায় ফরিদকে আসামী দেখায় পুলিশ। পরে ফরিদকে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে চালান দেয়া হয়। ফরিদকে পুলিশ গ্রেফতার করায় সুমির গায়ে হলুদ বাতিল করা হয়।

১ মার্চ মিরপুরে আওয়ামী এমপি কামাল আহমদ মজুমদার মোটরসাইকেল চাপায় আহত হন। তিনি অভিযোগ আনেন, নিজ দলেই তার প্রতিদ্বন্দ্বী স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা এস এম মান্নান কচি তাকে হত্যা করতে এ ঘটনা ঘটিয়েছেন। এ ঘটনার জের ধরে সেদিন মিরপুরে ৪ ঘন্টা রাস্তা ব্যারিকেড দিয়ে রাখা হয়। মানুষ দুর্ভোগের স্বীকার হয়। অথচ জননিরাপত্তা আইনে কোন মামলা হয়নি।

৫ মার্চ সকালে আওয়ামী লীগের বহিস্কৃত নেতা আখতারুজ্জামান বাবুর পুত্র সাইফুজ্জামান চৌধুরীর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম চেম্বার প্রেসিডেন্ট কামাল উদ্দিনকে বিতারিত করে চেম্বার দখল করে নিলে সরকার তার বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে মামলা করেনি। জননিরাপত্তা আইনের ৭ (খ) ধারায় উল্লেখ আছে, 'ইচ্ছাকৃতভাবে সরকার বা সরকারের নিয়ন্ত্রাধীন কোন প্রতিষ্ঠান অথবা কোন কোম্পানি বা ফার্ম বা যেকোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অথবা কোন দূতাবাস বা কোন বিদেশী বা আন্তর্জাতিক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান অথবা কোন ব্যক্তির স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ভাংচুর বা বিনষ্ট করেন, তাহলে ১ বছর কিন্তু অন্যূন ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং তার অতিরিক্ত অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হবেন।'

এমপি জয়নাল হাজারীর কৃর্তীকলাপ প্রতিদিন সংবাদপত্রে আসলেও, গোয়েন্দা সংস্থা রিপোর্টি দিলেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জয়নাল হাজারীর অপরাধ খুজে পান নি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ৬ মার্চ ফেনী সফরকালে এমপি হাজারীসহ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করার পর ষ্টেডিয়ামে আয়োজিত আওয়ামী লীগের জনসভায় ফেনীকে সন্ত্রাসমুক্ত করার নির্দেশ দেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশের পর থেকে সন্ত্রাস দমনের নামে সমগ্র ফেনী জেলায় কম্বিং অপারেশন শুরু হয়। অপারেশন অভিযানে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর থেকে আনা পাঁচ শতাধিক পুলিশ অংশ নেয়। অপারেশনের প্রথম দিন ৭ মার্চ ভোর রাতে শহরের উত্তরাংশে ফুলেশ্বর, সুলতানপুর, কাজীরবাগ, রামপুর, মধুরাই, পশ্চিম রামপুর, বিজয়সিংহসহ বিভিন্নস্থানে ব্যাপক অভিযান চালানো হয়। এই সময় কাজীরবাগ গ্রামের জনৈক জসিম উদ্দিনের বাড়ি ঘেরাও করে একটি ঘর থেকে বিএনপির সাধারণ সম্পাদক, সাবেক এমপি অধ্যাপক জয়নাল আবেদীন ভিপিসহ জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম চেয়ারম্যান, ছাত্রদল নেতা বেলাল হোসেন, খোকন, মামুন, নূরে আলম, আবুল কালাম, জহির উদ্দীন, জসিম উদ্দীন, শাহজাহান সাজু, সাইফুল ও মহিউদ্দিনকে ৫টি রাইফেল, ১টি রিভলবার, ২টি শর্টগান, ১টি অত্যাধুনিক শর্টগান, একনলা বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র দিয়ে পরিকল্পিতভাবে গ্রেফতার করে জননিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হয়। গ্রেফতার অভিযান পরিচালিত হওয়ার পর পুলিশের ব্রিফিংকালে অধ্যাপক জয়নাল আবেদীনসহ গ্রেফতারকৃতদের সাংবাদিকদের সামনে আনা হয়। ঐ সময় অধ্যাপক জয়নাল জানান, তাকে যেখান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে সেখানে কোন অস্ত্র পাওয়া যায়নি। তিনি আরও বলেন, 'পুলিশের সাথে গমণকারী সাদা পোশাকধারী একদল যুবক গ্রেফতারের পর তার দলের নেতা-কর্মীদের বেদম প্রহার করেছে।

www.pathagar.com

তারা থানা হাজতে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে'। অধ্যাপক জয়নালের এ কথার পর পুলিশ সুপার বলেন, অভিযানকালে তাদের সাথে সিভিল পোশাকধারী কোন লোকজন ছিল না। ভিপি জয়নাল সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে আরও কিছু কথা বলতে চাইলে পুলিশ তাকে থানা হাজতের ভিতর নিয়ে যায়। সকালে বিএনপি নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতারের খবর শহরে ছড়িয়ে পড়ার পর সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। বিএনপির ঘাটি বলে চিহ্নিত এলাকাগুলোতে ব্যাপক নিন্দার ঝড় উঠে। কিন্তু পাঁচ শতাধিক পুলিশ দুদিন ধরে বিএনপি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে কম্বিং অপারেশনের নামে সাড়াশি অভিযান চালায়। একই দিনে এই গ্রেফতার অভিযানে উৎফুল্ল এমপি হাজারী ফেনী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আরজুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পুলিশের ভূয়ষী প্রশংসা করে বলেন, সাবেক এমপির দাবীদার ভিপি জয়নালকে গ্রেফতারের সময় পুলিশ বিপুল অস্ত্র উদ্ধার করেছে। তিনি জননিরাপত্তা আইনে আটক হয়েছেন। আগামী দেড় বছর তো নয়ই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও তার বের হবার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় গেলে আরও ৫ বছর তাকে জেলে আটক থাকতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

১২ মার্চ ছাত্রলীগের কর্মীরা কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের প্রশাসনিক ভবনে আক্রমণ চালিয়ে ভাংচুর করে ভয়াবহ ভীতিকর অবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে কলেজের প্রিন্সিপালকে অবাঞ্ছিত হিসেবে ঘোষণা করে। এ ঘটনার পর সরকার হামলাকারীদের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে কোন মামলা দায়ের করেনি।

জননিরাপত্তা আইনের অপপ্রয়োগ নিয়ে বিরোধী দলের নেতারা জনসভায় বক্তব্য রাখলে সরকার পক্ষ থেকে বলা হতো সংসদ অথবা সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশন করুন। আওয়ামী লীগ ঢাকডোল পিটিয়ে গলাবাজীতে-চাপাবাজিতে সর্বদা প্রথম স্থানে থাকে তা পুনরায় প্রমাণ হয় ১৩ মার্চ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে। বৈঠকে কমিটির সভাপতি মোঃ ছায়েদুল হকের সভাপতিত্বে সদস্য চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, বিরোধী দলীয় চীপ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার, হুইপ উপাধ্যক্ষ মোঃ আব্দুস শহীদ, হুইপ এসএম মোস্তফা রশিদী (সুজা), মোঃ তাজুল ইসলাম, মিসেস জিনাত হোসেনের উপস্থিতিতে বিবিধ আলোচনায় বিএনপির মেজর (অব.) হাফিজউদ্দিন জননিরাপত্তা আইনকে বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের ওপর ব্যবহার ও ফেনীতে অনবরত ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি উত্থাপন করলে চীফ হুইপ কমিটির সভাপতিকে বৈঠক মূলতবী করতে বললে তিনি আকস্মিকভাবে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। হটাৎ বৈঠকস্থলে টিভি ক্যামেরা এসে পৌঁছলে পুনরায় সকলে বসে ১০ মিনিট ধরে টিভি ক্যামেরার সামনে বৈঠকের মহড়া দেন। সভাপতি বিএনপি সদস্যদেরকে বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উপস্থিত নেই। সে কারণে এসব বিষয় আলোচনা করার সুযোগ নেই। এ পর্যায়ে মেজর হাফিজ সভাপতিকে বলেন, মাননীয় সভাপতি আপনি স্পীকারকেও হার মানিয়েছেন। এভাবে সংসদীয় কমিটির বৈঠক চালালে আমরা কমিটির বৈঠকে আসবো কি আসবো না চিন্তা করে দেখবো। তিনি বলেন, আমরা জননিরাপত্তা আইন নিয়ে যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বিরোধী দলীয় চীপ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার বলেন, পূর্ববর্তী কমিটির বৈঠকে আমরা জননিরাপত্তা আইন নিয়ে সংসদীয় কমিটির রিপোর্টে নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছিলাম। কিন্তু কমিটির রিপোর্টে আমাদের নোট অব ডিসেন্ট উল্লেখ করা হয়নি।

www.pathagar.com

জননিরাপত্তা আইন কার্যকর হওয়ার পর ১৪ মার্চ ২০০০ পর্যন্ত বিগত এক মাসে সারাদেশে মোট ৯৬টি মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলায় এজাহারভুক্ত ৮২৪ জন আসামীর মধ্যে গ্রেফতার হয় ১৩৪ জন। ১৫ এপ্রিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রামীণ ফোনের একটি সেলস্ সেন্টার উদ্বোধন করে বরিশাল ত্যাগের পর পরই আওয়ামী লীগের কর্মীরা ১৫ মিনিটের ব্যবধানে দুইবার সেন্টারটিতে আক্রমণ চালিয়ে তছনছ করে। কিন্তু সরকার জননিরাপত্তা আইনে কারও বিরুদ্ধে মামলা করেনি।

১২ মার্চ দৈনিক যুগান্তর ও ১৩ মার্চ দৈনিক মানবজমিনে জয়নাল হাজারী বলেছিলেন, 'আমার ছেলেদের কাছে অস্ত্র আছে। আমি জেলা আইন-শৃংখলা কমিটিকে বলেছি যে, বিএনপির কর্মীদের অস্ত্র উদ্ধারের পর আমি আমার ছেলেদের অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দেব। আর আমার ছেলেদের কাছে যে অস্ত্র আছে তা শুধু আত্মরক্ষার জন্য। পুলিশ যদি মনে করে আমার ছেলেদের কাছে অবৈধ অস্ত্র আছে, তাহলে তারা আমাকে অবহিত করলে আমি অভিযোগ তদন্ত করে দেখাবো। যদি অভিযোগ সত্য হয়; তাহলে আমি ছেলেদের বলবো অস্ত্র জমা দিতে।' দু'টি পত্রিকার সঙ্গে জয়নাল হাজারীর স্বীকারোক্তি দ্বারা তার বাহিনীর কাছে অস্ত্র আছে এ ধরনের স্পষ্ট বক্তব্য ছিল। সন্ত্রাসের মদদ দেয়া বা সন্ত্রাস সৃষ্টি করা জননিরাপত্তা আইনে গুরুত্বর অপরাধ। এ অপরাধের অভিযোগে অনধিক দশ বছর কারাদন্ডের বিধান রয়েছে। কিন্তু জয়নাল হাজারী ও তার ক্যাডাররা জননিরাপত্তা আইনের উর্ধ্বেই ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জের গডফাদারের মদদপুষ্ট যুবলীগ নেতা তোফাজ্জল বাহিনী ফতুল্লা থানার পাগলা এবং মুন্সীখোলায় প্রকাশ্যে ডাকাতি, চাঁদাবাজি করে আসছিল। ১০ এপ্রিল গডফাদারের ইশারায় ঢাকার গাফফাদারের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান মদিনা ট্রেডিং কর্পোরেশনে ডাকাতি সংঘটিত হয়। ঘটনার পরপরই মদিনা ট্রেডিং-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সড়কের মুন্সীখোলায় রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে ছয় ঘন্টাব্যাপী যান চলাচলে অবরোধ করেন। হাজী সেলিমের নেতৃত্বে কয়েকটি ট্রাক রাস্তায় আড়াআড়ি রেখে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে ঐ অবরোধ সৃষ্টি করা হয়। ফলে কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ যানজট পড়ে যায়। এমপি মনে করেছিলেন যে, স্থানীয় একজন চেয়ারম্যান তার দোকানে ডাকাতি করেছে। পরের দিন ঐ ইউপি চেয়ারম্যানসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু এমপিসহ যারা রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে অবরোধ করে, তাদের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করা হয়নি।

১৮ এপ্রিল দৈনিক মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে হাজারীর অপরাধ প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেছেন। সবাই সমালোচনা করছে আপনি জয়নাল হাজারীকে বাঁচানোর জন্যই কিংবা তাকে আরো প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একচোখা নীতি গ্রহণ করেছেন, বিরোধীদের আটক করে হাজারীকে একচ্ছত্র নেতা বানানোর এটা কি কোনো কৌশল নয়? প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন-'এটা ঠিক নয়। যাদের ধরা হচ্ছে তারা অস্ত্রসহ ধরা পড়েছে। জয়নাল হাজারীর বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই। যে অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে ধরা যেতে পারে। যার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই তাকে আমি ধরতে পারি না। এ্যাকশনে যেতে পারি না। ছাত্রলীগ, যুবলীগের অনেক লোককে ফেনীতে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ছিল, মামলা ছিল। এগুলো বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফেনী দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসকবলিত ছিল। এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে। সেখানে কোন দিন পুলিশ এ্যাকশনেই যেতে পারত না। কাজ

www.pathagar.com

করতে পারত না। আমরা সেখানে কাজ শুরু করেছি। কম্বিং অপারেশন চলছে। জয়নাল হাজারীর অনেক লোক ধরা পড়েছে। সেখানে প্রতিটি বাড়িতে অভিযান পরিচালিত হয়েছে। হয়তো একটা কথা ঠিক, প্রথমদিকে একটি গ্রুপ ধরা পড়েছে, যারা অন্য দলের হতে পারে। তারা অস্ত্র নিয়ে ধরা পড়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। পুলিশকে আমি নির্দেশ দিয়েছি, জয়নাল হাজারীর লোকজন জড়িত থাকলেও তাদের পাকড়াও করতে হবে। অনেকে অবশ্য পালিয়ে গেছে।'

২৫ এপ্রিল সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতির প্রাক্তন সদস্য গোলাম কিবরিয়া (কক্ষ নং-২৮,সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতি ভবন, থানা-রমনা, ঢাকা) পল্টন ময়দানের জনসভা থেকে বিচারপতিদের উদ্দেশ্য করে প্রকাশ্যে হুমকি ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন, মাথায় সাদা কাপড় পরে লাঠি মিছিল করে রাজপথে বেআইনী শক্তির মহড়া ও দাপট প্রদর্শনের মাধ্যমে জনমনে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগ এনে নিজে বাদী হয়ে বন ও পরিবেশ মন্ত্রী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুকুল বোস, পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এবং প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার বিরুদ্ধে মতিঝিল থানায় জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইনের ১০ ও ১২ ধারায় মামলা দায়ের করেন। বিকাল সাড়ে ৫টায় বাদী সুপ্রীমকোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন, চৌধুরী গোলাম মোহাম্মদ আলাল, শেখ রেজাউল করিম এবং মোখলেসুর রহমান সাহেদকে সঙ্গে নিয়ে মতিঝিল থানার ওসি আবদুল হকের কক্ষে এসে এফআইআর দায়ের করেন।

জননিরাপত্তা আইনের ১০ ও ১২ ধারায় উল্লেখ আছে, '(ত্রাস সৃষ্টির শাস্তি) যদি কোনো ব্যক্তি আকস্মিক বা পরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাটে, যানবাহনে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা উহার আশেপাশে বা জনসাধারণের ব্যবহার্য কোনো স্থানে বা হাটে বাজারে, বাড়িতে, দোকানে বা অন্য কোনো স্থানে আগুন ধরাইয়া দেন বা বোমাবাজি বা বেআইনী শক্তির মহড়া বা দাপট প্রদর্শন বা বেআইনীভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে আশেপাশের জনমনে ত্রাস সৃষ্টি করেন বা তাহাদের দৈনন্দিন সাধারণ কার্যকলাপের বিঘ্ন ঘটান বা জনপথে চলাচলের ব্যাঘাত ঘটান, তাহা হইলে অনধিক ১০ বৎসর কিন্তু অনুন্য ২ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং অতিরিক্ত ইহার অর্থ দন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।'

১২। (অপরাধের প্ররোচনা বা সহায়তার শাস্তি) যদি কোনো ব্যক্তি এ আইনের অধীনে কোনো অপরাধ সংঘটনে অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্ররোচনা দেন এবং সেই প্ররোচনার ফলে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হয় বা যদি কোনো ব্যক্তি এ আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা করেন বা কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে এ আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করেন-তাহা হইলে অপরাধ সংঘটনের জন্য এ আইনের যে দন্ড নির্ধারিত আছে সে একই দন্ডে উক্ত প্ররোচনাকারী বা প্রচেষ্টাকারী বা সহায়তাকারী দন্ডনীয় হইবেন।'

বাদী পক্ষকে আধা ঘন্টা থানায় বসিয়ে রেখে মতিঝিল থানার ওসি ৩ দফা উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মোবাইল টেলিফোনে কথা বলে এক পর্যায়ে সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে তিনি বাদী পক্ষকে জানান তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবেন। এ সময় বাদী পক্ষে উপস্থিত আইনজীবীরা ওসিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আইনের চোখে সবাই সমান। আমরা জননিরাপত্তা আইনের সুনির্দিষ্ট ধারার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এজাহার দায়ের করেছি। মামলা গ্রহণ না করার কোনো কারণ নেই। আমরা আশা করি আপনি মামলা গ্রহণ করবেন।'

www.pathagar.com

এজাহারে ১ নম্বর আসামী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলা হয় তিনি ১৩ এপ্রিল পল্টন ময়দানের জনসভায় 'বাংলার কোনো আদালতে বিচার না হলে জনতার আদালতে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচার হবে', ১৭ এপ্রিল মহানগর নাট্য মঞ্চে তিনি জনগণের মধ্যে ভীতি সঞ্চারকারী বক্তব্য দেন। তার এ বক্তব্য বিচার বিভাগের প্রতি হুমকি ও উস্কানিমূলক।

পল্টনের জনসভায় মুকুল বোসের 'প্রয়োজনে জনগণকে নিয়ে বিচারকদের বাড়ি ঘেরাও করবো'-এ বক্তব্যের জন্য তাকে অভিযুক্ত করা হয়।

আবদুস সামাদ আজাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, তিনি 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা, আজ জেগেছে সেই জনতা' এই উক্তির মাধ্যমে বিচারপতি, আইনজীবী-বুদ্ধিজীবীদের কটাক্ষ করে জনগণের মধ্যে ভীতি সৃষ্টিকর বক্তব্য প্রদান করেন।

এজহারে ৪ নম্বর আসামী মহিউদ্দিন খান আলমগীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার শুনানী গ্রহণে বিব্রত হয়ে যে সব বিচারক সারা জাতিকে অপমান করেছেন, তাদের বাংলাদেশে থাকার অধিকার নেই-এই বক্তব্যের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ভয়ভীতি প্রদর্শনের মতো কঠোর ভাষায় হুমকি দিয়েছেন।

এজাহারে ৫ নম্বর আসামী মোহাম্মদ নাসিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলা হয়, গত ১৮ এপ্রিল তার নেতৃত্বে কয়েকশ' অজ্ঞাতনামা লোক লাঠিসোটা হাতে নিয়ে মাথায় সাদা কাপড় পরে রাজপথে বেআইনী শক্তির মহড়া ও দাপট প্রদর্শন করে ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন। এজহারে বলা হয়, পল্টন এলাকা থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার অভিমুখে যাত্রা করে লাঠি মিছিল আশপাশের জনমনে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করে। এ লাঠি মিছিলে মোহাম্মদ নাসিম লাঠিধারী লোক এবং দেশবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আওয়ামী লীগ যারা চিনে না তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে, লাঠি কোথায় মারতে হয় আওয়ামী লীগ তা দেখিয়ে দেবে। এজাহারে বলা হয়, এ লাঠি মিছিল ও লাঠি মিছিল পূর্ব সমাবেশে নেতৃত্ব দেন ১ নম্বর আসামী মন্ত্রী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, ৫ নং আসামী মোহাম্মদ নাসিম এবং ৬ নম্বর আসামী প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া।

এজাহারে উল্লেখ করা হয় ১৯ এপ্রিল মোহাম্মদ নাসিমের নেতৃত্বে একটি মশাল মিছিল বের করা হয় এবং এ মিছিলে স্লোগান দেয়া হয়, 'বিচারপতির গদিতে আগুন জ্বালো এক সাথে, বিচারপতি রাজাকার এই মুহূর্তে বাংলা ছাড়।'

এজাহারে বলা হয়, ১৩, ১৭ ও ১৯ এপ্রিল অত্র থানার পল্টন ময়দান এবং এর আশপাশের এলাকা থেকে পরিকল্পিতভাবে বেআইনী সমাবেশ করে শক্তির মহড়া ও দাপট প্রদর্শনপূর্বক আশপাশে জনমনে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করা হয় যা ১৪ এপ্রিল থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত হয়েছে। এ খবর প্রকাশিত হওয়ার পর দেশের সর্বত্র শান্তিপ্রিয় জনগণের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি হয়েছে যা জননিরাপত্তা বিশেষ (বিধান) আইন ২০০০-এর ১০ ও ১২ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এছাড়া মন্ত্রীদের হুমকিকে কেন্দ্র করে আদালত অঙ্গনে বিচারপতি, আইনজীবীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা ও ভীতিকর অবস্থা সৃষ্টি করেছে।

এজহারে উল্লেখিত অভিযোগের সমর্থনে আবেদনের সঙ্গে দৈনিক জনকণ্ঠ, প্রথম আলো, আজকের কাগজ এবং দৈনিক শ্যামবাজার পত্রিকায় বিভিন্ন তারিখে প্রকাশিত রিপোর্ট ও ছবির কপি সংযুক্ত করা হয়। এক পর্যায়ে ওসি বলেন, এর আগেও রাস্তায় লাঠি মিছিল হয়েছে, মশাল

www.pathagar.com

মিছিল হয়েছে, জননিরাপত্তা আইনে মামলা হয়নি। জবাবে আইনজীবীরা জননিরাপত্তা আইনের গেজেট খুলে ১০ ও ১২ ধারা পাঠ করেন। তারা বলেন, সাধারণ মিছিল আর হুমকি প্রদর্শন ও দাপট প্রদর্শন এক কথা নয়। তাছাড়া তখন জননিরাপত্তা আইন ছিল না।

এজাহার পেশ করার পর বাদী এডভোকেট গোলাম কিবরিয়া, ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন এবং চৌধুরী গোলাম মোহাম্মদ আলাল সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। তারা বলেন, সারাদেশে জননিরাপত্তা আইনে যেসব মামলা করা হচ্ছে-সেই প্রেক্ষাপটে এ মামলাটি নথিভুক্ত না করার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট এবং ছবি মামলার সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হবে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে তারা বলেন, জননিরাপত্তা আইনের ১৫ ধারায় এসব সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

ফেনী জননিরাপত্তা বিশেষ আদালতে হাঙ্গামার অভিযোগ জয়নাল আবেদীন হাজারীসহ ৩২ জন আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতার বিরুদ্ধে ফেনী থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। ৫ মে দুপুরে সাইফুল ওসমান এই অভিযোগ দাখিল করেন। ফেনী থানার ডিউটি অফিসার দুলাল কিশোর স্বাক্ষর দিয়ে অভিযোগ গ্রহণ করেন। থানায় নির্দিষ্ট অভিযোগ নিয়ে মামলা দায়ের করা হলেও পুলিশ বা সরকার এ ব্যাপারে আইনগত পদক্ষেপ নেয়নি।

জননিরাপত্তা আইনের ৬ ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, 'যদি কোন ব্যক্তি বেআইনী বল প্রয়োগ বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করিয়া কোন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র আহবান, দাখিল, গ্রহণ, দাখিলকৃত দরপত্রের প্রেক্ষিতে কোন কাজে হস্তক্ষেপ বা চাপ প্রয়োগ বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বা দাখিলকৃত দরপত্র গ্রহণে বা গৃহীত দরপত্র বাতিলকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেন বা উক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কার্যাদেশ হাসিল করেন, তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে বা অনধিক ১৪ বছর কিন্তু অন্যূন ৩ বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হবেন' কিন্তু এ আইনটি নগর ভবনের ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার বেলায় কার্যকর হয়নি। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবনের একজন নির্বাহী প্রকৌশলীর কক্ষে আওয়ামী সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, টেন্ডারবাজ ফাইভ স্টার বাহিনী ১৬ মে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের সাংবাদিকদের আটকে রেখে অকথ্য ভাষায় গালাগাল এবং প্রাণনাশের হুমকি দেয়। সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বিভিন্ন মার্কেট সংস্কার করার দেড় কোটি টাকার কাজের সিডিউল ফাইভ স্টার বাহিনী কিনে নিয়েছিল। সিডিউল কিনতে এসে সাধারণ ঠিকাদাররা কিনতে না পেরে ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস কক্ষে লাথি মারেন। এ খবর ১৫ মে কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত হলে ফাইভ স্টার গ্রুপের সদস্য মোশাররফ হোসেন রাজা, ইকবাল হোসেন অপু, সেন্টু, কবিরসহ অন্যরা ক্ষিপ্ত হয়ে সাংবাদিকদের ওপর প্রতিশোধ নিতে সকাল ১০টা থেকে নগর ভবনে বসেই বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে টেলিফোন করে ভবনের ১৪ তলায় এক ব্যক্তি খুন হয়েছে বলে জানায়। কয়েকজনকে মোবাইল টেলিফোনে একই খবর জানানো হয়। পুলিশও খবরটি জানতে পারে। খুনের খবর সংগ্রহের জন্য সাংবাদিকরা নগর ভবনে যান। সাংবাদিকরা ভবনের নিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তাসহ অপরাপর কর্মকর্তাদের সঙ্গে খুন সম্পর্কে কথাবার্তা বলেন। তারা এ ব্যাপারে কোনো তথ্য দিতে না পেরে ভবনের ৮ম তলায় নির্বাহী প্রকৌশলী নূরুল আমীনের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দেন। এই কর্মকর্তার কক্ষে ঢুকেই রাজা, অপু, সেন্টু, কবিরসহ একদল সশস্ত্র যুবককে দেখা যায়। তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিল মদ্যপ। ফাইভ স্টার গ্রুপের সদস্যরা উপস্থিত সাংবাদিকদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে। এর প্রতিবাদ করতেই সন্ত্রাসীরা অস্ত্র উঁচিয়ে সাংবাদিকদের খুন করতে উদ্ধত

www.pathagar.com

হয়। তারা খুন করার হুমকি দিয়ে নগর ভবন সম্পর্কে রিপোর্ট না লিখতে বলে। রিপোর্ট লেখা হলে তারা সাংবাদিকদের খুঁজে খুঁজে খুন করবে বলে ঘোষণা দেয়। শেষ পর্যন্ত রাজা নামে দলনেতাকে জননিরাপত্তা আইনে না করে পুলিশ বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার করে।

২০০০ সালের জুনে দিনাজপুরের একটি জননিরাপত্তা মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আফজালুল হকসহ অন্য আসামীরা হাইকোর্টে এ আইনকে চ্যালেঞ্জ করে প্রথম রীট আবেদন দাখিল করেন। তবে জানুয়ারি ২০০১ প্রথম রুলনিশি জারি হয় বিএনপির সংসদ সদস্য মোর্শেদ খানের আনা রীট আবেদনে। তার ও তার পুত্রের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের খুলশী থানায় জননিরাপত্তা আইনে মামলা হলে তিনি এ রীট আবেদন দাখিল করেন। এরপর প্রথমোক্ত রীটেও রুলনিশি জারি হয়। পরবর্তী সময়ে একইভাবে আরো ৪৮৫টি রীট আবেদনে একই রুলনিশি জারি হয়। এদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেলের তথ্য অনুযায়ী, এপ্রিল ২০০১ পর্যন্ত সারা দেশে জননিরাপত্তা আইনে মামলা হয় ২ হাজার ৯০০। আসামীর সংখ্যা ছিল ২১ হাজার ৬০০। এর মধ্যে ১৭০০ মামলায় ১০ হাজারেরও বেশি আসামীর বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল হয়েছে। ওই সময়ে গ্রেফতার ছিল ৭ হাজার আসামী। সারা দেশে জননিরাপত্তা আইনে বিভিন্ন মামলায় ২৩৮জন আসামীর সাজা হয়।

৯ জুলাই ফেনীর ফাজিলপুরে বিএনপি নেতা সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মরহুম কবির আহমেদের কুলখানি অনুষ্ঠান চলাকালে স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা পুলিশের সহায়তায় অনুষ্ঠানটি ঘেরাও করে ২০/২৫ রাউন্ড ফাঁকা গুলি করে আতংক সৃষ্টি করে। পুলিশ অনুষ্ঠান থেকে ছাত্রদল ও যুবদলের ২৯ জন নেতা-কর্মীকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। পুলিশের বক্তব্য ছিল, আসামী সন্দেহে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

জুলাই মাসে পরিবহন ধর্মঘট চলাকালেও পরিবহন শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হয়। এর মধ্যে শিমুল বিশ্বাস ও হানিফের বিরুদ্ধে মিরপুর থানায় যে মামলা দায়ের করা হয় তা শেষ অবধি হাস্যকর বলে প্রমাণিত হয়। কেননা ঘটনার দিন শিমুল বিশ্বাস ছিলেন পাবনায় এবং হানিফ ছিলেন বিদেশে। (সূত্র ঃ দৈনিক দিনকাল ১৮ নভেম্বর ২০০০)

১২ জুলাই জননিরাপত্তা আইনের বিরুদ্ধে আনা রীট আবেদনে হাইকোর্ট বেঞ্চের দুই বিচারক বিভক্ত রায় দেন। বেঞ্চের জ্যৈষ্ঠ বিচারক এম.এ. আজিজ এ আইনকে সংবিধান পরিপন্থী ও অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন। অন্যদিকে কনিষ্ঠ বিচারক বিচারপতি মোঃ শামসুল হুদা পুরো আইনকে বাতিল না করে জামিন নিষিদ্ধ সংক্রান্ত ১৬ ধারা এবং সাক্ষীদের জবানবন্দী হুবহু না লিখে সারাংশ লেখার বিধান সংবলিত ১৮(১) (খ) ধারাকে সংবিধান পরিপন্থী ও অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন। অবশ্য কনিষ্ঠ বিচারক তার রায়ের আদেশের অংশই ঘোষণা করেন। পুরো রায় ঘোষণার জন্য আরেক দিন নির্ধারণ করেন। আইনজীবী, সাংবাদিক ও আবেদনকারীদের ভিড়ে তিল ধারনের ঠাঁইহীন আদালতে পিনপতন নিস্তব্ধতার মধ্যে সকাল সাড়ে ১০টা থেকে শুরু করে বিকেল ৩টা পর্যন্ত একানাগাড়ে বিরতিহীন রায়ের শ্রুতিলিখনের মাধ্যমে নিজ রায় শেষ করেন বিচারপতি এম.এ. আজিজ। এরপর বিচারপতি শামসুল হুদা তার ভিন্ন রায় পরে ঘোষণা করার কথা জানান। আইনজীবীরা অন্তত রায়ের আদেশের অংশ ঘোষণার আবেদন জানালে তিনি আদেশের অংশ ঘোষণা করেন। বিচারপতি আজিজ তার রায়ে বলেন, 'জননিরাপত্তা আইনকে অর্থবিল হিসেবে পাস করা হলেও তা সংবিধানের ৮১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রকৃতপক্ষে অর্থবিল ছিল না। একে অর্থবিল হিসেবে

www.pathagar.com

স্পীকারের দেওয়া প্রত্যয়ন ওই অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। এতে ৮০ (৩) অনুচ্ছেদে দেওয়া রাষ্ট্রপতির প্রাধিকার খর্ব করা হয়েছে। একইভাবে জননিরাপত্তা আইন সংবিধানের ৭,২৭, ৩১, ৩২ ৬৫ (১) ১০১ ও ১১৬ক অনুচ্ছেদেরও পরিপন্থী। তাই জননিরাপত্তা আইন সংবিধান পরিপন্থী অবৈধ ঘোষণা করা হলো। এ আইনকে আইনগ্রন্থ থেকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নেওয়া হোক। রীট আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে আনা জননিরাপত্তা আইনের মামলার সব কার্যক্রমকে বেআইনী ও আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হলো।' অন্যদিকে বিচারপতি শামসুল হুদা তার রায়ে বলেন, 'পরিস্থিতির আলোকে আমি মনে করি, সন্ত্রাসী ও অবৈধ অস্ত্রধারীদের হাত থেকে জনগণকে রক্ষাসহ দেশের সাধারণ মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে জননিরাপত্তা আইন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই আমি পুরোপুরি এ আইনকে সংবিধান পরিপন্থী ঘোষণার ব্যাপারে বিজ্ঞ সহকর্মীর সঙ্গে একমত নই। আমার বিবেচনায়, কোন ফৌজদারী মামলায় জামিন চাওয়ার অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না। জামিন আবেদন বিবেচনার ক্ষমতা আদালতকে দেওয়া হয়েছে। অজামিনযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রেও জামিন দেওয়া আদালতের এখতিয়ারভূক্ত। তাই জননিরাপত্তা আইনে ১৬ নং ধারা ন্যায় বিচারের স্বাভাবিক নীতিমালা বিরোধী এবং সংবিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্য। ফলে ১৬ ধারা বাতিল হবে। একই সঙ্গে গুরুদণ্ডের বিষয়ে বিচারের ক্ষেত্রে জননিরাপত্তা আইনে ১৮ (খ) ধারা প্রযুক্ত হতে পারে না। তাই এ ধারাও বাতিল হবে। ফলাফলে আবেদনকারীদের পক্ষে রুল আংশিক মঞ্জুর করা হলো এবং জননিরাপত্তা আইনের ১৬ ও ১৮ (খ) ধারা সংবিধান পরিপন্থী ও অবৈধ ঘোষণা করা হলো। ১৯২ নং রীট আবেদনের ক্ষেত্রে জননিরাপত্তা আইনের কোন উপাদান নেই। তাই ওই মামলার বিচারের এখতিয়ার ট্রাইব্যুনালের নেই। ফলে ওই রীট আবেদনের আবেদনকারীদের পক্ষে রুল মঞ্জুর করা হলো। বাকী সব রীটের রুল আংশিক মঞ্জুর হলো।' উল্লেখ্য ১৯২ নং রীটের আবেদনকারী হলেন ব্যারিস্টার নাজমুল হুদাসহ সুপ্রীমকোর্টের ১৬ জন আইনজীবী। ১১ জানুয়ারি আপিল বিভাগের বিচারপতি নিয়োগের জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে বিরোধী দলীয় আইনজীবীরা প্রতিবাদ জানালে তাদের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে ওই মামলা দায়ের করা হয়। (বিচারপতি শামসুল হুদা ১৮ (খ) ধারা বাতিলের কথা বললেও আইনে অনুরূপ ধারা নেই। আইনে ১৮(১) (খ) ধারা আছে)।

২০ আগষ্ট জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় নেতা এডভোকেট হাবিবুর রহমান মণ্ডলের নৃশংস হত্যাকান্ডের পর ঢাকা জজকোর্ট ও সিএমএম কোর্ট প্রাঙ্গণে হত্যার প্রতিবাদে সর্বস্তরের আইনজীবীরা প্রতিবাদ মিছিল করে এবং প্রতিবাদ সভা করে মন্ডল হত্যার বিচারের দাবি জানান। এরপর কোতোয়ালী থানার এসআই মোঃ সিদ্দিকুর রহমান সরকারের উস্কানিতে হাবিব মন্ডল হত্যাকে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করার জন্য কোতোয়ালী থানায় জননিরাপত্তা আইনের ৭, ৮ ও ১০ ধারায় এডভোকেট মোঃ সানাউল্লাহ মিয়া, মাসুদ আহমেদ তালুকদার, খোরশেদ আলম, মোঃ শাহজাদা, মোঃ নূরুল ইসলাম বাবুল, মোঃ আবু সেলিম চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী, এ এফ এম গোলাম ফাত্তাহ, হারুন-অর-রশিদ খান, এম.ইউ আহমেদ, কাজেম আলী দুলাল, মাইনউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, আবদুর নূর ভূইয়া, খন্দকার দিদারুল ইসলাম, মোঃ আনিসুর রহমান, মাহফুজুর রহমান পাটোয়ারী, মোঃ আবদুল বাতেন, মোঃ আনোয়ার জাহিদ ভূইয়া, মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম ও মইনউদ্দিনসহ মোট ৩৩ জন বিএনপি নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে। ৩ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি মোঃ নূরুল ইসলাম ও বিচারপতি মুহাম্মদ লতিফুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত

www.pathagar.com

অবকাশকালীন ডিভিশন বেঞ্চে ২০ জন আইনজীবী আত্মসমর্পণপূর্বক অন্তর্বর্তীকালীন আগাম জামিনের প্রার্থনা জানালে আদালত ১৫ অক্টোবর সুপ্রীমকোর্ট খোলার ২ সপ্তাহের মধ্যে আবেদনকারী আইনজীবীদের সংশ্লিষ্ট আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। আদালত একই সাথে হাইকোর্ট খোলার ২ সপ্তাহের পর পর্যন্ত ওই ২০ জন আইনজীবীকে কোতোয়ালী থানার মামলা নম্বর ২৮ (৮) ২০০০ ধারা জননিরাপত্তা আইনের ৭, ৮ ও ১০ তে গ্রেফতার না করাসহ অন্য কোনো প্রকার হয়রানি না করার জন্য নির্দেশ দেন।

৩ অক্টোবর সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসন কলারোয়া থানা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে বেগম খালেদা জিয়ার ত্রাণকার্যে আগমনের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে জানায় এবং সে মোতাবেক জনসভা ও মাইক ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করে। খালেদা জিয়া কলারোয়ায় যাওয়ার পথে বিডিআর ও পুলিশ বাধা দেয়, জনসভার মঞ্চ ভেঙ্গে দেয়। এর প্রতিবাদ করলে বিডিআর বিএনপির কর্মীদের প্রহার করে এবং তাতে ২০ জন আহত হয়। কিন্তু কলারোয়ায় বিরোধী দলীয় নেত্রীর যাত্রাকালে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিসহ জনসভা ও মাইক ব্যবহারের অপরাধে কলারোয়া থানার ওসি ফজলুল হক বাদী হয়ে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য হাবিবুল ইসলাম হাবিবসহ ১৬৬ জনের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করে। একই দিন রাতে পুলিশ বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাস্টার রফিকুল ইসলাম, বিএনপি নেতা মেহরুল্লাহ, ইব্রাহিম, আসাদ, যুবদল নেতা মোশাররফ ও আশরাফকে গ্রেফতার করে। জননিরাপত্তা আইনে কয়েকজনকে আটক করার পর মূলতঃ বিরোধী জোটের নেতা-কর্মী শূন্য হয়ে পড়ে কলারোয়া। পুলিশ বাড়ি বাড়ি চষে ফিরে বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের আটক করার জন্য। সরকার ও সরকার দলীয় নেতা-কর্মীরাও ধমকাধমকি ও তান্ডব চালানোর জন্য পুলিশকে সর্বতোভাবে সহায়তা করে ।

৫ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচিতে বাধাদান করার কাল্পনিক অজুহাতে ষড়যন্ত্রমূলক, ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক হিংসা চরিতার্থ করার জন্য সরকারের প্রভাবশালীদের মদদে কলারোয়া থানার বিতর্কিত ওসি ফজলুল হক বাদী হয়ে ১৬ জনের নামে জননিরাপত্তা আইনে একটি মামলা দায়ের করে। পরে তদন্ত শেষে ৪৬ জনের নামে চার্জশীট দাখিল করা হয়। এই মামলার অন্যতম সাক্ষী যাকে করা হয় এবং যাকে দিয়ে ২২ অক্টোবর ১৬৪ ধারায় সাতক্ষীরার ম্যাজিস্ট্রেট অশোক কুমার দেবনাথের আদালতে জবানবন্দী রেকর্ড করা হয় সেই সাক্ষী মোঃ ইব্রাহীম একটি মামলায় (এসটিসি ৮৯/২০০০) সাতক্ষীরা জেল হাজতে আটক ছিল এবং ঘটনার দিন বিকাল ৫টায় জেল হাজত থেকে জামিনে মুক্তিলাভ করে বলে জেল সুপারের রেকর্ড থেকে জানা যায়। বিষয়টি জেলা জজ অবগত হয়ে জেল সুপারকে পত্র দেন। জেল সুপার লিখিতভাবে বিষয়টি জেলা জজকে জানান। ঘটনার সময় বেলা ১২টা। অথচ মামলার সাক্ষী জেল থেকে মুক্তি পায় বেলা ৫টায়। এমন সাক্ষীর জবানবন্দির ভিত্তিতে আসামীদের নামে চার্জশীট প্রদান করে আইনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে ওসি। এ মামলায় প্রাথমিক পর্যায়ে ৭ জন আটক ছিল। তাদের জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। ২৬ ডিসেম্বর আইনের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে চার্জশীটভুক্ত ৩৯ জন জননিরাপত্তা আইনের বিশেষ আদালত সাতক্ষীরায় জামিনের আবেদন জানিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। বিশেষ আদালত তাদের জামিনের আবেদন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এরমধ্যে ছিলেন একজন সাবেক এমপি, ছাত্রনেতা হাবিবুল ইসলাম হাবিব, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান, একজন আইনজীবী, কয়েকজন কলেজ ও স্কুলের শিক্ষকসহ ৩৯ জন বিএনপির নেতা-কর্মী।

www.pathagar.com

৭ নভেম্বর চীপ হুইপ আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহর পুত্র আশিক আব্দুল্লাহ তার সন্ত্রাসী বন্ধুদের নিয়ে ধানমন্ডিতে এক বাসায় গিয়ে চাঁদা দাবি করে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। এ ঘটনায় আশিক আব্দুল্লাহর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের হয় এবং তাকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু অপরাধগুলো জননিরাপত্তা আইনে আমলযোগ্য ছিল। সবার ক্ষেত্রে এ ধরনের অপরাধের জন্য জননিরাপত্তা আইনে খড়গ নেমে আসলেও তার বিরুদ্ধে হয় ফৌজদারী আইনে মামলা।

৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় গুলশানে ছাত্রলীগ নেতা এবং তিতুমীর কলেজের ভিপি আক্কাসুর রহমান আঁখি নিহত হন। এর প্রতিক্রিয়ায় ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মীরা মহাখালী, গুলশান, বনানী, তেজগাঁও, এলিফ্যান্ট রোড আর ঢাকা কলেজের সামনে অবাধে গাড়ি ভাংচুর করে এবং অগ্নি সংযোগ করলে একটি কারণ ধরেও জননিরাপত্তা আইন প্রয়োগ হয়নি। ৩ ডিসেম্বর কারওয়ান বাজারে চাঁদাবাজদের সঙ্গে পুলিশ ও আনসারদের সংঘর্ষ বাধে। যুবলীগের স্থানীয় সন্ত্রাসী হান্নানের নেতৃত্বে একদল চাঁদাবাজ মুড়িপট্টিতে এসে বেপরোয়া বোমাবাজি করে। এঘটনায় পুরো কারওয়ান বাজারে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লেও জননিরাপত্তা আইনে কোনো মামলা হয়নি।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে বগুড়ার শহীদ জিয়া মেডিকেল কলেজে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা একের পর হামলা চালিয়ে ২০ জন শিবির সমর্থিত কর্মীদের দিশেহারা করে তোলে। শিবির কর্মীরা ছাত্রলীগের হামলায় বাধা সৃষ্টি করলে জননিরাপত্তা মামলার আসামী হয়ে তাদের কারাগারে যেতে হয়। অভিযোগ রয়েছে, ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ছাত্রাবাসের ছাত্রদের মেরেধরে তাদের টাকা-পয়সা, মূল্যবান সামগ্রী ফ্যান, টিভি, ঘড়ি প্রভৃতি মালামাল জোরপূর্বক কেড়ে নিয়ে সেগুলো সেকেন্ডহ্যান্ড মাল হিসেবে বিক্রি করে। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০০)

৩ জানুয়ারি ২০০১ শত নাগরিক কমিটির প্রফেসর ডাঃ এমএ মাজেদ, প্রফেসর আসকার ইবনে শাইখ, জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর আর আই চৌধুরী, প্রফেসর এম মনিরুজ্জামান মিয়া, এম এ হাকিম, কৃষিবিদ ডা. খন্দকার সিরাজুল ইসলাম, প্রফেসর মাহবুব উল্লাহ, সাদেক খান, প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ, প্রফেসর আফতাব আহমাদ, আমানউল্লাহ কবীর, কৃষিবিদ ড. এ এ হালিম, রিয়াজ উদ্দীন আহমেদ, প্রফেসর ইউসুফ হায়দায়, প্রফেসর জিন্নাতুন্নেসা তাহমিদা বেগম, প্রফেসর ড. জসিম উদ্দিন আহমেদ, মাহবুব আনাম, বিচারপতি হাবিবুল ইসলাম ভূঁইয়া, কৃষিবিদ এ এ সামাদ, ফজল এম কামাল, প্রকৌশলী এল কে সিদ্দিকী, প্রফেসর শাহ মোহাম্মদ ফারুক, প্রফেসর ইউসুফ আলী, প্রফেসর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক ডা. এম এ হাদী, প্রফেসর আনিসুর রহমান, শাহাদত হোসেন, আঞ্জুমান আরা বেগম, মোঃ আব্দুল গোফরান, মোজাম্মেল হোসেন, কৃষিবিদ প্রফেসর মাহফুজুর রহমান, মোবায়েদুর রহমান, কবি আব্দুল হাই শিকদার, মঞ্জুরুল আলম, আবদুল বাতেন, জহিরুল হক, কৃষিবিদ প্রফেসর ড. রফিকুল হক ভুঁইয়া, কৃষিবিদ প্রফেসর ড. মোঃ শাহজাহান, কৃষিবিদ প্রফেসর ড. মোশাররফ হোসেন মিঞা, কৃষিবিদ প্রফেসর ড. নজরুল ইসলাম, কৃষিবিদ প্রফেসর মোঃ বোরহান উদ্দিন, ডা. ইকবাল হাসান মাহমুদ, প্রফেসর মোজাম্মেল হক, মাহমুদ শফিক, আমীর খসরু, ডাঃ এ বি ভুইয়া, এডভোকেট ছানাউল্লাহ মিয়া, এডভোকেট লুৎফে আলম, প্রফেসর আলালউজ্জামান, প্রফেসর আবুল কালাম মঞ্জুর মোর্শেদ, প্রফেসর শামসুর রহমান, অধ্যাপক ড. মোঃ নুরুন নবী, অধ্যাপক ড. এম নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক এম এ মান্নান, প্রফেসর দাউদউর রহমান, প্রফেসর আমিনুল

www.pathagar.com

ইসলাম, প্রফেসর আব্দুল কাদের ভুঁইয়া, ড. সোহরাব উদ্দীন আহমদ, ড. মোহাম্মদ মাহবুব উল্লাহ, প্রফেসর খন্দকার মোস্তাহিদুর রহমান, প্রফেসর মোহাম্মদ আলী, প্রফেসর বদিউল আলম, প্রফেসর মাহমুদুল আমিন, এডভোকেট আবদুস সালাম মান্নান, এডভোকেট আবদুল আহাদ মিয়া, এডভোকেট আব্দুল মান্নান ভুইয়া, অধ্যাপক আঃ আউয়াল, অধ্যাপক মোঃ ইমাম উদ্দীন, অধ্যাপক রবিউল ইসলাম, ড. মোঃ এনামুল্লাহ পারভেজ, প্রফেসর কামরুল আহসান চৌধুরী, অধ্যাপক এটি.এম. ওবায়দুল্লাহ, অধ্যাপক মোখলেছুর রহমান, প্রফেসর এনামুল হক খান, এডভোকেট আবদুল ওয়াদুদ খন্দকার, এম এ হেনা, ড. এম এ রশীদ, প্রফেসর ইউসুফ শরীফ আহমদ খান, প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ, প্রফেসর আব্দুল গফুর, প্রফেসর মির্জা মফিজ উদ্দীন আহমেদ, প্রফেসর নুরুল আমীন বেপারী, প্রফেসর আমিনুর রহমান মজুমদার, প্রফেসর মাহফুজুল হক, প্রফেসর সৈয়দ রাশিদুল হাসান, ড. খলিলুর রহমান, ড. নজরুল ইসলাম, ড. নুরউদ্দিন মাহমুদ, ড.এ.কে.এম আব্দুল মতিন, প্রকৌশলী রাফায়েল কবীর, প্রকৌশলী ইকবাল হোসেন, কৃষিবিদ খুরশিদুল আলম কাজল, কবি মোশারফ করিম, ড. আনম মুনীর আহমেদ, ড. সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী, খন্দকার মনিরুল আলম, আবু সালেহ, মনজুর আহমদ, ড. একেএম আজিজুল হক, অধ্যাপক ফাইজুল ইসলাম ফারুকী, অধ্যাপক এলাহি নওয়াজ খান, অধ্যাপক একেএম ইয়াকুব আলী, অধ্যাপক তৌহিদুল আনোয়ার, অধ্যাপক আমিরুজ্জামন খান, অধ্যাপক আবদুস সালাম, অধ্যাপক শামসুল আলম সরকার, অধ্যাপক আবদুল্লাহ আনসারী, অধ্যাপক মোঃ শফি, অধ্যাপক আবদুস সাত্তার, রুহুল আমিন গাজী, ডঃ জাহিদুল ইসলাম, ড. খলিলুর রহমান ও প্রফেসর আমিনুর রসুল এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, 'জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইন ২০০০ যখন প্রথম বিল আকারে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়, তখন থেকেই আমরা একাধিক সেমিনার অনুষ্ঠান করে এবং জাতীয় পত্রিকায় বিবতি দিয়ে এই আশংকা প্রকাশ করেছিলাম যে, ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের মতই এটির প্রয়োগ ঘটবে শুধুমাত্র ভিন্নমত দমন ও বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের শায়েস্তা করার হীন লক্ষ্যে। এই আইনের কয়েকটি অবৈধ ধারা এবং অমানবিক সূত্রের জন্য মহামান্য প্রেসিডেন্টও এতে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকৃতি জানান। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নিজে প্রেসিডেন্টের নিকট উপস্থিত হয়ে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সংশোধনীর প্রতিশ্রুতি দিলে প্রেসিডেন্ট তারপরেই এতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। এসব সবার জানা। কিন্তু ন্যায়নীতি অথবা ইনসাফের কোন তোয়াক্কা না করে, মানবতা অথবা মানবাধিকারের প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহী না হয়ে, হিংসা-প্রতিহিংসার একবুক জ্বালা নিয়ে ক্ষমতাসীন সরকার শুধুমাত্র ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি রেখে এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জননিরাপত্তা আইনের অপ্রয়োগের মাধ্যমে বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের উপর নির্যাতন ও নিপীড়নের খড়গ যেভাবে উদ্যত করেছে তা সমগ্র জাতিকে স্তম্ভিত করেছে। মাত্র ক'দিন পূর্বে জাতীয় সংসদের সদস্য মঞ্জুর মোর্শেদ খানের বিরুদ্ধে এ অপপ্রয়োগ তারই এক নগ্ন বীভৎস রূপ। জাতীয় জীবনে এমন কুরুচিপূর্ণ পক্ষপাতের নমুনা শুধু অমানবিক নয়, ক্ষমতাসীনদের ফ্যাসিবাদ চরিত্রের এক জঘন্য রূপও বটে। জননিরাপত্তা আইনের অপপ্রয়োগের এই ঘৃণ্য রূপ দেখে সবাই আতংকিত, সকলেই বিস্মিত। এই নোংরা ঘটনা আবারো প্রমাণ করেছে, জননিরাপত্তা আইন আওয়ামী সন্ত্রাসীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। এই আইন শুধু বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের দমনের জন্য। এর লক্ষ্য দেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দমন নয় বরং বিরোধী দল দমন ও বিরোধী কণ্ঠ স্তব্ধকরণ। এর উদ্দেশ্য প্রশাসনিক নয় বরং দেশের আইন ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারীদের নিয়ন্ত্রণ করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তার প্রয়োগ। তাই দেখা যায়, মন্ত্রী-

www.pathagar.com

সংসদ সদস্যদের নেতৃত্বে রাজপথ অবরোধ করা হলে, মন্ত্রী ও মন্ত্রীপুত্র এবং সংসদ সদস্য ও তাদের পোষ্যদের দ্বারা সরকারি সম্পত্তির ধ্বংস সাধন ঘটালে, তাদের কারো কারো হাতে লাঠি, শুধু লাঠি কেন প্রকাশ্যে অস্ত্র ঝিলমিলিয়ে উঠলেও এমনকি হত্যাকান্ড সংঘটিত হলেও কোন মামলা হয়না। মামলা হয় বিরোধী দলীয় নেতা মোর্শেদ খান ও তার ছেলের বিরুদ্ধে। সন্ত্রাসীদের গডফাদার তুল্য আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা হয় না। এই কুখ্যাত আইনটি প্রণীত হওয়ার সময়ে আমাদের যে আশংকা ছিল, ক্ষমতার মদদে ও ক্ষমতাসীন ফ্যাসিষ্ট দলটি তা সত্যে পরিণত করেছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং জঘন্যভাবে এই আইনের অপপ্রয়োগের বিষয়টি জাতীয় বিবেকের নিকট তুলে ধরছি।'

'পরিপ্রেক্ষিত' পরিচালক আওয়ামী বলয়ের সাংবাদিক সৈয়দ বোরহান কবীর কিছু সহযোগী নিয়ে ১২ জানুয়ারি রাতে বগুড়ার নন্দীগ্রাম উপজেলার নিমাই দীগি গ্রামের প্রখ্যাত আলেম হযরত মাওঃ মুফতি মোঃ ইব্রাহীমের বাড়িতে জোরপূর্বক অনুপ্রবেশ করে টিভি ক্যামেরা দিয়ে ঐ বাড়ির মহিলাদের জোরপূর্বক ছবি উঠানোসহ বিভিন্ন ঘরে প্রবেশ করে মালামাল ও আসবাবপত্র তল্লাশি চালান। এ ঘটনার পরপরই বাদীপক্ষ থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ মামলা নিতে সম্মত না হওয়ায় ১৬ জানুয়ারি মুফতি ইব্রাহিমের বড় ছেলে মাহবুবুর রহমান বাদী হয়ে বগুড়া 'খ' অঞ্চলের ১ ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ মুস্তাফিজুর রহমানের আদালতে জননিরাপত্তা আইনের ১০ ধারামতে মামলা (নং ৪৮/পি-২০০১) দায়ের করেন। মামলার অভিযুক্তরা হলেন পরিপ্রেক্ষিতের পরিচালক ও উপস্থাপক সৈয়দ বোরহান কবীর, প্রোডাকশন বয় আঃ মান্নান, ক্যামেরাম্যান ও ক্রু মধ্যে শাহীন হাওলাদার, নাসির হাওলাদার, মোহসিন উল হাকিম, চয়ন, মুক্তা, মোমিন ও মাইক্রো চালক সামসুল আলম, দৈনিক যুগান্তরের উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিনিধি মোঃ হাসিবুর রহমান বিলু। ম্যাজিস্ট্রেট দায়েরকৃত মামলাটি গ্রহণ করে তা তদন্ত সাপেক্ষ নথিভুক্ত করা নির্দেশ দেন। মামলার আর্জিতে বলা হয়, 'ঘটনার সময় তাদের নিমাইদিঘীস্থ বাড়ির পুরুষ সদস্যদের অনুপস্থিতিতে সৈয়দ বোরহান কবীরের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটি দল একটি মাইক্রোবাসযোগে নিমাইদিঘী গ্রামে আসে। তার বাড়ি থেকে অর্ধ কি. মি. দূরে মাইক্রোবাস থামিয়ে টিভি ক্যামেরাসহ পায়ে হেঁটে বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। এরপর বাড়িতে ঢুকতে চাইলে বাড়ির ভিতর থেকে মহিলারা জানায় যে, বাড়িতে কোন পুরুষ মানুষ নাই, আপনারা পরদিন আসুন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সৈয়দ বোরহান কবীর ও তার দলের লোকেরা বাড়ির দরজা ভেঙ্গে জোর করে ভিতরে ঢুকে পড়ে। এরপর জোর করে বিভিন্ন ঘরে প্রবেশ করে তল্লাশির নামে মালামাল ও আসবাবপত্র তছনছ করে ভিডিও চিত্র ধারণ করে ও মেয়েদের ছবি তোলার সময় তাদের মাথার ঘোমটা সরিয়ে দেয়। জোরপূর্বক এসব কাজ করার সময় বাড়ির মেয়েরা কেঁদে ফেললে তাদের কান্নার আওয়াজ পার্শ্ববর্তী বাড়ির লোকেরা শুনতে পেয়ে মুফতির সাহেবের বাড়িতে ডাকাত পড়েছে মনে করে গ্রামবাসীরা চিৎকার শুরু করে ও মসজিদের মাইকে এই ঘোষণা প্রচার করে। ফলে আতংকিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে গ্রামবাসীরা দলে দলে ছুটে আসে। বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের হাত থেকে বাঁচার জন্য বোরহান কবীর ও তার দলের সদস্যরা কেউ পালিয়ে মাইক্রোবাসে উঠে, কেউ পার্শ্ববর্তী বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করে। পরে সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় মাদ্রাসার একটি কক্ষে হেফাজতে রাখা হয়। নিরাপত্তা হেফাজতে নেয়ার সময় সৈয়দ বোরহান কবীর তার নিজের ও অন্য সকলের পরিচয় প্রকাশ করে জানায়-তারা বিটিভিতে প্রচারিত 'পরিপ্রেক্ষিত' অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে টিভি চিত্র ধারণ ও মুফতি সাহেবের সাক্ষাৎকার নিতে এসেছে। উল্লেখিত

www.pathagar.com

ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ব্যাপারে পরদিন মামলা নেয়া হবে মর্মে পুলিশ প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের নিয়ে যায়। তবে পরদিন নন্দীগ্রাম থানা পুলিশ প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মামলা না নিলে বিজ্ঞ আইনজীবীদের পরামর্শে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলাটি দায়ের করতে এই বিলম্ব হয়েছে।' (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ১৭ জানুয়ারি ২০০১)

জননিরাপত্তা আইন কার্যকর হওয়ার পর ১ বছর ২ মাসে দেশের বিভিন্ন থানায় ২ হাজার ৬ শতাধিক মামলা দায়ের করা হয়। এ আইনে ৩০ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করার বিধান থাকলেও তা কার্যকর হয়নি। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত শেষ না হওয়ায় ট্রাইব্যুনালে বিচার কাজ এগুয়নি। ২৬ আগষ্ট ২০০০ একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত হয় যে, 'জননিরাপত্তা আইন কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও ঢাকা মহানগরীতে হত্যা ও অপরাধপ্রবণতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। পুলিশের রেকর্ড অনুযায়ী গত বছরের জানুয়ারি থেকে ২১ আগষ্ট পর্যন্ত রাজধানীতে ২শ'১৩ ব্যক্তি খুন হয়। অথচ পূর্ববর্তী বছরে ঐ একই সময়ে খুন হয়েছিল ১শ' ৯২ জন।' ২১ অক্টোবর প্রকাশিত একটি দৈনিকের খবর অনুযায়ী, জননিরাপত্তা আইন কার্যকর হওয়ার পর সারাদেশে প্রথম ৭ মাসে ১ হাজার ১শ'৪৮টি মামলা দায়ের হয়। এসব মামলায় এজাহারভুক্ত আসামীর সংখ্যা ৬ হাজার ৭শ' ২২ জন। গ্রেফতার হয় ২ হাজার ৪শ' ২৯ জন। এর মধ্যে ১শ' ৩টি মামলার নিষ্পত্তি হয় এবং ২৫ টি মামলায় আসামীরা বেকসুর খালাস পায়। শুধু ঢাকাতেই জননিরাপত্তা আইন বলবতের প্রথম ৬ মাসে ৫২ জনকে বিনা অপরাধে গ্রেফতার করা হয়। একটি দৈনিকে উল্লেখ করা হয় যে, ৫৩টি মামলায় পুলিশ ৫২ জনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দাঁড় করাতে পারেনি। ফলে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু মিথ্যা মামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অন্যদিকে এ ধরনের মিথ্যা মামলায় গ্রেফতারকৃতরা পুলিশের চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেরিতে দেয়াতে দীর্ঘদিন কারাভোগ করেছে। মিথ্যা মামলা করার জন্য বরিশালে একজন বাদীর দু'বছরের কারাদন্ড হয়। এছাড়া ঢাকাতে একজন বাদীর ১ বছর কারাদন্ড হয়। তার মামলায় দায় থেকে খালাস দেয়া হয়েছে অভিযুক্তকে। এই দন্ডপ্রাপ্ত বাদী হলেন, রাজধানীর ১৫, আরামবাগ এলাকার বাসিন্দা তোবারক হোসেন খসরু। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে যে, খালাস পাওয়া দু'জন অভিযুক্তই হচ্ছে সিটি এসবি'র দারোগা এম এ ফাত্তাহ ও নায়েক তোতা মিয়া।

ঢাকার জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এপ্রিল ২০০১ পর্যন্ত ৫শ' ৩০টির অধিক মামলা ছিল। এসব মামলায় অভিযুক্ত ৪ হাজারের বেশি লোক বিচারাধীন অবস্থায় কারাবন্দী ছিল।

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানায় ২০০০ সালে জননিরাপত্তা আইনে নজীরবিহীন একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলা বাদী স্বয়ং থানার ওসি মোঃ নাজমুল ইসলাম। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এলাকায় বোমাবাজি ও গোলাগুলি করে ত্রাস সৃষ্টি করার অভিযোগে আইনের ১০ ও ১২ ধারায় ওসি বাদী হয়ে থানায় এ মামলা দায়ের করেন। মামলার এজাহারে জামায়াত ও শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডার হিসেবে উল্লেখ করে ৫০/৬০ জনকে আসামী করা হয়। এতে ৪৩ আসামীর নাম-ঠিকানা দেয়া হয়। সশস্ত্র ক্যাডার হিসেবে যাদের নামে মামলা রুজু করা হয় তাদের মধ্যে কলেজের অধ্যাপক, মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী যুবক, পঙ্গু, বয়োবৃদ্ধব্যক্তি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক, বিমানবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা, ৮০ বছরের বৃদ্ধ এমনকি আওয়ামী লীগের নেতাও ছিল। এজাহারভুক্ত আসামীদের মধ্যে ৯০ শতাংশই কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলনা। অথচ এদের সবাইকে জামায়াত-শিবিরের সশস্ত্র

www.pathagar.com

ক্যাডার হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সাতকানিয়া থানা পুলিশ ২৪ সেপ্টেম্বর গাটিয়াডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির সহযোগিতায় ৫টি মামলার আসামী শাহাদাত হোসেনকে ফকিরপাড়া থেকে গ্রেফতার করে। পুলিশ তার কাছ থেকে একটি অত্যাধুনিক অয়্যারলেস সেট উদ্ধার করে। মামলার এজাহারে বলা হয়, 'গাটিয়াডাঙ্গা গ্রামে জামায়াত-শিবিরের সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল এবং জননিরাপত্তাসহ একাধিক মামলার আসামী এলাকায় বোমাবাজি ও গোলাগুলি করে জনমনে আতঙ্ক এবং ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করছে।' এজাহারে বলা হয়, 'গোপন সংবাদে আরো জানা যায় যে, ঐ স্থানে জামায়াত-শিবিরের ৫০/৬০ জন সশস্ত্র ক্যাডার গোপনে সংঘবদ্ধ হয়েছে। তারা ধ্বংসাত্মক কোন ঘটনা ঘটিয়ে বর্তমান সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলার অপচেষ্টা করছে। এ খবর পেয়ে পুলিশ দল সার্কেলের এএসপি ও ওসির নেতৃত্বে গাটিয়াডাঙ্গায় সন্ত্রাসীদের অবস্থানে ১০০ গজ কাছে পৌছলে ৫০/৬০ জন পুলিশের দিকে টর্চলাইট মারে। তখন পুলিশ তাদের দিকে পাল্টা টর্চলাইট মেরে চ্যালেঞ্জ করে। এ পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা তাদের হাতে থাকা বিভিন্ন অগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে পুলিশের প্রতি গুলি ছোঁড়ে।' মামলা এজাহারে বলা হয়, 'এ সময় এএসপি সার্কেল তার হাতে থাকা সরকারি চাইনিজ এসএমজি থেকে ৬ রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। তার নির্দেশে গাটিয়াডাঙ্গা ক্যাম্পের সুবেদার সালাহউদ্দিন তার এসএমজি থেকে ১ রাউন্ড, কনষ্টেবল বাদল রাইফেল থেকে ৯ রাউন্ড গুলি ছুঁড়লে অস্ত্রধারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ সময় ওসি নিজে আসামী শাহাদাতকে ঝাপটে ধরে। বাকীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।' মামলার এজাহারে বলা হয়, 'কয়েকজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে গ্রেফতারকৃত শাহাদাতকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে উক্ত আসামীদের নাম বলে।' মামলার এজাহারে যে ৪৩ জনের নাম ঠিকানা দেয়া হয় তাদের মধ্যে চট্টগ্রামের রেয়াজউদ্দিন বাজার, কাপ্তাই খাতুনগঞ্জ জহুর হকার্স মার্কেটের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছিল ৮/১০ জন। এদের সবার বয়স ৫০ বছরের কাছাকাছি। আসামীর তালিকায় মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজের শিক্ষক ছিল ৫ জন। ৭ নং আসামী শামসুল আলম বিমানবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ২৬ নং আসামী রুহুল আমিন দীর্ঘদিন থেকে সৌদী প্রবাসী, ১৮ ও ২২ নং আসামী কক্সবাজার জেলার চকরিয়ার ব্যবসায়ী। স্বপরিবারে তারা চকরিয়াতেই থাকেন। ১৯ নং আসামী ইলিয়াছ পঙ্গু এবং দিনমজুর, ৩০ নং আসামীর বয়স ৮০ বছর, পেশায় তিনি বিশিষ্ট পরিবহন ব্যবসায়ী।

রাজশাহী অঞ্চলে জননিরাপত্তা আইন ব্যক্তিগত শত্রুতা চরিতার্থ করার অন্যতম হাতিয়া হিসেবে পরিণত হয়। রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসায় হয়রানি করতেই প্রধানতঃ এ আইনে মামলা দায়ের হয়। বিভিন্ন অভিযোগে দায়েরকৃত মামলার অধিকাংশই খারিজ বা আসামী বেকসুর খালাস হয়ে যায় সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে। জননিরাপত্তা আইন চালুর পর থেকে জানুয়ারি ২০০১ এর তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত ৮৯টি মামলা দায়ের হয়। এর মধ্যে ৩১টি মামলার আসামীরা বেকসুর খালাস পায় সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকায়। রাজশাহীতে জননিরাপত্তা আইনে প্রথম দায়েরকৃত মামলাটি ছিল বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের আসামী করে। যা খারিজ হয়ে যায়। জানুয়ারি ২০০১ এর তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত মাত্র ৭টি মামলায় ২১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি দেয়া হয়। বাকীগুলো বিচারাধীন ছিল। এর মধ্যে ২০০০ সালের মামলা ছিল ২১টি এবং ২০০১ সালের ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত ২৮ টি মামলা হয়। এর মধ্যে ১টি মামলা চূড়ান্ত রিপোর্ট দিলে আসামীরা বেকসুর খালাস হয়।

৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় একটি বক্তব্যের প্রতিবাদে বানিয়াচং এল.আর.হাই স্কুল মাঠে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির

www.pathagar.com

সভাপতি মাওলানা আব্দুল বাছিত আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসমাবেশে তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে এর জের ধরে ২৪ ফেব্রুয়ারি বানিয়াচংয়ের ছিলাপাঞ্জা নামক স্থানে অবরোধ সৃষ্টি করলে সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত সুবোধপুর থেকে ফিরে আসেন। পরবর্তীতে বানিয়াচং থানার এস.আই. এনামুল হক বাদী হয়ে ৪নং বানিয়াচং দক্ষিণ-পশ্চিম ইউপি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী মমিনসহ ২২ জনের নাম উল্লেখ করে আরো ১০ হাজার মানুষের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেন। পুলিশ কর্তৃক দাখিলকৃত চার্জশীটে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ৪নং বানিয়াচং দক্ষিণ-পশ্চিম ইউপি চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী মমিন, বানিয়াচং উপজেলা ছাত্রদল সভাপতি মোঃ ফারুক মিয়া, জামায়াতে ইসলামী নেতা ডা. সফিকুর রহমান ঠাকুর, জাতীয় পার্টি নেতা আব্বাস আলী খান ও আংগুর মিয়া, বিএনপির নেতা ডা. কবির মিয়া, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ নেতা আলম খান, যুবদল সভাপতি শামীম চৌধুরী, ছামাউন খাঁ, বাবুল, মিজান খাঁ, ময়না মিয়া, মোজাহিদ, মামুন খান, গোলাম মোস্তফা, মুছা মিয়া, মোতালিব লস্কর, সোহেল মিয়া, মতিউর রহমান, সোহেল, আতিক, আলফু মিয়া, ইছাক মিয়া, জাবেদ মিয়া। উক্ত মামলা দায়েরের প্রতিবাদে হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সমাবেশে অবিলম্বে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার এবং সুরঞ্জিত সেন গুপ্তকে তার দেয়া বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে ক্ষমা প্রার্থনার আহবান জানানো হয়। অন্যথায় তাকে বাংলাদেশে অবাঞ্ছিত ঘোষণার দাবি জানানো হয়। এদিকে ১৯ মার্চ হাইকোর্টের বিচারপতি এম.এ. আজিজ ও বিচারপতি মোঃ শামসুল হুদার সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে বানিয়াচং থানার জননিরাপত্তা আইনে দায়েরকৃত মামলার ১৯ জন বিবাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে বানিয়াচং-এ ১০ হাজার মানুষের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে দায়েরকৃত মামলায় বিবাদীদের মৌলিক অধিকার লংঘিত হয়েছে বলে কেন ঘোষণা করা হবে না-এ মর্মে সরকারের প্রতি রুলনিশি জারি করা হয়। রুলনিশি শুনানির আগ পর্যন্ত বিবাদীদের গ্রেফতার ও হয়রানি না করার জন্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে নির্দেশ দেয়া হয়।

www.pathagar.com

আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতা

আওয়ামী শাসনামলে ঘটিত আলোচিত কয়েকটি ঘটনার মধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরিবর্তনের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ রফিকুল ইসলাম-এই অজুহাতে তাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে মুজিবের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর ছেলে মোহাম্মদ নাসিমকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আসনে বসিয়ে দেয়া হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে মেজর (অব.) রফিকুল ইসলামের বিদায় কেন হয়েছিল, কারা আইন-শৃংখলা অবনতির জন্য দায়ী, কারা সন্ত্রাসীদের মদদদাতা তা নিয়ে সংবাদপত্রে কিঞ্চিত আলোকপাত হয়েছে।

১১ মার্চ ১৯৯৯ প্রধানমন্ত্রী তার মন্ত্রীসভার দফতর পুনর্বন্টন করেন। তাতে রফিকুল ইসলামকে সরিয়ে দিয়ে টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয়। রফিকুল ইসলামকে করা হয় দফতরবিহীন মন্ত্রী। সরকারিভাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এই পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি, কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির শোচনীয় অবস্থাই যে এর মূল কারণ সেটা জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়।

রফিকুল ইসলাম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাবস্থায় প্রকৃত সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের গ্রেফতারের জন্য তোড়জোর শুরু করেছিলেন। কিন্তু তার এই প্রচেষ্টা বেশিদূর যায়নি। তখন অভিযোগ পাওয়া যায় যে রফিকুল ইসলাম চিহ্নিত আসামীকে ধরতে বলছেন আর আরেক মন্ত্রী টেলিফোন করে চিহ্নিত আসামীকে ধরতে মানা করেছেন। মূলত আওয়ামী সরকারের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই আইন-শৃংখলা অবনতির জন্য দায়ী ছিল। বস্তি এলাকায় আসামীরা পুলিশের উপর আক্রমণ চালিয়েছে অথচ তাদের না ধরতে উপরের অদৃশ্য মহল থেকে আদেশ এসেছে।

১৯৯৮ সালে দেশে প্রতিদিন গড়ে নয়জন করে মানুষ খুন হয়। আহত হয় অসংখ্য মানুষ। পুলিশ হেড কোয়ার্টার থেকে পাওয়া ১ মাসের খুনের পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া যায় এই চিত্র। জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে সারাদেশে খুন হয় ২৬০২ জন। প্রতি মাসে গড়ে খুন হয় ২৬২ জন করে। নভেম্বর মাসে এ সংখ্যা বেড়ে যায় হঠাৎ করে। নভেম্বর মাসে রাজধানীর বাইরে যশোর, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুরে একই ঘটনায় ২০ জনের বেশি লোক খুন হয়। ১৯৯৭ সালের ১২ মাসে দেশে খুন হয়েছিল ২৭১৯ জন। ১৯৯৬ সালে ঐ সংখ্যা ছিল ২৭৪ জন। ১৯৯৬ সালের তুলনায় ১৯৯৭ সালে খুনের সংখ্যা তেমন না বাড়লেও ১৯৯৮ সালে খুন বেড়ে যায় হু হু করে। সারাদেশের সাথে রাজধানীতেও খুনের ঘটনা বেড়ে যায় উল্লেখজনক হারে। রাজধানীতে প্রতিদিন তিন দিনে দু'জন করে খুন হয়। *(সূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ ১ জানুয়ারি ১৯৯৯)*

১৩ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এডভোকেট মোঃ রহমত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিটির বৈঠকে বিএনপি সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ বীর বিক্রম ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরে পুলিশের সামনে অহরহ ছিনতাইসহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বৈঠকে জানান, 'পুলিশের উপস্থিতিতে অহরহ অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে। পুলিশের সামনেই ছিনতাই হচ্ছে। অথচ পুলিশের

www.pathagar.com

সাহায্য চাওয়া হলে পুলিশ বলছে আমাদের কিছুই করার নেই।' জনাব হাফিজ সভায় অভিযোগ করেন তার নির্বাচনী এলাকা লালমোহন থানার ২০ গজ দূরে ৪টি দোকান লুট হবার পরও আজ পর্যন্ত এখন আসামীও গ্রেফতার করা হয়নি এবং যাদের দোকান লুট করা হয়েছে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বৈঠকে দেশের ৪টি মূখ্য মহানগর হাকিমের দফতরের সাংগঠনিক কাঠামো, লোকবল ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে মেজর হাফিজ বলেন, 'সিএমএম আদালতের পরিবেশ খুব খারাপ।' তিনি শিশু তানিয়া হ বেশকিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। বৈঠকে বিচারকার্য ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মহানগর হাকিম আদালতগুলোতে বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধির, আবাসন ও পরিবহন সুবিধাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষকে পরামর্শ দেয়া হয়।

সংসদে উত্থাপিত এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদকে অবহিত করেন যে ১৯৯৮ সালে সারাদেশ থেকে ৪০৯৩ টি অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের সর্বাগ্রে ছিল ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার স্থান। উদ্ধারকৃত অস্ত্রের সংখ্যা ৭৭১টি। এরপর চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার স্থান, উদ্ধারকৃত অস্ত্রের সংখ্যা ২৪৫টি। চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে থেকে উদ্ধারকৃত অস্ত্রের সংখ্যা ২১০টি। এর পরে ছিল কুষ্টিয়া ও যশোর উদ্ধারকৃত অস্ত্রের সংখ্যা যথাক্রমে ২০১ টি ও ১৯৬ টি। ঝিনাইদহ থেকে ১০৯টি ও সাতক্ষীরা থেকে ১০৭টি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, বগুড়াসহ অন্যান্য জেলা থেকেও বিপুল সংখ্যক অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। (সূত্রঃ দৈনিক জনতা ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯)

১৯৯৮ সালে উত্তরাঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন, নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৮ সালে উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলায় খুন হয় ৯০২ জন। ৩ সহস্রাধিক নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা রেকর্ড করা হয়। ১৬ হাজারেরও বেশি গ্রেফতারী পরোয়ানা তামিল হয়নি। চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, রাহাজানি ও সড়ক ডাকাতি মামলা অন্যান্য বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ ছিল। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, ছিনতাইয়ের ঘটনায় বগুড়া জেলা শীর্ষে ছিল। নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলায় শীর্ষে ছিল সিরাজগঞ্জ জেলা। থানায় থানায় পুলিশের স্বল্পতা, যানবাহনের সংকট, দায়িত্ব পালনে অবহেলা, গ্রেফতারকৃত আসামীদের সহজে জামিন, রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতাই উত্তরাঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির মূল কারণ হিসেব চিহ্নিত হয়। তাছাড়া মামলার তদন্তে গাফিলতি, বিলম্ব, যথাসময়ে পরোয়ানা জারি না করায় অপরাধীরা নির্বিঘ্নে অপরাধ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। বিভাগীয় পুলিশ দপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, জানুয়ারি মাসে বগুড়া সদর থানাসহ ১১টি থানায় খুন হয় ১৪ জন। ১৬ জেলার ১২৪ থানায় চুরি, ডাকাতি, দাঙ্গা-হাঙ্গামার মামলা রেকর্ড করা হয় ১ হাজার ৬৬৫টি। নারী ও শিশু নির্যাতনের সংখ্যা ৩ হাজার ১৫৮টি। এর মধ্যে সিরাজগঞ্জ জেলাতেই ১২০১টি মামলা হয়। বগুড়া জেলায় সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, দাঙ্গা-হাঙ্গামাসহ বিভিন্ন অপরাধের মামলা রেকর্ড করা হয় ৩৫৯৪টি। দায়েরকৃত এইসব মামলার অধিকাংশই তদন্ত সম্পন্ন হয়নি। ১৬ হাজার ৩৩৫টি গ্রেফতারী পরোয়ানা ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত জারির অপেক্ষায় ছিল। তদন্তে গাফিলতি, যথাসময়ে তদন্ত সম্পন্ন না করা, আদালতে সাক্ষীর গরহাজির, থানা হতে কেস প্রেরণ না করায় নারী ও শিশু নির্যাতনের অধিকাংশ মামলা খারিজ হয়ে যায়। (সূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯)

www.pathagar.com

১৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকার মালিবাগ রেল লাইন সংলগ্ন বস্তির সন্ত্রাসীরা পুলিশ কনস্টেবল আছালতের হাতের কব্জি কেটে দেয়। রাত ১১ টার দিকে টহলরত পুলিশ আছালত বস্তির আসামী মিন্টু ও কামালকে ধরতে যায়। পুলিশ এক আসামীকে ধরে ফেলে। সন্ত্রাসীরা পুলিশের হাত থেকে আসামী ছিনিয়ে নেয় এবং পুলিশ আছালতের ডান হাতের কব্জি কেটে দেয়। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দীর্ঘদিন যাবত রহিম গ্রুপের সদস্যরা বস্তিতে ফেনসিডিল ব্যবসাসহ বিভিন্ন অবৈধ কার্যক্রম করে আসছিল। ঘটনার দিন রহিম গ্রুপের মিন্টু ও কামালকে গ্রেফতার করলে বস্তির সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে পুলিশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ সময় আছালতসহ হাবিলদার মঞ্জুর আহত হন।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কাঁচপুর এলাকায় একই অবস্থা বিরাজ করেছে। গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে জবরদখলকারী, দুষ্কৃতকারী ও চাঁদাবাজদের দখলে চলে যাওয়ার ফলে প্রতিদিন মানুষকে পোহাতে হয় চরম দুর্ভোগ আর পরিবহনকে দিতে হয় হাজার হাজার টাকা। মহাসড়কে কৃত্রিম যানজট সৃষ্টি করে প্রতিনিয়ত করা হয় চাঁদাবাজী। আর এরই ফলশ্রুতিতে ভয়াবহ যানজটের প্রভাব গিয়ে পড়ে ঢাকায়। ঘন্টার পর ঘন্টা মাল বোঝাই ট্রাক, যাত্রীবাহী বিলাসবহুল বাস ও অন্যান্য যানবাহন আটকা পড়ে থাকে যানজটে, যা দেশীয় অর্থনীতি ও সার্বিক কর্মকান্ডকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করছিল। প্রভাবশালী চক্রটি স্থানীয় প্রশাসন, থানা পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশকে অর্থ ও ক্ষমতার জোরে এমনভাবে পকেটবন্দী করে রাখে যে, কৃত্রিম যানজট তৈরি ও নিরসনের ক্ষেত্রে তাদের সামান্যতম ভূমিকাও থাকেনি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের এই স্থানটিতে যানজটের কারণ নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট ডেমরা থানা, সিদ্ধিরগঞ্জ থানা ও ট্রাফিক পুলিশকে পৃথক পৃথকভাবে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু পুলিশ যানজটের কারণ হিসেবে গাড়ি চালকদের অদক্ষতা ও আইনের প্রতি অশ্রদ্ধাকে দায়ী করে একটি দায়সারা গোছের রিপোর্ট পেশ করে নিজেরা পার পেয়ে যায়। পরবর্তীতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে একটি পর্যবেক্ষণ শেষে বিশেষজ্ঞরা চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্ট অনুযায়ী স্থানীয় একটি চক্র কতিপয় পুলিশের সহযোগিতায় চাঁদাবাজীর জন্যই এই মহাসড়কে কৃত্রিম যানজট সৃষ্টি করে আসছিল। পাথর নিতে আসা শত শত ট্রাক রাস্তার উপর অনিয়ন্ত্রিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে স্বাভাবিক যানচলাচল বিঘ্নিত হয়। চক্রটি বাস ট্রাক, টেম্পো আটকে চাঁদা উঠায়। চাঁদা উত্তোলনের ক্ষেত্রে কখনো কোন হেরফের হলেই রাস্তার ওপর যত্রতত্র বাস আটকে রেখে যানজট সৃষ্টি করা হয়। এই যানজটের সুযোগে পকেটমার ও ছিনতাইকারী দল প্রচন্ড ভিড়ের মধ্যে যাত্রীবাহী বাস-টেম্পোতে উঠে পড়ছে। যানজটের ফলে স্থানীয় হকার ও খবরের কাগজ বিক্রেতাদেরও সুবিধা হয়। প্রতিটি হকারকে প্রতিদিন নির্ধারিত অংকের চাঁদা প্রদান করতে হয়। যানজটের সৃষ্টি হলে সর্বাধিক লাভবান হয় পুলিশ। স্বাভাবিক অবস্থায় বাস, ট্রাক তল্লাশীর ক্ষেত্রে পুলিশকে বেশ কিছুটা সমস্যা পোহাতে হয়। কিন্তু যানজটে আটকে পড়া মাল বোঝাই ট্রাক ও বাসচালকদের কাছ থেকে টুপইস কামিয়ে নেয়া যায় সহজেই। এছাড়াও স্থানীয় চাঁদাবাজ ও ট্রাক, টেম্পো শ্রমিকদের মধ্যে বেশ কয়েকটি দল রয়েছে। প্রায়শই চাঁদার ভাগাভাগি নিয়ে এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেধে গেলে রাস্তার ওপর খালি ট্রাক, টেম্পো, গাছের গুড়ি, ড্রাম ফেলে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়। যানজট বিরোধকল্পে এই সড়কে বেশ কয়েকটি পুলিশের পেট্রোল কার নিয়োজিত থাকলেও তাদের ভূমিকা হতাশাব্যঞ্জক ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘন্টার পর ঘন্টা যানজট লেগে থাকলেও থানা পুলিশ তাতে নাক গলায় নি। সার্বিক দিক মিলিয়ে পুলিশের সীমাহীন অবহেলা, অনিয়মতান্ত্রিকতা ও অপরাধী

www.pathagar.com

চক্রের অবাধ অপতৎপরতার ফলে যানজট ও জনদুর্ভোগের যাত্রা দিন দিন বেড়েছিল। ২ মার্চ ১৯৯৯ স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষে জনৈক মোঃ ইকবাল হোসেন, ঠিকানা ঢাকা-চট্টগ্রাম রোড, সিদ্ধিরগঞ্জ একটি অভিযোগ পত্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম বীর উত্তমের বরাবরে পেশ করেন। উক্ত দিনই অভিযোগটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হস্তগত হয়। অভিযোগে বলা হয়, মোঃ নূর হোসেন, মোঃ আমীর হোসেন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে সার্বিক অব্যবস্থাপনার মূল হোতা। এই চক্রটি দীর্ঘদিন থেকে কতিপয় পুলিশের সহযোগিতায় এই সড়কে চাঁদাবাজী, জমি জবরদখল ও কৃত্রিম যানজট সৃষ্টি করে আসছে। এরা এতই দুর্ধর্ষ যে, এদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাই কর্যকরী হয় না। এদের হীন কীর্তিকলাপ নেই যা থানা পুলিশ অবগত নয়। এই চক্রটির পেছনে রয়েছে আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতার হাত। এই চক্রটির প্রধান আস্তানা সড়ক পরিবহন শ্রমিক সংঘের ৪৯৪ নম্বর অফিস। এখানে বসে চাঁদাবাজরা রাস্তায় গাড়ি আটকে প্রতিদিন লাখ লাখ টাকা চাঁদা আদায় করে। যা সম্পূর্ণ অবৈধ ও নিয়ম বহির্ভূত। এরা প্রতিটি বাস থেকে ১০ টাকা, বালু বা পাথরের ট্রাক থেকে ২৫ টাকা, টেম্পো থেকে ৫ টাকা, ফল ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ১০ টাকা, হকার ও খবরের কাগজ বিক্রেতাদের কাছ থেকে ৫ টাকা হারে আদায় করে। এছাড়াও রাস্তার উভয় পাশে সড়ক ও জনপথ বিভাগ ও ওয়াপদা বালুর মাঠের পূর্ব পাশে সরকারি খাস জমিতে পাথর ও বালুর গদি স্থাপন করে নিয়মিত চাঁদা আদায় করে। চাঁদার বিনিময়ে প্রধান সড়কের ওপর পাথর ও বালুর ট্রাক লোড করার সুযোগ করে দেয়া হয়। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ৭ মার্চ ১৯৯৯)

রফিকুল ইসলামের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদ থেকে বিদায় নেয়ার পর নাসিমের সময়কাল দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির আরো অবনতির ঘটে। ১৪ মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নতুন দায়িত্ব গ্রহণের পর মোহাম্মদ নাসিম মন্ত্রণালয়ে প্রথম দিনের ব্যস্ত কর্মময় দিবসের বিকেলে মন্ত্রণালয়ে উপস্থিত কয়েকজন সাংবাদিককে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানান। তিনি জানান যে প্রথম কয়েকদিনে এই মন্ত্রণালয়ে সামগ্রিক ধারণা গ্রহণ করবেন এবং পরবর্তীতে একটি ওয়ার্কিং টিম সুসংগঠিত করে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করবেন। মন্ত্রী বলেন, 'সন্ত্রাস আমাদের দেশে এখন একটি সামাজিক ব্যাধি। একে মোকাবেলা করতে অনেক কঠিন পথ পাড়ি দিতে হবে।' মন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, 'আমার মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা।' তিনি সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রশংসা করে বলেন, 'মন্ত্রণালয় পরিচালনা ও দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।' নাসিম বলেন, 'ইতোমধ্যে কয়েকটি অনাকাংখিত ঘটনা আমাদের বিব্রত করেছে। এ জন্যই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ও ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্টদের চিহ্নিত করে শাস্তির জন্য আইনের হাতে সোপর্দ করতে চান।' মন্ত্রী বলেন, 'এই লক্ষ্যেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড পরিচালিত হবে।' তিনি বলেন, 'এক্ষেত্রে প্রথম অগ্রাধিকার ভিত্তিক কাজ হবে কুষ্টিয়া ও যশোরের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করা। তাদের আইনের কাছে সোপর্দ করা।' খুলনা বিভাগের ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসী কার্যকলাপ নির্মূল করাকেও অগ্রাধিকার দেয়া হবে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'এ বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।' এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে মন্ত্রী বলেন, 'সন্ত্রাসীদের সঙ্গে কোন আপোস করা হবে না। সন্ত্রাসী যেই হোক না কেন, তাকে শাস্তি পেতেই হবে।' এক প্রশ্নের জবাবে নাসিম বলেন, 'ভীষণ টেনশনে আছি, নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর কর্মী এবং শুভানুধ্যায়ীরা বড় রকমের আশাবাদী হয়ে উঠেছেন। তাদের মধ্যে সৃষ্ট প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবো কি-না এটা নিয়েই এখন টেনশনে আছি।'

www.pathagar.com

১৩ মার্চ রাত ৮ টায় ঢাকা কলেজের দুই ছাত্র সাঈদ আহমেদ টিপু ও ইমরান একটি প্রাইভেট কার (ঢাকা মেট্রো-ক-০২-১৪৬৯) এ করে উত্তরা যাবার পথে খিলক্ষেত নিকুঞ্জ-২ পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের কাছে তাদের গাড়ির গতিরোধ করা হয়। গতিরোধ করে সন্ত্রাসীরা দু'জনকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করে। পরে পুলিশ গাড়ির ড্রাইভার আনিসুর রহমান জাবেদকে গ্রেফতার ও গাড়িটি উদ্ধার করে। নিহত টিপু নুরজাহান রোড মোহাম্মদপুর ডি ব্লকের মরহুম আব্দুল মতিনের পুত্র এবং নিহত ইমরান উত্তরার হাজী মোজাফফর হোসেনের পুত্র ছিল। টিপুর ভাই মেজর আজিজ আহমেদ বাদী হয়ে বাড্ডা থানায় একটি মামলা করেন। একই দিনে ট্রাক চালক শিপন খুন হয় মধ্যরাতে। তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ভ্যানচালকদের সাথে কয়েকজন ট্রাক চালকের প্রথমে কথাকাটাকাটি ও পরে তুমুল মারামারি বাধে। এসময় আলুর আড়তের শ্রমিকরা ভ্যান চালকদের সাথে যোগ দেয়। বেদম প্রহারে শিপন মারাত্মক আহত হয়। হাসপাতালে ভর্তির পর তার মৃত্যু হয়। নিহত শিপন নোয়াখালী সেনবাগের এয়াবপুর গ্রামের আব্দুল হাইয়ের পুত্র ছিল। আলু ব্যবসায়ীদের সাথে সংঘর্ষে নিহত ট্রাক চালকের লাশ নিয়ে মিছিল বের করলে পুলিশের সাথে ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ গুলি ছুঁড়লে ১৮ জন আহত হয়। ১৪ মার্চ কলাবাগান এলাকায় অপহরণ করে এনে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় হাসিবুর রহমান মন্টি নামে এক যুবককে। দুপুর সাড়ে ১২টায় লেক সার্কাস কলাবাগানের জাহাঙ্গীরের একটি ৫তলা নির্মাণাধীন বাড়ির নিচতলায় তাকে দুর্বৃত্তরা হত্যা করে। নিহত মন্টি লেক সার্কাস এলাকার হাফিজুর রহমানের পুত্র ছিল। একই দিনে দুপুর পৌনে একটায় মতিঝিল থানার ওসি লুৎফর রহমান কমলাপুর ব্যারাক বস্তির দিকে যাওয়ার সময় তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি ছোঁড়া হয়। গাড়িতে করে যাবার পরে ব্রাদার্স ক্লাবের মোড়ে দেখতে পান জনৈক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে সন্ত্রাসী নুরুল ইসলাম স্বপন রিভলবার তাক করে আছে। ওসি সন্ত্রাসীর উপর ফিল্মী কায়দায় লাফিয়ে পড়লে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সন্ত্রাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওসিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। এতে ওসি আহত হন। এ সময় ওসির গাড়ি চালক কনস্টেবল মোজাম্মেল হোসেন শর্টগান নিয়ে সন্ত্রাসীর উপর গুলি ছোঁড়ে। পরে আহত অবস্থায় সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করা হয়। সে সবুজবাগ থানাধীন মানিকনগর এলাকার জনৈক সাহাবুদ্দিনের পুত্র। এ সময় আটক করা হয় ব্যবহৃত রিভলধার সহ ৩ রাউন্ড গুলি। আলামত হিসেবে উদ্ধার করা হয় দু'টি গুলির খোসা। একইদিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নীলক্ষেতে বসবাসকারী রীতা দত্ত নামে তরুণী ছিনতাইয়ের শিকার হন। তিনি যখন তার কর্মস্থল পলমল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন তখন ভিসির বাসার দরজার সামনে কয়েকজন মোটর সাইকেল আরোহী তার রিকশার গতিরোধ করে। তার গলার সোনার চেইন, হাতের ঘড়ি, ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ৫০ হাজার টাকার সঞ্চয়পত্র ও ৭শ' টাকা ছিনতাই করে।

১ মে গার্মেন্টস শ্রমিক কিশোর মিন্টু তার সন্ত্রাসী বন্ধু জামালের কাছে কোতোয়ালী থানাধীন নিমতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে খুন হয়। ৫ মে কমলাপুল বাসস্ট্যান্ডের কাছে সন্ত্রাসীরা শেরপুর থেকে আগত এক ট্রাক চাল ছিনিয়ে নেয়। প্রথমে ট্রাক ড্রাইভারকে জিম্মি করে ও তাদের সুবিধামত জায়গায় নিয়ে গিয়ে চাল রিকশা-ভ্যানে নামিয়ে নেয়ার পর ড্রাইভারকে ট্রাকসহ ছেড়ে দেয়া হয়। ৬ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষ ও গোলাগুলি হয়। ৭ মে রাজধানীতে হাত-পা ও গলার রগ কেটে ছাত্রদল নেতাকে খুন করা হয়। নারিন্দায় চাহিদামাফিক চাঁদা না দেয়ায় সন্ত্রাসীরা

www.pathagar.com

একটি নির্মাণাধীন বাড়ির মালিককে গুলি করে। ৮ মে গুলশান থানাধীন বাড্ডা খেয়াঘাট এলাকায় মাইক্রোবাস আরোহী পেশাদার খুনিরা ফিল্মী কায়দায় বাড্ডা আনারকলি সুপার মার্কেটের দোকান-মালিক ও ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি, স্থানীয় যুবলীগ নেতা হারুনুর রশিদকে প্রাতঃভ্রমণকালে খুন করে, ১০ মে অব্যাহত সন্ত্রাস, হকারদের ফুটপাত দখল ও চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির প্রতিবাদে বায়তুল মোকাররম ব্যবসায়ী সমিতি গোটা মার্কেট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। ১৫ মে ছাত্রলীগ কর্মীর হাতে ভিসি লাঞ্ছিত হওয়ায় শিক্ষকদের ক্লাস বর্জন ও জগন্নাথ ভার্সিটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৬ মে মানিকনগরে সন্ত্রাসীদের সাথে পুলিশের গুলি বিনিময়ের পর গুলিবিদ্ধ সন্ত্রাসী গ্রেফতার হয়, ১৭ মে লক্ষ্মীবাজারে সহকর্মীদের গুলিতে প্রকাশ্য দিবালোকে কবির হোসেন ডানো নামের এক ছিনতাইকারী নিহত হয়। ১৮ মে রাজধানীর বাহাদুর শাহ পার্ক এলাকায় সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজরা এক পরিবহন কর্মচারীর পায়ের রগ কেটে ৩০ হাজার টাকা লুট করে। ১৯ মে সুইডেন আসলামের দুই সহযোগী গ্রুপের গুলি বিনিময়ে ১ সন্ত্রাসী নিহত ও ৫ জন আহত হয়। ২২ মে পশ্চিম ধানমন্ডিতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি ও ৯ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট হয়, ২৩ মে ছিনতাইকারীদের চাপাতির কোপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের দোয়েল চত্বরে এক দম্পতি গুরুতর আহত হয়, ২৪ মে হাজারীবাগ ও কোতোয়ালী থানা এলাকায় দুই তরুণ নৃশংসভাবে খুন হয়। ২৬ মে মিরপুরের পশ্চিম কাজীপাড়া এলাকায় সন্ত্রাসী ও জনতার সংঘর্ষের এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীদের গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত এবং ৫ জন আহত হয়, পশ্চিম আগারগাঁওয়ে দুর্ধর্ষ ডাকাতি, লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট, তেজগাঁওয়ে হুন্ডি ব্যবসায়ীকে ছুরিকাঘাত করে সাড়ে ৪ লাখ টাকা ছিনতাই হয়। ২৭ মে সিটি হার্ট ভবন থেকে নীচে ফেলে আদম ব্যবসায়ীকে হত্যা করা হয়, আগারগাঁওয়ে কেরোসিন গায়ে ঢেলে আগুন দিয়ে গৃহবধু খুন করা হয়, ২৮ মে গোপীবাগে দু'দল সন্ত্রাসীর মধ্যে সংঘর্ষে সাহাবুদ্দিন নামের এক যুবক নিহত হয়, মিরপুরে সন্ত্রাসীদের গুলিতে এক তরণ ও এক কিশোরীর মৃত্যু হয়। ২৯ মে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা ৭৪ নং ওয়ার্ডের ছাত্রদল সভাপতি মামুনের হাতের কব্জি কর্তন করে, মাইক্রোবাসকে সাইড না দেয়ায় ট্রাক ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে সন্ত্রাসীরা গুলি করে। গুলিবিদ্ধ ড্রাইভার শামছুল ইসলাম টুলু পরের দিন মৃত্যুবরণ করে। ৩১ মে মানিক নগর এলাকায় সন্ত্রাসীদের বোমা তৈরির সময় ওসমান নামের এক সন্ত্রাসী নিহত ও ২ জন আহত হয়।

১৯৯৮ সালে রূপগঞ্জ উপজেলার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে বাস ডাকাতি, ছিনতাই নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ২ জানুয়ারি আধুরিয়া এলাকায় বিওসির কাছে নরসিংদী ঢাকাগামী যাত্রীবাহী মিনিবাসে (ঢাকা ব-১১২০) ডাকাতি সংঘটিত হয়। ৫ জানুয়ারি সাদুন এলাকায় ঢাকা থেকে নরসিংদীগামী বাসে (ঢাকা মেট্রো চ-৩০৬) ডাকাতি, ৬ জানুয়ারি রূপসী বাজারে নকিব নামক এক ব্যক্তির কাছ থেকে দিন দুপুরে ৫ হাজার টাকা ছিনতাই, ৮ জানুয়ারি তারাব বিশ্বরোড এলাকায় রাতে জামদানী ব্যবসায়ী জানুর কাছ থেকে ১২ হাজার টাকা ছিনতাই ও ছিনতাইকারীদের ছুরির আঘাতে জানু মিয়া গুরুতর আহত হয়। ৯ জানুয়ারি যাত্রামুড়ায় ছিনতাই, ১০ জানুয়ারি বরাব এলাকায় প্রিয়া টেক্সটাইলের ম্যানেজারের কাছ থেকে ২৫ হাজার টাকা ছিনতাই, ১০ জানুয়ারি বরপা বাজারের পাশে পেরাব গ্রামের হাসান মিয়ার কাছ থেকে ১১ হাজার টাকা ছিনতাই, ১২ জানুয়ারি মৈকুলীতে বেবিটেক্সী আটক করে গন্ধবপুর গ্রামের আলী হোসেনের কাছ থেকে ৭ হাজার টাকা ছিনতাই, ২১ জানুয়ারি খদুন এলাকায় রাত ১০ টার সময় ট্রাক নিয়ে রাস্তা অবরোধ করে সিলেট থেকে ঢাকাগামী বাসে ডাকাতি, ২২

www.pathagar.com

জানুয়ারি কর্নগোপ এলাকায় ইট খোলার মালিকের কাছ থেকে ১ হাজার টাকা ছিনতাই, ৩১ জানুয়ারি পাঁচরুখী (বান্ডি) এলাকায় মাইক্রোবাস নিয়ে অপর একটি মাইক্রোবাস আটক করে দিন,দুপুরে ডাকাতি, ৪ ফেব্রুয়ারি তারাব বিশ্বরোড আড়াই হাজারগামী মিনিবাস আটক করে (ঢাকা মেট্রো ব-৪০৬৯) ডাকাতি, ৮ ফেব্রুয়ারি তারাব বাজারে কাঠ ব্যবসায়ী লালুর কাছ থেকে অস্ত্রের মুখে প্রকাশ্যে ১০ হাজার টাকা ছিনতাই, ১২ ফেব্রুয়ারি নৈকুলী এলাকায় বেবিটেক্সী আটক করে (ঢাকা মেট্রো থ-০৩১১-০৩১১৮) স্বামী-স্ত্রীর কাছ থেকে স্বর্ণালংকারসহ সর্বস্ব ছিনতাই, ১৯ ফেব্রুয়ারি আওখাব এলাকায় ট্রাক দিয়ে রাস্তা অবরোধ করে রাত ১১ টার সময় সিলেটগামী একটি যাত্রীবাহী (চট্টগ্রাম ব-১৫২০ বাসে ডাকাতি ও এ সময় ডাকাতদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে বাসের হেলপারসহ ১০ জন যাত্রী আহত হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি মুড়াপাড়াগামী বাসে রূপসী এলাকায় ডাকাতি, ২১ ফেব্রুয়ারি আড়িয়াব এলাকায় ছিনতাই, ২২ ফেব্রুয়ারি গরু ভর্তি ট্রাক লুট, ৪ মার্চ আড়িয়াব এলাকায় গার্মেন্টসকর্মী বীণার কাছ থেকে তার বেতনের ১৪শ' টাকা ছিনতাই, ১২ মার্চ খাফুন ও বরপা এলাকার সাবেক ইউপি মেম্বারের কাছ থেকে টাকা ছিনতাই, ১৩ মার্চ ভুলতা বাজারের পাশে ভৈরবগামী (ঢাকা মেট্রো-ব-০৪-১৬০) বাসে ডাকাতি, ১৯, ২৩, ২৭ মার্চ রূপসী, খাদুন এলাকায় ছিনতাই, ২৯ মার্চ বরাব এলাকায় মাইক্রোবাসে (ঢাকা মেট্রো-জ-২২১২) ডাকাতি, ১ এপ্রিল কলেজ ছাত্রী বীণার গলার চেইন ছিনতাই, ৪ এপ্রিল সাওঘাট এলাকায় কাপড় ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কাপড়ের গাইটসহ সর্বস্ব ছিনতাই, ৭ এপ্রিল ভৈরবগামী বাসে দিন দুপুরে ডাকাতি, ১৪ ও ১৮ এপ্রিল বরপা ও যাত্রামুড়ায় ছিনতাই, ২৮ এপ্রিল ইটভাটা এলাকায় রাত ৩ টার সময় সিলেট থেকে ঢাকাগামী বাস রাস্তায় ট্রাক দিয়ে অবরোধ করে বাস যাত্রীদের কাছ থেকে সর্বস্ব লুট ও এ সময় ডাকাতদের গুলিতে ৩ জন আহত হয়। ১ মে রাতে খাদুন ও বরপা এলাকায় পেরাব গ্রামে রফিকুল ও মাছিমপুর গ্রামের রহিম মিয়ার কাছ থেকে টাকা ছিনতাই, ২ মে সকালে কলেজ ছাত্রী রীয়ার গলার চেইন ছিনতাই, ৪ মে কাঁচপুর এলাকায় আড়াই হাজারগামী (টাঙ্গাইল-ব-৪১৮১) বাসে ডাকাতি। এ সময় ডাকাতদের ছোরার আঘাতে বাস ড্রাইভারসহ ৫ জন যাত্রী আহত হয়। ৬ মে যাত্রামুড়া এলাকায় রাস্তায় গাছ ফেলে মাইক্রোবাসে ডাকাতি, ৯ মে আকর একি এলাকায় সংঘটিত হয় বাস ডাকাতি, ১০ মে বরাব এলাকায় ছিনতাই, ১৪ মে কাঁচপুর সিনেমা হলের সামনে বি-বাড়িয়াগামী বাসে ডাকাতি, ৩ জুন ভুলতায় বাস ডাকাতি, ১২ জুন রাতে মুড়াপাড়ায় মাইক্রোবাস নিয়ে স্বর্ণ দোকানে ডাকাতি, ১০, ১১, ১৫, ২২ জুন বরপা, কার্নগোপ, তারাব, রূপসী এলাকায় পৃথক ছিনতাই, ২৩ জুন আধুরিয়া এলাকায় ঢাকা থেকে পলাশগামী (ঢাকা মেট্রো চ-২২৯) বাসে ডাকাতি, ২৮ জুন পাঁচরুখী এলাকায় বাবুর হাট থেকে কাপড় ব্যবসায়ীদের বাস (ময়মনসিংহ-চ ০৪-০১৮) আটক করে নগদ ২ লাখ টাকাসহ কাপড় লুট, ৩০ জুন খাদুন এলাকায় রাত ১০ টার সময় নরসিংদীগামী বাসে ডাকাতি, ২ জুলাই মুড়াপাড়ায় ছিনতাই, ৯ জুলাই কাঁচপুর ব্রিজের পূর্ব পার্শ্বে গোপাদীগামী বাসে ডাকাতি, ১৩ জুলাই কাঁচপুর ব্রিজের পূর্বপাশে ডাকাতি, ১৮ জুলাই মৈকুলী এলাকায় সুতার ট্রাক লুট, ১৯ জুলাই রূপসী মনিমহল সিনেমার মালিকের কাছ থেকে ১৪শ' টাকা ও হাত ঘড়ি ছিনতাই, ২৭ ও ৩১ জুলাই যাত্রী বেশি ডাকাতরা সাওঘাট ও যাত্রামুড়া এলাকায় দু'টি বাসে ডাকাতি করে, ২ আগস্ট বরপায় ছিনতাই, ৫ আগস্ট কর্ণগোপে বেবিট্যাক্সি আটক করে ছিনতাই, ৭,১০,১৩ আগস্ট আতখাব, পাচরুখী, খাদুন এলাকায় ছিনতাই, ১১ আগস্ট কাঁচপুর এলাকায় বাস ডাকাতি, ৫ অক্টোবর বলাখা গ্রামের ছানাউল্লাহ তার স্ত্রীসহ বাড়ি ফেরার পথে আওখাব

www.pathagar.com

এলাকায় বেবি ট্যাক্সি আটক করে ডাকাতি, ৯ অক্টোবর রূপসীতে বাস ডাকাতি, ১১ অক্টোবর পাঁচরুখী বাজারের পাশে দিন দুপুরে বাস ডাকাতি, ১৭ অক্টোবর সিলেটগামী নাইটে গাড়িতে ডাকাতি, ২১ অক্টোবর বরপা এলাকায় সিলেটগামী মিতালী ট্রান্সপোর্ট বাসে ডাকাতি, এদিন বিকালে আধুরিয়া এলাকায় ঘোড়াশালগামী মিনিবাসে (ঢাকা মেট্রো-চ-৪৩৫০) ডাকাতি, ৩০ অক্টোবর মৈকুলী এলাকায় সিলেট থেকে ঢাকাগামী নিরাপদ পরিবহনের বাসে ডাকাতি। ২০/২৫ জনের ডাকাতদল ট্রাক ঘিরে বাসটি আটক করে অস্ত্রের মুখে যাত্রীদের সর্বস্ব লুট করে। ১৭ নভেম্বর মনোহরদী থেকে ঢাকাগামী বাসে ডাকাতি করার সময় বাস যাত্রী ও বরপা এলাকার জনগণের সহায়তায় ৫ জন ডাকাতসহ ২টি কাটা রাইফেল, ২টি পিস্তলসহ আটক করে, ২৫ নভেম্বর আধুরিয়ায় বাস ডাকাতি, ২৭ নভেম্বর ৩ জন সাংবাদিক কাঁচপুর ব্রিজের কাছে ছিনতাইকারীদের কবলে পরে সর্বস্ব হারান, ১০ ডিসেম্বর আওখার এলাকায় বাসে ডাকাতি করার সময় ডাকাত-পুলিশে সংঘর্ষে স্থানীয় মসজিদের ইমাম ডাকাতদের গুলিতে নিহত হন। এ সময় ২ জন পুলিশও গুলিবৃদ্ধ হয়।

১০ এপ্রিল ২০০০ দৈনিক যুগান্তরের সঙ্গে সাক্ষাতকারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, 'চাঁদা আদায়ের অবৈধ স্থাপনা ভেঙে দিয়ে পরিবহন খাতকে রাহুমুক্ত করতেই হবে।' এ ব্যাপারে তিনি দলমত নির্বিশেষে সবার সমর্থন কামনা করেন। তিনি বলেন, 'স্বার্থপর, দুর্নীতিপরায়ণ চক্রের কাছে লাখ লাখ মানুষ এভাবে জিম্মি হয়ে থাকতে পারে না।' মন্ত্রী পরিবহন খাতে চাঁদাবাজীর কারণে যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে তা যথার্থভাবে তুলে ধরার জন্য সংবাদপত্রের প্রতি আহবান জানান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'বাস টার্মিনালের বাইরে টোলঘর বসিয়ে যারাই চাঁদাবাজী করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সময় কোন বাছবিচার করা হবে না। এর সঙ্গে পুলিশও জড়িত থাকলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন এই কথাগুলো বলছিলেন তখন পরিবহন সেক্টরের চাঁদাবাজীর উপর প্রকাশের জন্য যুগান্তরে একটি রির্পোট তৈরি হচ্ছিল প্রকৃত চিত্রের আলোকপাত করে। যুগান্ত রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাতকার যে দিন প্রকাশ পায় সেদিনই রির্পোটটি প্রকাশ পেয়েছিল। রির্পোটটি থেকে জানা যায়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরিবহন সেক্টরে চাঁদাবাজি বন্ধের জন্য চাঁদা আদায়ের আখড়া টোলঘর ১১ এপ্রিলের মধ্যে ভেঙে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরিবহন সেক্টরে চাঁদাবাজী বন্ধ সহজসাধ্য নয় বলে অনেকে মন্তব্য করেন। তারা বলেন, 'দৈনিক লাখ লাখ টাকা চাঁদা আদায় হয় ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকা থেকে। আর এ চাঁদার ভাগ শুধু শ্রমিক নেতারাই নয়, পুলিশের বড় কর্তাদের পকেটেও যায়। চাঁদাবাজীর সঙ্গে জড়িত শ্রমিক নেতা আর তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা সরকারি দলের (আওয়ামী) নেতা-কর্মীদের আশ্রয়-প্রশ্রয়েই ছিল। পরিবহন সেক্টর প্রতিদিন ইউনিয়ন সংগঠন ইত্যাদি নানা নামে লাখ লাখ টাকার চাঁদা আদায় করা হয়। মহাসড়কে চেকপোস্ট বাসিয়ে, টার্মিনালে শ্রমিক ইউনিয়নের নামে এমনকি প্রকাশ্যে টোলঘর বানিয়ে চাঁদা আদায় চলে। সাভার থানার নয়ারহাটে বাঁশ দিয়ে কল বানিয়ে তৈরি করা হয় চেকপোস্ট। রাস্তার পাশেই ছিল মুলিবাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি অস্থায়ী অফিস ঘর। অফিস ঘরে রাতদিন ২৪ ঘন্টা ১৫/২০ জন তরুণ বসে থাকত। পণ্য বোঝাই ট্রাক আসলেই বাঁশের কল ফেলা হত। প্রতি ট্রাক থেকে ২০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত চাঁদা আদায় করা হয়। ঢাকা-আরিচা ও বঙ্গবন্ধু সেতু অভিমুখী সড়কে ৮/১০টি চেকপোষ্ট ও টোলঘর ছিল। নবীনগর থেকে বঙ্গবন্ধু সেতু যেতে বাইপাইলে আরও দু'টি চেকপোস্ট ছিল। চেকপোস্টের পাশেই ছিল বাংলাদেশ আন্তঃ জেলা ট্রাক চালক ইউনিয়নের অফিস। কোন কোন চেকপোস্ট থেকে আবার

www.pathagar.com

২০ টাকার রসিদ ধরিয়ে দেয়া হয়। রসিদে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি ট্রাক শাখা অথবা বাংলাদেশ আন্ত জেলা ট্রাক চালক ইউনিয়নের নাম থাকে। ট্রাকে কি পণ্য বহন করা হচ্ছে তা দেখে ইচ্ছেমত চাঁদা আদায় হয়। ট্রাক প্রতি ১০০ থেকে ২০০ টাকাও আদায় করা হয়। (সূত্রঃ দৈনিক যুগান্তর ১০ এপ্রিল ২০০০)

কোটালীপাড়ায় প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থলের মাত্র ৫০ গজ দূরে মাটির নিচে রাখা পলিথিনে মোড়ানো ছিল একটি শক্তিশালী বোমা। সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন শাহিনের নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের একটি বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ দল ৭৬ কেজি ওজনের এই শক্তিশালী বোমা উদ্ধার করে ২১ জুলাই ২০০০ যশোর সেনানিবাসে নিয়ে যান। বিশেষজ্ঞ দল বোমাটিকে যশোরের উদীচী ট্রাজেডিতে ব্যবহৃত বোমার চেয়েও শক্তিশালী বলে প্রাথমিকভাবে মন্তব্য করেন। পুলিশ এ ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে শিবির কর্মী কোটালীপাড়া থানার পিঞ্জুরী ও আলিটারপাড়া গ্রামের ফরিদুজ্জামান তরুণ ও জাহাঙ্গীর আলমকে ২০ জুলাই রাতে গ্রেফতার করে। ২২ জুলাই সকাল সাড়ে ১০টায় প্রধানমন্ত্রীর নিজ নির্বাচনী এলাকা কোটালীপাড়া সদরে শেখ লুৎফর রহমান ডিগ্রী কলেজ মাঠে এক জনসভায় বক্তব্য দেয়ার পূর্ব নির্ধারিত তারিখ ছিল। এ মাঠের ৫০ গজ দূরে এবং সভাস্থলের পূর্বদিকে আওয়ামী কর্মী বদিউজ্জামানের চায়ের দোকানের কাছে বোমাটি মাটির নিচে পোঁতা ছিল। ঘটনার দিন সকাল ৬ টার দিকে বদিউজ্জামান পার্শ্ববর্তী পুকুরে চায়ের কেটলী পরিষ্কার করতে গিয়ে কেটলীর সঙ্গে সরু তার জড়িয়ে পড়লে সে পৌর চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা কামাল হোসেনকে খবর দেয়। বিষয়টি থানাকে জানালে জেলা প্রশাসক ইকবাল মাহমুদ, পুলিশ সুপার মোঃ জসিম উদ্দিন ও কর্মরত এসএসএফ কর্মকর্তাগণ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পান যে, হেলিপ্যাড থেকে প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থলে যাবার পথে রাস্তার পাশে মাটির নিচে একটি পলিথিন জাতীয় ব্যাগের মধ্যে কার্বনের আবরণ দিয়ে ঢাকা বোমাটির সাথে তারের এক প্রান্ত যুক্ত রয়েছে এবং তারের অপর প্রান্ত মাটির নিচ দিয়ে ও পুকুরের মধ্যদিয়ে গিয়ে অপর পাড়ে উঠেছে। উদ্ধারকৃত বোমাটি দেড়ফুট উঁচু ও গোলাকৃতি একটি লোহার রড এবং দু'টি অলিম্পিকের পেনসিল ব্যাটারীর সাথে যুক্ত কৌটায় আটকানো ছিল। ২৪ জুলাই রাতে পুলিশ শহরের বিসিক শিল্প নগরী সংলগ্ন হিমাঙ্গন আবাসিক প্রকল্পের সোনার বাংলা সাবান ফ্যাক্টরির মালিক মুফতী মোহাম্মদ আবদুল হান্নান মুন্সির বাসা থেকে বোমা তৈরির কারখানা আবিষ্কারের পর গোপালগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আবদুল হামিদ, জামায়াত নেতা একে এম ইমদাদুল হক, ইসলামী ব্যাংকের ম্যানেজার আক্তার হোসেন, হেকমত আলী কাজী, হাসমত আলী কাজী, কোটালীপাড়া আদর্শ ক্যাডেট মাদ্রাসার শিক্ষক আয়ূব আলী, আহাদ হোসেন, মামুনুর রশীদকে গ্রেফতার করে। ২৬ জুলাই লে. কর্ণেল মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ২১ সদস্যের সেনা বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ দল বেলা আনুমানিক ২-৪৫ মিনিটের সময় হেলিপ্যাডে আরেকটি বোমা নিষ্ক্রিয় করে উদ্ধার করে। দ্বিতীয় বোমাটি প্রথম বোমার মত একই পদ্ধতিতে তৈরী, একটু উন্নতমানের। ওজন প্রায় সমান হবে। বোমাটি উদ্ধারের সময় পুঁতে রাখা স্থানের চারপাশে এক হাজার বালির বস্তা রাখা ছিল। বিস্ফোরক থেকে মাল্টিপল এন্টিলিফটিং ডিভাইস বিচ্ছিন্ন করে এটিকে উদ্ধার করা হয়। বোমাটিকে ১শ' ফুট লম্বা দড়ি দিয়ে টেনে এর অবস্থান থেকে সরানো হয়।

গোলাপগঞ্জের কোটালীপাড়ায় বোমা পুঁতে রাখা এবং চট্টগ্রাম ও যশোরের সাম্প্রতিক হত্যাকান্ডসহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলকে দায়ী করেন। প্রধানমন্ত্রী কোটালীপাড়ায় দুদিনের সফর শেষ করে ঢাকায় ফিরে আসার পর ২২ জুলাই একই

www.pathagar.com

স্থানে আরেকটি বোমার সন্ধান পাওয়া যায়। এ পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ঢাকায় বিবিসির পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হয় যে, বোমা পাওয়ার এ ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী কি তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে উৎকণ্ঠিত, নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গাফিলতির কারণেই কি এটা হয়েছে ?

জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, আমার তো মনে হয়েছে, যারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তারা এ ব্যাপারে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তারা জানে আমাদের নিরাপত্তায় কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয় এবং এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কি মারাত্মক পাল্টা ব্যবস্থা নেয়া যায়, তাই তারা করেছে। এ ব্যাপারে তারা যথেষ্ট ট্রেনিংপ্রাপ্ত এবং বিষয়টি তারা জানে।

কিন্তু বিরোধী দল তো বলছে যে, আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে তাদের যে জোট হচ্ছে তাতে ভীত হয়ে পরিকল্পিতভাবে সরকার এ অবস্থার সৃষ্টি করছে। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে যে ঘটনাগুলো ঘটছে, চট্টগ্রামে যে হত্যাকান্ড, তাকে বিরোধী দল আপনাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল বলছে।

প্রধানমন্ত্রী পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন যে, ভীত হয়ে আমরা আমাদের নিজেদের ছেলে মারবো নাকি? এটা কি করে হয়? আমরা আমাদের ছেলেকে কেন মারতে যাবো? বিরোধী দল তো এরকম মিথ্যা কথা সব সময় বলে। মিথ্যা কথা বলা তাদের অভ্যাস। তারা তো বলেছিল যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে মসজিদে আজানের ধ্বনি শোনা যাবে না, উলুধ্বনি শোনা যাবে। মসজিদে কি উলুধ্বনি শোনা যাচ্ছে ? তারা তো বলেছে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে দেশ ভারত হয়ে যাবে। দেশ কি ভারত হয়ে গেছে? বাংলাদেশ এখনও স্বাধীন সার্বভৌম আছে। এ রকম নির্জলা মিথ্যা কথা বলে তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছে। আর অপরদিকে তারা হত্যাকান্ড চালাচ্ছে।

এই যে, আপনাদের সরকারের চার বছর পার হয়ে গেছে, চার বছরে আপনারা একবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পরিবর্তন করেছেন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির একটি অবস্থায় গিয়ে। দক্ষিণাঞ্চলে আপনারা সাফল্যের কথা বলেছেন। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলে এখনও সহিংস ঘটনা ঘটছে। এই যে, সহিংস ঘটনা রক্তপাত, খুনাখুনী এ পরিস্থিতিতে আপনারা আর কি করতে পারেন?

জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, দেখুন যে দেশে খুনীকে সহযোগিতা করা হয়, খুনীকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়, খুনীদের বিচার হয় না, সে দেশে তো হত্যা-খুন চলবেই। সমস্যা হচ্ছে, পুলিশ কষ্ট করে অপরাধীদের ধরে। কিন্তু আদালত থেকে তারা জামিন পেয়ে যায়। যেন অপরাধীদের একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল হচ্ছে কোর্ট। সেখানে গেলেই তারা জামিন পেয়ে যায়। আর এ জামিন পেয়ে ফিরে এসেই তারা হত্যাকান্ড ঘটাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি তো মনে করি, যে উকিল তাদের জন্য জামিন চাচ্ছেন, সে উকিলকেও ধরা উচিত এবং যে কোর্ট জামিন দিচ্ছে সে কোর্টের জবাবদিহির ব্যবস্থা থাকা উচিত। এ ব্যবস্থা যতদিন এ দেশে প্রতিষ্ঠিত না হবে, আর অপরাধী যে পর্যন্ত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না পাবে সে পর্যন্ত পরিস্থিতি উন্নত করা অত্যন্ত কঠিন। আপনারা কি মনে করেন যে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে আপনারা ব্যর্থ হয়েছেন?

জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, আমরা ব্যর্থ হইনি। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আমরা যথেষ্ট উন্নত করেছি। বিএনপির আমলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কি ছিল, এরশাদ আমলে কি ছিল, জিয়াউর রহমানের আমলে কি ছিল, তার সাথে তুলনা করলে আমরা বলবো যে, তখনকার চেয়ে এখন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি শতভাগ উন্নত। দুই একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটছে। আর কিছু ঘটনা বিরোধী দল ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটাচ্ছে। তবে এখানে আমাদের আরেকটি সমস্যা

www.pathagar.com

আছে। বিএনপি ক্ষমতায় থাকতে কিছু সন্ত্রাসী ও মাস্তানকে পুলিশে চাকরী দিয়ে গেছে। তারাও এ সকল কর্মকান্ডে লিপ্ত। ফলে অনেক সময় আমরা যাদের দিয়ে আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি করবো, সেখানে একটি সমস্যা থেকে যায়।

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কোনো চিন্তা আপনাদের আছে কিনা এ প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, যে ধরনের দাবী আমরা দেখতে পাচ্ছি তা নির্ভর করে জনগণের দাবীর ওপর। জনগণ কি চায় তার ওপর নির্ভর করবে। তবে যারা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করছে, যারা হত্যা, খুন করে যাচ্ছে তাদের ব্যাপারে নিশ্চয়ই দেশবাসীকে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আগামী নির্বাচনে বিরোধী দলগুলোর নির্বাচনী জোট সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, জেনারেল জিয়াউর রহমানের হাতে তৈরি হয়েছে বিএনপি, জেনারেল এরশাদের হাতে তৈরি হয়েছে জাতীয় পার্টি। কাজেই তাদের তো নিজস্ব একটি আঁতাত আছেই। আর তাদের সাথে যোগ দিয়েছে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র অর্থাৎ জামায়াতে ইসলামী। জনগণ তাদের প্রত্যাখান করছে। কাজেই পরাজিত শক্তি আজ এক হয়ে কোনো সফলতা অর্জন করতে পারবে না। তাদের পরাজয়ই বরণ করতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ কোনো দিনই পরাজিত শক্তির পক্ষে থাকেনি, ভবিষ্যতেও থাকবে না।

ঐ দলগুলোতে আপনাদের সাথেও আন্দোলন করেছিল যখন আপনারা বিরোধী দলে ছিলেন। জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, হ্যাঁ তখন যারা সংসদে বিরোধী দল ছিল, আমরা তখন সেই বিরোধী সংসদ সদস্যদের নিয়েই আন্দোলন করেছি, এভাবে দল করে নয়। আমি কখনো গোলাম আযমের সাথে একমঞ্চে উঠিনি। দাতারা একটি বক্তব্য এখন বারবার দিয়ে আসছে যে, বাংলাদেশে কাজ করতে গিয়ে তারা দুর্নীতির সমস্যায় পড়ছেন। আপনি সংসদে বলেছেন যে, দুর্নীতি শিকড় গেড়ে বসে আছে। সেক্ষেত্রে আপনারা তাহলে কি করছেন?

জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, একটি দেশে যখন গণতন্ত্র থাকে না, মিলিটারী ডিক্টেটররা যখন দেশ চালায়, দেশে স্বৈরতন্ত্র চলে। সে দেশে তখন দুর্নীতি শিকড় গেড়ে বসে। এ দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করে যাচ্ছি। আপনারা তো বুঝতে পারেন যে, এ চার বছরে চট করে পরিবর্তন আনা তো সম্ভব নয়। আরো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ২০ বছর যাবত দুর্নীতি গড়েছে। এর মূলোৎপাটন করতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন এবং এখানে জনগণেরও সহযোগিতা দরকার। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অতীতের চেয়ে অনেক বেশি সুশৃঙ্খল, যথেষ্ট উন্নত। তিনি বলেন, ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আমরা জনগণের জন্যই কাজ করেছি, ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার দরুন মুদ্রাস্ফিতি বাড়েনি।

প্রধানমন্ত্রীর অসংযত কথাবার্তা কোন ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত তা বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ ভাল করেই বুঝেন। প্রধানমন্ত্রী তার সাক্ষাৎকারে কি বুঝাতে চেয়েছেন তা অনেকটা আচঁ করতে পেরে ২৭ জুলাই ২০০০ বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া এক বিবৃতিতে পূর্বের দিনে বিবিসির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে অসত্য, দায়িত্বজ্ঞানহীন ও উস্কানিমূলক বলে উল্লেখ করে সারাদেশে পরিকল্পিতভাবে সংঘাত ছড়িয়ে দেয়ার সরকারি চক্রান্ত সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক থাকার আহবান জানান। বিবৃতিতে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কোটালীপাড়ায় বোমা পুঁতে রাখা এবং চট্টগ্রাম ও যশোরে হত্যাকান্ডের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর জন্য নাকি বিরোধী দলই দায়ী। তিনি বলেছেন, আদালত নাকি খুনিদের

www.pathagar.com

নিরাপদ আশ্রয়স্থল। প্রধানমন্ত্রীর এসব বক্তব্য শুধু মিথ্যেই নয় দেশে পরিকল্পিতভাবে সংঘাত সৃষ্টি ও আইনের শাসনের অবশেষটুকু পর্যন্ত মুছে দিয়ে একদলীয় ফ্যাসিবাদী শাসন পুনঃপ্রবর্তনের ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের অংশ। বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় এখন ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বিরোধী দলের বিরুদ্ধে একটির পর একটি মিথ্যা চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। কোথাও কিছু ঘটামাত্র কোনো প্রমাণ ছাড়াই বিরোধী দলের ঘাড়ে দোষ চাপাবার মিথ্যাচার সরকারি দলের লোকদের মজ্জাগত কু-অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। নিজেদের ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব বিরোধী দলের ঘাড়ে চাপিয়ে জনগণের করুণা আকর্ষণের হীন তৎপরতাও চালানো হচ্ছে। অন্যদিকে ফটিকছড়িতে তিন খুন, শিক্ষা ভবনে চাঁদাবাজি, কলাবাগানে বাড়ি দখলসহ সাম্প্রতিককালে সরকারি দলের লোকদের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি সরকার। তিনি বলেন, আদালত সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুধু আদালতের অবমাননাই নয়, আইনের শাসন নিশ্চিহ্ন করার ভয়াবহ হুমকিও। ইতোমধ্যেই নিম্ন আদালতগুলো সরকারি দলের নেতারা তাদের অপইচ্ছা পূরণের আজ্ঞাবহে পরিণত করেছে। বিচার পাওয়ার সর্বশেষ সুযোগ উচ্চ আদালতের অধিকার খর্ব করার জন্য নিপীড়নমূলক জননিরাপত্তা আইন পাস করা হয়েছে। এতোকিছু করেও সরকার সন্তুষ্ট নয়। এখন তারা নগ্নভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে আদালতের বিরুদ্ধে। এমনকি মিথ্যার বিরুদ্ধে যেসব আইনজীবী আইনের লড়াই করছেন তাদেরকে পাকড়াও করার হুমকি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে সরকার ও সরকারি দলের লোকদের দেয়া হাজার হাজার মিথ্যা মামলার মধ্যে যারা উচ্চ আদালতে বিচার প্রার্থনার সামর্থ্য রাখছেন তারা আইনের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই জামিন লাভ করছেন। নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেয়া হচ্ছে বলে সরকার তাদের অপরাধ প্রমাণ করতে পারছে না। অন্যদিকে প্রকৃত খুনী, সন্ত্রাসী, দখলদার, চাঁদাবাজরা সরকারি দল করে বলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলাই হচ্ছে না।

২৮ জুলাই ২০০০ একই দিনে ২৯ মিন্টো রোডে অনুষ্ঠিত চারদলের কেন্দ্রীয় লিয়াজোঁ কমিটির এক বৈঠকে দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবিসিসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে দেয়া প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বক্তব্য বিশ্লেষণ করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিবিসিকে যা বলেছেন তা কেবল আইনের শাসনের পরিপন্থী নয়, বিচারক ও উকিলদের বিরুদ্ধে রীতিমতো উস্কানিমূলক।

লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠক শামসুল ইসলাম এমপি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির আনোয়ার জাহিদ, জাতীয় পার্টির কাজী ফিরোজ রশীদ ও মোস্তফা জামাল হায়দার, জামায়াতে ইসলামীর আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, মুহাম্মদ কামরুজ্জামান ও এটিএম আজহারুল ইসলাম এবং ইসলামী ঐক্যজোটের এ আর এম আবদুল মতিন। বৈঠকে চারদল কর্তৃক ঘোষিত জনসংযোগ ও আগামী ৬ আগষ্ট সকাল-সন্ধ্যা হরতাল কর্মসূচি সফল করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। বৈঠকে বিগত ২৬ জুলাই বিবিসির সঙ্গে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও বিচার বিভাগ সম্পর্কে যেসব আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন তার প্রতিবাদ জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রস্তাবে বলা হয়, বিবিসির সঙ্গে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরোধী দলের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার অভিযোগ করে প্রকৃতপক্ষে নিজের মিথ্যা বলার বদঅভ্যাসেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। নির্বাচনের আগে তিনি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, রেডিও-টিভির স্বায়ত্তশাসন,

www.pathagar.com

সন্ত্রাস দমন, দুর্নীতি প্রতিরোধ, পাটের মূল্য প্রতি মণ ৫ শ' টাকা করা সহ যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা রক্ষা না করে তিনি নিজেই জাতির সামনে ওয়াদা খেলাফকারী প্রমাণিত হয়েছেন।

বিরোধী দলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ করার আগে তার স্মরণ করা উচিত ছিল যে, তার দলীয় এমপি সুনামগঞ্জের মহিবুর রহমান মানিকের বাড়িতেই বোমা তৈরির কারখানা আবিষ্কার হয়েছে এবং তার দলের অনেক নেতা, সংসদ সদস্য ও তাদের আত্মীয়-স্বজন দেশের বিভিন্ন স্থানে হত্যাকান্ড ও সন্ত্রাসী তৎপরতায় জড়িয়ে পড়েছে। তাদের জমি দখল, বাড়ি দখল, ব্যাংক দখল এমনকি নদী দখল ও সন্ত্রাসীদের গডফাদার হিসেবে ভূমিকা পালন সম্পর্কে দেশবাসী অবহিত রয়েছে। আওয়ামী লীগের এক সন্ত্রাসী এমপি নারায়ণগঞ্জে জাতীয় নেতৃবৃন্দকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা ও নারায়ণগঞ্জে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার মত চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ সন্ত্রাসী বক্তব্য রাখাসহ প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের অফিসে অগ্নিসংযোগ ও হত্যার প্রকাশ্য হুমকি প্রদান করেছেন; অপর এক সংসদ সদস্য ফেনীকে সন্ত্রাসীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছেন। আরেকজন সংসদ সদস্য ও প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বরিশালে সন্ত্রাসের তাণ্ডব চালাচ্ছে- রাজধানীতে ব্যবসায়ী শিপু হত্যাকান্ডের সঙ্গে আওয়ামী লীগের একজন সংসদ সদস্যের সন্তান, রামপুরায় বুশরা নাম্নীয় এক তরুণী হত্যার সঙ্গে আওয়ামী লীগের একজন নেতার সংশ্লিষ্টতাসহ অসংখ্য হত্যাকান্ড ও সন্ত্রাসী ঘটনার সঙ্গে সরকারি দলের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সম্পর্কের কথা দেশবাসী ভালোভাবেই জানেন। অথচ প্রধানমন্ত্রী বিবিসির নিকট মন্তব্য করেছেন, 'যে দেশে খুনীকে সহযোগিতা করা হয়, খুনীকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়, বিচার হয় না, সেদেশে হত্যা-খুন চলবেই।' তার এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি প্রকারান্তরে হত্যা ও খুনের অবাধ লাইসেন্স দিয়েছেন। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে যেসব গুরত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে সেসব হত্যাকান্ডের বিচার না হওয়ার জন্য কি আওয়ামী লীগ সরকারই দায়ী নয়? প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিবার পরও তার দলের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে না এবং স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী হত্যা মামলার আসামীর সভাপতিত্বে জনসভায় বক্তৃতা করে সন্ত্রাস নির্মূলের হুংকার দিচ্ছেন। সন্ত্রাস দমনে সরকারের ব্যর্থতার দায়িত্ব অন্যদের ওপর চাপিয়ে জনগণকে আর কষ্ট না দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর উচিত হবে অবিলম্বে পদত্যাগ করা।

প্রধানমন্ত্রী বিবিসিকে আরো বলেছেন, 'পুলিশ কষ্ট করে আসামীদের ধরে। আসামীদের কোর্ট থেকে জামিন দেয়া হয়, কোর্ট আসামীদের নিরাপদ আশ্রয়। যখনই যাচ্ছে তখনই তারা জামিন পেয়ে যাচ্ছে। আর জামিন পেয়ে ফিরে এসেই হত্যাকান্ড ঘটাচ্ছে। আমি তো মনে করি যে উকিল তার জন্য জামিন চাচ্ছে সে উকিলকেও ধরা উচিত এবং যে কোর্ট জামিন দিচ্ছে তারও জবাবদিহি করা উচিত।' অন্যদিকে তিনি আগের সরকারের আমলে মাস্তান ও সন্ত্রাসীদের পুলিশের চাকরি দেয়া হয়েছে তারাও সন্ত্রাসের জন্য দায়ী বলে দাবী করেছেন। লিয়াজোঁ কমিটি মনে করে বিচার বিভাগ ও উকিলদের সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর উক্তি শুধু বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের পরিপন্থীই নয় বরং বিচারক ও উকিলদের বিরুদ্ধে রীতিমত উস্কানিমূলক। জামিন দেয়ার ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট আদালতেরই এখতিয়ার এবং এ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কটাক্ষ করার অর্থ হচ্ছে তিনি আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করতে চান। পুলিশ বিভাগে মাস্তান ও সন্ত্রাসীদের চাকরি দেয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী তার সরকারের ব্যর্থতা পুলিশ বিভাগের উপরও চাপাতে চাচ্ছেন। অথচ দলীয়করণ ও ক্ষমতাসীন দলের অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপের কারণে

www.pathagar.com

পুলিশ বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারছে না। পুলিশ বিভাগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরকার তাদেরকে রক্ষীবাহিনীর মত বিরোধী রাজনৈতিক দলের ওপর নির্যাতন চালানোর জন্য ব্যবহার করছে।

প্রস্তাবে বলা হয়, জনগণ চাইলে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশকে নিষিদ্ধ করা হবে বলে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী দেশের একটি বৈধ ও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সংবিধান বিরোধী ও বেআইনি মন্তব্য করেছেন। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার কোনো সুযোগ নেই। দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি এ ধরনের দায়িত্বহীন মন্তব্য করতে পারেন না।

আগের সরকারগুলোর চাইতে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি একশ' ভাগ উন্নতি হয়েছে বলে দাবি করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির সামনে আরও একবার হাস্যকর ও ডাহা মিথ্যা কথা বললেন। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তার সরকারের ব্যর্থতার কথা তিনি নিজেই একাধিকবার স্বীকার করেছেন। এ জন্য তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পরিবর্তন করেছেন এবং বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যত হুংকারই দিন না কেন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনো উন্নতিই হয়নি, বরং দেশে এখন কোথাও মানুষের জানমাল ও ইজ্জতের কোনো নিরাপত্তা নেই। প্রতিদিনের পত্র-পত্রিকা ও দেশের ভুক্তভোগী জনগণই এর সাক্ষী।

চারদলের লিয়াঁজো কমিটি মনে করে বিবিসির সঙ্গে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যার বেসাতি করেছেন। দেশের জনগণ আর বেশিদিন তার এই মিথ্যার বেসাতি বরদাশত করবে না। তার উচিত হবে জনগণের আন্দোলনের একদফা দাবি মেনে নিয়ে অবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

২৫ নভেম্বর ২০০০ দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশ, 'প্রায় দুই লাখ ফেরারী আসামী নিয়ে পুলিশ মহাবিপাকে পড়েছে। আদালতের গ্রেফতারী পরোয়ানা থাকা সত্ত্বেও পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে এসব আসামী সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ তাদের ধরতে পারছে না। আবার ফেরারী দুর্বৃত্তরা তাদের অপরাধ কর্ম চালিয়েই যাচ্ছে। এদের মধ্যে তালিকাভুক্ত আসামী রয়েছে কয়েক হাজার। ভাড়ায় খাটছে কিছু আসামী। পুলিশের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিদিনই তালিকাভুক্ত আসামীদের গ্রেফতারের জন্য থানা পুলিশ অভিযানে নামছে। কাজ হচ্ছে না। নতুন নতুন সোর্স নিয়োগ করে গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারাও মাঠে নেমেছেন। সারাদেশে সাম্প্রতিক আইন-শৃংখলার চরম অবনতির জন্য আন্ডারওয়ার্ল্ডের টেররদের গোপন তৎপরতাকে দায়ী করেছে পুলিশ। কিন্তু গোপন আস্তানা থেকে তাদের গ্রেফতার করা যাচ্ছে না। ভুক্তভোগীরা বলেছেন, ওয়ারেন্টি ফেরারী আসামীদের গ্রেফতার করতে পুলিশ সব সময়ই শৈথিল্য দেখিয়েছে। এমন বহু মামলার আসামী রয়েছে পুলিশ যাদের কোনদিনই গ্রেফতার করতে পারেনি, তারা মরেও যায়নি। তবে গেল কোথায়? এই প্রশ্ন সবার। মামলার অভিযোগকারীদের দাবী, আসামীরা ঠিকানা পরিবর্তন করে ফের অপরাধ কর্মে জড়িয়ে পড়েছে। পুলিশের হাতে ওয়ারেন্ট কিন্তু চিনতে পারছে না আসামীকে। দেশের প্রায় দুই লাখ ওয়ারেন্টি ফেরারী আসামী পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে। যদিও পুলিশের খাতা-কলমে এদের সংখ্যা দেখানো হয়েছে ১ লাখ ৭৮ হাজার ৫শ'। খুন, চাঁদাবাজী, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ডাকাতি, ছিনতাই, ধর্ষণ, অপহরণসহ বড় ধরনের অঘটনের দায়ে অপরাধীদের বিরুদ্ধে থানায় এবং আদালতে দু'ভাবে মামলা রুজু হয়। পুলিশ বিভাগের হিসাব মতে, থানায় দায়ের করা ১ লাখ ২৭ হাজার ৭শ' এবং আদালতে দায়ের করা মামলার প্রায় ৫১ হাজার আসামী বর্তমানে

www.pathagar.com

পলাতক রয়েছে। পুলিশ বলছে, এই আসামীদের মধ্যে ৩ হাজার ১৭ জন বিদেশে এবং ৬ হাজারের বেশি আসামী দেশের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে আছে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোয় ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড থেকে অস্ত্রধারী ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হল পাহারা বাবদ প্রতিদিন ৫০ হাজার টাকা করে দেয়া হচ্ছে-এ সংবাদ প্রকাশ করেছে ২০ জুলাই ২০০১ দৈনিক দিনকাল। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশ, কাটাবন, নীলক্ষেত, শাহবাগ, চানখাঁর পুল এলাকা থেকে ছাত্রলীগ যে চাঁদা পায় তার বড় অংশ হল পাহারাদার অস্ত্রধারীদেরকে দেয়া হয়। হাই কমান্ডের নির্দেশ অনুযায়ী ক্যাডারদের মধ্যে হল পাহারা বাবদ অর্থ উপঢৌকন দেয়া হচ্ছে। যেসব ক্যাডাররা রাত এবং দিনে হলে অস্ত্র নিয়ে পাহারা দেয় তাদের মধ্যে এই টাকা বন্টন করা হয়। হল পাহারার এই ভাতা দিয়ে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা প্রতিদিন আনন্দ-উল্লাসে বিরানী, ফাস্টফুড, সিগারেট খায়। মুজিব হলে এই টাকার বন্টন নিয়ে ক্যাডারদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। এর কারণ হল বড় মাপের ক্যাডারকে চার-পাঁচশ টাকা এবং ছোট মাপের ক্যাডারকে মাত্র দু'শো টাকা করে দেয়া হয়। ছাত্রলীগ ক্যাডাররা প্রতিরাতে হলের ছাদ, গেস্টরুম এবং হলের মূল গেটে অস্ত্র হাতে প্রকাশ্যে পুলিশের সামনে মহড়া দেয়। পুলিশ অস্ত্র দেখেও না দেখার ভান করে।

২০০০ সালের শেষের দিকে বরিশালের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। খুন, ডাকাতি, ধর্ষণ, চাঁদাবাজী ও অপহরণ নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়। এসব ঘটনা পুলিশের সামনে ঘটলেও তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। ১৫ ডিসেম্বর শহরতলীর কাশিপুরে ৫ বছরের শিশু কন্যা ইরাকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে ধর্ষণ করে হত্যা করে। ওইদিন ইরা মায়ের সাথে নানারবাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। ১৯ ডিসেম্বর রাতে ইফতারির পর পরই শহরের আলেকান্দা এলাকায় ডাঃ নাসিম আহমেদের বাসার তৃতীয় তলায় ডাকাতি সংঘটিত হয়। ডাকাতরা বাসার সব কিছু লুট করে নিয়ে যায়। তারা পানি খাওয়ার কথা বলে দরজা খুলতে বলে ভিতরে প্রবেশ করে অস্ত্রের মুখে এই ডাকাতি করে। একই রাতে একদল সন্ত্রাসী বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সামনে লুনা ফার্মেসীতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে এবং দোকান থেকে আড়াই লক্ষাধিক টাকা লুট করে নিয়ে যায়। হামলাকারীরা দোকানের মালিক রফিকুল ইসলাম রবকে কুপিয়ে আহত করে। পরের দিন প্রতিবাদে এলাকার ব্যবসায়ীরা ওষুধসহ সকল দোকানপাট বন্ধ করে ধর্মঘট পালনসহ শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। ২০ ডিসেম্বর শহরের সিএন্ডবি রোডে একটি তেলের ট্যাংকারের চাকায় পিষ্ট হয়ে একজন রিকশাচালকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ট্যাংকারটি ভাঙচুর, পুলিশ-জনতা সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় ২০ জন আহত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ১১ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। ২২ ডিসেম্বর রাতে গৌরনদী থানার বার্থী গ্রামে ৪টি ঘরে ডাকাতি সংগঠিত হয়। ডাকাতরা তিন লক্ষাধিক টাকার মাল লুঠ করে নিয়ে যায়। ২৪ ডিসেম্বর বিকালে প্রকাশ্য দিবালোকে নতুনবাজার পুলিশ ফাঁড়ির সামনে থেকে একদল ক্যাডার দুলাল নামে একজন ঠিকাদার ও তার স্ত্রীকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ঘটনাটি ফাঁড়ির সামনে ঘটলেও পুলিশ ঘটনাটি দেখেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। পরে এ ব্যাপারে কোতোয়ালী থানায় জিজ্ঞেস করা হলে জানানো হয় তারা কিছুই জানে না। দুলাল ঈদের কেনাকাটা শেষে বরিশাল থেকে ৬ মাইল নামক স্থানে যাওয়ার পথে এ ঘটনা ঘটে। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ২৫ ডিসেম্বর ২০০০)

www.pathagar.com

আওয়ামী সরকারের ৫ বছরে বিশ মামলার আসামীও আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স পেয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী বাৎসরিক ৫ হাজার টাকা আয়কর দেন এমন কোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছে নির্ধারিত ফরমে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারেন। ফরমে বাৎসরিক আয়, আগে লাইসেন্স আছে কিনা, কী কারণে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োজন, পেশা ইত্যাদি উল্লেখ করতে হয়। এরপর জেলা প্রশাসকের দপ্তর থেকে আবেদনের তথ্য যাচাইয়ের জন্য পুলিশের মাধ্যমে তদন্ত করে পুলিশী রিপোর্টে কোন বিরূপ মন্তব্য না থাকলে জেলা প্রশাসন থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের অনাপত্তির জন্য পত্র দেওয়া হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি পাওয়ার পর জেলা প্রশাসক আবেদনকারীর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার নিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স ইস্যু করার জন্য সংশ্লিষ্ট শাখায় নির্দেশ দেন এবং সে অনুযায়ী লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। কারও বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা থাকলেও তিনি অস্ত্রের লাইসেন্স পাওয়ার অযোগ্য বিবেচিত হবেন। বৈধ অস্ত্রধারী সংশ্লিষ্ট থানায় নিজের নাম-পরিচয়সহ ঠিকানা লিপিবদ্ধ করবেন। থানায় এজন্য একটি আলাদা রেজিস্টার রয়েছে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার বৈধ অস্ত্র মনিটর করবেন। শর্টগানসহ লাইসেন্স করা বিভিন্ন অস্ত্র সন্ত্রাসী কাজে ব্যবহার হয়েছে।

আওয়ামী সরকারের শেষ কার্যদিবসে ১২ জুলাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স পাওয়ার জন্যই আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রচন্ড ভিড়, হুড়োহুড়ি, ফাইল নিয়ে দৌড়াদৌড়ির দৃশ্য দেখা গেছে। ঐ দিন ঢাকাতেই ২০০'রও বেশি আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়া হয়। দুই মাসে (মে মাসের মধ্যভাগ থেকে জুলাই মাসের মধ্যভাগ) ঢাকায় ৫ হাজারসহ সারা দেশে প্রায় ২০ হাজার লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। অবাধে এই লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে আর্মস এ্যাক্টের বিধি-বিধান উপেক্ষা এবং বিধিবদ্ধ শর্তের বরখেলাফ করা হয়। ঢাকার বাইরেও তাড়াহুড়ো করে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। এই লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিচয়কেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। মন্ত্রী, সাংসদদের পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন, আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য প্রার্থী, ছাত্রলীগ, যুবলীগের নেতা-কর্মীরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে লাইসেন্স পায়। তাছাড়া লাইসেন্স পেয়েছে এমন অনেকের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত থাকা ও থানায় মামলা আছে। আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে কোন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি। অনেকে সাদা কাগজে আবেদন করেছে। অনেক ক্ষেত্রে আবেদনকারী নিজেই বিশেষ ব্যবস্থায় পুলিশি রিপোর্ট সংগ্রহ করে জেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট শাখায় জমা দিয়েই লাইসেন্স পাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও উর্ধ্বতন কর্তার চাপে লাইসেন্স ইস্যু করেন। আওয়ামী লীগের ক্ষমতা ত্যাগের এক সপ্তাহে পূর্বে শুধু ঢাকায় প্রায় দেড় হাজার পিস্তল, শর্ট গান ও রিভলবারের লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। এর সিংহভাগই পায় সরকারের মন্ত্রীদের আত্মীয়-স্বজন, ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী, আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য প্রার্থী, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা-কর্মীরা। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা পেশা গোপন করে নিজেদের ব্যবসায়ী পরিচয় দিয়ে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করে প্রায় সবাই লাইসেন্স পায়। কোনো পুলিশী তদন্ত ছাড়াই লাইসেন্স পান মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সালাউদ্দিন। এ সময়ে আরো যারা লাইসেন্স পায় তাদের মধ্যে আছেন হাসিনা দৌলা, গোলাম রব্বানী, মঞ্জুর আলম, খোরশেদ আলম, দেলোয়ার হোসেন, আবুল কালাম মোঃ ফারুক, মাহবুব উদ্দিন, মনির হোসেন, আব্দুর রহমান, সালেহ মোহাম্মদ টুটুল, আয়নাল হক মিন্টু, আফজালুর রহমান বাবু, পলাশ, হিমু, পনিরুজ্জামান, রেজাউল করিম খান রেজা,

www.pathagar.com

মুক্তিযোদ্ধা শেখ শামসুল হক, মোহন, নিজাম উদ্দিন, গোলাম রব্বানী চিনু, অমিয় কুমার সরকার প্রমুখ। এদের সবাই আওয়ামী লীগ বা এর কোনো অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মী।

ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিনে মন্ত্রী আত্মীয়দের আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ওই এলাকায় মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের ভাগিনা মনির, মুকুল, মিলন, শফিক, বাচ্চু, আলমসহ প্রায় ২০ জনকে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়। আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়ে মন্ত্রীর ভাগিনা-ভাতিজারা বোরহানউদ্দিন, বাংলাবাজার, গঙ্গাপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া দেয়। ফলে সাধারণ জনগণ আতংকগ্রস্থ হয়ে পড়ে। বখাটে ওইসব সন্ত্রাসীদের হাতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত পিস্তল, শর্টগান ছাড়াও বিভিন্ন দেশী-বিদেশী ভারী অস্ত্র-শস্ত্র ছিল। ৫ বছরে নিজেদের অপকর্ম ঢাকতে পণরোষ এড়াতে মন্ত্রী তার আত্মীয়দের হাতে অস্ত্রের ভান্ডার তুলে দেন। আওয়ামী সরকারের পুরো ৫ বছরই মন্ত্রী, ভাগিনা-ভাতিজারা সমগ্র ভোলা জেলায় টেন্ডারবাজি করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। তারা খুন, ধর্ষণ, লুটপাট ও নিরীহ জনগণকে অত্যাচারের মাধ্যমে এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। তাদের ভয়ে কেউ প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে সাহস পায়নি।

সিরাজগঞ্জে শতাধিক লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে আজম খান ওরফে নাইদুল এবং ফরিদুল ইসলাম নামে দু'জন সন্ত্রাসীও ছিল। সাইফুলের বাড়ি চন্দনগতি। তার বিরুদ্ধে ডাকাতি মামলা রয়েছে। ফরিদুলের বাড়ি খিদরুমাতি। তার বিরুদ্ধেও ক্রিমিনাল কেস রয়েছে। প্রয়োজনীয় পুলিশী তদন্ত শেষেই নাকি এদের লাইসেন্স দেয়া হয়েছে।

লাইসেন্সে পেয়ে প্রতিদিনই টিসিবি, রাইফেলস ক্লাব ও অনুমোদিত অস্ত্রের দোকানে তারা ভিড় করেছে। এক হিসাব মতে, টিসিবি ২০০১ সালের জুলাই পর্যন্ত ১৭'শ অস্ত্র সরবরাহ করেছে। ২০০০ সালে এর পরিমাণ ছিল ১২শ'। টিসিবি পিস্তল, রিভলবার ও শর্টগান এবং এই তিন ধরনের অস্ত্রের গুলি বিক্রি করে থাকে। প্রতিটি শর্টগান ৫৪ হাজার, রিভলবার প্রকারভেদে ৪০ ও ৩৭ হাজার এবং পিস্তল ৫৬ ও ৪৮ হাজার টাকায় বিক্রি করেছে। বাইরে এসব অস্ত্রের দাম ক্ষেত্র বিশেষে দুই গুণ, তিনগুণেরও বেশি। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয়, ঢাকা মহানগরী এবং জেলা নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকে লাইসেন্স পেয়ে অস্ত্রও কিনে ফেলে। (সূত্রঃ দৈনিক যুগান্তর ১৩ জুন, দৈনিক দিনকাল ৬ জুলাই, দৈনিক ইনকিলাব ৬ জুলাই, দৈনিক প্রথম আলো ১৩ জুলাই ২০০১)

৭

www.pathagar.com

ব্যাংক দখলে আওয়ামী নেতা

২৬ আগষ্ট ১৯৯৯ আওয়ামী লীগের শিল্প বিষয়ক সম্পাদক সাবেক সংসদ সদস্য আক্তারুজ্জামান বাবু নাটকীয় কায়দায় অস্ত্রের মুখে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবিএল) দখল করেন। মতিঝিল থানায় দায়ের করা হয় দুটি পৃথক এজাহার। জাফর আহমদ চৌধুরীর এজাহারে বলা হয়, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ এর মতিঝিলস্থ প্রধান কার্যালয়ে ৬ তলায় ব্যাংকের সভাকক্ষে পরিচালনা পর্ষদের এক মিটিং ২৬ আগষ্ট বিকেল সাড়ে ৩টায় শুরু হবার পর আওয়ামী লীগ নেতা ও শিল্পপতি আক্তারুজ্জামান চৌধুরী বাবু ও তার পুত্র সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদসহ ৫০/৬০ জনের সশস্ত্র ক্যাডার ব্যাংকের প্রধান ফটক ভেঙ্গে বোর্ড রুমে প্রবেশ করে। অস্ত্রধারীরা ব্যাংকের চেয়ারম্যান জাফর আহমদ চৌধুরীসহ পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য সদস্যদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ফেলে। এমনকি জাহাঙ্গীর আলম খান, শওকত আজিজ, রাসেলসহ উপস্থিত সকল পরিচালককে মারধর শুরু করে এবং পিস্তল ঠেকিয়ে জোরপূর্বক পরিচালকের পদে ইস্তফা পত্রে স্বাক্ষর নেয়। পাশাপাশি অন্যান্য কাগজপত্রে স্বাক্ষর করাতেও বাধ্য করায়। এ সময় অস্ত্রধারীরা পরিচালকদের টাকা পয়সা, ঘড়ি, মূল্যবান জিনিস ও কাগজপত্র ছিনিয়ে নেয়। ব্যাংকের জিনিসপত্র তছনছ করে এবং মূল্যবান কাগজপত্র নষ্ট করে ফেলে। এজাহারে আরো বলা হয়, সন্ত্রাসীরা জনাব জাফর আহমদের পরিধেয় কাপড় ছিঁড়ে তাকে বিবস্ত্র করে ফেলে। এজাহারে ৫জন আসামীর নাম উল্লেখ করা হয়। এ পাঁচ জন হলেন, আক্তারুজ্জামান চৌধুরী বাবু, পিতাঃ নুরুজ্জামান চৌধুরী, চট্টগ্রাম, সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদ, পিতাঃ আক্তারুজ্জামান চৌধুরী বাবু, চট্টগ্রাম, খোরশেদ আলম, পিতাঃ আব্দুল মাবুদ সওদাগর, সাং-রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম। আব্দুল কাদের, মোঘলটুলী, চট্টগ্রাম, চিরা আকবর, পলিটেকনিক চট্টগ্রাম। এদের সবার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। এ অস্ত্র দিয়ে পরিচালকদের হত্যার চেষ্টা করা হয় বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া জাফর আহমেদ চৌধুরীর স্ত্রী ও ব্যাংকের অন্যতম পরিচালক মনোয়ারা বেগমের দায়ের করা এজাহারে ব্যাংকের অভ্যন্তরে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে বলে উল্লেখ করা হয়। ব্যাংকের পরিচালক শওকত আজিজ রাসেল অভিযোগ করেন, বাবু মাস্তানসহ বোর্ড রুমের দরজা ভেঙ্গে ব্যাংকের চেয়ারম্যান জাফর আহমেদ চৌধুরীসহ ৭/৮ জন পরিচালককে মারধর করে বের করে দেন। এর আগে তিনি অস্ত্রের মুখে টাইপ করা কাগজে চেয়ারম্যানসহ ৫/৬ জন পরিচালকের সই নেন। তিনি জানান জাফর আহমেদ চৌধুরীকে বেদম প্রহার করে পোষাক ছিঁড়ে ফেলে বিবস্ত্র করে কক্ষ থেকে বের করে দেয়া হয়। অন্যান্য পরিচালককেও মারধর করে পোষাক ছিঁড়ে ফেলা হয়। এমন অমানবিক ঘটনা ঘটলে থানা মামলা নেয়নি। নেয়ার কথাও নয়। সবকিছু ম্যানেজ করেই এহেন কাজ করা হয়। অথচ এতসব ঘটনা ঘটে গেলে বাবু বলেছেন তিনি কিছুই জানেন না। তিনি বলেন, না না কোন ঘটনাতো ঘটেনি। ব্যাংকের পরিচালকরা নাকি তাকে সর্বসম্মতিক্রমে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেছেন। বাবুর আচরণটি ছিল ভারতীয় হিন্দি ফিল্মের ভিলেনের মত। একদিকে সন্ত্রাসীদের লিডার অন্যদিকে সমাজসেবী। মার খেয়ে আসা পরিচালকরা এ বিষয়ে মামলা করার জন্যে মতিঝিল থানায় সঙ্গে সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলে থানা থেকে জানানো হয়, আমাদের বড় অফিসার স্পটে আছেন, আমরা মামলা নিতে পারবো না। বাবুর ব্যাংক

www.pathagar.com

দখলের পর পুলিশ প্রতিষ্ঠানের হেড অফিস তালাবদ্ধ করে দেয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের নির্দেশে ব্যাংকটি পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে বলে জানানো হয়। এরপর জাফর আহমেদ চৌধুরী ও বাবুর মধ্যে বিবৃতির লড়াই-এর পাশাপাশি আইনী লড়াইও চলতে থাকে। উভয় পক্ষ থেকে আদালতে মামলা, রীট পিটিশন হয়। ২১ সেপ্টেম্বর মাননীয় হাইকোর্ট ইউসিবিএল-এর চেয়ারম্যানশীপ সম্পর্কে স্থিতাবস্থা জারি করেন। কিন্তু সে নির্দেশকে উপেক্ষা করে বাবুর পুনরায় ব্যাংক দখলের চেষ্টা করেন। ২৯ সেপ্টেম্বর বাবু বিকাল ৩ টা ১৫ মিনিটে দুটো মাইক্রোবাস ভর্তি সশস্ত্র ব্যক্তিদের প্রহরায় ইউসিবিএল-এর প্রধান কার্যালয়ের সামনে উপস্থিত হন। গাড়ি থেকে নেমে বাবু সঙ্গীদের নিয়ে ভবনের ৫ম তলায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যেতে চাইলে ভবনের প্রবেশ পথে প্রহরারত পুলিশ তাকে বাধা দেয়। এ সময় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে.সি রেজাউল হক নিচে নেমে এসে শুধুমাত্র বাবুকে তাঁর কক্ষে নিয়ে যান। সেখানে বাবু ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে.সি রেজাউল হক, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক হামিদুল হক ও ব্যাংকের সেক্রেটারীর সঙ্গে আলোচনা করে বোর্ড মিটিং ডাকার নির্দেশ দেন। তিনি বিকাল ৪টা ১০ মিনিট পর্যন্ত ব্যাংকে অবস্থান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকে ভবনের গেট পর্যন্ত এগিয়ে এসে বিদায় জানান। বাবু যতক্ষণ ব্যাংকে ছিলেন ততক্ষণ সাংবাদিকদের ব্যাংকে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। সমস্ত ভবনে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়ে। এর আগে সকাল থেকে ব্যাংকের বোর্ড রুমে জাফর আহমেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে বোর্ডের ঢাকায় অবস্থিত পরিচালকদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর ২টার মধ্যে বোর্ডের মিটিং শেষ হলে পরিচালকরা চলে যান। ইউসিবিএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে.সি রেজাউল হক বাবু চলে যাওয়ার পর প্রথম সাংবাদিকদের বলা হয়, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অসুস্থ বোধ করছেন। কথা বলতে পারবেন না। পরে সাংবাদিকদের পীড়াপীড়িতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, বাবু নিজেকে ব্যাংকের বৈধ চেয়ারম্যান বলে দাবী করেছেন। কে.সি. চৌধুরী বলেন, আমরা আখতারুজ্জামান বাবুর কথা শুনেছি। বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংককে জানাবো। বাংলাদেশ ব্যাংক যে নির্দেশ দেবে তাই করবো। বোর্ডের বর্তমান বৈধ চেয়ারম্যান কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, সকালে ব্যাংকের চেয়ারম্যান জাফর আহমেদ চৌধুরী পরিচালনা পরিষদের সভা করেছেন। বাবুকে নিয়ে বৈঠক করেছেন কেন-জানতে চাইলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, কেউ এসে আলোচনা করতে চাইলে আমি তো বাধা দিতে পারি না। বাবু আগে থেকেই জানিয়ে ব্যাংকে এসেছেন কিনা জানতে চাইলে এমডি বলেন, না হঠাৎ করেই এসেছেন। জাফর আহমেদ চৌধুরী ব্যাংকে তার অফিস কক্ষে ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, পরিকল্পিত দুরভিসন্ধি নিয়ে বাবু ব্যাংকে এসেছিল। তিনি ২৬ আগস্টের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চেয়েছিলেন। তা না হলে ২টা মাইক্রোবাস ভর্তি সশস্ত্র লোক নিয়ে আসা কেন? পুলিশ বাবু ছাড়া অন্যদের ব্যাংকে প্রবেশ করতে না দেয়ায় বড় ধরনের অঘটন ঘটেনি। তিনি বলেন, হাইকোর্ট ব্যাংকে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এর আগে ৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংক আমাকে চেয়ারম্যান ঘোষণা দিয়েছে। বর্তমানে স্থিতাবস্থা বজায় থাকার অর্থই হচ্ছে আমি চেয়ারম্যান। বাবু নিজেকে চেয়ারম্যান দাবী করতে পারেন না। ঋণ খেলাপীর অভিযোগে যে ব্যক্তি (বাবু) পাঁচ বছর আগে ব্যাংকের চেয়ারম্যান এবং পরিচালকদের পদ থেকে অপসারিত হয়েছিলেন সে ব্যক্তির ব্যাংক দখলের শক্তির উৎস কোথায় সেটাও একটি বড় প্রশ্ন হিসেবে মানুষের মনে বারবার দাগ কাটে। বাবু আদালতের নির্দেশও উপেক্ষা করার সাহস দেখিয়েছেন। দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের অরাজক পরিস্থিতিতে আওয়ামী সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক নির্লিপ্ত ছিল।

www.pathagar.com

অরক্ষিত আদালত

আওয়ামী শাসনে আদালত ভবনও অরক্ষিত-এ অভিযোগ রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে দেওয়া কোন নেতার ভাষ্য নয়। এটি নির্মম ও বাস্তব সত্য। নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়েছেন ন্যায় বিচারস্থল আদালত ও কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটগণ। প্রায়ই সরকারি দলের সন্ত্রাসী দ্বারা আক্রান্ত হয় ন্যায় বিচারের একমাত্র কেন্দ্র আদালত।

১৩ নভেম্বর ১৯৯৮ ভোলায় সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক পদের পরীক্ষা চলাকালে কতিপয় যুবলীগ নেতা কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটকে লাঞ্ছিত করে। নিয়ম ভঙ্গ করে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশে বাধা দিয়েছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট, এটাই ছিল তার অপরাধ।

১৬ নভেম্বর দৈনিক দিনকালে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, খুলনা মহানগর মুখ্য হাকিম প্রকৃত রঞ্জন চাকমা তার জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ফ্যাক্স পাঠিয়েছেন। খুলনা সি.এম.এম তার ফ্যাক্স বার্তায় উল্লেখ করেছেন, ৮ নভেম্বর খুলনার কতিপয় যুবলীগ নেতা তার খাস কামরায় প্রবেশ করে একটি মামলায় জামিন দিতে তাকে নিষেধ করে। তিনি মামলার বিষয়ে আগে থেকে কিছুই বলা যাবে না বললে যুবলীগ সন্ত্রাসীরা উচ্চস্বরে চিৎকার করতে থাকে এবং তার চাকরির সাধ মিটিয়ে দেবে বলে হুমকি দেয়। এক পর্যায়ে তারা সিএমএম এর খাস কামরার আসবাবপত্র ভাংচুর করে এবং তাকে লক্ষ্য করে পেপারওয়েট ছুঁড়ে মারে। তারা সিএমএমকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং দৈহিকভাবে লাঞ্ছিত করে।

২৫ জানুয়ারি ১৯৯৯ ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত ছাত্রলীগ নেতা ইফতেকার আলম আজাদ, বাসিরউদ্দিন রিপন, সুমন, উজ্জ্বল, পুটনের কিশোরগঞ্জ ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুবা হাসানাতের আদালতে বেলা আড়াইটায় জামিন না-মঞ্জুর করায় ছাত্রলীগ-যুবলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী আদালতে হামলা, ভাংচুর, বিচারককে লাঞ্ছিত, পুলিশকে আহত করে কাঠগড়া থেকে ৫ আসামী ছিনতাই করে নিয়ে যায়। পুলিশ বাধা দেয়ায় সন্ত্রাসীরা কিল, ঘুষি, লাথি ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে হাবিলদার তাজুল ইসলাম, কনষ্টেবল আবু হানিফসহ ১৫ জনকে আহত করে। এরপর তারা ডিসির অফিস ও একটি গাড়ি ঢাকা মেট্রো (ঙ-৬২৯১) ভাংচুর করে। এ ঘটনার পর ডিসি, এসপি ও আওয়ামী নেতারা গভীর রাতে বৈঠক করে ভোর রাতে ছিনিয়ে নেয়া ৫ ছাত্রলীগ নেতাকে আদালতে হাজির করেন। এরপরই জামাই আদরে তাদের কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

ফেব্রুয়ারির শেষদিকে সন্দ্বীপে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা বিএনপির নেতা-কর্মীদের বেশ কয়েকটি বাড়িতে হামলা করে লুঠপাটের ঘটনা ঘটায়। তারা থানা বিএনপির কার্যালয় এবং ২০/২১টি দোকানে অগ্নিসংযোগ করে উল্টা থানা বিএনপির সভাপতি ও সেক্রেটারীসহ ২ শতাধিক নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা দায়ের করে। ইতিমধ্যে থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মৌলভী এমএস ইলিয়াসসহ ৮/১০ জন কর্মীকে গ্রেফতার করে শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে তাদেরকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়। গ্রেফতারকৃতদের জামিনের আবেদন জানানোর জন্য আইনজীবীরা যাতে আদালতে যেতে না পারেন তার জন্য আওয়ামী

www.pathagar.com

লীগের সন্ত্রাসীরা প্রতিদিন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের আশপাশে অবস্থান করে। তারা ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় জড়ানো বিএনপির নেতাদের পক্ষে আইনজীবীকে কোর্টের যেতে বাধা প্রদান করে। বিএনপির নেতাদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করায় সন্ত্রাসীরা সন্দীপ কোর্টের আইনজীবী মোক্তাদির মাওলা নাসির, এডভোকেট নিজাম উদ্দিন, আবদুল হামিদ, এডভোকেট জয়নুল আবেদিন ও এডভোকেট মঞ্জুরুল আমিনকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। তারা 'বিএনপির নেতাদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করবেন না'-এই মর্মে জোরপূর্বক একজন আইনজীবীর কাছ থেকে সাদা কাগজে স্বাক্ষর রেখে ছেড়ে দেয়। অপর কয়েকজন সন্ত্রাসী আইনজীবীদের প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে কোর্ট এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয়। ভয়ে কোনো আইনজীবী আদালতে যেতে না পারায় তাদের পক্ষে মামলাগুলোর সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ করা সম্ভব না হওয়ায় নেতা-কর্মীদের জামিনের আবেদন করা দুরূহ হয়ে পড়ে।

৩১ মে নোয়াখালী সরকারি আবাসিক এলাকার বাসিন্দা এবং মাদক আসক্ত জেলা যুবলীগের যুগ্ম-সম্পাদক রেজাউল করিম হেলাল জেলার অতিরিক্ত দায়রা জজ-২ ঋষিকেশ সাহার নিকট তার খাস কামরায় চাঁদা চাইতে গিয়ে হাজতবাসী হন। অত্যন্ত সৎ জজ হিসেবে খ্যাত ঋষিকেশ সাহার নিকট দলীয় পরিচয় দিয়ে কোম্পানিগঞ্জ থানার দলীয় কর্মী সমাবেশে যেতে বাস ভাড়ার জন্য চাঁদা দাবী করলে বিজ্ঞ জজ তাকে তার কমরায় বসিয়ে রেখে সুধারাম থানায় খবর দিলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে কোর্টে চালান দেয়।

২৯ জুন ঢাকার জজকোর্ট প্রাঙ্গণে সন্ত্রাসীরা বেলা ১১টায় প্রকাশ্যে গুলিবর্ষণ করে ক্যান্টনমেন্ট ও কাফরুল থানার ছাত্রলীগের আহবায়ক আতাউর রহমান আজাদকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। জজ কোর্টে একটি মামলায় হাজিরা দিয়ে বের হয়ে আসার পরই সন্ত্রাসীরা গুলি চালালে আজাদ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। গুলিবর্ষণের শব্দে পুরো আদালত এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি হয়। আদালত পাড়ার লোকজন প্রাণভয়ে এদিক-ওদিক পালাতে থাকে। আইনজীবী ও বিচারকদের মধ্যেও ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। আজাদ কোর্ট প্রাঙ্গনে লুটিয়ে পড়লে রক্তে ভেসে যায়। গুলি তার মাথা ও পাঁজরের তিনটি জায়গায় বিদ্ধ হয়। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন বড় ভাই এডভোকেট মুশফিকুর রহমান সবুজ, একই মামলার আসামী মশিউর রহমান কচি এবং দু'জন আর্মড ক্যাডার। আজাদের বিরুদ্ধে ক্যান্টনমেন্ট ও মিরপুর থানায় হত্যা, হত্যার উদ্দেশ্যে অপহরণ এবং বিস্ফোরকদ্রব্য সম্পর্কিত ১৩টি মামলা ছিল। আজাদ নিহত হবার পর তার ভাই সবুজ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। জজকোর্টে হাজিরা দিয়ে মা সাহানা বেগম, বোন সালমা, ভাইসহ ডেমরায় এক মামার বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার জন্য সকালে তাদের নিয়ে একটি কারযোগে আজাদ বের হয়। জজকোর্টের পশ্চিম পাশে লাগোয়া কোর্ট হাউস স্ট্রিটে কারে মা-বোনকে রেখে সে জজকোর্টে বিস্ফোরকদ্রব্য সংক্রান্ত একটি মামলায় হাজিরা দিতে যায়। কোর্টে হাজিরা দিয়ে কোর্ট হাউস স্ট্রিটে এডভোকেট শাহজাহান তালুকদারের চেম্বারে যাওয়ার সময় ঘটনাটি ঘটানো হয়।

মোহাম্মদপুরের যুবলীগ নেতা হারেস আহমেদের স্ত্রী দিলারা জামানকে হত্যার উদ্দেশ্যে ১৭ জুলাই রাতে বিজয় সরণীতে কালা ফিরোজ ও তার এক সহযোগী প্রাইভেট কার নিয়ে এসে কয়েক রাউন্ড গুলি করে পালিয়ে যায়। দিলারা তখন বেবীট্যাক্সিতে বিজয় স্মরণী হয়ে বাসায় ফিরছিলেন। সৌভাগ্যবশত দিলারা অক্ষত অবস্থায় বাসায় ফিরে এ ব্যাপারে তেজগাঁও থানায় মামলা করলে পুলিশ ২২ জুলাই রাত ১০টার দিকে ধানমন্ডি ক্লাবে অভিযান চালিয়ে ফিরোজকে

www.pathagar.com

গ্রেফতার করে। ফিরোজকে থানায় নেয়ার ১০ মিনিটের মধ্যে শতাধিক প্রাইভেট কার নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা তেজগাঁও থানা ঘেরায়ের মাধ্যমে তাকে থানা থেকে ছেড়ে দিতে পুলিশের ওপর প্রচন্ড চাপ প্রয়োগ করে। ফিরোজকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নিতে তারা ব্যর্থ হলে আওয়ামী দু'জন এমপি তদ্বির শুরু করেন।

১৯ আগষ্ট নেত্রকোনায় একটি মামলায় অভিযুক্ত ছাত্রলীগের ৩৬ জনকে আদালত জামিন মঞ্জুর না করলে তারা এজলাস ভাংচুর করে এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আসামীরা অতঃপর পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়।

৪ অক্টোবর ১৯৯৪ সালে ফতুল্লা শিল্পাঞ্চলে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল নেতা শফিক হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত অন্যতম আসামী শ্রমিক লীগ নেতা কাউসার আহমেদ পলাশ ও ফতুল্লা শিল্পাঞ্চলের আওয়ামী টপটেরর টুন্ডা মাসুদ, আওয়ামী ক্যাডার ইসহাক ও খালেকের দুপুরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মাহবুবুর রহমানের আদালতে যুক্তিতর্কের দিন ধার্য ছিল। তারা হাজিরা দিতে আসলে তাদের জামিন না মঞ্জুর করে আদালত জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। আদালত শ্রমিক দল নেতা শফিক হত্যা মামলার রায় ১৩ অক্টোবর ধার্য করলে নিয়ম অনুযায়ী আসামীদের কারাগারে প্রেরণ করা হয়। ৪ জনকে কারাগারে নেয়া হয়েছে এ খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে উক্ত ৪ জনের সমর্থকরা ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-মুন্সীগঞ্জ সড়কের পাগলা ও আলীগঞ্জ এলাকায় ব্যারিকেড দিয়ে রাখে। প্রায় ৩ ঘন্টা অবরোধকালে সড়কে সকল প্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে পুলিশের সাথে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে। পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে অবরোধ তুলে দেয়। সংঘর্ষে ফতুল্লা থানার দারোগা মজিবর রহমান ও ড্রাইভার আনোয়ার উদ্দিন সহ ২০ জন আহত হন। পরে শ্রমিক লীগ নেতা পলাশের মুক্তির দাবীতে বিশাল একটি মিছিল শহরে আসে। মিছিল থেকে ফতুল্লা শিল্পাঞ্চলের আওয়ামী টপটেরর টুন্ডা মাসুদের বাহিনীর একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ জেলা কারাগারে হামলা চালায়। এ সময় কারারক্ষীদের সাথে হামলাকারীদের সংঘর্ষ বেধে যায়। চলতে থাকে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। মুহূর্তের মধ্যে জেলখানা রক্ষার করার জন্য এএসপি এমদাদুল হকের নেতৃত্বে বিপুল পুলিশ এসে লাঠিচার্জ শুরু করে। পুলিশের লাঠিচার্জে গুরুতর জখম হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন আসামী দেখতে আসা বৃদ্ধ আনিস। পরে তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। অপর একটি মিছিল কোর্ট এলাকায় আসার পথে গ্রীন্ডলেজ ব্যাংকের সামনে পুলিশের বাধার সম্মুখীন হয়। পুলিশ টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। পুলিশের সাথে আওয়ামী সমর্থকদের সংঘর্ষে ১০ জন পুলিশসহ প্রায় অর্ধশতাধিক লোক আহত হয়। পুলিশের নিক্ষিপ্ত ঝাঁজালো গ্যাসে পথচারী মহিলাসহ অনেকে বমি করে দেয়। স্থানীয় প্রেসক্লাবে অবস্থানরত সাংবাদিকও গ্যাস থেকে রক্ষা পাননি। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ৫ অক্টোবর ১৯৯৯)

দৈনন্দিন বাজার করতে গিয়ে কারো অজ্ঞাত সন্ত্রাসীদের কাছে বন্দী হওয়ার ঘটনা আওয়ামী শাসনামলে নতুন কিছু না হলেও আইনের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আবু আহমেদের অপহরণ সরকারকে বেশ বেকায়দায় ফেলে দেয়। যারা অপরাধীদের আইনের মাধ্যমে শায়েস্তা করার কাজে সহযোগিতা করেন তাদের নিরাপত্তাহীনতা সাধারণ মানুষকে আর নিরাপদে থাকার পথ দেখায় না। ১৫ জানুয়ারি বাজার করার জন্য চট্টগ্রাম জজশীপ কর্মচারী সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আবু আহমেদ চকবাজারে গিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত বাসায় না ফিরলে পরিবারের অন্যরা খোঁজখবর নিতে থাকেন। এর পরদিন সকালে অজ্ঞাত স্থান থেকে সন্ত্রাসীরা টেলিফোনে আবু আহমেদের বাসায় খবর দেয় যে, তাকে অপহরণ করা হয়েছে। ২০ লাখ টাকা মুক্তিপণ

www.pathagar.com

দিলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। সন্ত্রাসী কর্তৃক মুক্তিপণ দাবীর প্রতিবাদে ১৮ জানুয়ারি চট্টগ্রাম জজ আদালতে বিক্ষুব্ধ কর্মচারীরা প্রতিবাদস্বরূপ সকল আদালতসমূহে সকাল থেকে তালা ঝুলিয়ে দেয়। শত শত কর্মচারীরা অবিলম্বে অপহৃত আবু আহমেদের উদ্ধারের দাবীতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করে। ফলে সকাল থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত আদালত সমূহের কার্যক্রম বন্ধ থাকে। আবু আহমেদ চট্টগ্রাম কোর্ট বিল্ডিং জজ আদালতে কর্মরত ছিলেন। কিছুদিন আগে তিনি পটিয়া সহকারী জজ আদালতের সেরাস্তাদার হিসেবে বদলী হন। গ্রামের বাড়ি ফটিকছড়িতে হলেও দীর্ঘদিন যাবত নগরীর বাকলিয়া ডিসি রোড এলাকায় বসবাস করেন। আদালতের কার্যক্রম বন্ধ হওয়ায় দুপুর ১ টা নাগাদ সন্ত্রাসীরা নগরীর টাইগার পাস এলাকায় অর্ধ চেতন অবস্থায় মাইক্রোবাস থেকে আবু আহমেদকে ফেলে দেয়। পুলিশ তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার খবর ছড়িয়ে পড়লে পুনরায় দুপুর ২টা থেকে সকল জজ আদালত খুলে দেয়া হয়। (সূত্রঃ দৈনিক জনতা ১৯ জানুয়ারি ২০০০)

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০০ বরিশাল শহরের রূপাতলী এলাকায় একদল পুলিশ নিয়ে সওজের রাস্তার দুপাশের অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ করতে গেলে গুটিকয়েক সন্ত্রাসী প্রতিরোধ করে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট গোলাম মোস্তফাকে ঘেরাও করে রাখে। সন্ত্রাসীরা এ সময়ে রূপাতলী সড়ক একঘন্টা অবরোধ করে রাখে। পরে একদল অতিরিক্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

১০ এপ্রিল বেলা তিন টায় ১০/১৫ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী পর্যটন শহর কক্সবাজার জেলা প্রশাসক কার্যালয় সংলগ্ন কোর্ট হাজতখানা ভেঙ্গে হত্যা, ধর্ষণ ও ডাকাতিসহ বিভিন্ন মামলার বিচারাধীন ১৮ জন আসামীর মধ্য থেকে ১৫ জনকে শ' শ' মানুষ ও সশস্ত্র পুলিশের চোখের সামনে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা মাইক্রোবাসে করে কোর্ট বিল্ডিং এলাকায় আসে এবং সামান্য পায়ে হেঁটে হাজতখানা পর্যন্ত পৌছে। সন্ত্রাসীরা প্রথমে ককটেল ফাটিয়ে ও গুলি ছুঁড়ে আতংক সৃষ্টি করে অবস্থানরত সকল লোককে সরিয়ে দেয়। তারপর তারা হাজতখানার গ্রীল ভেঙ্গে হাতকড়া পরা অবস্থায় আসামীদের ছিনিয়ে নিয়ে যায়। আসামীদের ছিনিয়ে নিয়ে যাবার সময় কর্তব্যরত পুলিশের সাথে সন্ত্রাসীদের তুমুল সংঘর্ষ হয় এবং ২ জন কনষ্টেবল, ২ জন হাবিলদার ও ১ জন এএসআইসহ মোট ৫ জন পুলিশ গুলিবিদ্ধ হয়। পুলিশ ছৈয়দ আহমদ, ফয়সাল ও নূরুল কাদেরকে পুনরায় আটক করলেও মোস্তাক আহমদ, রশিদ আহমদ, আবুল হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, জাহেদ হোসেন, সলিমউল্লাহ, সাব্বির আহমদ, আবুল কালাম, আবদুল্লাহ, ফরিদুল আলম, আমির হোসেন, সামচু, আবুল বশর, কামাল উদ্দিন ও ইসমাইলকে সন্ত্রাসীরা নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সন্ত্রাসীরা সবাই কক্সবাজার সদর এলাকার। বিভিন্ন আদালতে বিচারকার্যের জন্য কারগার থেকে সকালে ৬৪ জন আসামীকে কোর্টে আনা হয়। বিচারকার্য শেষে কোর্ট হাজতে ফিরিয়ে নেয়া হয়। আসামী ছিনতাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে জেলা প্রশাসক পুলিন বিহারী দেব ও পুলিশ সুপার লুৎফুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, মামলার কার্যক্রম শেষে আসামীদের কোর্ট হাজতে নিয়ে আসার সময় হাজতখানা সন্ত্রাসী দল কর্তৃক আক্রান্ত হয়। তারা ককটেল ও গুলি ছুঁড়ে ৪ জন পুলিশকে আহত করার পর ১৮ জন আসামীকে নিয়ে যায়। অপরদিকে কোর্ট হাজতে কর্তব্যরত পুলিশ বলেছে, সশস্ত্র হামলাকারীরা হাজত থানার তালা ভেঙ্গে আসামীদের নিয়ে যায়। পরে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় ৩ জনকে পুলিশ ধরে ফেলতে সক্ষম হয়।

www.pathagar.com

আওয়ামী আমলে সন্ত্রস্ত জনপদ ফেনীর জেলা ও দায়রা জজকোর্ট এলাকা কি আদৌ নিরাপদ? ফেনী জেলা আদালতে কি বিচারের পরিবেশ আছে? বাদী-বিবাদী ও সাক্ষীরা কি এখানে নিরাপত্তার অভাব অনুভব করেন? ফেনী শহরে বাস করেন এমন কাউকে এ প্রশ্ন করলে সরাসরি জবাব আসবে-না, এখানে বিচারের পরিবেশ নেই। ফেনীতে আদালত ও বিচারকরাও আওয়ামী আমলে সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে ছিলেন। চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা সর্বস্তরে আধিপত্য বিস্তারের পর আইন আদালতকে নিজেদের খেয়াল খুশীমত চালানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। এখানে জেলা ও দায়রা জজ বিচার করতে বিব্রত বোধ করেন। জজের গাড়ি ভাঙচুর করে সন্ত্রাসীরা। নিরাপত্তার জন্য জেলা জজ নিজেই প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইজিপি, জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিতভাবে সাহায্য প্রার্থনা করেন। বাদী-বিবাদী, সাক্ষীতো আছেই।

দীর্ঘদিন সরকারের সর্মথক একটি চিহ্নিত সন্ত্রাসী চক্র জেলা ও দায়রা জজ আদালতকে জিম্মি করে রাখে। বাদী-বিবাদী, সাক্ষীই নয় স্বয়ং জেলা জজ এই চক্রের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েন। পুলিশের ভূমিকা থাকে এই চক্রের পক্ষে। ফলে জেলা জজের গাড়ি ভাঙচুর করেও পার পেয়ে যায় এই চক্র। সন্ত্রাসীরা বিচারকদের হুমকি দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, আদালতের সম্পত্তি লুট ও জবরদখল করেছে। আদালতের বিচারক ও কর্মচারীদের জিম্মি করে রাখার জন্য নবনির্মিত জজ কোর্ট ভবনে আদালত কার্যক্রম স্থানান্তর কাজকে দীর্ঘ দুই বছর যাবত তালা দিয়ে রাখা হয় এই সন্ত্রাসী চক্রের সুবিধার জন্য। নতুন ভবনে চলে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়া হলে দুবার পেট্রোল ঢেলে তার আসবাবপত্র পুড়িয়ে দেয়া হয়। এ ব্যাপারে ২টি মামলা থাকলেও পুলিশের তৎপরতা ছিলনা।

এ ব্যাপারে প্রতিকার চেয়ে জেলা জজ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বার বার আবেদন করেও বিফল হয়েছেন। জেলা জজই সন্ত্রাসীদের ভয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেছেন। জেলা জজ নিরাপত্তা চেয়ে আইন মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। আওয়ামীরা ক্ষমতায় আসার পর থেকেই চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা আদালতের কার্যক্রমের উপর ন্যক্কারজনকভাবে হস্তক্ষেপের অপপ্রয়াস চালাতে শুরু করে। তারা আদালত আঙ্গিনায় ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে একদিকে প্রতিপক্ষের বাদী-সাক্ষীদের আদালতের বিচার কাজে অংশগ্রহণ করতে বাধা দিয়েছে অন্যদিকে নিজের খেয়াল খুশীমত বিচারের রায় করানো এবং রাজনৈতিক আসামীদের জামিন দেয়া না দেয়ার ব্যাপারে নানা কৌশলে হস্তক্ষেপ করে আসে।

সন্ত্রাসীরা জেলা জজ আদালতের জায়গা-জমি দখলের খেলায় মেতে উঠে। একবার একদল সন্ত্রাসী আদালতের অবকাশকালীন ছুটি চলাকালে জজ কোর্ট সংলগ্ন জায়গা জোরপূর্বক দখল করে সেখানকার গাছপালা লুট করে এবং সে জায়গায় দোকানপাট নির্মাণ শুরু করে। সন্ত্রাসীদের এই অপকর্মে বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা আদালতের ভারপ্রাপ্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। ফেনী সদর থানার সন্নিকটে অবস্থিত জজ কোর্ট এলাকায় এ জবর দখল ও লুটপাট চললেও পুলিশ প্রশাসন সম্পূর্ণ নির্বকার ছিল। এ ব্যাপারে প্রশাসনিক কর্মকর্তা সুলতান আহমদ, জেলা ও দায়রা জজ স.ম. হারুন ওসমানী পৃথক পৃথক ভাবে ফেনীর পুলিশ সুপার ও আইন মন্ত্রণালয়ের সচিবকে লিখিতভাবে অবহিত করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানালেও পরবর্তী এক মাসেও ন্যূনতম কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। জেলা ও দায়রা জজ কর্তৃক ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৮ তারিখে আইন সচিবের কাছে দেয়া পত্রে (স্মারক নং-৩৮৩ (৩) এবং ফেনীর পুলিশ সুপারের কাছে দেয়া পত্রে বলা হয়, গত ২ ডিসেম্বর থেকে জেলা জজ মাসব্যাপী অবকাশকালীন ছুটিতে ছিলেন। এই সময়ে দুস্কৃতিকারীরা রাজাঝী দীঘির পূর্ব ও

www.pathagar.com

দক্ষিণ পাড়ে জজকোর্ট সংলগ্ন সরকারি খাস জমি দখল করতে থাকে। এ ব্যাপারে বাধা দিলে দুস্কৃতিকারীরা ভারপ্রাপ্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। পত্র নং-৫, তারিখ ৪-১-১৯৯৯ তে বলা হয়, গত ৩ জানুয়ারি ১৯৯৯ অবকাশকালীন ছুটির পর আদালতের পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম শুরুর পরও দুস্কৃতকারীগণকে অবৈধভাবে নির্মাণ কাজ করতে দেখা গেছে। দীঘির পূর্বপাড় বাসস্ট্যান্ড হিসেবে ব্যবহার করাও হচ্ছে এবং আদালতের বনায়নকৃত স্থানে গাছপালা ও মাটি কেটে রাস্তা সমতল করা হচ্ছে। জেলা জজ তার পত্রে এ ব্যাপারে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

১৫ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী এমপি জয়নাল হাজারীর গাড়ির ওপর বোমা হামলার ঘটনায় হাজারী নিজে বাদী হয়ে ফেনীর থানায় জননিরাপত্তা আইনে ৭ জনকে আসামী করে মামলা রুজু করেন। ৩০ এপ্রিল এই মামলার গ্রেফতারকৃত আসামী জসিমউদ্দিন আইনজীবীর মাধ্যমে হাইকোর্টে এক পিটিশন দাখিল করেন যে, ফেনী আদালতে এই মামলার বিচার অনুষ্ঠিত হলে তিনি ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হবেন। সাক্ষীরা ভয়ে সত্য ঘটনা বর্ণনা থেকে বিরত থাকবে নিরাপত্তার অভাবে।

৪ মে ফেনী জননিরাপত্তা আদালতে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ভিপি জয়নাল ও ফেনী জেলা যুবদল সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীরসহ বিবাদীদের কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বেলা সাড়ে ১১ টায় জননিরাপত্তা আইনে ১০ ধারায় দায়েরকৃত মামলার শুনানীতে ফেনী জজকোর্টে হাজির করা হলে আওয়ামী লীগের গডফাদার নিয়ন্ত্রিত স্টিয়ারিং কমিটির কয়েকশ' সশস্ত্র ক্যাডার আদালত ঘেরাও করে। এমন সময় ৫০/৬০ জনের একদল যুবক হৈচৈ ও ভিপি জয়নালকে গালাগালি করতে করতে কোর্ট চত্বরে উপস্থিত হয়। সন্ত্রাসীরা ভিপি জয়নালসহ অপর রাজনৈতিক বন্দীদের পুলিশের হেফাজত থেকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালায় এবং বিচারকদের হুমকি প্রদর্শন করে মুহুর্মুহু শ্লোগান দেয়। পুলিশের উপস্থিতিতে দীর্ঘ সময় সন্ত্রাসীরা আদালতের কার্যক্রম অচল করে রাখে।

জেলা ও দায়রা জজ খাদেমুল ইসলাম বেলাল জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে পাঠানো পত্রে এই হাঙ্গামা বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে-'অত্র মামলার শুনানিকালে একদল উশৃঙ্খল যুবক এজলাসের পাশের রাস্তায় চিৎকার করিয়া অশ্লীল ভাষায় আসামী ভিপি জয়নালকে গালিগালাজ করিতে থাকে এবং এজলাসে প্রবেশের চেষ্টা করে। তবে পুলিশের তৎপরতার ফলে তাহারা এজলাসে প্রবেশ করিতে না পারিলেও বিজ্ঞ আইনজীবী, আদালতের কর্মচারী, আসামী ও আদালতে উপস্থিত অন্য লোকজনের নিরাপত্তার জন্য এক পর্যায়ে আদালতের দরজা, জানালা বন্ধ করিয়া দিতে হয়। অবশ্য বিপুল পরিমাণ পুলিশ থাকা সত্ত্বেও এই সমস্ত যুবকদের ধৃত করার কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয় নাই। এই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি দুর্ভাগ্যজনক এবং অনাকাঙ্ক্ষিত....অত্র আদালত এলাকায় অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ দুস্কৃতিকারীদের ধৃত না করিয়া নীরব ভূমিকা পালন করিয়া প্রকারান্তরে তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছে। যেহেতু এই ট্রাইব্যুনাল মনে করে তাহাদের (আসামীদের) সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে তাহাদেরকে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা সমীচীন। তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি (মামলার ধার্য তারিখ) তাহাদিগকে যথাযথ নিরাপত্তায় আদালতে হাজির করিতে বলা হইল।'

২৮ সেপ্টেম্বর প্রকাশ্য দিবালোকে আদালত ভবনের সামনে রাজধানীর আন্ডার ওয়ার্ল্ডের অন্যতম গডফাদার যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা মুরগী মিলন নামে পরিচিত হুমায়ুন কবির মিলনকে সন্ত্রাসীরা নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করে। বেলা ১টার কিছু পর ঢাকা জেলা জজ

www.pathagar.com

আদালতে প্রায় নয় বছর আগে তার বিরুদ্ধে ক্যান্টনমেন্ট থানায় দায়েরকৃত একটি স্বর্ণ চোরাচালান মামলার শুনানী শেষে আদালত প্রাঙ্গণে দেহরক্ষীদের সাথে সে দাঁড়িয়ে থাকার সময় ১০/১২ জনের আততায়ীরা পরপর কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়লে মুরগী মিলন জজ কোর্ট প্রাঙ্গণে লুটিয়ে পড়ে। এ সময় তার সঙ্গে থাকা তপন সরকারসহ ৪ দেহরক্ষী পালিয়ে যায়। গুলি করে সন্ত্রাসীরা বীরদর্পে আদালত প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে। তার ডান বুকে ২টি ও বাম গলায় ১টিসহ বেশ কয়েক রাউন্ড পিস্তল ও রিভলবারের গুলিবিদ্ধ হয়।

খুলনা আদালত প্রাঙ্গণে ও আশপাশ এলাকায় বিচারপ্রার্থী, বিচারক ও আইনজীবী আওয়ামী আমলে আর নিরাপদ ছিলেন না। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেছেন তারা। কারো কারো টেনশনে রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। একবার আদালত চলাকালীন ইমন-হিরু বাহিনীর ক্যাডাররা সশস্ত্র অবস্থায় সিএমএম এজলাসে হামলা চালানোর পর ম্যাজিস্ট্রেটরা এজলাসে বসতে অস্বীকৃতি জানান। পরে সিএমএম পিআর চাকমার হস্তক্ষেপে ম্যাজিস্ট্রেটরা ওইদিন কাজ করলে ২৭ সেপ্টেম্বর সিএমএমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক ম্যাজিস্ট্রেসির সভায় সিএমএমকে উদ্দেশ্য করে এক বিচারক বলেন, 'আমাকে বদলী করেন স্যার।' আরেক বিচারক বলেন, 'এভাবে দায়িত্ব পালন করা যায় না।' খুলনা আদালত প্রাঙ্গণে সন্ত্রাসীদের আনাগোনা দীর্ঘদিন ধরে চললেও তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে আদালত কক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে। ১৯৯৮ সালে আদালত কক্ষে নজরুল নামে এক আইনজীবীর সহকারী খুন হন। ১ ফেব্রুয়ারি আদালত প্রাঙ্গণে হ্যান্ডকাপ পরা অবস্থায় পুলিশ কাস্টডিতে খুন হয় যুবলীগ কর্মী লিটন। (সূত্রঃ দৈনিক মানব জমিন ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০০)

১৮ অক্টোবর দৈনিক দিনকালে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, ভোলা ডিসি কোর্টে একটি অপরাধ মামলার বাদী আবুল খায়ের ম্যাজিস্ট্রেট শরীফ মর্তুজা মামুনের সামনে সন্ত্রাসীদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। অফিসার পাড়ার কাজলের ছেলে সোহাগ এবং জনৈক ভুলুর ছেলে সুমনের নেতৃত্বে দশ-বারো জনের একটি সন্ত্রাসী দল খায়েরের হাতে থাকা মামলার গুরুত্বপূর্ণ কাগজসহ হাত ব্যাগটি ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। খায়ের উপর্যুপরি মার খেয়েও ব্যাগটি রক্ষা করেন। কিন্তু পকেটের টাকা রক্ষা করতে পারেননি। সন্ত্রাসীরা তার প্যান্টের পকেট থেকে দশ হাজার তিনশ' টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা প্রায় আধাঘন্টা ধরে খায়েরকে কোর্টের বাইরে নিয়ে যাবার জন্য টানা-হেচড়া করতে থাকে। এ সময় তিনি প্রাণভয়ে চিৎকার দিতে থাকলে ডিসির নাজির মাহাবুবসহ কয়েকজন এসে তাকে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে উদ্ধার করে। সন্ত্রাসীরা তখন বীরদর্পে অফিসার পাড়ার দিকে চলে যায়। এ সময় ম্যাজিস্ট্রেট দূর থেকে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখেন এবং উদ্ধারের পর খায়েরের কাছ থেকে বিস্তারিত জানেন। ঢাকার মোহাম্মদপুরের বাসিন্দা আবুল খায়ের ভোলা জেলার চরফ্যাশন থানার নীলকমল ইউনিয়নের চর যমুনার মৃত আব্দুল লতিফের ছেলে। তিনি জাতিসংঘের ঢাকা অফিসে কর্মরত ছিলেন। অবসর নেয়ার পর চরফ্যাশনে ট্রাকের ব্যবসা শুরু করেন। নীল কমলের চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন লিখনের নেতৃত্বে স্থানীয় শাহজল, শহীদ, সেকান্দরসহ কয়েকজন চাঁদা চেয়ে না পেয়ে তার ট্রাকটি দীর্ঘ ২৯ মাস যাবৎ জোরপূর্বক আটকে রাখে। বাধ্য হয়ে আবুল খায়ের কোর্টে মামলা করেন।

১৩ জুন একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, 'ঢাকার সিএমএম আদালত ও মহানগর দায়রা আদালতসহ ৬০টি আদালতের জন্য এতদিন ৪০ জন সশস্ত্র পুলিশকে রাখা হতো তাদের পাশাপাশি আভ্যন্তরীণ কর্তব্য তথা আসামীদের আনা-নেয়া ও অন্যান্য কাজ

www.pathagar.com

কর্মের জন্য থাকতো ৬০ জন নিরস্ত্র পুলিশ। কিন্তু চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হঠাৎ ঐ ৪০জনের মধ্যে থেকে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশকে প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং প্রত্যাহারের কোনো কারণও জানানো হয়নি। এর ফলে আদালত পুলিশ দুর্বল ও বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে প্রতিদিন হাজতী ও বিচারাধীন পাঁচ শতাধিক আসামীকে আদালত প্রাঙ্গণে আনতে হয়। সেই সাথে আনা হয় রাজধানীর ২১টি থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃত আসামীদেরও যাদের গড় সংখ্যা প্রায় তিনশ'। আইনানুযায়ী যে অপরাধের অভিযোগই হোক, গ্রেফতার করার ২৪ ঘন্টার মধ্যে আটক ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করা হয়। ফলে সব মিলিয়ে প্রতিদিন আট শতাধিক আসামীকে আনা-নেয়ার পাশাপাশি বিচারকের সামনে পেশ করার দায়িত্বও আদালত পুলিশকে পালন করতে হয়। এ জন্য আদালত প্রাঙ্গণে কঠোর নিরাপত্তা প্রয়োজন। অতীতে অনেক উপলক্ষ্যেই এখানে আসামী ছিনিয়ে নেয়ার এবং বোমাবাজি ও গুলিবিনিময়ের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, সন্ত্রাসীরা এমনকি প্রতিপক্ষের সন্ত্রাসী নেতাকে গুলি করে হত্যাও করেছে। এসবের সঙ্গে আসামী পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটে। বিচারালয় হলেও আদালত প্রাঙ্গণে সবসময় অপরাধী-সন্ত্রাসীদের ভিড় থাকে এবং আশঙ্কা থাকে নানা ধরনের অপরাধ ও সহিংস ঘটনা সংঘটিত হওয়ার। উপর্যুপরি সহিংসতার প্রেক্ষিতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল এবং এই কমিটির রিপোর্ট ও সুপারিশের ভিত্তিতেই ১৯৯৯ সালে সরকার রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকে নিয়ে আদালত প্রাঙ্গণে ৪০ জন সশস্ত্র পুলিশকে মোতায়েন করেছিল। এ আয়োজনকেও যথেষ্ট মনে করা হয়নি, আর সে কারণে আদালত পুলিশের পক্ষ থেকে আরো ২০ জন সশস্ত্র পুলিশ পাঠানোর অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আওয়ামী সরকার বিপরীত পদক্ষেপ নেয়। এর ফলে নানামুখী সমস্যা দেখা দেয়। একই পুলিশকে আসামী আনা-নেয়া ও বিচারকের সামনে উপস্থাপন থেকে আদালত প্রাঙ্গণের নিরাপত্তা বিধান করা পর্যন্ত সকল ধরনের কাজ করতে হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে ৬০ টি আদালতের সবকয়টিতে আসামী হাজীর করা অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং প্রায়ই প্রসিকিউশনকে আদালতের কাছে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। একই সাথে বাড়ে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা। নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা জানিয়ে আদালত পুলিশ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখে প্রত্যাহারের পরিবর্তে সশস্ত্র পুলিশের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য অনুরোধ জানায়। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ১৭ জুন ২০০১)

www.pathagar.com

আইনের শাসনের প্রতি আঘাত

বিচার বিভাগের উপর সরাসরি আক্রমণ করার স্বভাব শেখ হাসিনা সরকার তাদের পূর্বসূরী শেখ মুজিবের কাছ থেকে পেয়েছে। শেখ মুজিবের শাসনামলে বিচার বিভাগ বহুবার আক্রান্ত হয়েছে। বাকশাল কায়েমের পূর্বে ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আইনের মাধ্যমে প্রথম বাংলাদেশের বিচারকদের নিয়োগ-বরখাস্তের ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধান অর্থাৎ শেখ মুজিবের হাতে চলে যায়। মেজরিটির জোর দেখিয়ে একদলীয় সরকার কায়েমের জন্য সেদিন শেখ মুজিবের স্বৈরাচারী মনোভাবে চতুর্থ সংশোধনী পাস হয়েছিল। চতুর্থ সংশোধনীর পূর্বে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগের বিধান ছিল। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতিদের সরাসরি নিয়োগের ক্ষমতা লাভ করেন।

চতুর্থ সংশোধনীতে সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফার পরিবর্তে নতুন করে (১) দফা প্রতিস্থাপন করা হয়। সেখানে বলা হয়, 'প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকগণ প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।' সংবিধানের ৯৬(ক) (২) দফার পরিবর্তেন নতুন (২) দফা প্রতিস্থাপন করে বলা হয়, 'অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা কোনো বিচারপতিকে তাঁর পদ হইতে অপসারণ করা যাইবে।' এভাবে সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপনের ফলে বিচার বিভাগীয় পদের বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি বলে প্রেসিডেন্ট তাদেরকে নিয়োগ দানের ক্ষমতা লাভ করেন।

শেখ মুজিবের শাসনামলের পরে পরবর্তী সরকারগুলো বিচার বিভাগকে কটাক্ষ বা সরাসরি হস্তক্ষেপ করার সাহস না পেলেও ১৯৯৬ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করে শেখ হাসিনা ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা তা করেছে। শুধু তাই নয়, মুজিবের দ্বিতীয় বিপ্লব বাস্তবায়নের কথা বলে শেখ হাসিনা বাকশালী শাসনের পুনরাবৃত্তি করার আভাস দিয়েছিলেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই আওয়ামীরা বিচার বিভাগ সম্পর্কে একের পর এক অসংলগ্ন কথা-বার্তা বলেছে।

আওয়ামী সরকারের দায়ের করা পুলিশের এসআই নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলায় ২৮ জুন ১৯৯৮ খালেদা জিয়া মাননীয় জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুলের আদালতে হাজির হয়ে জামিন প্রার্থনা করেন। দুর্নীতি দমন কর্মকর্তা আঃ সাত্তার সরকার ১৯৯৬ সালের ২১ ডিসেম্বর রমনা থানায় মামলাটি দায়ের করে ২ জুন সিএমএম আদালতে অভিযোগপত্রে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরীকে পলাতক দেখানো হয়। জামিনের শুনানীকালে জজ কাজী গোলাম রসুল মামলার নথি পর্যালোচনা করে এই মামলার তদন্তকারী অফিসার আছেন কিনা জানতে চান। তদন্তকারী অফিসার এজলাসের সামনে হাজির হলে তার নাম কি জানতে চান। জজ তদন্তকারী অফিসারকে তাৎক্ষণিকভাবে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। তার চাকরির মেয়াদকালও জানতে চান। জবাবে তদন্তকারী অফিসার তার নাম আঃ সাত্তার সরকার এবং ১৩ বছর যাবত চাকরি করছেন বলে জানান। এ সময়ে জজ বেগম খালেদা জিয়াকে লক্ষ্য করে বলেন, ওনাকে চিনেন? জবাবে তদন্তকারী অফিসার বলেন,

www.pathagar.com

জ্বী। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরীকে চিনেন? এ প্রশ্নের জবাবেও তদন্তকারী অফিসার বলেন, জ্বী চিনি। পরে জজ তদন্তকারী অফিসারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনি অভিযোগপত্রে এদেরকে পলাতক দেখিয়েছেন কেন? এ ব্যাপারটি আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। জজ আরো বলেন, আপনি কি সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন মনে করছেন বা তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন? জবাবে তদন্তকারী অফিসার বলেন, আমি তাঁদের খুঁজে পাইনি। তদন্তকারী অফিসারের বক্তব্য শুনে জজ বলেন, আমার কাছে অবাক লাগছে যে, আপনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে খুঁজে পাননি। জজ বলেন, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য, আমার কাছে এ বক্তব্য অপমানজনক মনে হচ্ছে। জজ বলেন, আপনি কি কখনো তাদেরকে গ্রেফতারের চেষ্টা করেছেন? এই সময়ে সৈয়দ রেজাউর রহমান বলেন, আমাদের বাস্তবতাকে দেখতে হবে। তদন্তকারী অফিসারের পক্ষে বাস্তবে তাদেরকে গ্রেফতার করা সম্ভব কিনা তা বিবেচনা করতে হবে। জবাবে জজ বলেন, একতরফাভাবে বলবেন না। এ দেশে এ ধরনের ঘটনা কি ইতিপূর্বে ঘটেনি?

এদিকে খালেদা জিয়ার পায়ে অসুবিধা থাকার জন্য আদালতে উপস্থিত হয়েই তাঁর আইনজীবীদের মাধ্যমে নিয়মানুযায়ী বিচারকদের কাছে বসার অনুমতি চান। বিচারক খালেদা জিয়াকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা।' উত্তরে তিনি বলেন, 'আমার পায়ে একটু ব্যথা আছে।' তখন বিচারক তাঁকে পাশে একটি খালি চেয়ারে বসার অনুমতি দেয়ার পর খালেদা জিয়া চেয়ারে বসেন।

বিচারকের অনুমতি নিয়ে খালেদা জিয়া বসেছেন জেনেও প্রধানমন্ত্রী পরের দিন সংসদে তাঁর বক্তৃতায় খালেদা জিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেন, দুনীর্তির মামলায় জড়িয়ে আদালত অবমাননা করে কেউ নিজের অপরাধ ঢাকতে পারবে না। আদালতকে যদি বক্তৃতার মাঠে পরিণত করা হয়, আর আসামীকে যদি কাঠগড়ায় না দাঁড়িয়ে চেয়ারে বসাতে বাধ্য করা হয় তাহলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না। এজলাসে রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়ে কিভাবে আইনের শাসন কায়েম হবে?'

প্রধানমন্ত্রী উপরোক্ত বক্তব্য দিয়ে কার্যত আদালতের অবমাননা করেছেন। আদালত কিভাবে চলবে এগুলো নির্ণয় করা সংশ্লিষ্ট বিচারকের নিজস্ব এখতিয়ার। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী হয়ত ইতিহাস চর্চা ভুলে গিয়ে এসব মন্তব্য করেছেন। সুদূর অতীতে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের হয়েছিল তখন বিচারকের অনুমতি নিয়েই শেখ মুজিব মঞ্চের বক্তৃতার মতো আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জবানবন্দী প্রদান করেছিলেন।

জেলহত্যা দিবস উপলক্ষে ৩ নভেম্বর ১৯৯৮ আওয়ামী লীগ পল্টন ময়দানে এক সমাবেশের আয়োজন করে। কিন্তু সমাবেশের শ্লোগান, বক্তব্য, ব্যানার, ফেস্টুন লিফলেট প্রভৃতির মাধ্যমে যে দৃশ্য চোখে পড়ে তাতে বুঝা যায় জেলহত্যা নয়, ৮ নভেম্বর শেখ মুজিব হত্যা মামলার রায়কে সামনে রেখেই এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ শেখ মুজিব হত্যা মামলার রায় সামনে রেখে মাঠ গরম ও মাঠ দখল করার যে কর্মসূচি পরবর্তীতে বাস্তবায়ন করেছে এ সমাবেশে তার সূচনা হয়েছিল। সমাবেশ থেকে আগামী কয়েকদিনের মাঠ দখল কর্মসূচিও ঘোষণা করা হয়। সমাবেশে যোগদানের জন্য যেসব মিছিল আসে, সেসব মিছিলে শ্লোগান ছিল একটিই, তা হচ্ছে '৮ নভেম্বর রায়ে ফাঁসি চাই, দিতে হবে।' একই দাবী ব্যানার, ফেস্টুন এবং প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল। তেমনি যেসব লিফলেট সমাবেশে ছাড়া হয় তাতেও ছিল 'শেখ মুজিব ও চার নেতার হত্যা মামলার ফাঁসি চাই দিতে

www.pathagar.com

হবে।' জনসভায় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রায় সব বক্তার বক্তব্যেই ফাঁসি চাই, দিতে হবে, দাবীটি ছিল কমন। বক্তব্য দিতে উঠে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আগামী ৮ নভেম্বর জাতির জনক হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করা হচ্ছে। আপনারা দোয়া করবেন কোনো খুনীই যাতে রেহাই না পায়'। টিএন্ড টি মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, 'আগামী ৮ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করা হবে। আপনাদের সবাইকে এই রায় ঘোষণা পর্যন্ত এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এই রায় বাস্তবায়ন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত রাজপথ দখলে রাখতে হবে।' ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি ও মেয়র মোহাম্মদ হানিফ বলেন, 'আগামী ৮ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় ঘোষণা হবে। রায় সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে চাই না। তবে আপনাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে এবং রাজপথে থাকতে হবে।' একই ভাষায় বক্তব্য দেন অন্যান্য বক্তাও। সমাবেশ শেষে মাইকে ঘোষিত হয় আগামীকাল স্বেচ্ছাসেবক লীগ, পরশু শ্রমিক লীগ বঙ্গবন্ধু হত্যার খুনীদের ফাঁসির দাবীতে গণমিছিল বের করবে। এসব মিছিলে আপনারা থাকবেন। পল্টন ময়দানের জনসভায় আওয়ামী লীগ যে আচরণ করেছে তাতে মনে হওয়া অস্বাভাকি নয় যে, তারা ধরে নিয়েছে কি রায় হতে যাচ্ছে আদালতে। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ যে বক্তব্য দেন তাতে পরোক্ষভাবে আদালতের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। রায়ের আগে এ ধরনের বক্তব্য আদালতের রায়কে প্রভাবিত করার শামিল। শুধু বক্তৃতা এবং শ্লোগানই নয় সমাবেশে আওয়ামী লীগ পেশীশক্তিও প্রদর্শন করে। আওয়ামী ঘাট শ্রমিক লীগ, নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য অঙ্গ দল যেসব মিছিল নিয়ে সমাবেশে যোগ দেয়, তাতে শক্তির মহড়াই প্রদর্শিত হয়। এসব মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা গজারী কাঠের লাঠির মাথায় লাল নিশান বেঁধে সমাবেশে আসে। হাজারে হাজারে ছিল গজারী কাঠের লাঠি। অসংখ্য ক্যাডারের মাথায় বাঁধা ছিল লালপট্টি। জনসভা উপলক্ষে পুলিশকেও সরকার যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে। জনসভায় নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল কয়েক হাজার পুলিশ। রাজউক ভবন, জীবন বীমা ভবন, শিল্পভবন, স্টেডিয়ামের গ্যালারী থেকে শুরু করে আশপাশের ভবনের কাছে, বেলকনিতে পুলিশকে অস্ত্র উচিয়ে ডিউটি করতে দেখা গেছে। জনসভাটির চারপাশে অসংখ্য পুলিশ মোতায়েন ছিল। গুলিস্থান সিনেমা হল, বঙ্গভবন এলাকা, দৈনিক বাংলা মোড়, ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড, জিপিও'র সামনে মহানগর পুলিশ এবং আমর্ড পুলিশ নিয়োজিত ছিল। মঞ্চের পাশে বাঁশের রোলিং দিয়ে নিরাপত্তা বেষ্টনি তৈরি করা হয়। সেনাবাহিনী, বিডিআর ও পুলিশ সেখানে দায়িত্ব পালন করে। হকি স্টেডিয়ামে বিডিআর সদস্যরা ভারি মেশিনগান তাক করে নিরাপত্তা দেয়। এছাড়া পুরো পল্টন এলাকায় সাদা পোশাকে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার লোকদেরকে ওয়াকিটকি হাতে জনসভার নিরাপত্তা তদারকি করতে দেখা যায়।

সুপ্রীমকোর্ট বার এসোসিয়েশনের সদস্য এ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকারকে দেশের নির্বাহী বিভাগের আওতামুক্ত সুপ্রীমকোর্ট সীমানার অভ্যন্তর থেকে সাদা পোশাকী ও পোশাকধারী পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে। উত্তরে বার কাউন্সিল ভবন, দক্ষিণে কার্জন হল, মন্ত্রণালয়ের সামনে সড়ক পর্যন্ত সমগ্র এলাকা সুপ্রীমকোর্ট এলাকা। আদালতের নির্দেশ ছাড়া আদালত এলাকা থেকে কারো গ্রেফতারের কোন নজির নেই। সুপ্রীমকোর্টের সীমানা থেকে পেশারত আইনজীবীকে গ্রেফতারের একদিনের মাথায় ২৩ নভেম্বরে দুপুরে সুপ্রীমকোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি এডভোকেট হাবিবুল ইসলাম ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে দেড়ঘন্টা স্থায়ী এক জনাকীর্ণ জরুরী সাধারণ সভায় সদস্য আইনজীবীগণ বলেন, সুপ্রীমকোর্ট চত্বর থেকে গ্রেফতারের এই ঘটনা স্বাধীন-সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা, আইনের শাসন এবং

www.pathagar.com

আইনজীবীদের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও দায়িত্ব পালনে নগ্ন হস্তক্ষেপ। এ ঘটনা সুপ্রীমকোর্টের অভ্যন্তরে বিরাজমান পবিত্র পরিবেশকে ক্ষুণ্ন ও কুলষিত করেছে। বক্তারা আইনজীবীদের নিরাপত্তা ও সুপ্রীমকোর্টের পবিত্রতা রক্ষায় প্রধান বিচারপতির হস্তক্ষেপ কামনা করেন। ক্ষুব্ধ আইনজীবীগণ বলেন, পেশাগত দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত আইনজীবীগণ বিচারপতিদের মতোই আদালতের কর্মকর্তা ও বিচার ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুপ্রীমকোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে এমন একজন আইনজীবীর গ্রেফতারকে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থায় নির্বাহী বিভাগ ও পুলিশ হস্তক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করেন। সভায় এই কাজের জন্য দায়ী ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনা না করলে এবং ভবিষ্যতে এহেন আচরণের পুনরাবৃত্তি না ঘটার নিশ্চয়তা প্রদান না করলে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনয়নের নোটিশ প্রদানের জন্য প্রধান বিচারপতির প্রতি অনুরোধ জানানোর জন্য বার এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেয়া হয়। সভার প্রস্তাবে সুপ্রীমকোর্টের অভ্যন্তরে বিরাজমান পবিত্র পরিবেশ রক্ষার আহবান জানানো হয়। বার এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট আব্দুল আউয়ালের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সুপ্রীমকোর্টের প্রবীণ ও বিশিষ্ট আইনজীবী এ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমদ, এ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান এমপি, ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার এমপি, ব্যারিস্টার আমিনুল হক এমপি, ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, এ্যাডভোকেট খান সাইফুর রহমান, বার এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট জয়নাল আবেদীন ও এ্যাডভোকেট মশিহুজ্জামান, এ্যাডভোকেট এইচ কে আব্দুল হাই, এ্যাডভাকেট নজরুল ইসলাম প্রমুখ। বক্তাগণ উদ্ভুত পরিস্থিতি ও সমস্যা অচিরেই সমাধানের জন্য আহবান জানান। তারা তাদের দায়িত্ব পালনের অধিকার ও সুযোগের উপর নগ্ন হামলার নিন্দা জানিয়ে সুপ্রীমকোর্টের পবিত্রতা, বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা, বিচারপতি ও আইনজীবীদের নিরাপত্তা, মান সম্মান অক্ষুণ্ন রাখা ও সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ২৪ নভেম্বর ১৯৯৮)

জেল হত্যা মামলায় গ্রেফতারকৃত সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের প্রতি সরকারের বিমাতাসুলভ আচরণ সবাইকে হতবাক করেছে। সরকারের একটি নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিবাদে শাহ মোয়াজ্জেমের স্ত্রী সালেহ হোসেন সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দিয়েছেন তা প্রতিহিংসাপরায়ণ সরকারের অসুস্থ চিন্তা ভাবনার পরিচয় বহন করেছে। বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করেন, ১৭ জানুয়ারি দিবাগত রাতে ৮টায় আমার স্বামী শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের একমাত্র বড় ভাই জনাব শাহ আলম ইন্তেকাল করেন। জনাব শাহ আলমের মৃত্যুর প্রায় ১ ঘন্টার পর আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে অনুরোধ জানাই, শৈশবে পিতামাতা হারা এক মাত্র বড়ভাইয়ের স্নেহে লালিত-পালিত শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনকে যেন কিছু সময়ের জন্য প্যারোলে মুক্তি দিয়ে বড় ভাইয়ের লাশ শেষবারের মতো একনজর দেখার এবং নামাযে জানাজায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে আমার স্বামীর আইনজীবীর মাধ্যমে লিখিত আবেদন করার পরামর্শ দেন। আমরা পরদিন সকালে আইনজীবীর মাধ্যমেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আবেদন করে লাশ নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা উৎকণ্ঠার সাথে অপেক্ষা করতে থাকি। বিকেল ৪টার পর অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের জানানো হয়, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনকে প্যারোলে মুক্তি দেয়া সম্ভব নয়। সরকারের এ নির্দেশে আমাদের শোকার্ত পরিবারের জন্য আর একটি নির্মম, প্রচন্ড আঘাত। তদানীন্তন পাকিস্তান আমল হতে স্বাধীন বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত কোনো বন্দীর

www.pathagar.com

নিকটাত্মীয় গুরুতর অসুস্থ হলে কিংবা মৃত্যু হলে তাকে শেষবারের মতো একজনর দেখা এবং জানাযায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের শত শত উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও আমার স্বামীকে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে সরকার মানবিক মূল্যবোধকে ধুলায় লুণ্ঠিত করে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে আমাদের প্রতি এক নিদারুণ নিষ্ঠুর আচরণ করেছে। আমি সরকারের এমন মানবিক নিষ্ঠুর আচরণের নিন্দা করে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সর্বস্তরের জনগণের নিকট এই নিষ্ঠুর আচরণের বিচার ভার ছেড়ে দিয়ে শুধু এটুকু বলতে চাই, আমার স্বামী শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন মহান মুক্তিযুদ্ধের একজন সফল সংগঠক। নিজের জীবনকে বাজি রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামে যুদ্ধ করেছেন। ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনী আমার স্বামীর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে বাড়ি পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল এবং আমার স্বামীর বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করেছিল। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন হতে প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আমার স্বামীর ভূমিকা সর্বজনবিদিত। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, প্রতিহিংসার শিকার হয়ে তিনি আজ কারাগারের নির্জন কক্ষে গুরুতর অসুস্থ। দুর্ভাগ্য আজ একমাত্র ভাইকে শেষবারের মতো এক নজর দেখা এবং নামাযে জানাযায় অংশগ্রহণ হতে তিনি বঞ্চিত হলেন। আমি দ্ব্যর্থহীনকণ্ঠে বলতে চাই, আমার স্বামী নির্দোষ ও নিরপরাধ। (সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব ২৪ জানুয়ারি ১৯৯৯)

৭ আগষ্ট ১৯৯৯ সিলেট প্রেসক্লাবে এক সভায় আওয়ামী লীগের এমপি শাহ আজিজুর রহমান উক্তি করেন, 'হাইকোর্টে এখন সন্ত্রাসীদের যেভাবে জামিন দেয়া হচ্ছে তাতে হাইকোর্ট আর হাইকোর্ট মনে হচ্ছে না। আগের দিন রাতে সন্ত্রাসীদের সাথে বৈঠক করে পরের দিন জামিন দেয়া হচ্ছে। হাইকোর্টকে এখন সার্কিট হাউস মনে হচ্ছে।' এমপি অবশ্য পরবর্তীতে বলেছেন তিনি এ ধরনের কথা বলেননি।

১০ আগষ্ট দলীয় এক সভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও মন্ত্রী জিল্লুর রহমান বলেন, 'নিম্ন আদালতের মৃত্যুদন্ডের সেই রায়টি নিয়ে অযথা কালক্ষেপণ করা হচ্ছে। নিম্ন আদালতে যে রায় দেয়া হয়েছে, তার কাগজপত্র দেখেই হাইকোর্ট রায় দিতে পারে। হাইকোর্ট তা না করে অযথা মামলাটি ঝুঁলিয়ে রেখে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করতে দিচ্ছে না।' মন্ত্রী আরো বলেন, 'ওই নিম্ন আদালতের রায় যেন কার্যকর করা না যায় সেজন্য সংশ্লিষ্ট আর সবাই যত সব ষড়যন্ত্র করবে।'

মন্ত্রীর বক্তব্যে স্পষ্টভাবে বুঝা গেছে তিনি মুজিব হত্যাকান্ডের মামলা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। নিম্ন আদালতের কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরে অভিযুক্তরা উচ্চতর আদালতে আপীল করবে, মামলা চলবে, শাস্তি বহাল বা মওকুফ হবে এটাই নিয়ম। মন্ত্রী সেই নিয়মকে কটাক্ষ করে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তা আদালত অবমাননার শামিল। হাইকোর্টে এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার তড়িৎ নিষ্পত্তি কোনক্রমেই সম্ভব নয়। ইতিহাসের অনেক ঘটনায় দেখা গেছে উচ্চতর আদালতে আপীল হওয়ার পরে মামলাটি অন্যদিকে মোড় নিয়েছে।

১৯ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জাতীয় দৈনিক ও সংবাদ সংস্থার সম্পাদকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে মন বাসনা জাহির করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জজ, ব্যারিস্টার, আইনজীবী ও সাংবাদিকদের জবাবদিহিতা থাকতে হবে। জবাবদিহি করতে হবে।' শেখ মুজিবের বাকশাল কায়েমের পূর্বে ১৯৭৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ভারতের কলকাতা থেকে প্রকাশিত ফ্রন্টিয়ার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখায় বলা হয়েছিল 'বাংলাদেশের সুপ্রিমকোর্টের মৌলিক মানবাধিকার প্রয়োগের আর ক্ষমতা থাকবে না। শেখ মুজিব দুর্বব্যহার ও অযোগ্যতার

www.pathagar.com

অজুহাতে বিচারপতিগণকে অপসারণ করতে পারবেন। মিসেস জি (গান্ধী)'র মতো তিনিও তার অনুগত বিচারপতি দেখতে চান। ক্ষমতার ঔদ্ধত্যে অথবা মানসিক উৎকর্ষের অভাবে ডান্ডা প্রয়োগই তিনি বেশি পছন্দ করেন।'

একই দিনে ঢাকার পুলিশ কমিশনারের কাছে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের সহকারী রেজিষ্ট্রার সিদ্দিকুর রহমান হাইকোর্ট এলাকা থেকে বস্তিবাসীদের সরিয়ে নেয়ার জন্য অতি জরুরী একটি চিঠি পাঠান। চিঠিতে বলা হয়, গত ১৮ আগস্ট থেকে হাইকোর্ট এলাকার বাইরে অনেক বস্তির লোকজন জমায়েত হয়ে বিভিন্ন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে বিধায় তাদের বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট এলাকা থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া একান্ত প্রয়োজন। এমতাবস্থায় উপরোল্লিখিত বিষয়ে অত্র কোর্টের শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার নিমিত্তে অতীব জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।' এই চিঠি ডিএমপি কমিশনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে পাঠালে মন্ত্রী হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা অবস্থায় বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করা যায় কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠান। ২২ আগস্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কয়েক জন সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এই চিঠির কথা স্বীকার করে বলেন, 'অন্য কোন সময় হলে হাইকোর্টের অনুরোধ রক্ষা করতে পারতাম।'

১ সেপ্টেম্বর ঢাকা সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল বলেছিলেন, 'এক সময় আমাদের চালু প্রবাদ বাক্য ছিল দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। কিন্তু এখন সেটা উল্টো হয়েছে দুষ্টের পালন ও শিষ্টের দমন। দুর্নীতি যদি রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে যায়, তাহলে তা দমন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।'

প্রধান বিচারপতি এই বক্তব্যের পর ৬ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে ডেপুটি স্পীকার আব্দুল হামিদের সভাপতিত্বে সংসদের বৈঠক চলাকালে আওয়ামী এমপি শাহিন মনোয়ার হকের এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'সেমিনারে দাঁড়িয়ে অনেকে দুষ্টের লালন ও শিষ্টের দমনের ব্যাপারে বড় বড় কথা বলেন। আসলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন হচ্ছে না। ওরাই দুষ্টের দমন করে না। উচ্চ আসনে বসে ক্রিমিনালদের ছেড়ে দেয়া ও তাদের পক্ষ নেয়ার ডাবল স্ট্যান্ডার্ড অবলম্বন করা হয়।' তিনি বলেন, উদার ভাবে জামিন দেয়া বন্ধ হলে আমরা অবশ্যই সন্ত্রাস দমন করতে পারবো।' তিনি বলেন, 'সন্ত্রাস দমনের স্বার্থে আমরা এমন আইন করবো যাতে সন্ত্রাসীরা আইনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে না যেতে পার।' তিনি হাইকোর্টের জামিন ও আগাম জামিন প্রদানের সমালোচনা করে ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, 'যশোরের উদীচী অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণের মামলার আসামী নুরুন্নবীকে হাইকোর্ট আগাম জামিন দিয়েছে। খুনী নুরুন্নবীর বিরুদ্ধে উদীচীর ঘটনা ছাড়াও একজন সম্পাদক হত্যার মামলা রয়েছে।' তিনি বলেন, 'আমার দুঃখ হয় যখন দেখি বহু লোকের খুনী নুরুন্নবী আগাম জামিন পায়।' জামিনের বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'কিছুদিন আগে ঢাকা শহরের সন্ত্রাসী মগবাজারের শুভ্রকে হাইকোর্ট জামিন দিয়েছে।' তিনি বলেন, 'হাইকোর্ট শুভ্রকে জামিন দেবে এ আগাম খবর জানার পর মগবাজার এলাকার হাজার হাজার লোক আমার কাছে এসেছে। তারা বলেছে, একজন সন্ত্রাসী জামিন পেয়ে যাচ্ছে। সে ছাড়া পেলে এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি হবে। তার জামিন লাভের পর আমি আইজিপিকে নির্দেশ দিলাম তাকে গ্রেফতার করতে। ৫ মিনিট পর টেলিফোন করে আইজিপি আমার নির্দেশ পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, হাইকোর্ট শুধু শুভ্রকে জামিনই দেয়নি, তাকে দ্বিতীয়বার গ্রেফতার না করার নির্দেশ দিয়েছে। আবার গ্রেফতার করলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে আদালত ব্যবস্থা নেবে।' তিনি

www.pathagar.com

প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, 'দুষ্টের লালন ও শিষ্টের দমন কারা করে? কারা সমাজে অশান্তি সৃষ্টির জন্য দায়ী?'

সংসদ একটি মহান স্থান। আদালতও একটি মহান স্থান। সংসদে দেশের জন্য আইন প্রণীত হয়। আদালতে ন্যায় বিচার হয়। কেউ সংসদ ও আদালতকে অভিযুক্ত করে বক্তব্য রাখতে পারেন না। তারপরও সকল প্রকার শিষ্টাচার বর্জন করে সংসদের মতো পবিত্র স্থানে দাঁড়িয়ে মন্ত্রী এ ধরনের কথাগুলো বলেন। মন্ত্রী বুঝে-শুনে সম্পূরক প্রশ্নের উত্তরে কথাগুলো বলেছেন। মন্ত্রীকে বাঁচানোর জন্য এক শ্রেণীর বুদ্ধি বিক্রেতা আবেগের আশ্রয় নিয়ে 'সংসদে একজন সদস্যের কথা বলার ক্ষমতা অসীম' বলে প্রচার-প্রপাগান্ডা চালিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, প্রচলিত বিধি মোতাবেক সংসদে অনেক কিছু আলোচনা করা গেলেও বিচার বিভাগ কিংবা বিচার সম্পর্কে কোনো বিরূপ মন্তব্য করা যায় না। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৭০(৩) ধারা মতে বিচারক সম্পর্কে কোনো বিরূপ মন্তব্য করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই ধারায় বলা হয়েছে, কোনো আলোচনা যথাযথ ভাষায় লিখিত বাস্তবভিত্তিক না হইলে রাষ্ট্রপতি বা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকের ব্যক্তিগত আচরণ সম্পর্কে কটাক্ষের সমতুল্য কোন মন্তব্য করিবেন না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে হাইকোর্টে মামলা হলে ২৮ অক্টোবর বিচারপতি এম মোজাম্মেল হক ও বিচারপতি আবদুর রশিদ সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ তাদের প্রদত্ত রায়ে 'সংসদ সদস্য ও অন্যদের আদালত সম্পর্কে সতর্ক বক্তব্য দেয়া উচিত বলে' মতামত দেন। আদালত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কিছু অভিযোগের ব্যাখ্যাও দেন। যশোরের নুরুন্নবীকে জামিন দেয়া হয়নি বলে আদালত জানান। শুভ্রর আটকাদেশ সম্পর্কে আদালত বলেন, 'আদালত তিনবার শুভ্রর আটকাদেশ অবৈধ ঘোষণা করলে সরকার চতুর্থবারেও একই অভিযোগে তাকে আটকাদেশ দেয়। তখন আদালত তার আদেশে বলেন, সরকার আদালতের আদেশকে অবহেলা করে একই অভিযোগে একই ব্যক্তিকে চার বার আটকাদেশ দিচ্ছে। একই অভিযোগে তাকে আর আটকাদেশ দেয়া যাবে না।'

২৮ আগষ্ট থেকে ১৭ অক্টোবর ১৯৯৯ পর্যন্ত সুপ্রীমকোর্টের বাৎসরিক ছুটির পর কোর্টের কার্যক্রম পুনরায় শুরুর প্রাক্কালে ১১ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের নেতৃত্বাধীন আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির বৈঠকে অভিযোগ করা হয়, ২৮ আগস্ট অবকাশে যাবার আগে দু'দিন হাইকোর্ট বেঞ্চ ১২শ' লোককে জামিন দিয়েছে। সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত বলেন, 'সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করে ঘটনার তদন্ত করা উচিত।'

পরের দিন ১২ অক্টোবর সরকার সমর্থক দু'টি পত্রিকা দৈনিক সংবাদ ও দৈনিক জনকণ্ঠে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভার উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয় যে, 'গত ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর (মূলতঃ ২৬ ও ২৭ আগষ্ট) হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ রাত ৮টা পর্যন্ত কাজ চালিয়ে খুন, ধর্ষণ, অস্ত্র মামলাসহ গুরুতর অপরাধের সহস্রাধিক আসামীকে জামিন দেয়ার এক নজিরবিহীন ঘটনা ঘটিয়েছে। এসব মামলার মধ্যে ৬৩টি মামলায় অভিযুক্তদের আগাম জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। এ আগাম জামিন মঞ্জুরের অস্বাভাবিক সংখ্যাধিক্য নিম্ন আদালতগুলোকে অকার্যকর করার অবস্থায় ঠেলে দিচ্ছে বলে উক্ত সভায় মন্তব্য করা হয়েছে বলে উক্ত সভার উদ্ধৃতি দিয়ে প্রকাশ করা হয়।'

পরদিন ১৩ অক্টোবর দু'টি দৈনিকেই প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়। এতে মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক জামিন প্রদান করা বা না করার কোন

www.pathagar.com

প্রসঙ্গই বৈঠকে উত্থাপিত বা আলোচিত হয়নি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় সংসদের গণসংযোগ শাখা কর্তৃক প্রেরিত এ ব্যাখ্যাটি দু'টি দৈনিকেই দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় গুরত্বহীনভাবে প্রকাশ করে। আইনমন্ত্রী সংসদে প্রদত্ত বক্তব্যে এসব সংবাদ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উল্লেখ করেন। সংবাদের সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য নভেম্বরে সুপ্রীমকোর্ট বার এসোসিয়েশনের নির্বাচিত সম্পাদক এডভোকেট আঃ আউয়াল সুপ্রীমকোর্টের রেজিষ্ট্রারকে প্রেরিত এক চিঠিতে ২৬ ও ২৭ আগষ্ট হাইকোর্ট বিভাগের ঐ বেঞ্চে কতগুলো মামলার বিচার হয়েছে এবং কতজন জামিন লাভ করেছেন সে তথ্য জানাতে অনুরোধ করেন। রেজিস্ট্রার তার উত্তরে সম্পাদককে যে তথ্য সরবরাহ করেন তাতে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র প্রতিফলিত হয়।

মাননীয় বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হক ও মাননীয় বিচারপতি এ বিএম খায়রুল হকের সমম্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বিভাগের সবচেয়ে সিনিয়র ফৌজদারী বেঞ্চটিতে ২৬ আগস্ট মোট ১০২টি মোশন (নতুন মামলা) শুনানী হয়। তার মধ্যে ৯৪ টি মামলায় প্রতিপক্ষের উপর রুল ইস্যু হয় এবং ৮টি মামলা প্রাথমিক শুনানী শেষে খারিজ হয়ে যায়। এ ৯৪টি মামলার মধ্যে ৮৩টি মামলায় হাইকোর্ট বিভাগ ন্যায়, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিবেচনায় ২১৯ জন আবেদনকারীকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেন। বাকী ১১টি অন্যান্য মামলা ছিল।

বাৎসরিক ছুটির শুরুর পূর্বদিন ২৭ আগষ্ট বর্ণিত বেঞ্চটিতে মোট ১২০টি মোশন শুনানী হয়। তার মধ্যে ১০১টিতে প্রতিপক্ষের উপর রুল ইস্যু হয় এবং ১৯টিতে মামলা খারিজ হয়। ১০১টি মামলার মধ্যে ৭২টিতে ছিল জামিনের আবেদন। তাতে জামিন লাভ করেন মোট ১৩৮ জন। ২৯টি ছিল অন্যান্য মামলা অর্থ্যাৎ বাৎসরিক ছুটির পূর্ববর্তী দুদিনে হাইকোর্ট বিভাগের ঐ বেঞ্চটিতে সর্বমোট (৮৩+৭২) ১৫৫টি জামিনের আবেদন শুনানী হয়। আর জামিন লাভ করেন সর্বমোট (২১৯+১৪৮) ৩৬৭ জন।

প্রাপ্ত এক তথ্যে দেখা গেছে, ২৬ আগষ্ট মোজাম্মেল-খায়রুল বেঞ্চে সিলেটের ২টি মামলায় ৭ জনকে, নড়াইলের ৪টি মামলায় ২৯ জনকে, বরিশালের ৪টি মামলায় ৮ জনকে, যশোরের ৫টি মামলায় ৭ জনকে, গাজীপুরের ৫টি মামলায় ১৭ জনকে, মাগুরার ১টি মামলায় ১ জনকে, জামালপুরের ১টি মামলায় ১ জনকে, নোয়াখালীর ৮টি মামলায় ৮ জনকে, চট্টগ্রামের ৫টি মামলায় ১৯৯৯ জনকে, ভোলার ১টি মামলায় ১ জনকে, ঢাকার ১৭টি মামলায় ৩০ জনকে, নারায়ণগঞ্জের ৩টি মামলায় ৬ জনকে, নীলফামারীর ১টি মামলায় ১ জনকে, কমিল্লার ৩টি মামলায় ৫ জনকে, বরিশালের ২টি মামলায় ২ জনকে, মোমেনশাহীর ৪টি মামলায় ৪ জনকে, দিনাজপুরের ৫টি মামলায় ৫ জনকে, বগুড়ার ২টি মামলায় ২ জনকে, নওগাঁর ১টি মামলায় ১১ জনকে, মুন্সীগঞ্জের ২টি মামলায় ১৭ জনকে, হবিগঞ্জের ২টি মামলায় ২ জনকে, কক্সবাজারের ২টি মামলায় ৪ জনকে, সাতক্ষীরার ১টি মামলায় ১ জনকে, ফরিদপুরের ১টি মামলায় ৫ জনকে, ফেনীর ১০টি মামলায় ১৪ জনকে, নেত্রকোণার ১টি মামলায় ২ জনকে, ঝালকাঠির ১টি মামলায় ১ জনকে এবং পঞ্চগড়ে ১টি মামলায় ১ জনকে জামিন দেয়া হয়।

পরদিন ২৭ আগষ্ট একই বেঞ্চ ঢাকার ১৮টি মামলায় ২১ জনকে, ঝালকাঠির ২টি মামলায় ৩ জনকে, সিরাজগঞ্জের ৩টি মামলায় ৩ জনকে, ঝিনাইদহে ২ জনকে, লক্ষীপুরে ৩ জনকে, জয়পুর হাটের ১ জনকে, মানিকগঞ্জের ৩ জনকে, গোপালগঞ্জের ১ জনকে, নওগাঁর ১ জনকে, রাজশাহীর ৪ জনকে, বরিশালের ২ জনকে, বগুড়ার ৯ জনকে, কুমিল্লার ১২ জনকে, কক্সবাজারে ৪ জনকে, চাঁদপুরের ১ জনকে, নড়াইলের ১ জনকে, যশোরের ২ জনকে, চট্টগ্রামের ১১ জনকে, নারায়ণগঞ্জের ১৪ জনকে, গাজীপুরের ১৪ জনকে, পাবনার ৪ জনকে,

www.pathagar.com

নরসিংদীর ১ জনকে, চাঁপাইনবাবগঞ্জের ১ জনকে, বাগেরহাটের ১ জনকে, মেহেরপুরের ২ জনকে, খুলনার ৮ জনকে, সাতক্ষীরার ২ জনকে, শেরপুরের ৩ জনকে, ঝিনাইদহের ৪ জনকে এবং ফরিদপুরের ৭ জনকে জামিন প্রদান করেন। একাধিক মামলায় এ সকল আসামী জামিন লাভ করেন।

১২ নভেম্বর আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু ও প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে হাইকোর্টের সরকারি হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত বিষয়ে সংবাদপত্রে লেখালেখির ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, 'সরকার বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করেনি, বিচার বিভাগে সরকারি হস্তক্ষেপ কখনো ঘটেনি। সরকার বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং এই লক্ষ্যে কমিশন গঠন করা হয়েছে।' একই সাথে তারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অর্থ অবাধ স্বাধীনতা নয়-এ ধরনের বক্তব্য প্রদান করেন।

প্রেস ব্রিফিংয়ে তারা পুনরায় পূর্বে প্রদত্ত বক্তৃতা অস্বীকার করলেও তাদের নেত্রী প্রধানমন্ত্রী ভারত সফর শেষে ২৯ জানুয়ারি ১৯৯৯ গণভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিচার বিভাগের সমালোচনা করে একপর্যায়ে বলেন, '.... আমাদের এক হাইকোর্টে দেখা যাচ্ছে যে দু'দিনের মধ্যে ১২শ' মামলার জামিন হয়ে যায়। দু'দিনের মধ্যে ১২শ' মামলার জামিন! কিভাবে হলো, কেন হলো? এটা কোনদিন হয়? জনাব চীফ জাস্টিসের নজরে তা আনা হয়েছে। যদিও কোর্ট চেঞ্জ করা হয়েছে। কিন্তু কোনো ব্যবস্থা তিনি নেননি। তবে এ ব্যাপারে যদি সত্যিই তদন্ত করা হতো এবং ব্যবস্থা নেয়া হতো, অথচ জুডিশিয়ালী অনেক মানে দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেত। জুডিসিয়ালী সম্পর্কে মানুষের কোনো সন্দেহ দেখা দিতো না। কিন্তু ২ দিনে ২৫ আগষ্ট এবং ২৬ আগষ্ট দু'দিনে ১২শ' লোকের জামিন হয়ে গেল। পুলিশ ক্রিমিনালদের ধরে, জীবনের ওপর ঝুঁকি নিয়ে। ২০ দিনও যায় না তারা বেরিয়ে আসে জামিন নিয়ে এবং পুলিশেরই নাগের ডগা দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এমনিতর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা বা জনজীবনে নিরাপত্তা দেয়া কঠিন ব্যাপার। এই বিষয়গুলো আপনারা লেখেন না কেন? সেইগুলোও লেখেন। কোর্টে আপনারা যেটা দেখেছেন, আপনারা লেখেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলে তো হবে না। আমি যদি সেখানে কিছু বলতে যাই আপনারা বলবেন যে বিচার (টেনে টেনে) বিভাগের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। সেই কথাই নিয়ে আসবেন আবার। আপনারা যখন যেটা উপলব্ধি করছেন, দেখছেন, আমি তা বলবো আপনারা বেশি করে লেখেন। যেন এই ব্যাপারে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে।'

কাউকে জামিন দেয়া-না দেয়ার এখতিয়ার সম্পূর্ণ আদালতের। যারা উল্লেখিত বেঞ্চে জামিন লাভ করেছিল খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে দায়েরকৃত মামলার অধিকাংশই রাষ্ট্র দায়েরকৃত। নিম্ন আদালতে মামলার জটের কারণে শুনানীর অভাবে অথবা বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে আসামীরা মহামান্য হাইকোর্টের আশ্রয় নিয়েছিল। পূর্বে জামিন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সরকারের নীতি নির্ধারকদের মন্তব্য সঠিক ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় হুবহু তথ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য দ্বারা। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে ২৫ আগষ্টের কথা উল্লেখ করলেও প্রকৃত পক্ষে ঐ তারিখে অবকাশকালীন কোনো বেঞ্চ বসেনি। ২৬ ও ২৭ আগস্ট যাদের জামিন দেয়া হয়েছে তাদের সংখ্যা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের চেয়ে তিনগুন কম ছিল। এ জন্য প্রধানমন্ত্রী মহামান্য সুপ্রীমকোর্ট দ্বারা তিরস্কার পেলেও পুনরায় বিচার বিভাগকে কটাক্ষ করে মন্তব্য করেছেন।

www.pathagar.com

২৮ অক্টোবর ১৯৯৯ ঢাকার সিএমএম আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট আবু তালেবের এজলাসে ঢুকে সিআইডি জনৈক এসপি আসামী শোয়েব চৌধুরীকে গলাটিপে ধরেন। দফায় দফায় রিমাণ্ডে নিয়ে শোয়েবকে লিফলেটের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর হত্যা প্রচেষ্টায় জড়িত করে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করতে না পেরে ঐ পুলিশ অফিসার ক্ষিপ্ত হয়ে তার গলাটিপে ধরেন। এমনকি তাকে আবারো রিমান্ডে নেয়ার হুমকি দিয়ে 'কুত্তার বাচ্চা' বলে গালিও দেয়া হয়। একজন পুলিশের আইন-আদালতকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শনের এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট সকলেই হতবাক হয়ে যান। যেখানে আদালতের বিচারকের সামনে একজন অভিযুক্তকে পুলিশ গলাটিপে হত্যা করার চেষ্টা চালাতে পারে সেখানে পর্দার অন্তরালে কত নিষ্ঠুর নির্যাতনই না চালানো হয়। (সূত্রঃ দৈনিক সংগ্রাম ১২ নভেম্বর ১৯৯৯)

হাইকোর্ট ১৯৯৯ সালের ২৩ আগষ্ট এক রায়ে সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছিল 'পুনর্গঠন ছাড়া বস্তি উচ্ছেদ করা যাবে না।' কিন্তু ২৬ জানুয়ারি ২০০০ হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে সরকার আবারো রাজধানীতে বস্তি উচ্ছেদ শুরু করে। বিনা নোটিশেই সরকার মহাখালী আমতলী ঝিলপাড় বস্তিতে বুলজোজার চালিয়ে দু'শতাধিক ঘর গুড়িয়ে দেয়। ফলে সহস্রাধিক বস্তিবাসী সহায় সম্বল হারিয়ে পথে বসতে বাধ্য হয়। কোন প্রকার পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই ভোরে পুলিশ ও দাঙ্গা পুলিশ বস্তিটি ঘেরাও করে বুলডোজার চালিয়ে ঢাকা সিটি করপোরেশনের সদস্যরা একের পর এক বস্তি গুড়িয়ে দেয়। এ সময় বস্তিবাসীদের কোন মালামাল বের করতে দেয়া হয়নি। মালামাল বের করার উদ্যোগ নিয়ে মহিলা ও বৃদ্ধাসহ অনেকেই পুলিশ ও দাঙ্গা পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হয়। বুলডোজার দিয়ে সাজানো সংসার চোখের সামনেই মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়ার নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞের বীভৎসতায় শিশু ও মহিলাদের আর্ত-চিৎকার করতে দেখা গেছে। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত টানা উচ্ছেদ অভিযানে সহস্রাধিক পুলিশ, দাঙ্গা পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট অংশ নেন।

স্বরাষ্ট্র এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের বিরুদ্ধে ঢাকা জেলা প্রশাসন কর্তৃক ২৫ লাখ টাকা আদায়ে সার্টিফিকেট মামলার প্রক্রিয়া মাঝপথে থেমে আছে বলে ৬ মে ২০০০ দৈনিক দিনকালে প্রকাশ। ১৬ জানুয়ারি বিডিআর হেড কোয়ার্টারে পুলিশ-বিডিআরের জন্য নাসিম তার জ্যেষ্ঠ ছেলের রাজকীয় বৌভাত আয়োজন করেন। ওইদিন ঢাকার জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে মন্ত্রীর পক্ষে তার একান্ত সচিব সৈয়দ আব্দুল মালেক ৫শ' অতিথি আপ্যায়নের একটি পারমিট গ্রহণ করেন। তবে ওই বিলাসবহুল আয়োজনের জন্য আইনের রক্ষক মন্ত্রী হয়েও প্রচলিত আইনে নির্দিষ্ট ২৫ লাখ টাকার সরকারি কর কোষাগারে জমা দেননি। ঘটনা এখানেই থেমে থাকেনি। জেলা প্রশাসন থেকে মাত্র ৫ শ' অতিথি আপ্যায়নের জন্য গৃহীত পারমিটটি ছিল ভূয়া। কারণ পারমিট গ্রহণের আগে ট্রেজারীতে ওই নির্দিষ্ট খাতে কোনো অর্থ জমা দেয়া হয়নি। অভিযোগ প্রকাশ, হয়তো ভূয়া বা জাল চালান জমা দিয়ে জেলা প্রশাসনকে প্রতারণা করা হয় অথবা কোনো চালান জমা না দিয়ে জেলা প্রশাসনকে চাপের মুখে অবৈধ পারমিট ইস্যু করতে বাধ্য করা হয়। প্রচলিত আইন অনুসারে আপ্যায়িত অতিথিদের মাথাপিছু ২৫০ টাকা করে ন্যূনতম ২৫ লাখ টাকা কর আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করার বিধান থাকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দৈনিক দিনকালে প্রথম ১৮, ১৯, ২২ জানুয়ারি তিনটি রিপোর্ট ছাপা হওয়ার কয়েকদিন পর ২৫ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দফতর থেকে দায়সারাগোছের একটি প্রতিবাদ পাঠানো হয়। ওই প্রতিবাদলিপি এবং পাশাপাশি তথ্য প্রমাণ পুনরুল্লেখ করে ২৮ জানুয়ারি দিনকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি রিপোর্টগুলোর বস্তুনিষ্ঠতা চ্যালেঞ্জ

www.pathagar.com

করে চতুর্থ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টগুলো প্রকাশের পর ঢাকার জেলা প্রশাসন সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে ২৫ লাখ টাকা আদায়ে মামলা দায়েরের উদ্যোগে নিলে প্রশাসনের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তাকে বদলী করে দেয়া হয়। পরে মামলা স্থগিতের শর্তে বদলীর আদেশ স্থগিত করা হয়। মন্ত্রীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগে মামলা দায়ের হলে নীতিগত কারণে তাকে পদত্যাগ করতে হতে পারে-সে আশংকায় তদন্ত থামিয়ে দেয়া হয়।

৪ আগষ্ট ২০০০ গণভবনে ৪ দিনব্যাপী মালয়েশিয়া সফর সম্পর্কে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'প্রশাসন ও সংসদের জবাবদিহিতা থাকলে বিচার বিভাগেরও জবাবদিহিতা থাকতে হবে। সত্যি কথা বলতে গিয়ে যতই গালি খাই না কেন, আমি বলেই যাব। বিচার বিভাগ সন্ত্রাসী ও খুনীদের জামিন দেয়ার পর তারা আরো খুন করে বেড়াচ্ছে। আমি লাখ লাখ মানুষের মনের কথা বলেছি। প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের বিচার বিভাগ সম্পর্কে তার বক্তব্যের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি যা বলেছি ঠিকই বলেছি। আপনাদের প্রধান বিচারপতির বক্তব্য অনুসরণ করা উচিত। প্রধান বিচারপতিও বিচার বিভাগের জবাবদিহিতার কথা বলেছেন।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, খুনীরা আদালত থেকে জামিন পাওয়ার পর আবারো একাধিক খুন করছে। আদালত তাদেরকে আর গ্রেফতার করা যাবে না মর্মেও নির্দেশ দিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে মগবাজারের সুব্রত বাইন, কামাল পাশা, ফ্রিডম সোহেল ও লিয়াকতের নাম উল্লেখ করেন। তিনি প্রশ্ন করেন, জননিরাপত্তা আইনে মামলার আসামী বিএনপির এমপি সারোয়ারকে কিভাবে হাইকোর্ট জামিন দেয়। ফৌজদারী আইনে ৫১৪ ধারায় জামিনের শর্তভঙ্গ হলে জামিনদারের বিরুদ্ধে আদালতের ব্যবস্থা নেয়ার বিধান আছে। কিন্তু আদালত সে ক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। শেখ হাসিনা বলেন, কোটালিপাড়ায় বোমা পাওয়ার ঘটনায় প্রচলিত আইনে বিচার হবে। তার নিরাপত্তা রত কর্মীদের গলদ প্রমাণ হলে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৮ আগষ্ট ২০০০ বিচার বিভাগকে ধ্বংস করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে প্রধানমন্ত্রীর অসাংবিধানিক উক্তি ও আইনজীবীদের সম্পর্কে অবমাননাকর বক্তব্যের প্রতিবাদে সর্বস্তরের আইনজীবীরা রাজপথে মৌন মিছিল নিয়ে নেমে এসেছিলেন। আইনজীবী ঐক্য পরিষদের আহবায়ক এডভোকেট খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে মৌন মিছিল-পূর্ব এবং মৌন মিছিল শেষে মুক্তাঙ্গনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা এমপি, ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, এডভোকেট কাজী ফিরোজ রশীদ, এডভোকেট শেখ আনসার আলী, ঢাকা বার এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মহসিন মিয়া, জাতীয় আইনজীবী পরিষদ নেতা এডভোকেট গরীব নেওয়াজ প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সমাবেশ শেষে কালো গাউন পরিহিত সুপ্রীমকোর্ট ও ঢাকা বার সমিতির ৫ শতাধিক আইনজীবীর এক বিশাল মৌ মিছিল সুপ্রীমকোর্ট থেকে জাতীয় প্রেসক্লাব, তোপখানা রোড হয়ে মুক্তাঙ্গনে এসে দ্বিতীয় সমাবেশে মিলিত হয়। মিছিলে আইনজীবীগণ আদালত ও আইনজীবীদের আক্রমণ করে দেয়া প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদে বিভিন্ন শ্লোগান সংবলিত প্লাকার্ড-ফেস্টুন বহন করেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, গণতন্ত্র ও সংবিধান এবং মানুষের মৌলিক অধিকারের প্রতি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং তার সরকারের কোনো শ্রদ্ধাবোধ নেই। এর

www.pathagar.com

আগে সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক সতর্ক করে দেয়ার পরও প্রধানমন্ত্রী বিচারক, বিচার বিভাগ এবং আইনজীবীদের আক্রমণ করে ঢালাওভাবে বক্তব্য দেয়া অব্যাহত রাখেছেন। তারা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর বাবা সংবিধান সংশোধন করে বাকশাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের অধিকার হরণ করেছিলেন। তার পক্ষে সংবিধান সংশোধন সম্ভব হচ্ছে না। সে কারণে তিনি বিচার বিভাগকে ধ্বংস করে মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করতে চান। নিপীড়িত মানুষকে ন্যায়-বিচার থেকে বঞ্চিত করে নৈরাজ্য কায়েম করতে চান। কারণ বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারলে প্রধানমন্ত্রী এবং তার সরকারের ফ্যাসিবাদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

বিবিসির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত সাক্ষাতকারের জন্য আইনজীবীরা দেশের চীফ এক্সিকিউটিভ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করতে চাননি; তারা চেয়েছিলেন এ ব্যাপারে একটা সমঝোতায় আসতে। প্রধানমন্ত্রী কারো উদ্যোগকে বড় করে না দেখে 'যা হবার তা হবে'-নীতিকে বিশ্বাস করে সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি এবং খ্যাতনামা আইনজীবী ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমদ, ব্যারিস্টার রফিকুল হক, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন প্রমুখ শীর্ষ আইনজীবীগণ সহ আইনজীবীদের একট ডেলিগেশন সাক্ষাৎ করে বিষয়টির সন্মানজনক মিমাংসা চেয়েছিলেন।

১৩ আগস্ট ২০০০ রাতে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আইনজীবীদের সমঝোতা বৈঠক যে আশাবাদ সৃষ্টি করেছিল পরেরদিন সরকারের অবৃমিশ্যকারিতার জন্য তা ভন্ডুল হয়ে যায়। ১৩ আগস্ট রাত ৮ টা থেকে সাড়ে ১০ পর্যন্ত আড়াই ঘন্টার বৈঠকটি কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়। প্রধানমন্ত্রী তার আদালত অবমাননাকর বক্তব্য প্রত্যাহার করে একটি ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি প্রদানের পর আইনজীবীগণ মামলা না করার কথা জানিয়েছিলেন কিন্তু তা কার্যকর না হওয়ায় বৈঠকটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। বৈঠকে সাব্যস্ত হয়েছিল যে, প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যের ব্যাপারে একটি বিবৃতি প্রদান করবেন এবং আইনজীবীরাও এ নিয়ে আর কোন বাড়াবাড়ি করবেন না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বিবৃতি দিতে অস্বীকার করে বলেন, 'সবাই মিলে মিটিং করলাম, এখন আমি একা বিবৃতি দেবো কেন'? প্রধানমন্ত্রী বিবৃতি দিতে অস্বীকার করার পর মামলা করা ব্যতীত আইনজীবীদের সামনে অপর কোন গত্যন্তর থাকে না। সিনিয়র আইনজীবীদের পক্ষ থেকে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীকে তার আদালত অবমাননাকর বক্তব্যের জন্য বার বার ভুল স্বীকার এবং এ ব্যাপারে একটি ব্যাখ্যা প্রদানের অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও তিনি রাজী না হয়ে আইনজীবীদের কাছে নিজ বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। এ ব্যাপারে আদালতে মামলা দায়ের হলে তিনি নিজেই সেটা মোকাবিলা করবেন এবং তার কোন সাহায্যের প্রয়োজন হবে না। আইনজীবীরা তাকে আসামী এবং অভিযুক্তদের পার্থক্য বুঝাতে চাইলে তিনি কোনো কথাই শুনতে রাজি হননি। আইনজীবীরা প্রধানমন্ত্রীকে বলেন যে, রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধান হিসেবে তার বিরুদ্ধে কোনো রকম মামলা-মাকদ্দমায় তারা বিব্রত হচ্ছেন। এখন আইনের শাসন' এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীর উচিত হবে বিষয়টির একটি ইতিবাচক পরিসমাপ্তি ঘটানো। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বার বার তার বক্তব্যের পুণরুক্তি করে যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। অবশেষে তিক্ততার ভেতরে দিয়েই বৈঠকের সমাপ্তি ঘটে।

প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্য প্রত্যাহার করে বিবৃতি দেবেন বলে পত্রিকায় যে খবর প্রকাশিত হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে সেটা অস্বীকার করা হয়। বিবিসি জানায়, 'প্রধানমন্ত্রী আদালত সম্পর্কিত বিতর্কিত মন্তব্যের ব্যাপারে নতুন করে বিবৃতি দেবেন কিনা এ নিয়ে সরকার ও আইনজীবীদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব জাওয়াদুল করিম

www.pathagar.com

বলেন, গত রোববার রাতে প্রধানমন্ত্রী ও আইনজীবীদের মধ্যে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর নতুন করে বিবৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়নি। আইনজীবীরা বলেছেন, একথা ঠিক না। সুপ্রীমকোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এখন যদি প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য না দেন তাহলে শেষ পর্যন্ত কনটেম্পটে যেতে হবে। এটা প্রধানমন্ত্রীর জন্য আমরা যাবো না, আমাদেরকে দেখাতে হবে যে আইনজীবীরা বিচারকদের সাথে আছেন এবং তাদেরকে শক্তি যোগাবেন। এটা বলার জন্য আমাদের কনটেম্পটে যেতে হবে। সিদ্ধান্ত আমাদের হয়ে আছে। রাতের মধ্যে যদি বিবৃতি না আসে তবে আমাদের পরিস্কার আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে একটি বক্তব্য যাবে। আমাদের যে আলোচনা হয়েছে এটার সামারি যাবে এটা তো অন্য কথা।' এক প্রশ্নের জবাবে মঈনুল হোসেন বলেন, যাতে এটা রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে গ্রহণ করতে না পারে সে চেষ্টা করছি। প্রধানমন্ত্রী যদি বক্তব্য না দেন তবে অবশ্যই এটা একটা সমস্যা। কেউ রাজনৈতিক ফায়দা নেয়ার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করবেন। আমাদেরও কনটেম্পট পিটিশন ফাইল করতে হবে। আমরা বলিনি আলোচনার সমাধান হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু বলেন, প্রধানমন্ত্রী বিচার বিভাগ অথবা আইনজীবীদের ভূমিকার বিরুদ্ধে কোনো মন্তব্য করেননি। নির্বাহী প্রধান হিসেবে জনগণের জান ও মালের নিরাপত্তা বিধান করা তার সাংবিধানিক দায়িত্ব। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যেসব বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন সে বিষয়ে আলোকপাত করতে চেয়েছেন। আইনজীবীরা তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ও নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং আইন সভার সীমারেখা রক্ষা করে দায়িত্ব পালন করবে এটাই প্রত্যাশিত। বৈঠকে ফলাফল সম্পর্কে প্রেস রিলিজ যাবে, বিবৃতি নয়। (সূত্রঃ দৈনিক সংগ্রাম ১৫ আগস্ট ২০০০)

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেশের শীর্ষস্থানীয় আইনজীবীদের বৈঠকে কোন ফলাফল না আসায় ১৬ আগস্ট সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে সভাপতি ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রথম আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেন। এতে প্রধানমন্ত্রী তার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে পরের দিন জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে পল্টনে আয়োজিত আলোচনা সভায় বলেন, 'কে এই মঈনুল হোসেন? তার সম্পর্কে জনগণের জানা দরকার। এই মঈনুল হোসেন বঙ্গবন্ধু হত্যার পর আত্মস্বীকৃত খুনী কর্ণেল শাহরিয়ার রশীদ খান, মেজর বজলুল হুদাদের সঙ্গে প্রগশ নামে রাজনৈতিক দল করেছিলেন। নিজের অফিস দৈনিক ইত্তেফাকে হত্যাকান্ড ঘটিয়েছিলেন। আপন ভাইকে হত্যার জন্য গুন্ডা লাগিয়েছিলেন।'

১৯ আগষ্ট ২০০০ প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক আক্রমণাত্মক বক্তব্যের জবাবে সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেন, 'সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর জামিন সংক্রান্ত বিতর্কিত বক্তব্যের ব্যাপারে আদালত অবমাননার মামলা দায়েরের পর গত বৃহস্পতিবার (১৭ আগষ্ট) একটি জনসভায় তিনি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে বক্তব্য রেখেছেন। আদালত অবমাননার বিষয়টি ছিল তার ও আদালতের মধ্যকার ব্যাপার। এটা আমার কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল না। অথচ আমাকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে এমন কি খুনী হিসেবে চিহ্নিত করতেও তার বাধেনি। রাষ্ট্রীয় উচ্চাসন থেকে ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে এমন অযৌক্তিক আক্রোশ প্রকাশের দৃষ্টান্ত বিরল। ভিত্তিহীন ও সংযমহীন ব্যক্তিগত আক্রোশের কোনো উত্তর হয়না। তবুও প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের জবাবে আমি শুধু এটুকুই বলব যে, বাংলাদেশে আমরা

www.pathagar.com

সবাই বানের জলে আসিনি যে, কারো সার্টিফিকেটের ওপর আমাদের মানসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকা নির্ভর করবে। আমার রাজনীতি ও রাজনৈতিক বিশ্বাস গোপন কিছু নয়। আমি প্রমাণ করেছি যে, আমি ক্ষমতা পাগল নই, ক্ষমতা পাগলের রাজনীতিও করিনি। আমি বাকশালও করিনি, প্রগশও করিনি। আমি হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত গণতান্ত্রিক রাজনীতির কথাই বলে আসছি। আমার মতো একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তির পরিচয় নিয়ে সময় নষ্ট না করে প্রধানমন্ত্রী তার নিজের পরিচয়, সুনাম ও সাফল্যের কথা দেশবাসীকে শুনালেই পারতেন। কোর্ট থেকে শুরু করে সর্বত্র খুন আর খুনীদের খোজাখুঁজি করা সুস্থ রাজনীতি নয়। আমি যদি খুন-খারাবির পর্যায়ে নামতে পারতাম তবে আমিও হয়তো একজন বড় নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর আশপাশে থাকতে পারতাম। প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রের কথা বলেন কিন্তু ভিন্নমতের প্রতি তার চরম অসহিষ্ণুতা তার গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তিকেই নস্যাৎ করছে। আদালত অবমাননার মামলাটি করা হয়েছে সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক। এই সংবাদ একাধিকবার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ৩০ জুলাই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় কিন্তু এই সিদ্ধান্তের ১৬ আগষ্ট পর্যন্ত কেউ টু শব্দটি করেননি। এমন কি ১২ আগস্ট তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির মিটিংয়ে আদালত অবমাননার মামলাটি নিয়ে আলোচনা হয়। সমিতির সেক্রেটারী ভিন্নমত প্রকাশ করায় তার উপস্থিতিতে সমিতির প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমাকে এককভাবে আদালত অবমাননার পিটিশন করার ক্ষমতা দেয়া হয়। দেখা যাচ্ছে ১৬ আগস্ট মামলাটি আদালতে ফাইল করবার পরই তলবি সভা ডাকার কথা বলা হচ্ছে। কার্যনির্বাহী কমিটির প্রস্তাবটি কার্যকর হবার পর তলবি সভায় এ ব্যাপারে আর কী করণীয় থাকে তা আমি বুঝি না। এ অবস্থায় কার্যনির্বাহী কমিটির উক্ত সিদ্ধান্তের একমাত্র আইনগত বৈধতাই কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে । এর সুযোগও তো আমি দেখি না। সবাই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, আমি শীর্ষস্থানীয় আইনজীবীদের নিয়ে সমঝোতার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আদালত অবমাননার মামলা নিয়ে যাতে দলীয় রাজনীতি করা না হয় তার চেষ্টা করেছি। কিন্তু যারা সমঝোতা চাইলেন তারাই প্রধানমন্ত্রীর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হলেন। প্রধানমন্ত্রী কোর্টে হাজির হয়ে তার বক্তব্যের সপক্ষে আইনী লড়াই করবার কথা বলেছেন, তার মতে তিনি যা বলেছেন তা আদালত অবমাননাকর নয়। আদালত অবমাননার বিষয়টি নিয়ে তিনি কেন যে রাজনীতি করতে চাচ্ছেন তা আমি বুঝি না। ইচ্ছা করলে এখনও তিনি মামলাটির অবসান ঘটাতে পারেন।'

২০ আগষ্ট সকাল পৌনে ১১ টায় বিচারপতি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রশিদের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে সুপ্রীম কোর্টের ৩৩৯ জন আইনজীবীর পক্ষে সাবেক এটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার রফিকুল হক সংবিধানের ১০৮ অনুচ্ছেদ এবং ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইনের ২ ধারায় প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার দ্বিতীয় মামলা দায়ের করেন। মামলাটি ড্রাফট করেন ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক। যারা মামলাটির বাদী হন তাদের মধ্যে রয়েছেন ব্যারিস্টার রফিকুল হক, এডভোকেট আবদুল মালেক, ব্যারিস্টার আজমলুল হোসেন (ইংল্যান্ডের কুইন্স কমিশনের সদস্য), খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, এডভোকেট হাবিবুল ইসলাম ভূইয়া, খন্দকার মাহবুব হোসেন, শেখ রাজ্জাক আলী, মোহাম্মদ আয়েন উদ্দিন, শেখ আনসার আলী, কাজী ফিরোজ রশীদ, ব্যারিস্টার আবদুর রেজাক, ব্যারিস্টার আমিনুল হক, আবদুর রব চৌধুরী, ব্যারিস্টার জিয়াউর রহমান খান, নিতাই রায় চৌধুরী, ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, জয়নুল আবেদীন, সাইদুর রহমান, আবদুল আউয়াল,

www.pathagar.com

গোলাম আরশাদ, শফিকুল ইসলাম বাবুল, লুৎফর আলম, মীর হাসমত আলী, হুমায়ুন কবির বুলবুল, ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন, গোলাম মোহাম্মদ চৌধুরী আলাল, গোলাম কিবরিয়া, মোখলেছুর রহমান জাহিদ প্রমুখ। আবেদনকারীদের মধ্যে অর্ধশতাধিক আইনজীবী মামলা দায়েরের সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন। মামলার একমাত্র অভিযুক্ত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, স্বামী ড. ওয়াজেদ আলী মিয়া, ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাসভবন, গণভবনকে তার বর্তমান ঠিকানা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ২৬ জুলাই বিবিসিতে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য (যা পরদিন ২৭ জুলাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়) এবং মালয়েশিয়া থেকে ফিরে ৪ আগষ্ট সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে (যা ৫ আগস্ট বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়) সুস্পষ্টভাবে আদালত অবমাননা হিসেবে উল্লেখ করে মামলা দায়ের করা হয়। 'কোর্ট হচ্ছে খুনী-সন্ত্রাসীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল এবং যে আইনজীবী জামিন চায় তাকেও ধরা উচিত, যে কোর্ট জামিন দেয় তাকেও জবাবদিহি করা উচিত'-প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যগুলো উল্লেখ করে আবেদনে বলা হয়, 'আদালতের মর্যাদা, নিরপেক্ষতা এবং আইনজীবীদের পেশাগত মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে এ বিষয়টি আদালতের বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন।' আবেদনে ১৯৯৯ সালের আদালত অবমাননার মামলার আপীল বিভাগের ফুল বেঞ্চের রায়ের উল্লেখ করা হয়। এছাড়া লাঠি মিছিলের মাধ্যমে আদালতকে কয়েকজন মন্ত্রীর হুমকি প্রদর্শনের ঘটনাও উল্লেখ করা হয়। ৭২ পৃষ্ঠার এ আবেদনের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করা হয় ৩৩ পৃষ্ঠাব্যাপী। বাকি ৩৯ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সম্পর্কিত রিপোর্ট ও সম্পাদকীয় নিবন্ধের কাটিং সংযোজিত করা হয়। যেসব পত্রিকার কাটিং সংযুক্ত করা হয় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে দৈনিক ইত্তেফাক, ইনকিলাব, জনকণ্ঠ, দৈনিক দিনকাল, প্রথম আলো, ডেইলী স্টার, মানবজমিন, দি নিউনেশন ও দৈনিক সংগ্রাম। ২৯ জুলাই দৈনিক দিনকালে প্রকাশিত প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সম্পর্কে ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদসহ সিনিয়র আইনজীবীদের প্রতিক্রিয়া, ৩১ জুলাই দৈনিক দিনকালে প্রকাশিত সুপ্রীমকোর্ট বারের আদালত অবমননার মামলা করার সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত রিপোর্টের কপিও সংযুক্ত করা হয়। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে রেডিও বাংলাদেশে-এর মনিটরিং রিপোর্টের একটি মূল কপি, সুপ্রীমকোর্ট বারের রেজুলেশন এবং ১১ আইনজীবীর বিবৃতি মামলার নথিতে সংযুক্ত করা হয়।

এদিকে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা এবং সরকার সমর্থক আইনজীবীদের নোটিশ বলে সুপ্রীমকোর্ট বারের সেক্রেটারী আহুত তলবি সভাকে কেন্দ্র করে ঐদিন সুপ্রীমকোর্ট এলাকায় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। পাশাপাশি নৃশংস ঘটনায় ঢাকার বনগ্রাম রোডে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার অন্যতম পিটিশনার এবং নিম্ন আদালতে মুজিব হত্যা মামলার একজন অভিযুক্তের নিয়োজিত আইনজীবী এবং বিএনপির ঢাকা মহানগরী শাখার যুগ্ম-সম্পাদক এডভোকেট হাবিবুর রহমান মণ্ডল নিহত হন। পেশাগত কাজে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে লাইলী কটেজের বাসা থেকে সহকারী আরসাদসহ মণ্ডল ভেসপা মোটর সাইকেল যোগে কোর্টে যাওয়ার সময় বাড়ি থেকে অল্প দূরে সন্ত্রাসীরা তার পথ রোধ করে এবং সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কপালে গুলি চালায়। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যু ঘটে। সন্ত্রাসীদের গুলিতে আইনজীবী নিহত হওয়ার ফলে পুরনো ঢাকার অনেক এলাকায় দোকানপাট ও ব্যবসা-বণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। সুপ্রীমকোর্টে দায়িত্ব পালনরত আইনজীবীদের মধ্যে ভীতি ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়ে। আইনজীবীরা আদালতে বিভিন্ন মামলা পরিচালনায় অপারগতা প্রকাশ করেন। কোর্টে ও সুপ্রীমকোর্ট প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ৩৩৯ জন আইনজীবীর স্বাক্ষরে প্রধানমন্ত্রীর

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে যে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করা হয় এডভোকেট মন্ডল ছিলেন এই মামলার ৩৩৮ নম্বর ক্রমিকে স্বাক্ষরকারী পিটিশনার। একই দিনে বাগেরহাট জেলা আইনজীবী সমিতির সেক্রেটারী এডভোকেট কালিপদ বড়াল বাগেরহাটে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন।

বেলা পৌনে ১২ টার দিকে সুপ্রীমকোর্ট বারের সভাপতি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ও সেক্রেটারী শহীদুল করিম সিদ্দিক সিনিয়র আইনজীবীদের সাথে নিয়ে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সুপ্রীমকোর্ট চত্বরে নিরাপত্তাহীনতা এবং মন্ডলের নিহত হওয়ার খবর তাকে অবহিত করেন। প্রধান বিচারপতিকে কয়েকজন আইনজীবী জানান, কোর্ট এলাকায় অস্ত্রশস্ত্রসহ কিছু সন্দেহভাজন লোককে তারা দেখতে পেয়েছেন। আইনজীবীদের এ কথার প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি বেলা ২ টা থেকে কোর্টের সকল কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করেন এবং আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। একজন আইনজীবী হত্যার প্রতিবাদে কোর্টের কার্যক্রম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। প্রধান বিচারপতি একজন আইনজীবী হত্যার ঘটনা এবং কোর্ট এলাকাস্থ আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির বিবরণ শুনে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'আমি নিজেও এ ঘটনায় বিস্মিত।' এ সময় খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, শেখ রাজ্জাক আলী, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, এডভোকেট মাহবুবুর রহমান, ব্যারিস্টার আবদুর রেজাক, খন্দকার মাহবুব হোসেন, আবদুর রব চৌধুরী, শেখ আনসার আলী, জয়নুল আবেদীন, সাইফুর রহমান, কাজী ফিরোজ রশীদ, নিতাই রায় চৌধুরী, আদিলুর রহমান শুভসহ প্রায় অর্ধশতাধিক আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন।

দুই জন আইনজীবী নিহত হবার ঘটনা নিয়ে সুপ্রীমকোর্ট বার এসোসিয়েশনের নির্বাহী কমিটির এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের সভাপতিত্বে এ সভায় সেক্রেটারী শহীদুল করিম সিদ্দিকের প্রস্তাবে সরকার সমর্থক ৭১ জন আইনজীবী নোটিশ বলে সেক্রেটারী আহুত তলবি সভা স্থগিত ঘোষণা করা হয় এবং তলবি সভায় বদলে বিকেল সাড়ে ৪টায় সমিতি ভবনে শোক সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়।

সুপ্রীমকোর্ট বার নেতৃবৃন্দ মন্ডলের লাশ দেখতে হাসপাতালে যান। সিনিয়র আইনজীবীরা হাসপাতালে গিয়ে মরহুমের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। বেলা ২ টায় সুপ্রীমকোর্ট চত্বরে নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে আইনজীবীরা লাশ নিয়ে শোক মিছিল বের করেন। সুপ্রীমকোর্ট এলাকায় জানাজার জন্য কফিন প্রবেশ করানোর মুহূর্তে পুলিশ বাধা দেয়। সিনিয়র আইনজীবীদের হস্তক্ষেপের পর পুলিশ লাশ প্রবেশ করতে দেয়।

অপরদিকে মণ্ডল খুন হবার পর মহানগর গোয়েন্দা সংস্থা (ডিসি-ডিবি) বিকেলে নিজ দফতরে কয়েকজন সাংবাদিককে ডেকে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে নিহত মণ্ডলকে সন্ত্রাসী বানানোর চেষ্টা করে। ডিবির আবদুল হান্নান বলেন, 'এটা রাজনৈতিক হত্যাকান্ড নয়। শত্রুতাবশত খুনের ঘটনাটি ঘটে। মামলাটি আমরা তদন্ত করব বলে কমিশনারকে বলেছি। কারণ এটি একটি স্পর্শকাতর হত্যাকান্ড।' একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যেখানে মামলাই হলো না সেখানে কি এমন কারণ রয়েছে যে, আগাম তদন্ত চেয়েছেন? এ সময় তিনি কিছু সময় নীরব থেকে জবাব দেন, 'টুডে অর টুমরো মামলা ডিবিতে আসবে, আমি একটু আগেই চেয়েছি।' হান্নান বলেন, 'নগরীর টপটেরর সুব্রত বাইনের বিরুদ্ধে মাত্র ১৩ টি মামলা রয়েছে। পক্ষান্তরে মণ্ডলের বিরুদ্ধে খুনসহ ২১ টি মামলা রয়েছে।'

www.pathagar.com

২১ আগষ্ট ২০০০ আদালত অবমাননার অভিযোগে বাংলাদেশের সংবিধানের ইতিহাসে প্রথম প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এমপিরা আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। এমপিদের পক্ষে মামলাটি দায়ের করেন ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ। তাকে সহায়তা করেন ব্যারিস্টার মাহবুবউদ্দীন খোকন। বিএনপির ৯৫ জন, জাতীয় পার্টির ১২ জন ও জামায়াতের ৩ জন-সর্বমোট ১শ'১০ জন এমপি স্বাক্ষরিত মামলা দায়েরের সময় সংসদ বিরোধী দলীয় উপনেতা প্রফেসর একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী, জাতীয় পার্টির এমকে আলম চৌধুরী ও জামায়াতের দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীসহ অর্ধশতাধিক এমপি আদালত কক্ষে উপস্থিত ছিলেন। এমপিদের পক্ষে মামলা দায়েরের সময় আদালত কক্ষে তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। আবেদনকারীদের পক্ষে অন্যান্যের মধ্যে ব্যারিস্টার আমিনুল হক, ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক, শেখ আনসার আলী, জয়নুল আবেদীন, নিতাই রায় চৌধুরী, সাইদুর রহমান, গোলাম আরশাদ, হুমায়ুন কবির বুলবুল, গোলাম মোঃ চৌধুরী আলাল, আতাউর রহমান, গিয়াসউদ্দীন মিঠু, মোহাম্মদ শাহজাদা, এসএম এমদাদুল হক, মোখলেছুর রহমান জাহিদসহ দু'শতাধিক আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন।

হাইকোর্টে মামলা দায়েরের লক্ষে ২৯ মিন্টো রোড থেকে বিরোধ দলীয় এমপিদের সঙ্গে যাত্রা শুরুর প্রাক্কালে বিরোধী দলীয় উপনেতা সাংবাদিকদের বলেন, 'সংবিধান ও আদালতের মর্যাদা রক্ষায় আইন প্রণেতা হিসেবে এমপিদের দায়িত্ব কোনো অংশেই আইনজীবীদের চাইতে কম নয়। সে জন্যই বিরোধী দলীয় এমপিরা প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করেছেন।' তিনি বলেন, 'এমপিরা আইন প্রণেতা ও সংবিধানের রক্ষক। এক্ষেত্রে যদি দেখা যায় কেউ সংবিধান লংঘন বা আদালত অবমাননা করছেন তাহলে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে তাদের অধিকার রক্ষার কথা এমপিদের বলতে হবে।' তিনি বলেন, 'আইন-আদালতকে রক্ষা করা না হলে জুলুম-নির্যাতনের সীমা থাকবে না।' জামিনের অধিকার সম্পর্কে তিনি বলেন, 'মিথ্যা মামলা দায়ের হলেই একজন ব্যক্তি জামিন পাবার অনুপযুক্ত হয়ে যান না। কোনো ব্যক্তিকে অপরাধী মনে করা হলেই তিনি অপরাধী হয়ে যান না।' তিনি বলেন, 'জামিন পাওয়া একটি মানবাধিকার। আদালত থেকে জামিন দেয়াও কোনো অপরাধ নয়। তাই বলে জজ ও উকিলদের ধরা উচিত এমন মন্তব্য কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তিই করতে পারেন না। এটা আইন ও আদালতের প্রতি অবমাননা বলে আইনজীবীরা এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন।' তিনি বলেন, 'দেশে অন্যায়, অবিচার আজ কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে তা কল্পনাও করা যায় না। আইনজীবী, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী একের পর এক খুন হচ্ছে'। বিরোধী দলীয় উপনেতার নেতৃত্বে হাইকোর্ট যাত্রা শুরুর সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, সাইফুর রহমান, কর্ণেল (অব.) অলি আহমদ, খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, এম শামসুল ইসলাম, কর্ণেল (অব.) আকবর হোসেন, ব্যারিস্টার জিয়াউর রহমান খান, আবদুল মান্নান, আবদুল মান্নান তালুকদার, আমানউল্লাহ আমান, শামসুল আলম প্রামাণিক, রুহুল কুদ্দুস দুলু, নাজিমউদ্দিন আলম, শামসুদ্দিন আহমদ, গৌতম চক্রবর্তী ও জামায়াতে ইসলামীর মাওলানা দেলোওয়ার হোসাইন সাঈদী প্রমুখ। জাতীয় পার্টির এমপিগণ দলীয় কার্যালয় থেকে হাইকোর্টে যান। বিরোধী দলীয় এমপিগণ সকাল ৯ টার পর থেকেই একের পর এক মিন্টো রোডে এসে সমবেত হতে থাকেন। এরপর তারা ঘড়িতে ১০ টা বাজার আগেই নিজ নিজ গাড়িতে উঠে হাইকোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

www.pathagar.com

এমপিগণ তাদের আর্জিতে বলেন, তারা সকলে তাদের নিজ নিজ এলাকা থেকে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। তারা বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতের সদস্যও বটে। সংসদ সদস্য হিসেবে সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করা সকল সদস্যদের প্রাথমিক ও মৌলিক দায়িত্ব। তারা সংবিধানকে রক্ষা করার জন্য শপথ গ্রহণ করেছেন। তারা বলেন, 'বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংবিধানের একটি মৌলিক কাঠামো। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য। আমাদের সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের শাসন ও মানবাধিকারের বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সংবিধান সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করেছে। আইন প্রণেতা হিসেবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষায় সংবিধানকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। মামলার প্রতিপক্ষ শেখ হাসিনাও একজন সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, তিনিও সংবিধান রক্ষার জন্য শপথ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে সংবিধান, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসনকে ভুলুণ্ঠিত করেছেন।' মামলার আর্জির সঙ্গে ডকুমেন্ট হিসেবে সংযুক্ত করা হয় ২৯ জুলাই দৈনিক দিনকালে প্রকাশিত ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদসহ শীর্ষস্থানীয় আইনজীবীদের প্রতিক্রিয়া, ৩১ জুলাই দৈনিক দিনকালে প্রকাশিত সুপ্রীমকোর্ট বারের আদালত অবমাননার মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত রিপোর্ট, ২৭ জুলাই ও ৪ আগষ্ট দৈনিক ইত্তেফাক, ইনকিলাব, প্রথম আলো ও ডেইলী স্টারসহ বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের রিপোর্টের কপি এবং বিবিসিতে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকারের রেডিও বাংলাদেশের মনিটরিং রিপোর্ট।

মামলা দায়েরের পর আদালত কক্ষের বাইরে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা ও সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, 'সংবিধান রক্ষার শপথ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী সংবিধান লংঘন করলে আইন প্রণেতা হিসেবে সংসদ সদস্যদের কিছু দায়-দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ববোধ থেকেই সংসদ সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেছেন।' ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা বলেন, 'সাংবিধানিকভাবেই বিচার বিভাগের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা আছে। নির্বাহী বিভাগ বা অন্য কোনো বিভাগের এমন জবাবদিহিতার কথা বলে প্রধানমন্ত্রী আসলে কি বোঝাতে চান, সেটা পরিস্কার করার জন্যই আমরা আদালতের আশ্রয় নিয়েছি।'

২৪ অক্টোবর বিবিসির সাথে সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী আদালত ও আইনজীবীদের সম্পর্কে কটাক্ষপূর্ণ উক্তি করার প্রেক্ষিতে সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, জাতীয় সংসদের ১১০ জন সদস্য এবং দেশের ৩৩৯ জন বিশিষ্ট আইনজীবী তার বিরুদ্ধে আদালত অবমামনার অভিযোগ এনে পৃথক যে তিনটি মামলা দায়ের করেছিলেন সেই মামলাগুলোর একযোগে শুনানির পর রায় দেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীকে আবারো সতর্ক করে দেন বিচারপতি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক এবং বিচারপতি আবদুর রশিদের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। তিনটি মামলার রায় ঘোষণাকালে হাইকোর্ট বলেন, 'বিচার বিভাগ, বিচারক এবং আদালত সম্পর্কে কোনো বক্তব্য প্রদান বা মন্তব্য করার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর উচিত আরো অধিকতর সতর্ক ও শ্রদ্ধাশীল থাকা।' উচ্চ আদালত রায় ঘোষণাকালে আরো মন্তব্য করেছে যে, 'দেশের বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনা, দেশের সর্বোচ্চ নির্বাহী পদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা, সম্ভাব্য সকল রাজনৈতিক অস্থিরতা এড়ানো, বিচার বিভাগ এবং নির্বাহী বিভাগকে মুখোমুখি দাঁড় করানো থেকে বিরত থাকা এবং রাষ্ট্রের এই দুই গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোর মধ্যে

www.pathagar.com

সৌহার্দ্যপূর্ণ সহযোগিতা এবং সমন্বয় রক্ষার স্বার্থে আদালত রুল ইস্যু করা থেকে বিরত থেকেছে।' রায়ে বিচারপতিগণ ১৯৯৯ সালের ৪ মার্চ প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অপর একটি মামলার রায়ের সাথে একমত পোষণ করেন। ওই রায়েও আদালত সম্পর্কে কথা বলার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীকে সংযত হওয়ার পরামর্শ ও সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল।

১৯ নভেম্বর ২০০০ রাতে নারায়ণগঞ্জ ক্লাব মিলনায়তনে জেলা আইনজীবী সমিতির অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইন, বিচার সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু বলেন, 'বর্তমানে আদালতে দুর্নীতি ওপেন সিক্রেট। ৬০ ভাগ মানুষ ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত। গরীব মানুষের পক্ষে আইন-আদালত নয়।' মন্ত্রী বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে বিচারপ্রার্থী হয়ে যারা আদালতে ঘুরছেন তাদের জন্য রাতে আদালত বসে না। অথচ একজন রাষ্ট্রদ্রোহী আসামীর জামিনের জন্য রাতে আদালত বসে।' সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি এডভোকেট সুরুজ আলীর সভাপতিত্বে অভিষেকে বক্তব্য রাখেন বার কাউন্সিলের ভাইস-চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার এম আমির-উল ইসলাম, সুধাংশু শেখর হাওলাদার, অধ্যাপক রেজাউল করিম এম.পি, এমদাদুল হক প্রমুখ।

২০ অক্টোবর শুক্রবার দৈনিক ইনকিলাবে সাপ্লিমেন্ট উপহারের ভেতরের পাতায় প্রকাশিত 'প্যারোডি জাতীয় সংগীত' নামের একটি ছড়া ছাপাকে কেন্দ্র করে সরকার ইনকিলাব সম্পাদক এ. এম. এম. বাহাউদ্দীনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দায়ের করে গ্রেফতারের জন্য হন্য হয়ে ঘুরেছে। ৭ নভেম্বর থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত ইনকিলাব সম্পাদক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে ৬ টি কথিত রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা হয়। ৭ নভেম্বর ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইসমত কাদির গামা বাদী হয়ে ইনকিলাব সম্পাদক এ. এম. এম, বাহাউদ্দীন, প্রকাশক এ.এস. এম, বাকীবিল্লাহ ও লেখক আ.সা মোশাররফের বিরুদ্ধে সিএমএম আদালতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে প্যারোডি ইস্যুভিত্তিক প্রথম মামলাটি দায়ের করেন। ঢাকাতেই মোট তিনটি মামলা হয়। এছাড়াও পর্যায়ক্রমে ময়মনসিংহ, মাদারীপুর এবং মাগুরা থেকে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের পক্ষ থেকে ইনকিলাব সম্পাদক-প্রকাশকের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক মামলা দায়ের করা হয়। এসব মামলার কোনো কোনোটিতে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানাও জারি করা হয়। ৮ নভেম্বর ইনকিলাব সম্পাদকের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন জানানো হয়। এই আবেদনটি তখন শুনানির অপেক্ষায় ছিল এবং শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তদের হয়রানী না করার জন্য হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল। ৯ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্রলীগ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিম ইনকিলাবের বিরুদ্ধে প্রথম হুংকার ছেড়ে বলেন, 'জাতীয় সংগীতের প্যারোডি যারা ছেপেছেন তাদের বিরুদ্ধে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ব্যবস্থা নেয়া হবে। ওই পত্রিকার মালিকদের এজন্য জবাবদিহি করতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ থেকে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। আইনজীবীদের উচিত হবে তাদের পক্ষ না নেয়া, কোর্টের উচিত হবে তাদের জামিন না দেয়া।'

৯ নভেম্বর হাইকোর্টের বিচারপতি কাজী শফিউদ্দিন পদত্যাগ করেন। পদত্যাগের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বিচারপতি শফিউদ্দিন পরের দিন বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে বলেন, 'নির্বাহী প্রধানের অযাচিত হস্তক্ষেপের ফলে বিচার বিভাগ অভ্যন্তরীণ নির্বাহী কার্যক্রমে তার কার্যক্ষমতার সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারছে না। পদে পদে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হচ্ছে।' তিনি বলেন; 'যারা কনিষ্ঠ বিচারক হিসেবে আমার সঙ্গে কাজ করেছেন তারাও আমাকে অতিক্রম

www.pathagar.com

করে গেলেন।' তার মতে বিষয়টি এখন প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং পুরোপুরী রাজনৈতিক হয়ে যাওয়ার কারণে প্রতিবাদ হিসেবে তিনি পদত্যাগ করেছেন। তিনি আরো বলেন, সংবিধান অনুসারে প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া সব সিদ্ধান্তই প্রেসিডেন্টকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে নিতে হয়। অথচ তিনি যখন বিচারক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছিলেন তখন প্রধান বিচারপতির পরামর্শে প্রেসিডেন্ট নিয়োগ দিতেন বলে বিষয়টি রাজনৈতিক স্বার্থ মুক্ত ছিল। বিচারপতি শফিউদ্দিন আরো বলেন যে, নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপের কারণে বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। তার মতে এ রকম চলতে থাকলে বিচার বিভাগের ওপর মানুষের আস্থা দিন দিন কমে যাবে এবং ভেঙ্গে পড়বে।

বিচারপতি কাজী শফিউদ্দিনের বক্তব্যের বিপরীতে আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু এক সাক্ষাৎকারে বিবিসিকে বলেন, বিচারপতি 'শফিউদ্দিনের বক্তব্য সঠিক নয়। প্রেসিডেন্ট সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে নিয়োগ দেন।'বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না বলে বিচারপতি শফিউদ্দিনের মন্তব্য প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রী বলেন, 'এ সরকারের আমলেই শুধু এমন হয়েছে তা নয়। আগের বহু সরকারের আমলে এমন করা হয়েছে।' আইনমন্ত্রী দাবী করেন, তাদের সরকারই প্রথম বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করার উদ্যোগ নিয়েছে। আইনমন্ত্রী অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, বিচারপতি থাকা অবস্থায় পদত্যাগ অভূতপূর্ব।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘোষণার পর ১৩ নভেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মোঃ আমিন উদ্দিন বাদী হয়ে ঢাকা সিএমএম আদালতে ইনকিলাব সম্পাদক-প্রকাশকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। বাদী তার আর্জিতে উল্লেখ করেন, 'গত ২০ অক্টোবর ২০০০ ইং তারিখে রোজ শুক্রবার ইনকিলাব পত্রিকার উপহার সাপ্লিমেন্ট-এ জনৈক আ. সা. মোশাররফ, শ্যামলী, ঢাকা-এর লিখিত প্যারোডি জাতীয় সংগীত নামক বাংলাদেশের মহান জাতীয় সংগীতের অনুকরণে একটি ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা প্রকাশিত হয়। উক্ত রচনা প্রকাশের মাধ্যমে আইনানুগভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা, জনরোষ সৃষ্টি করত, সরকারকে জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন করত, পরিকল্পনা দন্ডবিধির ১২৪-এর "এ" ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধকে চিহ্নিত করে।'

মামলা দায়েরের সঙ্গে সঙ্গেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আদালত থেকে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়। সে অনুযায়ী ঐ রাতেই শুরু হয় পুলিশী তান্ডব। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ইনকিলাব সম্পাদক ও প্রকাশককে গ্রেফতারের লক্ষ্যে পুলিশ একযোগে ইনকিলাব ভবন, সম্পাদক ও প্রকাশকের বাসভবন ঘেরাও করে অভিযান চালায়। ডিবি, এসবি ও সংশ্লিষ্ট থানার ৫০ জনের বেশি পুলিশ এই তল্লাশি অভিযানে অংশ নেয়। রাত সোয়া ১১টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত এই অভিযান চলে। রাত সাড়ে ১১ টায় বনানীর বাসভবনে প্রায় ৫০ জন পুলিশ দ্বারা এবং সাড়ে ১২ টায় উত্তরার বাসভবনে তল্লাশি পরিচালিত হয়। অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত একটি বাহিনী কমান্ডো স্টাইলে এই অভিযান চালায়। তল্লাশিকালে তারা ইনকিলাব ভবন অবরুদ্ধ করে রাখে। এসময় পুলিশ কাউকে ভেতরে ঢুকতে এবং বেরুতে দেয়নি। উল্লেখ্য ৮ নভেম্বর প্রদত্ত হাইকোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা করেই পুলিশ তল্লাশি চালায়। তল্লাশিকালে সম্পাদক ও প্রকাশক অফিসে ছিলেন না। তাদের কক্ষগুলো তালাবদ্ধ ছিল। পুলিশ চাবি নিয়ে প্রতিটি কক্ষ খুলে তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালায়। তারা ইনকিলাবের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাওলানা এম. এ মান্নান ও পরিচালকদের কক্ষে তল্লাশি চালায়। অফিস ও বাসভবনে ইনকিলাব সম্পাদককে না পেয়ে ১৪ নভেম্বর সকালে পুলিশ সম্পাদককের ছোট

www.pathagar.com

ভাই মোহাম্মদ মঈনউদ্দীনকে (পরিচালক-প্রশাসন) গ্রেফতার করে ডিবি অফিসে নিয়ে যায় এবং পরে তাকে এক মাসের আটকাদেশ দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়। সরকার তাকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে একমাসের আটকাদেশ দেয়। মঈনউদ্দীনের বিরুদ্ধে কোনো মামলা না থাকা সত্ত্বেও পুলিশ তাকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে নিয়ে যায়। মঈনউদ্দীনকে গ্রেফতারের সময় পুলিশকে বলতে শোনা যায়, 'ওপরের নির্দেশে এই গ্রেফতার।' সম্পাদককে গ্রেফতার করতে না পারার খবর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পৌঁছার পর সেখান থেকে এমনও নির্দেশ দেয়া হয় যে, 'বাসায় যাকে পাও তাকেই নিয়ে আস।'

পুলিশ ১৪ নভেম্বর সারাদিন ও মধ্য রাত পর্যন্ত হাইকোর্ট এলাকায় অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। পোশাকদারী ও সাদা পোশাকের বিপুলসংখ্যক পুলিশ এবং আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন এজেন্সীর কর্মকর্তারা হাইকোর্ট এলাকা ঘিরে রাখে। এই অবস্থার মধ্যেই সকাল ১১ টার মধ্যে অনেকটা অলৌকিকভাবে কোনো বাধা ছাড়াই ইনকিলাব সম্পাদক অন্ত র্বর্তী জামিনের জন্য হাইকোর্টে হাজির হন। বিচারপতি মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম ও বিচারপতি মমতাজ উদ্দিন আহমদ সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চের জুনিয়র বিচারক মামলার শুনানি অনুষ্ঠানে বিব্রতবোধ করলে বিষয়টি প্রধান বিচারপতির কাছে প্রেরণ করা হয়। প্রধান বিচারপতি রাত ৮ টায় এ বিষয়ে দুটি মামলার শুনানি অনুষ্ঠানের জন্য বিচারপতি রুহুল আমিন ও বিচারপতি জয়নাল আবেদীন সমন্বিত বেঞ্চে পাঠান। প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্তের পর ইনকিলাব সম্পাদকের আইনজীবী খোন্দকার মাহবুব উদ্দিন ও ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ সংশ্লিষ্ট বিচারপতিদ্বয়ের বাসভবনে গিয়ে সৃষ্ট জরুরী পরিস্থিতি তুলে ধরেন। আইনজীবীদ্বয় জানান, 'ইনকিলাব সম্পাদক সুপ্রিমকোর্টের একজন আইনজীবীর চেম্বারে বসে আছেন। তাকে গ্রেফতার করার জন্য পোশাকধারী ও সাদাপোষাকের বিপুল সংখ্যক পুলিশ এবং বিভিন্ন এজেন্সীর কর্মকর্তা আদালতে তার অবস্থানস্থলকে ঘেরাও করে রেখেছেন। ইনকিলাব পত্রিকা অফিস এবং সম্পাদকের বাসায় গভীর রাতে পুলিশ হানা দিয়ে এক নজীরবিহীন আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। ইনকিলাব সম্পাদকের ছোট ভাই মঈনউদ্দীনকে কোনো মামলা এবং অভিযোগ ছাড়াই সরকার গ্রেফতার করে একমাসের আটকাদেশ প্রদান করেছে।' আইনজীবীগণ বিচারপতিগণের সামনে আরো বলেন, 'আগাম জামিনের আবেদন জরুরী ভিত্তিতে শুনানির ব্যবস্থা করা না হলে বাংলাদেশে বহুল প্রচারিত একটি দৈনিকের সম্পাদকের আইনের আশ্রয় লাভের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হবে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর কালো ছায়া বিস্তার করবে।'

আইনজীবীগণের এ আর্জি শুনে বেঞ্চের দু'জন বিচারপতি শুনানি অনুষ্ঠানের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করেন। সে অনুযায়ী রাত ১০ টায় শুনানি শুরু হয় এবং তা শেষ হয় রাত সাড়ে ১১ টায়। আদালত আবেদনকারীর আইনজীবীদ্বয়ের বক্তব্য শুনে এবং উপস্থাপিত কাগজপত্র গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে '২০ নভেম্বরের মধ্যে কেন স্থায়ী আগাম জামিন মঞ্জুর করা হবে না'-এ মর্মে সরকারের প্রতি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেন। একই সাথে আদালত ২০ নভেম্বর পর্যন্ত ইনকিলাব সম্পাদকের অন্তর্বর্তীকালীন আগাম জামিন মঞ্জুর করেন। ২০ নভেম্বর রুলের ওপর শুনানি অনুষ্ঠানের দিন ধার্য করেন। হাইকোর্টের এই রায় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে আদালতের বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করেন।

১৫ নভেম্বর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইনকিলাব সম্পাদকের হাইকোর্টের আগাম জামিন দেয়ার কঠোর সমালোচনা করে সংসদে বলেন, 'এত কি জরুরী হয়ে পড়লো যে, মধ্যরাতে এজলাস বসিয়ে তাকে জামিন দিতে হলো? আদালত বঙ্গবন্ধু হত্যার রায় দিতে বিব্রত হয়। দিনের পর দিন

www.pathagar.com

জাতিকে অপেক্ষা করতে হয়। আর ইনকিলাবের সম্পাদকের জন্য মধ্যরাতে এজলাস বসে। এর জবাব কে দেবে?' তিনি বলেন, 'ইনকিলাবের উপহারে উপহার দিয়েছে জাতীয় সঙ্গীতের প্যারোডী। জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে তারা জেনে শুনে ২০ অক্টোবর প্যারোডী ছেপেছে। যে জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা'র জন্য মানুষ জীবন দিয়েছে সেই জাতীয় সঙ্গীত প্যারোডি করে ইনকিলাব ব্যঙ্গ করেছে ওরা এখন কোর্টে দাঁড়িয়ে বলে ভুল হয়েছে। ত্রুটি হয়েছে। এটা কি ভুল-ত্রুটির ব্যাপার।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আ.সা মোশাররফ নামে শ্যামলীতে কোন লোক নেই। এই মোশাররফ হলো মাওলানা মান্নান, বাহাউদ্দীন, টিক্কা-ইয়াহিয়ার প্রেতাত্মা। এ মোশাররফ হলো বেগম খালেদা জিয়া, যে নেত্রী ইনকিলাবের পক্ষে বিবৃতি দিয়েছে।'

১৬ নভেম্বর জাতীয় সংসদে রাতের বেলা কোর্ট বসিয়ে ইনকিলাব সম্পাদককে আগাম জামিন দেয়ার বিষয়ে সংসদে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা বাবু সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত দাবী জানিয়ে বলেন, 'একটি কুচক্রী মহল জনগণকে হাইকোর্টের অধীন করতে চায়। শেখ মুজিব হত্যার বিচারে কোর্ট কেন বিব্রত হলেন তা জানার অধিকার আছে। আদালতে যা হচ্ছে তা বেদনাদায়ক। সারিবদ্ধভাবে কোর্ট বিব্রত বোধ করছে।' তিনি বলেন, 'সংসদ সার্বভৌম। সংসদ থেকেই জুডিশিয়ারীর কার্যক্রম নির্ধারিত হবে। আদালত অবমাননা এখন যেন উকিল অবমাননায় পরিণত হয়েছে। সুপ্রীমকোর্টে যে সর্বশেষ নাটক হয়ে গেল তার দায়-দায়িত্ব কয়েকজন উকিল ও জজ নেবেন। আমরা নেব না।' সুরঞ্জিত সেন বলেন, 'সংবিধান রক্ষার দায়িত্ব তো সুপ্রীমকোর্টেরও। কিন্তু নির্লজ্জভাবে প্রতিটি সামরিক শাসনে প্রধান বিচারপতিরা সহায়তা করেছেন। লজ্জা করে না তাদের নামের সাথে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি লিখতে। তারা জুডিশিয়ারীকে কলঙ্কিত করেছেন।' তিনি বলেন, 'ইনকিলাব স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। আদালত কোথায় তাদের বিরুদ্ধে সুয়োমোটো করবে, তা না করে জামিন দেয়। সবচেয়ে ঘৃণ্য অপরাধ যে করেছে তার জামিনের জন্য গভীর রাতে কোর্ট বসাতে হবে। কে আপনাকে গভীর রাতে কোর্ট বসাবার অধিকার দিয়েছে। আমরা জানতে চাই কেন গভীর রাতে কোর্ট বসল।' কোন নোটিশ ছাড়াই বৈধতার প্রশ্নে দাঁড়িয়ে প্রথমে এ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন বিটীম পার্টির (ম-ম) এডভোকেট ফজলে রাব্বী। তিনি বলেন, 'রাত ১২ টায় কোর্ট বসার বিধান আছে কিনা জানতে চাই। এভাবে এক ব্যক্তিকে জামিন দেয়ার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে নেই।'

সুরঞ্জিত সেনের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে এক অনির্ধারিত আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। আমাদের পবিত্র সংবিধান, জাতীয় সংগীত ও স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয়েছে। যারা বাংলাদেশের নাগরিক, স্বাধীনতার বিশ্বাস করে, তারা জাতীয় সংগীত এবং জাতীয় পতাকার অবমাননা কোন ভাবেই মেনে নিতে পারে না। যারা স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না, তারাই কেবলমাত্র এ ধরনের অবমাননা মেনে নেবে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বার বার আমার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ করা হয়েছে। তিনবার মামলা হয়েছে। হাইকোর্ট অনেক অভজারভেশন দিয়েছে। কিন্তু আজ এমন কি ঘটলো বাংলাদেশে যে, রাত ১০ টায় কোর্ট বসালো। কার স্বার্থে কোর্ট বসানো হলো। যার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা, যিনি জাতীয় সংগীতের অবমাননা করলেন, সেই আসামীকে জামিন দেয়ার জন্য রাত ১০ টায় কোর্ট বসাতে হলো? কোর্ট বসার একটা সময় আছে। পরের দিনও তো কোর্ট বসতে পারতো। প্রধান বিচারপতি কোর্ট গঠন করেছেন। কিন্তু তিনি রাত ১০ টায় কোর্ট বসাতে বলেননি। মামলা করলো রাষ্ট্রপক্ষ। তাদের কোন নোটিশ করা হলো না। এটর্নি

www.pathagar.com

জেনারেলকে না জানিয়ে মামলার আসামীকে জামিন দেয়া হলো-এটা কিভাবে মেনে নেয়া যায়? আইন-আদালত স্বাধীন। কিন্তু কেউ সংবিধানের উর্ধ্বে নয়। সংবিধান তো মানতে হবে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বড় দুঃখ লাগে এত সংগ্রাম করে স্বাধীনতা এনেছি। যারা জাতীয় সংগীতের বিরুদ্ধে কথা বলে, তাদেরকে রাতে কোর্ট বসিয়ে জামিন দেয়া হয়। যারা স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব মানে না, জাতীয় সংগীত মানে না, তাদের রক্ষার জন্য কোর্ট জামিন দেয়। এ কেমন কথা? এটা হলে কিভাবে চলবে? মানুষ যাবে কোথায়? এত কি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে গেল যে, রাতে মামলার শুনানি হতে হবে। এ বিষয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া দরকার। আদালত শেষ আশ্রয়স্থল। সেখানকার আচার-আচরণ যদি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, তবে মানুষ কোথায় যাবে। কিভাবে দেশ চলবে?' তিনি এ বিষয়ে আলোচনার জন্য একটা দিন ধার্যের অনুরোধ করেন স্পীকারের প্রতি। ডেপুটি স্পীকার জানান, এ বিষয়ে আলোচনার জন্য দিন ধার্য করা হবে।

নভেম্বর মাসে জ্যেষ্ঠতা ভঙ্গ করে বিচারপতি মাইনুর রেজা চৌধুরীকে আপীল বিভাগে নিয়োগের পর হাইকোর্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারক বিচারপতি কাজী শফিউদ্দিন আহমেদ পদত্যাগ করেন। ডিসেম্বরে আপীল বিভাগের দু'জন বিচারক বিচারপতি এ এম মাহমুদুর রহমান এবং বিচারপতি কাজী এবাদুল হক অবসরে গেলে দু'জন বিচারপতির পদ শুন্য হয়। নভেম্বর মাসের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি না ঘটার জন্য এক পর্যায়ে সুপ্রীমকোর্টের সিনিয়র আইনজীবীদের একটি প্রতিনিধি দল প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাদের মাঝে কি কথা হয়েছে সেটা সবিস্তার প্রকাশ করা হয়নি। তবে সংবাদপত্রের ভাষ্যমতে তারা বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে দলনিরপেক্ষতা বিবেচনা এবং জ্যেষ্ঠতা ভঙ্গ না করার বিষয়ে প্রেসিডেন্টের হস্ত ক্ষেপ কামনা করেন। প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে, বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি সংবিধান অনুসরণ করবেন। সুপ্রীমকোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন একটি নিবন্ধে লিখেন, 'আপীল বিভাগের প্রমোশন এবং হাইকোর্ট বিভাগে নূতন নিয়োগদানের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বচ্ছতা থাকতে হবে। কারণ কথায় বলে যে শুধুমাত্র ন্যায়বিচার করলেই চলবে না, সেটি যে ন্যায় বিচার হয়েছে সেটা সকলকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সুতরাং এখন প্রয়োজন পূর্ণ স্বচ্ছতা।' বিচারকেদের নিয়োগদান সম্পর্কে সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

(১) প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশ নাগরিক না হইলে, এবং

(ক) সুপ্রীমকোর্টে অন্যূন দশ বৎসরকাল এডভোকেট না থাকিলে; অথবা

(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বৎসরকাল কোন বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করিয়া থাকিলে; অথবা

(গ) সুপ্রীমকোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতা না থাকিলে; তিনি বিচারক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।'

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের পর উচ্চ আদালতের আইনজীবীদের মধ্যে এমন ধারণা সৃষ্টি হয় যে, প্রেসিডেন্ট বিষয়টি বিবেচনা করবেন। কিন্তু হাইকোর্ট বিভাগের দু'জন সিনিয়র বিচারপতিকে ডিঙ্গিয়ে তাদের জুনিয়র দু'জন বিচারপতিকে উচ্চতর আদালতে নিয়োগের ঘটনায় বিচার অঙ্গনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতম হচ্ছেন বিচারপতি কে এম হাসান। বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রব্বানীর অবস্থান ২ নম্বরে, ৩ নম্বরে বিচারপতি সৈয়দ জে আর মোদাচ্ছের হোসেন, ৪ নম্বরে অবস্থান হচ্ছে

www.pathagar.com

বিচারপতি মোহাম্মদ রুহুল আমিনের'। কে এম হাসানকে ডিঙিয়ে গোলাম রব্বানী এবং দু'জনে ডিঙিয়ে মোহাম্মদ রুহুল আমিনকে নিয়োগ করা হয়। বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রব্বানীর আচরণের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগের একটি আদেশ রয়েছে। বিচারাধীন মামলার বিষয় সংবাদপত্রে নিবন্ধ লেখার কারণে তাকে সতর্ক করে একটি রায় দিয়েছেন আপীল বিভাগ। জনতা টাওয়ার মামলায় সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের শাস্তি প্রদান এবং ফতোয়া অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেয়ার ঘটনায় তার নাম নানাভাবে আলোচিত হয়। বিচারপতি মোহাম্মদ রুহুল আমিন মুজিব হত্যা মামলার ডেথ রেফারেন্সের জ্যেষ্ঠ বিচারক। তিনি এ মামলার ১০ জন আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করে তাদের মৃত্যুদন্ড বহাল রাখেন এবং অপর ৫ জনকে খালাস দেন। এ কারণে তার নামটি আদালত অঙ্গনে ছিল আলোচিত।

দু'জন সিনিয়র বিচারপতিকে ডিঙ্গিয়ে অপেক্ষাকৃত ২ জন জুনিয়র বিচারপতিকে সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগের বিচারপতি নিয়োগের ঘটনায় উচ্চ আদালত অঙ্গনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। উচ্চ আদালত অঙ্গনে সারা দিনই বিষয়টি নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। প্রধান বিচারপতি এজলাসে না আসার বিষয়টিকেও এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে আলোচনায় আনা হয়। এদিকে আদালত অঙ্গনে এমন আলাপ-আলোচনাও চলতে থাকে যে, এটর্নী জেনারেল পদত্যাগ করতে পারেন। আগের দিন সুপ্রীমকোর্টের এনেক্স ভবন উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেননি। জননিরাপত্তা আইন সম্পর্কে বিএনপির এমপি মনজুর মোরশেদ খানের দায়ের করা রীট পিটিশনের শুনানিতে তিনি আসেননি। সরকারের আইন কর্মকর্তারা জানান, 'এটর্নী জেনারেল বিব্রত বোধ করছেন। তিনি শুনানিতে অংশ নেবেন না।' অতিরিক্ত এটর্নী জেনারেল মাহবুব আলম সরকার পক্ষে দাঁড়ান। তবে তিনি প্রস্তুত নন বলে সময় প্রার্থনা করলে আদালত পরের দিন শুনানির সময় ধার্য করেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় আইনজীবীরা সুপ্রীমকোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতির দফতরে এক জরুরী সভায় মিলিত হয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় প্রস্তাবে গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলা হয়, 'এ ঘটনা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা খর্ব করবে।'

বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতির কার্যকরী কমিটি এক জরুরী সভায় মিলিত হয়ে উচচ আদালতে অব্যাহতভাবে সুপারিশ করার ঘটনাকে স্বেচ্ছাচারিতা এবং বিধি বহির্ভূত কাজ বলে এর নিন্দা করে। পাশাপাশি সর্বদলীয় আইনজীবী ঐক্য পরিষদও সন্ধ্যায় সুপ্রীমকোর্ট বারের সাবেক সভাপতি ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার চেম্বারে এক জরুরী সভায় মিলিত হয়। ব্যারিস্টার হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এক প্রস্তাবে বিতর্কিত নিয়োগ অনুসারে ২ বিচারপতির শপথ পাঠ না করানো জন্য প্রধান বিচারপতির প্রতি অনুরোধ জানানো হয় এবং বিতর্কিত নিয়োগের বিষয়টি প্রেসিডেন্টের কাছে উপস্থাপন করে আইনজীবীদের উদ্বেগের কথা তাকে জানানোর জন্য প্রধান বিচারপতির প্রতি আহবান জানানো হয়। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ১১ জানুয়ারি ২০০১)

১১ জানুয়ারি প্রধান বিচারপতি বির্তকিত দু'জন বিচারপতিকে শপথ করানোর আগে সর্বস্তরের আইনজীবীগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন ও প্রতিবাদ করেন। এ নিয়ে হাইকোর্ট ও সুপ্রীমকোর্টে নজিরবিহীন অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। আইনজীবীরা মাটিতে এলোপাথারী শুয়ে প্রতিবাদ করেন। পরিস্থিতি জটিল হওয়ার পূর্বে সিনিয়র আইনজীবীদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তারা উদ্ভুত সমস্যার একটি সম্মানজনক সমাধানের লক্ষ্যে আলাপ-আলোচনায় বসেন। সন্ধ্যায় সুপ্রীমকোর্ট প্রাঙ্গণে সরকার সমর্থক আইনজীবীদের সংগঠন সম্মিলিত আইনজীবী সমন্বয়

www.pathagar.com

পরিষদের দু'দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের প্রবীণ আইনজীবী ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগের দুই বিচারপতির বিতর্কিত নিয়োগের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, 'বিচার বিভাগের ওপর নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপের প্রক্রিয়া চলছে। এটা আইনজীবী হিসেবে আমাদের উদ্বেগের কারণ।' তিনি বলেন, 'নির্বাহী বিভাগকে বিচার বিভাগের সঙ্গে সংঘর্ষে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। সংবিধান বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও পার্লামেন্টের ক্ষমতা নির্ধারণ করে দিয়েছে। সংবিধান অনুসারে ক্ষমতা প্রয়োগ করলে কোনো সমস্যা হতে পারে না।' ব্যারিস্টার ইশতিয়াক বলেন, 'বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের কথা ক্ষমতার বাইরে থাকতে সকলেই বলেন। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে সেটা ভুলে যান। কি কারণে তারা সেটা ভুলে যান, সেটা আমাদের জানতে হবে।' তিনি বলেন, '২০০০ সালের মধ্যে বিচার বিভাগকে পৃথক অবস্থায় দেখবো বলে আশা করেছিলাম। কিন্তু দেখা হলো না। এবার ২০০১ সালের মধ্যে এটা হতেই হতে। সংবিধানের ৭ নম্বর ক অনুচ্ছেদে জনগণের মৌলিক অধিকার ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। শুধু এই অনুচ্ছেদটি পুরো কার্যকর করলেই জনগণ ও সরকার লাভবান হবে। সুশাসনও নিশ্চিত হবে।' একই আলোচনায় বক্তৃতাকালে ড. কামাল হোসেন বলেন, 'সুপ্রীমকোর্টে আইনজীবীরা যে বিষয়টির প্রতিবাদ করেছেন তার সুরাহা উচিত। আমরা তার সুরাহার জন্য সবকিছু করবো।' ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের ওপর সম্মেলনের মূল বক্তব্য প্রদান করেন আইন কমিশনের সদস্য বিচারপতি নাঈম উদ্দীন আহমেদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ব্যারিস্টার শওকত আলী খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী, এডাব চেয়ারপার্সন খুশী কবির, ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, এডভোকেট সুধাংশ শেখর হাওলাদার, এডভোকেট ওজায়ের ফারুক, এডভোকেট সাহারা খাতুন, এডভোকেট আবদুল বাসেত খন্দকার প্রমুখ।

১২ জানুয়ারি ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদের চেম্বারে সর্বদলীয় আইনজীবী নেতৃবৃন্দের এক সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে একটি আপস ফর্মুলায় উপনীত হয়ে ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ, ড. কামাল হোসেন, সাবেক বিচারপতি এমএ মালেক, ড. এম জহির ও ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেনকে দায়িত্ব দেয়া হয় সমস্যার একটি সম্মানজন সমাধানে উপনীত হওয়ার জন্য। সভায় প্রস্তাবিত আপস ফর্মূলাটি ছিল যে-দু'জন বিচারপতিকে সুপারসিড করা হয়েছে তাদেরকেও আপীল বিভাগে নিয়োগ দেয়ার সুপারিশ করা হবে। সরকার এই দাবী মেনে নিলে বিষয়টির একটি সম্মানজনক সুরাহা হতে পারে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক পাঁচজন আইনজীবী সেদিনই সন্ধ্যায় প্রধান বিচারপতির বাসভবনে সাক্ষাৎ করে এই প্রস্তাব দেন। তিনি এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করে সার্বিক সহযোগীতার আশ্বাস দেন।

১৩ জানুয়ারি সকালে পাঁচজন আইনজীবী বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করে একই প্রস্তাব দেন। তিনিও এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে সহযোগীতার আশ্বাস দেন। এরপর তারা প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কোন সাক্ষাতের অনুমতি দেননি। প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাতের অনুমতি না দিয়ে একইদিনে পাবনায় ঈশ্বরদী থানা আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষণকালে বলেন, 'বিএনপির কতিপয় আইনজীবী দেশের সর্বোচ্চ আদালতে সন্ত্রাস-মাস্তানী করেছে। এরা প্রধান বিচারপতির দরজায় লাথি মেরেছে, ঘেরাও করেছে। মাস্তানী করে, সন্ত্রাস করে আপীলেট বিভাগে বিচারপতি নিয়োগ করা যায় না। এর জন্য সংবিধানে নিয়ম আছে। সেই অনুসারে নিয়োগ দেয়া হয়।'

www.pathagar.com

আলহাজ্ব হাই স্কুল মাঠে আয়োজিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন এমপি শামসুর রহমান ডিলু। বক্তব্য রাখেন স্বরাষ্ট্র, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমদ, আব্দুল কুদ্দুস এমপি, ওয়াজি উদ্দিন খান এমপি, অধ্যাপিকা জান্নাতুল ফেরদৌস এমপি, পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি এম সাইদুল হক চুন্নু; সাধারণ সম্পাদক রেজাউল রহিম লাল, আব্দুল হামিদ মাস্টার প্রমুখ। প্রধানমন্ত্রী বিকেল সাড়ে ৩ টায় তার ভাষণ শুরু করেন। ভাষণ শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট পরই উপস্থিত জনতার বেশকিছু অংশ সভাস্থল ত্যাগ করে বাড়ির পথে রওয়ান হয়। প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ ৩০ মিনিট বক্তেব্যের ১৫ মিনিট জুড়ে তার সরকারের আমলে উন্নয়নের কথা ছিল। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা যে নির্বাচনী ওয়াদা করেছিলাম তা একটা একটা করে সব পূরণ করেছি। ওয়াদার বাইরেও উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করে যাচ্ছি। আগামীতে ক্ষমতায় আসলে আরও উন্নয়ন করা হবে। কারণ আমরা দেশকে ভালবাসি, দেশের মানুষকে ভালবাসি।'

১৪ জানুয়ারি সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম নিয়ে আন্দোলনরত সংগ্রামী আইনজীবীদের 'মাস্তান' হিসেবে আখ্যায়িত করে প্রধানমন্ত্রীর উক্তিতে সর্বদলীয় আইনজীবী ঐক্য পরিষদের আহবায়ক ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা এমপির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। সভা পরিচালনা করেন এডভোকেট গোলাম কিবরিয়া। নাজমুল হুদা বলেন, 'আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সুপ্রীমকোর্টের আপীল ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম হলে দেশের সচেতন আইনজীবী সমাজ তা প্রতিরোধে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।' তিনি চলমান আন্দোলনকে আরো গতিশীল এবং তা নস্যাৎ করার যে কোন ষড়যন্ত্র নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিহত করার জন্য দেশের সচেতন আইনজীবী সমাজের প্রতি আহবান জানিয়ে আরো বলেন, 'আইনজীবী সমিতির এই দক্ষিণ হল এখন থেকে আইনজীবীদের জন্য মুক্তাঙ্গন। এখান থেকে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন, সংগ্রাম ও দাবী জানানো হবে।' তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শুধু আওয়ামী লীগের প্রধানমন্ত্রী নন, তিনি সারাদেশের প্রধানমন্ত্রী। আন্দোলনরত আইনজীবীদের ব্যাপারে 'মাস্তান' ও 'গুন্ডা' জাতীয় লজ্জাকর ও অশালীন শব্দ ব্যবহার করে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছেন।' প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তিনি আবেদন জানান, 'সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি নিয়োগসহ আইনবিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে যেখানে তার পরামর্শের প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে মতামত প্রদানের পূর্বে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা করেই পরামর্শ দেয়া উচিত। তা না হলে এ ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক।' সভায় বক্তব্য রাখেন ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, কাজী ফিরোজ রশিদ, আব্দুর রব চৌধুরী, ব্যারিস্টার আমিনুল হক, নিতাই রায় চৌধুরী প্রমুখ। সভায় সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে নব নিযুক্ত আপীল বিভাগের বিচারকদের খন্ডিতভাবে সম্বর্ধনা জানানোয় দুঃখ প্রকাশ করা হয়। অন্যান্য বক্তাগণ বলেন, 'বিচার বিভাগের মর্যাদা সমুন্নত রাখা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যই এই আন্দোলন। কোন অনিয়ম-সন্ত্রাস নয়। বরং একই সঙ্গে আন্দোলন ও আলোচনার মধ্য দিয়েই এই আন্দোলনের চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব।' বক্তাগণ আরো বলেন, '৫ জন শীর্ষস্থানীয় আইনজীবীর প্রস্তাব মতে দুইজন জ্যেষ্ঠ বিচারপতিসহ সাত জন বিচারপতি সমন্বয়ে আপীল বিভাগ গঠন করাই বর্তমান সংকট নিরসনের একমাত্র পথ। যে প্রস্তাবে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান বিচারপতির সম্মতি রয়েছে। প্রধান নির্বাহী তাতে সম্মতি প্রদান না করলে সংগ্রামী আইনজীবী সমাজ তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবে।'

www.pathagar.com

একইদিনে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে জ্যেষ্ঠতা লংঘন করে বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী ও বিচারপতি মোহাম্মদ রুহুল আমিনকে আপীল বিভাগের বিচারপতি নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের মহাসচিব মোঃ সাইফুল ইসলাম দিলদার এবং সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতির সদস্য ও মানবাধিকার কমিশনের সদস্য এডভোকেট এস এম গোস্বামী একটি রীট আবেদন-দাখিল করেন। রীটে মামলার প্রতিপক্ষ করা হয় বাংলাদেশ সরকারে পক্ষে প্রেসিডেন্টের সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবকে। দরখাস্তকারী রীট আবেদনে উল্লেখ করেন, 'বাংলাদেশের সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে জ্যেষ্ঠতা বিধি লংঘন করে সম্প্রতি সিনিয়র বিচারপতি কে এম হাসান এবং বিচারপতি সাঈদ জিয়া মোদাচ্ছের হোসেনের পরিবর্তে জুনিয়র বিচারপতি গোলাম রব্বানী এবং বিচারপতি এম রুহুল আমিনকে আপীল বিভাগে বিচারপতি হিসেবে ১১ জানুয়ারি শপথ পাঠ করানো হত।' মানবাধিকার কমিশনের পক্ষে এই মামলাটি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ড. কাজী আকতার হামিদ।

১৫ জানুয়ারি ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন আইনমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু সরকারি দল হীতের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে একই দিনে বিতর্কিত বিচারপতি নিয়োগের প্রতিবাদে আইনজীবীরা যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তা নিয়ে সংসদে এক অনির্ধারিত প্রশ্নোত্তরকালে আওয়ামী লীগের লে. কর্ণেল (অব.) ফারুক খানের এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে প্রথমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আদালত সম্পর্কে ন্যায্য কথা বলেছিলেন। এজন্য বিএনপির আইনজীবীরা মামলা করেছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার চেয়ে মিছিল করেছিলাম বলে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল। অথচ প্রধান বিচারপতির দরজায় লাথি মারা হল। শুধু প্রধান বিচারপতিকে তারা গালিগালাজ করেনি, সর্বোচ্চ আদালতের মর্যাদা ধুলোয় লুণ্ঠিত করা হয়েছে। ঐ কালো কোটধারীদের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার আমাদের আছে। বঙ্গবন্ধুর খুনীদের রক্ষা করাই তাদের একমাত্র টার্গেট।' পরে এডভোকেট ফজলে রাব্বীর বৈধতা প্রশ্নের সূত্র ধরে এ নিয়ে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও আইনমন্ত্রী। ফজলে রাব্বী বিচারপতি নিয়োগের প্রতিক্রিয়ায় আইনজীবীদের প্রতিবাদের সমালোচনা করে বলেন, 'জ্যেষ্ঠতা প্রমোশনের মাপকাঠি নয়। পাঁচজন আইনজীবীর ফর্মূলার সাথে একমত নই।' এরপর ডেপুটি স্পীকার আইনমন্ত্রীকে বক্তব্য রাখার অনুরোধ জানালে আইনমন্ত্রী উঠে দাঁড়ান। কিন্তু সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত উঠে দাঁড়িয়ে ফ্লোর চাইলে ডেপুটি স্পীকার তাকেই ফ্লোর দেন। সুরঞ্জিত বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা ছাড়া প্রেসিডেন্টের নিজের কোন কিছু করার এখতিয়ার নেই। আপীল বিভাগের আইনজীবীরা যে ঘটনা ঘটালেন তা বিচার বিভাগের জন্য অবমাননাকর। আমি আশ্চর্য হই কেন তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হলো না। আর যে ৫ জন আইনজীবী এর-ওর সাথে দেখা করছেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, তারা যত বড় উকিল ও রাজনৈতিক নেতাই হন না কেন, সংবিধান লংঘন করার অধিকার তাদের নেই। আপীল বিভাগে কাকে এবং কতজন নিয়োগ করা হবে-তা কামাল-মইনুলদের কথায় হবে না। কামাল-ইশতিয়াকরা সংবিধান লংঘন করে কথা বলবেন, তা মেনে নেয়া যায় না। এটা প্রমোশন নয়, এটা নিয়োগ। প্রধানমন্ত্রী যদি মনে করেন এ পদে কামাল হোসেন বা ইশতিয়াককে নিয়োগ দেবেন তাও দিতে পারেন। উকিল সাহেবদের কথায় যদি বিচারপতি নিয়োগ করতে হয়, তবে তাদের কথা মতই বিচার করতে হবে। শুনেছি ৫ আইনজীবী

www.pathagar.com

আইনমন্ত্রীর সাথে দেখা করবেন। তাদের কি সাংবিধানিক দায়দায়িত্ব আছে?' তিনি আদালতে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী আইনজীবীদের বিরুদ্ধে মামলা করার এবং আদালত অবমাননার অভিযোগ দায়েরের দাবী জানান। এরপর আইনমন্ত্রী ফ্লোর নিয়ে বলেন, 'জাতির সামনে কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হয়েছে। সাংবিধানিক রীতিনীতি অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট আপীল বিভাগের দু'জন বিচারক নিয়োগ করেছেন। প্রেসিডেন্ট প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করেই এ নিয়োগ দিয়েছেন। প্রধান বিচারপতি লিখিতভাবে পরামর্শ দিয়েছেন। যদিও এ ব্যাপারে কোন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা নেই। প্রধান বিচারপতি যে চারজনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ইচ্ছা করলেই তাদের মধ্য থেকে কাউকে নিয়োগ নাও দিতে পারতেন। আপীল বিভাগে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতাই একমাত্র মাপকাটি নয়। যোগ্যতা, বিচক্ষণতা, প্রজ্ঞা ইত্যাদি নিয়েও বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয়।' এই নিয়োগ নিয়ে সুপ্রীমকোর্টের আইনজীবীদের প্রতিবাদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ তো নয়ই, কোন সভ্য সমাজে এটা কল্পনা করা যায় না। একটি চিহ্নিত মহল নীলনকশা অনুযায়ী একটা গভীর ষড়যন্ত্র করছে। বিএনপির মুখচেনা কতিপয় আইনজীবী আইন পেশায় চেয়ে যাদের রাজনৈতিক পরিচয় বড়, তারা ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার নেতৃত্বে বিচারকদের জিম্মি করে রেখেছে, প্রধান বিচারপতির দরজায় লাথি মেরেছে। যার অর্থ সমগ্র জাতির মর্যাদা ও সম্মানে আঘাত। প্রধান বিচারপতির কোন ক্ষমতা নেই কোন নিয়োগের বা নিয়োগ বাতিলের। এই অসভ্য কাজ ২শ' বছরের ইতিহাসে কেউ দেখেনি। এটা একটা ফৌজদারী অপরাধ। আমি প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন করি, তাদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল ইস্যু করুন। রেজিস্ট্রারকে নির্দেশ দিন ফৌজদারী মামলা দায়েরের জন্য।' আইনমন্ত্রী বলেন, 'সুপারসিডের ঘটনা নতুন নয়। এর আগেও বহুবার হয়েছে। এর অনেক কারণ আছে। সিটিং জাজদের সম্পর্কে কিছু বলতে চাইনা। সুপ্রীমকোর্ট ন্যায় বিচারের প্রতীক। আমরা দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচারপতি নিয়োগ করিনি। জাতির পিতার খুনীদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে খালাস দিয়েছিলেন বিচারপতি রুহুল আমিন। তাকেও নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নাজমুল হুদা বলেছেন, বিচারপতি গোলাম রব্বানী সাত দলের সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। আমরা রাষ্ট্রদূত বা পার্টির সভাপতিকে বিচারপতি বানাইনি।' এ পর্যায়ে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত নিজ আসন থেকে উঠে এসে আইনমন্ত্রীর কাছাকাছি গিয়ে কিছু বলার জন্য তাগিদ দিতে থাকেন। আইনমন্ত্রী তখন বলেন, 'এর আগে বহুবার সুপারসিড করে জুনিয়রদের আপীল বিভাগে নিয়োগ দেয়া হলেও তা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেনি। আজ কেন প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। প্রধান বিচারপতিকে বিতর্কিত করাই এর উদ্দেশ্যে। তিনি পরবর্তী কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হবেন। এজন্যই এসব প্রশ্ন তোলা হচ্ছে।' সুরঞ্জিতের অব্যাহত তাগিদের প্রেক্ষিতে আইনমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, 'যে দু'জন বিচারপতিকে আপীল বিভাগে নিয়োগের জন্য বলা হচ্ছে তাদের একজন বঙ্গবন্ধুর খুনীদের একজনের নিকটাত্মীয়। খুনীদের রক্ষা করতে চায় বলেই ওরা এসব দাবী জানাচ্ছে।' আইনমন্ত্রী এই বক্তব্যের পর সুরঞ্জিত টেবিল চাপড়ে সমর্থন জানান। আইনমন্ত্রীর বক্তব্যের পর ডেপুটি স্পীকার বলেন, 'আদালতে যা ঘটেছে তা নিন্দনীয় ও দুঃখজনক। এটা হওয়া কোনমতেই উচিত নয়। বিচারপতি নিয়োগ সংবিধান মোতাবেক হয়েছে। অতীতেও এটাই অনুসৃত হয়েছে। ভবিষ্যতেও এটাই হবে। সংবিধান মেতাবেক আমাদের চলতে হবে।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০০১ সাবেক সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল (অব.) শফিউল্লাহ এবং অন্যান্য বাহিনী প্রধানদের তীব্র সমালোচনা করার মধ্য দিয়ে শেখ মুজিব হত্যা মামলার

www.pathagar.com

সাক্ষীদের সাক্ষ্য উপস্থাপন পর্ব শেষ হয়। হাইকোর্ট বেঞ্চের দেয়া বিভক্তি রায়ের ওপর শুনানিকালে সাক্ষীদের বক্তব্য উপস্থাপনের সময় বিচারপতি ফজলুল করিম এই বলে মন্তব্য করেন যে, তাকে (শফিউল্লাহ) মামলার সাক্ষী করার পরিবর্তে আসামী করা উচিত ছিল। বিচারপতি করিম আরও বলেন, পুরো সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে থাকা অবস্থায় রাষ্ট্রপতির জরুরী তলব পেয়েও তাতে সাড়া প্রদানের ব্যর্থতা তার অযোগ্যতার পরিবর্তে বড় ধরনের ভুল। বিচারপতি এই মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামী মেজর ডালিমের চাপের কাছে নতি স্বীকার করা এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট ষড়যন্ত্রকারী নেতাদের প্রতিষ্ঠিত প্রশাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য তার পেছন পেছন রেডিও ষ্টেশনে যাওয়ায় তদানীন্তন সেনাপ্রধানকে তিরস্কার করেন। বিচারপতি করিম তদানীন্তন বিডিআর প্রধান মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান এবং নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর প্রধানদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এবং বলেন, 'এরা সবাই মামলার আসামি হওয়ার যোগ্য।' বিচারপতি করিম ১৫ আগস্টের পরিবর্তনের পর অধিকাংশ ষড়যন্ত্রকারী নেতার মতো জেনারেল শফিউল্লাহ বিদেশে নিয়োগ গ্রহণ করায় তার সমালোচনা করেন। বাদী পক্ষের কৌসুলী জেনারেল শফিউল্লাহসহ অন্যান্য বাহিনীর প্রধানের ভূমিকাকে অযোগ্যতা হিসেবে অভিহিত করেন। গত চারদিনের শুনানিকালে সাক্ষীদের সাক্ষ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে বাদী পক্ষ ছয় আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের চেষ্টা করেন এবং পুরো মামলার প্রেক্ষাপট ব্যাখা করেন। (সূত্রঃ দৈনিক যুগান্তর ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০১)

প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে ছাত্রলীগের চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা ১১ এপ্রিল ২০০1 চট্টগ্রাম আইনজীবীদের মৌন মিছিলে নগ্ন হামলা চালায়। বয়োবৃদ্ধসহ অসংখ্য আইনজীবীকে মারধর করে। গায়ের কাপড় খুলে নগ্ন করে। এ বর্বর হামলার পর উল্টো থানায় জোরপূর্বক আইনজীবীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। হামলাকারীরা পত্রিকায় আইনজীবীদের বিরুদ্ধে জঘন্য ভাষায় বিবৃতি দেয়। অথচ কিছু ব্যক্তির হীন চক্রান্তে হামলাকারীদের স্রেফ 'সরি' বলতেই সবকিছু শেষ হয়ে যায়। আইনজীবীদের বৃহৎ অংশের আপত্তি-ক্ষোভ সত্ত্বেও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয়। নিজের অনুগত ক্যাডারদের বাঁচাতে চট্টগ্রাম মেয়রের অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ, ঢাকার শীর্ষ আওয়ামী সমর্থক আইনজীবীদের নির্বাচনী স্বার্থ এবং সর্বোপরি চট্টগ্রামের বিরোধী দলীয় আইনজীবী নেতাদের অদূরদর্শী সিদ্ধান্তের এমন ন্যক্কারজনক ঘটনার বিশ্রী পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৩ এপ্রিল সকাল দশটায় আদালতে আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে মেয়র গ্রুপের গিয়াস উদ্দিন হিরুর নেতৃত্বে হামলাকারীরা পূর্ব নির্ধারিত পন্থায় আইনজীবীদের কাছে সরি বলে। এরপর সরকার সমর্থক ও বিরোধী আইনজীবী নেতারা পূর্বের পরস্পরের বিরুদ্ধে থানায় দায়ের করা অভিযোগ প্রত্যাহার করার জন্য দারোগার কাছে পৃথক পৃথক আবেদন করতে সম্মত হয়।

আওয়ামী আমলে ঢাকার সিএমএম কোর্ট ও থানা পুলিশের কতিপয় অসাধু ব্যক্তির সহায়তায় একটি শক্তিশালী জালিয়াত চক্র দীর্ঘদিন ধরে কোর্ট থেকে ভুয়া ওয়ারেন্ট, সাজা পরোয়ানা, হুলিয়া, ক্রোক পরোয়ানা ও জেল ওয়ারেন্ট তৈরির মাধ্যমে নিরীহ মানুষকে হয়রানি করে। এ চক্রটি ভুয়া জামিননামা তৈরি করেও গুরুত্বপূর্ণ মামলার আসামীদের জেল থেকে ছাড়িয়ে নেয়। আদালত প্রাঙ্গণের একটি চক্র এক শ্রেণীর অসাধু কর্মচারীর সহায়তায় সিল-স্বাক্ষর জাল করে এসব ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে। অর্থ আদায়ের জন্যই চক্রটি এসব করেছে। কেউ প্রতিপক্ষ কাউকে হেনস্থা করার জন্যও এই চক্রের আশ্রয় নিয়েছে। পটুয়াখালী জেলার ইটাবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা ৫০ বছর বয়স্ক আলমগীর সরকারকে পাঁচটি ভুয়া মামলায়

www.pathagar.com

৩ বছর জেল খাটতে হয়। তাকে ১৯৯৯ সালে পটুয়াখালী পুলিশ একটি ডাকাতি মামলার আসামী করে। এ মামলা মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে ঢাকার সিএমএম আদালত থেকে পর পর ৫টি ভূয়া ওয়ারেন্ট পাঠানো হয়। এই ওয়ারেন্ট পেয়ে পটুয়াখালী পুলিশ ২০০০ সালে ১৭ জানুয়ারি আলমগীরকে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠায়। কারাবন্দী অবস্থায় কারা কর্তৃপক্ষ দেড় বছরেও তার ব্যাপারে কোন তথ্য আদালতকে অবহিত করেনি। ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সিরাজুল হায়দার মামলার নথি তল্লাশী করে দেখতে পান যে, মামলাগুলোর ওয়ারেন্ট বের করে আলমগীরকে জেলে ঢোকানো হয়েছে তার সবক'টিই ভুয়া। পরে তিনি ২৬ জুন আলমগীরকে মুক্তির নির্দেশ দেন। আলমগীরের জেলে আটকাদেশ প্রসঙ্গে ঢাকার সিনিয়র জেল সুপার জাহাঙ্গীর হোসেন ১ জুলাই সিএমএম বরাবর প্রেরিত এক প্রতিবেদনে বলেন, 'আলমগীরের কারা পরোয়ানায় ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর, ১নং কোর্টের সিল থাকায় সন্দেহ করার কোন অবকাশ ছিল না।' জেল সুপার তার প্রতিবেদনে আরও একটি ভয়াবহ তথ্য তুলে ধরেন, তা হল-ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক বিচারাধীন বন্দীদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে অন্তর্বর্তীকালীন হাজতের পরোয়ানা আদালতে হাজিরার তালিকা না থাকায় ২ হাজার আসামী বন্দী রয়েছে। কোর্ট থেকে ভূয়া জামিন নামা তৈরি করেও যে জেল থেকে আসামী বের করা হচ্ছে এ ব্যাপারেও একটি কেস স্টাডি জেল সুপার তার প্রতিবেদনে প্রকাশ করেন। তাতে জানানো হয়, 'নরসিংদীর শিবপুর উপজেলার বাঘার গ্রামের বাসিন্দা বেনজীর আহমেদ নামের এক লোক হাইকোর্ট, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরগঞ্জ ও জেল সুপারের মাধ্যমে মোশাররফ নামের এক ব্যক্তির কয়েদীর মুক্তিনামা তৈরি করে। বিষয়টি পরে জানাজানি হলে বেনজীরের বিরুদ্ধে লালবাগ থানায় ২০০০ সালের ৫ জুন একটি মামলা রুজু করা হয়।' প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, 'ঢাকা কারা কর্তৃপক্ষ আরও কয়েকটি ভূয়া ছাড়পত্র উদঘাটন করেছেন। ঢাকার সিএমএম আদালত থেকে ইস্যুকৃত ভুয়া ওয়ারেন্টে গ্রেফতারকৃত হয়ে এক মাস জেল খেটেছেন বাবা ও ছেলে। সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার নোয়া গ্রামের নিরীহ বাসিন্দা আলাউদ্দিন ও তার পুত্র মোতালেবকে ১৯৯৭ সালের একটি প্রতারণা মামলার আসামী দেখিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট পাঠানো হয়। ভুয়া ওয়ারেন্টের বিষয়টি সম্প্রতি জানাজানি হলে ৫ জুন পিতা-পুত্রকে জামিনে মুক্তির নির্দেশ দেন ঢাকার একজন ম্যাজিস্ট্রেট। প্রতিদিনই ঢাকার আদালত থেকে ভুয়া ওয়ারেন্ট বের করে মানুষকে হয়রানীর বিষয় জানার পর সিএমএম এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য একটি অফিস আদেশ জারি করেন। ঢাকার সিএমএম শৈলেন্দ্র কুমার অধিকারী ৪ জুলাই অন্যান্য ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করে তার আদেশে বলেন, 'সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে, কিছু অসাধু ব্যক্তি জালিয়াতির মাধ্যমে সাধারণ নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে গ্রেফতারী পরোয়ানা, মাল ক্রোক, হুলিয়া, সাজা পরোয়ানা, কাস্টডি ওয়ারেন্ট ও জেল ওয়ারেন্ট ইস্যু করে হয়রানী করছে। এই চক্রটি অবৈধ পন্থায় রিলিজ আদেশ, বেলবন্ড সমন, নোটিশ, পরোয়ানা ফেরত ইত্যাদি তৈরি করছে। এরা ম্যাজিস্ট্রেটদের সই-সিলও জাল করছে।' সিএমএম তার অফিস আদেশে বলেন, 'পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত কোর্ট জিআর শাখার যাবতীয় প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট পুলিশ সই-সিল দেয়ার পরই ম্যাজিস্ট্রেটগণ স্বাক্ষর করবেন।' (সূত্রঃ দৈনিক যুগান্তর ৯ জুলাই ২০০১)

www.pathagar.com

মামলার জট

রাস্তায় বেরুলে যানজটের সৃষ্টি ও নিষ্পত্তি দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট, কিছুদিন পর তার নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু আওয়ামী আমলে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতার কারণে আদালতগুলোতে মামলার যে জট বেঁধে ছিল তা নিষ্পত্তির কোন লক্ষণ ৫ বছরে দেখা যায়নি। সত্য বলতে গেলে মামলা নিষ্পত্তির জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ বা পথ খুঁজে বের করেনি হাসিনা সরকার। সেমিনারে দাঁড়িয়ে, সংবাদপত্রে ফিচার লিখে সবাই 'বিলম্বিত বিচার-অবিচারেরই শামিল'-উল্লেখ করলেও কারো কথায় গুরুত্ব দেয়নি সরকার। বাস্তব পর্যালোচনায় তাই কথাটি কেবলই উপহাস বিবেচিত হয়েছে। ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অভিপ্রায়ে আদালতগুলোর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মামলা দায়েরের পর নিষ্পত্তির মাধ্যমে রায় পাওয়া বাদী-বিবাদী উভয়ের জন্য জরুরী। যদি মামলা নিষ্পত্তিতে বছরের পর বছর সময়ক্ষেপণ হয় তবে তা ন্যায় বিচারের নামে অন্যায় করা হয়। শুধু তাই নয়, বিচারের দীর্ঘসূত্রিতার জন্য মানবাধিকার লংঘিত হয়।

একটি মামলা দায়েরের পর নিম্ন আদালতের মাধ্যমে প্রথমে বিচারকার্য শুরু হয়। আওয়ামী আমলে নিম্ন আদালতে মামলাগুলোর নিষ্পত্তি হওয়া দূরে থাক, বিচারকের অভাবে দিনের পর দিন তারিখ পড়ে মামলার শুনানী পর্যন্ত ঠিকমত হয়নি। এর মধ্যে রাজনৈতিক কারণে মামলাও ছিল। নিম্ন আদালত বিশেষতঃ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমূহ প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে সরকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের উপর মিথ্যা মামলা দায়ের করে আটক রাখার সহজ পথটি বেছে নিয়েছিল।

দেশের গুরুত্বপূর্ণ জেলায় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও প্রতিহিংসামূলকভাবে সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় গ্রেফতারকৃত জামিন পাননি। ফলে জামিনের আবেদন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে না করে উচ্চতর আদালতে করা হয়। সরকারের নগ্ন হস্তক্ষেপের কারণে মনমত কাজ করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটদের সবসময় থাকতে হয় তটস্থ। জেলা পর্যায়ে দায়রা আদালতসমূহে জামিনের আবেদনের শুনানীর সুযোগ লাভের সুযোগ কমে যাওয়ায় চূড়ান্ত পরিণতি নির্ণয়ের জন্য হাইকোর্টে যেতে হয় রাজনৈতিক নিপীড়িতদের। উচ্চতর আদালতে শরণাপন্ন হয়ে অনেক প্রতীক্ষার পর জামিন পেতে হয়েছে ভুক্তভোগীকে।

মামলা দায়েরের পর এফআইআরসহ আসামী আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ায়। তারপর চার্জশীট হয়। চার্জশীট সাধারণত ৯০ দিনের মধ্যে দিতে হয়। সময় বাড়াতে হলে আদালতের অনুমতি নিতে হয়। বাংলাদেশে দেখা গেছে চার্জশীট প্রদানে বিলম্ব করেছে তদন্তকারী কর্মকর্তা। সরকারি প্রভাবে যেসব মামলা সাজানো হয় সেগুলোর চার্জশীট খুব তাড়াতাড়ি প্রদান করলেও ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় আটকদের চার্জশীট আদালতে পাঠাতে গড়িমসি করে তদন্তকারী কর্মকর্তা। কারণস্বরূপ পর্যালোচনায় পাওয়া গেছে, পুলিশ ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় আটকদের পরিবারবর্গকে নানারূপ হুমকি, চাপ সৃষ্টি করে, মানসিক বিপর্যস্ত করে মামলার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অর্থ আদায় করেছে। পরিবারকে বাধ্য হয়ে আসামীর মঙ্গলের জন্য সহায়-সম্বল বিক্রি করে খায়েশ পূরণ করতে হয়েছে তদন্তকারী কর্মকর্তার। অনেক ক্ষেত্রে টাকার বিনিময়ে

www.pathagar.com

প্রকৃত অপরাধীরা জেল থেকে বা আত্মীয়-স্বজন, সাঙ্গ-পাঙ্গ দ্বারা চার্জশীট ভিন্নখাতে প্রবাহিত করেছে।

পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি), সহকারী পাবলিক প্রসিকিউর (এপিপি) থাকেন সরকার পক্ষের উকিল। পিপি-এপিপিরা রাজনৈতিক মামলায় বিরোধিতা করার জন্য বিরোধী নেতৃবৃন্দের মুক্তি নিম্ন আদালতগুলোয় সম্ভবপর হয়নি। নিম্ন আদালতগুলোতে পিপি-এপিপির বিরোধিতাই অঘোষিতভাবে বুঝে নিতে হয় সরকারের নাখোশ মনোভাব। নাখোশ মনোভাবের বলী হয়েই বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে পরবর্তী হাজিরা দিতে হয় দীর্ঘদিন পরে পড়া তারিখে।

আওয়ামী শাসনামলে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, দোষী বা একজন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে সিএমএম আদালত থেকে মামলায় জামিনের জন্য দশটি স্তর পার হতে হয়েছে। প্রতিটি স্তরেই গুনতে হয়েছে অনেকটা নির্ধারিত টাকা। তারপর ঘটেছে জামিনে মুক্তি। উকিলের নির্ধারিত টাকার বাইরেই এ টাকা ব্যয় করতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধিও পায়। জনৈক ব্যক্তিকে দশ স্তর পার হতে ন্যূনতম ৬শ' টাকা ব্যয় করতে হয়। প্রথম স্তরে মামলা বুঝে উকিলকে ৫ শ' টাকা থেকে শুরু করে ৫ হাজার কিংবা আর বেশি টাকা প্রদান করতে হয়। একজন জামিনপ্রার্থীকে প্রথমে ফাইলটা শুধু দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ২০ টাকা দিতে হয়। তবে ফটোকপি নিতে চাইলে সেক্ষেত্রে দিতে হয় ১ শ' টাকা। দ্বিতীয় স্তরে জামিনের দরখাস্তটি নথিবদ্ধ করার জন্য ২০ টাকা প্রদান করতে হয়। গুরুত্বপূর্ণ মামলা হলে ৫০ থেকে ১শ' টাকা ব্যয় হয়। তৃতীয় স্তরে জামিন মঞ্জুর হলে জামিননামা প্রদান কালে একটা নথিতে লেখার জন্য দিতে হয় ৫০ টাকা। চতুর্থ স্তরে পিআর এর জন্য ২০ টাকা দিয়ে সীল দেয়াতে হয়। পঞ্চম স্তরে জিআরও এর স্বাক্ষরের জন্য ১ শ' টাকা প্রদান করতে হয়। ষষ্ঠ স্তরে কোর্ট ইন্সপেক্টরকে দিতে হয় ৫০ টাকা। সপ্তম স্তরে জামিননামা গ্রহণের জন্য যে পিয়নকে দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর আনতে হয়, তাকে দিতে হয় ২০ টাকা। অষ্টম স্তরে যদি জামিন না হয়, সে ক্ষেত্রে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে জেলে পাঠানো হয়। এ সময় ডেসপাস শাখায় ২০ টাকা প্রদান করতে হয়। নবম স্তরে প্রকার ভেদে বিশেষভাবে যদি কাউকে বেলবন্ডসহ কারাগারে পাঠাতে হয় সে ক্ষেত্রে ২শ' টাকা থেকে ৫শ' টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। দশম স্তরে পুরনো মামলার ফাইল দেখতে চাইলে, সে ক্ষেত্রে তারিখ বলতে পারলে ২০ টাকা, তারিখ না বলতে পারলে ৫০ টাকা প্রদান করতে হয়। এসব সিস্টেমগুলো প্রকাশ্যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছিল। এটা নিয়ে আওয়ামী সরকার মাথা ঘামায়নি। এমনকি বিভিন্ন থানা থেকে যেসব গ্রেফতারকৃতদের প্রিজন ভ্যানে কোর্ট হাজতে আনা হয়েছে; তাদের মধ্যে যারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের টাকা দিতে পেরেছে; তাদের হাতে হাতকড়াও পড়েনি কিম্বা মাজায় দড়ি বাঁধা হয়নি। কোর্ট হাজত থেকে কোর্টে নেয়ার সময় মাজায় দড়ি বেঁধে একসাথে কয়েকজন করে নেয়া হয়। তবে এসব ক্ষেত্রে যারা অর্থ প্রদান করেছে তারা সুবিধাটা পেয়েছে। প্রতিদিন পুলিশ যে সব অতি দরিদ্র লোকজনকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করেছে তাদের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় এক নির্মম পরিস্থিতি। অনেক ক্ষেত্রে এমন সব লোকও গ্রেফতার হয়, যাদের কোন আত্মীয়-স্বজন ঢাকায় ছিল না কিংবা আত্মীয়-স্বজন জানেই না গ্রেফতারের ঘটনা। এসব পরিস্থিতিতে অনেককেই কোন জামিনের আবেদন ছাড়াই জেলে চলে যেতে হয়।

দেশের ফৌজদারী মামলার সংখ্যা যেভাবে বেড়েছে সে হারে বিচার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করেনি সরকার। ফলে অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা সর্বপর্যায়ে বৃদ্ধি পায়। মামলা নিস্পত্তি না

www.pathagar.com

হওয়ার জন্য বিনা বিচারে শ্রীঘরে থেকে অনেকেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। হাসিনা সরকারের শাসনামলে বিচার ব্যবস্থা অব্যবস্থায় পরিণত হয়। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় একদিকে যেমন বিচারকের স্বল্পতা ছিল অন্যদিকে বিচারকদের দায়িত্ব পালন নিয়ে কথা উঠিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর বেশ কয়েকটি রিপোর্টে বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতির আশ্রয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জন সি হোলজম্যান ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের একজরিপ উল্লেখ করে ঢাকায় আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স বাংলাদেশের উদ্যোগে 'সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ৫০ বছর পূর্তি' স্মরণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে অভিযোগ করেছিলেন, 'বাংলাদেশে পুলিশ ও নিম্ন আদালত ঘুষ খায়।' (সূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক ৮ ডিসেম্বর ১৯৯৮)

১৪ জানুয়ারি ১৯৯৯ দৈনিক ইত্তেফাকে নাজমুল হুদা শামীমের 'আদালতে মামলার জট প্রসঙ্গে' লেখায় প্রকাশিত তথ্য হচ্ছে দেশের ৬৪টি জেলায় বিচারাধীন দেওয়ানী মামলা ৩ লাখ ২৫ হাজারেরও বেশি এবং প্রায় সাড়ে ৩ লাখ ফৌজদারী মামলা বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তির জন্য মাত্র ৭শ' এর বেশি বিচারক কর্মরত আছেন। বিচারাধীন এই মামলার সাথে প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন আদালতে হাজার হাজার মামলা দায়ের করা হচ্ছে। ফলে দিনদিন মামলায় জট বেড়েই চলেছে। এর সাথে বাড়ছে জনগণের অর্থের অপচয়, দুর্ভোগ হয়রানি।

২৩ জানুয়ারি ১৯৯৯ চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে মহানগরী ছাত্রলীগ নেতা রফিউল হায়দার রফি অভিযোগ করে বলেন, গত কিছু দিন যাবত সুনির্দিষ্ট মামলায় গ্রেফতারকৃত দাগী আসামীরা একের পর এক মামলায় জামিন পেয়ে যাচ্ছে। ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ বলেন, একজন ম্যাজিস্ট্রেট এসব জামিন প্রদানের পর বলেছেন আইনমন্ত্রীর নির্দেশে তিনি এই আসামীদের জামিন দিয়েছেন। যারা জামিন পেয়েছিল তারা হলো : (১) ডবলমুরিং থানার মামলা নং ৫(৬) ৯৭, ধারা ৩০২/৩৪ আসামী নূরুল কবির প্রকাশ হেলাল উদ্দিন, এজাহারে ২নং আসামী এবং তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে। জেলা জজ আদালতে বেশ কয়েকবার জামিন না মঞ্জুর হলেও ১৭ জানুয়ারি সিএমএম মনিরুল ইসলাম উক্ত আসামীকে জামিন দিয়েছেন, (২) পাহাড়তলী থানার মামলা নং-১৫(১২) ৯৮, ধারা ৩০২/৩৪, এজাহারভুক্ত ও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে, এরূপ আসামী শাহ আলম, সাহেদুল ইসলাম, মোঃ জাবেদ ও আবুল কালাম আজাদকে সিএমএম আদালত জামিন দিয়েছেন। মামলার মাত্র ২৪ দিনের পর এই তদন্তাধীন মামলার আসামীদের ঢালাওভাবে জামিন প্রদান ও তাদের জিজ্ঞাসাবাদ না করার ফলে মামলার ভিত্তি নষ্ট হয়েছে, (৩) পাঁচলাইশ থানার মামলা নং-৩২(১২)৯৮, ধারা বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩৬৪ ধারার আসামীকে জামিন প্রদান, (৪) পাঁচলাইশ থানার মামলা নং-৩২(১২)৯৮, ধারা ৩৮৫/৩০৭, আসামীকে জামিন প্রদান, (৫) পাঁচলাইশ থানার মামলা নং-৩৮(১১)৯৮, ধারা ৩০৭/৩৪, আসামীকে জামিন প্রদান, (৬) পাহাড়তলী এলাকার ব্যবসায়ী চাঞ্চল্যকর রফিক হত্যা মামলার আসামীকে জামিন প্রদান, (৭) অস্ত্র মামলা একে ৪৭সহ গ্রেফতার হওয়া আসামীকে জামিন প্রদান, (৮) কয়েকটি লোমহর্ষক ডাকাতি মামলার আসামীকে জামিন প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি মামলায় উচ্চতর আদালতে বিগত সময়ে জামিন না মঞ্জুর হয়েছিল। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ২৪ জানুয়ারি ১৯৯৯)

www.pathagar.com

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ দৈনিক জনতার সম্পাদকীয়তে প্রকাশিত তথ্য মতে দেশের নিম্ন আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা সাড়ে ৪লাখ। এর মধ্যে সাড়ে ৩ লাখ দেওয়ানী। বাকিগুলো ফৌজদারী। দেওয়ানী মামলাগুলোর মধ্যে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ মামলা এক যুগ ধরে ঝুলে আছে।

ফৌজদারী মামলায় যেসব ডাক্তার ও পুলিশ কর্মকর্তা সাক্ষী হিসেবে থাকেন, তারা আদালতে হাজিরা না দেয়ায় চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন আদালতে শ' শ' ফৌজদারী মামলার বিচার কাজে বিলম্ব হচ্ছে। ফৌজদারী মামলার এসব সাক্ষীদের প্রতি সাক্ষ্য দেয়ার জন্য সাধারণ সমন বা নোটিশ এমনকি সাক্ষীদের হাজিরার জন্য ওয়ারেন্ট ইস্যু করার পরও তারা আদালতে হাজির হচ্ছেন না। ফলে একদিকে যেমন ফৌজদারী মোকদ্দমা বিচারে বিলম্ব হচ্ছে, অন্যদিকে আসামীরাও সাক্ষীর অভাবে বিচারে খালাস পেয়ে যাচ্ছে-এ ধরনের তথ্য পরিবেশন করেছে ১০ মার্চ ১৯৯৯ এর দৈনিক প্রথম আলো। দৈনিক প্রথম আলোর তথ্য মতে, চুয়াডাঙ্গার একটি সহকারী জজ আদালতে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ৬৩ টি ও ১৯৯৮ সালে ৪২ টি ফৌজদারী মামলার আপিল করা হয়। আপিল মামলার মধ্যে ১৯৯৮ সালে মাত্র ১৯ টির নিষ্পত্তি হয়। এছাড়া একই আদালতে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ফৌজদারী মামলায় ৮৭ টি রিভিশন হয়। ১৯৯৮ সালে দাখিল হয় আরো ৪৪টি মামলা। সর্বমোট ১৩১টি মামলার মধ্যে ১৯৯৮ সালে মাত্র ৩২টির নিষ্পত্তি হয়।

ঢাকা মহানগরীর তদন্তের কব্জায় বন্দী প্রায় ২০ হাজার মামলা ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তদন্তের নামে থানায়ই পড়ে ছিল। মাস, বছর সময় অতিক্রম করলেও আলোর মুখ দেখেনি। তদন্তের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে বহু মামলার মেরিট নষ্ট হয়ে যায়। ঢাকা মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো ডিবির কাছে তদন্তের জন্য পাঠানো হলেও মামলাগুলো তদন্তে ডিবি পুলিশের তেমন উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়নি। মামলা তদন্তে শ্লথ গতির কারণে খোদ ডিবি কর্তৃপক্ষও উদ্বিগ্ন ছিল। ১ মার্চ ১৯৯৯ মহানগর গোয়েন্দা প্রধান আলতাফ হোসেন মোল্লা স্বাক্ষরিত অফিস অর্ডার স্মারক নম্বর ১৯৫ (৯৮)-এ বলা হয়, 'গোয়েন্দা বিভাগের কাছে যে সকল মামলা ন্যস্ত হচ্ছে বা পূর্ব থেকে তদন্তাধীন ওইসব মামলা তদন্তের অগ্রগতি ও গুণগত মান আশানুরূপ না হওয়ার কারণে মামলার বাদীসহ জনগণের প্রত্যাশা পূরণে বেগ পেতে হচ্ছে। এ অবস্থায় তদন্তকারী অফিসারদের কাছে যে মামলা তদন্তাধীন আছে তা নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে নিয়মিত অগ্রগতি জানাতে হবে।' ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গোয়েন্দা পুলিশের কাছে ৩৮৭টি গুরুত্বপূর্ণ মামলা ছিল। এর মধ্যে হত্যা ৪৩টি, অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৪৪টি, ডাকাতি ১৩টি, দস্যুতা ১৮টি, অপহরণ ৯টি, নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে ৮টি মামলা ছিল। অন্যান্য মামলা ছিল ২০৬টি। নগরীর ২১টি থানার মধ্যে ১৫টি থানায় ২/৩ বছরের পুরাতন মামলা ঝুলে ছিল। তদন্তাধীন ছিল ১২শ' মামলা। (সূত্রঃ দৈনিক মানবজমিন ১৬ মার্চ ১৯৯৯)

আইনমন্ত্রী ৩ মার্চ ১৯৯৯ জাতীয় সংসদে প্রশ্ন-উত্তর পর্বে সরকারি দলের জয়নাল আবেদীন হাজারীর এক প্রশ্নের জবাবে সুপ্রীমকোর্টের আপীল ও হাইকোর্ট বিভাগের মামলা নিষ্পত্তির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়া বিষয়টি সরকারে সক্রিয় বিবেচনাধীনে রয়েছে বলে জানান। বিএনপির এমপি মোহাম্মদ ফজলুল আজিমের এক প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী জানান, সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ৯৫ হাজার ৫৯৪টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। আর সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৩ হাজার ৩৭৮টি। আইন মন্ত্রী জানান, ১৯৯৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন ফৌজদারী

www.pathagar.com

মামলার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৬৪০টি, দেওয়ানী মামলার সংখ্যা ৪০ হাজার ৫৩টি, রীট মামলার সংখ্যা ১৪ হাজার ৬২২টি ও হাকিম দেওয়ানী ১ হাজার ২৭৯টি। একই সময়ে আপীল বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা সিভিল পিটিশন ২ হাজার ৬৫৮টি, ক্রিমিনাল পিটিশন ৩৫৬টি, সিভিল আপীল ৩০৫টি এবং ক্রিমিনাল আপীল ৫৯টি। সরকারি দলের জয়নাল আবেদীন হাজারীর অপর এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, ১৯৯১-৯৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হাইকোর্ট বিভাগ ১ লাখ ৪ হাজার ২১৯টি ও সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগ ৬ হাজার ৫৩১টি মামলার নিষ্পত্তি করে। সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত মামলাগুলোর মধ্যে সিভিল পিটিশন ৪ হাজার ৬০৮টি, ক্রিমিনাল পিটিশন ১ হাজার ২২০টি, সিভিল আপীল ৫৪১টি ও ক্রিমিনাল আপীল ১৬২টি। হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত মামলাগুলোর মধ্যে ফৌজদারী ৩০ হাজার ৩৪৪টি, দেওয়ানী ২৫ হাজার ৯৪৭টি। মন্ত্রী জানান, ঢাকায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালত ২৫০টি মামলার নিষ্পত্তি করে। এখনো ১ হাজার ৫৫টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। খুলনায় ১৬০টি মামলার নিষ্পত্তি করা হয় আর বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ১৫২টি। সিলেটে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ২৩৫টি, বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৫২৩টি। চট্টগ্রামে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ২৩৫টি, কুষ্টিয়ায় নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৬১৪টি, বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৫২৩টি, রাজশাহীতে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৩২২টি, বিচারাধীন ২১৪টি, রংপুরে নিষ্পত্তিকৃত মামলা ১৬২টি, বিচারাধীন মামলা ৭২৯টি, কুমিল্লায় নিষ্পত্তিকৃত মামলা ১৪১টি ও বিচারাধীন মামলা ১৩৫টি এবং ময়মনসিংহে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ২৮২টি আর বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ১৭৯টি।

সংসদে স্বীকারোক্তি দেওয়ার পরই ২৩ মার্চ দৈনিক মাতৃভূমির সঙ্গে সাক্ষাতকারে আইনমন্ত্রী বলেছিলেন, 'হাইকোর্ট ডিভিশনে আরো ৩৪ জন বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' অনেক সময় পেরিয়ে গেলেও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি। আওয়ামী লীগের শাসনামলে সব কিছুতে একটা শিথিলতা প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। মামলার ক্ষেত্রে যে শিথিলতা সরকার দেখিয়েছে তা সত্যিই নজীরবিহীন।

প্রবীণ আইনজীবী ও দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন তার পত্রিকায় ২৮ মার্চ ১৯৯৯ একটি লেখায় উল্লেখ করেছেন '...... নিম্ন আদালতের উপর জনগণের আস্থা যে কমিয়া গিয়াছে তাহা এখন আর না বলিয়া পারা যাইতেছে না। নিম্ন আদালতের দুর্নীতির বিস্তার নিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করা হইতেছে অনেক আলোচনা সভায়। নিম্ন আদালত স্বাধীন নয় বলিয়া এইসব কোর্ট-আদালতের বিচারকার্যে সরকারি হস্তক্ষেপের অভিযোগও হালকাভাবে দেখিবার বিষয় নয়.....।'

১৮ এপ্রিল ১৯৯৯ দৈনিক মানবজমিনে প্রকাশিত প্রতিবেদনে মিজান মালিক ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালতে প্রায় ১১শ' মামলা বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। ১৯৯৫ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন প্রণীত হওয়ার পর বিচারকার্য পরিচালনার জন্য ১৯৯৬ সালের ২৬ অক্টোবর ঢাকায় মাত্র একটি আদালত স্থাপিত হয়। এরপর থেকে ঢাকা ও এর আশপাশের থানা এবং সিএমএম কোর্টে দায়েরকৃত শিশু ও নারী নির্যাতন সংক্রান্ত মামলাগুলো বিচারের জন্য এ আদালতে পাঠানো হয়। বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৯৬ সালে মোট মামলা হয়েছে ১৮৬টি। এর মধ্যে ধর্ষণ মামলা ৪৮, নারী নির্যাতন মামলা ১৩৪ ও এসিড নিক্ষেপের মামলা হয়েছে ৪টি। এসব মামলার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র ৫১টি। ১৯৯৭ সালে সর্বমোট মামলা হয়েছে ৫৩৩টি। এর মধ্যে ধর্ষণ মামলা

www.pathagar.com

১৫৮, নারী নির্যাতন মামলা ৩৬০ এবং এসিড নিক্ষেপ মামলা ১৫টি। ১৯৯৮ সালে সর্বমোট মামলা হয়েছে ৫০৯টি। এর মধ্যে ধর্ষণ মামলা ১৬২, নারী নির্যাতন মামলা ৩৩৫ এবং এসিড নিক্ষেপের দায়ে মামলা হয়েছে ১২টি, এর মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র ৯৪টি। ১৯৯৯ সালে মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে ১৫২।

দেশের আইনের শাসনে বিভিন্ন দুর্বল দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করে দীর্ঘ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক। ১৯৯৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশিত রিপোর্টে অনেক বিষয়েই আলোকপাত করা হয়, যাতে সরকারও মোটামুটি একমত হয় কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই করেনি। রিপোর্টে দেশের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে চূড়ান্ত নেতিবাচক মূল্যায়ন করে বলা হয়, 'একটি আধুনিক ও পুরাতন আইনগত কাঠামো, দুরূহ বিচারিক পদ্ধতি, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা-মানব সম্পদের ভিত্তি, নৈতিক আদর্শের অভাব, পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যবস্থার অভাব, বিচারকদের জন্যে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সহায়তা প্রদানের অর্পযাপ্ততা, অর্পযাপ্ত ভৌত অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, উর্ধ্বতন আদালত কর্তৃক পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণের অভাব ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় মারাত্মক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখিত দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিচারের অপেক্ষায় পড়ে থাকা অসংখ্য মোকদ্দমার স্তূপে।' রিপোর্টে বাংলাদেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থার আনুপূর্বিক মূল্যায়ন করে বলা হয়, 'বাংলাদেশে বিদ্যমান অনেক আইনই শতাব্দী পুরানো। সেকেলে হয়ে যাওয়া আইন এবং দুর্বল ও অদক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা দেশের সার্বিক আধুনিকায়ন ব্যক্তিগত খাতের বিস্তৃতি, বিচারক প্রক্রিয়ায় দরিদ্র ও পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী ও মহিলাদের অভিগম্যতার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিরাজ করছে। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় বর্তমানে অন্তত পাঁচ ধরনের আদালত রয়েছে। সেগুলো হলো-(১) সুপ্রীমকোর্ট, (২) অধঃস্তন আদালত, (৩) ম্যাজিস্ট্রিসি, (৪) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও (৫) বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনাল। এগুলোর মধ্যে সর্বশেষ ধরনের আদালত নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল, পারিবারিক আদালত, শ্রম আদালত, অর্থ ঋণ আদালত, দেউলিয়া আদালত প্রভৃতি হাইকোর্টের বিভাগ ও আপীল বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত। সুপ্রীমকোর্ট দেশের সর্বোচ্চ আদালত। আপীল বিভাগে পাঁচ জন এবং হাইকোর্ট বিভাগে ৪০ জন বিচারক রয়েছেন। সুপ্রীমকোর্ট হলো বিচারের ক্ষেত্রে সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। দেশের সংবিধান অনুসারে সমস্ত অধঃস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপর হাইকোর্ট বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রয়েছে। সুপ্রীমকোর্টের অধীনে অধঃস্তন আদালত-জেলা ও দায়রা জজ আদালত, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত, সিনিয়র সহকারী জজ ও সহকারী জজ আদালত নিয়ে গঠিত। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন আদালতে প্রায় ৬ শ' জন ৬১টি জেলা আদালতে কর্মরত আছে। ৩টি পার্বত্য জেলায় কোন জজ কোর্ট নেই। তবে অদূর ভবিষ্যতে সেখানে আদালত স্থাপন-জজ নিয়োগের পরিকল্পনা সরকারের আছে। তবে বর্তমানে প্রতি ২ লাখ লোকের জন্যে একজন জজ রয়েছেন। এছাড়া প্রতিটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট রয়েছে যা নিয়ন্ত্রণ করছে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টগুলো শুধু নির্দিষ্ট সংখ্যক কম গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারী মোকদ্দমা নিষ্পিত্তি করে থাকে। সুপ্রীমকোর্টের নিজস্ব প্রশাসনিক সেটেআপ থাকলেও এর আর্থিক বরাদ্দ তথ্য বাজেটর জন্যে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে উপর নির্ভর করতে হয়। আইন মন্ত্রণালয় সমগ্র বিচার বিভাগের বাজেট তৈরি ও পরিচালনার দায়িত্বে এবং অধঃস্তন আদালত ও তার কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক কার্যাবলির তত্ত্বাবধান করে থাকে। অধঃস্তন আদালতের বিচারকদের পদোন্নতি, ছুটি মঞ্জুর ও শৃঙ্খলা সম্পর্কি বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়

www.pathagar.com

সুপ্রীমকোর্টের সাথে দায়িত্ব ভাগ করে থাকে এবং এ বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয় সুপ্রীমকোর্টের সাথে পরামর্শ করতে বাধ্য।' রিপোর্টে বলা হয়, 'বাংলাদেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থায় সামগ্রিক প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে সরকার সচেতন। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেছে সরকার। যা মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অপরিহার্যতার বিষয় স্বীকৃত হয়েছে।' আইন ও বিচার ব্যবস্থায় সংস্কার ফলপ্রসূ করতে সরকার বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতা চেয়েছে। বিশ্বব্যাংক দু'ভাবে এ আহবানে সাড়া দেয়। বিশ্বব্যাংক বলেছে, 'বাস্তবিকপক্ষে সংস্কার সম্ভব পুরনো আইন ও বিধি বিধানের আধুনিকায়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে। তাছাড়া এ বিষয়ে আরো যা করতে হবে তা হলো ব্যক্তিগত খাত, সর্বসম্মতভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রাতিষ্ঠানিককরণ এবং আদালত, প্রশাসন ও মোকদ্দমা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সহজীকরণ। আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োজনীয় দুর্বল প্রতিষ্ঠাসমূহকে শক্তিশালী করা। বিচারিক প্রক্রিয়ায় মহিলা ও সুবিধা বঞ্চিতদের অভিগম্যতার ক্ষেত্র বিস্তৃত করা।'

দেশের আইন-আদালত সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়, 'বাংলাদেশের বিচার বিভাগ এবং বিচার প্রার্থী জনগণের জন্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে বিচারের অপেক্ষায় পড়ে থাকা প্রায় ৫ লাখের উপর মোকদ্দমা।' রিপোর্টে বলা হয়, 'বাংলাদেশে একেকটি মোকদ্দমা শেষ হতে প্রায় ১৫ থেকে ২০ বছর লাগে। এর কারণ দেশের পদ্ধতিগত আইন ও মোকদ্দমা ব্যবস্থাপনার পুরাতন ধ্যান-ধারণা। এছাড়া রয়েছে আপীল ও রিভিশনের নামে হাইকোর্ট থেকে মোকদ্দমা স্থগিত রাখার বন্যা।' রিপোর্টে বলা হয়, 'সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতির ক্ষেত্রে আরও বিস্তৃত করতে হবে। এর জন্যে প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন হবে মোকদ্দমার শ্রেণী বিন্যাস পদ্ধতির প্রবর্তন। দেওয়ানী কার্যবিধিতে সুস্পষ্ট শর্তের উল্লেখ থাকতে হবে। যার মাধ্যমে সামারি জাজমেন্ট (সংক্ষিপ্ত বিচার) অথবা অন্য বিশেষ পদ্ধতির মোকদ্দমাসমূহের শ্রেণী বিভাগ করা হবে। প্রথমে নিষ্পত্তির জন্যে (ফাষ্ট ট্রাকে) কিছু মামলাকে নিয়ে আসতে হবে। শুরুতেই ব্যবস্থার প্রবর্তন করা গেলে বিচারকের মনে সংশয় সৃষ্টির কোন অবকাশ থাকবে না। বর্তমানে জমে থাকা মোকদ্দমাগুলোকে ৬টি ভাগে শ্রেণী বিন্যস্ত করা যায়। (ক) সংক্ষিপ্ত বিচারের মোকদ্দমা, (খ) ক্ষুদ্র ঘটনার মোকদ্দমা (স্মল কলেজ কেইস), (গ) বাণিজ্যিক ধরনের মোকদ্দমা, (ঘ) ব্যবহারিক বিষয়ক মোকদ্দমা, (ঙ) অন্যান্য সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তুগত ও (চ) দীর্ঘ বিষয়বস্তুগত মোকদ্দমা। বর্তমানে হাইকোর্টে প্রতিদিনের মামলার কজ লিষ্ট পদ্ধতি চালু আছে। মামলার শ্রেণী বিভাগ করা গেলে কজ লিষ্ট হবে আরো বাস্তবানুগ। এতে করে একই ধরনের মোকদ্দমাসমূহ একই তারিখে একই জজের সামনে বিচারের জন্যে নেয়া যেতে পারে। এদের মধ্যে একাধিক মোকদ্দমার বিষয়বস্তু প্রায় একই ধরনের হলে সেগুলোকে একই সময়ে শুনানি করা যেতে পারে। দেখা যাবে, একই রায় একাধিক মোকদ্দমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এই পদ্ধতিতে মোকদ্দমা সঠিক ও স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারবে। একই ভাবে পুরোনো মোকদ্দমার স্তূপকে অপসারণ করা যেতে পারে। বাংলাদেশে বর্তমানে আপীল, রেফারেন্স, রিভিউ ও রিভিশনের একটি বিস্তারিত পদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে। সাধারণতভাবে দেওয়ানী মোকদ্দমার ক্ষেত্রে মূল আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা যায়। একজন সহকারী জজের আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজের কাছে, সাব জজের আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজ বা হাইকোর্টের কাছে, জেলা জজ বা অতিরিক্ত জেলা জজের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের কাছে এবং হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে উপরোক্ত সুযোগ

www.pathagar.com

বিদ্যমান। যে কোনো আপীল আদালতের ক্ষমতা রয়েছে-(ক) কোন মোকদ্দমা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করা, (খ) মোকদ্দমা রিমান্ডে পাঠানো, (গ) ইস্যু গঠন করে বিচারের জন্যে পুনরায় প্রেরণ করা এবং (ঘ) অতিরিক্ত সাক্ষ্য নেয়ার জন্য নিম্ন আদালতকে নির্দেশ দেয়া। আপীলের এই প্রক্রিয়ায় মোকদ্দমার চূড়ান্ত বিচারে বিলম্ব ঘটে। পদ্ধতি পরীক্ষান্তে পরিবর্তন জরুরী হয়ে পড়েছে। তা না হলে সামগ্রীক দেওয়ানী বিচার পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রক্রিয়া অবরুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। বর্তমানে হাইকোর্ট বিভাগে যে প্রায় ৯০ হাজার মামলা স্তূপ তার এক-তৃতীয়াংশই রিভিশন মোকদ্দমা। আপীলের ক্ষেত্রে সমস্যা হলো সহজেই স্থগিতাদেশ পাবার। দেওয়ানী কার্যবিধির বোধগম্য শর্তের উল্লেখ আছে যা পূরণ করলেই স্থগিতাদেশ পাওয়া যায়। এমনকি শুধুমাত্র একপক্ষকে শুনেই রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত করা যায়। এর পরিবর্তন প্রয়োজন। যাতে এক পক্ষের অনুপস্থিতিতে স্থগিতাদেশ পেতে হলে অন্য পক্ষকে একটি নির্দিষ্ট অংকের অর্থ গচ্ছিত বা জমিনে রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।'

রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশে সবার আগে প্রয়োজন বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। পাশাপাশি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি করা। জনসংখ্যা অনুপাতে নিম্ন আদালতের বিচারকের সংখ্যা বাড়াতে হবে। জ্ঞানের পরিমাপের ভিত্তিতে নিয়োগ করতে হবে নতুন বিচারক। রিপোর্টে ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৩৮টি আইন কলেজে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের সুপারিশ করা হয়। রিপোর্টে বিস্তারিতভাবে বলা হয়, 'কমনওলেথ দেশসহ ভেনিজুয়েলা, গুয়তেমালা, যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে সর্বস্তরে বিচারকদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, সাময়িক বরখাস্ত, অপসারণ ও অন্যান্য শৃংখলামূলক কাজের জন্য আধুনিক, কার্যকর, স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক জবাবদিহিতামূলক প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। এসব দেশের অনুসরণে বাংলাদেশেও জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন স্থাপন করার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের প্রথম কাজ হবে বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নিশ্চিত করে জনগণের আস্থা বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয় কাজ হবে বিচারিক প্রক্রিয়ার দরিদ্র জনগোষ্ঠি, শিশু ও মহিলাদের অভিগম্যতার ক্ষেত্র বিস্তৃত ও শক্তিশালী করা। অংশগ্রহণমূলক ধ্যান-ধারণাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করা। সর্বোপরি অনৈতিক ও অবৈধ কায়-কায়বার বন্ধ করা।' বাংলাদেশের আইন শিক্ষা সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়, 'কাঙ্ক্ষিত মান রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। যে কোন পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানের মতো বিচার পদ্ধতির মান ও দক্ষতা মানব সম্পদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও সততার উপর নির্ভর করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান আইন শিক্ষা পদ্ধতি একটি যথাযথ, মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যমান আইনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মান বলতে গেলে মিশ্র ধরনের। ৪টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আইন কলেজগুলোতে আইন শিক্ষা দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদগুলো শিক্ষার মান কিছুটা বজায় রাখতে সমর্থ হলেও কলেজগুলো ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। স্থান সংকুলান, সার্বক্ষণিক সুষ্ঠু ও মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান, সাজ-সরঞ্জামের ব্যবহার, লাইব্রেরীসহ অন্যান্য ভৌত কাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা প্রদানে কলেজগুলো ব্যর্থ। অথচ ব্যাঙের ছাতার মত আইন কলেজের সংখ্যা দ্রুতই বেড়ে চলেছে। বর্তমানে এ সংখ্যা ৩৮। এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তি বেড়েই চলেছে। কারণ এখানে ভর্তি পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত আইন শিক্ষাদানের সুযোগ খুবই কম। অথচ বর্তমানকালে একজন আইনজীবীর বেঁচে থাকার জন্যে হলেও বাণিজ্যিক আইনে জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। জাতীয় ভিত্তিক কোন আদর্শ মান না থাকার কারণেই

www.pathagar.com

আইন শিক্ষায় চলছে চূড়ান্ত ব্যর্থতা। বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ অনুসারে আইন পেশার মান উন্নয়নের দায়িত্ব মূলত বার কাউন্সিলের। দুর্ভাগ্যবশত বার কাউন্সিল শিক্ষার মান এখনো নির্ধারণ করতে পারেনি। তবে এ ব্যাপারে বার কাউন্সিল নিজেদের সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা বলেছে। এ কথা সত্য যে উন্নত রায় ও আদেশ দানের ব্যাপারে বিচারকরাই দায়ী। সে জন্যে তাদেরকে নির্ভর করতে হয় আইন পেশায় নিয়োজিতদের দক্ষতার ওপর। আইন পেশায় নিয়োজিতদের পেশাগত আচরণ, সৌজন্যতা ও সচেনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোড অব ইথিকস প্রবর্তন করা প্রয়োজন। বর্তমানে বার কাউন্সিল আইনে কিছু পেশাগত আচরণ ব্যবহার ও নীতির উল্লেখ থাকলেও যথেষ্ট বা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। রিপোর্টে বলা হয়, 'সংস্কার কার্যক্রমে সবচেয়ে বেশি নজর দিতে হবে অবকাঠামোর উন্নয়নে। বর্তমানে আদালতগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব সরঞ্জামাদি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। রেকর্ডগুলো বেশিরভাগই হাতে লেখা। নিম্ন আদালতে রায় ও ডিক্রি এবং সাক্ষীর মৌখিক সাক্ষ্য হাতেই লেখা হয়। এ জন্যে কম্পিউটার ভিত্তিক মোকদ্দমা পদ্ধতি চালুর প্রয়োজন রয়েছে। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে অপর্যাপ্ত, জীর্ণ ও পুরাতন ভৌত অবকাঠামোগত অবস্থা নিম্নতর আদালতের কর্মক্ষমতাকে বহুলাংশে হ্রাস করেছে। এই আদালত কক্ষে ২-৩ জন বিচারক একত্রে বসা এখন কোন ব্যতিক্রমী বিষয় নয়। ধাপে ধাপে নিম্নতর আদালতের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের ব্যবস্থা নেয়া খুবই জরুরী। পঞ্চায়েত বা সালিস পদ্ধতি সম্পর্কে রিপোর্টের শেষভাগে বলা হয়, 'এটি হলো বাংলাদেশে সবচেয়ে পুরানো বিচার পদ্ধতি। ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে গ্রামে কোন বিরোধ দেখা দিলে তা গ্রামের লোকদের সর্বসম্মতিক্রমে ৫ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত পঞ্চায়েত বিচার করতো। পঞ্চায়েত পদ্ধতি যে খুব ভালো ছিল না তা নয়। কারণ এতে ধনী ও অফিসিয়াল পদে অধিষ্ঠিতরাই স্থান পেত। তথাপি ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে শত শত বছর ধরে এবং ব্রিটিশদের আগমনের কিছুদিন পর পর্যন্ত এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বহাল ছিল। গত ৫০ বছরে এই ব্যবস্থা অধঃপতিত হয়েছে। এই সালিস ব্যবস্থা যতটুকু বিদ্যমান আছে-তাও গ্রাম্য টাউট ও প্রভাবশালীদের হাতে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। তবু গ্রামবাসী, দরিদ্র মানুষ সালিসের সম্মুখীন হচ্ছে। কারণ তাদের সামনে ভালো বিকল্প নেই। থানা-পুলিশ কোর্টে যে টাকা-পয়সা প্রয়োজন তা তাদের নেই এবং আদালতকে তারা ভয় করে। (সূত্রঃ দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা ৪-৭ মে ১৯৯৯)

১৫ জুন ১৯৯৯ দৈনিক ভোরের কাগজে প্রকাশিত সংবাদ '১৪ হাজার সাজাপ্রাপ্ত আসামীর গ্রেফতারী পরোয়ানা ফাইল বন্দী।' পুলিশ রেগুলেশনের ৪৬৯ ধারামতে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারির সময় ম্যাজিস্ট্রেটগণ একটি নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করে দেবেন, যে তারিখের মধ্যে পুলিশ পরোয়ানা ফেরত দেবে কিংবা জানাবে যে পরোয়ানা কার্যকরী করা হয়নি। কিন্তু বর্তমানে জারিকৃত পরোয়ানায় কোন তারিখ উল্লেখ করে দেয়া হয় না। বিচারকরা গ্রেফতারী পরোয়ানায় স্বাক্ষর করলেও পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগ আসামীদের সঙ্গে যোগসাজশ করে থানায় না পাঠিয়ে ফাইলবন্দী করে রাখে। ফলে বিভিন্ন মেয়াদের সাজা প্রাপ্তরাও নির্দ্বিধায় প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায়। এভাবে চলেছে বছরের পর বছর। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) বিভিন্ন থানায় মে ১৯৯৯ পর্যন্ত মাসের শুরুতে মূলতবী ওয়ারেন্ট ছিল ৮৮৬টি, নতুন ওয়ারেন্ট জারি হয় ২৯৭টি, তামিল হয় ০টি, মাস শেষে মূলতবী ওয়ারেন্টের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৮৩টি। চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের (সিএমপি) বিভিন্ন থানায় মাসের শুরুতে ১১৫টি, নতুন ১টি, তামিল ১টি, মোট সংখ্যা ১১৪টি। খুলনা মহানগর পুলিশের (আরএমপি) বিভিন্ন থানায় মাসের শুরুতে

www.pathagar.com

৬৩টি, নতুন ১টি, তামিল ২টি, মোট সংখ্যা ৬২টি। ঢাকা রেঞ্জে মাসের শুরুতে ২৬৫টি, নতুন ১৮৪টি, তামিল ১০৪টি, মোট ২৭৩৮টি। চট্টগ্রাম রেঞ্জে মাসের শুরুতে ৩৯৯১টি, নতুন ৬৪টি, তামিল ৬৯টি, মোট ৩৬৮৬টি। সিলেট রেঞ্জে মাসের শুরুতে ১৩৩৯টি, নতুন ৪৯টি, তামিল ৩৭টি, মোট ১৩৫১টি। খুলনা রেঞ্জে মাসের শুরুতে ১৩৬৫টি, নতুন ৪৫টি, তামিল ৩৬টি, মোট ১৩৭৪টি। বরিশাল রেঞ্জে মাসের শুরুতে ১২৯০টি, নতুন ২৫টি, তামিল ১৭টি; মোট ১২৯৮টি। রাজশাহী রেঞ্জে মাসের শুরুতে ১৬৮৯টি, নতুন ৫৬টি, তামিল ৯৩টি, মোট ১৬৫২টি।

১৮ জুন দৈনিক মানবজমিনে অম্লান দেওয়ানের প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী দেখা গেছে, দেশের বিভিন্ন স্তরের আদালতে প্রায় ৭ লাখ মামলা বিচারাধীন। এর মধ্যে আপীল বিভাগে ২ হাজার, হাইকোর্ট বিভাগে ৯০ হাজার, জজ আদালতে ৪ লাখ এবং অন্যান্য আদালতে প্রায় তিন লাখ মামলা বিচারের অপেক্ষায় ফাইলবন্দী হয়ে আছে।

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) 'দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ১৯৯৯-এ শাসন ব্যবস্থার সংকট' শীর্ষক বিষয়ে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার করুন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক জজের নিকট এতো বেশি মামলা দক্ষিণ এশিয়ার কোন দেশে নেই। ভারতে প্রত্যেক জজের হাতে মামলা রয়েছে ২ হাজার ১শ' ৩৭টি। পাকিস্তানে ৪শ' ৫৪টি, নেপালে ৩শ' ১৪টি।

২৬ জানুয়ারি ২০০০ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট-এর খাস কামরায় কোর্ট রিপোর্টার্স এসোসিয়েশনের সদস্যদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে ঢাকার চীপ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কে এম আব্দুল্লাহ আদালতের বিচার ব্যবস্থা ও পারিপার্শ্বিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে অনেক কথা বলেন। মত বিনিময় সভায় অন্যান্য ম্যাজিস্ট্রেটদের উপস্থিতিতে তিনি বলেন, সিএমএম আদালতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। প্রয়োজনীয় জনবল, ম্যাজিস্ট্রেট, এজলাস ও পরিবেশ না থাকায় বিচার কাজ স্থবির হয়ে পড়ছে। মামলার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সন্ত্রাসীদের পদচারণায় আদালত অঙ্গনে ভীতিকর অবস্থা বিরাজ করছে। তিনি ২২ জন ম্যাজিস্ট্রেটের যাতায়াতের জন্য মাত্র ২টি গাড়ি থাকার কথা উল্লেখ করে বলেন, এতে করে বিভিন্ন স্থান থেকে নির্ধারিত সময়ে আদালতে আসা প্রায় অসম্ভব। ম্যাজিস্ট্রেটদের সরকারি কোনো বাসভবন নেই। ফলে শহরের যে কোন স্থানে ভাড়া বাড়িতে নিরাপত্তাহীনতার মাঝে থাকতে হয়। তিনি বলেন, একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়। মামলার নিস্পত্তি ছাড়াও সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করা, টিআইসি সম্পন্ন করাসহ অনেক কাজ তাদের করতে হয়। এদের জন্য নেই কোন আড়দালি বা ষ্টেনোগ্রাফার। যদিও সমপর্যায়ের অফিসার সাব জজদের তা রয়েছে। সারাদেশে প্রায় ৪ লাখ ফৌজদারী মামলা বিচারাধীন রয়েছে এবং তা নিস্পত্তির জন্য ৬শ' জন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োজিত রয়েছেন। এদের মধ্যে শুধুমাত্র ঢাকা মহানগরীতে ৬৮ হাজার মামলা নিস্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। এগুলো নিস্পত্তির দায়িত্বে রয়েছেন মাত্র ২২ জন ম্যাজিস্ট্রেট। এর মধ্যে বর্তমানে ৬ জন ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ খালি রয়েছে। মাত্র ১৬ জন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে বর্তমানে সিএমএম আদালত চালানো হচ্ছে। সরকারে নীতিমালা অনুযায়ী ১ জন ম্যাজিস্ট্রেট বছরে ১৫০টি মামলা নিস্পত্তি করবেন। সে ক্ষেত্রে সিএমএম আদালতের প্রতিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে মামলা রয়েছে ২ হাজার। একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের পক্ষে এত মামলা নিস্পত্তি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। মহানগরীর বিচারাধীন মামলা

www.pathagar.com

নিষ্পত্তির জন্য কমপক্ষে ৮০ জন ম্যাজিস্ট্রেট অতিসত্বর নিয়োগ দেয়া আবশ্যক। সিএমএম আদালত থেকে বছরে দেড় কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়ে থাকে। এর একটা অংশ এই খাতে ব্যয় করলে সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচার দ্রুত করা সম্ভব। সিএমএম আদালতে বর্তমানে হাজারো সমস্যার আবর্তে রয়েছে। এখানে মালখানা অপ্রতুল। ফলে মামলার আলামত যথাসময়ে খুঁজে পাওয়া না যাওয়ায় আসামীরা খালাস পাচ্ছে। এখানে একই এজলাসে ২ জন ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ক্রমে বসেন, নেই কোনো পায়খানা, প্রশ্রাবখানা, এছাড়া রেকর্ড রুম এবং জিআর রুমেরও সমস্যা রয়েছে। কোর্ট হাজত থানায় আসামীদের মানবেতরভাবে কাটাতে হয়। মাত্র ৪২ জনের নির্ধারিত স্থানে মাঝে মাঝে ৫-৬শ' আসামী পর্যন্ত রাখা হয়। ফলে যে কোন সময় অনেক আসামী অসুস্থ হয়ে পড়ে। আলোচনার এক পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেট আনিস উদ্দিন মঞ্জুর বলেন, মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইন মোতাবেক পলাতক আসামীদের আদালতে হাজির হওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি দিতে হয়। বহুল প্রচারিত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়ার বিধান থাকলেও এ খাতে বাজেট এত কম যাতে করে প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া সম্ভব হয় না। ফলে অখ্যাত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয় তার প্রচার সংখ্যা এতই কম যাতে আসামীদের নজরে আসে কিনা সন্দেহ। তিনি আরো বলেন, কারাগার থেকে আসামী বহনকারী প্রিজনভ্যান মাত্র দু'টি। বহুলসংখ্যক আসামী যথাসময়ে আদালতে হাজির করা সম্ভব হয় না। এর কারণে বিচার কাজে বিঘ্ন ঘটে। সভায় সিএমএ কে এম আব্দুল্লাহ বলেন, পুলিশ কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে পাঠান। প্রশাসনিক ও সঙ্গত কারণে আদালতকে রিমান্ড দিতে হয়। তিনি বলেন, পৃথিবীর আর কোন সভ্য দেশে আমাদের দেশের মতো রিমান্ডের অপব্যবহার করা হচ্ছে না। পুলিশ ইচ্ছা করলে থানা থেকেও ৫৪ ধারায় গ্রেফতারকৃত আসামীকে জামিনে মুক্তি দিতে পারেন। তিনি এহেন অব্যবস্থা ও অমানবিকতার অবসান কামনা করেন। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ২৫ জানুয়ারি ২০০০)

কুমিল্লার মুরাদনগর থানার সহকারী জজ মুকুল আহছানের বিরুদ্ধে কুমিল্লা বারের আইনজীবীগণ অসদাচরণ, কটুক্তি, সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই ৪৭টি মামলা খারিজ ইত্যাদির অভিযোগ এনে ১৯৯৯ সালের আগষ্ট থেকে আদালত বর্জনের কারণে সহস্রাধিক মামলা ঝুলে থাকার তথ্য দিয়েছে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০০০ এর দৈনিক প্রথম আলো।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর শেখ মুজিব হত্যা মামলার বিচার শুরু হয়। ১৯৯৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর মামলাটি দায়ের করা হয়। সিআইডি মামলার তদন্ত শেষে ১৯৯৭ সালের ১৫ জানুয়ারি আদালতে চার্জশীট দাখিল করে। ১ মার্চ আদালতে চার্জ গঠন করা হয়। ৬ এপ্রিল মামলার বিচার শুরু হয়। মোট ১৫১ টি কার্যদিবসে শুনানি চলে। ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল প্রায় দু'বছর শুনানির পর ১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর মামলাটির রায় প্রদান করেন। রায়ে ১৫ জন সাবেক সেনা সদস্যদের মৃত্যুদন্ডের রায় ঘোষণা করা হয়। রায়ের সময় আসামীদের মধ্যে কর্ণেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমান, লে. কর্ণেল (অব.) সুলতান শাহরিয়ার রশীদ খান ও লে. কর্ণেল (অব.) মহিউদ্দিন আহমেদ (আর্টলারি) আদালতে উপস্থিত ছিলেন। নিম্ন আদালতে যে দিন মামলার রায় ঘোষণা করা হয় সেদিনই মামলার অন্যতম আসামী মেজর (অব.) বজলুল হুদাকে ব্যাংকক থেকে ঢাকায় এনে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। মামলার অপর ১১ জন আসামী হলেন-লে. কর্ণেল (অব.) খন্দকার আবদুর রশীদ, লেঃ কর্ণেল (অব.) এসএইচ এম বি নূর চৌধুরী, লে. কর্ণেল (অব.) কিসমত হাসেম, ক্যাপ্টেন

www.pathagar.com

(অব.) আবদুল মাজেদ, লে. কর্নেল (অব.) আবদুল আজিজ পাশা, রিসালদার (অব.) মুসলেম উদ্দীন, মেজর (অব.) একেএম মহিউদ্দিন, মেজর (অব.) একেএম মহিউদ্দিন আহমেদ (ল্যান্সার) ও মেজর (অব.) আহমদ শরিফুল হোসেন।

রায়ে বলা হয়, 'একটি ফায়ারিং স্কোয়াডে প্রকাশ্যে তাহাদের প্রত্যেকের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার নির্দেশ হইলো। নির্দেশ মোতাবেক তাহাদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করিতে কর্তৃপক্ষের কোনো অসুবিধার কারণ থাকিলে তাহাদের মৃত্যুদন্ড প্রচলিত নিয়ম অনুসারে ফাঁসিতে ঝুলাইয়া কার্যকর করার নির্দেশ রইলো।'

বাংলাদেশের জেলকোড বা সিভিলিয়ান ক্রিমিনাল কোডে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার কোনো বিধান নেই তাই নিম্ন আদালতের রায় নিয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রশ্ন তুলে নানা রকম বিতর্কিত মতামত প্রকাশিত হয়। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। প্রখ্যাত লেখক ফরহাদ মজহার এ সম্পর্কে লিখেন, 'সমগ্র বিচার বিভাগের পক্ষে উচ্চ আদালতকে এখন নিজের ন্যায্যতা প্রতিপাদনের জন্য প্রমাণ করতে হবে নিম্ন আদালতে রায় যাই হোক না কেন বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা প্রতিহিংসা এবং বিচারের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম। দেখাতে হবে যে আদালত বাদী বা বিবাদী কোনো পক্ষেরই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে না।' (সূত্রঃ সাপ্তাহিক পূর্ণিমা ২৬ এপ্রিল ২০০০)

এই মৃত্যুদণ্ডাদেশ অনুমোদনের জন্য হাইকোর্টে পাঠানো হয়। আসামীদের বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতে মৃত্যুদন্ডাদেশ দেয়ার পর গ্রেফতারকৃত ৫ আসামীর পক্ষে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা হয়। ১৬ জানুয়ারি ২০০০ তারিখে বিচারপতি কাজী এবাদুল হক ও বিচারপতি মকবুল হোসেনের বেঞ্চে সরকারের পক্ষ থেকে মৃত্যুদন্ড কার্য করার লক্ষ্যে ডেথ রেফারেন্সের শুনানির দিন ধার্য করার জন্য প্রথম আবেদন জানানো হয়। ঐ বেঞ্চ বিব্রতবোধ করে নির্ধারিত বেঞ্চে আবেদনের পরামর্শ দেন। ৬ ফেব্রুয়ারি সরকার পক্ষ বিচারপতি এমএম রুহুল আমিন ও বিচারপতি মোঃ আবদুল মতিন সমন্বয়ে গঠিত ডেথ রেফারেন্সের জন্য হাইকোর্টের নির্ধারিত বেঞ্চে শুনানি শুরু করার তারিখ ধার্যের জন্য আবেদন জানায়। আদালত আবেদনের প্রেক্ষিতে জানান, '১৯৯৬ সালের ডেথ রেফারেন্স সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলছে। মুজিব হত্যা মামলার ডেথ রেফারেন্স ১৯৯৮ সালের ৩০ নম্বর ক্রমিক রয়েছে। এ বিষয়ে শুনানি রীতি অনুযায়ী হবে। আদালত এ বিষয়ে ব্যতিক্রম কিছু করবে না।' প্রয়োজনে মামলাটি প্রধান বিচারপতির নিকট পাঠানো যেতে পারে বলে আদালত মন্তব্য করেন। একইদিনে বিচারপতি রুহুল আমিন ও এস কে সিনহা বেঞ্চে মামলাটি হস্তান্তরিত হলে একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। পরের দিন ৭ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি নুরুল ইসলাম ও বিচারপতি মোনতাজ উদ্দীন আহমেদ বেঞ্চ পূর্বের বেঞ্চগুলোর সাথে একমত হন। ১০ এপ্রিল হাইকোর্টের কয়েকটি বেঞ্চে শেখ মুজিব হত্যা মামলার ডেথ রেফারেন্স সংক্রান্ত শুনানি শুরুর প্রস্তুতি পর্বে তাৎক্ষণিক পদ্ধতিতে জটিলতা দেখা দেয়ায় হাইকোর্টের আরেকটি বেঞ্চের বিচারক বিচারপতি আমীরুল কবীর ও বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুল আজিজ বিব্রতবোধ করেন। বিচারপতিদ্বয় বিব্রত হওয়ায় এর শুনানীর তারিখ নির্ধারণে অপারগতা প্রকাশ করেন। ঐ বেঞ্চ মামলাটির পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান বিচারপতির নিকট যাবতীয় নথিপত্র প্রেরণের নির্দেশ দেন। ১০ এপ্রিল পর্যন্ত হাইকোর্টের ৫ টি বেঞ্চ ডেথ রেফারেন্সের শুনানিতে হয় অপারগ অথবা বিব্রত হওয়ার কথা জানান। এই ডেথ রেফারেন্সের শুনানিতে বিচারকদের বিব্রত হওয়া অথবা অপারগ হওয়ার সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে মামলা জট, সিরিয়াল ভঙ্গ করে বিধিবহির্ভূতরূপে মামলা উপস্থাপন এবং

www.pathagar.com

বাইরের চাপের কথা উল্লেখ করা হয়। বিচারকদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। তবে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী ও সুপ্রীমকোর্ট বার এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, সম্পূর্ণ আইনানুগভাবেই কোনো বিচারক কোনো মামলার শুনানির ক্ষেত্রে অপারগ অথবা বিব্রত হওয়ার কথা জানাতে পারেন।

মোট ৫টি আদালত মামলা শুনানীতে অস্বীকৃতি জানানোর প্রেক্ষিতে শুরু হয় আওয়ামী লীগের বিচারক শুদ্ধি অভিযান। ১৩ এপ্রিল পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের হরতাল বিরোধী জনসভায় ভারপ্রাপ্ত সভানেত্রী এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী বলেন, 'ন্যায়বিচার করতে যে বিচারকরা বিব্রতবোধ করেন তাদের আদালতের পবিত্র ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। বাংলার কোনো আদালতে বিচার না হলে জনতার আদালতে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচার হবে।' তিনি বলেন, 'আজ বিচারকরা বিব্রতবোধ করেন, কিন্তু ১৪ জন মুক্তিযোদ্ধার ফাঁসি দেয়ার সময় তারা বিব্রত হননি। তখন একদিনের সময় চেয়েও পাইনি। বিচারকরা বিব্রত হলে আমরা কার কাছে যাবো।' তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন না হলে বিচারকরা আজ কোথায় থাকতেন।' ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেন, 'এতোদিনে বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের ফাঁসি হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সময় নষ্ট করে খুনীদের বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।' মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি রিয়াজউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় ২৯ জন বক্তা অনুরূপ বক্তব্য রাখেন। আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুকুল বোস বলেন, 'গোলাম আজমের নাগরিকত্ব দিতে বিচারকরা বিব্রত হন না, কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচারে করতে বিব্রত হন। এটা লজ্জার বিষয়।' তিনি বলেন, 'প্রয়োজন হলে জনগণকে নিয়ে বিচারকদের বাড়ি ঘেরাও করা হবে।' আওয়ামী লীগের সহ-দফতর সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকুর রউফ খান বলেন, 'কাদের ধমকে বিচারকরা বিব্রত হন জনগণ তা জানতে চায়।' আওয়ামী যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট কাজী ইকবাল বলেন, 'বিচার করতে যে বিচারকরা বিব্রত হন, দায়িত্বে অবহেলার জন্য তাদের বিরুদ্ধেই আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা হবে।' মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ন-সম্পাদক ও পিপি এডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন, 'বিচার করতে যারা বিব্রত হন, বিচারকের আসনে তাদের বসার কোনো অধিকার নেই।'

১৭ এপ্রিল ২০০০ মুজিবনগর দিবস পালন উপলক্ষে বিকেলে মহানগর নাট্যমঞ্চে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিব হত্যা মামলার ডেথ রেফারেন্সের শুনানী গ্রহণে বিব্রত হাইকোর্টের বিচারপতিদের পুনরায় তীব্র সমালোচনা করেন। ঢাকার মেয়র ও মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি মোহাম্মদ হানিফের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় দলের ভারপ্রাপ্ত সভানেত্রী, বন ও পরিবেশমন্ত্রী সাজেদা চৌধুরী বলেন, সংবিধানের উর্ধ্বে কেউ নয়। হাইকোর্টের বিচারপতিরা গোলাম আজমের নাগরিকত্ব প্রদানে বিব্রতবোধ করেনি। অথচ বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারে বিব্রতবোধ করছেন কেন তার ব্যাখ্যা নেই। হাইকোর্টের মাধ্যমে রাজাকাররা বেরিয়ে যাবে, সন্ত্রাসীরা মুক্তি পাবে আর বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচার হবে না তা হতে পারে না। তারা বিব্রতবোধ করলে চলবে না। আমাদের কনটেম্পটের ভয় দেখাবে না। কনটেম্পটের ভয়ে আমরা মুখ বুঝে থাকব তা হতে পারে না। আমরা এর প্রতিবাদ করব। জেলে যেতে আমরা প্রস্তুত। তিনি প্রেসিডেন্ট ও প্রধান বিচারপতির প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, যারা বিব্রতবোধ করছেন, তাদের ওখান থেকে

www.pathagar.com

বিদায় করে দিন। যারা ন্যায়বিচার করবে, তাদের বসান। তিনি বলেন, বিচারে সময়ক্ষেপণ করা হচ্ছে। অন্যদিকে কিলাররা টাকা পাঠাচ্ছে তাদের মুক্তির জন্য আন্দোলন করতে। আমরা বিচার চাই। যতদিন না বিচার হবে আমরা থেমে থাকব না। জনগণই সবচেয়ে বড় শক্তি। আমরা জনগণকে নিয়ে আন্দোলনকে করব।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ বলেন, স্বাধীন দেশে চক্রান্তকারী ও ষড়যন্ত্রকারীরা আবার ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। আমাদের একটাই কথা, বিচার করতে হবে। যারা বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের বিরোধিতা করবে, তাদেরও বিচার করতে হবে। বিচারের বিরুদ্ধে যেই দাঁড়াবে, জনগণ তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। সে মন্ত্রী হোক, বিরোধী দলের নেতা হোক বা অন্য যাই হোক। তিনি বিচারপতিদের উদ্দেশ্যে বলেন, গোলাম আযমের নাগরিকত্বের সময় বিব্রতবোধ করেননি কেন? কারণ পরিচয় এক জায়গায়। শেখ হাসিনা সুপ্রীমকোর্ট হাইকোর্ট মানেন বলেই কি তাকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছেন? বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে সেই জনতা। জনগণ দেখতে চায় কে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করতে চায় না। তিনি দেশ ও আইনকে বাঁচাতে এগিয়ে আসার জন্য শিক্ষিত সমাজের প্রতি আহবান জানান।

শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমদ বলেন, বিচার বিভাগের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু এমন কোন পরিস্থিতি বা পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি যে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচারে আদালত বিব্রতবোধ করতে পারেন। কেউ কি আদালতকে ভয় দেখিয়েছে যে, তারা বিব্রতবোধ করছেন?

ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর বলেন, যারা বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারে বিব্রতবোধ করেন, তারা জাতিকে অপমাণিত করেছেন। তাদের বাংলাদেশে অন্ন গ্রহণের নৈতিক অধিকার নেই। জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যে কর্তৃপক্ষ বিব্রতবোধ করেন বা জনস্বার্থে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না তিনি সংবিধান লংঘন করেন। তাকে সংবিধান স্বীকৃত কোন পদে থাকতে দেয়া যায় না। তিনি বলেন, আমার বলতে ঘৃণা হয়, যারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কাজ করেছে, তাদের নাগরিকত্ব দিতে যারা বিব্রতবোধ করেননি, বন্দুকের নলে দখল করা ক্ষমতা জায়েজ করতে যারা বিব্রতবোধ করেননি, তারা বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারে বিব্রতবোধ করেন। এরা ঘৃণারপাত্র। এর মাধ্যমে সুপ্রীমকোর্টের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষতি করা হচ্ছে। এখনই সময় ব্যবস্থা নেয়ার।

নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বলেন, যতক্ষণ না বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকর হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। খুনীদের রক্ষার জন্য ষড়যন্ত্র চলছে। আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না। যেখানেই ষড়যন্ত্র, সেখানেই আঘাত হানতে হবে।

বক্তব্য রাখেন, খাদ্যমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় নেতা মোজাফফর হোসেন পল্টু, কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবদুল মান্নান, আইন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট শাহারা খাতুন, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মুকুল বোস, সহ-দপ্তর সম্পাদক সিদ্দিকুর রউফ খান, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হাবিবুর রহমান খান, হাবিবুর রহমান মোল্লা এমপি, মকবুল হোসেন এমপি, আহসান উল্লাহ মাস্টার এমপি প্রমুখ।

একই দিনে সন্ধ্যায় শেখ মুজিবের হত্যার রায় অবিলম্বে কার্যকর করার দাবীতে বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ রাজধানীতে মশাল মিছিল করে তা নূর হোসেন স্কয়ার, পল্টন মোড়, তোপখানা রোড হয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবে গিয়ে শেষ হয়। মিছিল শুরুর আগে স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক আলহাজ্ব মকবুল হোসেন

www.pathagar.com

এমপির সভাপতিত্বে এ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং স্বরাষ্ট্র ও ডাক টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোঃ নাসিম। মন্ত্রী অবিলম্বে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের ফাঁসির রায় কার্যকর করে আইনের শাসন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দেশ ও জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উচ্চ আদালতের সম্মানিত বিচারকদের প্রতি আহ্বান জানান।

১৮ এপ্রিল ২০০০ সরকারের মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের নেতারা আবার বিচার বিভাগ ও বিচারকদের কটাক্ষ করে বক্তৃতা দেন। শেখ মুজিব হত্যাকান্ডে অভিযুক্তদের ফাঁসি কার্যকর করার দাবীতে দলীয় প্রতিবাদ সমাবেশে তারা ২০০০ সালের মধ্যে অভিযুক্তদের ফাঁসি দেয়ার প্রত্যয় ঘোষণা করে বলেন, যে বিচারকরা বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বিচার করতে বিব্রতবোধ করে- জাতি তাদের বিচারক হিসেবে দেখতে চায় না।

পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন থানা ও ওয়ার্ড থেকে দলীয় নেতা-কর্মীরা গজারী ও বাঁশের লাঠি উঁচিয়ে এবং মাথা- গলায় কাফনের কাপড় বেঁধে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জড়ো হয়। শহীদ মিনারে সমবেত নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় আওয়ামী লীগের সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী বলেন, যে বিচারপতিরা বিবেকের কাছে দায়ী নয় এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষাকায় মূল্যায়ন করে না তাদের দেখতে চাই না। তিনি হুংকার দিয়ে বলেন, বিচারকরা কোন মানসিকতা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের ফাঁসি দিতে বিব্রতবোধ করছেন, জাতি তা জানতে চায়। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতায় মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে খুনীদের ছেড়ে দেয়ার মানসিকতা থেকেই কৌশলে বিচার প্রক্রিয়ায় বিলম্ব করা হচ্ছে। আমরা সে সুযোগ দেব না। ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতা মোজাফ্ফর হোসেন পল্টু, প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, আব্দুল মান্নান, মুকুল বোস, কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, হাবিবুর রহমান মোল্লা এমপি প্রমুখ সমাবেশে বক্তৃতা করেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই ২০০০ সালের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর খুনীদের ফাঁসি কার্যকর করা হবে। কেউ ঠেকাতে পারবে না। মেয়র মোহাম্মদ হানিফ বলেন, খুনীদের ফাঁসির দাবিতে কাফনের কাপড় পরেছি। দাবি আদায় না করে ঘরে ফিরব না। সমাবেশের পর লাঠি ও সাদা কাপড় জড়িয়ে লাঠিমিছিল পল্টন, ফকিরাপুল, দৈনিক বাংলা, তোপখানা রোড ঘুরে শহীদ মিনারে ফিরে আসে। শাসক দলের এই কর্মসূচি উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিপুল পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বেলা ৩টা থেকে পুলিশ হাইকোর্টের মূল গেট বন্ধ করে দিলে ভেতরে বিচারক, আইনজীবী নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ জিম্মি হয়ে পড়ে। সন্ধ্যার পূর্বে হাইকোর্টের গেট খুলে দিলে জিম্মিদশা থেকে বিচারক ও আইনজীবীরা মুক্তি পান।

১৮ এপ্রিল ২০০০ মিন্টো রোডে বিরোধী দলীয় নেত্রীর সরকারি বাসভবনে চার দলের লিয়াজোঁ কমিটির সভায় দেশের সর্বোচ্চ আদালত সম্পর্কে শাসকদলীয় নেতৃবৃন্দের বেআইনী ও বর্বর মন্তব্য এবং কর্মকান্ডের তীব্র নিন্দা জানানো হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএনপি নেতা এম শামসুল ইসলাম এমপি। অন্যান্যদের মধ্যে বিএনপি নেতা আনোয়ার জাহিদ, জাতীয় পার্টির এবিএম গোলাম মোস্তফা ও মোস্তফা জামাল হায়দার, জামায়াতে ইসলামীর আব্দুল কাদের মোল্লা, এটিএম আজহারুল ইসলাম ও এডভোকেট শেখ আনছার আলী এবং ইসলামী ঐক্যজোটের মুফতি ফজলুল হক আমিনী এবং এ আর এম আব্দুল মতিন উপস্থিত ছিলেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, 'আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, গত

www.pathagar.com

কয়েকদিন ধরে শেখ মুজিব হত্যার বিচারকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের কয়েকজন মন্ত্রী, নেতা ও তাদের সমর্থক বুদ্ধিজীবী হাইকোর্টের বিজ্ঞ বিচারপতিদের সম্পর্কে যেসব কুৎসিত মন্তব্য ও নির্লজ্জ আস্ফালন করেছেন-তা দেশ থেকে চিরতরে আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে টুঁটি চেপে হত্যা করারই শামিল। প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ ও সামরিক বাহিনীসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে চরমভাবে দলীয়করণ করে এক ভয়াবহ নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির পর আওয়ামী শাসকরা দেশের অসহায় মানুষদের শেষ আশ্রয়স্থল উচ্চতর আদালতকেও আজ্ঞাবহ ও ধামাধরায় পরিণত করার বর্বর আস্ফালনে মেতে উঠেছে। দেশের উচ্চ আদালতের প্রতি ক্রোধ প্রকাশের ঘটনা মুজিব হত্যার বিচারের প্রসঙ্গ উচ্চতর আদালতে উপস্থিত হবার অনেক পূর্ব থেকেই শুরু হয়েছে। হাইকোর্ট কর্তৃক বিচারাধীন অভিযুক্তদের আইনের পরিসীমার মধ্যে জামিন মঞ্জুর সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর বল্গাহীন ও আপত্তিকর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রীমকোর্টের ফুলবেঞ্চ কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীকে ভর্ৎসনা ও হুশিয়ারী প্রদান সত্ত্বেও শাসকগোষ্ঠী উচ্চতর আদালতের প্রতি চরম অসৌজন্য প্রকাশে বিরত থাকেনি। বস্তি উচ্ছেদ সংক্রান্ত রীট মামলাকে কেন্দ্র করে হাইকোর্টের বিব্রতবোধকারী বিচারপতিদের প্রতি আদালতের পবিত্র ঘর ছেড়ে চলে যাবার জন্য ১৩ এপ্রিল আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভানেত্রী এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রী বেগম সাজেদা চৌধুরী যে হুমকি এবং মামলার রায় কার্যকর করার যে ডাক দিয়েছেন-তা কেবল একটি অসভ্য-বর্বর ও জংলী সমাজেই সম্ভব। বেগম সাজেদা চৌধুরীর এই অসভ্য উক্তির ধারাবাহিকতায় অন্য আওয়ামী নেতারা বিচারপতিদের বাসভবন ঘেরাওয়ের হুমকিও দিয়েছেন। এসবের উদ্দেশ্য একটি বিচারের গতিকে চোখ রাঙিয়ে, ভয় দেখিয়ে বিচারপতিদের নতজানু করে নিজেদের খেয়াল খুশিমতো প্রভাবিত করা। আওয়ামী সরকারের ৬ জন মন্ত্রী মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে মহানগর নাট্যমঞ্চে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় আরও যেসব উক্তি করেছেন-তা দেশ থেকে বিচার বিভাগকে উচ্ছেদেরই অশনি সংকেত দেয়। তারা বিচারকদের জনতার আদালতে বিচারের হুমকি দিয়েছেন এবং বিচারকদের অপসারণের দাবী জানিয়েছেন। এছাড়া লাঠি ও কাফনের কাপড় নিয়ে ১৮ এপ্রিল মিছিল করেছেন। এই কাফনের কাপড় কি উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা? বিজ্ঞ বিচারকদের জীবননাশ করে জানাজা পড়ার উদ্যোগ কিনা সেটাই আজ জনমনে বিশাল প্রশ্ন। শেখ মুজিব হত্যা মামলা দেশের আইন ও সংবিধানের অধীনে একটি সাধারণ হত্যা মামলা মাত্র। মামলার বাদী মামলাটি সেভাবেই বিচারের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন। আইনের চোখে রাজা ও প্রজা, শাসক ও শাসিত সবাই সমান। ব্যক্তির সাধ ও মর্যাদার কারণে এর ব্যত্যয় ঘটার কোনো অবকাশ একটি গণতান্ত্রিক দেশে থাকতে পারে না। বিজ্ঞ বিচারপতিগণ প্রথা ও নিয়ম ভঙ্গ করে কিছুই করতে পারেন না। একমাত্র আইনের বিধান ছাড়া অন্য কিছুই বিচারপতিদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। আমরা মনে করি আমাদের উচ্চ আদালতের বিজ্ঞ বিচারপতিরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেই তাদের দায়িত্ব সম্পাদন করে চলেছেন। কিন্তু আওয়ামী নেতারা ফরাসী স্বেচ্ছাচারী রাজা ষোড়শ লুই-এর মতো মনে করেন তারাই রাষ্ট্র, তাদের কথাই আইন। আমরা এই বর্বরতার প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি। আমরা মনে করি, উচ্চতর আদালতের স্বাধীনতাকে খর্ব করার সকল প্রয়াস আইনের স্বাভাবিক গতিতে ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমরা আরও মনে করি, বিজ্ঞ বিচারপতিরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আদালতকে এসব হুমকি ও অবজ্ঞা প্রদর্শনের বেআইনী তৎপরতাকে আইনানুগ বিচারের প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসবেন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের উদ্যোগে আয়োজিত দু'দিনব্যাপী আইনজীবী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণদানকালে ২১ এপ্রিল ২০০০ প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আসামীরা হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন নিয়ে চলে গেলে মামলাটি পরে ডিপফ্রীজে চলে যায়। হত্যাকান্ড ঘটিয়ে কেউ যদি স্বীকার করে, তারপরও বিচার হয় না। দুই দশক ধরে খুনীদের প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে এবং খুনীদের রাষ্ট্রদূত বানানো হয়েছে। রাষ্ট্রদূতদের যোগ্যতা হচ্ছে খুনী। এ খুনীদের বিচার না হলে এ সমাজ থেকে খুন-সন্ত্রাস কোনো দিন যাবে না। সন্ত্রাসীরা যাতে জামিন না পায় সেদিকে বিচারকদের লক্ষ্য রাখা দরকার।' বার কাউন্সিলের সভাপতি এটর্নী জেনারেল মাহমুদুল ইসলাম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অন্যান্যের মধ্যে প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান, আইনমন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু, বার কাউন্সিল সদস্য আব্দুস সালাম তালুকদার ও শুধাংশু শেখর হাওলাদার বক্তৃতা করেন।

প্রধান বিচারপতি বিদেশ থেকে ফিরে ২০ এপ্রিল শেখ মুজিব হত্যা মামলার ডেথ রেফারেন্স শুনানির বিষয়টি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করতে বিচারপতি এমএম রুহুল আমিন এবং আব্দুল মতিন সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চকে দায়িত্ব দেন। ঐ বেঞ্চ নথিটি পাবার সঙ্গে সঙ্গে মামলা পরিচালনায় বিব্রতবোধ করে নথিতে নোট দেন। বেঞ্চ অনানুষ্ঠানিকভাবেই নোটাংশসহ নথিটি পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠান। ঐ নথি পাবার পর প্রধান বিচারপতি সংশ্লিষ্ট বেঞ্চের সঙ্গে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। বেঞ্চ পূর্ব সিদ্ধান্তে অনড় অবস্থান নেয়। প্রধান বিচারপতি ঐ রাতেই বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিচারপতিদের অনড় সিদ্ধান্তে সৃষ্ট পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটাতে প্রধান বিচারপতি প্রচেষ্টা চালান। দায়িত্ব অর্পণের বিষয়টি সুপ্রীমকোর্ট থেকে ঘোষণা দেয়ায় প্রকাশ্য আদালত থেকে এর প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করায় বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ বিবেচনায় এনে মামলাটি ২৩ এপ্রিল কার্যক্রমে আদেশের জন্য তালিকাভুক্তির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শুনানির পরিবর্তে আদেশের জন্য অন্তর্ভুক্তি করতে ঐ বেঞ্চ থেকে নির্দেশ দেয়া হয়। প্রধান বিচারপতির আদেশ লংঘন হবার অপব্যাখ্যার আশংকায় কেবল ঐ বেঞ্চ বিষয়টি ২৪ এপ্রিল শেখ মুজিব হত্যা মামলার ডেথ রেফারেন্স আদালতের কার্যতালিকাভুক্ত করে। সকাল সাড়ে ১০টায় দু'নম্বর কোর্টে বিচারপতি এমএম রুহুল আমিন এবং বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুল মতিন সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ কজলিস্টের শীর্ষে মুদ্রিত 'আদেশের জন্য' মৃত্যুদণ্ডাদেশ রেফারেন্স মোকাদ্দমা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য অগ্রসর হন। '৩০/১৯৯৮ রাষ্ট্র বনাম লে. কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান গং' হিসেবে উল্লিখিত এই মামলাটি কজলিস্টে স্থান পায়। হাইকোর্টে ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ এর ঐসব মৃত্যুদণ্ডাদেশ অনুমোদনের আগে ১৯৯৮ এর ডেথরেফারেন্স শুনানির জন্য কজলিস্টে আসে। বিচারপতি এমএম রুহুল আমিন এবং বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুল মতিন সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে সিদ্ধান্ত ঘোষণার সময় সরকার নিযুক্ত বিশেষ এডভোকেট সিরাজুল হক, সৈয়দ ফারুক রহমানের কৌসুলি এডভোকেট মাহবুবুর রহমানসহ বিশিষ্ট আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন। বিচারপতি এমএম রুহুল আমিন এবং আব্দুল মতিন সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ কজলিস্টে স্থান দেয়ার পর বিষয়টি প্রধান বিচারপতির কাছে প্রেরণ করেন। প্রধান বিচারপতি ঐদিনই মামলাটি শুনানির জন্য নতুন করে বিচারপতি মোহাম্মদ রুহুল আমিন এবং বিচারপতি এবি এম খায়রুল হকের সমন্বয়ে হাইকোর্ট ডিভিশনের একটি বেঞ্চ গঠন করেন।

২০ এপ্রিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম তার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় বাস্তবায়নের সঙ্গে সমগ্র জাতির

www.pathagar.com

আবেগ জড়িত। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার কাজ চালাতে গিয়ে সম্মানিত বিচারকরা নিরাপত্তাজনিত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন কিনা অথবা কোন পক্ষ থেকে তাদের হুমকি দেয়া হচ্ছে কিনা স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আমি জানতে চাই। নিম্ন আদালতে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায়ের সময় বিচারক কাজী গোলাম রসুল তার নিরাপত্তার কথা সরকারকে জানিয়েছিলেন। আমরা তার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলাম। বিচারকদের নিরাপত্তা দেয়া আমাদের দায়িত্ব। কারণ সম্মানিত বিচারকরা দেশের অপরাধ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।'

২ মে ২০০০ ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডে আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় থানা আহবায়ক শফিউদ্দিন বিশ্বাসের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত এক জনসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর খুনিদের যারা রক্ষা করতে চায়, আমাদের লাঠি মিছিল তাদের বিরুদ্ধেই। এই মিছিলটি চলবেই।' নাসিম বলেন, 'সারাদেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বিচার চায়, শুধু বেগম জিয়া, এরশাদরা বিচার চান না। সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্র করেই হরিণাকুন্ডে আমাদের প্রার্থী নূরে আলম সিদ্দিকীকে পরাজিত করা হয়েছে। রাজনীতিতে ওরা আমাদেরকে পরাজিত করতে পারেনি। আমরা জনগণের মন জয় করেই জনগণের ভোট পেতে চাই।' তিনি বলেন, 'বেগম জিয়া নির্বাচনের আগে বলেছিলেন যে, আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে ইসলাম থাকবে না, দেশ ভারত হয়ে যাবে। আমাদের নেত্রী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন। অথচ বেগম জিয়া নামাজের আগে অজু করেন কিনা সন্দেহ রয়েছে।'

১০ জুন ২০০০ দৈনিক যুগান্তর হতে জান যায়, ভিসেরা রিপোর্টের অভাবে মেহেরপুরে সদর, গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা শত শত মামলা নিষ্পত্তি হচ্ছে না। মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলার মামলাসমূহ ভিসেরা রিপোর্টের অভাবে অনিষ্পন্ন অবস্থায় পড়ে থাকার কারণে বছরের পর বছর ধরে মামলাসমূহ নিষ্পত্তি না হওয়ায় বাদী-বিবাদীগণকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। শুধু দুর্ভোগই নয়, বাদী-বিবাদীগণ এই কারণে আর্থিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্থ হন। উক্ত এলাকাসমূহে ভিসেরা রিপোর্ট মহাখালীতে পাঠানোর পর রিপোর্টের জন্য কখনও দেড় দুই বৎসর কিংবা কোনও কোনও ক্ষেত্রে আরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। ভিসেরা পরীক্ষা নিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহে জটিলতার আরেকটি দিক ছিল। লাশের ময়না তদন্ত, ভিসেরা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার দায়িত্ব স্বাস্থ্য অধিদফতরের অথচ ভিসেরা পাঠানোর ব্যয় বহন করে থাকে জেলা প্রশাসন। এই দ্বৈত ব্যবস্থাপনার অবসান না হওয়ার জন্য সমস্যা আরো বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ভিসেরা পাঠানোর সময় পুলিশের প্রয়োজন হয়। ফরমালিশ, কাঠের বাক্স, ইত্যাদি কিনে ভিসেরা প্যাকিং করতে হয়। কিন্তু অনিয়মিত ও অপর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের কারণে এই ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যার জন্য বৎসরে দুই বারের বেশি ভিসেরা পরীক্ষার জন্য মহাখালীস্থ পরীক্ষাগারে পৌছানো সম্ভব হয় না।

৩০ জুন ২০০০ দৈনিক দিনকালে প্রকাশিত তথ্যে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে বগুড়ার কোর্টগুলোতে ম্যাজিস্ট্রেট স্বল্পতা ও কোর্ট ভবনের অভাবে বিচার কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রতিদিন গড়ে ৪/৫ হাজার বিচার প্রার্থীরা বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন। প্রতিদিন যেহারে মামলা দায়ের হচ্ছে সে অনুপাতে নিষ্পত্তি না হওয়ায় মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বগুড়া ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য ২০ জন ম্যাজিস্ট্রেটের স্থলে মাত্র ৮ জন ম্যাজিস্ট্রেট কর্মরত আছেন। জেলার ১১টি থানার মধ্যে বগুড়া সদর (ক-অঞ্চল) ১জন, কাহাল-নন্দী গ্রাম-দুপচাচি (খ-অঞ্চল) ও আদমদিঘি শিবগঞ্জে (গ-অঞ্চলে) আছেন ১ জন করে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট। ৩১ মে তারিখ পর্যন্ত শুধু ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ১০ হাজার ৫ শ' ৬৪টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

www.pathagar.com

এরমধ্যে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে ৫ হাজার ৩ শ' ১৬টি। ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়াও ৩ জন ২য় শ্রেণীর ম্যাজিস্টেটের হাতে বিচারাধীন (ট্রায়াল কোর্টে) ৫ হাজার ২ শ' ৪৮টি মামলা রয়েছে। কর্মরত ৬ জন ছাড়া বাকি ২ জন প্রশাসনের অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করে থাকেন।

১০ সেপ্টেম্বর ২০০০ জাতীয় সংসদ অধিবেশনে আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু আইন কমিশন প্রণীত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। আইন কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন সাবেক প্রধান বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন এবং সদস্য ছিলেন বিচারপতি আমিনুর রহমান ও বিচারপতি নঈম উদ্দিন আহমদ। কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের স্বাক্ষরিত এ প্রতিবেদনে দীর্ঘসূত্রতাকে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার প্রধানতম ত্রুটি হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়, 'বিলম্বের কারণে সুবিচার এক অলীক বস্তুতে পরিণত হয়েছে এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থাহীনতা সৃষ্টি হচ্ছে।' আইন কমিশন বিচার বিলম্বের জন্য ১০ টি কারণ চিহ্নিত করাসহ দ্রুত বিচার নিষ্পত্তির জন্য ২৩ টি সুপারিশ করেছে। কমিশন বলেছে, 'বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতার কারণ উদঘাটনে ও দ্রুত ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে ইতোপূর্বে এদেশে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ ও সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু নির্মম বাস্তবতা হলো আন্তরিক বাস্তবায়ন প্রচেষ্টার অভাবে কোন উদ্যোগই শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। বাস্তবায়নের আন্তরিক ইচ্ছার অভাব থাকলে এ ধরনের সুপারিশমালা প্রণয়ন হবে কেবলই সরকারি সময় ও অর্থের বিলাসী অপচয়।' আইন কমিশন বিচার বিলম্বের যে ১০ টি কারণ চিহ্নিত করেছে সেগুলো হচ্ছে-'(১) আদালতে বিচারাধীন মোকদ্দমার আধিক্য, (২) বিশেষায়িত আদালত ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, (৩) পদ্ধতিগত আইনের দুর্বলতা, (৪) বিচারকের কর্তব্য নিষ্ঠার অভাব, (৫) বিচার ব্যবস্থার কার্যকর তদারকির অভাব, (৬) আইনজীবীদের আন্তরিক সহযোগিতার অভাব, (৭) দেওয়ানী মোকদ্দমায় সমন জারির জটিলতা এবং মোকদ্দমার যে কোন পর্যায়ে আরজি সংশোধন, অতিরিক্ত জবাব দাখিলসহ বিভিন্ন প্রকারের ইন্টারলোকেটরী দরখাস্ত দাখিল করার শর্তহীন সুযোগ, (৮) ফৌজদারী মোকদ্দমার ক্ষেত্রে প্রসিকিউশনের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, (৯) স্থায়ী পেশাদার, দক্ষ ও সার্বক্ষণিক অপরাধ তদন্ত বিভাগের অনুপস্থিতি এবং (১০) বিচারকদের পর্যাপ্ত লজিসটিকসের অভাব।' আইন কমিশনের ১৯৯৮ সালের বাৎসরিক প্রতিবেদনে 'অধস্তন আদালতে মামলার দ্রুত বিচার নিষ্পন্ন নিশ্চিত করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে করণীয়' বিষয়ে প্রণীত প্রতিবেদনে এসব বিষয় উল্লেখ করেছে।

কমিশন বলেছে, 'আমাদের বিচার ব্যবস্থায় এখন পর্যন্ত প্রধান নির্ভরতা ব্যক্তি বা পক্ষের সদিচ্ছা ও সততার ওপর আমাদের পদ্ধতিগত অধীনে সময়সীমা নির্দিষ্ট করা নেই। মোকদ্দমার পর্যায়ক্রমিকতার সংস্থান আইনে থাকলেও তা রক্ষার কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। পদ্ধতিগত আইনে বিচারকদের ইচ্ছামূলক ক্ষমতা যেমন অসীম, তেমনি চূড়ান্ত শুনানি পর্যায়ে উপনীত একটি মোকদ্দমাকে যে কোন পক্ষ অতি সহজেই এমনকি পর্যাপ্ত যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই পুনরায় প্রাথমিক পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারেন।' আইন কমিশন এ কারণে নির্ভরশীলতার ক্ষেত্র পরিবর্তন করে ব্যক্তির পরিবর্তে পদ্ধতির ওপর নির্ভরতা সৃষ্টি করা এবং পদ্ধতিগত বিষয়ে বিচারকের ইচ্ছাধীন ক্ষমতাকে আইনের অধীনে সীমিত করার জন্য বলেছে। কমিশন বলেছে, 'পদ্ধতিগত আইনে মোকদ্দমার পর্যায়ক্রমিকতা রক্ষার বাধ্যবাধকতার সংস্থান রাখতে হবে এবং প্রত্যেকটি পর্যায়ের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে তা তামিলের বাধ্যবাধকতা এবং ব্যর্থতার পরিণতি সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে'। আইন কমিশন আদালতে মোকদ্দমার সংখ্যার ব্যাপারে বলেছে, 'কোন আদালতে

www.pathagar.com

মোকদ্দমার সংখ্যা বিস্ময়কর রকমের বেশি। আবার কোন আদালতে তা নগণ্য। এছাড়া একইভাবে একটি মাত্র আদালতে, সাব-জজ আদালতে, একই সাথে ভূমি বিরোধ, পারিবারিক বিরোধ, বাণিজ্যিক বিরোধ, অর্থঋণ ও চুক্তি প্রবলজনিত বিরোধ এবং ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার কাজ করা হয়।' কমিশন এ জন্য বিচারাধীন মোকদ্দমার চরিত্র ও শ্রেণী অনুসারে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত পর্যন্ত বিশেষায়িত আদালত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছে। কমিশন বলেছে, 'এর ফলে একদিকে যেমন মোকদ্দমা নিষ্পত্তির সংখ্যা বাড়বে তেমনি অন্যদিকে বিচার কাজের গুণগত মানোন্নয়ন ও দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।' আইন কমিশন একই সাথে বিচারাধীন মোকদ্দমার সংখ্যার ভিত্তিতে আদালতের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য সুপারিশ করে বলেছে, 'আদালতে বিচারাধীন মোকদ্দমার সংখ্যা এক হাজারের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।' রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'নিম্ন আদালতের ওপর কার্যকর তদারকির ব্যবস্থার অনুপস্থিতি বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা ও সততাকে প্রতিনিয়ত নিম্নগামী করছে। সহকারী জজ ও সাব-জজগণের ক্ষেত্রে জেলা জজ তদারকি কর্তৃপক্ষ হলেও নানা কারণে তারা যেমন তদারকি কাজ দক্ষতা ও কঠোরতার সাথে পালন করতে সমর্থ হচ্ছেন না, তেমনি অন্যদিকে জেলা জজগণের মূল্যায়ন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে কার্যকরভাবে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। অপরদিকে অতিরিক্ত জেলা জজের ওপর জেলা জজের কোন কার্যকরী তদারকি ক্ষমতা নেই। অধস্তন আদালতসমূহের সার্বিক তদারকি বিচার মন্ত্রণালয় ও হাইকোর্টের ওপর যুক্তভাবে ন্যস্ত হওয়ায় সমন্বয় ও সহমতের অভাবে কার্যকর তদারকি ব্যবস্থা গড়ে উঠছে না। ফলে অধস্তন বিচার ব্যবস্থার কর্মদক্ষতা, সততা ও সুনাম মারাত্মকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। পতনের এ গতি অবিলম্বে কার্যকরভাবে রোধ করতে ব্যর্থ হলে অধস্তন বিচার ব্যবস্থা সর্বপ্রকার উপযোগিতা হারাবে।' আইন কমিশন রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'বিচার বিভাগীয় কিছু কর্মকর্তার অবিচারসুলভ কাজের কারণে সমগ্র বিচার ব্যবস্থা হেয় প্রতিপন্ন হলেও তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে না আছে কোন উপযুক্ত আইনী সংস্থান, না আছে কোন উপযুক্ত তদারকি সংস্থা'। কমিশন অবিলম্বে এ রকম অবস্থার অবসান হওয়া আবশ্যক বলে উল্লেখ করেছে। কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছে, 'অধস্তন আদালতের বিচারকদের শৃংখলা বিধানের জন্য বর্তমানে কার্যকর সরকারি কর্মকর্তা শৃংখলা ও আপীল বিধিমালা ১৯৮৫ অত্যন্ত অপ্রতুল প্রমাণিত হয়েছে।' সে কারণে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের শৃংখলা বিধানের জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন করার জন্য কমিশন জোর সুপারিশ করেছে। এছাড়া কমিশনের অন্যান্য সুপারিশের মধ্যে রয়েছে, প্রত্যেক বিচারকের বাসস্থান এবং বাসস্থান থেকে আদালতে যাওয়া-আসার পরিবহন সুবিধা নিশ্চিত করা, প্রত্যেক বিচারকের জন্য একজন স্টেনোগ্রাফার নিযুক্ত করা, রাজনৈতিক বিবেচনার পরিবর্তে প্রকৃত যোগ্য আইনজীবী থেকে জিপি ও পিপি নিয়োগ, একটি স্থায়ী পেশাদার ও দক্ষ অপরাধ তদন্তকারী সংস্থা গড়ে তোলা, প্রাথমিকভাবে প্রত্যেকটি বিভাগীয় সদর দফতরে অপরাধ কর্মের আলামত ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির রাসায়নিক পরীক্ষা ও লাশের ভিসেরা পরীক্ষার সর্বাধুনিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, প্রত্যেক থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ফৌজদারী অপরাধ সংশ্লিষ্ট ভিকটিমের মেডিকেল পরীক্ষার আধুনিক ব্যবস্থার সংস্থান রাখা প্রভৃতি।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০০০ দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশ, মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনে ম্যাজিস্ট্রেটসহ এক হাজারের বেশি পদ শূন্য থাকায় প্রায় চার লাখ ফৌজদারী মামলা বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে এবং হ্রাস পেয়েছে জেলা প্রশাসনের গতিশীলতা। মাঠ প্রশাসনের জন্য এ্যাডমিন ক্যাডারে মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা ২০৬৯টি। বর্তমানে কর্মরত পদের সংখ্যা ৯৯৯টি। এর ভিতর থেকেও

www.pathagar.com

অনেকে ছুটিতে থাকার ফলে বাস্তবে অর্ধেকেরও কম কর্মকর্তা দিয়ে চলে মাঠ প্রশাসনের কাজ। দেশে বর্তমানে তিন লাখ ৯৫ হাজার ৯০৮টি ফৌজদারি মামলা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টসমূহে বিচারাধীন রয়েছে। অপর দিকে ৬৪টি জেলায় প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের সংখ্যা ৩১৬ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মিলিয়ে মোট ম্যাজিস্ট্রেটের সংখ্যা ৫৮৫ জন। এদের বেশির ভাগই প্রটোকল এবং জেলা প্রশাসনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকেন। এ কারণে তারা খণ্ডকালীন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করার সুযোগ পান। এতে মামলার নিষ্পত্তি বিলম্বিত হচ্ছে। ফলে দেশের কারাগার সমূহে সাজাপ্রাপ্ত ও সামীদের চেয়ে বিচারাধীন বন্দীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। যার পরিমাণ কারাগারগুলোর ধারণ ক্ষমতার চেয়েও বেশি। ম্যাজিস্ট্রেটের সংখ্যা না বাড়ানো ফলে অবস্থা আর ভয়াবহ আকার ধারণ করছে।

১ অক্টোবর ২০০০ দৈনিক দিনকালে প্রকাশ, 'বিলম্বিত বিচার ব্যবস্থা, বিচারক স্বল্পতার কারণে রংপুরের আদালতে আশ্রয়ে বিচার প্রার্থী প্রায় লক্ষাধিক মানুষের ভোগান্তি দিনদিন আরও বাড়ছে। বিচার কাজে নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালত ছেড়ে অন্যত্র প্রশাসনিক কাজকর্মসহ বিভিন্ন কাজে জড়িত থাকাই এ ভোগান্তির মূল কারণ। রংপুর জেলার ৮টি থানার জন্য গঠিত ৪টি ফৌজদারী আদালতের মধ্যে পীরগাছা ও কাউনিয়া থানার জন্য গঠিত আদালতে বিচারাধীন মামলা রয়েছে ৫শ' ৬টি। রংপুর সদর, তারাগঞ্জ থানার জন্য গঠিত আদালতে রয়েছে ১ হাজার ৭শ' ৮৯টি মামলা। মিঠাপুকুর ও বদরগঞ্জ থানার জন্য গঠিত আদালতে রয়েছে ৯শ' ২৬টি এবং পীরগঞ্জ ও গংগাচড়া থানার জন্য গঠিত আদালতে রয়েছে ৮শ' ২১টি মামলা। এ ছাড়াও কগনিজেন্স আদালতে বিচারাধীন মামলা রয়েছে ৪ হাজার ৯৬টি।

২০০০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কোর্টে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ১৪ হাজার ৪৮টি। এর মধ্যে নিষ্পত্তি হয় ১৪শ' ২৪টি, সাজা পায় ২ শ' ৩টি মামলার আসামীরা। বাকী ১২ শ' ২১ টি মামলায় প্রমাণের অভাবে আসামীরা খালাস পায়। মোট ১৪ হাজার ৪৮টি মামলার মধ্যে ২০০০ সালে গৃহীত মামলার সংখ্যা ৪ হাজার ১শ' ১২টি এবং পূর্ববর্তী বছরের মূলতবী মামলার সংখ্যা ৯ হাজার ৯শ' ৮৭টি। ১৯৯৯ সালে যেখানে মূলতবী মামলার সংখ্যা ছিল ৯ হাজার ৯ শ' ৮৭টি, সেখানে ২০০১ সালের শুরুতে মূলতবী মামলার সংখ্যা দেখা হয় ১২ হাজার ৬শ' ২৪টি। অর্থাৎ মূলতবী মামলা কমা তো দূরের কথা আর অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সিএমএম আদালতে ১৫ হাজার মামলা, ঢাকা ডিসি আদালতে প্রায় ৫ হাজার ও ঢাকা জেলা জজ আদালতে প্রায় ৫ হাজার মামলা পেন্ডিং রয়েছে। মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অতি ধীর গতির কারণে আসামী বা বাদীগণের মাসের পর মাস কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। কোন কোন মামলা দশ বছরেরও বেশিকাল ধরে চলছে। এ ধরনের অনেক মামলায় জড়িত ব্যক্তিরা প্রায় সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়েছে। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ২৫ জানুয়ারি ২০০১)

২০০১ সালের প্রথম দিকে ঢাকার নতুন সিএমএম আসার পর সিএমএম আদালতের হালহাকিকত একদম পাল্টে যায়। নতুন সিএমএম এমন একটা পদ্ধতি দাঁড় করান, তাতে কিছু ম্যাজিস্ট্রেট অত্যধিক গুরুত্ব লাভ করেন, আবার কিছু ম্যাজিস্ট্রেট মারাত্মকভাবে ভিকটিমে পরিণত হন। সেই সঙ্গে আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীরা একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে যায়। এ রকম নাজুক পরিবেশকে একজন আইনজীবী চরম স্বেচ্ছাচারিতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, 'এই নতুন পদ্ধতি দ্রুত বিচারসম্পন্ন ও ন্যায় বিচারের পথে

www.pathagar.com

বিরাট বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই সঙ্গে লংঘিত হয়েছে সরকারি আইন-বিধি। নতুন পদ্ধতিতে প্রতি তিন থানার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটকে ফিক্সড করে দেয়া হয়। সেই সঙ্গে একজন করে বিকল্প ম্যাজিস্ট্রেট রাখা হয়। বিকল্প ম্যাজিস্ট্রেট বলে কোন আইনসম্মত পদ নেই। কারণ মন্ত্রণালয় তাদের বিকল্প ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ দেয়নি। ফলে এসব ম্যাজিস্টেটকে চরমভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। তবুও নতুন সিএমএম নিজের মত করে বিকল্প ম্যাজিস্ট্রেট তৈরি করেন। এই পদ্ধতিতে ফিক্সড ম্যাজিস্ট্রেটরা যদি কোন কারণে অনুপস্থিত থাকেন কেবলমাত্র তখনই বিকল্প ম্যাজিস্ট্রেটরা এজলাসে বসতে পারবেন। এর ফলে সিএমএম আদালতের ৮ জন বিকল্প ম্যাজিস্ট্রেট অপাঙক্তেয় হয়ে পড়েন। নতুন সিএমএম আসার আগে সিএমএম আদালতে কর্মরত ২১ জন ম্যাজিস্ট্রেট ৪ ভাগে ভাগ ছিল। যেমন জিআর, সাউথ, নর্থ, ইস্ট ও ওয়েস্ট। তখন সিএমএম সাহেব প্রতিদিন অনির্ধারিত মামলাগুলো বেলা ১২ টায় চারটি অঞ্চলের ২১ জন ম্যাজিস্ট্রেটকে ভাগ করে দিতেন। আর শুনানী শুরু হয়ে যেত বেলা ১ টায়। যদিও এই পদ্ধতিতে মাঝের ১ ঘন্টার আইনজীবীদের কাগজপত্র প্রস্তুত করতে বেশ অসুবিধা হতো। তা সত্ত্বেও এক ঘন্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী, বিচারপ্রার্থী ও দালালসহ সবাই জেনে যেত তাদের মামলা কোন কোর্টে যাচ্ছে। সেই সাথে এই অল্প সময়ের মধ্যে কারো পক্ষে তদ্বির করাও কঠিন হয়ে পড়ত। তাছাড়া একজন বিচারপ্রার্থী যদি মনে করতেন, কোন একটি কোর্টে ন্যায়বিচার পাবেন না বা পাচ্ছেন না তাহলে তিনি কোর্টে যেতে পারতেন। নতুন ম্যাজিস্ট্রেটের পদ্ধতিতে শোনানির জন্য প্রতি তিনটি থানার জন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেট ফিক্সড করে দেয়ায় আইনজীবী, বিচারপ্রার্থী, দালাল সবাই জিম্মি হয়ে পড়ে। নতুন ম্যাজিস্ট্রেটের পদ্ধতিতে সমাজের দরিদ্র ও নিপীড়িত অংশের মানুষেরা সম্পূর্ণ জিম্মি হয়ে পড়েন। শিকার হন নিদারুণ ভোগান্তির। নতুন ম্যাজিস্ট্রেটের পদ্ধতির ফলে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। যেমন সিআর সমন পিটিশন মামলা। এই মামলা যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দায়ের করা হয়, তিনিই মামলার গুনাগুণ বিচার করে সমন ও ওয়ারেন্ট জারি করেন। যে আসামীর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করা হয়, তাকে আবার ঐ ওয়ারেন্ট জারিকারী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেই যেতে হয় জামিনের জন্য। সঙ্গত কারণে যিনি ওয়ারেন্ট জারি করলেন, তার কাছ থেকে জামিন না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। তারপরও যদি ঐ ম্যাজিস্ট্রেট জামিন দেন; তাহলে তার সাথে আগেই একটা বুঝাপড়া করার প্রশ্ন থেকে যায়। সুতরাং নতুন পদ্ধতিতে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয় ব্যাপকভাবে। অপরদিকে যে ৮ জন বিকল্প ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন তারা বঞ্চিত হন। সিএমএম এক আদেশ বলে যে নতুন পদ্ধতি সৃষ্টি করে বিভিন্ন কোর্টে যে সব কিম্ভূত ম্যাজিস্ট্রেট ও বিকল্প ম্যাজিস্ট্রেট দেন, তারা হলেন, দুর্নীতি দমন বিভাগের ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের মামলা-১ নং কোর্ট। সিএমএম শৈলেন্দ্র কুমার অধিকারী নিজে এই কোর্টের দায়িত্ব নেন। বিকল্প হচ্ছেন দু'জন অতিরিক্ত সিএমএম কোর্ট নং ২ ও ৩। জিআরও, নন জিআর মামলা রমনা, ধানমন্ডি ও লালবাগ থানা। কোর্ট নং-১৭। ফিক্সড ম্যাজিস্ট্রেট শহীদুল ইসলাম। কোতোয়ালী, হাজারীবাগ ও কামরাঙ্গীরচর এলাকার মামলা কোর্ট নং-৪। ফিক্সড ম্যাজিস্ট্রেট দিলীপ কুমার শর্মা। উত্তরা, ক্যান্টনমেন্ট ও বাড্ডা থানা। কোর্ট নং-৭। ফিক্সড ম্যাজিস্ট্রেট আনিস উদ্দিন মঞ্জুর। মিরপুর, পল্লবী ও কাফরুল থানা। কোর্ট নং-৬ ফিক্সড ম্যাজিস্ট্রেট নারায়ণ চন্দ্র দাস। মোহাম্মদপুর, তেজগাঁও ও গুলশান। কোর্ট নং-৫। ফিক্সড ম্যাজিস্ট্রেট বিমান বিহারী বড়ুয়া। মতিঝিল, খিলগাঁও ও সবুজবাগ। কোর্ট নং-১৯। ফিক্সড ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আবুল কাসেম। ডেমরা, শ্যামপুর ও সূত্রাপুর থানা। কোর্ট নং-১৫। ফিক্সড

www.pathagar.com

ম্যাজিস্ট্রেট সিরাজুল হায়দার। সিআর মামলা। কোর্ট নং ১৩। ফিক্সড ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ নুরুল ইসলাম। অন্যদিকে বিকল্প ম্যাজিস্ট্রেটরা হচ্ছেন কোর্ট নং-১৮, খন্দকার আতিয়ার রহমান। কোর্ট নং-৮, একে এম আব্দুস সালাম। কোর্ট নং-১০, আবুল কাসেম। কোর্ট নং-১২ আবদুল সালাম মিয়া, কোর্ট নং-১৪, মোঃ আবু তালেব। কোর্ট নং-২০ কাজী মিরাজ হোসেন। কোর্ট নং-১৬ মোঃ সামসুর রহমান ও কোর্ট নং-১১ এম, মাকসুদুর রহমান পাটোয়ারী। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ২৮ জানুয়ারি ২০০১)

২৬ মার্চ ২০০১ একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়, 'ঢাকার মহানগর দায়রা আদালতে একজন মাত্র অতিরিক্ত দায়রা জজের ওপর সাড়ে সাত হাজার মামলার বিচারকাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব পড়েছে।' এই অবিশ্বাস্য অবস্থার কারণ ছিল, অতিরিক্ত জেলা জজ পর্যায়ের চারটি পদ বিগত দেড় মাস ধরে শূন্য ছিল এবং সেজন্য তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজকে নিজেরটি সহ পাঁচটি আদালতের দায়িত্ব পালন করতে হয়। রাজধানীতে সংঘটিত বেশকিছু চাঞ্চল্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ হত্যা মামলাসহ প্রায় দেড় হাজার মামলার বিচারকাজ পরিচালনার পাশাপাশি আইনানুগ বাধ্যবাধকতার কারণে অতিরিক্ত দায়রা জজকে প্রতিদিন অন্তত তিনশ' মামলার নথিতে স্বাক্ষর করতে হয়। তারপর আবার অন্য চারজনের দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তিনি প্রচন্ড চাপের মধ্যে পড়েন এবং সব মিলিয়ে সাড়ে সাত হাজার মামলার বিচারকাজ সম্পন্ন করা তার পক্ষে অসম্ভব। এর ফলে একদিকে হাজার হাজার মামলার বিচারকাজ বাধাগ্রস্ত হয়, অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, অন্যদিকে অন্যায়ভাবে কারাভোগ করে অসংখ্য অভিযুক্ত।'

১৮ মার্চ ২০০১ দৈনিক ইনকিলাবের সম্পাদকীয়তে প্রকাশ, 'দেশের একমাত্র ফরেনসিক ল্যাবরেটরীতে ভিসেরা জট মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে। মহাখালীতে অবস্থিত এই ল্যাবরেটরীতে সারাদেশ থেকে প্রতিদিন অসংখ্য ভিসেরা এসে জমা হয়। কিন্তু জনবলের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিকের অভাবে যথোচিত সময়ে দূরে থাক মাসের পর মাস পেরিয়ে গেলেও এসব ভিসেরা পরীক্ষা সম্পন্ন করে রিপোর্ট প্রদান করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে তদন্তসহ মামলার কাজ পিছিয়ে যাচ্ছে এবং দেশের সর্বত্র আদালতে মামলার জট প্রকট হয়ে উঠছে। ফরেনসিক ল্যাবরেটরীতে প্রতিবছর পাঁচ হাজারের বেশি ভিসেরা পরীক্ষার জন্য জমা হচ্ছে এবং এর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। হত্যা-আত্মহত্যাসহ অস্বাভাবিক মৃত্যুজনিত মামলার ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির দেহ থেকে সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য ভিসেরা পাঠানো হয় এবং এই পরীক্ষার রিপোর্টের ওপর মামলার কার্যক্রম অনেকাংশে নির্ভর করে। অন্যদিকে ফরেনসিক ল্যাবরেটরীর দুর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে রিপোর্ট প্রদানে বিলম্ব হয়। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা বাড়তে থাকে। পরিণতিতে ন্যায়বিচার উপেক্ষিত হয় এবং বিচারপ্রার্থীরা সুবিচার লাভ করার সুযোগ পায় না। ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুভার্গ্যক্রমে অনেককেই মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত হতে হয়, তার ভিসেরা রিপোর্ট না আসার অনির্দিষ্টকালব্যাপী কারাগারে বন্দী থাকে কিংবা জামিন নিয়ে অসম্মানজনক জীবন যাপনে বাধ্য হয়। অথচ স্বল্পতম সময়ে ভিসেরা রিপোর্ট পাওয়া গেলে এসব নির্দোষ মানুষের হয়রানি যেমন বন্ধ হতো, তেমনি মামলার জটও থাকতো না। ফরেনসিক ল্যাবরেটরীতে কর্মরত ১০ জন পরীক্ষকের মধ্যে মাত্র তিনজন বছরের পর বছর ধরে পরীক্ষার কাজ করে চলেছেন। নতুন দুজন যুক্ত হলেও ভিসেরা পরীক্ষার মূল কাজ ঐ তিনজনকেই করতে হয়। একটি মাত্র ল্যাবরটেরীতে প্রচন্ড চাপের প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম, রাজশাহী

www.pathagar.com

ও খুলনায় তিনটি বিভাগীয় ল্যাবরেটরী স্থাপনের প্রক্রিয়া মাঝপথে থেমে যায়। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে উদ্যোগ নেয়ার পর ঐ তিন স্থানে ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয় কিন্তু যন্ত্রপাতি ও জনবলের অভাবে সেগুলো চালু করা সম্ভব হয়নি।'

২ এপ্রিল জাতীয় সংসদে সুপ্রিমকোর্টের বিচারকদের পেনশন ও প্রিভিলেজ সম্পর্কিত দু'টি বিল পাসের সময় এডভোকেট ফজলে রাব্বীর বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে আইনমন্ত্রী খসরু বলেন, 'সুপ্রিমকোর্টে নতুন বিচারক নিয়োগ দেয়ার চেষ্টা চলছে। সিনি... না থাকায় যে পরিমাণ মামলা বিচারাধীন রয়েছে, তা ৫০ থেকে ১০০ বছরেও শেষ হবে না।' তিনি বলেন, 'সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগে ৪৫ জন বিচারপতি আছেন।' এডভোকেট ফজলে রাব্বী বলেন, 'সুপ্রিমকোর্টের বিচারকদের রেমুনারেশন ও প্রিভিলেজ বৃদ্ধির আমরা বিপক্ষে নই। তবে এতে দেশের মানুষের কি মঙ্গল হবে?' পরে আইনমন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে সুপ্রিমকোর্টে জাজেস (লিভ পেনশন এন্ড প্রিভিলেজ), (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল-২০০১ ও সুপ্রিম কোর্ট জাজেস (রেমুনারেশন এন্ড প্রিভিলেজ) (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল-২০০১ কণ্ঠভোটে পাস হয়।

১২ জুন দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, 'সারাদেশের জেলাগুলোর কোর্টে মামলা জট এখন চরমে। নিষ্পত্তির অপেক্ষায় যে মামলাগুলো আদালতের মামলা ফাইলে আটকা আছে শুধু সেগুলো নিষ্পত্তি করতেই ১০ বছরের বেশি সময় লাগবে। তার উপর প্রতিদিন নতুন নতুন মামলা রুজু হচ্ছে। অনিষ্পন্ন ফৌজদারী মামলায় জেলে আটক আসামীদের দিনের পর দিন বিনা বিচারে হাজতে থাকতে হচ্ছে। সারাদেশে আদালতগুলোতে বর্তমানে প্রায় সাড়ে ৮ লাখ মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে। বৃটিশ আমলের বিচার কাঠামো, পর্যাপ্ত আদালত ও সংশ্লিষ্ট লোকবলের অভাব, পুলিশের রিপোর্ট দাখিলের অবহেলা এবং সাক্ষীদের আদালতে হাজির করতে পুলিশের ব্যর্থতার কারণে মামলার শুনানিও নিষ্পত্তি হচ্ছে না। এতে হয়রানির শিকার হচ্ছে বিচারপ্রার্থী ও আসামী উভয়পক্ষ।' ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি থেকে ২০০০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫ বছরে সারাদেশে ৭ লাখ ২৬ হাজার ৭৭৮টি মামলা দায়ের করা হয়। একই সময়ে নিষ্পত্তি হয় মাত্র ৩ লাখ ১৯ হাজার ৭৪২টি। ৫ বছরে ফৌজদারী মামলা দায়েরের তুলনায় নিষ্পত্তির হার ছিল ৪৩.৯৯ শতাংশ। বাকী ৫৬ শতাংশ মামলাই অনিষ্পন্ন থেকে গেছে। শুধু ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি থেকে ২০০০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫ বছরে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা হচ্ছে ৪ লাখ ৭ হাজার ৩৬টি। ফলে স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলা দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে ৮ লাখ। ফৌজদারী মামলায় ১৯৯৬-২০০০ সালে আদালতে সাক্ষী উপস্থিতি হয় ৩১.১৯ শতাংশ। বাকী ৭৮ শতাংশের বেশি সাক্ষীকে আদালতে হাজির করা সম্ভব হয়নি। ফৌজদারী মামলার অধিকাংশই বাদীপক্ষ সরকার। বাদীপক্ষের আন্তরিকতার অভাব ও অবহেলার কারণে সাক্ষীদের আদালতে উপস্থিত করা যায়নি। তাতে মামলার শুনানির তারিখ দিনের পর দিন পিছিয়ে দেয়া হয়। ৫ (১৯৯৬-২০০০) বছরে সিলেট বিভাগে মামলা দায়েরের তুলনায় নিষ্পত্তির হার সবচেয়ে কম। সিলেট বিভাগে মাত্র ৩৮.৫৮ শতাংশ মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। ৫ বছরে সিলেট বিভাগে মামলা দায়ের হয় ৪১ হাজার ৭২৩ টি। এর মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ২৫ হাজার ৬২৪টি। ঢাকা বিভাগে মামলা দায়ের হয় ২ লাখ ৫৯ হাজার ৮৮৫টি। এর মধ্যে নিষ্পত্তি হয় ১ লাখ ১৫ হাজার ৪৯৫ টি। নিষ্পত্তির হার ৪৪.৪৪ শতাংশ। রাজশাহী বিভাগে মামলা দায়ের হয় ১ লাখ ৪৮ হাজার ৪১৯টি। এর মধ্যে নিষ্পত্তি হয় ৬৫ হাজার ২১৮টি। নিষ্পত্তির হার ৪৩.৯৪ শতাংশ। চট্টগ্রাম বিভাগে মামলা দায়ের হয় ১ লাখ ৪৪ হাজার ৭৪১টি। এর মধ্যে নিষ্পত্তি হয় ৬২ হাজার ১৭৭টি। নিষ্পত্তির

www.pathagar.com

হার ৪২.৯৬ শতাংশ। খুলনা বিভাগে মামলা দায়ের হয় ৯০ হাজার ১৪৮টি। এর মধ্যে নিষ্পত্তি হয় ৪২ হাজার ৭৬৬টি। নিষ্পত্তির হার ৪৬.৩৩ শতাংশ। বরিশাল বিভাগে মামলা দায়ের হয় ৪১ হাজার ৮৬২টি। এর মধ্যে নিষ্পত্তি হয় ১৮ হাজার ৯৮৭টি। নিষ্পত্তির হার ৪৪.৩৫ শতাংশ।

ঐতিহ্যবাহী পরীর পাহাড়ে অবস্থিত শতাব্দী-প্রাচীন চট্টগ্রাম আদালত ভবন এখন মাত্রাতিরিক্ত জনসমাগমের চাপের সম্মুখীন। আদালত ভবনটি সঠিকভাবে সংস্কার ও সংরক্ষণের উদ্যোগ না নেয়ায় তা বর্তমানে চরম বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে-এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে ২১ জুন দৈনিক সংগ্রামে। সংগ্রামে বলা হয়েছে, 'আদালতে বিচারকের আসন শূন্যতার পাশাপাশি এজলাস, প্রয়োজনীয় ফার্নিচার, টেলিফোন ও পর্যাপ্ত যানবাহনের অভাব খুবই তীব্র। দিন দিন মামলার সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেলেও তদনুপাতে নতুন আদালত ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ না হওয়ায় জনভোগান্তি ও হয়রানি তীব্র আকার ধারণ করেছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা চট্টগ্রাম সদর শাখা কর্তৃক পরিচালিত এক তদন্ত প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয়, চট্টগ্রামের দেওয়ানী, ফৌজদারী সেশন ও ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমূহে বর্তমানে ৩০ হাজারের অধিক মামলা বিচারের অপেক্ষায় রয়েছে। ১০/১২ বছরেও দেওয়ানী আপীল মামলার শুনানি হয় না। অথচ অগণিত বিচারপ্রার্থী সাধারণ মানুষ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বছরের পর বছর মামলার ঘানি টানতে গিয়ে চরম আর্থিক ক্ষতি ও দৈহিক হয়রানির শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পুরাতন ভবন সরকার কর্তৃক জাতির বৃহত্তর স্বার্থে অধিগ্রহণপূর্বক তথায় মেট্রোআদালত স্থানান্তর, মূল আদালত ভবনের সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে সকল সংকটের নিরসন হবে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। এ ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সচেতনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। আদালত অভ্যন্তরে একশ্রেণীর চিহ্নিত কর্মচারীর খামখেয়ালীর কারণে অধিকাংশ জারি মামলার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হচ্ছে। পুলিশ মামলার তদন্ত কর্মকর্তাদের মামলা তদন্তে অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণেও মামলা নিষ্পত্তিতে মারাত্মক দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হচ্ছে। ১২ থানার জন্য রয়েছে মাত্র ৩ জন ম্যাজিস্ট্রেট। এডিশনাল সিএমএম পদে এখনও কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। সিএমএম আদালতে সকল মামলা বন্টন, বিচার, ট্রায়েল, ট্রান্সফার ও শুনানি কার্যক্রম একজন সিএমএম এবং মাত্র ৩ জন মেট্রো ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এদিকে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট সমূহেও এক একজন বিচারককে একাধিক চার্জ দিয়ে চলছে আদালত। ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমূহে বর্তমানে মামলা চলাকালে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মাত্রাতিরিক্ত ভীড়ের কারণে মামলার নম্বর, নাম ডাক শুনতে না পারায় হাজির থাকা সত্ত্বেও অনেককে ডাকে গরহাজির পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়। এতে করে ন্যায়বিচার মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।'

৮ জুন রাতে রাজধানীতে প্রায় ৪শ' ৫০ জন নতুন এডভোকেটের সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে প্রধান বিচারপতি মাহমুদুল আমিন চৌধুরী বিলম্বিত বিচার প্রক্রিয়ার জন্য বিচারকদের দায়ী করার প্রবণতার প্রতিবাদ করে বলেন, 'যারা মামলা বিলম্বিত করার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী তাদের ব্যাপারে কিছুই বলা হচ্ছে না।' বাংলাদেশ বার কাউন্সিল আয়োজিত এ সভায় আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু, সাবেক প্রধান বিচারপতি আবু তাহের মোহাম্মদ আফজাল, বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার এম আমীরুল ইসলাম,সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ বাসেত মজুমদার এবং বিশিষ্ট আইনজীবী

www.pathagar.com

শুধাংশু শেখর হালদার বক্তব্য রাখেন। এটর্নী জেনারেল ও পদাধিকারবলে বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মাহমুদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আজকাল বিচারকদের সমালোচনা করা একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে।' তিনি প্রশ্ন করেন, মাত্র ৬শ' ৫০ জনের মতো বিচারক কিভাবে বর্তমানে প্রায় সাড়ে ৮ লাখ ঝুলন্ত মামলা দ্রুত নিস্পত্তি করতে পারেন? প্রধান বিচারপতি বলেন, 'গণতান্ত্রিক পরিবেশে একে অপরকে দোষারোপ করলে সমস্যার সমাধান হবে না। বরং যার যার কর্মস্থল থেকে তার তার নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে।' তিনি বলেন, 'কোন কোন সময় আইনজীবীরা বিভিন্ন বিচারকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে কোর্ট বর্জন করে থাকেন। কিন্তু পরবর্তী তদন্ত চলাকালে তাদের কাছ থেকে তেমন সাহায্য পাওয়া যায় না। বরং অধিকাংশ স্থানেই বদলীর সুপারিশ করা হয়। কিন্তু বদলী কোনো সমাধান হতে পারে না। বরং আইনজীবীদের সাহসিকতার সাথে এগিয়ে এসে দুর্নীতিবাজ বিচারক কিংবা আইনজীবী সকলকেই আইনাঙ্গন থেকে বিদায় করে দেয়া উচিত।' তিনি আরো বলেন, 'প্রায়ই আইনজীবীরা অভিযোগ করেন, বিচারপতিরাই বিচার বিলম্বের জন্য দায়ী। কিন্তু আমার প্রশ্ন, যে সকল উকিল মক্কেলের সরলতার সুযোগ নিয়ে তাকে কোর্টের বারান্দায় দাঁড় করে রেখে টাকার লোভে বার বার মামলার তারিখ নির্ধারণ করেন তারা কি মামলা বিলম্বিত করছেন না। মামলা দেরীতে নিস্পত্তি হলে যদি মানবাধিকার লংঘন করা হয় তাহলে যারা মামলা বিলম্বিত করছেন তাদেরকে কি নামে অভিহিত করা হবে?' তিনি দুঃখ করে বলেন, 'আগে আইনজীবীগণ মক্কেলকে পরিচালনা করতেন, আর এখন মক্কেলরা অনেক আইনজীবীকে টাকার জোরে পরিচালনা করে।' তিনি বলেন, 'আইন পেশা নয়, এখানে টাকাই বড় কথা। তাই আইনজীবীদের অনেককেই দেখা যায়, আইন সম্পর্কে জানার আগ্রহের চেয়ে বেইল পিটিশনের দিকে নজর বেশি।' তিনি নবীন আইনজীবীদের এ মোহ থেকে মুক্ত থাকার আহবান জানান। প্রধান বিচারপতি নবীন আইনজীবীদের শপথ গ্রহণের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'যে সমস্ত প্রবীণ আইনজীবী শপথ ছাড়াই এ পেশায় রয়েছেন এবং পেশার জন্য সবচেয়ে বেশি দুর্নাম কুড়িয়েছেন তাদের ব্যাপারে কি করা যায় তাও বার কাউন্সিলের ভেবে দেখা দরকার।' (সূত্রঃ দৈনিক সংগ্রাম ৯ জুন ২০০১)

১ জুলাই ২০০১ দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশ, 'যশোর জেলায় প্রায় ১২ হাজার মামলা এখন ঝুলছে। কবে নাগাদ এসব মামলার নিস্পত্তি হবে তা নিয়ে রয়েছে সংশয়। পুলিশী তদন্তে ধীরগতি, ম্যাজিস্ট্রেটদের সরকারি বিভিন্ন অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত রাখা, ফুল কোট রেফারেন্সসহ সাপ্তাহিক দু'দিনের ছুটির কারণে সৃষ্টি হয়েছে এ ধরনের অব্যবস্থার। যশোরের ৩০টি আদালতের ২৬টিতে বর্তমানে প্রায় ১২ হাজার মামলা রয়েছে বিচারাধীন। এর মধ্যে ফৌজদারী মামলা প্রায় ৬ হাজার। নালিশী মামলা রয়েছে ৪ হাজার এবং পারিবারিক দেওয়ানী মামলার সংখ্যা ২ হাজারেরও বেশি। প্রতিদিনই ক্রমাগতভাবে বাড়ছে মামলার সংখ্যা। স্ফীত হচ্ছে মামলার পাহাড়। বিভিন্ন জজ আদালত ও ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা সমান। আইন প্রয়োগ এবং বিচার সম্পন্নের মাঝে দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় প্রতিটি ধাপে রয়েছে নানা জটিলতা ও মামলা জট বাঁধার কারণ। মামলা পরিচালনা ও দ্রুত নিস্পত্তির ক্ষেত্রে আইনজীবীদের ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ থাকলেও দেখা যায় অধিকাংশ মামলায় নানা যুক্তিতে আদালতের কাছে আইনজীবীদের সময় প্রার্থনা করতে। মামলা জটের অন্যতম কারণ হতে পারে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের ভূমিকা। তদন্ত শেষে বিলম্বে ত্রুটিপূর্ণ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করবার সময় প্রার্থনা করা ইত্যাদি সমস্যাও রয়েছে এক্ষেত্রে। অতিরিক্ত মামলার চাপ ও

www.pathagar.com

যথেষ্ট লোকবলের অভাব আইন-শৃংখলা রক্ষাসহ নানা ক্ষেত্রে তাদের ওপর অতিরিক্ত কাজের চাপ, অনেকাংশে তদন্ত সম্পন্নে বিলম্ব, ত্রুটিপূর্ণ তদন্ত প্রতিবেদন ও সময় প্রার্থনা করার কারণে মামলা প্রলম্বিত হচ্ছে। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টগুলোতে বিচারকাজের পাশাপাশি তাদেরকে দেয়া হয় সরকারি নানা ধরনের দায়িত্ব। ফলে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টগুলোতে মামলার নিষ্পত্তি হতে লেগে যায় দীর্ঘ সময়। এ অঞ্চলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে থানায় প্রমাণ ছাড়া মামলা করতে গেলেই সহজে যে কোন মামলা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। নিয়মানুযায়ী যে কোন ব্যক্তি থানায় মামলা করতে গেলেই প্রথমে বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা এবং প্রয়োজনে যে বিষয়টি থানায় বসেই মীমাংসা করা সম্ভব সেটি মামলা থেকে বিরত রাখলেই হয়তো আদালতে মামলার জট থাকবে না।'

নিম্ন ও উচ্চ আদালতের মতো রাজস্ব সংক্রান্ত আপিলেট আদালতেও মামলার জট লেগেছে। কাস্টমস এক্সসাইজ ও ভ্যাট আপিলেট ট্রাইব্যুনালে বর্তমানে প্রায় ১৫ হাজার মামলা ঝুলে আছে। ১৯৯৬ সালের বিভিন্ন সময় থেকে মামলাগুলো দায়ের করা হয়। বিচারক স্বল্পতার কারণে এই আদালতে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় পড়ে থাকা মামলার স্তূপ ক্রমশই বাড়ছে। দায়েরকৃত মামলার বিপরীতে মাত্র শ' পাঁচেক মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। দ্রুত নিষ্পত্তি না হওয়ায় এসব মামলার বিপরীতে প্রায় দুইশ' কোটি টাকার রাজস্ব অনাদায়ী পড়ে আছে-এ তথ্য প্রকাশ করেছে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০০ এর দৈনিক যুগান্তর। বিচারক প্রয়োজন ছিল চারজন। কিন্তু দায়িত্ব পালন করেছিলেন মাত্র একজন। বেঞ্চ দুইটি মধ্যে কার্যকর ছিল একটি। বিচারকের অভাবে বিচারকার্য মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি জন্য বেঞ্চ সংখ্যা আরও বাড়ানোর অব্যশকতা ছিল। মূলত ট্যারিফ মূল্য সংক্রান্ত জটিলতার কারণে মামলাগুলো উদ্ভব হয়। শুল্ক ফাঁকি দেয়ার নামে পণ্যের প্রকৃত মূল্য আড়াল করে আমদানিকারকরা কম মূল্য ঘোষণা দিলে রাজস্ব কর্মকর্তারা আপত্তি জানায়। তখন আমদানিকারকরা পণ্যের শুল্ক হার চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করে। আপিলেট আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রীটও করা যায়। দায়েরকৃত এসব মামলার অধিকাংশ ছিল সিআরএফ সংক্রান্ত মামলা। এ মামলার সংখ্যা ১০ হাজার ৫৪ টি। অপরদিকে শুল্ক সংক্রান্ত ১ হাজার ৮১৯টি, ভ্যাট ২৪৭ এবং টার্নওভার মামলা ২ হাজার ৫০০টি। সব মিলিয়ে মামলার সংখ্যা ১৪ হাজার ৬৪২টি। নিষ্পত্তিকৃত মামলার মধ্যে ৩০০টি সিআরএফ সংক্রান্ত। বাকি ২০০ মামলা শুল্ক ভ্যাট ও টার্নওভার সংক্রান্ত। এসব মামলার অংক সর্বোচ্চ ৫ কোটি টাকা এবং সর্বনিম্ন ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত। সিআরএফ সংক্রান্ত মামলার বিপরীতে আর্থিক পরিমাণ শতাধিক কোটি টাকা। শুল্ক সংক্রান্ত ৭০ থেকে ৮০ কোটি এবং ভ্যাট মামলার বিপরীতে প্রায় ২০ কোটি টাকা আটকে ছিল। দায়েরকৃত মামলার ৯০ ভাগ চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসের। বাকি মামলাগুলো ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী ও যশোর কাস্টমস হাউসের। রাজস্ব সংক্রান্ত মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে ঢাকায় গঠন করা হয় পৃথক কাস্টমস এক্সসাইজ ও ভ্যাট আপিলেট ট্রাইব্যুনাল। এর আগ পর্যন্ত অন্যান্য মামলার সঙ্গে এসব মামলা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিজেই নিষ্পত্তি করতো। সরকার ওই বছর রাজস্ব আইন সংশোধন করে উল্লিখিত আদালত গঠন করে। সিআরএফ সংক্রান্ত মামলাগুলো টার্নওভার টেক্স কমিশনের আদালতে নিষ্পত্তি হয়। আপিলেট ট্রাইব্যুনালে চাপ কমানোর লক্ষ্যে এ মামলাগুলো কমিশনে হস্তান্তর করা হয়। ১৯৯৯ সালের এপ্রিলে এক এসআরও জারি করে একটি 'বিশেষ বেঞ্চ' গঠনের মাধ্যমে সিআরএফ সংক্রান্ত মামলাগুলো টেক্স কমিশন আদালতে নিষ্পত্তির আদেশ জারি করা হয়। এর আগ পর্যন্ত

www.pathagar.com

টার্নওভার টেক্স কমিশনে শুধু টার্নওভার সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি হত। ১৯৯৪ সালে এই আদালত গঠিত হয়। সাধারণত ১৫ লাখ টাকার নিচে যে কোন প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত মামলাগুলো এই আদালতে নিষ্পত্তি করা হয়। চার শতাংশ হারে রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও রাজস্ব কর্মকর্তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। তখন রাজস্ব কর্মকর্তারা মূল্য নির্ধারণ নিয়ে আপত্তি জানালে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী উক্ত আদালতে আবেদন করে। সাধারণ মামলা দায়ের করার ৬০ দিনের মধ্যে টার্নওভার মামলা নিষ্পত্তি করা হয়।

৮ জুলাই ২০০১ দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, 'হাইকোর্টে বর্তমানে ১ লাখ ৬৫ হাজার মামলা ঝুলে থাকার কারণে বাদী-বিবাদী উভয়েরই ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। বিরোধী দলগুলোকে দমন-পীড়নের উদ্দেশ্যে আওয়ামী সরকারের দায়ের করা মামলাগুলো জরুরী ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করতে গিয়ে অমিমাংসিত মামলার সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। তাছাড়া মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যাপারে আইনজীবীদের উদ্যোগ ও তৎপরতার মধ্যেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সুপ্রীমকোর্ট বার এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত ২ হাজার ১শ' ৩০ জন আইনজীবী থাকলেও মূলত মানসম্মত আইনজীবীর সংখ্যা খুব একটা বেশি নেই। এদের মধ্যে মাত্র ৪৫জন আইনজীবী রয়েছেন যারা সুপ্রীমকোর্টে মামলা পরিচালনার যোগ্যতা রাখেন। যোগ্যতা সম্পন্ন আইনজীবীর স্বল্পতাও মামলা জট সৃষ্টির অন্যতম একটি কারণ। ২০০০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত হাইকোর্টে বিচারধীন মামলার সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২৭ হাজার ২৪৪টি। ২০০১ সালের ৬ মাসে আরো ২৭ হাজার ৮৯৭টি নতুন মামলা যুক্ত হয়। হাইকোর্টে মোট ৩২ বেঞ্চ (এজলাস) রয়েছে। এতে ৫৬ জন বিচারপতি কর্মরত রয়েছে। ১৯৯৬ সালের ১৩ জুলাই সরকার গঠনের পর আওয়ামী লীগ হাইকোর্ট বিভাগের ৪০ জন বিচারপতি নিয়োগ করেছে। ১৯৯৭ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ৩ জন, ১৯৯৮ সালের ২৭ এপ্রিল ৬ জন, ১৯৯৯ সালের ২৪ অক্টোবর ৮ জন, ২০০০ সালের ২৮ মে, ৫ জন, ২০০১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ৯ জন এবং সর্বশেষ ৩ জুলাই ৯ জনকে নিয়োগ প্রদান করে। এর মধ্যে কয়েকটি নিয়োগের ব্যাপারে বিরোধী দলীয় আইনজীবীগণ প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন।

www.pathagar.com

নারী নির্যাতন

এক নজরে ১৯৯৮ সালে নারী নির্যাতনের একটি চিত্র

(১) পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে একজন কিশোরীসহ ৯জন তরুণীকে গণধর্ষণ (দৈনিক দিনকাল ১৯ আগষ্ট), (২) ছাতক থানার শিবনগর গ্রামে ১২ বছরের কিশোরীকে ধর্ষণ করেছে এক নরপশু (ইনকিলাব ১৮ আগষ্ট), (৩) জামালপুর শহরের ছোনকান্দা গ্রামের বালু ঘাটে মোর্শেদা বেগম নামের এক গার্মেন্টস কর্মীকে চার নরপশু রাতভর পালাক্রমে ধর্ষণ করে (দিনকাল ১২ আগষ্ট), (৪) দেবীগঞ্জ তাবার সুন্দরদিঘী ইউনিয়নে এনজিও কর্মী গোলাম মাহমুদ ধর্ষণ করেছে জাহেদা পারভীনকে (ইনকিলাব ২১ আগষ্ট), (৫) গোয়াইনঘাটে মোহাম্মদপুর গ্রামে ৯ বছরের শিশুকে ধর্ষণ করেছে নরপশু আজাদ মিয়া (দিনকাল ২৩ আগষ্ট), (৬) যশোরের রূপদিয়া গ্রামের গৃহবধু মাকসুদা বেগম গণধর্ষণের শিকার (মানবজমিন ২৪ আগষ্ট), (৭) ১৭/৭/৯৮ তারিখের জাতীয় দৈনিকের প্রায় সবক'টি দৈনিকের সংবাদ ছিল এ রকম-ছাত্র ক্যাডারেরা ধর্ষণ করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ ছাত্রীকে, (৮) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা রেহনুমা ছাত্রলীগ ক্যাডারের হাতে লাঞ্ছিত (দৈনিক মানবজমিন ২৪ আগষ্ট), (৯) ৭ আগষ্ট চট্টগ্রামের রাংগুনিয়া থানার দক্ষিণ পোমরা গ্রামের সাত নরপশু গৃহবধু আয়েশাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে (মানবজমিন ২৪ আগষ্ট), (১০) সিলেট জেলার জকিগঞ্জ থানার জনৈক এনজিও কর্মকর্তা কর্তৃক এক তরুণী ধর্ষিত (ভোরের কাগজ ২৪ আগষ্ট), (১১) নগরীর উত্তরায় বখাটে যুবকদের হাতে ৯ জন তরুণী নিগৃহীত (ভোরের কাগজ ২৪ আগষ্ট), (১২) ২১ আগষ্ট বরিশাল শহরের নিউ সার্কুলার রোডে গৃহবধু ফরিদাকে একদল নরপশু ঘুমন্ত অবস্থায় অপহরণ করে ধর্ষণ করে (দৈনিক দিনকাল ২৫ আগষ্ট), (১৩) যশোরের ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থানার দমোদপুর গ্রামে মায়ের গলা কেটে কিশোরী কান্তাকে অপহরণ করে একদল সন্ত্রাসী (ইনকিলাব ২৫ আগষ্ট), (১৪) সিলেটে এনজিও 'তেরেসায়' কর্মরত মহিলা কর্মীর অবৈধভাবে গর্ভপাত ঘটানো হয়। দীর্ঘ দিন ধরে এনজিওর দুই সহকর্মীর দ্বারা ধর্ষিত হয়েছিল মহিলাকর্মী নিকুলা ইয়াসমিন (দৈনিক ইনকিলাব ২৫ আগষ্ট), (১৫) প্রকাশ্যে দিবালোকে জনসম্মুখে নওগাঁয় গৃহবধূ মাকদুসাকে উলঙ্গ করে গোপণাঙ্গে হাত বুলিয়ে সন্ত্রাসীদের আদিম উল্লাস। পরে মাথায় ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করে পালিয়ে যায় সন্ত্রাসীরা (দিনকাল ২৬ আগষ্ট), (১৬) নরসিংদী সদর থানার ইউএসসি জুটমিলের পুরাতন কলোনীতে তাসলিমা আক্তার নামে ৫ বছরের শিশু ধর্ষিত হয় (দিনকাল ২৬ আগষ্ট), (১৭) ২৪ আগষ্ট বিকালে ডেমরার ধলপুরের বাসার সামনে থেকে শরীফা বেগম নামের এক যুবতীকে ৫ দুর্বৃত্ত অপহরণ করে গণধর্ষণ চালায়। (দিনকাল ২৬ আগষ্ট), (১৮) বরিশাল শহরে মেয়ে ও বাবাকে এসিড নিক্ষেপ, ঝলসে যায় দুই জনেরই সমস্ত শরীর (দিনকাল ২৬ আগষ্ট), (১৯) পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে হাজীডাঙ্গা গ্রামে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী আছিয়া বেগমকে ধর্ষণ চেষ্টার দায়ে জুতাপেটা, জরিমানা ও মামলা (ইনকিলাব ২৭ আগষ্ট), (২০) ৯জন এনজিও কর্মী ধর্ষিত হওয়ার পর রংপুরের চার এনজিও কর্মকর্তা তাদের এক সহকর্মীকে জোরপূর্বক অফিস কক্ষে ধর্ষণ করেছে (ইনকিলাব ২৭

www.pathagar.com

আগষ্ট), (২১) নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানার ঋষিপাড়ায় ৩ নরপশু ১২ বছরের কিশোরী গার্মেন্টস শ্রমিককে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে (ইনকিলাব ২৭ আগষ্ট), (২২) পাবনায় এক নরপিশাচ চিকিৎসক ও তার দুই সহযোগী কর্তৃক গণধর্ষণের শিকার হয়ে এক রুগিনী পাবনা হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়েছে (দিনকাল ২৭ আগষ্ট), (২৩) একজন কর্মজীবী মহিলাকে তেজগাঁও থেকে অপহরণ করে নিয়ে এসে রাজধানীর উত্তরার আজমপুর এলাকায় তিনদিন ধরে ধর্ষণ করেছে কয়েকজন নরপশু (দিনকাল ২৭ আগষ্ট), (২৪) ক্রীড়াবিদ লাভলীর ইজ্জত হরণ (মানবজমিন ২৬ আগষ্ট), (২৬) নগরীর হাইকোর্টের লিফটম্যান আলী আকবর ১০ বছরের সেলিনা নাম্মী এক কিশোরীকে লাঞ্ছিত করে (মানবজমিন ২৬ আগষ্ট), (২৭) টঙ্গী-আশুলিয়া বাজারে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্বের ২য় বর্ষের ছাত্রী ক্যাম্পাসে ফেরার পথে ৩/৪ জন স্থানীয় অস্ত্রধারী যুবক অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে একটি পরিত্যক্ত ঘরে নিয়ে তার উপর গণধর্ষণ চালায় (ইনকিলাব ২৮ আগষ্ট), (২৭) মানিকগঞ্জের আশ্রয় কেন্দ্রে ৮ বছরের বালিকাকে খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে ইদ্রিস ও সহিদুল নামে দুই নরপশু ধর্ষণ করেছে (জনকণ্ঠ ৩১ আগষ্ট), (২৮) লালমনিরহাটের কালিগঞ্জে নবম শ্রেণীর ছাত্রী এবং দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে এক যুবতী ধর্ষিত হয়েছে (দিনকাল ৩০ আগষ্ট), (২৯) শ্লীলতাহানি ও বস্ত্র হরণের আরেকটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে নওগাঁও জেলার ধামরাই হাট থানার চকসবদল গ্রামে। প্রতিবেশী আশরাফ আলী ও তার সঙ্গীরা গৃহবধূ মাসুদাকে চুল ধরে ঘর থেকে টেনে বাইরে নিয়ে এসে জনসম্মুখে তার ব্লাউজ ছিঁড়ে ফেলে এবং শাড়ী উপরে তুলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে তার গোপণাঙ্গ ও স্তনে আঘাত করতে থাকে ও শ্লীলতাহানি ঘটায়। পরে তাকে ধামরাইহাট হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তার কুড়ানোকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে ঘটনাটি ঘটে। মাকসুদার স্বামী সফিকুল বলেন, 'ওরা ক্ষমতাসীন দলের লোক। ওরা এখন মামলা তুলে নেয়ার কথা বলছে, নাহলে জানে খতম করার হুমকি দিচ্ছে' (ইনকিলাব ২৮ আগষ্ট), (৩০) ১৬ আগষ্ট সৈয়দপুর স্কুল ছাত্রী সাবিনা খাতুনকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে আশরাফুল নামের এক নরপশু (মানবজমিন ১ সেপ্টেম্বর), (৩১) রাজধানীর মনিপুরি পাড়ার একটি বাসায় ১৭ বছরের একজন যুবতী ধর্ষিত হয়েছে গৃহকর্তা দ্বীপক বিশ্বাস নামে এক নরপশু দ্বারা (ভোরের কাগজ ২ সেপ্টেম্বর), (৩২) ২৭ আগষ্ট ইডেন কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীকে বিয়ের কথা বলে তার কথিত প্রেমিক ইকরামুল্লাহ বাবুল ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ আসার পথে লিং রোডে মিজমিজি এলাকায় ধর্ষণ করে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় (ভোরের কাগজ ২ সেপ্টেম্বর), (৩৩) রাজধানীতে লালবাগ এলাকায় নাজিমুদ্দিন রোডে স্বামী আবুল হোসেনের নিক্ষিপ্ত এসিডে দগ্ধ হয়েছে আলেয়া বেগম নামে এক মহিলা (ডেইলী স্টার ২৭ আগষ্ট)।

শুধু ১৯৯৮ এর আগষ্ট মাসে পঞ্চগড়ে ১৯টি নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। দেবীগঞ্জে ৯ জন মহিলার ধর্ষণকারীদের নায়ক ছিলেন এনজিও কর্মকর্তা আতাউর রহমান এবং খল নায়িকা ছিলেন লায়লা বেগম। ধর্ষিতারা থানায় মামলা করতে গেলে ওসি প্রদীপ কুমার রায় মামলা নিতে গড়িমসি করে, এক পর্যায়ে এলাকাবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে টিনএনও মামলা নিতে বাধ্য করে তাও ১১ দিন পর। উল্লেখ্য আতাউর এনজিওর ব্যানারে চাকরি দেয়ার নামে চালিয়েছে নারী পাচার ও নারী ধর্ষণের মতো নোংরা কর্মকান্ড। এনজিওর প্রভাব যেখানে বেশি সেখানেই ধর্ষণজনিত ঘটনা বেশি ঘটতে দেখা গেছে। ৩১ আগষ্ট ইনকিলাব খুলনা ব্যুরো সংবাদদাতা খবর দিয়েছেন শুধু কালিগঞ্জ থানায় বিগত ৭ মাসে শিশুসহ ১০ জন মহিলা ধর্ষিত হয়েছে। গত ৪ মাসে চট্টগ্রামে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৭০টি। এর মধ্যে ধর্ষণ ২৯টি, নারী ও শিশু

www.pathagar.com

নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ১২টি, অপহরণ ১০টি, এসিড নিক্ষেপ ১টি এবং অন্যান্যভাবে নির্যাতিত হয়েছে আরো ৫ জন নারী। শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র চট্টগ্রামের স্থানীয় পত্র-পত্রিকা থেকে এ তথ্য সংগ্রহ করেছে। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ২৯ আগষ্ট ১৯৯৮)

দি ইনস্টিটিউট অব ডেমোক্রেটিভ রাইট (আইডিআর) এক জরিপে দেখা গেছে, শুধু আগষ্ট মাসে সারা দেশে ১২৬টি খুন এবং ৮৯ জন শিশু গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা ঘটেছে ৭টি। ধর্ষিতদের বয়স ৪-৪৫ বছর। (সূত্রঃ দৈনিক ভোরের কাগজ ২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮)

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ পবা থানার ধর্মহাটা গ্রামের দরিদ্র দিনমজুরের মেয়েকে প্রতিবেশী প্রভাবশালী আশরাফ মন্ডলের ছেলে নয়ন ও একই এলাকার নূর মোহাম্মদের ছেলে শফি টিভিতে ভালো ছবি হচ্ছে বলে বাড়িতে নিয়ে যায়। রাত পৌনে ৮টার দিকে নয়ন নিজের শোবার ঘরে ধারালো অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে ছবি তোলে। শফি যখন জোর করে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে তখন সে দৃশ্যের ছবি তোলে নয়ন। আবার নয়ন ধর্ষণ করার সময় ছবি তোলে শফি। উলঙ্গ ছবি তোলা ও ধর্ষণের পর মেয়েটিকে ছেড়ে দেয়ার সময় নয়ন ও শফি হুমকি দিয়ে বলে, এখন থেকে ডাকলেই যেন সে চলে আসে, নইলে ছবিগুলো সবাইকে দেখিয়ে দেবে। নয়ন ও শফি ছবিগুলো ওয়াশ করতে দেয় স্থানীয় স্টুডিও মালিক মাহফুজকে। মাহফুজ ছবি দেখে ধর্ষিতার বাবাকে জানায়। বাবা স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে ঘটনা জানিয়ে বিচার প্রার্থনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি মেরাজ মোল্লার মাধ্যমে ঘটনাটি ওসি আবু বকর সিদ্দিককে জানান। ওসি ১৮ ফেব্রুয়ারি মাহফুজকে গ্রেফতার করে থানা নিয়ে এসে ছবিগুলো হাতিয়ে নেয়। পরে ৪০ হাজার টাকার বিনিময়ে মাহফুজকে ছেড়ে দেয়ার তথ্য প্রকাশিত হয় ২৮ ফেব্রুয়ারি দৈনিক প্রথম আলোতে। ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের পাশাপাশি ব্ল্যাকমেইলিংয়ের যে অভিযোগ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় সে একই ঘৃণ্য কাজ করেছে ওসি। ধর্ষিতার বাবা ঘটনার পর বিচারের আশায় প্রতিটি দিন থানায় গেলেও ওসি মামলা না নিয়ে তাকে ঘুরাতে থাকে। আসামী পক্ষ থেকে লক্ষাধিক টাকা খেয়ে ওসি মামলা নিতে গড়িমসি করে। ওসি ধর্ষিতার বাবাকে বলেন, 'কিছু মাল আদায় করে দিচ্ছি, এতে তোমারও দিনকাল ভালো কাটবে, আর তোমার কালো মেয়েটার একটা ভালো বিয়েও দিতে পারবা।' নানা সূত্রে খবর পেয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি একদল সাংবাদিক ঘটনাস্থলে গিয়ে নির্যাতিত মেয়েটার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে লোমহর্ষক এই ঘটনার বিষয়ে প্রায় ভারসাম্যহীন হয়ে পড়া মেয়েটির দেয়া করুণ বর্ণনা রেকর্ড করেন। সাংবাদিকরা যোগাযোগ করছে জানতে পেরে ওসি মেয়েটি ও তার বাবাকে থানায় তুলে এনে ১০ মিনিটের মধ্যে মামলা রেকর্ড করে। ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত একটি জাতীয় দৈনিকের খবরে বলা হয়, 'পবা থানার ওই ওসি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে ১০ দিনের ট্রেনিংয়ের অনিয়মিত ছুটি নিয়ে রাজশাহী ত্যাগ করেছেন।' ওসির অপকর্ম জানাজানি হওয়ার পরও তাকে শাস্তির হাত থেকে রেহাই দিতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কি করে তাকে এমনতরো ছুটি দেন সে বিষয়ে তদন্তের জন্য সরকার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ওই ঘটনার ধর্ষণকারীদের অপরাধ আর ওসির অপরাধের মধ্যে আদতে কোনো গুণগত পার্থক্য ছিল না।

৪ মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় গাজীপুরের কালিগঞ্জ থানাধীন জুগুলী গ্রামের দরিদ্র কৃষক ফাইজুদ্দিনের ৩ মাসের অন্তঃসত্ত্বা তরুণী কন্যা নাসিমা বেগম শ্বশুরালয় থেকে প্রকৃতির ডাকে বের হলে পিছন দিক থেকে নজরুলের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী তার মুখ চেপে ধরে অপহরণ

www.pathagar.com

করে। নরপশুরা তাকে একটানা ১০ দিন বিভিন্ন স্থানে আটকে রেখে ধর্ষণও করে। ধর্ষিতার পিতা কন্যাকে অপহরণ করার ঘটনায় বিচার প্রার্থী হয়ে থানায় মামলা দিতে গেলে পুলিশ ঘটনার ব্যাপারে নিয়মিত মামলা না নিয়ে একটি জিডি এন্ট্রি করে। নাসিমাকে উদ্ধারের জন্য পুলিশ কোনো সহযোগিতা করেনি। লোকজনের সহায়তায় নাসিমাকে উদ্ধার করার পর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে পাশবিক নির্যাতনের চিহ্ন দেখিয়ে দ্বিতীয় দফায় নরপিশাচদের বিরুদ্ধে মামলা করতে যান। কিন্তু পুলিশ তার মামলাটি নেয়নি। উপরন্তু পুলিশের চরম দুর্ব্যবহার ও অসহযোগিতা পেয়ে তিনি ফিরে আসেন। পরে আদালতের নির্দেশে ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের দু'মাস পর ৩ এপ্রিল নারী নির্যাতন আইনে মামলাটি নেয়। আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মামলাটি নেয়ার জন্য থানা পুলিশকে ৮ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। সত্যতা যাচাইয়ের পর ঘটনা এফআইআর হিসেবে নেয়ার জন্য কোর্টের নির্দেশ থাকার পরও কোন কালক্ষেপণ করা হচ্ছে শুধু এইটুকু বলার অপরাধেই বাদী ফাইজুদ্দিনকে ভোগ করতে হয় অমানুষিক পুলিশী নির্যাতন ও নানা বিড়ম্বনা। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আলী আকবর মাতব্বর তাকে থানায় বেদম মারপিট করে। এক পর্যায়ে দারোগার লাথি ও ঘুষিতে ফাইজুর সামনের দু'টি দাঁত মারাত্মক আঘাত প্রাপ্ত হয়। দারোগা ফাইজুকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করে বলতে থাকে 'শালার পুলা, তুই দিচ্ছিস ৮ হাজার আর আসামীরা দিয়েছে ১ লাখ টাকা। খাতির কি তোকে করব'? (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ১৯ জুন ১৯৯৯)

১৬ মার্চ সংবাদপত্রে বৃটিশ হাই কমিশনের এক সার্কুলার প্রকাশিত হয়। হাই কমিশন সার্কুলারে প্রবাসী বৃটিশ মহিলাদের বাংলাদেশের কোনো থানায় পুরুষ সঙ্গী ছাড়া যেতে নিষেধ করে দেয়। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় ঢাকার গুলশানে একজন বৃটিশ যুবতী গুলশান থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গিয়ে চার পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হন। ধর্ষিতা মহিলার বারিধারাস্থ বাসায় রাত ৩টায় চুরি হয়। ঘুম ভাঙলে রাতেই নাইট ড্রেস পরিহিত অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে থানায় চলে যান। থানা গিয়ে এ ঘটনা জানালে ৪ জন পুলিশ অভিযোগ লেখার কথা বলে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। এ ঘটনায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান। তার পরিবারের পক্ষ থেকে ঘটনাটি ব্রিটিশ হাই কমিশনে জানানো হলে হাই কমিশনার আইজিকে লিখিতভাবে তা অবহিত করেন। একই সাথে উপরোক্ত মর্মে প্রথমবার সার্কুলার জারি করেন। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ১৯ মার্চ ১৯৯৯)

দুর্গাপুরে দুস্কৃতিকারীদের হাতে নিহত আওয়ামী লীগ কর্মী আজিজুল ইসলাম হত্যাকান্ডের ঘটনা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য. দুর্গাপুর থানা পুলিশ ১৬ এপ্রিল রাতে সানপুকুর গ্রামের আব্দুল আজিজকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। ঐদিন আজিজের দুই স্ত্রী বেদানা বেগম ও চিনি মালা তাকে দেখতে গেলে পুলিশ তাদের আটক করে। নিহত আজিজুলের হত্যাকারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের নামে তাদের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। দু'দিন থানা হাজতে আব্দুল আজিজ ও তার দু'স্ত্রীকে আটক রাখার পর ১৭ এপ্রিল এসআই আশরাফ ১শ' টাকা দিয়ে চিনি মালাকে দুপুর ১২টার দিকে থানা থেকে ছেড়ে দেয়। এরপর বেলা ২টার দিকে থানা হাজত থেকে বেদানা ওসি কাজী আতাউর রহমানের কক্ষে এনে এসআই অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এসআই সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর ওসি একইভাবে তাকে ধর্ষণ করে এবং এ ঘটনা গোপন রাখার জন্য অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তাকে হুমকি দেয়।

১৮ জুন চাঁপাইনবাবগঞ্জের রহনপুর স্টেশন থেকে রাজশাহীগামী এক চলন্ত শাটল ট্রেনে তিন সন্ত্রাসী নরপশু কর্তৃক কিশোরী ধর্ষিত হয়। রাজশাহী স্টেশনে পৌঁছে কিশোরীটি স্টেশনের

www.pathagar.com

উপস্থিত লোকজনের সামনে জিআরপি পুলিশের কাছে এ পাশবিক ঘটনাটি বর্ণনা করে। আসামীদের গ্রেফতার করে পরবর্তী যোগাযোগের জন্য কিশোরীটি রাজশাহীতে রিকশাচালক তার খালু শাহজাহান এর ঠিকানা বলেছিল। সেই খালুকে ঘটনার দিন সন্ধ্যায় পুলিশ মামলা নেয়ার কথা বলে ডেকে নিয়ে মামলা করতে হলে পাঁচ হাজার টাকা দাবী করে। টাকা দিতে তার অক্ষমতা প্রকাশ করার ফলে পুলিশ এজাহার নিয়েও মামলা রেকর্ড করেনি। কয়েকটি জাতীয় সংবাদপত্রে লোমহর্ষক এ সংবাদের সঙ্গে পুলিশ আচরণের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের কড়া নির্দেশে জিআরপি মামলা রুজু করে। মামলা রুজু হওয়ার পরই কিশোরটিকে পুলিশী হেফাজতে এনে ওইদিনই তার ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়।

২৪ জুন ধর্ষণের শিকার গৃহবধূ নাজমার মামলা নিতে প্রথমে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল ডেমরা থানা পুলিশ। নাজমা থানায় যাওয়ার ৯ ঘন্টা পর সাংবাদিকদের চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত মামলাটি নিতে বাধ্য হয় পুলিশ। স্বামী নূর উদ্দিনের সামনে থেকে ধরে নিয়ে এক সন্তানের মা নাজমাকে বাড়িওয়ালা হাবিবুর রহমান, কিরন ও অজ্ঞাত আরো ২ জন পালাক্রমে ধর্ষণ করে। নাজমা ভোর ৫টায় ডেমরা থানায় যান মামলা করার জন্য। দুপুর ২টা পর্যন্ত শত অনুরোধের পরও থানা তার মামলা নিতে চায়নি। নাজমা সাংবাদিকদের জানান, 'আমি বুধবার রাতে ধর্ষিত হয়েছি। আমার স্বামীর সাথে শত্রুতা বাধিয়ে আমাকে ঘরে আটকিয়ে পর পর ৪ জন আমার ইজ্জত লুটেছে।' ৪ নরপশুর অত্যাচারে নাজমার শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়। স্বামীর সামনে থেকে ঝাপটে ধরে নিয়ে ৪ জনে রাত ২টা থেকে অত্যাচার শুরু করে। এ সময় রক্তাক্ত হয়ে যায় তার শরীর। স্বামীর সামনে থেকে কেড়ে নেবার সময় তিনি তার স্বামীকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। কিন্তু ওরা তাকে কিল-ঘুষি-লাথি মেরে নাজমাকে কেড়ে নেয়। নাজমাকে ধর্ষণ করার সময় নূর উদ্দিনকে আটকে রাখা হয় অন্য একটি ঘরে। নাজমা ছাড়া পেয়ে ভোর ৫টায় ডেমরা থানায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। এর কিছুক্ষণ পর তার স্বামীও থানায় যান। তারা এ ব্যাপারে মামলা করতে চান। কিন্তু ভোর ৫টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত অনুরোধ করলেও থানা কর্তৃপক্ষ তাদের মামলা নেয়নি। নূর উদ্দিন পুলিশকে অনেক অনুরোধ করেন। কিন্তু কিছুতেই তারা মামলা নিতে চায়নি। ডিউটি অফিসার পাঠায় সেকেন্ড অফিসারের কাছে। ডেমরা থানায় তখন পত্রিকার কয়েকজন সাংবাদিক যান। সাংবাদিকদের উপস্থিতি টের পেয়ে পুলিশ নাজমাকে ডেকে নেয়। রাজি হয় মামলা রেকর্ড করতে।

পঞ্চগড় সদর থানার তালমা আদর্শ গুচ্ছগ্রামের মহিলা সদস্যরা নিজস্ব সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে রোপিত ২টি ইউক্যালিপটাস গাছ বিক্রি করে পুকুরে মাছের পোনা ক্রয়ের জন্য ২০ জুন কর্তন করে। কিন্তু স্থানীয় সাবেক ইউপি সদস্য জয়নাল, জাকির ও অমরখানা তহসীল অফিসের তহসীলদার মোঃ আবুল কাশেম গাছ দু'টি সরকারি এই মর্মে অজুহাত দেখিয়ে উৎকোচ দাবী করে। সদস্যরা দিতে অস্বীকার করলে ২৫ জুন রাতে পঞ্চগড় থানার এসআই নাজমুল হক ও কনস্টেবলরা নীরিহ মহিলাদের বিবস্ত্রসহ নির্যাতন চালায়। পুলিশের নির্যাতনে কোলের শিশুরাও রেহাই পায়নি।

৭ মে ২০০০ চট্টগ্রামের বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থিয়েটার আর্টস (বিটা) মিলনায়তনে বিটা আয়োজিত 'নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড পরিবীক্ষণ'-শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রামের পুলিশ কমিশনার এটিএম আহমেদুল হক চৌধুরী বলেন, 'চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকার থানা সমূহে গত ৭ মাসে ২৮ টি ধর্ষণ, ৩৭ টি নারী নির্যাতন এবং ১৬ টি কিশোরী অপহরণের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে।' তার তথ্যমতে ধর্ষণ, অপমৃত্যু, হত্যার

www.pathagar.com

৫২২টি মামলা দীর্ঘদিন ধরে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে। এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক বিভাগকে দায়ী করে তিনি বলেন, 'ভিসেরা ও পোস্ট মর্টেম রিপোর্টের অভাবেই এগুলো পড়ে রয়েছে।' তার মতে, কেবল পোস্টমর্টেম রিপোর্টি পেলেও অনেক ক্ষেত্রে এগুনো যায়; তাও সম্ভব হয়নি। পুলিশ কমিশনার আরও বলেন, 'অপমৃত্যুর ক্ষেত্রে লাশের পাশে একজন কনস্টেবল ছাড়া কোন নিকটজনও অনেক সময় কেউ থাকে না। লাশের পোস্ট মর্টেম করতে ডোমকে আনতে হলে ২ বোতল মদ, নগদ ২০০ টাকা, সিগারেট দিতে হয়। তাও কনস্টেবলকেই দিতে হয়। শুধু তাই নয়, লাশ নেয়ার লোক পাওয়া যায় না। আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামকে খুঁজে দায়িত্ব দিতে হয়। তাছাড়া নির্যাতিতার সমর্থনে কাউকে পাওয়া যায় না। চার্জশিট দেয়ার পর মামলা কোর্টে গেলে মেয়েটি অসহায় হয়ে যায়। ধর্ষণকারী, খুনীদের সঙ্গে থাকতে হয় নির্যাতিতাকে। ফলে থানায় যেতে আগ্রহীদের চেয়ে কোর্টে যেতে আগ্রহীর সংখ্যা কম বলে তিনি প্রস্তাব করেন সরকারের ভিকটিম সাপোর্ট স্কিম থাকা উচিত।' বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ফরেনসিক বিভাগের প্রধান ডা. হাসানউজ্জামান পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাদের দায়িত্বহীনতাকে দায়ী করে বলেন, 'অপমৃত্যুর লাশ মর্গে নেয়া বা এ সংক্রান্ত কাজের সব নিয়ম সারদা একাডেমিতে শেখালেও তারা সেসব কাজে লাগান না।'

কেরানীগঞ্জের কলতিয়া ইউনিয়নের মিরাশ আসামদীপুর গ্রামের মোহাম্মদ কাইউমের স্ত্রী মনোয়ারা বেগম তার ভাইকে বিদেশ পাঠাবার জন্য স্বামীকে ৯০ হাজার টাকা দেন। কিন্তু স্বামী তার শ্যালককে বিদেশে পাঠাতে ব্যর্থ হয়ে টাকা ফেরত দেয়নি। টাকা ফেরত দেয়ার জন্য মনোয়ারা এবং বাপের বাড়ির আত্মীয়-স্বজনরা বার বার তাগাদা দিয়েও কোনো কাজ হয়নি। এ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে মনোয়ারা বাপের বাড়ি চলে যায় এবং পরে এ সম্পর্কে ইউপি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা নিজাম উদ্দিনের কাছে ১৯৯৮ সালের ৬ মে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের বিচারের জন্য চেয়ারম্যান প্রথম তারিখ নির্ধারণ করেন ২২ মে। দ্বিতীয় দফায় তারিখ নির্ধারিত হয় ২৯ মে। কিন্তু ১৮ মে চেয়ারম্যান তার এক ঘনিষ্ঠ লোক মারফত পরদিন সকাল ৮টার মধ্যে মনোয়ারকে জিঞ্জিরা ফেরিঘাটে উপস্থিত থাকতে বলেন। মনোয়ারা চেয়ারম্যানের বেঁধে দেয়া সময়মত ফেরিঘাটে উপস্থিত হলে চেয়ারম্যান তার জীপ গাড়িতে করে উপস্থিত হয়ে মনোয়ারাকে ইউনিয়ন পরিষদে না নিয়ে মিঠাপুকুর গ্রামে নিজ বাড়িতে নিয়ে যায়। বাড়িতে নিয়ে মনোয়ারাকে ধর্ষণের জন্য ঝাপটে ধরে। তাকে বিবস্ত্র করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। দু'জনে কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে মনোয়ার দুশ্চরিত্র চেয়ারম্যানের কবলমুক্ত হয়। এ ব্যাপারে মনোয়ারা ৪ জুন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে একটি পিটিশন মামলা করেন। পিটিশন মামলা তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে কেরানীগঞ্জ থানার ওসিকে কোর্ট নির্দেশ দিলে ওসির তদন্ত শেষে ৬ জুলাই চেয়ারম্যানকে ৩৫৪ ধারায় অভিযুক্ত করে মামলা (নং-১১) রুজু করেন। এই মামলায় ঢাকা জেলা ডিবির ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ আলী চার্জশীট দাখিল করলে মনোয়ারা আপত্তি জানিয়ে ১৯৯৫ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে চার্জশীট দাখিলের জন্য কোর্টে আবেদন করেন। কোর্টের নির্দেশে সহকারী পুলিশ সুপার (কেরানী সার্কেল) খোন্দকার একে গিয়াসউদ্দিন মামলাটির পুনরায় তদন্ত শেষে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের ৯(গ) ধারায় চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিলের সুপারিশ করেন। জেলা পুলিশ সুপার মুজিবুর রহমান অভিযুক্ত চেয়ারম্যানের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করেন। ধর্ষণের চেষ্টা সংক্রান্ত মামলার ডকেটটি মাসের পর মাস চাপা দিয়ে রাখেন। এভাবেই মাসের পর মাস পার করে মতামতের জন্য পিপির কাছে ডকেট পাঠানো হয়। পিপি একই ধারায় চার্জশীট দাখিলের সুপারিশ করেন ২২

www.pathagar.com

ফেব্রুয়ারি ২০০০। এরপর কেইস ডকেটটি লাল ফিতার এসপি অফিসে বন্দী ছিল। দীর্ঘ বিলম্বের পর অবশেষে ডকেটটি এসপিমুক্ত ১৮ এপ্রিল। ওই দিন চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে চার্জশীট দাখিল হয়। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ৩ জুন ২০০০)

১৯৯৬ সালের ২০ মার্চ গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ থানার ভোলারা গ্রামের সাইফুল ইসলামের সাথে ষোড়শী কুসুমের বিয়ে হয়। বিয়ের পর কুসুমের ওপর গ্রামের কিছু বখাটে ছেলের কুনজর পড়লে এক পর্যায়ে তারা সাইফুলকে হাত করে এবং ২৫ মে গভীর রাতে সাইফুল ঘরের দরজা খুলে পাষন্ডদের হাতে কুসুমকে তুলে দেয়। কুসুমের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইনছার, ইছহাক, নূরুজ্জামান মন্ডল, জয়নাল তাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। কুসুম বাধা দিতে গেলে তার চোখ, হাত, পা তলপেটে মেরে জখম করে ও স্তনে কামড় দেয়। ধর্ষণ ও নির্যাতনের পর কুসুম মৃতপ্রায় হয়ে গেলে পাষণ্ডরা গলায় ওড়না বেঁধে গাছে ঝুলিয়ে রাখে। সাইফুল এক পাশে থেকে সব ঘটনা দেখে এবং অপকর্মে সহায়তা করে। পরেরদিন সাইফুল, তার ভাই জলিল, রফিকুল, জহুরুল গংরা প্রচার করে যে কুসুম গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এ ঘটনা নিয়ে মামলা হলে ১৯৯৮ সালের ২৭ জুলাই গাইবান্ধা জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালতের বিচারক সিরাজ উদ্দিন এক রায়ে সাইফুল, ইনছার, ইছহাক, নুরুজ্জামান মন্ডল, জয়নালকে মৃত্যুদন্ডাদেশ এবং জলিল, রফিকুল ও জহুরুলকে খালাস দেন। ২৫ জুন বিচারপতি মোঃ রুহুল আমিন ও বিচারপতি এ বিএম খায়রুল হক সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট ডেথ রেফারেন্স বেঞ্চ এই মামলা দীর্ঘ শুনানী শেষে সাইফুল ছাড়া অন্যদের খালাস প্রদান করে। আদালতে সরকার পক্ষে ডেপুটি এটর্নী জেনারেল ব্যারিস্টার সামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, সহকারী এটর্নী জেনারেল সৈয়দ হায়দার আলী ও আসামী পক্ষে আব্দুর বাসেত মজুমদার মামলাটি পরিচালনা করেন। সাইফুলকে মৃত্যুদন্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন দন্ড দেয়া হয়। তবে আদালত রায়ে পুলিশ ও মামলা পরিচালনায় জড়িত ব্যক্তিদের গাফিলতি, অবহেলার সমালোচনা করে তারা বলেন, এই মামলায় পুলিশ ভীষণ ব্যর্থতা ও অবহেলার পরিচয় দিয়েছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা সুন্দরগঞ্জ থানার ওসি আব্দুল জলিল শেখ এ মামলায় প্রয়োজনীয় সাক্ষীদের আদালতে আনেননি। বরং যারা ঘটনা দেখেনি তাদের মামলার সাক্ষী করা হয়েছে। অন্যদিকে ময়না তদন্তকারী গাইবান্ধা সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক ডা. মোঃ রফিকুল ইসলাম তার প্রতিবেদনে বলেছেন, কুসুমের যৌনাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। অন্যদিকে আদালতে সাক্ষ্য দানকালে বলেছেন, ধর্ষণের কোনো আলামত মহিলার দেহে পাওয়া যায়নি। অথচ মামলার সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা যায়, কুসুমকে ধর্ষণের পর গলায় ফাঁস দিয়ে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রায়ের অভিমতে বলা হয়, রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধানের জ্ঞাত করা দরকার পুলিশ ও মামলার পরিচালনায় জড়িত ব্যক্তিদের গাফিলতি এবং অবহেলার ফলে অনেক মামলার আসামীকে সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দেয়া ছাড়া আদালতের আর কোনো উপায় থাকে না। এই রায়ের একটি কপি প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিবের কাছে প্রেরণ করা হোক। একই সাথে রায়ে আরো বলা হয় যে, এই মামলায় ৩ জন চাক্ষুষ সাক্ষী আছে যে, আব্দুল জলিল, রফিকুল ইসলাম ও জহুরুল ইসলাম কুসুমকে গাছে ঝুঁলিয়ে রাখে। চাক্ষুষ সাক্ষী থাকা সত্ত্বেও বিচারক এই ৩ জনকে খালাস প্রদান করেছেন সুতরাং এই রায়ের একটি কপি ঐ বিচারকের কাছে পাঠানো হোক। সরকারের ডেপুটি এটর্নী জেনারেল এই রায়কে যথার্থ উল্লেখ করে বলেছেন, স্থানীয় প্রসিকিউশন বা জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল নিম্ন আদালতে ছেড়ে দেয়া আসামীদের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করা। (সূত্রঃ দৈনিক মানবজমিন ২৬ জুন ২০০০)

www.pathagar.com

পুলিশের অপরাধ প্রবণতা

ব্রিটিশ যখন এদেশ শাসন করেছিল তখন একটি নীতি তারা বিশ্বাস করত তাহলো কারাগারে যারা বিপ্লব করার চেষ্টা করবে তাদের গণহারে গুলি করে মারা হবে। ব্রিটিশরা এ ধরনের মানসিকতা মূলত তাদের বিরুদ্ধে যাতে আন্দোলন সংগঠিত না হতে পারে তার জন্য করেছিল। ব্রিটিশরা বিতাড়িত হওয়ার পর পাকিস্তানিরা কিছু অত্যাচার সংশোধনী এনে প্রচলন করে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের কাজটি। অবশ্য রাজনৈতিক কারণে ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানের সময় কারাগারে সার্জেন্ট জহিরুল হককে তারা গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুজিব আমলে বন্দীদের উপর মাত্রাতিরিক্ত নির্যাতন করে মেরে ফেলার সংস্কৃতি আবিষ্কৃত হয়। আর সেই সংস্কৃতির প্রবর্তক ছিলেন মুজিব স্বয়ং। লাল ঘোড়া দাবড়ানোর হুঙ্কার করে তিনি বিরোধী দলকে নির্মূলের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। ফলশ্রুতিতে পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী বিরোধী রাজনৈতিক বন্দীদের উপর নিপীড়ন করে হত্যা করার অঘোষিত লাইসেন্স পেয়েছিল। অনেককে তারা হত্যা করে হজম করেছে কিন্তু বিপ্লবী সিরাজ সিকদারকে হত্যা করে ঘটনা চাপা দিয়ে রাখতে পারেনি। হাসিনার শাসনামলেও পুলিশের অতীত অত্যাচারের ধারা অব্যাহত ছিল। আর এই সকল অপকর্ম যারা করেছে তারা সরকারের অতি প্রিয়ভাজন ছিল।

তরতাজা যুবক ছাত্রদল নেতা তুহিন মিছিলে শ্লোগান হেঁকে আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে রাজপথ কাঁপিয়ে বাসায় আর ফিরতে পারেনি। পুলিশ তাকে মতিঝিল থানায় ধরে এনে অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে। হত্যার পর মিথ্যা কাহিনী ফাঁদা হয় যে, তুহিন গলায় জুতার দড়ি দিয়ে ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করেছে।' কি মিথ্যাচার! জুতার ফিতার দৈর্ঘ্য কত? তুহিনের আত্মহত্যার কাহিনী দেশে-বিদেশে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করে। বিএনপির নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ তখন লন্ডনে ছিলেন। দেশে ফিরে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'লন্ডনে এক ব্রিটিশ আইনজীবী যখন আমাকে প্রশ্ন করলেন How long is your shoe lace. তখন খুব লজ্জা পেলাম।

সামান্য রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত রেষারেষির কারণে বলদর্পী শাসকের হাতে একটি নিরপরাধ মেধাবী তরুণের নিঃশেষ হওয়ার কাহিনী হচ্ছে রুবেলের কাহিনী। আওয়ামী লীগের নেত্রী মুকুলী বেগম রুষ্ট ছিলেন রুবেলের উপর। মুকুলী তার দল ক্ষমতায় থাকায় এসি আকরামকে দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করিয়েছিলেন রুবেলকে। প্রধানমন্ত্রীও উভয়ের অবৈধ কর্মকান্ডকে সমর্থন করেছিলেন। ১ আগস্ট ১৯৯৮ প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নির্যাতনে হত্যাকান্ডের শিকার এদেশে রুবেলই প্রথম হয়নি, দীর্ঘদিন ধরে এই ঘটনা ঘটছে।' এ বক্তব্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী রুবেল হত্যাকান্ডকে একটি স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবেই দেখাতে চেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন রুবেল হত্যাকান্ডের যখন তদন্ত চলছে তখন প্রধানমন্ত্রী এ হত্যাকান্ডকে কেন হালকা করে দেখছেন? এ বক্তব্য তিনি কেন দিলেন? তাহলে কি তিনি পুলিশ হেফাজতে এই মৃত্যুকে সমর্থন করলেন? তার এ বক্তব্য কি অপরাধী পুলিশ কর্মকর্তারা প্রশ্রয় পেলো না? প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে

www.pathagar.com

সামনে রেখেই রুবেল হত্যাকান্ডের মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য সরকারি দলের পক্ষ থেকে একাধিক 'সাবোটাজ' কাহিনী প্রচার করা হয়। অফিস, ব্যাংক-বীমায়, ক্লাবের আড্ডায় আওয়ামী সমর্থক লোকজন খুব সুকৌশলে তাদের আবিস্কৃত 'সাবোটাজ' কাহিনীগুলো বলেছে। এসব 'সাবোটাজ' কাহিনীর মধ্যে রয়েছে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বডিগার্ড, রুবেলের সঙ্গে প্রেমের ঘটনা জড়িত ইত্যাদি। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, আবিস্কৃত 'সাবোটাজ' কাহিনীর তথ্যগুলো স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে দলের নিম্নস্তরের নেতারা পর্যন্ত একবাক্যে বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'রুবেল হত্যাকান্ডের বিচার প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ কারো দাবীর জন্য আমরা বসে থাকিনি।' কিন্তু বাস্তব ঘটনা হচ্ছে দাবীর আগে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠিত হয়নি। যখন এ হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে জনমত তীব্র হয়েছে তখনই সরকার তদন্ত কমিটি করতে বাধ্য হয়েছে। রুবেলের বাবা সাংবাদিক সম্মেলন করে সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবী জানিয়েছিলেন। সর্বস্তরের মানুষও একই দাবী করেন। কিন্তু সরকার তদন্ত কমিটি করলেও সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতির নেতৃত্বে তা করা হয়নি। এ ছাড়া বিশেষ ট্রাইব্যুনাল করা হয়নি।

১৮ অক্টোবর হরতালে ফকিরাপুলে পুলিশ পিটিয়ে হত্যা করে আব্বাস আলীকে। পুলিশের বেদম প্রহার ও বুটের গুঁতোয় আব্বাছ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। হত্যা করার পর পুলিশ বলেছে, সে একজন মাদকাসক্ত ও ছিনতাইকারী ছিল। হত্যাকান্ড জায়েজ করার জন্য পুলিশ যে কতো ধরনের অপবাদ নিহত ব্যক্তিকে দিতে পারে এ হত্যাকান্ডই তার বড় প্রমাণ। আব্বাস নিহত হওয়ার পর পুলিশ বাবা-মা'র কাছ থেকে জোর করে লাশ ছিনিয়ে নিয়ে আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করে। আব্বাছের নামাজে জানাযায় তার পিতা ও ভাইসহ আত্মীয়-স্বজনকে শরীক হতে দেয়া হয়নি। দাফনের আগে শেষ বারের মত আব্বাছের মুখটিও পিতা-মাতা ও স্ত্রীকে দেখতে দেয়া হয়নি। ময়না তদন্ত শেষে দুপুর বারোটায় আব্বাছের লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে থেকে তার পিতা আব্দুস সাত্তারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। সন্তানের লাশ শাহজাহানপুর গোরস্থানে দাফনের জন্য তিনি ট্রাকে তোলেন। এ অবস্থায় রমনা থানার ওসি রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে একদল পুলিশ ট্রাক শাহজাহানপুর নিতে বাধা দিয়ে ট্রাক নিয়ে যায় আজিমপুরে। এ সময় ৩২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাও পুলিশকে জোর করে লাশ ছিনিয়ে নিতে সহায়তা করে। আব্বাসের মা মিসেস সাত্তার ও স্ত্রী সালেহা চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন। বলতে থাকেন আব্বাছের মুখখানা একটিবার দেখতে দাও। কিন্তু পুলিশের হৃদয়ে এই আর্তনাদ সামান্যতম রেখাপাত করেনি। আব্বাছের মা ও স্ত্রী লুটিয়ে পড়েন মাটিতে। তাদের কান্নায় এক মমস্পর্শী দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় পথচারীরাও অশ্রুসজল ছিলেন। কিন্তু পুলিশের নিষ্ঠুরতা ও আওয়ামী লীগের সশস্ত্র ক্যাডারদের চোখ রাঙানীতে তারা ছিলেন অসহায়। পুলিশ যখন লাশের ট্রাক ছিনিয়ে নেয়, তখনই ঘটনাস্থলে পৌছেন বিএনপি'র যুগ্ম মহাসচিব ও সাবেক মন্ত্রী আব্দুল্লাহ-আল নোমান ও যুবদল নেতা সাজু কামাল। এই সময় আব্বাসের ভাই চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'পুলিশ আমার ভাইয়ের লাশ ছিনতাই করে নিয়ে যাচ্ছে। আমার মাকেও পুলিশ আব্বাছের মুখ দেখতে দেয়নি।' এ সময়ে উপস্থিত জনতা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় পুলিশ মারমুখো হয়ে ওঠে এবং লোকজনকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে লাশ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আব্দুল্লাহ আল নোমান নিজ পরিচয় দিয়ে লাশ আব্বাছের বাবার কাছে হস্তান্তর করতে বললে রমনা থানার ওসি তাকে ধাক্কা মারে। এর মধ্যে আব্বাছের ভাই ও আত্মীয়-স্বজনেরা ট্রাক থেকে লাশ নামানোর উদ্যোগ নিলে পুলিশ ও

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের সশস্ত্র ক্যাডাররা তাদের ওপর হামলা চালায়। এক পর্যায়ে আক্কাছের আত্মীয়-স্বজনকে পুলিশ ট্রাক থেকে নামিয়ে দেয়। আব্দুল্লাহ আল নোমান লাশ হস্তান্তর ও তার আত্মীয়-স্বজনকে শেষ দেখার সুযোগ দেয়ার কথা পুনরায় বললে রমনা থানার ওসি তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। এ সময় তার সঙ্গে ওসির উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। জনাব নোমান ওসিকে বলেন, আপনি আমাকে এ্যারেস্ট করতে পারেন, গায়ে হাত দিতে পারেন না। ওসি রফিক প্রয়োজন হলে তাও করবো বলে জনাব নোমানের দিকে তেড়ে আসে। পুলিশ শক্তি প্রয়োগ করে আক্কাছের মা-বাবা, ভাই-বোন ও আক্কাছের স্ত্রীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে লাশ নিয়ে আজিমপুরের দিকে যায়। আগে-পিছে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার লোকদের পাহারায় ট্রাক নেয়া হয়। ট্রাক পলাশীর মোড়ে পৌছার পর আক্কাছের পিতা ট্রাকের স্টিয়ারিং চেপে ধরে চিৎকার করতে থাকেন ট্রাক শাহজাহানপুরের দিকে নেয়ার জন্য। ড্রাইভার পলাশীর মোড়ে থামাতে বাধ্য হয়। পরে আক্কাছের পিতা ট্রাক থেকে নেমে বলেন, 'লাশ শাহজাহানপুরে দাফন করব। আজিমপুরে নিতে চাইলে আমার বুকের ওপর দিয়ে ট্রাক নিতে হবে।' এ সময় আক্কাছের মা ও স্ত্রী এবং ভাই-বোনেরাও ট্রাকের সামনে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু পুলিশ তাদের সরিয়ে দিয়ে ট্রাক নিয়ে যায় আজিমপুরে এবং দাফন করে। আক্কাছের পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন তার জানাযাও পড়তে পারেনি। এক অমানবিক ও নিষ্ঠুরতার মধ্য দিয়ে আক্কাছকে আজিমপুরে পুলিশ দাফন করে। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ২০ অক্টোবর ১৯৯৮)

২২ অক্টোবর ১৯৯৮ হরতালের দিনবেলা ২-৩০ মিনিটের দিকে আকবর হোসেন নামে ৭ম শ্রেণীর ছাত্রটি পুলিশী হামলার শিকার হয়। খবরে প্রকাশ, পুলিশের নির্যাতনে তার হাড় ভেঙ্গে যায়। কিশোরটির সর্বাঙ্গ ছিল ক্ষত-বিক্ষত। পুলিশ কিশোরটির ওপর বর্বরোচিত হামলা চালিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে হাসপাতালে রেখে আসে। বলে আসে যে ছেলেটি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে। ঐদিন সাড়ে এগারোটায় আকবর মারা যায়। ময়না তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়, শারীরিক নির্যাতনের ফলেই আকবরের মৃত্যু হয়েছে।

ঈদকে সামনে রেখে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা গ্রেফতার অভিযান জোরদার করেছে। তবে প্রতিদিন সন্ধ্যায় থানা হাজতগুলো ভরা থাকলেও ভোরবেলা তা ফাঁক হয়ে যায়। গভীর রাতে চলে লেনদেন। কেউ কেউ রসিকতা করে বলেন, ঈদ বোনাস আদায় করা হচ্ছে-এরকম রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ৩০ ডিসেম্বর ১৯৯৮ এর দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা। বাংলাবাজার আরো বলে, 'সাম্প্রতিক সময়ে ডিএমপি'র ২১টি থানায় ছিনতাইকারী, পকেটমার ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতারের সংখ্যা অতীতের যে কোন সময়ের থেকে অধিক। যেখানে প্রতিদিন গড়ে গ্রেফতারের সংখ্যা ১০/১২, সেখানে দাঁড়িয়েছে ৩৫/৪০ জন। ২৬ থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত ২১টি থানায় গ্রেফতারের সংখ্যা ছিল ২২শ'। কিন্তু আদালতে পাঠানো হয়েছে ৯শ' জনকে। বাকীদের পাঁচশ টাকা থেকে দু'হাজার টাকার বিনিময়ে থানা থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ প্রকাশ। প্রকাশিত অভিযোগে ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, লালবাগ, পল্লবী, শ্যামপুর, সবুজবাগ, হাজারীবাগ, কাফরুল ও কামরাঙ্গীর চর থানায় প্রতিদিন বিকেল গড়াতেই পুরো হাজতখানা ভরে যায় বলে উল্লেখ করা হয়। রাত আটটার পর চলে দালাল ও পুলিশের মধ্যে দরকষাকষি। রাত ১১ টার পর থানা হাজতগুলো ফাঁকা হয়ে যায়।

মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশীর কাছে ছাত্রদল নেতা মামুনুর রশীদ সৎ, আদর্শবান ও ধার্মিক ছেলে হলেও পুলিশের নজরে সে ছিল সন্ত্রাসী। অনায়াসে গুলি করে

www.pathagar.com

হত্যার মাধ্যমে সন্ত্রাসী নামটি মামুনের গায়ে জুড়ে দেয় পুলিশ। ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ বংশালের আব্দুল হামিদ লেনের ২৬/এ নং বাড়ির বাসিন্দা মামুনকে গুলি করে হত্যার পর পুলিশ মনগড়া কাহিনী বানিয়ে সংবাদপত্রে খবর পাঠায় সে নাকি বোমাবাজ। পুলিশের মিথ্যা কাহিনীর জবাবে মামুনের মা বলেছেন 'আমার সন্তান হত্যার বিচার চাই। পুলিশ আমার ছেলেকে গুলি করে হত্যা করেছে। আমার ছেলে বোমা বানাতে জানেনা। সে ছোট বেলা থেকেই খুব শান্ত। পুলিশ তাকে খুন করে আবার বোমা বানানোর মিথ্যা অভিযোগ এনেছে।' তিনি পুত্র হত্যার বিচার দাবী করে বলেন, 'আর কত মায়ের বুক খালি করবেন-সরকারের কাছে আমি জানতে চাই।' মামুনের ছোট ভাই কবি নজরুল কলেজের ছাত্র হারুনুর রশীদ অভিযোগ করেন, 'বুধবার রাত ৮টায় মামুনকে গুলি করে হত্যা করার পর লাশ গায়েব করে রাখা হয়। আমাদের কাছে কোনো সংবাদ জানানো হয়নি। পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে ১০টায় পত্রিকা পড়ে আমি সংবাদ পাই। সাথে সাথে আমরা ছুটে যাই স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে। মর্গে গিয়ে আমরা লাশ সনাক্ত করি। পোস্টমর্টেম হয়নি বলে আমাদের দুপুর ১টা পর্যন্ত বসিয়ে রাখা হয়। পোস্টমর্টেম শেষ হওয়ার পরও পুলিশ আমাদের কাছে লাশ হস্তান্তর করতে রাজি হয়নি। সারাদিন ধরে আমরা পুলিশের পিছু পিছু ঘুরি। অবশেষে রাত সাড়ে ৮টায় কতোয়ালী থানার ওসি আমাদের শর্তজুড়ে দেন যে, হাসপাতালের মর্গ থেকে সরাসরি লাশ আজিমপুর গোরস্থানে নিয়ে দাফন করতে হবে। আমরা এতে রাজি হইনি। পরে তিনি আমাদের দুটি শর্ত জুড়ে দিয়ে বলেন, 'লাশ নিয়ে কোনো মিছিল করা যাবে না এবং রাতেই দাফন করতে হবে।' (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯)।

১৪ মার্চ পুলিশ সবুজবাগের ৯৭/১, দক্ষিণ বাসাবো বাড়ির মজিবুর রহমান মইজা পুলিশের লাঠির আঘাতে জ্ঞান হারিয়ে পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার পর পুনরায় তার উপর উপর্যুপরি বাঁশের গুতায় কাদার নিচে পুতে যাওয়ার কারণে তিনি মারা যান। ১৪ মার্চ পুলিশ যখন তার বাড়ি ঘেরাও করে তখন হতভাগ্য মইজা টেলিভিশন দেখছিল। পুলিশের আগমনে ভীত হয়ে ঘরের পিছ দিক দিয়ে বাড়ির নিচে ঝিলে আটকে রাখা নৌকার সাহায্যে পালানোর চেষ্টা করলে একজন পুলিশ বাঁশ দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে। এতে সে পানির নিচে তলিয়ে গেলে পুলিশ তার পোশাক খুলে হাফপ্যান্ট পড়া অবস্থায় ঐ নৌকায় গিয়ে উঠে এবং একটি বাঁশের সাহায্যে নিমজ্জিত মইজাকে উপুর্যপরি গুতাতে থাকে। এক পর্যায়ে কোন সাড়া না পেয়ে পুলিশ বলতে থাকে বেটা পালিয়েছে। পুলিশ স্থান ত্যাগ করার পূর্বে ৪জনকে গ্রেফতার করে। এরা ছিল মইজার ভাগ্নে এমরান, মইজার খালাতো ভাই সোলাইমান, আলম ও শিল্পী। এদের মধ্যে শিল্পী জামিনে মুক্তি পায়। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা যায়, এ ঘটনাটি ঘটে বিকেল ৫টা থেকে সাড়ে ৫টায় (১৪ মার্চ)। এর পরে পুলিশ রাতে এসে ঝিলের ঘটনাস্থলে টর্চলাইট দিয়ে মইজাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ১৬ মার্চ তার লাশ পানিতে ভেসে উঠে। পুলিশ তার লাশ পোস্টমর্টেমের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মর্গে নিয়ে যায়। মইজার লাশটির মুখমন্ডল ও ডান হাতে আঘাতের চিহ্ন তথা লাশটি প্রায় বিকৃত অবস্থায় ছিল।

২৮ মার্চ সূত্রাপুর থানার কাপ্তান বাজারে মুরহীর ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে দুপুরে কয়েকজন পুলিশ চাঁদা আদায় করতে গেলে ব্যবসায়ীরা তাদের বলে, থানার ওসি পূর্বেই চাঁদা লোক মারফত গ্রহণ করেছে। ব্যবসায়ীদের কথা পুলিশ বিশ্বাস না করলে শুরু হয় বচসা, শুরু হয় সংঘর্ষ। পুলিশ এ সময় তিনজন ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে। এদের মধ্য থেকে রিপন নামের একজন মুরগীওয়ালা পুলিশের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য দৌড় দিলে পুলিশ তাকে

www.pathagar.com

লক্ষ্য করে ৪ রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই রিপন মৃত্যুবরণ করে। (সূত্রঃ দৈনিক জনতা ২ এপ্রিল ১৯৯৯)

৬ মার্চ বিকেলে রাজশাহী নগরীর কেশবপুর পুলিশ ফাঁড়ির কাছে ছাত্রলীগ নেতা এসএম গোলাম মুর্শিদকে অপর একটি হত্যা মামলার চিহ্নিত আসামীরা খুন করে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ তাদের গ্রেফতার না করায় ৫ এপ্রিল বিকেলে কোর্ট চত্বরে সর্বস্তরের জনতা এক নাগরিক শোক সভায় মিলিত হন। শোক সভায় অন্যান্যদের মধ্যে মুর্শিদের বৃদ্ধ পিতা অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা আব্দুল জব্বার বক্তব্য রাখেন। তিনি পুলিশ বিভাগের কর্মকান্ডে ঘৃণা প্রকাশ করে বলেন, ৩০ বছর আগে পুলিশ বিভাগে চাকরি করেছি, এ পরিচয় দিতে আমার লজ্জা হয়। শোকসভার পর তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে রিক্সাযোগে বাসায় ফেরত পাঠানো হয়। এরপর ওইদিন সন্ধ্যায় শোক সভায় উপস্থিত বিক্ষুব্ধ নগরবাসী এক শোক মিছিলে অংশ নেয়। মিছিলটি নগর প্রদক্ষিণ কালে বিক্ষুব্ধ জনতা রাজপাড়া থানায় হামলা চালিয়ে পুলিশের ফাঁকা গুলি, লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস সেল নিক্ষেপ করে। সে রাতেই পুলিশ থানায় হামলার অভিযোগে ২৬ জনের নামসহ আরো ২শ' জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করে। পুলিশ আসামীদের নাম জানাতে চরম গোপনীয়তা প্রকাশ করলেও, ৭ এপ্রিল মুর্শিদের পিতাকে মামলার সুনির্দিষ্ট আসামী করার কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। (সূত্রঃ দৈনিক মানবজমিন ৮ এপ্রিল ১৯৯৯)

১৬ এপ্রিল বিজয়নগরস্থ অফিসে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ১৯৯৯ বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার প্রকাশিত প্রতিবেদনে পুলিশের সম্পত্তির হিসাব নিয়মিত গ্রহণ ও পুলিশ অপরাধ করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশসহ পুলিশের অবস্থা, সমস্যা ও আচরণ প্রভৃতি নিয়ে বক্তব্য করা হয়। প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করেন সংস্থার পরিচালক তদন্ত এডভোকেট এলিনা খান। বক্তব্য রাখেন মহাসচিব সিগমা হুদা। এলিনা খান প্রতিবেদনে জানান, পুলিশ বাহিনীর একাধিক সদস্য অবৈধ অর্থ ও সম্পত্তির মালিক। কয়েকদিন আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একটি সার্কুলার জারি করা হয়েছিল। পুলিশের সম্পত্তির হিসাব এবং তাদের স্ত্রীদের অলংকারের হিসাব দেয়ার জন্য। কিন্তু তারা এ বিষয়ে কোন তথ্য দেয়নি। পুলিশের কাছে সম্পত্তির হিসাব চাওয়া হলে তারা স্ত্রী বা শ্বশুর বাড়ি থেকে পেয়েছে বলে জানান। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, একজন ডিআইজি পদমর্যাদার পুলিশের গুলশান, মিরপুর, উত্তরায় ৩তলা, ৪তলা, ৬ তলা বিশিষ্ট আলিসান বাড়ি রয়েছে। তিনি বাড়ি ভাড়া বাবদ মাসে ৩০ থেকে ৬০ হাজার টাকা পাচ্ছেন। তার মাসিক বেতন ১৩,৫০০ টাকা। অপরদিকে একজন এআইজির উত্তরায় ২টি বাড়ি, খুলনায় ও ফরিদপুরে ২টি বাড়ি রয়েছে। ১ জন এসপির উত্তরা, ধানমন্ডি, হুমায়ুন রোড, কলেজ গেটে ৪টি বাড়ি রয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, পুলিশ দুইভাবে অবৈধ সম্পত্তির মালিক হয়। এগুলো হচ্ছে-অবৈধ আইন প্রয়োগ ও সরকারি ব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহন। প্রতিবেদনে আরো জানানো হয়, একজন এসি পর্যায়ের কর্মকর্তার মাসিক বেতন ৯ হাজার ৭শ' ৫০ টাকা। রামপুরা ও উত্তরায় দু'টি বাড়িসহ একটি প্রাইভেট কার ও একটি মোটর সাইকেল তার রয়েছে। এএসপি পর্যায়ের একজন কর্মকর্তার মাসিক বেতন ৭ হাজার ৭শ' ৪০ টাকা। তার রয়েছে সাভার ও মিরপুরে ২, ৩, ও ৪ তলার বাড়ি। ওসি পর্যায়ের এক কর্মকর্তার মাসিক বেতন ৬ হাজার ৬শ' ২৫ টাকা। অথচ ঢাকার ধানমন্ডি, মিরপুর, সাভার, পান্থপথ ও গাজীপুরে রয়েছে তার ৪,৫ ও ৬ তলা বাড়ি। পাশাপাশি প্রাইভেট কার, মোটর সাইকেল, মাইক্রোবাস। ওসির ছেলেরা আমেরিকা ও বোম্বে

www.pathagar.com

পড়াশুনা করছে। সিএমএম কোর্টের একজন ইন্সপেক্টরের মোহাম্মদপুরে বাঁশবাড়ি এলাকায় একটি হাউজিং এর ওপর ৪ ও ৫ তলা বাড়ি রয়েছে। তার মাসিক বেতম ৬ হাজার ৬শ ২৫ টাকা। একজন এসআইয়ের মাসিক বেতন ৫ হাজার ১শ' ৩০ টাকা। মিরপুর, পাইকপাড়া, দক্ষিণ পীরের বাগ, মিরপুর ও পূর্ব আহমেদনগর মিরপুরে রয়েছে ২তলা বাড়ি। এছাড়া ব্যাবিট্যাক্সি, মাইক্রোবাস ও মোটর সাইকেল রয়েছে তার। একজন পুলিশ সার্জেন্ট মাসিক বেতন পান ৪ হাজার ৭শ' ৩৫ টাকা। উত্তরা ও মিরপুরে তার হাউজিং প্লট ও জমি রয়েছে। এদের সবারই রয়েছে নিজস্ব মোবাইল ফোন। তদন্তকালে দেখা গেছে, একজন এসআই-এর মাসিক মোবাইল বিল আসে ৯ হাজার টাকা। সংস্থার প্রতিবেদনে 'পুলিশ প্রশাসনকে অবশ্যই জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে'-মন্তব্য করেও কয়েকটি সুপারিশ প্রদান করা হয়। এগুলো : ১। পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো উচিত। সরকার সিদ্ধান্ত নিতে পারে কতজন পুলিশ বাড়ানো দেশের ও জনসাধারণের জন্য মঙ্গল হয়, ২। পুলিশের জন্য একটি স্থায়ী পৃথক 'পুলিশ কমিশন' হওয়া উচিত। যারা পুলিশের সকল সুযোগ-সুবিধা এবং দুর্নীতিসহ সকল কার্যক্রম অনুসন্ধান, তদন্ত, পর্যবেক্ষণ, পরামর্শ ও প্রয়োজনে নীতিমালা প্রণয়ন করবেন। এই পুলিশ কমিশন সম্পূর্ণভাবে জুডিসিয়াল আন্ডারে থাকবে, ৩। পুলিশ চাকরিতে যোগ দেয়ার আগে প্রথমে তাদের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব সরকারের কাছে পেশ করতে হবে এবং সরকার পাঁচ বছর পর তা মনিটরিং করবে। এই বিষয়ে পৃথক 'পুলিশ কমিশন' প্রয়োজন। পুলিশ কমিশন গোপনে অনুসন্ধান করে দেখবে। যদি কোন পুলিশ সৎ উপার্জিত টাকা দিয়ে বা সৎভাবে আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে কোন সম্পত্তি পেতে চায়, তাহলে 'পুলিশ কমিশনে'র কাছে দরখাস্তের মাধ্যমে সম্পত্তির হিসাব এবং কার কাছ থেকে পাচ্ছে তার সম্পর্কে লিখে পারমিশন চাইবে। পুলিশ কমিশনের অনুমতির ভিত্তিতে তারা ঐ সকল সম্পত্তির মালিকানা পেতে পারেন, ৪। সরকার কর্তৃক পুলিশের বেতন বৃদ্ধিসহ জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন সকল দ্রব্যাদি সরবরাহ করতেহবে। না হলে ভুক্তভোগীরা কখনও পুলিশের কাছ থেকে আন্তরিক সহযোগিতা পাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথক 'পুলিশ কমিশন' গঠন না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সরকার নিজেই এই সকল বিষয় নিয়ে কাজ করতে পারেন। পুলিশ প্রশাসনকে অবশ্যই জনগণের কাছে জবাবদিহিতা করতে হবে, ৫। ক্যাডার ও নন ক্যাডারদের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পুলিশ বিভাগে তিন জায়গায় লোক ভর্তি না করে দুই ভাগে লোক নিয়োগ করা উত্তম, ৬। কোন পুলিশ দুর্নীতি, অন্যায় এবং সন্ত্রাস করলে তার বিরুদ্ধে সাসপেন্ড, ক্লোজ, ডিপার্টমেন্টাল প্রোসিডিংয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থানা যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে আর দশজন ব্যক্তির মতো অপরাধের দায়ে তার নামে ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এবং কোন সাধারণ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ দেবে পুলিশ ব্যক্তিটি, তার বিধান রাখতে হবে, ৭। বিভিন্ন সরকার প্রায়ই পুলিশকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে। সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আন্দোলন হলে আইন-শৃঙ্খলার দোহাই দেয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পুলিশকে ব্যবহার করা হয়েছে এবং হচ্ছে। পুলিশ চাকরি হারানোর ভয়ে সরকারের নির্দেশ পালন করছে এবং কখনও কখনও সরকারের দোহাই দিয়ে পুলিশ ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে সুযোগ গ্রহণ করছে। যতক্ষণ সরকার পুলিশকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার বন্ধ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পুলিশের অরাজকতা চলবেই, ৮। পুলিশ যে সমস্ত আইন শুধু তার আইন মনে করে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে, তা দূর করতে এবং সেই সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারণা দিতে হবে। যে সকল আইন তারা নিজের মনে করে তা হলো

www.pathagar.com

ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪, ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং দণ্ডবিধির ৩৮৫/৩৮৭ চাঁদাবাজি আইন, ৯। পুলিশ বিষয়ক সকল সমস্যা সমাধানে সরকারের সচেষ্ট হওয়া জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন। তাদের নৈতিকতা ফিরিয়ে আনার জন্য মোটিভেশনের ওপর যেমন জোর দিতে হবে, তেমনি আইনের সঠিক প্রয়োগ এবং সুষ্ঠু তদন্ত করার ব্যাপারে তাদের ব্যাপক প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, ১০। তদন্তকারী পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বা প্রশাসনিক পুলিশকে একই সঙ্গে দুই কাজে ব্যবহার করা যাবে না। যেমন, একজন পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ মামলা তদন্ত করে, তেমনি একই সঙ্গে তাকে হরতাল, সন্ত্রাস দমন, মন্ত্রীদের নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা কাজে প্রতিনিয়ত জড়িত থাকতে হয়। ফলে সুষ্ঠুভাবে কোন তদন্ত হয় না। এই অজুহাতে পুলিশ দিনের পর দিন মামলার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভোগায়। এই অবস্থা অনতিবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন, ১১। মামলা গ্রহণের ক্ষেত্রে পুলিশের অনীহা রয়েছে। কখনও কখনও তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপ অথবা কোর্টের অন্য কোন ভাবে মামলা গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে অনেক সময় সঠিকভাবে এজাহার লেখা ও তদন্ত করা হয় না। ফলে বিচারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এর ফলে আসামীরা খালাস পায়। নির্যাতিত ব্যক্তি বিচার থেকে বঞ্চিত হয়, ১২। পুলিশ যদি কোন ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকে, তাহলে সেই বিষয়টি অন্যখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করা হয় এবং ধর্ষণের কেস হলে সেই নারী বা শিশুকে পতিতা ও নষ্টা বলে প্রচার করার চেষ্টা চলে। একই সঙ্গে পুলিশ দ্বারা নির্যাতিত হলে সেই অসহায় পুলিশ তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে আইনানুগ বা মানবিক প্রতিকার পায় না। তেমনিভাবে পুলিশের নির্যাতনে নিহত ব্যক্তিদের স্ত্রীদের নষ্টা বলে প্রচার করার অপচেষ্টা চলে। কেউ এই ধরনের কাজ করলে তার বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। (সূত্রঃ দৈনিক মানবজমিন ও দৈনিক সংগ্রাম ১৭ এপ্রিল ১৯৯৯)

প্যারিসে দাতাগোষ্ঠীর বৈঠকের প্রাক্কালে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থার কড়া সমালোচনা করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে অর্থনৈতিক অবস্থার পাশাপাশি দেশের বিচার বিভাগ এবং পুলিশ প্রশাসনের সবচেয়ে বেশি সমালোচনা করে খাত দুটোতে বিশেষভাবে নজর দেওয়ার জন্য তাগিদ দেওয়া হয়। প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংক ৬টি খাতের দিকে নজর দেওয়ার আহবান জানায়। এগুলো হলো মানবসম্পদ উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ ছাড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে উন্নয়ন সাধন করতে হবে। বেসরকারি অর্থনৈতিক খাতকে আরো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে হবে। বিদেশী বিনিয়োগের সুষ্ঠু ব্যবহার, ব্যাংকিং, ফিন্যান্স এবং কর ও শুল্ক ইত্যাদি তোলা এবং এগুলোর ব্যবহার আরো সুষ্ঠুতর করা এবং সর্বোপরি মুদ্রার বিনিময় হার, মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা আনার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশে বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিশ্বব্যাংক বলে, বর্তমানে বাংলাদেশী জনসাধারণের বিচার ব্যবস্থার কাছ থেকে যে চাহিদা তা মেটাবার সামর্থ্য বিচার ব্যবস্থার নেই। প্রতিবেদনে পুলিশ প্রশাসনের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়, গত কয়েক বছরে পুলিশ প্রশাসনের আচরণ দেখে 'পুলিশ দরিদ্রের বিরোধী' বলে বাংলাদেশের জনগণের মনে একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। তা ছাড়া আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং মানুষের নাগরিক অধিকার বিধান করার ক্ষেত্রেও পুলিশের সাহায্য একেবারেই আশা করা যায় না। এ ব্যাপারে বিশ্বব্যাংক কিছু তথ্য প্রদান করে। ১৯৯৭ সালের প্রথম ২ মাসে দেশের ১৪০ জন নারী নিহত হয়েছে এবং ১৯৯৮ সালের প্রথম ৬ মাসে নিহত নারীর সংখ্যা ২৩১।

www.pathagar.com

১৯৯৭ সালের প্রথম ৬ মাসে ১৪৩ জন এবং ১৯৯৮ সালের প্রথম ৬ মাসে ৪৫৯ জন ধর্ষিত হয়েছে। রমনা, মতিঝিল এবং গুলশান থানার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, পুলিশ বেআইনীভাবে কুপন ছাপিয়ে সেগুলো পুলিশের বিভিন্ন কর্মকর্তার কাছে ৫০,১০০ টাকায় বিক্রি করে। কর্মকর্তারা আবার সেগুলো ট্রাক ড্রাইভারদের কাছে অনেক চড়া দামে বিক্রি করে। বিশ্বব্যাংকের মতে, এ ধরনের অবৈধ অর্থ সংগ্রহের ফলে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্থনীতি সত্যিই বিপাকে পড়েছে। (সূত্রঃ দৈনিক ভোরের কাগজ ১৯ এপ্রিল ১৯৯৯)

একখণ্ড জমির ঘটনায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় অভিযুক্ত গ্রেফতারকৃত নাসিমা আক্তার ৫ মে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পান। ২৫ এপ্রিল খিলগাঁও থানার ওসির নির্দেশে একজন মহিলা পুলিশসহ কয়েকজন পুলিশ এসে নাসিমাকে রাত ৯টায় জোরপূর্বক থানায় নিয়ে যায়। অসুস্থতার কথা বললে তারা অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে। পুলিশরা জানায়, 'আপনি থানায় চলেন, ওসি সাহেব জমি-জমার ব্যাপারে কথা বলবেন। আপনার জমি কেউ দখল করতে পারবে না। পুলিশ আপনাকে সহায়তা করবে।' থানায় নিয়ে নাসিমাকে সারারাত কিছু খেতে দেয়া হয়নি। ঘুমানোরও সুযোগ দেওয়া হয়নি। পরদিন খিলগাঁও থানা পুলিশ কোর্টে পাঠিয়ে তাকে দু'দিনের রিমান্ডে আনেন। রিমান্ডের প্রথমদিনের দুপুর পর্যন্ত থানায় বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার লোক জিজ্ঞাসাবাদ করে। তিনি বারবার জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপারে একজন পদস্থ সেনা কর্মকর্তার সাথে দ্বন্দ্বের কথা বলেন। কিন্তু তারা তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী ও গোপন দলের সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। তিনি তাদের স্পষ্ট করেই বলেন, 'আমি একজন নিরীহ মেয়ে। রাষ্ট্রদ্রোহিতা কি জিনিস জানি না।' রিমান্ডের প্রথম দিনের শেষভাগে খিলগাঁও থানার ওসি তাকে বলে, গাড়িতে উঠুন। আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। নাসিমা যথারীতি গাড়িতে ওঠেন। ফার্মগেটে এসে একজন সাদা পোশাকধারী মহিলা পুলিশ কালো কাপড় দিয়ে তার চোখ বাঁধার চেষ্টা করে। তিনি মহিলা পুলিশকে অনুরোধ করেন চোখ না বাঁধার জন্য। মহিলা পুলিশ ধমক দিয়ে বলেন ইচ্ছে করে না বাঁধলে বাধ্য করা হবে। পরে তাকে ক্যান্টনমেন্টের একটি বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়। বাসায় নেওয়ার পর আরো ১০/১২ জনলোক তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিছুক্ষণের জন্য তার চোখ খুলে দেওয়া হয়। বলা হয়, ডান দিকে তাকাবেন না। তিনি চোখ খুলেই বাসার পরিবেশ বুঝতে পারেন। একটি টেবিলে সেনাদফতর ইত্যাদি লেখা কিছু কাগজ দেখতে পান। ক'জন সেনা কর্মকর্তা তাকে সাদা কাগজে নাম দস্তখত করতে বলেন। তিনি প্রতিবাদ করে বলেন, সাদা কাগজে আমি সই দিবো না। এক পর্যায়ে তারা বলেন, জীবনে বাঁচতে চাইলে সই করো। সই করতে রাজি না হলে একটি বড় রড দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে। এ সময় খিলগাঁও থানার পুলিশ পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। এক পর্যায়ে নাসিমাকে জিজ্ঞেস করে, জমিটা কিভাবে ও কখন কিনেছেন। তিনি বলেন, 'আমি ১৯৯৩ সালের মার্চ মাসে উত্তরার তারাটেকের শামছু ও তার দুই বোন আলাতন ও ফলিমার কাছ থেকে জমিটি কিনেছি।' রাষ্ট্রদ্রোহিতার ব্যাপারেও কয়েকবার তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। গোপন দলের সদস্যদের তিনি আর্থিক সহায়তা করছেন কিনা তাও জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি তাদের সব কথাই অস্বীকার করে বলেন, সব মিথ্যা বানোয়াট। নাসিমাকে গ্রেফতারের আগের দিন উত্তরা থানার ওসি এসআই আক্তারকে তার রামপুরার বাসায় পাঠান। আক্তার এসে তাকে থানায় নিয়ে যায়। থানায় গিয়ে তিনি যে ব্যক্তিকে বসে থাকতে দেখেন, এই ব্যক্তিকে ক্যান্টনমেন্টের বাসায় দেখতে পান। এই ব্যক্তিটি ধমক দিয়ে তাকে বলে, আমি কে এখন চিনতে পেরেছিস? আরো চিনবি। এভাবে কয়েকবার ধমক দিয়ে তারা চলে যায়।

www.pathagar.com

১৯ মে ১৯৯৯ ঢাকার মূখ্য মহানগর হাকিম আব্দুস সালাম মিয়ার আদালতে বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার কতিপয় আইনজীবীর মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে রাজপথে বিবস্ত্র করা ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনে বিএনপি নেত্রী মণি বেগম ডিসি রায়ট পুলিশ সিদ্দিকুর রহমান, এডিসি হেড কোয়ার্টার শফিকুল ইসলাম, মতিঝিল থানার ওসি মোহাম্মদ হানিফ, কনস্টেবল শাহিনুর বেগম, নায়েক হেলাল, কনস্টেবল ফজলুল হক ও কনস্টেবল মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ৩২৪/ ৩৫৪/ ৫০৬ ও ১০৯ ধারার মামলা দায়ের করেন। মণি বেগম তার আরজিতে বলেন, আসামীরা সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী। জনসাধারণের জানমাল, সম্মান, সম্ভ্রম ও ইজ্জত রক্ষার দায়িত্বে থেকে আসামীরা রক্ষক হয়ে ভক্ষকের ভূমিকা পালন করে আসছে যা সম্পূর্ণ বেআইনী। বাদিনী আরো বলেন, ঘটনার দিন ১১ মে হরতালের সময় জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের একটি মিছিলে অন্যান্যের সাথে তিনিও নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। মিছিলটি সকাল ১১টার সময় বিজয়নগর হয়ে প্রেসক্লাবের দিকে যাচ্ছিল। এ সময় মতিঝিল থানার ওসি হানিফ একজন পুলিশসহ মিছিলটি অনুসরণ করতে থাকে। পুলিশ হঠাৎ করে মিছিলটি ঘেরাও করে বেপরোয়া লাঠিচার্জ করতে থাকে। পুলিশের লাঠির আঘাতে তিনি মাটিতে পড়ে যান। এ সময়ে ফটো সাংবাদিকরা পুলিশের ওই নির্মম নির্যাতনের ছবি তুলতে থাকেন। ওই সময় আসামীরা বাদিনীর শাড়ি ধরে টানাটানি করতে থাকে যার ফলে তার শরীরের উপরের অংশের সম্পূর্ণ কাপড় খুলে যায় এবং তাকে জোরপূর্বক বিবস্ত্র করা হয়। বাদিনী আরো বলেন, আসামীরা ওই সময় তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে বলে যে, শাড়ি খুলে রেখে দিলে আর মিছিলে আসবে না। বাদিনী তার ইজ্জত রক্ষার জন্য দুহাতে শাড়ি আটকে রাখতে চেষ্টা করেন যারা সচিত্র ছবি বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় ছাপা হয়। বাদিনী ১১ মে'র পর লজ্জায় এবং পুলিশের ভয়ে আত্মগোপন করে থাকেন।

একটি কাক অপর কাকের মাংস খায় না-এটা সকলেই বিশ্বাস করে। কিন্তু আওয়ামী শাসনামলে এ বিশ্বাসটুকু মিথ্যা হয়ে যায় ডিবি পুলিশ কর্তৃক নিজস্ব বাহিনীর লোককে হত্যার ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার মধ্য দিয়ে। ঢাকার মিন্টু রোডের ডিবি অফিসে ডিবি'র গাড়ীচালক এবং সোর্স জালাল আহমেদ শফিককে হত্যা করে ছাদের পানির ট্যাংকে লাশ গুম করার জন্য সিআইডি পুলিশ ডিবি ইন্সপেক্টর জিয়াউল আহসান, হাবিলদার বিল্লাল, কনস্টেবল আব্দুর রব এবং ক্যাপ্টেন মালিক আনোয়ার হোসেনকে অভিযুক্ত করে ২৭ মে ৪ পৃষ্ঠার চার্জশীট দাখিল করে। চার্জশীটে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে হত্যা ও লাশ গুমের অভিযোগ আনা হয়। তদন্ত শেষে দাখিলকৃত চার্জশীটে জালাল হত্যাকান্ডের সময় কর্তব্যে অবহেলা, সত্য গোপন এবং সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান না করার অভিযোগে ৮ জনকে দায়ী করা হয়। এরা হলেন-এসি হুমায়ূন কবির (তত্ত্বাবধানে অবহেলা), ইন্সপেক্টর বেলাল হোসেন (কম্পাউন্ড ডিউটি থাকলেও ডিউটি না করা), সাব-ইন্সপেক্টর শাহজাহান (সত্য গোপনের অভিযোগ), ভুঁইয়া মাহবুব (সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করা), হাবিলদার শহিদুল ইসলাম, কনস্টেবল আব্দুল বাতেন, কনস্টেবল জয়নাল আবেদীন ও রউফ। ডিবি অফিসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, ঢালাওভাবে ঘুষ গ্রহণ, চোরাচালানকৃত স্বর্ণ হজম করার সুযোগ প্রদানকারী হিসেবে ডিসি ডিবি আলতাফ হোসেন মোল্লা এবং এডিসি নূরুজ্জামান সম্পর্কে যে অভিযোগ ছিল চার্জশীটে তাদেরকে অভিযোগ থেকে বাদ দেয়া হয়। শফি হত্যার নেপথ্য কারণ সম্পর্কে মামলা তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা এএসপি মুন্সি আতিকুর রহমান চার্জশীটে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বলেন, ডিবি অফিসে নিহত

www.pathagar.com

শফি ছিলেন ডিবি'র ইন্সপেক্টর জিয়াউল আহসানের সোর্স। শফিকে দিয়ে জিয়া বেশ কয়েকটি বড় ধরনের 'সামারি' করান। এর মধ্যে সোনা চোরাচালানের একটি। শফি তখন নিজস্ব মাইক্রোবাস চালান। জিয়া তাকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মাইক্রোবাস কিনে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। জিয়ার কথামতো শফি তার মাইক্রোবাসটি বিক্রি করে দেন। কিন্তু জিয়া তার সাথে প্রতারণা করেন। তাকে মাইক্রোবাস কিনে দেননি। এতে শফি কিছুটা ক্ষুব্ধ হন। এ পর্যায়ে জিয়ার অধীনে কাজ না করার সিদ্ধান্ত জানান। ফলে জিয়া তার ওপর ক্ষেপে যান। গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে জিয়া প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করেন। শফি নিয়মিত ডিবি অফিসে যাতায়াত করলেও জিয়াকে এড়িয়ে চলতেন। ১৭ মার্চ রাত ৮টায় জিয়া শফিকে ডিবি অফিসে পেয়ে যান। তাকে পরদিন রাতে দেখা করতে বলেন। জিয়ার কথা অনুযায়ী শফি পরের দিন রাতে ডিবি অফিসে গিয়ে জিয়াকে পাননি। পরে যোগাযোগ করলে জিয়া তাকে জানান, ১৯ মার্চ রাতে তার বাসায় একজন লোক যাবে। ওইদিন রাত আড়াইটায় হাবিলদার বিল্লাল, কনস্টেবল রব এবং ডিবি'র কেন্টিন মালিক আনোয়ার গাড়িতে করে শফিকে নিয়ে ডিবি অফিসে যায়। শফিকে দেখে জিয়া বিল্লালকে বলেন, "ওকে ছাদে নিয়ে যাও, ওর সাথে কথা আছে।" পরে ২৫ মার্চ বিকেলে ডিবি অফিসের ছাদের পানির ট্যাংক থেকে শফির লাশ উদ্ধার করা হয়। এদিন রমনা থানায় অপমৃত্যু এবং পরদিন হত্যা মামলা রুজু হয়। এই ট্যাংকে ৩০ মার্চ শফির ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া যায়। ড্রাইভিং লাইসেন্সের ছবি ডিবি'র সকল সদস্যকে দেখানো হয়, কিন্তু তারা কেউই ছবির ব্যক্তিকে সনাক্ত করেনি। পরদিন লাশ সনাক্ত হয়। এদিনই ডিবির ক্যান্টিন ম্যানেজার আনোয়ারকে গ্রেফতার করা হয়। আগের দিন সিআইডি কর্তৃপক্ষ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইন্সপেক্টর জিয়াউল আহসান, রেজাউল হোসেন ফারুক, সাব-ইন্সপেক্টর শেখ মাহবুব আলম, হাবিলদার বিল্লাল ও কনস্টেবল রবকে ডাকেন। এতে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে সিআইডি'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এডিসি মাহফুজুল হক নূরুজ্জামানের নেতৃত্বে বিদ্রোহী সদস্যরা ডিসি আলতাফ হোসেন মোল্লাকে ঘেরাও করে প্রতিবাদ জানান। সিআইডি ৬ এপ্রিল জিয়াউল আহসান, ৭ এপ্রিল মোহাম্মদ শাহজাহান, হাবিলদার বিল্লাল এবং কনস্টেবল রবকে গ্রেফতার করে। শফি হত্যা সম্পর্কে ৫ সোর্স সাক্ষী হিসেবে কোর্টে স্বীকারোক্তি দেয়। ৫ জন সোর্সসহ এই মামলায় সাক্ষী করা হয় ৩৯ জনকে।

নতুন শতাব্দীর প্রথম ৬ মাসে পুলিশের নির্যাতনে নিরাপত্তা হেফাজতে ২৬ জনের মৃত্যুর চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন ১ জুলাই ২০০০ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন। প্রতিবেদনে বলা হয় যে, এসব বন্দীর অনেকেরই বিচারের দুয়ারে যাওয়ার পূর্বেই নির্যাতনের কারণে মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। দেশের সংবিধান এবং জাতিসংঘ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে স্পষ্টভাবে নির্যাতন নিষিদ্ধ করা হলেও দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোতে মৃত্যুর ঘটনা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। থানা হাজতে বিশেষ করে পুলিশ হেফাজতে বন্দীদের ওপর চরম নির্যাতন এবং নির্যাতনের ফলে মৃত্যুর ঘটনা মানবাধিকারের চরম লংঘন। দেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রতিটি সরকারের আমলেই নিরাপত্তা হেফাজতে কম-বেশি বন্দীদের ওপর নির্যাতন এবং বন্দী মৃত্যুর ঘটনার অভিযোগ রয়েছে। বিচারাধীন বন্দীদের উপর নির্যাতন এবং নির্যাতন পরবর্তী হত্যাকান্ডের প্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষ আইনের প্রতি ক্রমেই শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে ফেলেছে। গত ৬ মাসে পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যাকান্ডের অভিযোগের পাশাপাশি কারাগারগুলোতে অমানবিক, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বন্দীদের রোগাক্রান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি

www.pathagar.com

পাচ্ছে এবং একের পর এক বন্দী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে, যা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। একজন মায়ানমারের নাগরিকসহ দু'জন মহিলা এবং ২৩ জন পুরুষবন্দীসহ ৬ মাসে মোট বন্দী মৃত্যুর সংখ্যা ২৬ জন। এরা হচ্ছেন –

নং	নাম	তারিখ	স্থান
১।	আব্দুর রশিদ (৩৩)	২১ জানুয়ারি	সাতক্ষীরা কারাগার
২।	নীল মাধব সাহা (৫২)	২৪ জানুয়ারি	নওগাঁ কারাগার
৩।	আব্দুল মজিদ (৩৫)	২৪ জানুয়ারি	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার
৪।	আব্দুর রহিম (৩৩)	১৯ ফেব্রুয়ারি	নারায়ণগঞ্জ কারাগার
৫।	অজ্ঞাত যুবক (২৫)	৯ ফেব্রুয়ারি	শ্যামপুর থানা, ঢাকা
৬।	কারারক্ষী রাজিয়া খাতুন (৩৫)	২৭ ফেব্রুয়ারি	ভোলা কারাগার
৭।	মং সাতওয়াই মার্মা (২৫)	১৪ মার্চ	খাগড়াছড়ি থানা, খাগড়াছড়ি
৮।	গোলাম (৫০)	৪ এপ্রিল	কুষ্টিয়া কারাগার
৯।	আমির আলী (৪২)	৪ এপ্রিল	ব্রাহ্মণবাড়িয়া কারাগার
১০।	হারুনুর রশীদ (৬৫)	১২ এপ্রিল	বরিশাল কারাগার
১১।	কয়েদী আবুল কালাম (৩৫)	১৮ এপ্রিল	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
১২।	শেখ জহির উদ্দিন (৫২)	২৯ এপ্রিল	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
১৩।	হুমায়ূন কবীর (৩০)		পল্লবী থানা, ঢাকা
১৪।	কাঞ্চন (৫০)		হাজারীবাগ থানা, ঢাকা
১৫।	মোক্তার হোসেন (৩৫)	৪ মে	সিরাজগঞ্জ কারাগার
১৬।	আব্বাস আহমেদ (৩৬)	১৮ মে	চট্টগ্রাম কারাগার
১৭।	গোলবাহার বেগম (৬৮)	২০ মে	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
১৮।	কারারক্ষী সেলিম পাটোয়ারী (৪০)	২০ মে	বান্দরবন কারাগার
১৯।	আক্তার হোসেন (৪৫)	২৯ মে	গোপালগঞ্জ কারাগার
২০।	নানু (৩২)	৩১মে	
২১।	আব্দুল কুদ্দুস (৩০)	৩ জুন	বগুড়া কারাগার
২২।	মোস্তাফিজুর রহমান (২৬)	৯ জুন	
২৩।	সাইফুল ইসলাম সালেট (২৫)	১৪ জুন	টঙ্গী থানা, গাজীপুর
২৪।	বাদল মিয়া (৬০)	১৭ জুন	মানিকগঞ্জ কারাগার
২৫।	আমজাদ হোসেন বাদল (৬০)	১৭ জুন	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
২৬।	অংচাউ (৪৬) মায়ানমার নাগরিক	২২ জুন	বান্দরবন কারাগার

বিদেশে প্রত্যাগত এক ব্যক্তির কাছ থেকে ২ হাজার ৪শ' মার্কিন ডলার ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ২০ এপ্রিল ২০০০ সিটি এসবির ডেমরা জোনের সাব-ইন্সপেক্টর আর ফাত্তাহ, চাকরিচ্যুত পুলিশ হাবিলদার তোতা মিয়া গণধোলাইয়ের শিকার হয়েছে। ঘটনার দিন দুপুরে বিদেশ প্রত্যাগত তোবারক হোসেন খসরুর কাছ থেকে ২৪ শ' ডলার ছিনতাই হয়। তারা নিজেদের ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে খসরুকে সিলভার কালারের একটি মোটর সাইকেলে তুলে নিয়ে যায় কাকরাইল মোড়ে। তারা ডলারগুলো হাতিয়ে নিয়ে খসরুকে তাড়িয়ে দেয়।

www.pathagar.com

১ মে ২০০০ এসবি পুলিশ রাজধানীর টপটেরর ইয়াসিন খান পলাশ ও তার সহযোগী লিটন মোল্লাকে গ্রেফতার করে। পরের দিন তাকে ৪ দিনের রিমান্ডে আনা হয়। রিমান্ডের প্রথম দিনে পলাশ চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করে। পলাশ জানায়, খিলগাঁও থানায় এসি আবু হেনা মোস্তফা কামাল ও সাব ইন্সপেক্টর এনামকে তার গ্রুপ নিয়মিত মাসোহারা দিতো। গ্রেফতার হওয়ার ১০ দিন আগেও পলাশের বাবা ইউনুস ওসির বাসায় তাকে ১ লাখ টাকা দিয়ে এসেছেন। টাকা খেয়ে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করতো না। তার গ্রুপ অবাধ চাঁদাবাজির সুযোগ পেতো। পলাশের বিরুদ্ধে ৬টি হত্যাসহ ১৯টি মামলা ছিল। তারপরও পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেনি। রামপুরা-খিলগাঁও এলাকার গার্মেন্টস কারখানা থেকে পলাশ গ্রুপ নিয়মিত চাঁদা তুলত। গার্মেন্টস মালিকরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পলাশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে এসবিকে দায়িত্ব দেয়া হয় পলাশকে গ্রেফতার করার জন্য। অবশেষে এসবি পুলিশ পলাশকে গ্রেফতার করে।

৮ মে ২০০০ দৈনিক যুগান্তরে পুলিশের খাতায় পেশাদার অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত প্রায় অর্ধশত ভয়ঙ্কর অপরাধীরা আইনের ফাঁক গলিয়ে জামিনে জেল থেকে বের হওয়ার তথ্য প্রকাশ। জামিনপ্রাপ্তদের মধ্যে খুনি, ডাকাত, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী ও মাদক সম্রাটও রয়েছে। পুলিশের দুর্নীতি ও পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে পেশাদার ও চিহ্নিত অপরাধীরা বার বার জামিন পায়। হত্যা, চাঁদাবাজি, রাহাজানি ও অস্ত্র আইনের জামিন অযোগ্য ধারায় ২০টি মামলা থাকার পরও মার্চে নগরীর টপ সন্ত্রাসী বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক ত্রিমতি সুব্রত বাইন ওরফে শুভ্র হাইকোর্টের জামিনে ছাড়া পায়। ১৯৯৭, ১৯৯৮ ও মার্চ মাসে তিন দফায় জামিন পাওয়ার পিছনে পৃথক তিনটি কারণ ছিল। প্রথমবার সে জামিন পায় ৬৮(৮)৯৬ নম্বর মামলার এজাহারে তার নাম নেই বলে। দ্বিতীয়বার ১২৭(১০)৯৬ মামলায় পুলিশ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে 'সন্দেহবশত তাকে গ্রেফতার করা হল।' সন্দেহবশত কথা উল্লেখ করায় জামিন পায়। তৃতীয়টিতে হত্যা, অস্ত্র ও সন্ত্রাসী মামলায় পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে অস্ত্র মামলায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়নি। ২৭ এপ্রিল হত্যা, রাহাজানি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজিসহ ৪৪টি মামলার আসামী শামসু ওরফে চাপাতি শামসু জেল থেকে ছাড়া পায়। ইতিপূর্বে পুলিশ তাকে তিনবার গ্রেফতার করেছিল। কিন্তু তিনবারই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে শামসু ছাড়া পায়। পুলিশ কনস্টেবল মোতালেবকে হত্যার অভিযোগে ১৭ এপ্রিল তাকে গ্রেফতার করা হয়। মাত্র ১০ দিন পরই শামসু জেল থেকে বেরিয়ে আসে। রিমান্ড শেষে প্রেরিত প্রতিবেদনে সূত্রাপুর থানা উল্লেখ করে 'হত্যার স্বপক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি'। তাছাড়া জামিনের শুনানিকালে বাদীপক্ষ পুলিশ জামিনের বিরোধিতা করেনি। ফলে সহজেই জামিন হয়। ১৯৯৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে দক্ষিণাঞ্চলের সন্ত্রাসী ৭২ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী মারফত আলীকে পুলিশ ঢাকায় গ্রেফতার করে। কিন্তু পুলিশ আদালতে পর্যাপ্ত দলিলপত্র উপস্থাপন করতে পারেনি বলে আদালত তাকে জামিন দেয়। পরে গুলশান থেকে পুলিশ তাকে আবার গ্রেফতার করে।

১৪ জুন কথিত অস্ত্র উদ্ধারের নামে টঙ্গী থানায় ২৫ বছর বয়স্ক যুবক সাইফুল ইসলাম ছুলেটকে রিমান্ডে এনে নির্যাতন করায় সন্ধ্যা ৬টায় তার মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। ছুলেটের শরীরে আঘাতের চিহ্ন এবং বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত ঝরতে দেখা গেছে অথচ পুলিশ বলেছে, শার্ট গলায় পেঁচিয়ে সে আত্মহত্যা করেছে। পুলিশ ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। ১৫ জুন সকাল সাড়ে ১০টায় গাজীপুরের এনডিসি ও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সায়েদুল ইসলাম ছুলেটের লাশের সুরতহাল রিপোর্ট করেন। ছুলেট আত্মহত্যা করেছে বলে পুলিশ

www.pathagar.com

বললেও ম্যাজিস্ট্রেট সুরতহাল রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন যে, ছুলেটের পায়ের গোড়ালী, তালু ও নাক দিয়ে রক্ত ঝরেছে। শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পুলিশ একটি চুরির মামলায় ছুলেটকে গ্রেফতার দেখায়। টঙ্গীর চেরাগ আলী বাজারে মোটর সাইকেল গ্যারেজের মালিক স্বপন ও জালালাবাদ হোটেলের মালিক মোমিন উল্লাহ ১২ জুন পূর্ব শত্রুতার জের ধরে জোরপূর্বক ছুলেটকে থানায় সোপর্দ করে। ছুলেটকে চুরির মামলায় জড়িয়ে গ্রেফতার করা হলেও রিমান্ডে আনা হয় তার কাছে অবৈধ অস্ত্র আছে বলে।

ডিবি অফিসের চাঞ্চল্যকর জালাল হত্যার মামলার অন্যতম আসামি ইন্সপেক্টর জিয়াউল আহসান ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০০ জামিনে কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে নিহত জালালের পরিবার-পরিজনসহ মামলার অন্য সাক্ষীদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করা শুরু করে। আওয়ামী শাসনের শুরু থেকেই এ রকম অভিযোগ সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু সরকার তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেনি।

সিবি.২১৫/১, কচুক্ষেত পুরান বাজার, কাফরুলের বাসিন্দা বাদল মিয়া দীর্ঘ ১০ বছর সৌদি আরবের মিনিস্ট্রি অব হেলথ-এ চাকরি করার পর ১৯৯৫ সালে দেশে ফিরে আসেন। তিনি মিরপুর ১৪ নম্বর মোড়ে ওয়াসার জমি লিজ নিয়ে সাতটি দোকান তৈরি করেন। ১৯৯৯ সালের ১৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় ক্যান্টনমেন্ট থানার ওসি ফারুক আহমদ তার দোকানের সামনে যায়। ওসি বাদল মিয়াকে ডেকে বলে, আমার এলাকায় ব্যবসা করছেন আমাকে না জানিয়ে। এক সপ্তাহের মধ্যে থানায় এসে আমাকে ৫ লাখ টাকা দিয়ে যাবেন। ওসি এই কথা বলে চলে যাওয়ার পর বাদল মিয়া বিষয়টি তার প্রতিবেশীদের জানায়। ১০ দিন পর ওসি তার থানার এসআই শ্যামল চৌধুরী ও আমিনুল ইসলামসহ ৬/৭ জন সিপাহীকে পাঠিয়ে দেয়। তারা এসে পুনরায় তাকে শাসিয়ে যায় এবং বলে ওসি সাহেবের সাথে টাকা নিয়ে দেখা না করলে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে উচিত শিক্ষা দেয়া হবে, জানে মেরে ফেলা হবে। এরপর ৩০ নভেম্বর রাত ১টা ৩০ মিনিটে এসআই শ্যামল চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম, এসআই ফারুকসহ ১০/১২ জন সিপাহী এসে জোরপূর্বক বাদল মিয়াকে তুলে নিয়ে যায়। রাতভর তাকে থানার ওসি'র কক্ষে তালা দিয়ে রাখা হয়। তার গলার সোনার চেইন, মোবাইল ফোন, পকেটে রাখা ২৪ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়া হয়। পরদিন সকাল ৯টায় ওসি থানায় এসে বাদল মিয়ার কাছে ৫ লাখ টাকা চায়। বাদল মিয়া টাকা দিতে না পারায় থানার দোতলায় নিয়ে তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। তার স্ত্রী, সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনেরা আসলে বাদল মিয়ার বিরুদ্ধে দুইটি মামলা আছে বলে তাদের লাঞ্ছিত করে বের করে দেওয়া হয়। ওসি স্বয়ং এসআই আমিনুল ইসলামকে নির্দেশ দেন যে, শালাকে মামলায় দিয়ে দেন। এরপর তাকে ক্যান্টনমেন্ট থানার মামলা নং ৬২(১১)৯৮, ধারা ১৪৩, ৩৮৫ ও ৩২৩ দন্ডবিধি এবং মামলা নম্বর ৪(১২) ৯৮, ধারা ৩৪২, ৩২৩, ৩৭৯ ও ৪২৭ দন্ডবিধিতে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। ২ ডিসেম্বর তাকে এক মাসের আটকাদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। ১ ফেব্রুয়ারি ২০০০ তিনি জামিনে ছাড়া পেয়ে ক্যান্টনমেন্ট থানায় গিয়ে জানতে পারেন ওসি ফারুক আহমদ বদলি হয়ে গুলশান থানায় এসেছে। বাদল মিয়া তার চেন ও টাকা চাইতে গুলশান থানায় ওসি'র কাছে যান। সেখানে ওসি তার ওপর মারাত্মক ক্ষেপে যায় এবং আবারো মামলায় ফাঁসিয়ে ডিটেনশন দিয়ে জেলে পাঠিয়ে দেবে বলে জানায়। এই ঘটনার পর সিএমএম আদালতে ওসি ও তার সহযোগী পুলিশের বিরুদ্ধে একটি মামলা (নম্বর ৪২১/৯৯ ধারা ৪২০, ৪০৬ দন্ডবিধি) দায়ের করেন। মামলা দায়েরের ফলে শুরু হয় নতুন পন্থায় নির্যাতন। ৮ সেপ্টেম্বর ওসি গুলশান থানার ইন্ধনে কাফরুল থানার এসআই

www.pathagar.com

মহিউদ্দিন লোকজন নিয়ে বাদল মিয়ার বাসায় যায়। এ সময় বাদল মিয়া বাসায় ছিলেন না। পুলিশ তার বাসার দরজা, আসবাবপত্র ভাংচুর ও তছনছ করে এবং তার স্ত্রীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। তারা বলে, পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার না করলে তোমার স্বামীর নামে ১০টা মামলা দেবো।

জমিজমা সংক্রান্ত একটি মামলায় (নং-৩৬৯/৯৭) বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট মোজাম্মেল হক ২৮ নভেম্বর ২০০০ ফায়েকুজ্জামান শেখকে নির্দোষ প্রমাণ করে আদালতে খালাস প্রদান করেন। একই দিনে গোপালগঞ্জ 'ক' অঞ্চলের ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অন্য একটি মামলায় (নং-৬৩/৯৯) ফায়েকুজ্জামান জামিন লাভ করেন। খালাস ও জামিন পেয়ে ফায়েকুজ্জামান শেখ উকিল দুপুর ১ টার দিকে তার নিজ আইনজীবীর সাথে কথা বলতে থাকেন। এ সময় কোর্ট দারোগা আলতাফ হোসেন ও কনস্টেবল জামান সেখানে গিয়ে ফায়েকুজ্জামানকে কিল-ঘুষি মারতে মারতে টেনে-হেঁচড়ে কোর্ট হাজতে ঢুকায়। তাকে টেনে-হেঁচড়ে নেয়ার সময় তিনি কোর্ট দারগা আলতাফকে বলেন, তার বিরুদ্ধে আর কোনো মামলা নেই। এ সময় আলতাফ বলেন, 'ছাড়তে পারি একশর্তে তোর প্রতিপক্ষ আবুল কালামকে মামলা সংক্রান্ত জমি ছেড়ে দিবি এবং হাইকোর্টে মামলায় কন্টেস্ট করবি না-এই মর্মে তোকে লিখিত দিতে হবে।' এ কথায় ফায়েকুজ্জামান রাজি না হওয়ায় কোর্ট দারোগা ম্যাজিস্ট্রেটের কোনো প্রকার আদেশ ছাড়াই ঐ দিন তাকে জেলা কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। পরদিন তাকে কোর্টে হাজির করা হলে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না থাকায় বেলা ৩ টায় আদালত তাকে মুক্তির নির্দেশ দেন। এ ঘটনার পর ফায়েকুজ্জামান বাড়ি গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় বিনা অপরাধে ওয়ারেন্ট ছাড়াই বেআইনীভাবে ২৬ ঘন্টা জেল হাজতে রেখে ক্ষমতার দাপট দেখানোর প্রেক্ষিতে তার স্ত্রী চায়না পারভীন বাদী হয়ে কোর্ট দারোগা আলতাফ হোসেন ও কোর্ট পুলিশ জামানসহ ৫ জনকে আসামী করে গোলাপগঞ্জ গ অঞ্চলের ১ ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ৩৪২/৩৪৫/৩২৩/১০৯ ধারায় মামলা দায়ের করেন (নং-২৮৪৩/২০০০)।

নীলফামারী সদর উপজেলার কচুকাটা গ্রামে একটি টুপিকে কেন্দ্র করে গত ২০ অক্টোবর ২০০০ দু'পক্ষের মধ্যে মারামারি হয়। এ ব্যাপারে উক্ত গ্রামের কেচুয়া মামুদ বাদী হয়ে ৮ জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্তকারী অফিসার দারোগা একাব্বর আলী অজ্ঞাত কারণে উক্ত ৮জন আসামীর সাথে চার বছরের শিশু লেবু মিয়াকে আসামী করে ৯ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন। শিশু লেবু আসামী হওয়ার ব্যাপারটি জানা না থাকার কারণে মামলার অন্যান্য আসামীরা ইতোপূর্বে আদালতে হাজির হয়ে জামিনে মুক্তি পায়। ফলে লেবু মিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হয়। লেবুর পিতা আতিয়ার রহমান আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ৯ জানুয়ারি ২০০১ লেবুকে কোলে নিয়ে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল হাকিমের নিকট জামিনের আবেদন করলে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট তার জামিন মঞ্জুর করেন। আসামীর কাঠগড়ায় শিশু লেবুকে দেখে আদালতে উপস্থিত সকলেই হতবাক হয়ে পড়েন। এ ঘটনা জানার পর পুলিশের প্রতি সকলের চরম ঘৃণা ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কারণ একজন পুলিশ কর্মকর্তার কর্তব্য অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার জন্য শিশু লেবু মামলার চার্জশীটভুক্ত আসামী হয় ও তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হয়েছিল। আদালতের কামরায় এ শিশুটিকে দেখে অনেকে মন্তব্য করেন, 'বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বেই লেবুকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হল।'

www.pathagar.com

লন্ডনভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রতি বছরই পুলিশের অবৈধ নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানিয়ে 'শূন্য ফলাফল' পেয়েছে। ৩০ নভেম্বর ২০০০ ঢাকায় এ্যামনেস্টি তাদের ২১ পৃষ্ঠার রিপোর্টে বাংলাদেশের পুলিশী নির্যাতনের এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছে। এতে বলা হয়েছে, স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে পুলিশের হেফাজতে নির্যাতনের ফলে অগণিত মানুষ মারা গেছে। নির্যাতনের ক্ষেত্রে পুলিশ নানা ধরনের নিষ্ঠুর পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে বলে রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়। এ্যামনেস্টির রিপোর্ট প্রকাশ অনুষ্ঠানে পুলিশী নির্যাতনের শিকার তিনজনকে উপস্থিত করা হয়। এরা হলেন ৯ বছরের বালক গাইবান্ধার ফিরোজ, চট্টগ্রামের ইউসুফ সিকদার ও সাভার থানার আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ৮১ বছর বয়স্ক শেখ সাহাবুদ্দীন আহমেদ। ফিরোজের দেয়া বর্ণনা ছিল অকল্পনীয়। পুলিশ একটি শিশুর সঙ্গে যে কি ধরনের বর্বর আচরণ করে তা তার বর্ণনায় ফুটে উঠে। এ্যামনেস্টির কর্মকর্তা আব্বাস ফয়েজ বলেন, নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটা অবস্থান গ্রহণের জন্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে তারা চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো দলের কাছ থেকেই তারা সাড়া পাননি। তিনি বলেন, দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের মনে হয়, এসব রাজনৈতিক দল নিপীড়নের বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি। আমরা ভেবেছিলাম নিপীড়নের বিরুদ্ধে তারা প্রকাশ্যে একটা বিবৃতি দেয়ার তাগিদ অনুভব করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা দেখলাম সব প্রধান রাজনৈতিক দল যাদের সরকারের আমলে এদেশের ব্যাপক নির্যাতন চলেছে, তারা কেবল নিজ দলের কর্মীদের নির্যাতনের ব্যাপারেই মনোযোগ দেয়। সমাজের অবহেলিত মানুষ যারা, যারা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয় তাদের প্রতি এসব দলের কোনো দৃষ্টিই নেই। এ্যামনেস্টির রিপোর্টে বাংলাদেশের পুলিশ হেফাজতে ধর্ষণকে একটি মারাত্মক সমস্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের কর্মকর্তারা জানান, বাংলাদেশ নির্যাতন বিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুমোদন করলেও দেশটিতে এমন কিছু আইন রয়েছে যা নির্যাতনের সুযোগ তৈরি করে দেয়। তারা এসব আইন বিলোপের জন্য সুপারিশ করেন। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ১ ডিসেম্বর ২০০০)

নতুন বছরের সাতদিন পার হতে না হতেই দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত হয় একটি চমকদায়ক প্রতিবেদন। প্রতিবেদনের প্রথমেই বলা হয় '২০০০ সালে ঢাকা মহানগরীতে পুলিশের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার কোন অগ্রগতি নেই। বরং উল্টো হয়রানির শিকার হচ্ছে বাদী পক্ষ। মামলার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটও বিব্রত হচ্ছেন। বিচার প্রার্থীদের অভিযোগ-মামলা করে লাভ হচ্ছে না। পুলিশের বিরুদ্ধে পুলিশের তদন্ত বেশিদূর এগুচ্ছে না।' জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত শুধু ঢাকার আদালতেই শতাধিক পুলিশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে মামলা হয়। হত্যা, লুটপাট, চাঁদাবাজি, মহিলার শ্লীলতাহানি, হয়রানিসহ, গুরুত্বর অভিযোগে মামলাগুলো দায়ের হয়। একটি মামলায় খোদ পুলিশ কমিশনারকেও অভিযুক্ত করা হয়। এছাড়া মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের দু'জন সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি), কয়েকটি থানার ওসিও অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছে। মামলায় সর্বনিম্ন পর্যায়ের অভিযুক্ত হচ্ছে পুলিশের সোর্স। ৯ ফেব্রুয়ারি কোন গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়াই ডিবির এসি মাসুদ রব্বানী ও তানভীর আহমেদের নেতৃত্বে একদল পুলিশ শ্যামপুরের করিম উল্লাহবাগের একটি বাড়িতে মধ্যরাতে অভিযান চালায়। আসামী ধরার নামে পুলিশ সদস্যরা সুমন নামের এক যুবকের থুঁতনির নিচে গলায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করলে সুমনের মৃত্যু হয়। এক সময়ে

www.pathagar.com

পুলিশের গুলিতে আহত হয় সুমনের ভাই। পুলিশ এলোপাথাড়িভাবে সুমনের মা-বোনকে মারধর করে। এ ঘটনায় সুমনের ভাই হাজী মোজাম্মেল হোসেন বাদী হয়ে ডিবির এসি মাসুদ রব্বানী, তানভীর আহমেদ, ৬ পুলিশ ইন্সপেক্টর, ৮ জন দারোগাসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে ঢাকার সিএমএম আদালতে মামলা করেন। আদালত বাদীর জবানবন্দি রেকর্ড করে ঘটনা তদন্ত সাপেক্ষ শ্যামপুর থানাকে নিয়মিত মামলা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেন। পুলিশের বিরুদ্ধে পুলিশের নেয়া মামলার তদন্ত কাজ ওই পর্যন্তই থেমে আছে। জোর করে বাড়ি দখল, লুটপাট ও চাঁদাবাজির অভিযোগে উত্তরা থানার ওসিসহ ৮ পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালাম আজাদ। তার অভিযোগ-ওসির নির্দেশে অন্য পুলিশ সদস্যরা তার শ্বশুড় বাড়ির লোকজনকে মারধর করে বাড়ির দেয়াল ভেঙে দিয়ে ঘরের মালামাল ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে ওসি যেহেতু জড়িত তাই থানা মামলা নেয়নি। আদালত মামলার বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেন। এই পর্যন্তই বিষয়টি থেমে আছে। অবৈধভাবে ঘরে ঢুকে লুটপাট এবং মহিলার শ্লীলতাহানির অভিযোগে ডেমরা থানার ওসির বিরুদ্ধে ফেব্রুয়ারি তে আদালতে মামলা করেন ৭৬ নং ওয়ার্ড কমিশনার আলিম উল্লাহ। তার অভিযোগ বিনা ওয়ারেন্টে মদ্যপ অবস্থায় পুলিশের লোক তার বাসায় ঢুকে তার স্ত্রী শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায়। ঝিলের পানিতে ফেলে যুবক হত্যার অভিযোগে খিলগাঁও থানার দারোগা আতিয়ার রহমান ও তার ফোর্সের বিরুদ্ধে আদালতে ২৮ সেপ্টেম্বর হত্যা মামলা দায়ের করেন নিহত যুবকের মা মমতাজ বেগম। মামলার আর্জিতে মমতাজ বেগম বলেন, পুলিশ তার ছেলে মাহবুব হাসান অলিকে ধাওয়া করে পশ্চিম রামপুরার ঝিলের পানিতে ফেলে দেয়। পুলিশের সামনেই অলির মৃত্যু হয়। আদালত ঘটনা তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিআইডিকে নির্দেশ দেন। শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগে বাড্ডার নতুন বাজার এলাকার বাসিন্দা নার্গিস বেগম বাদী হয়ে পুলিশের এক হাবিলদার ও সোর্সের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন। ১২ অক্টোবর রুজু করা মামলার আর্জিতে নার্গিস বলেন, গুলশান থানার হাবিলদার কাদের ও সোর্স মন্টু রাতের বেলা বিনা কারণে তার ঘরে ঢুকে তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায়, পরে তার কানের, গলার সোনার গহনা ও নগদ ২৬ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় হাবিলদার। আদালত সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ দেন। কিন্তু মামলা রুজুর পর হাবিলদার কাদের ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তারা বাদীর পরিবারকে নানাভাবে হুমকি দিয়ে মামলা তুলে নেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। জোর করে মামলার দুই সাক্ষীকে ধরে নিয়ে সাক্ষ্য না দেয়ার জন্য সাদা কাগজে সই নিয়েছে। বিষয়টি জানিয়ে নার্গিস বেগম ফের ঢাকার সিএমএম আদালতে আরও একটি মামলা করেন। মধ্যরাতে ঘরে ঢুকে ডাকাতি ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে ডিবির এসি তানভীর আহমেদ, মিরপুর থানার এক দারোগাসহ ১০/১২ জনের বিরুদ্ধে ১৬ অক্টোবর আদালতে মামলা করেন সালমা বেগম। মিরপুর ১ নং সেকশন 'বি' ব্লকের বাসিন্দা সালমা বেগম আদালতে মামলা করে বলেন, '১৪ অক্টোবর রাত ১ টার দিকে অভিযুক্তরা তার ঘরে ঢুকে তার সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করে ৩ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়।' আদালত মামলাটি তদন্ত করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিআইডিকে নির্দেশ দেন। এরপর কি হয়েছে কেউ জানে না। হাইকোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা করে সূত্রাপুরের টিপু সুলতান রোডের একটি বাড়িতে ঢুকে হয়রানি ও ঘরের মালামাল লুটপাট করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে পুলিশ কমিশনার মতিউর রহমান, উপ-পুলিশ কমিশনার (পূর্ব) ও সূত্রাপুর থানার ওসিসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে রুকসানা বেগম লাবণী ২ নভেম্বর সিএমএম আদালতে মামলা

www.pathagar.com

করেন। আদালত মামলার বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেন। কিন্তু এর পরপরই লাবণী বেগম বাদী হয়ে একই আদালতে আর একটি মামলা করে বলেন, 'আসামীরা প্রভাবশালী হওয়ায় মামলা করার কারণে তাকে টেলিফোনে হুমকি দেয়া হচ্ছে। মামলার সাধ মিটিয়ে দেয়া হবে বলে ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে।' (সূত্রঃ দৈনিক যুগান্তর ৭ জানুয়ারি ২০০১)

২ মার্চ ২০০১ সকালে উত্তরার দক্ষিণখানে চাঞ্চল্যকর তারাজউদ্দিন খুনের মামলার আসামী বোরহান উদ্দিন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নৃশংসভাবে মৃত্যুবরণ করে। সকাল ১০টায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বোরহানের লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে নেয়া হয়। সকালে সে মারা যায়। নিহত বোরহান (হাজতী নম্বর ২৮৩৩/২০০১) মোহাম্মদপুর থানার ১৯/১ পশ্চিম আগারগাঁওয়ের এস্কেদার আলীর ছেলে। পেশায় রং মিস্ত্রি। সে স্ত্রী পারভিন এবং তিন বছর বয়সের মেয়ে রেহানা এবং তিন ভাই ও দু'বোন নিয়ে উত্তরার আশকোনার একটি বাসায় ভাড়া থাকতো। ৮ ফেব্রুয়ারি তারাজউদ্দিন হত্যাকান্ডের পর তার বাসা থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এরপর বেশ কয়েক দফা রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। বোরহান উদ্দিনের পরিবারের সদস্যরা দাবি করেছে, পুলিশী নির্যাতন তার মৃত্যুর জন্য দায়ী। নিহতের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের দগদগে চিহ্নের কথা উল্লেখ করে বলা হয়, 'উত্তরা থানা পুলিশ মন্ত্রীপুত্রের কেশার্গ স্পর্শ করতে না পারলেও বোরহানকে পিটিয়ে হত্যা করেছে।' নিহতের শরীরের নির্যাতনের চিহ্ন ছিল। শরীরের বিভিন্ন স্থান ফেটে রক্ত বের হবার পর সেখানে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এরপর তাকে উপযুক্ত চিকিৎসা না দিয়ে কারাগারের মধ্যেও রহস্যজনক কারণে নির্যাতন চালানো হয়। অন্য একটি সূত্রের মতে, মামলার প্রধান আসামী নৌ-পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার ছেলের দীপু চৌধুরীকে জামিনে মুক্তিদানের পর শর্তানুযায়ী বোরহানকে মুক্ত করার উদ্যোগ না নেয়ায় সে এই হত্যাকান্ডসহ মায়া চৌধুরীর পরিবারের অনেক তথ্য ফাঁস করে দেবে বলে কারাগার থেকে হুমকি দিয়েছিল। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ৩ মার্চ ২০০১)

নির্দিষ্ট মামলার কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার উপলক্ষে পুলিশের নির্বিচার ধরপাকড় এবং গণনির্যাতনের দৃষ্টান্ত আওয়ামী শাসনামলে বহুবার স্থাপিত হয়েছে। দেখা গেছে, একজন বা কয়েকজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ পুলিশ অভিযুক্তদের আত্মীয়-স্বজনসহ পাড়া, মহল্লা বা গ্রামের সাধারণ মানুষকে পর্যন্ত গ্রেফতার করেছে এবং তাদের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়েছে। পুলিশের ধরপাকড় ও নির্যাতনের শিকার হন সৈয়দপুরের চারটি গ্রামের অধিবাসীরা। ২ এপ্রিল সৈয়দপুরের কাশিরাম-বেলপুকুর ইউনিয়নের চারটি গ্রামের পুলিশের অভিযান এমন মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে যে, ঐ গ্রামগুলো সম্পূর্ণরূপে পুরুষশূন্য হয়ে যায়। সেখানে ঐতিহ্যবাহী চওড়া বাজারসহ সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। স্কুল ও মাদ্রাসায় তালা ঝুলেছে এবং কোনো পুরুষ মানুষ না থাকায় মসজিদগুলোতে আজান পর্যন্ত দেয়া হয়নি, নামাজ পড়াও বন্ধ হয়ে যায়। ওদিকে একযোগে শুরু হয় নারী নির্যাতন। পুরুষদের না পেয়ে পুলিশ নারীদের ওপর নির্যাতন চালায়। তাছাড়া পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে চোর-ডাকাত ও সন্ত্রাসীরা তৎপর হয়ে উঠে। ফলে হাঁস-মুগরী ও গবাধি পশুসহ মানুষের মালামাল লুণ্ঠিত হয় প্রতিদিন, নারীরা এমনকি ধর্ষণেরও শিকার হন। কিন্তু কোনো অপরাধেরই ন্যায়বিচার কিংবা প্রতিকার পাওয়ার কোন উপায় ছিল না সেখানে। কারণ পুলিশ নিজেই নামে নির্যাতনকারীর ভূমিকায়। ২৯ মার্চ একদল পুলিশ ঐ এলাকার একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে এবং

www.pathagar.com

চওড়াবাজার দিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু পুলিশ সদস্যরা সাদা পোশাকে থাকায় বাজারের লোকজন তাদেরকে সন্ত্রাসী অপহরণকারী বলে মনে করে এবং আটক ব্যক্তিকে ছিনিয়ে নেয়। জনতার তাড়া খেয়ে পুলিশ সদস্যরা চলে যায় তারপর দিন থেকে আলোচ্য চার গ্রামে শুরু হয় পুলিশের নিষ্ঠুর অভিযান। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ৪ এপ্রিল ২০০১)

দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী ও রাজনৈতিক নেতারা ভয়ংকর অপরাধ করেও আগাম জামিন নিয়ে ঘুরেছেন বহালতবিয়তে। ভিআইপি আসামীদের জন্য জামিনের আবেদন হয় জোরদার। কিন্তু এ সবের কোনকিছুই ছিল না গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র ১০ বছর বয়সী সাব্বিরের। তার প্রথম সাময়িক পরীক্ষার ৮ বিষয় পরীক্ষা দেয়ার পর বাকি পরীক্ষা দেয়ার পূর্বেই তাকে খুনের মামলার আসামী বলে স্কুলড্রেস পরা অবস্থায়ই ১০ মে হাতকড়া পরিয়ে জেলে নেয়া হয়। উচ্চতর আদালত তাকে দুই সপ্তাহের জামিন মঞ্জুর করে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন। কিন্তু আত্মসমর্পণের পর শুনানীর তারিখ নির্ধারণ করে তার জামিনের আবেদন বাতিল করা হয়। সাব্বিরকে হাতকড়া দিয়ে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত একটি হত্যা মামলায় সাব্বিরের জামিনের আবেদন না মঞ্জুর করে জেলে পাঠায়। ক্যারম খেলাকে কেন্দ্র করে ১৮ মার্চ হাজারীবাগ এলাকায় ছাত্রলীগের ক্লাবের সামনে অহিদুল আমিন বাবু নামের এক কিশোর খুন হয়। এই খুনের ঘটনায় ধারাল অস্ত্র সরবরাহ করার অভিযোগ এনে কিশোর সাব্বিরকে আসামী করা হয়। উচ্চতর আদালত ৩ মে দু'সপ্তাহের জন্য সাব্বিরের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন। নিম্ন আদালতে তাকে আত্মসমর্পণের কথাও বলা হয়। হাইকোর্টের আদেশে সাব্বিরকে আদালতে হাজির করে তার পক্ষে নিয়োজিত আইনজীবী জামিন প্রার্থনা করেন। আদালত জামিন শুনানির জন্য ১৩ মে দিন ধার্য করেন এবং জামিনের প্রার্থনা বাতিল করেন। সঙ্গে সঙ্গে কোর্ট পুলিশ জাহাঙ্গীর সাব্বিরের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়। এ অবস্থায় তাকে এজলাশের বাইরে নামানো হয়। সাব্বিরের পরনে ছিল স্কুলড্রেস, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী স্কুলের নেমপ্লেট, নেভি ব্লু প্যান্ট ও সাদা কেডস। তাকে কোর্ট হাজতের সামনে দিয়ে ভেতর ঢোকানোর আগে সাব্বিরের দুই চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। তার মুখে কথা ছিলনা। সাব্বিরের বাবা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, তার অবুঝ ছেলেটিকে বস্তির কিছু লোক ফাঁসিয়ে দিয়েছে। সাব্বিরের বাবা জানান, তার ছেলের প্রথম সাময়িক পরীক্ষা চলছিল। গতকালও পরীক্ষা ছিল। পুলিশের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গতকাল পরীক্ষা হল থেকে তিনি ছেলেকে নিয়ে কোর্টে আসেন। আইনজীবীরা ভরসা দেন আদালত মানবিক কারণে জামিন দেবে; কিন্তু তা হয়নি। সাব্বিরের পক্ষে এডভোকেট আতাউর রহমানসহ তিনজন আইনজীবী ঢাকার দ্বিতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ হাসান ইমামের আদালতে জামিন চান। জামিন আবেদনে তারা বলেন, অভিযুক্ত সাব্বিরের বয়স মাত্র ১০ বছর ৫ মাস। তার জন্ম ১৯৯০ সালের ২০ নভেম্বর। ক্যারম খেলার সময় সাব্বির ঘটনাস্থলে ছিল না, স্কুলে তার প্রথম সাময়িক পরীক্ষা চলছিল। পুলিশি হয়রানির কারণে তার লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, ক্যারম খেলার সময় নিহত বাবু ও তার অন্য বন্ধুরা বস্তিবাসী। কিছুদিন আগে একটি চুরির ঘটনায় নিহত বাবুর বড় ভাই ও এই মামলায় বাদী শহীদুল আমান সোহাগকে সামাজিক বিচারে সাজা দেয়া হয়। ওই বিচার অনুষ্ঠানে অভিযুক্ত কিশোর সাব্বিরের বাবা সালাহউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে বাদী স্থানীয় কিছু খারাপ লোকের কুপরামর্শে তার ছোটভাই হত্যার ঘটনায় সাব্বিরকে জড়িয়ে দেয়। সাব্বির রাস্তার হৈচৈ শুনে এগিয়ে গিয়ে দেখে বাবুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সাব্বিরের বিরুদ্ধে দায়ের করা

www.pathagar.com

মামলার এজাহার থেকে জানা গেছে, ১৮ মার্চ বিকালে নগরীর হাজারীবাগ থানার নিমতলা কালীমন্দিরের পাশে ৩৯ নং ওয়ার্ড ছাত্রলীগ ক্লাবে রনি, রবিউল ইসলাম বাবু, ওহিদুল আমিন বাবু ও রাহাত হোসেন সাগর নামে চার কিশোর ক্যারম খেলছিল। সন্ধ্যার পর তারা ক্লাব ছেড়ে চলে যায়। ক্লাবের বাইরে এসে খেলাকে কেন্দ্র করে কিশোরদের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতি হয়। এ সময় রনির চাকুর আঘাতে অহিদুল আমিন বাবু মারাত্মক জখম হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর বাবুর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় নিহত বাবুর বড়ভাই ৭১/১ হাজী আফসার উদ্দিন রোডের ভাড়াটিয়া শহীদুল আমান সোহাগ বাদী হয়ে কিশোর রনি ও সাব্বিরের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা করেন। সাব্বিরের অপরাধ সম্পর্কে এজাহারে বলা হয়, নিহত বাবু ও তার অন্য বন্ধুদের হাতাহাতির সময় হঠাৎ সাব্বির গিয়ে রনিকে চাকু সরবরাহ করে। (সূত্রঃ দৈনিক যুগান্তর ১১ মে ২০০১)

ভারতীয় নাগরিক নাবিলাকে আটক করার পর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আলীর বাড়িতে বেআইনী তল্লাশির দায়ে ২৫ জুন হাইকোর্ট দুই পুলিশকে দশ হাজার টাকা জরিমানা করেন। আগামী চার মাসের মধ্যে ঐ দুই পুলিশ সদস্য তেজগাঁও থানার সাবেক ওসি আব্দুল গাফফার ও এসআই জহিরের নিকট থেকে ঐ জরিমানার টাকা আদায় করে সংক্ষুব্ধ মোহাম্মদ আলীকে পরিশোধ করার জন্য পুলিশের আইজিকে নির্দেশ দেয়া হয়। হাইকোর্ট পুলিশের ঐ তল্লাশির ঘটনাকে বেআইনী ও আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করে ঐ রায় প্রদান করেন। বিচারপতি শাহ আবু নঈম মমিনুর রহমান ও বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ মোহাম্মদ আলীর রীটের দীর্ঘ শুনানি শেষে পুলিশকে জরিমানা করে রায় প্রদান করেন। আদালত অভিমতে বলেন, 'সন্দেহের ক্ষেত্রে যথার্থ ভিত্তি ছাড়া ৫৪ ধারায় কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না।' ইতোপূর্বে পুলিশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জরিমানার ঘটনা থাকলেও বেআইনী তল্লাশির ক্ষেত্রে উচ্চ আদালত পুলিশের বিরুদ্ধে এই প্রথম জরিমানা করে রায় দেয়। ঐ জরিমানার টাকা মোহাম্মদ আলীকে দেয়ার পরে আগামী ৪ মাসের মধ্যে পুলিশের আইজিকে হাইকোর্টে জানাতে বলা হয়। ভারতীয় নাগরিক ১৭ বছর বয়সী মিনা মলিক ওরফে নাবিলা বাংলাদেশে বেড়াতে এসে সংসদ ভবনে যায়। সংসদ ভবনের গেটে পুলিশ তার ব্যাগ রেখে দেয়। ঐ ব্যাগে থাকা নাবিলার আপেল পুলিশ খেয়ে ফেললে সে তার প্রতিবাদ করে। পুলিশ তখন তার ব্যাগ তল্লাশি করে একটা আপেল কাটার ছুরি পায়। এই অভিযোগে সেদিন ১৭ নভেম্বর ১৯৯৪ নাবিলা ও তার মামা আশফাক হোসেনকে ৫৪ ধারায় পুলিশ গ্রেফতার করে। অভিযোগে বলে, নাবিলার ব্যাগে ১২ ইঞ্চি লম্বা ড্যাগার পাওয়া গেছে। নাবিলা অবশ্য ঐ অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়ে ভারতে চলে যায়। ঐ ঘটনার জের হিসেবে নাবিলা ও তার মামা বাংলাদেশে যার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল ঢাকার মোহাম্মদপুরের সেই মোহাম্মদ আলীর বাড়িতে পুলিশ পর পর তিনদিন তল্লাশি করে। এ সময় মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে তার বাড়িতে অনুষ্ঠান চলছিল। পুলিশের ঐ হয়রানির বিরুদ্ধে মোহাম্মদ আলী হাইকোর্টে ২৯ নভেম্বর রীট করলে হাইকোর্ট স্বরাষ্ট্র সচিব সহ দুই পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে রুলনিশি জারি করে। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে দীর্ঘ ৬ বছর পর আদালত রায় প্রদান করে। মোহাম্মদ আলীর রীট আবেদনটি পরিচালনা করেন ব্যারিস্টার তানিয়া আমীর। তাকে সহায়তা করেন এ্যাডাভোকেট মঞ্জিল মোর্সেদ ও ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। সরকার পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার শামসুদ্দিন চৌধুরী। অপর একটি মামলায় আদালত হাইকোর্টের আদেশ অমান্য করে জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদের বাড়ি তল্লাশি ও হয়রানির অভিযোগে

www.pathagar.com

কুমিল্লার এসপিসহ তিন পুলিশকে আদালত ভৎর্সনা করেন। কুমিল্লার এসপিসহ তিন পুলিশকে বলা হয়, 'হাইকোর্টের আদেশ অমান্য করার সাহস আসে কোথা থেকে?' জননিরাপত্তা আইনের মামলায় কায়কোবাদকে গ্রেফতার বা হয়রানি না করার জন্য হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুলিশ তার ঢাকার খিলগাঁওয়ের বাসভবন তল্লাশি করে ও দু'জনকে গ্রেফতার করে। এর বিরুদ্ধে তিনি কুমিল্লার এসপি, এএসপি ও ওসির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করলে ঐ তিন পুলিশ সদস্য হাইকোর্টে হাজির হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আদালত বলেন, 'ভারতে আদালতের আদেশ লংঘন করা হলে ঐ তিন পুলিশের চাকরি চলে যেত।' তিন পুলিশের পক্ষে জবাব দেন ব্যারিস্টার শফিক আহমদ। (সূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ ২৬ জুন ২০০১)

ঢাকার চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত গত এক বছরে পুলিশ কর্মকান্ডের ওপর একটি অনুসন্ধানী জরিপ চালিয়ে তথ্য পায়, 'মামলার এজাহারে নাম নেই অথচ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ গত এক বছরে প্রায় ৭ হাজার নিরীহ লোককে সন্দেহ করে অকারণে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়ে তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। হয়রানিমূলক মামলায় জড়িয়ে অনেক সাধারণ মানুষ টাকা-পয়সা এবং পারিবারিক মানসম্মান খুইয়েছে।' মামলার তদন্ত পরিচালনা প্রসঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেসি থেকে এর ওপর একটি প্রতিবেদনও প্রকাশ করা হয়। এই প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। এছাড়া একই বিষয়ে পুলিশের আইজি, পুলিশ কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার ও সিআইডির স্পেশাল পুলিশ সুপারকে জানানো হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, 'পুলিশ ইচ্ছামতো ক্ষমতার অপব্যবহার করে হাজার হাজার সাধারণ নিরীহ লোককে আটক করে নির্যাতন করেছে। অথচ মামলায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে রিমান্ডে নেয়ার আবেদনেও পর্যাপ্ত যৌক্তিকতা ছিল না।' খুন, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ডাকাতি, চুরি, ধর্ষণ, অপহরণ, নারী নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রভৃতি কারণে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার ২১ থানায় ২০০০ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৪ হাজার ৯৬৩ টি মামলা রুজু করা হয়। এর বাইরে সন্দেহ করে ৫৪ ধারায় রুজু করা হয় আরো কয়েক হাজার মামলা। এসব মামলার মধ্যে এজাহার নামীয় আসামীর সংখ্যা ১১ হাজার ১৩০ জন ও সন্দেহ করে আসামী করা হয় আরও ৬ হাজার ২০৮ জনকে। এক বছরে মোট ১৭ হাজার ৩৩৮ জনকে গ্রেফতার করে তদন্তের নামে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতের কাছে আবেদন করে। পুলিশের আবেদনে আদালত ৬ হাজার ৫০৩ জনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। রিমান্ডে নেয়া অভিযুক্তদের মধ্যে ১১৩ জন ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দেয়। এর সংখ্যা শতকরা ১.৭৩ জন। ১১৭ জন অভিযুক্তের কাছ থেকে আলামত জব্দ করা হয় যার সংখ্যা রিমান্ডে নেয়া আসামীরা শতকরা ১.৮০ জন। মামলার তদন্ত সম্পন্ন হলেও ৪ হাজার ৭৮ জন অভিযুক্তকে চার্জশিট থেকে বাদ দেয়া হয়, যার সংখ্যা গ্রেফতারকৃত আসামীর শতকরা ২৩.৫২ জন। ৬ হাজার ৫৩১ জন অভিযুক্তকে চার্জশিটভুক্ত করা হয়, যা গ্রেফতারকৃত আসামির শতকরা ৩৭.৬৬ জন। এছাড়া ৫ হাজার ৮৬৫ জনকে ফাইনাল রিপোর্টভুক্ত করা হয়, যা গ্রেফতারকৃত আসামীর শতকরা ৩৩.৮২ জন। এক বছরে ২১ থানায় দায়ের করা মামলাগুলোর মধ্যে ৯৩০ টি মামলা ঝুলে আছে। কবে নাগাদ এর তদন্ত কাজ শেষ হবে তা অনিশ্চিত। ২০০০ সালে অন্যের প্ররোচনায় পড়ে নিরীহ লোককে মিথ্যা মামলায় জড়ানোর দায়ে দন্ডবিধির ২১১ ধারায় ৭৪ টি মামলার বাদীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়। ঢাকার চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শৈলেন্দ্র কুমার অধিকারী

www.pathagar.com

মামলায় পুলিশের তদন্ত পরিচালনার দুর্বলতা ও ক্ষমতার অপপ্রয়োগের বিষয়টি চিহ্নিত করে অভিমত প্রকাশ করেন, 'মামলায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে রিমান্ডে নেয়ার আবেদনে পর্যাপ্ত যৌক্তিকতা ছিল না। এজহারে নাম নেই অথচ সন্দেহ করে অকারণে কয়েক হাজার লোককে আটক করে রিমান্ডে নিয়ে হয়রানি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পুলিশ যথেচ্ছভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করছে।' (সূত্রঃ দৈনিক যুগান্তর ৩০ জুন ২০০১)

২০০০ সালের পুলিশী কর্মকান্ডের উপর জরিপ চালিয়ে সি.এম.এম আদালত কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনটি সম্পর্কে ৩০ জুন ঢাকার বিবিসি সংবাদদাতা মুখ্য মহানগর হাকিম শৈলেন্দ্র কুমারকে জিজ্ঞেস করেন এক বছরে পুলিশ কত লোককে গ্রেফতার করেছে যাদের নাম মামলার এজাহারে ছিল না। জবাবে শৈলেন্দ্র কুমার বলেন, এই ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করছি যে, বেশ কয়েক হাজার আসামী, প্রায় ৬ হাজারের বেশি যাদের এজাহারে নাম নেই তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারপর এদেরকে রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের খুব অল্প সংখ্যক আসামীকে পরবর্তীতে চার্জশিটভুক্ত করা হয়েছে।

বিবিসি ঃ এদেরকে যে গ্রেফতার করা হয়েছে সেক্ষেত্রে কি পুলিশ তার ক্ষমতার অপব্যবহার করেই এটা করেছে?

শৈলেন্দ্র ঃ এদেরকে গ্রেফতারের জন্য যতটুকু যৌক্তিক সাক্ষ্য প্রমাণ পুলিশের হাতে থাকা দরকার ছিল সেটা ছিল বলে এই প্রতিবেদনে মনে হয় না। যদি থাকতো তাহলে এদের একটা আরো বিরাট অংশ অবশ্য চার্জশীটভুক্ত হতো। হয়তো এদের মধ্যে অনেকে থাকতে পারে। কিন্তু সেটা তদন্তে প্রমাণিত করতে পারেনি বা তদন্তে এটা বেরিয়ে আসেনি।

বিবিসি ঃ এ ক্ষেত্রে কি মনে হয়েছে তদন্তের গাফলতি হয়েছে?

শৈলেন্দ্র ঃ এটাতে ক্রটি রয়েছে, তদন্ত আরো কার্যকরভাবে বা দক্ষতার সাথে হওয়া উচিত। এতে অতটা দক্ষতা বিভিন্ন ভিত্তিতে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তদন্তের মান যাতে বৃদ্ধি পায় এটাই আমাদের প্রতিবেদনের মূল লক্ষ্য এবং এটার ব্যাপারে আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

বিবিসি ঃ আপনারা কি সুপারিশ করেছেন সেখানে?

শৈলেন্দ্র ঃ যাতে তদন্তের গুণগত মান আরো বৃদ্ধি করা হয় এবং মামলার তদন্তে যারা নিয়োজিত আছেন তারা যাতে এ বিষয়ে আরেকটু বেশি দৃষ্টি দেন তাহলে এ ধরনের ঘটনা অনেক কমে আসবে, সংখ্যা কমে আসবে।

সি.এম.এম আদালতের এই প্রতিবেদন সম্পর্কে ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার মতিউর রহমান বলেন, 'নিরীহ লোক বলে কোন কথা নেই। যাদেরকে সন্দেহ করা হয়েছে মামলাতে যাদের সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে বলে ধরা হয়েছে এবং এই আইনটা তো স্বীকৃত আইন। কারণ আমার তো জানা থাকে না, এই তদন্ত একটা তো প্রক্রিয়া, যখন প্রাথমিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয় তখনই তাদেরকে ধরা হয়। পরবর্তীতে যখন নিরীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে তখন তারা আদালত থেকে ছাড়া পেয়েছে। নিরীহ লোককে নিরীহ লোক জেনে কোনদিন গ্রেফতার করা হয়নি। (সূত্রঃ দৈনিক সংগ্রাম ১ জুলাই ২০০১)

মুন্সীগঞ্জ কোর্ট হাজতের পুলিশ জেলার বিভিন্ন থানার আসামীদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে প্রতিদিন মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে ১০ জুলাই ২০০১ দৈনিক দিনকালে প্রকাশ। মামলার আসামীদের জেলা কারাগার থেকে মামলার তারিখ অনুযায়ী কোর্টে হাজিরা দিতে হয়। আসামীদের কোর্টে নেয়ার পর নিরাপত্তার স্বার্থে তাদের কোর্ট কারাগারে রাখা হয়।

www.pathagar.com

এ সময় দূর গ্রামাঞ্চল থেকে আসা তাদের অসহায়, দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন নিজ নিজ আত্মীয়দের এক পলক দেখার জন্য ভিড় জমায়, কোনো কোনো আসামীর আত্মীয় খাবার নিয়ে আসে। কোর্ট কারাগারের সামনে তাদের আটক আত্মীয়-স্বজনকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশকে মোটা অংকের বকশিস দিয়েই তারা তাদের আত্মীয়দের সাথে স্বস্তিতে দেখা করতে পারে। আর টাকা না দিলে শুনতে হয় অকথ্য ভাষায় গালি। জেলার বিভিন্ন থানা থেকে আসা আত্মীয়-স্বজনরা তাদের আসামীকে সপ্তাহে একবার দেখতে এসে ২/৩ হাজার টাকা জরিমানা দেয় শুধু দুই কারাগারের পুলিশকে। বড় আশা করে টাকা-পয়সা জমিয়ে একটু ভাল খাবার তৈরি করে নিয়ে আসে স্বামী, ভাই, কিংবা বাবাকে খাওয়ানোর জন্যে অথচ খাবার দিতে হলে পুলিশকে দিতে হয় মোটা অংকের টাকা। টাকা ছাড়া শত অনুরোধেও ভাই-মামা-চাচা ডেকেও পুলিশের পাথরের মন গলানো যায়নি। টাকার জন্য ঠেলা ধাক্কা দিতেও সংকোচবোধ করেনি এরা। ক্ষেত্র বিশেষে টাকা নিয়েও ক্ষান্ত হয় না এরা। অসহায় দরিদ্র কোনো কোনো মহিলাকে এরা কু-প্রস্তাব দেয়। গজারিয়া থানার চরবাউশিয়া গ্রামের জনৈক মহিলা ডাকাতি মামলার আসামী ছেলেকে দেখতে এসে জরিমানা দিতে বাধ্য হন ১০০ টাকা। তিনি দৈনিক দিনকালের সঙ্গে আলাপকালে বর্ণনা দেন কারাগারের পরিস্থিতি সম্পর্কে। তিনি জানান, দেখা করতে ৩০ টাকা লাগে আর ভাত দিলে ৬০ টাকা এখানকার ডিউটিরত পুলিশকে দিতে হয়। ৫/১০ টাকা কম দিলে পুলিশের লোকজন খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করে। গজারিয়া থানার আরেক গৃহবধূ তাজিনা আক্তার জানান, তার স্বামী ডাকাতি মামলার আসামী। অনেক কষ্ট করে সে টাকা যোগাড় করে এখানে এসেছে। সে শুনেছে এখানকার পুলিশকে টাকা না দিলে আত্মীয়দের সঙ্গে আসামীদের দেখা করতে দেয় না। দুপুরে ভাত এখানকার হোটেল থেকে কিনে ৬০ টাকা পুলিশকে দিয়ে তারপর স্বামীকে খাইয়েছেন। এরপর আরেক পুলিশ তার হাত থেকে জোর করে পান বিড়ে খাব বলে ১০ টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে। একই থানার চরবাউশিয়া বড় কান্দি গ্রামের রাবেয়া খাতুন জানায়, তার ছেলে ডাকাতি মামলার আসামী। ছেলেকে দেখতে খুব ভোরে সে রওনা দিয়েছে। তার ছেলের হাজিরার তারিখ তাই তার একমাত্র সম্বল ঝাঁকি জাল ৩শ' টাকায় বিক্রি করেছে। ছেলের সন্ধান করতে পুলিশের সাহায্য চাইলে পুলিশ ছেলেকে দেখা করিয়ে দেবে বলে ৩০ টাকা হাতিয়ে নেয়। ছেলের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে কিন্তু দু'একটা কথা বলতেই পুলিশ ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। অসংখ্য বার ভাই, বাবা ডেকেও আর পুলিশের মন গলাতে পারেনি সে। এরপর এক পুলিশের কথা মত রাবেয়া খাতুন হোটেল থেকে ভাত কিনে আনে। পুলিশ ৬০ টাকা দিয়ে ছেলেকে ভাত খাওয়ায়। তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন রাবেয়া খাতুন।

www.pathagar.com

মামলার রাজনীতিতে পারদর্শীতা

১৭ আগষ্ট ১৯৯৬ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলামের কাছে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে ছাত্রদল সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য দায়ীদের গ্রেফতারে পুলিশের অনীহা, বিএনপি এবং অঙ্গ সংগঠনসমূহের নেতা-কর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করে হয়রানি, গ্রেফতার করে ডিটেনশন ও জিজ্ঞাসাবাদের নামে অমানবিক নির্যাতন চালানোর কথা উল্লেখ রয়েছে। লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পরই কিভাবে বেপরোয়া কাজ করেছে, নির্যাতনের গতি, নির্মূলের গতি দ্রুততর করেছে তার প্রমাণ বহন করে ছাত্রদল প্রদত্ত স্মারকলিপি। একটি গণতান্ত্রিক দেশে-গণতন্ত্রের অবাধ চর্চার সুযোগ দেয়া হচ্ছে এ রকম আর্তচিৎকার করে প্রতিহিংসার একের পর এক উদাহরণ সৃষ্টিতে পরদর্শীতার পরিচয় দিয়েছিল লীগরা।

ক্ষমতায় বসার পরই ২১ বছর আগের রাজনৈতিক প্রতিশোধ নিতে শফিউল আলম প্রধানের নেতৃত্বাধীন জাগপার নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার প্রক্রিয়া শুরু করেছিল লীগ সরকার। সভাপতি প্রধান বার বার মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার হয়ে জেল খেটেছেন। নির্মম পুলিশী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ১৯৯৭ সালের ১৩ আগষ্ট সন্ধ্যায় জাগপা অফিস থেকে প্রধানকে একবার গ্রেফতার করা হয়। কয়েকদিন পরে ছেড়ে দেয়া হলেও ১১ দিনের মাথায় ৪ সেপ্টেম্বর সিআইডি পুলিশ তাঁর আসাদগেটস্থ বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে।

২২ সেপ্টেম্বর সকাল-সন্ধ্যা হরতাল চলাকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের আহবায়ক নজিবুল বশর মাইজভান্ডারীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতারের পর থানা হাজত ও কারাগারের অন্ধ গলিতে তাঁকে কি রকম নির্যাতন করা হয় তা বুঝা যায় জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর। জামিন পাওয়ার পর কারাগার থেকে তিনি একা বেরুতে পারেননি। অন্যের সাহায্য নিয়ে বেরুলেও তিনি ছিলেন নির্বাক। 'জুলুমের বিরুদ্ধে মজলুমের আন্দোলন' এটা নবী-রাসূলের যুগ থেকেই চলে আসছে। নজিবুল বশরের অপরাধ ছিল তিনি প্রেসক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে মুনাজাত ধরেছিলেন 'হে আল্লাহ এ জালেম সরকারের হাত থেকে তুমি আমাদের রক্ষা করো। আগামী দিনেও যাতে আজকের মতো সফলভাবে কর্মসূচি পালন করতে পারি, সে তওফিক দাও। আমাদের ধৈর্য্য ধারণ করার মত ক্ষমতা দাও। আমরা যেন আরো সুন্দরভাবে ইসলামী মূল্যবোধকে সমুন্নত করতে পারি, সে ক্ষমতা দাও। আমাদের এ জালেম সরকারের হাত থেকে রক্ষা করো.....।'

১০ অক্টোবর ১৯৯৭ দৈনিক দিনকালে জাগপার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ১০ জন কেন্দ্রীয় নেতাকে বিনা কারণে গ্রেফতারের তথ্য প্রকাশ। ২৮ ডিসেম্বর সংবিধান ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী পার্বত্য চুক্তি বাতিলের দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অভিমুখী লংমার্চের ইসলামী ঐক্যজোটের প্রস্তুতি নেয়ার সময় পুলিশ সমবেত জনতার ওপর ৩ দফা হামলা চালায়। এতে তিনজন ফটো সাংবাদিকসহ উদ্যোক্তা সংগঠন ইসলামী ঐক্যজোটের শতাধিক নেতা-কর্মী আহত হয়, ১৩ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ এবং লাঞ্ছিত হন ঐক্যজোটের অন্যতম নেতা পীর সাহেব চরমোনাই হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ফজলুল করিম। ঐক্যজোটের

www.pathagar.com

চেয়ারম্যান হযরত আল্লামা আজিজুল হক সহ শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে পুলিশ দুপুর ২টা পর্যন্ত অপরোধ করে রাখে। তারা এক পর্যায়ে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় অফিসে হামলা করে নেতৃবৃন্দের ওপর বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। কেবল তাই নয়, অফিসের আসবাবপত্র ভাংচুর ও মাইক কেড়ে নেয়া হয়, কর্মীদের প্রতিবাদের মুখে লাঠি, রাবার বুলেট, টিয়ার গ্যাস, ইট পাটকেল, যথেচ্ছভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে সমগ্র পল্টন এলাকায় পুলিশ নারকীয় তান্ডব সৃষ্টি করে। সরকারের বরকন্দাজরূপী পুলিশের এই বর্বরতায় গোটা পুরানা পল্টন, বিজয়নগর এলাকা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ দোকানপাট, হোটেল-রেস্তোরা ফেলে আতঙ্কে ছুটাছুটি শুরু করে। এদের মধ্যে কারো টুপিদাড়ি দেখলেই পুলিশ তার ওপর প্রবল আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত জনপদের মানুষগুলো যখন জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত, সবাই যখন বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন কাজে লিপ্ত, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ যখন দুর্ভিক্ষের পদধ্বনিতে শংকিত, বিরোধী দলগুলো যখন সকল রাজনৈতিক কার্যক্রম স্থগিত করে বন্যার্তদের পাশে ঠিক তখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করার অপচেষ্টায় ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ গভীর রাতে সিআইডি পুলিশের পৃথক তিনটি দল ফিল্মী স্টাইলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য কেএম ওবায়দুর রহমান এমপি, সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও বিএনপি নেতা নুরুল ইসলাম মঞ্জুর এবং জাতীয় পার্টির নেতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসনকে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগারে সংঘটিত হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করে। দলীয় রাঘব-বোয়ালদের রেহাই দিয়ে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য জেল হত্যায় জড়ানো হয় তাঁদের। ১৯৭৫-এর আগষ্টের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকা ও বই পুস্তকের লেখালেখিতে অনেক ঘটনা স্থান পেয়েছে এবং অনেক ব্যক্তির নাম এসেছে। কিন্তু ১৫ আগষ্টের পরবর্তী ২৩ বছরে অর্থাৎ মামলা দায়েরের পূর্ব পর্যন্ত জেল হত্যাকান্ড সম্পর্কে যেখানে যা কিছুই লেখা হয়েছে তার কোথাও ঘুর্ণাক্ষরেও ওবায়েদ, মঞ্জুর বা মোয়াজ্জেমের নাম আসেনি। এমনকি তথ্য প্রতিমন্ত্রী আবু সাইয়িদ তার 'ফ্যাক্টস এন্ড ডকুমেন্টে' দলিল-দস্তাবেজের সমুদ্র মন্থন করেও এই তিনটি নাম উঠিয়ে আনতে পারেননি। আবু সাইয়িদ তার বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করার অনেক অনেক ক্ষেত্রেই এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাসের 'একটি রক্তাক্ত দলিল' বইয়ের আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু মাসকারেনহাসের সমুদয় দলিল ঘেঁটেও তিনি জেল হত্যায় জড়িত থাকার দায়ে তাদের বিরুদ্ধে একটি শব্দও খুঁজে বের করতে পারেনি। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হলো এই যে, ওবায়েদ, মঞ্জুর, মোয়াজ্জেম তো দূরের কথা, তথ্য প্রতিমন্ত্রী তার বইয়ে কর্ণেল ফারুক-রশিদের বিরুদ্ধেও জেল হত্যার ব্যাপারে একটি লাইনও দাঁড় করাতে পারেনি।

৩ অক্টোবর ওবায়েদ, মঞ্জুর ও মোয়াজ্জেমের মুক্তির দাবীতে জাগপা আয়োজিত মিছিল থেকে প্রধানকে গ্রেফতার করা হয। বিরোধী দলের একজন নেতাকে বার বার গ্রেফতারের ঘটনা রাজনৈতিক ইতিহাসে নির্মম ও নজিরবিহীন। পরবর্তীতে তিনি জামিনে মুক্তি পেলেও ২০ অক্টোবর গভীর রাতে তাকে বাসভবন থেকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। এই গ্রেফতারের ব্যাপারে অভিযোগ ছিল যে, খালেদা জিয়ার সরকারি বাসভবনে বসে তিনি এবং খালেদা জিয়ার তথ্য উপদেষ্টা আনোয়ার জাহিদসহ কয়েকজন নেতা ঢাকায় উইলস কাপ ক্রিকেট বানচাল, সরকারকে উৎখাত, দেশের তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় নাশকতামূলক তৎপরতা চালানোর জন্য ষড়যন্ত্র করেছেন। একই রাতে আনোয়ার জাহিদকেও গ্রেফতার করা হয়।

www.pathagar.com

বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের হয়রানি করার এক সুদূরপ্রসারী চক্রান্তের অংশ হিসেবেই তথ্য পাচারের অভিযোগ সাজিয়ে সিটি স্পেশাল ব্রাঞ্চের ২ জন কর্মকর্তার নামে মামলা দায়ের করা হয়। ১১ নভেম্বর সিটি এসবির এএসপি মোখলেসুর রহমান এবং সাব ইন্সপেক্টর আতিকুজ্জামানকে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে রমনা থানায় যে এফআইর দায়ের করা হয় তাতে এ ধারণাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এফআইআরে উল্লেখ করা হয়, মোখলেসুর রহমান ২ নভেম্বর গ্রেফতারের জন্য তালিকাভুক্ত ২৮ জন সন্ত্রাসীর নামের তালিকা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবকে জানিয়ে দিয়েছেন। এই এফআইআরে সাদেক হোসেন খোকা এবং ছাত্রদল নেতা নাসির উদ্দিন পিন্টুকে সন্ত্রাসী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। (সূত্র ঃ দৈনিক দিনকাল ১৬ নভেম্বর ১৯৯৮)

২৭ নভেম্বর বন্যা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে বিশেষ ভিজিএফ কার্ড বিতরণের জন্য সিরাজগঞ্জ পৌরসভা চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সিরাজগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান জেলা বিএনপি নেতা টিআরএম নূর-ই আলম হেলালকে সাদা পোষাকধারী একদল পুলিশ মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করে। ৩০ ডিসেম্বর ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে লালবাগ আজিমপুর কমিউনিটি সেন্টার থেকে একদল পুলিশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন পিন্টুকে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করে।

১৯৯৭ সালের ১১ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ থানার ৪ নং আঠারবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে আমিনুল ইসলাম খান মনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। নির্বাচনের পর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জিল্লুর রহমান ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভা উদ্বোধন করতে গেলে স্থানীয় আওয়ামী লীগ এমপি আব্দুস সাত্তার বিভিন্ন কৌশলে ৫ জন ইউপি চেয়ারম্যানকে দলে যোগদানের ব্যবস্থা করেন। মনিকেও আওয়ামী লীগে যোগদানের জন্য এমপি চাপ প্রয়োগ করেন। পৌরসভা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিয়ে 'যোগদান নামক' প্রহসনের কথা শুনে মনি বিস্মিত হন। দাওয়াত দিয়ে আনা বিএনপি সমর্থন আরো দুই চেয়ারম্যান তাদের উপর সরকারি দলের চাপ প্রয়োগের অভিযোগ তুলে তারাও যোগ দিতে অস্বীকার করেন। এতে মন্ত্রী ও এমপি ক্ষুব্ধ হয়ে মনিকে টার্গেট করে 'বাঁচতে হলে সরকারি দলে যোগ দিতে হবে' বলে প্রকাশ্যে হুমকি দেন। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ চেয়ারম্যানের শপথের আগের রাতে তার নামে তিনটি মামলা দায়ের করা হয়। মন্দির ভাঙচুর, শহীদ মিনারে ফুল দিতে বাধা দান এবং বাজারে ডাকাতি ও হাঙ্গামা এই তিনটি জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা-পুলিশী ধাওয়ার মুখে মনি শপথ নিতে পারেনি। বহু চেষ্টা-তদ্বির করেও শপথ নিতে তিনি ব্যর্থ হন। জেলা ও থানা প্রশাসন তাকে শপথ নেয়ার চিঠি পর্যন্ত ইস্যু করেনি। পরে বাধ্য হয়ে তিনি ভৈরব কলেজের শিক্ষক মন্ত্রী জিল্লুর রহমানের চাচাত ভাইকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকার করেন। শপথ গ্রহণের পর আওয়ামী লীগে যোগ দিতে রাজি হওয়ায় মন্ত্রী জেলা প্রশাসককে শপথের ব্যবস্থা করতে টেলিফোনে নির্দেশ দেন। মনি শপথ নেয়ার পর কথামতো কাজ না করায় প্রথমে দুসপ্তাহ জেল খাটতে হয়। তারপর শুরু হয় একের পর এক হয়রানি। ১৩ নভেম্বর এলাকায় সংঘটিত একটি এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় জড়িয়ে চরম হেনস্থা করার চেষ্টা চলে। যে মামলায় তাকে জড়ানো হয়, তাতে বাদিনীর দায়েরকৃত এফআইআর এমনকি হাসপাতাল থেকে ম্যাজিস্ট্রেটকে দেয়া ১৬৪ ধারার জবানবন্দীতে মনির নাম উল্লেখ ছিল না। অথচ কয়েক সপ্তাহ পর বাদিনীকে দিয়ে এফিডেভিট করিয়ে মনি এবং

www.pathagar.com

স্থানীয় যুবদল সভাপতি ও ইউপি মেম্বার সাইদুর রহমানকে ওই মামলায় জড়িয়ে দেয়া হয়। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ৪ জানুয়ারি ১৯৯৯)

৩ জানুয়ারি ১৯৯৯ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের একদলীয় ও ভোটারবিহীন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম ভূতুড়ে নগরীতে পরিণত হয়। এর পূর্বে একাধিক হরতাল-হাঙ্গামায় বিরোধী নেতৃবৃন্দের নামে দেয়া হয় ডজন ডজন মামলা। নির্বাচনের সপ্তাহখানেক পূর্বে ২৫ ডিসেম্বর গ্রেফতার করা হয় জামায়াতে ইসলামীর নেতা শামসুল ইসলামকে। তার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনসহ একাধিক মামলা আনা হয়। রাজনীতিকদের নামে এভাবে ঢালাও মামলা দেয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মামলা দায়ের প্রক্রিয়ায় একশ্রেণীর পুলিশ কর্মকর্তার বাড়াবাড়ি, সরকারি নীতি নির্ধারকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবার চেষ্টায় অতি আগ্রহীদের কারসাজি, কতিপয় পুলিশ কর্মকর্তার রাজনীতি প্রভাবিত আচরণ, পুলিশ প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে সরকারের প্রতি অস্বাভাবিক আনুগত্য প্রদর্শনকারীদের সুদৃঢ় অবস্থানসহ অনেক গুরুতর অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক বিদ্বেষসহ আরো কিছু কারণ এ ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে। পুলিশী আচরণে তাদেরকে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী মনে হয়নি। বরঞ্চ সরকারের প্রাইভেট বাহিনী মনে হয়েছে। ৫৪ ধারার অপপ্রয়োগ হয় মারাত্মকভাবে। ডিটেনশনের পরিমাণ ছিল শত শত। এসব মামলার অধিকাংশে রাজনীতিকরা জামিনে থাকলেও বেশ কিছু মামলায় তাদের নামে ওয়ারেন্ট রয়েছে। দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রেখে সময়মত তাদের গ্রেফতার করা হয়। মাঠ পর্যায়ে নেতা-কর্মী এবং শীর্ষ নেতাদের যাদের গ্রেফতার করা হয় বা জামিনে ছিলেন তারা কেউই কারাগারে ডিভিশন পাননি। এর মধ্যে বিরোধী জোট নেতা শামসুল ইসলামকে কারাগারে ডিভিশন দেয়া হয়নি। উপরন্তু অসুস্থ নেতাকে উন্নত চিকিৎসা করার প্রয়োজন পড়লেও তাকে কারাগার কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করেনি।

ঈদের আনন্দে যখন সবাই ঘরমুখী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পরিবার-পরিজনের সঙ্গে আনন্দে মত্ত তখন লীগ সরকার আবিষ্কার করলো তাদেরই বুদ্ধিজীবী ও খাঁটি মুজিব সমর্থক কবি শামসুর রাহমানকে হত্যার প্রচেষ্টা করেছে হরকাতুল জেহাদ বাংলাদেশ নামের একটি সংগঠন। হামলার কথিত অভিযোগে শুরু করে মাদ্রাসা, মসজিদ ও ইসলামী সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার অভিযান। কারাগারে ঢুকানো হয় শত শত আলেমকে। কবির উপর হামলার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় ফজলে এলাহী মাহতাব, তারিক আজিজ এবং হাসান মাহমুদ মিরাজকে। আওয়ামী পুলিশের গোয়েন্দা বাহিনীর গোপন কুঠুরীতে নির্মম নির্যাতন চালিয়ে মিথ্যা অভিযোগ তাদের উপর নেয়ার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা চালানো হয়। ৩১ জানুয়ারি দুই দফায় ১০ দিনের রিমান্ড শেষে সিআইডি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদানের জন্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শহিদুল ইসলামের আদালতে সোপর্দ করে তাদের। কিন্তু তারা স্বীকারোক্তি দিতে অস্বীকার করেন। তবে ফজলে এলাহী এবং মাহতাব ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পৃথক পৃথক বিবৃতি প্রদান করে। জানান তাদের প্রদত্ত বিবৃতির সঙ্গে থানায় দায়ের করা মামলার বক্তব্যের কোন মিল নেই। স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী আদায় করতে ব্যর্থ হয়ে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এএসপি আব্দুল কাহার আকন্দ ক্ষুব্ধ হন। এরপরই মোহাম্মদপুর থানার একটি অস্ত্র আইনের মামলায় ফজলে এলাহী ও মাহতাবের রিমান্ড চেয়ে কোর্টে আবেদন জানানো হয়। অস্ত্র মামলায় দুইজনকে রিমান্ডে দেয়া হয়। আওয়ামী পুলিশের মিথ্যাচার চাপানোর সকল চেষ্টা যখন বুমেরাং হয়ে যায় তখন বিষয়টি ধামাচাপা দিয়েছে লীগ সরকার।

www.pathagar.com

সরকার সমর্থিত পরজীবীরাও আর কলম চালাতে পারেননি। সরকারের ব্যর্থ চেষ্টা ও অভিযোগ প্রমাণে পুলিশের পক্ষপাতিত্বের পরাজয় ঘটে অবশেষে অভিযুক্তরা জামিনে মুক্তি পান।

বিএনপি করার অপরাধে সাড়ে তিন বছরে ১৬২টি মামলার খড়গ সহ্য করতে হয় কতোয়ালী থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মোহনকে। ১৯৯৯ সালের এপ্রিলে তাকে পুলিশ গ্রেফতার করার পর ৫ মাস জেলে থাকতে হয়েছে। গ্রেফতারের পূর্ব পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে ১১৭টি মামলা ছিল। মামলাগুলোয় তিনি হাইকোর্ট থেকে জামিন নিয়েছিলেন। কিন্তু জামিন পরবর্তী সময়ে সরকার তার বিরুদ্ধে আরো ৪৫টি মিথ্যা মামলা দায়ের করে। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ২২ জানুয়ারি ১৯৯৯)

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপির আহবায়ক এডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন, আওয়ামী সন্ত্রাসীরা পুলিশ ও প্রশাসনের সহায়তায় নারায়ণগঞ্জ ও ফতুল্লা থানা বিএনপির ৫টি কার্যালয় ভাংচুর, অগ্নি সংযোগ ও দখল করার পর বর্তমানে বিএনপি নেতা-কর্মীদের পাইকারী হারে মিথ্যা মামলায় জড়াচ্ছে। সরকারি দলের সন্ত্রাসীরা প্রতিনিয়ত অস্ত্রের মুখে বিএনপি নেতা-কর্মীদের বাড়ি তল্লাশী করে মারধর করে এবং অপরাধী নাম করে পুলিশের সোপর্দ করে। পুলিশ বিএনপির কর্মীদের ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে ডিটেনশনে দিচ্ছে।

২৩ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় জাগপার অফিস থেকে প্রধানের নেতৃত্বে একটি মিছিল বের হবার চেষ্টা কালে পূর্ব থেকে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক পুলিশ জাগপার মিছিলের প্রস্তুতি বুঝতে পেরেই নেতা-কর্মীদের উপর চড়াও হয় এবং বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। তারা প্রধানসহ অন্তত ১০ জনকে গ্রেফতার করে দ্রুত গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে জাগপা কর্মীদের আর একত্রিত হতে দেয়নি পুলিশ।

২২ মার্চ ১৯৯৯ হাইকোর্টে হরতাল বিষয়ক মামলায় বিএনপির পক্ষ থেকে তাদের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলার যে সংক্ষিপ্ত বয়ান তুলে ধরা হয় তাতে মোটামুটি মামলার রাজনীতিতে লীগ সরকারের পারদর্শীতার প্রমাণই বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে মামলার রাজনীতি প্রবর্তনের জন্য ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য লীগরা। আদালতে প্রদত্ত তথ্য মতে, এক বছরে ২২ হাজার ৯শ' ৯৪ জনকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে এবং ৫৪ ধারায় আরও ৩শ' ৭৪ জন রাজনৈতিক কর্মীদের বন্দী করে রাখা হয়। ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালে ১৬৩৭টি মামলায় বিএনপির ১০ হাজার ৪শ' ৯৫ জনকে আসামী করা হয়। ১৯৯৮ সালে কেন্দ্রীয় নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার সাথে সাথে জেলা পর্যায়ে লক্ষ্মীপুরে ১০৮টি মামলায় ৫৮০, চট্টগ্রামে ৪৫টি মামলায় ৫৭৭, শেরপুরে ৪২টি মামলায় ৫৪২, বরিশালে ৩৫টি মামলায় ৪১১, নরসিংদীতে ৪৮টি মামলায় ৩৭৮, ঝিনাইদহে ১৮৯ মামলায় ১ হাজার ৯শ' ২৭, পাবনায় ৭২টি মামলায় ৪৬৪, ভোলায় ৪৯টি মামলায় ৮৭৪, মুন্সিগঞ্জে ২৫টি মামলায় ১ হাজার ৮৬, রাজশাহীতে ৮টি মামলায় ২৩৯, নারায়ণগঞ্জে ৩৮টি মামলায় ১৮৭ এবং ঢাকায় ৩শ' ৭৬টি মামলায় ১ হাজার ৭শ' ৩৮ জনকে আসামী করা হয়। তাছাড়াও বিএনপির ঢাকা মহানগরীর আহবায়ক সাদেক হোসেন খোকা এমপির বিরুদ্ধে ৫২টি, বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান এমপির বিরুদ্ধে ১৭টি, ঢাকার সাবেক মেয়র মির্জা আব্বাসের বিরুদ্ধে ২৩টি, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সাবেক প্রতিমন্ত্রী গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে ১৩টি, ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানির বিরুদ্ধে ২৭টি, ছাত্রদলের সভাপতি হাবিবুন্নবী সোহেলের বিরুদ্ধে ১৭টি, ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাসিরউদ্দিন পিন্টুর বিরুদ্ধে ৬৭টি,

www.pathagar.com

কোতোয়ালী থানা বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ মোহনের বিরুদ্ধে ১১৭টি, ৬৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আব্দুল মজিদ বাবুলের বিরুদ্ধে ৮৯টি, একই ওয়ার্ডের বিএনপির সেক্রেটারী তাইজউদ্দিন মাজুর বিরুদ্ধে ৭৯টি, ৭৭ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার লিয়াকত আলীর বিরুদ্ধে ৭৭টি মামলাসহ বিএনপির ঢাকা মহানগরী শাখার আরো ১৮ জন নেতার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিপুল সংখ্যক মামলার বিবরণ দেয়া হয়। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ২৩ মার্চ ১৯৯৯)

শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লাল ঘোড়া দাবড়ানোর ঘোষণা ক্ষমতা গ্রহণ করার কয়েক দিন পরে দিলেও মুজিব মন্ত্রিসভার সদস্য ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর ছেলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিম দেরীতে হলেও বিরোধী দলকে দমনের আস্ফালন করেন। তিনি বিরোধী দলকে আন্দোলনের সাধ মিটিয়ে দেয়ার ঘোষণা দেন। এ ঘোষণা দিয়ে নাসিম অপেক্ষার প্রহর গুনতে রাজী না থাকার জন্যই একদিন না যেতেই বিরোধী দল আহুত লং মার্চ সমাপ্তি শেষে ঢাকায় ফেরার পর ১৯ মার্চ ডেমরা থানা বিএনপির আহবায়ক ও ৮৬ নং ওয়ার্ড কমিশনার নবী উল্লাহ নবী ও রমনা থানা বিএনপির সভাপতি ও ৫৬ নং ওয়ার্ড কমিশনার চৌধুরী আলমকে বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়।

পবিত্র ঈদুল ফিতরের আনন্দের মধ্যে ২৯ মার্চ নওগাঁয় ঘটে এক দুঃখজনক ট্র্যাজেডি। আওয়ামী লীগের অন্তর্কলহের জের ধরে নিহত হন আত্রাই থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান রাজা ও যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক অরুণ দত্ত। লীগ সরকার প্রথম থেকেই হত্যাকান্ডকে ভিন্নখাতে, ভিন্নজনের ওপর বর্তাতে চায়। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হত্যাকান্ডের দায়-দায়িত্ব বিএনপির কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আলমগীর কবির এমপির উপর চাপায়। রাজনীতিতে প্রতিহিংসা, প্রতিপক্ষ নির্মূলে হত্যাকান্ড, আভ্যন্তরীণ কোন্দল এগুলো যুগ যুগ ধরে ঘটে আসছে। আওয়ামী লীগের মতো ভুনা খিচুড়ির দলে ক্ষমতার মুকুট ব্যবহারের প্রশ্নে রাজা-তরুণ নয় শত শত নেতা-কর্মী নিহত হলেও আশ্চর্যের কিছুই নেই। সবার ধারণা সত্য করে ১০ এপ্রিল সংসদ ভবন এলাকা থেকে সাদা পোশাকধারী পুলিশ গ্রেফতার করে আলমগীর কবিরকে।

২১ এপ্রিল মুজিব হত্যা মামলায় অভিযুক্ত কর্ণেল (অব.) আব্দুর রশিদের স্ত্রী জোবায়দা রশীদকে দুর্ব্যবহারের মাধ্যমে আবারো গ্রেফতার করে লীগ সরকার। ১৯৯৬ সালের শেষ দিকে মুজিব হত্যার ঘটনার অভিযোগ সাজিয়ে জোবায়দা রশিদকে গ্রেফতার করে দফায় দফায় ৩৩ দিনের রিমান্ডে নিয়ে অবর্ণনীয় নির্যাতন করা হয়। কুকুর লেলিয়ে তার উপর চালানো হয় জুলুমের স্টীম রোলার। মৃত্যুশয্যায় পৌঁছে যাওয়ার পরও সত্যের বিজয় ঘটাতে মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে তিনি আপীল করলে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে হাইকোর্ট তাঁকে অব্যাহতি দেন।

এপ্রিল মাসের শেষের দিকে বিশেষ ক্ষমতা আইনের অপব্যবহারের যে একটি চিত্র সংবাদপত্রে প্রকাশ পায় তাতে তিন বছরের পীড়ন বুঝতে কারো অসুবিধা হয়নি। ছাত্রদল নেতা সাইদুর রহমান নিউটনকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে দীর্ঘদিন আটক রাখে সরকার। আটকের ৬ মাসে আদালত তিনবার নিউটনকে মুক্তির আদেশ দেন। কিন্তু প্রতিবারই মুক্তি পাবার পর তাকে জেল গেটে আবার গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়। একই সঙ্গে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদল নেতা ইসহাক সরকারের পিতা মারা গেলে কারাগারের বদ্ধ প্রকোষ্ঠে বন্দী থেকেই তাকে পিতৃবিয়োগের শোক স্মরণ করতে হয়।

www.pathagar.com

২৫ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালনকালে ছাত্রদলের মিছিলে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা দেড় ঘন্টাব্যাপী তান্ডবলীলা চালালেও পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে উল্টো ছাত্রদলের জাহাঙ্গীর, ইসমাইল, আফসু, সুজনসহ অন্তত ৬০ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে। ছাত্রদের উপর সন্ত্রাসী হামলা ও পীড়ন চলার সময় প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের সহকারী সচিব রবিউল মোক্তাদির চৌধুরী ও এপিএস (রাজনৈতিক) বাহাউদ্দিন নাসিম উপস্থিত থেকে চলমান তামাশা দেখেছেন।

আলমগীর কবির এমপিকে গ্রেফতারের পরই যশোরের দৈনিক রানার পত্রিকার সম্পাদক সাইফুল আলম মুকুল হত্যা মামলায় শুধু একজন রিকশাচালকের সাক্ষ্যে বিএনপির সহ-সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী তরিকুল ইসলামকে অভিযুক্ত করে ২৫ এপ্রিল যশোর সদর থানা ম্যাজিস্ট্রেট গোলাম রহমান মিয়ার আদালতে মামলার চার্জশীল দাখিল করা হয়। চার্জশীটে তরিকুলসহ ২২ জনের নামের তালিকাভুক্ত আছে। ২২ জনের মধ্যে যশোর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুন্নবী, বিএনপি নেতা আব্দুল খালেক, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির জেলা সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবির জাহিদও রয়েছেন। অভিযোগ উঠেছে হত্যাকান্ডের পরিকল্পনার সাথে প্রভাবশালী সাংবাদিক দৈনিক জনকন্ঠের দক্ষিণ অঞ্চলীয় প্রতিনিধি শামছুর রহমান ও দৈনিক ইত্তেফাকের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার ফারাজী আজমল হোসেনের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি সর্বমহল থেকে উচ্চাতির হলেও চাজশীটে তাদের নাম রাখা হয়নি। চার্জশীট দাখিলের পর মুকুলের স্ত্রী হাফেজা আক্তার শিরীন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'আমি চার্জশীট না দেখে তেমন কোনো মন্তব্য করতে চাই না। তবে এ মামলার চার্জশীটে কোনো সাংবাদিকের নাম না থাকলে আমার কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ২৬ এপ্রিল ১৯৯৯)

১০ মে বিএনপির নেতা প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী এবং সাপ্তাহিক এভিডেন্সের সম্পাদক মেজর (অব.) মঞ্জুর কাদেরকে ধানমন্ডিস্থ পত্রিকা অফিস থেকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করা হয়। এরপর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে পুলিশ রিমান্ডে নেয়া হয়। ১৪ মে বিশেষ ক্ষমতা আইনের আটকাদেশ দিয়ে তাঁকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। এই আটকাদেশের বিরুদ্ধে পরবর্তীতে হাইকোর্ট বিভাগে হেবিয়াস কর্পাস আবেদন জানানো হলে বিচারপতি মোঃ হামিদুল হক ও বিচারপতি মোঃ হাসান আমীন-এর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে শুনানী অনুষ্ঠিত হবার পর আদালত উক্ত আটকাদেশকে বেআইনী ঘোষণা করে মঞ্জুরকে মুক্তির নির্দেশ দেন।

৭ জুন দৈনিক দিনকালে প্রকাশিত হয়েছে একটি প্রতিবেদন। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, শুধুমাত্র বিএনপিকে সমর্থন করায় একই পরিবারের ৩৮ জন সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে লীগ সরকার। জানে আলম, তার স্ত্রী ফাতেমা বেগম, বিবাহিত দুই মেয়ে খাদিজা ও সামসুন্নাহার, ৮ম শ্রেণীতে পড়ুয়া সুমন এবং বড় ছেলে মামুনের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে মামলা।

আওয়ামী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ৩ বছরে ৮ মাসে চট্টগ্রামে আন্দোলনরত বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ইসলামী ঐক্যজোট, জাগপা প্রভৃতি দলের শীর্ষ স্থানীয় নেতা থেকে শুরু করে সর্বস্তরের নেতা-কর্মী এবং ভিন্নমতের আইনজীবী, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রায় দেড় শতাধিক ফৌজদারী মামলা দায়ের হয়েছে বলে বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার তদন্ত রিপোর্টে প্রকাশ। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীসহ সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থানকারীদের দমনে বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৩৪/ ১০৯/

www.pathagar.com

১৪৩/ ১৪৭/ ১৪৮/ ১৪৯/ ৩০২/ ৩০৭/ ৩৩১/ ৩২৩/ ৩২৫/ ৩২৬/ ৩২৭/ ৩৩২/ ৩৩৪/ ৩৩৬/ ৩৪১/ ৩৫৩/ ৩৭৯/ ৪২৭/ ৪৩৫/ ৪৪১/ ৩৮০/ ৩৮৫/ ৩৯২/ ৪১১/ ৪৫৪/ ৫১১ বিস্ফোরক আইনের ৩ ও ৪ এবং অস্ত্র আইনের ১৯ (ক ও চ) ধারায় মামলাগুলো দায়ের করা হয়।

উল্লেখিত ধারার আওতায় যে কারণগুলো পড়ে তাহল দুষ্কর্মে সহযোগিতা, বেআইনী সমাবেশ, দাঙ্গা, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাঙ্গা, হত্যার প্রচেষ্টা, স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত বা গুরুতর আঘাত, বলপূর্বক সম্পত্তি ছিনিয়ে নেয়া, হত্যা, সরকারি কর্মচারীর কার্য সম্পাদনে বাধাদান, নিরাপত্তা বিপন্নকারী কার্য, অবৈধ বাধা দান, সরকারি কর্মচারীকে কর্তব্য পালনে বাধাদানের সময় আক্রমণ, চুরি, বাসগৃহে চুরি, ৫০ টাকার পরিমাণ ক্ষতি, বিস্ফোরক দ্রব্যের মাধ্যমে অনিষ্ঠ সাধন, অপরাধমূলক অনাধিকার প্রবেশ, দস্যুতা, চোরাই মাল গ্রহণ, সঙ্গোপনে গৃহে প্রবেশ।

ভিন্নমত পোষণ করার অপরাধে সূত্রাপুর থানার ৭৪ নং ওয়ার্ড কমিশনার ও ঢাকা মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক কাজী আবুল বাশার ৫৬টি ষড়যন্ত্রমূলক মামলার জ্বরে আক্রান্ত হয়। ১৯৯৯ সালের পবিত্র রমযান মাসেও নিরাপদে ইবাদত-বন্দেগী করতে পারেননি তিনি। আওয়ামী সরকারের দেয়া মিথ্যা ও সাজানো ৫৬টি মামলা কাঁধে নিয়ে প্রতিদিনই মসজিদ পরিবর্তন করে তারাবীহ নামাজ আদায় করছেন তিনি। হাইকোর্ট থেকে জামিন পাওয়ার পরও সাদা পোশাকধারী পুলিশ তাকে হয়রানি করার ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ২৯ নভেম্বর ১৯৯৯)

১১ মে বিরোধী দলের হরতাল চলাকালে প্রায় ৩শ' জনকে আসামী করে মতিঝিল থানায় পুলিশ একটি মামলা দায়ের করে। মামলায় বিরোধী দলের মির্জা আব্বাস, সাদেক হোসেন খোকা, হাবিব-উন-নবী সোহেল, কমিশনার চৌধুরী আলম, কমিশনার নবীউল্লাহ নবী প্রমুখকে আসামী করা হয়। ২১ মে এই মামলায় অভিযুক্তরা আদালতে হাজির হয়ে ১ মাসের অগ্রিম জামিন নেন।

৭ জুলাই হরতালের সময় আওয়ামী লীগের সশস্ত্র ক্যাডাররা রাজধানীর গুলিস্তান, পল্টন, বিজয়নগরসহ বিভিন্ন পয়েন্টে চোরাগুপ্তা বোমা হামলা করেছে। অস্ত্রধারী ক্যাডাররা সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে নগরীর জিরো পয়েন্ট সংলগ্ন পীর ইয়ামেনী মার্কেট এলাকা থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করলে পুলিশের দাঙ্গা বিভাগের কনস্টেবল মোহাম্মদ ফরহাদ খান নিহত হন। ফরহাদ নিহত হবার ঘটনায় ঢাকা মহানগরী বিএনপির আহবায়ক সাদেক হোসেন খোকা এমপি, নাজিম উদ্দিন আলম এমপিসহ দেড় শতাধিক বিএনপি ও ছাত্রদল নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা দায়ের করেছে। অভিযুক্তদের মধ্যে ছাত্রদল সভাপতি হাবিবুন নবী খান সোহেল, ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমদ পিন্টু, রমনা থানা বিএনপির সভাপতি, ৫৬ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার চৌধুরী আলম, ছাত্রদল ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ শাখার সভাপতি সাগীর আহমদ, ওয়ার্ড কমিশনার আরিফুর রহমান, মোল্লা মাসুদ, সুমন হারুন এবং বাবু রয়েছেন। অথচ সত্য ঘটনা হলো হরতালের সমর্থনে বিএনপির একটি মশাল মিছিল সাদেক হোসেন খোকার নেতৃত্বে নয়াবাজার থেকে শুরু করে ফুলবাড়িয়া এলাকায় এসে শেষ হয়। মিছিলকারীরা যার যার মতো করে চলে যায়। মিছিলকারীরা চলে যাবার সময় জিরো পয়েন্টে পরপর দুটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। এর একটি গড়িয়ে বিস্ফোরিত হয় পুলিশের উপর।

www.pathagar.com

রমনা থানা বিএনপির সভাপতি ও ওয়ার্ড কমিশনার চৌধুরী আলমের বিরুদ্ধে আওয়ামী শাসনের প্রথম সাড়ে তিন বছরে প্রায় অর্ধ শতাধিক মিথ্যা মামলা ও সাজানো মামলা আদালতে পৌঁছে। আদালত থেকে অনেক মামলায় জামিন পেয়েও তিনি পুলিশী হয়রানি থেকে রক্ষা পাননি। 'যে কোন একটি মামলার আসামী'-অজুহাতে তাকে কয়েক মাস জেলে থাকতে হয়েছে। জুলাই মাসে একটি সাজানো মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন কমিশনার আলম। গ্রেফতারের পরই পুলিশ বিনা কারণে তার বাসভবন থেকে ফ্রিজ, আলমীরা, ওয়্যার ড্রব, টেলিভিশন, লেপ-তোষক, বিছানা, চেয়ার, টেবিল, তরকারী কাটার বটি ক্রোক করে নিয়ে যায়। তার ৭৫ উর্ধ্ব প্যারালাইসিসে আক্রান্ত বৃদ্ধ মাতাকে খাট থেকে মাটিতে শুইয়ে সে খাটটি ক্রোক করে নিয়ে যাওয়া হয়। হাইকোর্টের নির্দেশে পরবর্তীতে অর্ধেক মালামাল ফেরত দেয়া হলেও তা ব্যবহারের অনুপযোগী ছিল। সরকার কমিশনার আলমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা মালামাল ক্রোক করে বসে থাকেনি। মানসিক চাপ বৃদ্ধির জন্য তার ছেলেকে পর্যন্ত গ্রেফতার করেছে। বাড়িতে বেড়াতে আসা মেয়ের জামাইও শ্বশুর বাড়িতে উপস্থিত থাকার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ২ মাস জেল খাটার দুর্ভাগ্য অর্জন করেছেন। শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে এসে গ্রেফতারের ঘটনা, এমন নোংরা দৃষ্টান্তের নজির ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ছেলে, মেয়ের জামাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে আলমের আপন ভাইকেও গ্রেফতার করে ৫ মাস কারাগারে রাখা হয়েছে। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৯)

২৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় চকরিয়ার খুটাখালী থানায় একদল পুলিশ ও আনসার আসামী ধরার নামে সাধারণ মানুষ ও ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ ও ব্যাপক তান্ডব চালায়। এ ঘটনায় ৩০ জন ছাত্র-শিক্ষক গুলিবিদ্ধসহ ২ শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে ২ নভেম্বর চকরিয়া নিউ মার্কেট চত্বরে ছাত্র-শিক্ষক ও সর্বদলীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় হাজার হাজার প্রতিবাদী মানুষ সমাবেশে অংশগ্রহণ করে। এতে তাৎক্ষণিকভাবে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। যানজট সৃষ্টি করার কারণ দেখিয়ে চকরিয়া থানার ওসির নির্দেশে এসআই আব্দুল গাফফার বাদী হয়ে ঐ দিনই বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ছাত্র শিবির, ওয়ার্কাস পার্টির নেতা-কর্মী, শিক্ষক-ছাত্রসহ ৬০০ ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২ (চ) (ঙ)/১৫(ক)/১৫(খ) ধারায় একটি মামলা দায়ের করে। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ৮ ডিসেম্বর ১৯৯৯)

৩১ অক্টোবর হরতালের আগের দিন রাতে সাবেক এমপি ও গোপালগঞ্জ জেলা বিএনপির সভাপতি শরফুজ্জামান জাহাঙ্গীরের পুরানা পল্টনস্থ পৈতৃক বাসভবনের গেট ভেঙ্গে রাত ৩টায় পুলিশ তল্লাশীর নামে বেপরোয়া তান্ডব চালায়। রাত ৩টার দিকে ৪/৫ ট্রাক ভর্তি সাদা পোষাক ও ইউনিফর্মধারী পুলিশ বাসভবন ঘেরাও করে গেট খোলার জন্য চিৎকার করতে থাকে। এক পর্যায়ে পুলিশ বাড়ির প্রধান গেট টপকিয়ে ভেতরে ঢুকে কলাপসিবল গেট ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে। বাড়ির নিচতলায় ঘুমন্ত শরফুজ্জামানের ৭৮ বছর বয়সী বৃদ্ধা মা ঘটনার আকস্মিকতায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পুলিশ ৩য় তলা বাড়ির প্রতিটি ফ্লোরে ঢুকে মালামাল তছনছ করে। দোতলায় শরফুজ্জামানের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী ও ৩টি শিশু সন্তান ছাড়া কেউ ছিল না। পুলিশ শরফুজ্জামানের ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে তিনি আহত হন। এরপর ৩য় তলায় উঠে হাতুড়ি- শাবল দিয়ে দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে শরফুজ্জামান ও তার ছোট ভাই বোরহানুজ্জামানকে খোঁজ করে। বোরহানুজ্জামান ওমর ঢাকা মহানগরী বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য। ঘটনার সময় শরফুজ্জামান ও তার ছোট ভাই বাসায় ছিলেন না।

www.pathagar.com

তাদের না পেয়ে পুলিশ আরো বেপরোয়া হয়ে পড়ে এবং বাড়ির প্রত্যেকটি ফ্লোরের আসবাবপত্র তছনছ ও স্টীলের আলমারী ভেঙ্গে চুরমার করে। রাত ৩টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত একটানা চলে পুলিশী অভিযান। ঘটনার ভয়াবহতায় বাড়ির শিশু ও মহিলারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে চিৎকার করতে থাকে। শরফুজ্জামানের বৃদ্ধ মা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ২ নভেম্বর ১৯৯৯)

৭ নভেম্বর হরতালকালে গুলিতে গৃহবধূ রিনা হত্যাকান্ডের ঘটনায় পুলিশ বিএনপিসহ বিরোধী দলের প্রায় ২ শতাধিক ব্যক্তিকে আসামী করে ডেমরা থানায় একটি মামলা দায়ের করে।

৮ নভেম্বর বিরোধী দলের হরতাল চলাকালে যাত্রাবাড়িতে বিএনপির ঢাকা মহানগরীর আহবায়ক সাদেক হোসেন খোকার নেতৃত্বে একটি মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে খোকা, জয়নাল আবেদনি ফারুকসহ অনেক নেতা-কর্মী আহত হন। এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে ডেমরা থানায় একটি মামলা দায়ের করে। পুলিশের দায়ের করা মামলায় আসামী করা হয় অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তিসহ ৭ জনকে। বিএনপির পক্ষ থেকেও পুলিশের বিরুদ্ধে পাল্টা মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ২১ নভেম্বর পুলিশের দায়ের করা মামলায় খোকা জামিন লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে আদালত 'মামলায় অভিযুক্ত আসামীদের কেন আগাম জামিন দেয়া হবে না'-এই মর্মে সরকারের প্রতি রুলনিশি জারি করেন।

ঢাকা মহানগরীর ৮৬ নং ওয়ার্ড কমিশনার নবী উল্লাহ নবীর বিরুদ্ধে আওয়ামী সরকারের প্রথম ৩ বছরে ৫৪টি মামলা দায়ের হয়। বেশ কয়েক মাস জেল খেটেছেন তিনি। হাইকোর্টের নির্দেশে জামিন পাওয়ার পরও স্বস্তি ছিল না তার জীবনে। সাদা পোশাকধারী পুলিশ সর্বক্ষণ ছায়ার মতো তার পিছু নেয়। ৮ নভেম্বর যাত্রাবাড়িতে সাদেক হোসেন খোকাসহ তিনিও পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছিলেন। শর্টগানের গুলিতে সারা শরীর ঝাঁজরা হয়ে যায়। আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হলে সাদা পোষাকধারী পুলিশ সেখানেও বারবার হানা দেয়। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে নিজ বাড়িতে ফিরে তিন রাত ঘুমাতে পারেননি তিনি। তৃতীয় দিন রাতে পুলিশ তার বাড়িতে হানা দিলে আহত অবস্থায় পালিয়ে যেতে হয়। পুলিশের ভয়ে প্রতিদিনই কোনো না কোনো মামলায় তাকে পালিয়ে থেকে কোর্টে হাজিরা দিতে হয়। জামিনপ্রাপ্ত মামলায়ও পুলিশ তাকে হয়রানি করে। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৯)

বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অপরাধে আওয়ামী শাসনের তিন বছরে (১৯৯৯-এর নভেম্বর পর্যন্ত) প্রায় ২৫টি মামলা দায়ের করা হয় ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৩২ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার মকবুল আহমদ আকন্দের বিরুদ্ধে। হরতাল, মিছিল-মিটিং কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করায় বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৫৩(২)৯৯, ৫৬ (২)৯৯, ৪৭(৩)৯৯, ৪৮(৩)৯৯, ১২৫(৩)৯৯, ১৩১(৩)৯৯, ১৩৫(৩)৯৯, ১২৭(৩)৯৯ ধারায় মামলা ছিল তার বিরুদ্ধে। মামলাগুলোর জন্য আদালত থেকে তিনি জামিন নেয়ার পরও পুলিশী হয়রানি কমেনি। বিনা কারণে তার বাড়িতে পুলিশী হানার ঘটনা ঘটেছে বেশ কয়েকবার। আওয়ামী সরকারের আমলে স্ত্রী-ছেলে-মেয়ের সঙ্গে তিনদিনও শান্তিতে থাকার সৌভাগ্য হয়নি তার।

২৫ নভেম্বর বিরোধী দল আহুত হরতালের সময় পেট্রোল বোমায় নিহত ট্রাক চালক নসু মিয়া হত্যার দায়ে বিএনপির নেতা মির্জা আব্বাস, ৩৪ নং ওয়ার্ড কমিশনার মির্জা খোকনসহ প্রায় ২০০ জনের বিরুদ্ধে মতিঝিল থানার এসআই নজরুল ইসলাম বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। এই মামলার এজাহারে লিপিবদ্ধ তিনজন আসামী ৬ মাস পূর্ব থেকে ঢাকা

www.pathagar.com

কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকলেও এবং ৯ নং আসামী শিপন সৌদী আরবে ১ বছর আগে থেকে বসবাস করলেও পুলিশের নজরে তারা উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকা আসামী রিন্টু ওরফে মিন্টু ওরফে সাজ্জাদকে করা হয় ৫ নং আসামী। ২১ ও ২২ নং আসামী জামি ও আলী আক্তার আলীকে মতিঝিল থানা ১১৪ (৯) ৯৮ নং মামলায় গ্রেফতার করেছিল ঘটনার মাসখানেক আগে। ঘটনার দিন তাদের জামিনের নথি শুনানীর জন্য আদালতে হাজির করা হয়। কিন্তু তারা জামিন পাননি। (সূত্রঃ দৈনিক মানবজমিন ৫ ডিসেম্বর ১৯৯৯)

আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে রাজপথে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের জন্য ১৭ ডিসেম্বর নয়াপল্টনস্থ বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মিছিল থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল হাবিব-উন-নবী সোহেল ও সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমদ পিন্টুকে। চলমান সরকার বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র নেতৃত্বের মধ্যে শূন্যতা সৃষ্টি ও অন্যান্যদের মধ্যে মামলা-গ্রেফতারের আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়ার ঘৃণ্য উদ্দেশ্য নিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছিল এ গ্রেফতার অভিযান। গ্রেফতার কার্য সম্পাদন করে পুলিশ তাদের উপর হিংস্র দানবের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পুলিশের বর্বরোচিত হামলায় পিন্টুর হাত ভেঙ্গে যায়। হাত ভাঙ্গা অবস্থায় মালগাড়ীর মতো পুলিশ বেদরদীভাবে পিন্টুকে টেনে হিঁচড়ে মতিঝিল থানায় নিয়ে যায়। থানায় সরকারের পূর্ব পরিকল্পিত মামলার ফাঁদে আটকানো হয় তাদের। পুলিশ নিজে বাদী হয়ে সোহেল-পিন্টুর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা করে। সবচেয়ে আলোচিত তথ্য হলো, পিন্টুর গ্রেফতারের পূর্বে তার বিরুদ্ধে ১০৪টি মামলা পূর্ব থেকে দায়ের করা ছিল এবং গ্রেফতারের পর বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে গাড়ি ভাংচুর, দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রভৃতির অভিযোগে মতিঝিল থানায় ১৩টি এবং রমনা থানায় ১টি মামলা দায়ের করে। সোহেল-পিন্টুর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ছিল জেলে ঢুকানোর আইনী পদক্ষেপ। জেলে ঢুকিয়ে ঐদিনই তাদের মতিঝিল থানা থেকে ক্যান্টনমেন্ট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সবার অজ্ঞাতসারে থানা হাজতে সারা রাত পশুর মতো তাদের উপর নির্যাতন চালিয়ে সরকারি দলে যোগদানের টোপ দেওয়া হয়। সোহেল-পিন্টু তা প্রত্যাখ্যান করলে নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে তাদের শারীরিক সুস্থতা নষ্ট করা হয়। পরদিন পুলিশী হেফাজতে সোহেল-পিন্টুর বিধ্বস্ত অবস্থা আদালত প্রাঙ্গণে দেখতে পাওয়া যায়। তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতির কথা আদালতের গোচরে এনে জামিনের আবেদন জানানো হলে আদালত পুলিশের আর্জি মতো উভয়কে দুই দিনের রিমান্ড প্রদান করেন। অসুস্থ অবস্থায় কষ্ট দিয়ে, মানবতাহীন আচরণ করে উভয়কে মতিঝিল থানায় পুনরায় নিয়ে আসা হয়। রিমান্ডের নির্দিষ্ট স্থানে দুই নেতার উপর চালানো হয় মধ্যযুগীয় স্টাইলের নির্যাতন। অসুস্থতা, জেনেও টানা-হেঁচড়ার পর তাদের চেয়ারে বসিয়ে সারা রাত হাই পাওয়ারের বৈদ্যুতিক ভাল্বের নিচে বসিয়ে অহেতুক বিভিন্ন প্রশ্নবানে জর্জরিত করা হয়। মাত্রাতিরিক্ত নির্যাতনে তারা ক্লান্তিতে কখনো ঘুমিয়ে পড়লে ধাক্কা দিয়ে জোর পূর্বক জেগে থাকতে বাধ্য করা হয়। গ্রেফতারের সময় পিন্টুর হাত ভেঙ্গে ফেলেছিল পুলিশ। কিন্তু কোনো সু-চিকিৎসা তারা করায়নি। পরবর্তীতে আশংকাজনক অবস্থায় বিষয়টি পৌঁছে গেলে টনক নড়ে তদের। গ্রেফতারের আড়াই মাস পরে পিজি হাসপাতাল থেকে একজন ডাক্তার ডেকে সাময়িক চিকিৎসা করানো হয় পিন্টুর। মতিঝিল থানার পুলিশ রিমান্ড শেষ রিমান্ড ছিল না। পরবর্তীতে উভয় নেতাকে কয়েক দফায় রিমান্ডে এনে পৃথক পৃথকভাবে জেআইসির ডিজিএফআই, এসবি, এনএসআই দ্বারা জিজ্ঞাসাবাদ ও আন্দোলন থেকে সড়ে দাঁড়ানোর চাপ সৃষ্টি করা হয়। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ৩ মার্চ ২০০০)

www.pathagar.com

ছাত্রদলের এক সময়ের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় ছাত্রদল নেতা সাহাবুদ্দীন লান্টুর বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় ১০টি মামলা। ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেনের নামে ২৭টি ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুনের নামে ১৬টি, কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি মঞ্জুর এ এলাহীর নামে ১৯টি, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন রানার নামে ১২টি ও তারিকুল ইসলাম বনির নামে ১০টি, বজলুল বাসিত আঞ্জুর নামে ১২টি ও সাংগঠনিক সম্পাদক এবিএম মোশাররফ হোসেনের নামে ১৪টি, মহানগরী (দক্ষিণ) সভাপতি সগির আহমদের নামে ৩০টি, সাধারণ সম্পাদক হাসান সারোয়ার সুমনের নামে ২৮টি এবং মহানগর (উত্তর) সাধারণ সম্পাদক হারুন-অর-রশিদের নামে ১২টি মামলা ছিল। (সূত্রঃ দৈনিক মানবজমিন ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০০)

চলমান সরকার বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার খেসারত হিসেবে সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদের নাবালক পুত্র শাদকে নিয়ে সরকার যে পাতানো খেলা শুরু করেছিল তা বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারেনি। ৩ মার্চ ভোর রাত মা-বাবার অনুপস্থিতিতে ১৬ বছরের কিশোর শাদের বিরুদ্ধে এক ধনাঢ্য শিল্পপতির মেয়েকে অপহরণ করে আটক রাখা সংক্রান্ত নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে অভিযোগ এনে গ্রেফতার করা হয়। বাদী পক্ষের আর্জিতে শাদের নাম না থাকা সত্ত্বেও গুলশান থানা পুলিশের অতিদ্রুত সময়ের মধ্যে অবিশ্বাস্য রকম উৎসাহে গ্রেফতার করা হয় শাদকে। পরবর্তী সময়ে বাদী স্ব-ইচ্ছায় মামলাটি তুলে নিতে চাইলেও সরকার তাতে বাঁধ সাধে। 'বাদী মামলা তুলে নিলে সরকার মামলা চালাবে'-এমন ভাব দেখিয়ে বেশি দূর যাওয়া সম্ভব হয়নি । অবশেষে জামিনে মুক্তি পান শাদ।

কোটালিপাড়ায় বোমা পুঁতে রাখার ঘটনায় প্রধান আসামী মুফতি হান্নান সহ ১৭ জনকে অভিযুক্ত করে সিআইডি পুলিশ ২৬ জানুয়ারি ২০০১ চার্জশীট দাখিল করে। গোপালগঞ্জ জেলা আদালতে বিস্ফোরক আইনের অধীনে তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি মামলার ফলে এই চার্জশীট তৈরি করা হয়। প্রায় ৪ মাস তদন্তের পর মামলাটির আইও এবং সিআইডি'র এএসপি মুনশী আতিকুর রহমান আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন। এতে ৪২ জনকে দেখানো হয় বাদী পক্ষের সাক্ষী হিসেবে এবং ১৯০টি প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে। তদন্তকালে পুলিশ মোট ১৭ জন অভিযুক্তের মধ্যে ৪ জনকে গ্রেফতার করে। এরা হলো আনিসুল ইসলাম, মেহেদী হাসান ওরফে আবদুল ওয়াদুদ ওরফে গাজী খান, হাসমত আলী কাজী এবং ওয়াসিম আখতার ওরফে তারেক হোসেন ওরফে মারফত আলী। পলাতক অভিযুক্তরা হলো মুফতি হান্নান, হাবিবুল্লাহ ওরফে মুফিজুর রহমান, মুন্সী ইবরাহীম, মাহমুদ আজহার ওরফে মামুনুর রশীদ, রাশেদ ড্রাইভার ওরফে শিমুল, শাহ নেওয়াজ ওরফে আজিজুল হক, লোকমান ইউসুফ ওরফে আবু মূসা হারুন, শেখ মোহাম্মদ এনামুল হক, ইসমাইল ওরফে নূর ইসলাম, সাইফুল, হাসানুজ্জামান ও খোকন। কোটালিপাড়ায় ২টি শক্তিশালী বোমা উদ্ধারের পর ২৩ জুলাই মুফতি হান্নানের সাবান ফ্যাক্টরী এবং হাসমত আলী কাজীর বাসভবন থেকে ৬০ কেজি বিস্ফোরক, ২টি জীবন্ত বড় বোমা, ২১ কেজি তরল রাসায়নিক পদার্থ, ৩ কেজি বারুদ এবং আরো কিছু বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করেছিল। কোটালিপাড়ায় বোমাপোঁতার ঘটনা এবং বিস্ফোরক উদ্ধার করার ব্যাপারে পুলিশ দায়ের করেছিল ৪টি মামলা।

শেখ মুজিব হত্যা মামলায় অভিযুক্ত কারাগারে আটক মেজর বজলুল হুদার শারীরিক অবস্থা তুলে ধরে এডভোকেট মাহবুবুর রহমান সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে একটি পিটিশন পেশ করেন। পিটিশনে মেজর হুদার প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে সরকারের প্রতি

www.pathagar.com

নির্দেশ প্রদানের জন্য আদালতের কাছে প্রার্থনা জানানো হয়। এই পিটিশনের উপর উভয় পক্ষের আইনজীবীদের শুনানী গ্রহণ শেষে ১৫ মে প্রধান বিচারপতি মাহমুদুল আমীন চৌধুরীর নেতৃত্বে আপীল বিভাগের ফুলবেঞ্চ এক আদেশে মেজর হুদার কিডনী, লিভার, আলসার, হার্টের প্রোবলেমসহ পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃক্ষকে প্রদান করেন। আদেশে আরো বলা হয় যে, প্রয়োজনে মেজর হুদাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ সমপর্যায়ের যে কোন হাসপাতালে স্থানান্তর করে সংশ্লিষ্ট রোগের বিশেষজ্ঞ প্রফেসর দ্বারা উচ্চতর মেডিকেল বোর্ড গঠন করে চিকিৎসা করতে হবে। ঐদিনই বিকেলে সুপ্রীম কোর্টের একজন বেয়ারার দ্বারা এ নির্দেশনামা কারাকর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। আদালতের এ আদেশের প্রেক্ষিতে কারাকর্তৃপক্ষ মেজর হুদার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট আদালতে জমা দেন। রিপোর্টে বলা হয় যে, 'সুপ্রীম কোর্টের ১৫ মে'র নির্দেশ মোতাবেক মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী মেজর বজলুল হুদাকে ২৩ এপ্রিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দুজন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করানো হয় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করা হয়। ৩০ এপ্রিল তারিখে তার প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার রিপোর্ট রিভিউ করানো হয়। ৫ মে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের দুইজন অধ্যাপক, একজন সহযোগী অধ্যাপক ও একজন সহকারী অধ্যাপক তাকে পরীক্ষা করে বলেন, রোগী আগের চেয়ে ভাল। তার প্রেসার ঠিক আছে। আগের চেয়ে তার ওজন বেড়েছে।' রিপোর্টে আরো বলা হয়, 'আজ ১৫ মে রোগীকে পরীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায় তিনি বর্তমানে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ আছেন।' বজলুল হুদার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে দেয়া রিপোর্টে ৩ জন সহকারী সার্জনের পৃথক ৩ টি সীল দেয়া থাকলেও এতে কারো কোন স্বাক্ষর দেয়া ছিল না। ২২ মে আপীল বিভাগের ফুল বেঞ্চে এডভোকেট মাহবুবুর রহমান এ রিপোর্টের বিভিন্ন অসংগতি তুলে ধরে বলেন, 'আপীল বিভাগ চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছে ১৫ মে। রিপোর্টে বলা হয়েছে বজলুল হুদাকে এ নির্দেশের প্রেক্ষিতে ২৩ এপ্রিল চিকিৎসা করা হয়। পরে ৩০ এপ্রিল, সর্বশেষ ৫ মে। এটা কিভাবে সম্ভব। তাছাড়া আদেশ দেয়া হয়েছে মেজর হুদার কিডনী, লিভার, হার্ট, আলসার পরীক্ষা করার জন্য। রিপোর্টে বলা হয়েছে তার প্রেসার মাপা হয়েছে। ওজন পরীক্ষা করা হয়েছে। তার মানসিক অবস্থা ভাল আছে। এগুলোতো চিকিৎসার বিষয় ছিল না।' এ মেডিকেল রিপোর্টকে মিথ্যা প্রমাণ করে এডভোকেট মাহবুব বলেন, 'এতে কোন ডাক্তারের স্বাক্ষরতো নেই-ই। কারা কর্তৃপক্ষেরও স্বাক্ষর নেই।' এডভোকেট মাহবুবুর রহমান বলেন, 'মেজর হুদাকে ১৯৯৮ সালে প্রথম যখন কারাগারে নেয়া হয় তখন তার ওজন ছিল ৬৫ কেজি, জানুয়ারি ২০০১ সালে তার ওজন কমে ৫৪ কেজি, ৬ মে তার ওজন হয় ৫২ কেজি, ২১ মে তার ৫১ কেজি। এতেই প্রমাণ হয় মেজর হুদা শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হচ্ছে। এডভোকেট মাহবুবের নিবেদনের পর প্রধান বিচারপতি এডিশনাল এটর্নী জেনারেল মাহবুবে আলমকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আমরা আদেশ দিয়েছি ১৫ মে আপনারা জবাবও দিলেন ১৫ মে। মাত্র ১ ঘন্টার ব্যবধানে কিভাবে বজলুল হুদার চিকিৎসা সংক্রান্ত রিপোর্ট তৈরি করলেন।' জবাবে এডিশনাল এর্টনী বলেন, 'আমরা আগেই কারাকর্তৃপক্ষকে এটি ভারবাল আদেশ দিয়েছি।' এডিশনাল এটর্নীর এ জবাবে প্রধান বিচারপতি ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, 'একটি মিথ্যা রিপোর্টের পক্ষে আপনি কিভাবে সাফাই গাইতে পারেন? মেজর হুদার ফাঁসি হবে কি হবে না তা আমাদের বিষয় না। আমরা মানবিক কারণে শুধু চিকিৎসার ব্যবস্থাটুকু করতে আদেশ দিয়েছি। আপনি কারাকর্তৃপক্ষকে এবং তার অধীনস্ত কর্মকর্তাদের

www.pathagar.com

নাম-ঠিকানা প্রদান করুন আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। এ সময় এডিশনাল এটর্নী বলেন, 'আমাদেরকে একটু সময় দেন। আমরা মেজর হুদার শারীরিক অবস্থার সঠিক রিপোর্ট তৈরি করে দেব।' এডিশনাল এটর্নীর আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত একটি আদেশ প্রদান করেন। প্রধান বিচারপতি এ রিপোর্টকে অসত্য ও প্রতারণামূলক হিসেবে মন্তব্য করে আদালতে আরো বলেন, 'দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সাথে সরকারের প্রতারণামূলক কর্মকান্ড আমাদেরকে বিস্মিত ও হতবাক করে তুলেছে। এটা আমরা কোন অবস্থাতেই গ্রহণ করতে পারি না। এ ব্যাপারে আমরা আমাদের ক্ষমতায় যা সম্ভব সব কিছুই করব।' আদালতে উপস্থিত এডিশনাল এটর্নী ও ডেপুটি এটর্নী জেনারেলদের উদ্দেশ্য করে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আপনারা বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।' প্রধান বিচারপতি বলেন, 'সরকারের আইন কর্মকর্তাগণ তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করলে দেশে বিরাজমান অবক্ষয় অশান্তি আরো বৃদ্ধি পাবে। সাধারণ লোক ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হবে। আপনারা শুধু সরকারেরই আইনজীবী নন। আদালতকে সহায়তা করাই আপনাদের একমাত্র দায়িত্ব। সরকার পক্ষে সাফাই গাওয়াই আপনাদের দায়িত্ব নয়।' সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে প্রধান বিচারপতি আরো বলেন, 'একটা দেশ এভাবে চলতে পারে না।' 'মেজর হুদার বিষয়ে দেয়া রিপোর্টটি ছিল মিথ্যা ও ভূয়া'-এটা উল্লেখ করে সময়ের প্রার্থনা জানিয়ে বেলা ১টার মধ্যে লিখিত পিটিশন জমা দেয়ার জন্য সরকারকে নির্দেশ দেয়া হয়। আদালতের এ নির্দেশ অনুযায়ী সরকার একটি পিটিশন দাখিল করে।

২৪ মে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত আপীল বিভাগের ফুলবেঞ্চ কারাগারে আটক মেজর বজলুল হুদার শারীরিক অবস্থার বিবরণ দিয়ে সঠিক মেডিকেল রিপোর্ট পেশ করার জন্য সরকারকে এক সপ্তাহ সময় দেন। ৩০ মে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের ফুলবেঞ্চ এ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বজলুল হুদার চিকিৎসার বিষয়ে পরবর্তী আদেশ প্রদান করার কথা উল্লেখ করা হয়। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে বিচারপতি মাইনুর রেজা চৌধুরী ও বিচারপতি গোলাম রব্বানীকে নিয়ে গঠিত আপীল বিভাগের ফুলবেঞ্চ সরকারের দাখিল করা একটি আবেদনের উপর উভয়পক্ষের আইনজীবীদের শুনানি গ্রহণ শেষে এ আদেশ প্রদান করেন। আদালতে এডভোকেট মাহবুব বলেন, মেজর হুদার চিকিৎসার বিষয়ে এ প্রতারণামূলক কর্মকান্ডে সরকারের সংকীর্ণ মনের প্রকাশ ঘটেছে। আওয়ামী লীগ সরকার কোনোকালেই দেশের আদালতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখায়নি। দলীয় স্বার্থের পরিপন্থী হলে তারা সুপ্রীমকোর্টের নির্দেশকেও লংঘন করতে দ্বিধা করে না। (সূত্রঃ দৈনিক সংগ্রাম ২৫ মে ২০০১)

www.pathagar.com

কারাগার নরকে পরিণত

হাসিনার শাসনের ৫ বছরে একদিকে হাজত ও কারাগারে পুলিশী নির্যাতনে বিচারের রায় শোনার পূর্বেই অনেকের জীবনাবসান ঘটছে অপরদিকে ছিল কারাগারে কষ্ট করে থাকার যন্ত্রণা। প্রায় সময়ই কারাগারের সমস্যা সংবাদপত্র ও মানবাধিকার সংস্থা তুলে ধরেছিল কিন্তু সরকার কুম্ভকর্ণের ঘুমে অচেতন ছিল। আওয়ামী শাসনে নরকের অপর নাম কারাগার ছিল। যারা কারাগারে প্রবেশ করেননি তারা কল্পনাও করতে পারবে না কি যন্ত্রণা ছিল সেখানে। একজন মানুষ বিনা কারণে বা অপরাধী হয়ে কারাগারে গেলেও প্রতিনিয়ত তাকে সহ্য করতে হয় মানসিক-শারীরিক নির্যাতন। বিচারে বিলম্ব, ৫৮ ধারায় সন্দেহজনক গ্রেফতার, জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার, ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় গ্রেফতার, অহেতুক বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার, বিদেশী বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য বা শাস্তি পাওয়ার জন্য গ্রেফতারের ফলে দেশের প্রতিটি কারাগারে বন্দীর সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে প্রতিদিন বেড়ে ছিল। সন্দেহজনক বা বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের গ্রেফতারের সময় তাদেরকে কারাগারে ঠাঁই দেয়া সম্ভব কিনা তা বিবেচনায় আনা হয়নি। পৃথিবী জুড়ে, জেলখানায় রাজবন্দী-সন্দেহজনকভাবে গ্রেফতারকৃতদের প্রতি, অপরাধীদের প্রতি মানবিক আচরণের যে বাধ্যবাধকতা আছে আওয়ামী শাসনামলে তা মানা হয়নি। কারাগারে বিচারাধীন বন্দী ও অপরাধীদের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে জেল কোড প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশেও একটা জেল কোড আছে। তাতে বিচারাধীন বন্দী ও সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদের সঙ্গে বঞ্চনা-নিপীড়নের কোন ধারা নেই। কিন্তু দিনের পর দিন কারাগারগুলোতে প্রচলিত জেল কোড লংঘিত করা হয়।

বিচারাধীন বন্দী হোক আর সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীই হোক, কারাগারে তারা নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে। বন্দীদশাটাই তাদের শাস্তি। সেই শাস্তির ওপর অন্য কোন শাস্তি প্রদানের অধিকার কারো নেই। তারপরও আওয়ামী শাসনে কারাগারগুলোয় কিভাবে তাদের মানবাধিকার লংঘিত হয়েছে তা উল্লেখ করা যাক। সারাদেশে কারাগারগুলোর ধারণক্ষমতা ২১ হাজার ৪শ' ৭ জন। কিন্তু ১৯৯৯ সালে পর্যন্ত ৬৩ হাজার ২শ' বন্দী সেখানে ছিল। আওয়ামী শাসনে ধারণক্ষমতার তিনগুণ বেশি বন্দী ছিল কারাগারগুলোতে। ফলে দেশের কারাগারসমূহে চরম আবাসিক সংকট সৃষ্টি হয়। প্রকৃত ধারণ ক্ষমতার নিরীখে দীর্ঘকাল আগে কারাগারে আবাসিক ভৌত অবকাঠামো নির্মিত হওয়ায় বন্দীদের শয়ন, গোসল, পয়ঃব্যবস্থাপনা প্রভৃতি ক্ষেত্রেই মানবেতর অবস্থা বিরাজ করেছে। অসংখ্য বন্দী রাতের বেলা পালা করে ঘুমায়। অথচ জেল কোড অনুযায়ী একজন বন্দীর জন্য ৩৬ বর্গফুট স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।

কারাগারে প্রতি বন্দীর জন্য ২টি কম্বল বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও বহু কারাগারে বন্দীরা সেই কম্বল পায় নি। ফলে বন্দীদের শীতের মধ্যে মেঝেতে গাদাগাদি করে ঘুমাতে হয়। অভিযোগ পাওয়া যায় জেল কর্তৃপক্ষ বন্দীদের জন্য বরাদ্দকৃত কম্বল তাদের আত্মীয়-স্বজনকে বিলিয়ে দেয়। খাওয়ার ব্যাপারে একই অবস্থা ছিল। নিয়ম অনুযায়ী একজন কারাবন্দীর দৈনিক ১২

www.pathagar.com

ছটাক চাল অথবা গম, ৫ ছটাক তরকারী, আড়াই ছটাক ডাল এবং কোয়ার্টার ছটাক গুড় পাওয়ার কথা কিন্তু বন্দীদের ভাগ্যে সে বরাদ্দ জুটেনি।

দেশের প্রতিটি কারাগারের অভ্যন্তরের ওয়ার্ডে সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের 'মেট' করা হয়। কারাগারের ভাষায় 'মেট' আর সহজ বাংলা ভাষায় হলো সরদার। কারাগারের ভিতরে কিছু সংখ্যক বন্দী ভালোভাবে জীবন যাপন করলেও, বেশিরভাগই এক এক ধরনের নরক যন্ত্রণার মাঝে বসবাস করছে। জায়গার অভাবে প্রতিটি ওয়ার্ডে ঘুমানোর জন্য তিন ধরনের পদ্ধতি ছিল। যারা 'মেট' ও কারারক্ষীদের বেশি টাকা প্রদান করে মন যোগাতে সক্ষম হয়েছিল তাদের ঘুমানোর জন্য প্রচুর জায়গা প্রদান করা হয়। যারা রেট অনুযায়ী টাকা-পয়সা দিতে পারে নি তাদের ঘুমানোর জন্য এক-দেড় হাত জায়গা দেয়া হয়। আবার যারা কোন টাকা-পয়সা দিতে পারে নি তারা ঠাসাঠাসি ও গাদাগাদি করে ঘুমায়। এমনকি তারা অনেক সময় পালা করেও ঘুমায়। মাসে মাসে মেট ও কারারক্ষীদের ঘুমানোর জন্য মাসোহারা দিতে হয়। দেশের কারাগারের অধিকাংশ বন্দীরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ঠাসাঠাসি করে ঘুমানোর কারণে নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছে। কারাগারের সংশ্লিষ্টদের খুশী রাখতে হয়েছে নইলে বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে তাদের পেতে হয় নির্মম শাস্তি।

দেশের অধিকাংশ জেলা কারাগারের বিল্ডিংগুলো ব্যবহার অযোগ্য। বহু ভবনের দেয়ালে পিডব্লিউডি 'বিপজ্জনক' সংকেত সাঁটিয়ে দেয়া হয়। ভগ্ন দশা দালাল যে কোনো সময়ে ধসে যাওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও সেখানে বন্দীদের রাখা হয়। দেশের কারাগারের একটিও সংশোধনাগার ছিল না। কারাগারকে সংশোধনাগার হিসেবে স্বার্থক বাস্তবায়নের জন্য সাজাপ্রাপ্ত অভ্যস্ত অপরাধীদের সংশ্রব থেকে বিচারাধীন বন্দীদের সম্পূর্ণ পৃথকভাবে রাখা বাঞ্চনীয় হলেও স্থানাভাবে তা সম্ভব হয় নি। (সূত্রঃ দৈনিক মানবজমিন ২৫ জানুয়ারি ২০০০)

আদালতের নির্দেশপ্রাপ্তির পর বিভিন্ন মামলার সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন কয়েদীরা আওয়ামী শাসনে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহায়। বিশেষতঃ জেলে কর্তব্যরত কর্মকর্তা ও সাধারণ কর্মচারীদের নির্যাতন ও নিপীড়নের কবলে অসংখ্য কয়েদী পড়েছে। মহিলা কয়েদীদের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী অত্যাচার হয়। যে সব মহিলা কিছুটা সুন্দরী তাদের কারাগারের কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অসৎ নজরে পড়তে হয়। তরুণী বা অবিবাহিতদের রাতে কর্মকর্তাদের রুমে ডেকে নিয়ে জোরপূর্বক অসামাজিক কাজে বাধ্য করা হয়। ফলে বহু ভদ্রঘরের মহিলা ও মেয়েরা আইনের বেড়াজালে জড়িয়ে নিরাপত্তা হেফাজতের নামে নির্যাতিত হন। প্রেম ঘটিত কারণে কিশোর-কিশোরী নির্ধারিত আইনানুগ বয়স পূর্তির আগে গোপনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে উভয় পক্ষের অভিভাবকরা বিয়ে মেনে নিতে না পারায় একে অপরের উপর প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে মিথ্যা অপহরণ মামলা সাজিয়ে পুলিশ দ্বারা ছেলে-মেয়েকে জেলের নিরাপত্তা হেফাজতে পাঠান। এ ধরনের ভাল পরিবারের মেয়েদের প্রতিই জেলের কিছু কর্মকর্তার কুনজর ছিল। তারা মেয়েদের জিজ্ঞাসাবাদের নাম করে রাতে তাদের অফিসের কক্ষে ডেকে নিয়ে অসামাজিক কাজে বাধ্য করে। বরিশাল কারাগারে মহিলা কয়েদীদের উপর পাশবিক নির্যাতনের বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কর্মকর্তাদের হুমকি-ধমকির মুখে সবই গোপন রাখা হয়। যেসব মহিলা কয়েদীর উপর নির্যাতন চালানো হয় তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ভয়ভীতি দেখানো হয়, যাতে করে কয়েদীদের উপর নির্যাতনের ভয়ে তারাও চেপে যেতে বাধ্য হয়। বরিশাল কারাগারের ন্যায় এ ধরনের ঘটনা সারাদেশের কারাগারগুলোতেই অহরহ

www.pathagar.com

হয়েছে। ফলে নির্যাতিত নারী নিরাপত্তা হেফাজতে গিয়ে আরো বেশি নির্যাতনের শিকার হন। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ১৮ জুলাই ২০০০)

বৃটিশ আমলে নির্মিত বাগেরহাট জেলা কারাগারে স্থানাভাবে সমস্যার দরুন হাজতী ও কয়েদী ছাড়াও জেল কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকেং দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ১৩০ জন কয়েদী ধারণ সক্ষম এই কারাগারে প্রতিদিন ৮ শতাধিক কয়েদী অবস্থান করে। ধারণক্ষমতার কয়েকগুণ বেশি লোক থাকায় কয়েদীরা মানবেতরভাবে কারাগারে বসবাস করে। চিকিৎসক না থাকায় প্রায়ই অসুস্থ আসামীদের চিকিৎসার জন্য সদর হাসপাতালে পাঠাতে হয়। এখানে পৃথক কোন রোগী রাখার স্থান ছিল না। (সূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক ১ জুন ১৯৯৯)

১০৪ জন আসামীর ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন শেরপুর কারাগারে ৪৪৪ জন কয়েদী থাকাবস্থায় ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৯ ফিল্মী কায়দায় অস্ত্র ভান্ডার লুণ্ঠন, ৯ জন কয়েদীর পলায়ন এবং পলায়নকালে পুলিশের সাথে গুলি বিনিময়ের সময় হতাহতের ঘটনা ঘটে। ঘটনার দিন সকাল সাড়ে সাতটার দিকে কারাগারের প্রধান ফটকে দায়িত্বরত কারারক্ষী মোফাজ্জল হককে সেভ করে দেয়ার কথা বলে সুজন ভালু নামে একজন কয়েদী (নাপিত) কারাগারের প্রধান ফটকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ঠিক তখনই এক সাথে আরো ৮ জন সেখানে ঢুকে যায়। কয়েদীরা প্রথমে কারারক্ষীকে মারপিট করে প্রধান ফটকের তালা খুলে দিতে বাধ্য করে। তারা অফিস সংলগ্ন কারাগারের অস্ত্রভান্ডারের তালা হাতুড়ি দিয়ে ভেঙ্গে সেখান থেকে ৩টি রাইফেল, শতাধিক রাউন্ড গুলি এবং একটি কিরিচ নিয়ে গুলি করতে করতে কারাগার থেকে বেরিয়ে পড়ে। তাদের ৯ জনের মধ্যে ৬ জনেরই ডাভাবেরী ছিল। তারা কারাগারের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গ্রামাঞ্চল অতিক্রম করতে থাকে। এ সময় বাইরে কোনো পাহারা ছিল না। খালি হাতেই ৭/৮ কারারক্ষী তাদের পিছু নেয়। ইতিমধ্যে শেরপুরের পুলিশকে বিষয়টি জানানো হলে পুলিশের তিনটি এস্কর্ট পলায়নরত কয়েদীদের লক্ষ্য করে বেরিয়ে পড়ে। জেলা শহর থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে সদর থানার চরশেরপুর ইউনিয়নের দুর্গম চরবাবনা গ্রামে পুলিশের সাথে পালিয়ে যাওয়া কয়েদীদের গুলি বিনিময়ের সময় পুলিশের গুলিতে একজন কয়েদী মারা যায় এবং সেখানে পুলিশ ও জনতা ৭ জনকে ধরে ফেলে। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ২২ ডিসেম্বর ১৯৯৯)

১৯৯৭ সালে বেআইনীভাবে বাংলাদেশ জলসীমানায় অনুপ্রবেশ করে মাছ ধরার অপরাধে কক্সবাজার সমুদ্র উপকূল থেকে ট্রলারসহ ৩৭ জন মায়ানমার (বার্মিজ) মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করা হয়। আদালত এদের প্রত্যেকের এক বছর দু'মাস করে সাজা প্রদান করেন। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে সাজার মেয়াদ শেষে দেশের বিভিন্ন কারাগারে বেশ কয়েকজন বার্মিজ নাগরিক আটক ছিল। এদের ফেরত নেয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে একাধিকবার মায়ানমার সরকারের সাথে যোগাযোগ করা হলেও তারা এ ব্যাপারে কার্যকর কোন উদ্যোগ না নেয়ায় এদের ফেরত পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না বলে সিলেট জেলা প্রশাসনের সূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদপত্রে তথ্য প্রকাশ করে। সিলেট কারাগারে ৭৯ জন মায়ানমারের বন্দী ছিল। এদের মধ্যে গোসল করার জন্য ৩৭ জনকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০০ সকাল আটটার দিকে ওয়ার্ডের বাইরে বের করা হলে তারা বিদ্রোহ করে বসে। ঝড়ের বেগে তারা ওয়ার্ডের টিনের চালা, পার্শ্ববর্তী নারিকেল ও কাঁঠাল গাছে উঠে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। তারা তাদের মুক্তি দিয়ে দেশে ফেরত পাঠানোর দাবী জানাতে থাকে। এক পর্যায়ে শক্তি প্রয়োগ করে টিনের চালা ও কাঁঠাল গাছ থেকে ২৫/৩০ জনকে নামানো সম্ভব হলেও ৭/৮ জন নারিকেল গাছের চুড়া থেকে

www.pathagar.com

নামতে অস্বীকৃতি জানায়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ নিয়ে জেলা প্রশাসক আলী ইমাম মজুমদার ও পুলিশ সুপার এম.এ. হানিফ দুপুরে কারাগারে ছুটে যান। প্রশাসনের কর্মকর্তারা তাদেরকে গাছ থেকে নেমে আসার অনুরোধ জানান। এ সময় বিদ্রোহীদের একজন ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা ভাষায় বলে তাদের মুক্তি দিয়ে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা না নিলে তারা গাছ থেকে নামবে না। জোর করে নামানোর চেষ্টা করা হলে তারা আত্মহত্যা করবে। এদের কয়েকজন নারিকেল গাছের চূড়া থেকে তাদের মাতৃভাষায় উচ্চস্বরে চিৎকার দিচ্ছিল। দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা চেষ্টা চালানোর পরও তারা গাছ থেকে না নামায় ডিসি, এসপি ও কারা কর্মকর্তারা বেলা একটার দিকে গাছের কাছে গিয়ে তাদেরকে নেমে আসার জন্য উপুর্যপরি অনুরোধ জানান। কর্মকর্তারা বিদ্রোহীদের দাবীর ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব দেখালে তারা একে একে গাছ থেকে নেমে আসে। বেলা ২টার দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। বিদ্রোহীদের একাংশকে দমনের সময় কারারক্ষীদের সাথে হাঙ্গামা এবং নিক্ষিপ্ত নারিকেলের আঘাতে প্রায় ১০ জন আহত হন। এদের মধ্যে গুরুতর আহত এক বার্মিজ বন্দীকে ওসমানী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। (সূত্রঃ দৈনিক সিলেটের ডাক ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০০)

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে দুর্নীতি, নির্যাতন-ঘুষসহ বিভিন্ন অনিয়মের প্রতিবাদে ১৯৯৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর কারাগার অভ্যন্তরে সব বন্দী প্রতিবাদস্বরূপ অনশন ধর্মঘট করেছিল। তখন জেল সুপার আলী আকবর তালুকদার বন্দীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এসবের অবসান এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে আশ্বাস দিয়ে অনশন ভঙ্গ করিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারে যেসব অনিয়ম হয় তার মধ্যে ছিল দর্শন ফি ৭০/৮০, আদালতে ছাড়পত্র আসার সাথে সাথে ছেড়ে দেয়ার বিধান থাকলেও সেক্ষেত্রে ১৫০/২০০০ টাকা করে বন্দীদের তদবিরকারীর কাছ থেকে না পাওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা, এমনকি বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে পরদিন ছাড়া হয়, প্রত্যেক দিনের খাদ্য তালিকা থেকে খাদ্য আত্মসাৎ করা, বেশি সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের কাছ থেকে ৫/৭ হাজার টাকা ঘুষ নিয়ে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে না পাঠানো, প্রত্যেক ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সর্দার নিয়োগ বাবদ ৮/১০ হাজার টাকা ঘুষ নিয়ে সর্দার নিয়োগ দেয়া, এ সর্দারদের কাছ থেকে প্রতি সপ্তাহের শনিবারে জেলারের পকেট খরচ বাবদ ৭টি ওয়ার্ড থেকে ৩৫০০ টাকা করে চাঁদা নেয়া, ভেতরে গাঁজা, ট্যাবলেট, ফেনসিডিল বিক্রি করার সুযোগ দিয়ে সপ্তাহে জেলারকে হাজার হাজার টাকা চাঁদা প্রদান, মহিলা বন্দীদের সঠিকভাবে সাবান-তেল না দেয়া, ২৬ মার্চ, দুই ঈদ, ১৬ ডিসেম্বর বন্দীদের জন্য সরকারি বিশেষ বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও না দেয়া প্রভৃতি। (সূত্রঃ দৈনিক মানবজমিন ৩ মার্চ ২০০০)

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে যে রুমে ৬০ জন বন্দী থাকার কথা সেখানে ২শ'র বেশি বন্দী ছিল। ২৫ মে ২০০০ পর্যন্ত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মোট বন্দীর সংখ্যা ছিল ৮ হাজার ৩শ' ৬৩ জন। এর মধ্যে মহিলা বন্দী ২শ' ৫৩ জন। বিচারাধীন বন্দীর সংখ্যা পুরুষ ৬ হাজার ১শ'৯৪ জন এবং মহিলা ১শ' ৯৫ জন। সশ্রম কারাবন্দী ২৮ জন মহিলাসহ মোট ১৪ শ' ৯৫ জন। বিনাশ্রমে বন্দী ২শ'৪৪ জন। বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক ১শ' ৯২ জন। ৩ জন মহিলাসহ মোট ১শ' ৪৯ জন জননিরাপত্তা আইনে আটক ছিল। নিরাপদে হেফাজতে ২শ' ১৯ জন, শিশু ৭৪ জন। এর মধ্যে মায়েদের সাথে অবস্থান করছে এমন শিশুর সংখ্যা ২২ জন।

www.pathagar.com

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত কয়েদীর সংখ্যা ১ জন মহিলাসহ ১৬ জন। ৫ বছরের বেশি সময় ধরে কারাবাস করছেন এমন বিচারাধীন কারাবন্দীর সংখ্যা ২০ জন ছিল।

তারপরেও ছিল অবর্ণনীয় সমস্যা। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অতিরিক্ত বন্দীর ফলে বাথরুমে বন্দীদের প্রচন্ড ভীড় হয়। ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়েও অনেকে বাথরুম ব্যবহারের সুযোগ পায় নি। এনিয়ে বন্দীদের মধ্যে প্রায়ই হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। বাথরুম ব্যবহারের ক্ষেত্রে বয়স্ক বন্দীরাই সবচেয়ে বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হয়। অনেকেই অপেক্ষা করতে করতে দাঁড়ানো অবস্থায়ই কাপড়- চোপড় নষ্ট করে ফেলেন। প্রায় ১ হাজার লোকের জন্য বরাদ্দ ছিল একটি গোসলখানা। ফলে অনেক বন্দী প্রায় দিনই গোসল করতে পারেনি।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দীদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সাক্ষাৎ প্রার্থীদের কাছে মসজিদের নামে মাথাপিছু ২ টাকা হিসেবে নেয়ার নিয়ম চালু থাকলেও বাস্তবে চালু ছিল বিভিন্ন ব্যবস্থা। কতিপয় প্রভাবশালী কয়েদী ও কিছু দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার যোগসাজশে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের কাছ থেকে জনপ্রতি ৬০ টাকা হিসেবে প্রতিদিন কয়েক লাখ টাকা আদায় করা হয়। এ ছাড়া বিশেষ ব্যবস্থায় কর্মকর্তাগণ নিজেদের অফিসেই অনৈতিকভাবে বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ব্যবস্থা চালু রাখেন। এক্ষেত্রে তাদের রেট আসামী প্রতি দেড় হাজার থেকে ২ হাজার টাকা পর্যন্ত ছিল। কারাভ্যন্তরে মাদক দ্রব্যও ঢুকেছে অবাধে। এর জন্য মাদক কারবারি বিশেষ কয়েদীদের সঙ্গে কয়েকজন দুর্নীতিবাজ কারা কর্মকর্তার মোটা অংকের লেনদেনও ওপেন সিক্রেট ছিল। কারাগারের বিভিন্ন ওয়ার্ড এবং প্রভাবশালী 'মেট' ও 'রাইটারদের' কাছে নগদ টাকার বিনিময়ে অলিখিতভাবে ইজারা দেয়া হয়। কারাবন্দীরা এ অবস্থায় 'মেট' এবং 'রাইটারকে' নিয়মিত টাকা না দিলে ঘুমানোর জায়গা, খাওয়া এবং গোসলের সুযোগ পায় নি। কেউ এর প্রতিবাদ করলেই তাকে 'কেস টেবিলের' সামনে দাঁড়াতে হয় এবং তার ওপর শুরু হয় অমানুষিক নির্যাতন।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে হিমশিম খেতে হয়। শেখ মুজিব ও জেল হত্যা মামলার আসামীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয় ২৪ জুলাই থেকে। জেলারের তত্ত্বাবধানে ১ ঘন্টা পর পর কারা অভ্যন্তরে রাউন্ড প্রদান করে কারারক্ষীরা। ৫০ জন কারারক্ষীকে ভেতরে অতিরিক্ত দায়িত্বে মোতায়েন করা হয়। (সূত্রঃ দৈনিক মানবজমিন ১৫ জানুয়ারি, ১৫ জুন ও দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা ২৫ জুলাই ২০০০)

১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত মোট ৩৫টি কক্ষ বিশিষ্ট খুলনা কারাগারের ধারণ ক্ষমতা পুরুষ ৫শ' ২৭ এবং মহিলা ১৫ জন থাকলেও ২০০০ সালের মধ্য ভাগ পর্যন্ত বসবাস করেছে ১৯শ' ৫০ জন। এর মধ্যে ৪৩ জন সশ্রম, ২শ' ৪০ জন বিনাশ্রম, জননিরাপত্তা আইনে আটক ১শ' ৬৭ জন, মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত ৯ জন, ভারতীয় নাগরিক ৩ জন বন্দী ছিল। কখনো কখনো এ সংখ্যা বেড়ে যায়। জুন ২০০০ পর্যন্ত বন্দীর বসবাস ছিল ২১ শ' জন। খুলনা কারাগারের কর্তৃপক্ষ টাকার বিনিময়ে গ্রেফতারকৃত টপটেরর ও ক্যাডারদের দুধ, কলা, ডিম, মাখন, মাংস ও আরামে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অপরদিকে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে একজন চিকিৎসক থাকলেও তাকে হাত করে বিনা রোগে প্রভাবশালী কয়েদী ও হাজতী মাসের পর মাস হাসপাতালের বেডে থাকায় প্রকৃত রোগীকে মেঝেতে থাকতে হয়। সঠিক চিকিৎসা না পাওয়ার ফলে মারাত্মক রেগে ভোগে প্রকৃত রোগীরা। নিম্ন মানের খাদ্য বিতরণ, মাদক দ্রব্যের অনুপ্রবেশ, অবৈধ অর্থ আদায়সহ অন্যান্য কারাগারগুলোর যেসব অনিয়ম হয় সবই এখানে বিরাজ করেছে। (সূত্রঃ দৈনিক মানবজমিন ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০০)

www.pathagar.com

১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তহীন সমস্যা বিরাজ করেছে। ১৯৬২ সালের নভেম্বরে এটিকে কেন্দ্রীয় কারাগার করা হয়েছিল। এর আগে ধারণ ক্ষমতা ছিল কয়েদী ২৮৬ ও আসামী ১৬ জন। কেন্দ্রীয় কারাগারে রূপান্তরিত করার পর ১৯৭০ সালে ১০৫৬ জন পুরুষ ও ২৬ জন মহিলা রাখার ব্যবস্থা করা হয়। একটি শেড নির্মাণ করে ২০০০ সালে ধারণ ক্ষমতা পুরুষ ১৭৯৪ ও মহিলা ২২ জনসহ মোট ১৮১৬ জন করা হয়। ২০০০ সালে অধিকাংশ সময়েই ১৮শ' ধারণ ক্ষমতার বিপরীতে ৩ থেকে সাড়ে ৩ হাজার বন্দী অবস্থান করে। কারাগারে কয়েদী ও হাজতী মিলে ৩১৫৬ পুরুষ এবং ৭৮ জন মহিলাকে রাখা হয়। ফলে বন্দীদের দুর্ভোগের সীমা থাকে না। মশা, গরম এবং বাথরুম সমস্যায় বন্দীরা অতিষ্ট হয়ে পড়ে। কুমিল্লা কারাগারে বেশ কয়েকটি ভবন ঝুঁকিপূর্ণ বলে গণপূর্ত বিভাগ অযোগ্য ঘোষণার পরও কয়েকটি ভবন ব্যবহার অব্যাহত রাখা হয়। ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ছিল আইজি প্রিজন ও জেলারের বাসভবন।

কয়েদী ও হাজতী দেখার নির্দিষ্ট দিন থাকলেও তা মানা হয় নি। টাকার অংক বাড়িয়ে দিয়ে যে কোন সময় বন্দীদের সাথে দেখা করার সুযোগ ছিল। নিয়মমতে ফাঁসির আসামীর সাথে বৃহস্পতিবার, কয়েদীর সাথে শনিবার, হাজতীদের সাথে রবি ও শুক্রবার মাত্র ২ টাকা ফি দিয়ে দেখা করার কথা। অনেক লোকের সাথে দেখতে হয় বলে ভালভাবে কথাবার্তা বলতে পারা যায় না বিধায় অনেকে বিশেষভাবে দেখা করতে চায়। বিশেষভাবে দেখানোর নামে কারারক্ষীরা প্রচুর অর্থ আদায় করে। অথচ মসজিদ ফান্ডে মাত্র ২ টাকা জমা দিয়ে দেখা করার কথা। মসজিদ ফান্ডে মাত্র ২ টাকা জমা দিয়ে বাকি টাকা ভাগবাটোয়ারা হয়। বিশেষভাবে দেখানোর ক্ষেত্রে কোন নিয়ম-কানুন অনুসরণ করা হয় নি। কয়েদী ও হাজতীদের নিম্নমানের খাদ্য পরিবেশন করা হয়।

কারাগারে হাসপাতালটিতে অবস্থানের জন্য রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলে। ৭৮ সিট বিশিষ্ট হাসপাতালে অনেক সময় কয়েদীরা অর্থের বিনিময়ে ডাক্তারদের কাছ থেকে অসুস্থ্যতার সনদ নিয়ে মাসের পর মাস অবস্থান করে। কুমিল্লা কারা হাসপাতালের সিভিল সার্জনের বডিগার্ড ওয়াহেদ মিয়ার দুর্নীতি, অনিয়ম আর স্বেচ্ছাচারিতার দরুণ কারাগারে হাজতী ও কয়েদী রোগীগণ অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহায়। হাসপাতালের রোগীদের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য ওয়াহেদ কুমিল্লা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। তখন অসহায় রোগীরা ওয়াহেদের কথা মতো টাকা দিতে বাধ্য হয়। তার চাহিদা মতো টাকা দিতে ব্যর্থ হলে সে সিভিল সার্জনকে দিয়ে উল্টা-পাল্টা রিপোর্ট দেয়ার ব্যবস্থা করে। ওয়াহেদকে খুশী করতে না পারলে কারা হাসপাতাল থেকে হাজতী সাজাপ্রাপ্ত রোগীদের ২/৪টি সাদা ট্যাবলেট ছাড়া আর কিছুই দেয়া হয় নি। (সূত্রঃ দৈনিক জনতা ২৭ জুলাই ও দৈনিক দিনকাল ১ নভেম্বর ২০০০)

১৮৮৫ সালে ২৯ একর জমিতে নির্মিত দিনাজপুর জেলা কারাগারের ধারণ ক্ষমতা ৪৩০ জনের থাকলেও এখানে বসবাস করেছে ১৪০০ জনের মতো কয়েদী। ১শ' বন্দীর জন্য একটি ল্যাট্রিন, ৫ বছরের অধুয়া কম্বল বিছানা ব্যবহার করছে বন্দীরা-এ রকম তথ্য পরিবেশ করেছে ১০ অক্টোবর ২০০০ এর দৈনিক দিনকাল।

অন্যদিকে কারাগারের অভ্যন্তরে মাদক ব্যবসা চলেছে জমজমাটভাবে। সকাল থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত অবাধে জুয়া ও মাদক সেবনের আসর বসেছিল। কতিপয় কারারক্ষী মদ, গাঁজা, ফেন্সিডিল, হেরোইন, সিডাকসিন টেবলেটসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য কারাগারের অভ্যন্তরে নিয়ে আসে। কারাগারে প্রবেশের দিন থেকে শুরু হয় নির্যাতন। প্রথম দিন বন্দীকে আমদানি

www.pathagar.com

ওয়ার্ডে রাখা হয়। সেখানে 'মেটদের' অর্থ আদায়ের কৌশল হিসেবে শুরু হয় নবাগতদের উপর চর-থাপ্পড়। প্রতিবাদ করলেই সাজা। দ্বিতীয় দিন সকালে নবাগত বন্দীদের সারিবদ্ধভাবে বসিয়ে রাখা হয় কেইস টেবিলের সামনে। সকলের নাম-ঠিকানা মিলানোর পর চুল কাটার নামে শুরু হয় নির্যাতন। এই নির্যাতন চলে গণহারে। তারপর নবাগত বন্দীদের কেনা-বেচার হাট বসে। এ হাটে বিক্রেতা থাকেন কারা প্রধান এবং ক্রেতা হয় মেটরা। বন্দীদের চেহারা ও পোশাক পরিচ্ছেদ দেখে মেটারা তাদের আর্থিক অবস্থা বুঝে নেয়। আর্থিক অবস্থা ভাল এমন বন্দীদের নিয়ে মেটদের মাঝে দর দামে প্রতিযোগিতা হয়। এরপর মেটদের পক্ষ থেকে জনপ্রতি বন্দীদের কাছে সিটের মূল্য হিসেবে দাবী করা হয় মাসে ২ থেকে ৩ হাজার টাকা। মেটদের দাবী পূরণে সরাসরি সম্মত না হলে বন্দীদের উপর নেমে আসে নির্যাতন। রাতে পায়খানার দরজার সামনে ভিজা কম্বল শোয়ার জন্য দেয়া হয়। এসব নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মেটদের দাবী মেটানোর জন্য আত্মীয়-স্বজন সাক্ষাতে এলে তাদের কাছ থেকে টাকা রাখতে বাধ্য হয় এবং তা মেটদের হাতে তুলে দেয়া হয়। আর যারা টাকা দিতে ব্যর্থ হয় তাদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চলে। কারাগারের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগের বিস্তার ঘটেছে প্রতিদিন। সেখানে বন্দী রোগীদের সুষ্ঠু চিকিৎসা ও ওষুধ ছিল না। ফলে বন্দীরা সংক্রামক রোগ নিয়ে দিনের পর দিন কষ্ট ভোগ করেছে। রোগী না হয়েও অর্থের বিনিময়ে দিনের পর দিন সুস্থ বন্দীরা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে থাকার সুযোগ পেয়েছে। ফলে প্রকৃত অসুস্থ বন্দীরা হাসপাতালে ভর্তি হতে পারে নি। এ ছাড়াও ওষুধ বিতরণে চলে দুর্নীতি। প্রত্যেক অসুস্থ বন্দীর জন্য যে পরিমাণ ওষুধ বরাদ্দ হয় বিতরণের সময় তার চেয়ে অনেক কম পরিমাণ ওষুধ প্রদান করা হয়।

দিনাজপুর জেলা কারাগারে বন্দীদের খাবার প্রদানের ক্ষেত্রেও চলেছে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি। সকালে ছোট একটি রুটির সাথে এক চিমটি গুড়, দুপুরে দুটি ছোট রুটির সাথে সামান্য পরিমাণ নিম্নমানের ডাল এবং বিকেলে এক মুঠি মোটা চালের ভাতের সাথে সবজি দেয়া হয়। যা প্রায় খাবার অযোগ্য। রুটিন মাফিক মাছ ও মাংস দেয়ার নিয়ম থাকলেও তা দেয়া হয় নি। কদাচিৎ তা দেয়া হলেও পরিমাণের তুলনায় অনেক কম ছিল। মাছের ক্ষেত্রে সিলভার কার্প এবং মাংসের ক্ষেত্রে অসুস্থ ছাগলের মাংস ছাড়া কিছুই মেলেনি। কারাগারের অভ্যন্তরে অবৈধভাবে উত্তোলন ও আয়কৃত টাকা-পয়সা কারারক্ষী থেকে শুরু করে কারা কর্মকর্তা মেটসহ উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত ভাগ-বাটোয়ারা হয়। কারাগারে সরবরাহকারী ঠিকাদারদের সাথে যোগাযোগ করে কারা কর্মকর্তারা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়। কারণ মাল সরবরাহ না করলেও ঠিকাদারকে বিল প্রদান করা হয়। যার সিংহভাগ অংশ কারা কর্মকর্তারা পকেটস্থ করেছে। দীর্ঘদিন ধরে দিনাজপুর কারাগারে এই অনিয়ম-দুর্নীতি চললেও কোন প্রতিকার ছিল না।

বৃটিশ রাজত্বের শেষ দিকে গাইবান্ধা শহরের প্রাণকেন্দ্রে ৩২টি ছোট ছোট সেল দিয়ে ১শ' ১৪ জনের (পুরুষ ১শ'৭ ও ৭ জন মহিলা) ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি উপ-কারাগার স্থাপিত হয়। ১৯৯৫ সালে উপ-কারাগারটি জেলা কারাগারে রূপান্তরিত করা হলে স্টাফ বাড়ে কিন্তু সুযোগ-সুবিধা কিছুই বাড়েনি। ৫/৬ জনের ব্যারাকে পুলিশ ছিল ৩১ জন। সুপারের অফিস এবং বাসভবনের ব্যবস্থা ছিল না, প্রধান কারারক্ষীর থাকার জায়গা ছিল না। কারাগারের প্রতিটি সেলে ৫/৬ জনের বেশি আসামী থাকা কষ্টসাধ্য হলেও থেকেছে ১৫ থেকে ২০ জন আসামী। সেগুলোতে আসামীরা রাতের বেলায় পালাক্রমে ঘুমিয়েছে। কারাগার অভ্যন্তরে পয়ঃ

www.pathagar.com

নিষ্কাশনের সুষ্ঠু কোনো ব্যবস্থা ছিল না। কারাগারের সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠতে জেলা শহরের অদূরে 'ঝিনেশ্বর' নামক স্থানে একটি নতুন জেলা কারাগার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। গণপূর্ত অধিদফতর থেকে এর নির্মাণ কাজের ব্যয় বরাদ্দ নির্ধারিত হয় প্রায় ১১ কোটি টাকা। ১৯৯৫ সালে এই কারাগার নির্মাণের উদ্দেশ্যে প্রায় ৬ একর জমি হুকুম দখল করা হয়। কিন্তু জমির মালিকদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিতে জেলা প্রশাসন গড়িমসির কারণে মামলার উদ্ভট ঘটে। ৪ বছর পর মামলা নিষ্পত্তি ও জমির টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে নির্মাণ কাজ শুরু হলেও তহবিল সঙ্কটের কারণে সীমানা প্রাচীর ও ২১টি ছাড়া আর কোন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়নি। কিন্তু সাবেক এক নির্বাহী প্রকৌশলী ঐ টাকা ভূয়া অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যয় করে অন্যত্র বদলী হয়ে যায়। ২০ আগষ্ট ২০০০ গাইবান্ধার গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী একেএম নজরুল ইসলাম ভূঁইয়া নির্মীয়মান কারাগারটি দ্রুত সম্পন্ন করার অত্যাবশ্যকতা জানিয়ে কারা মহাপরিদর্শকের বরাবরে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ চেয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু পর্যাপ্ত বরাদ্দ না পাওয়ায় কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকাদাররা হাত গুটিয়ে বসে ছিল। ফান্ড না থাকায় নিজস্ব তহবিল বিনিয়োগের উৎসাহ তারা হারিয়ে ফেলে। ফলে মাঝপথে নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে যায়। (সূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ ১৫ নভেম্বর ২০০০)

নড়াইল উপ-কারাগারে ৩৪ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা বন্দী রাখার ব্যবস্থা থাকলেও ধারণ ক্ষমতার চেয়ে ৫/৭ গুণ বেশি বন্দী রাখা হয়। ধারণ ক্ষমতা না থাকায় বন্দীরা পালাক্রমে ঘুমায়। কারা অভ্যন্তরে নোংরা পরিবেশ থাকায় বন্দীরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। কতিপয় কারারক্ষী ও সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সহায়তায় প্রতিদিন জেলগেটের সামনে চলে অনিয়ম, দুর্নীতি ও চাঁদাবাজী। নিত্যদিন গ্রামাঞ্চলের শ'শ' মহিলা শিশু ও বৃদ্ধরা কারাগারের সামনে বসে থাকে তাদের নিকটতমদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। কিন্তু কারা পুলিশ খাতা, চেয়ার, টেবিল নিয়ে জেল গেটের সামনে একটি ঘুমটি ঘরে সারাক্ষণ বসে থাকে। এখান থেকে স্লিপ সরবরাহ করা হয়। নগদ ৩০/৫০ টাকার বিনিময়ে টোকেন বা স্লিপ সংগ্রহ করে কারা অভ্যন্তরের হাবিলদার বা 'মেটদের' হাতে দেয়া মাত্র কাঙ্খিত বন্দীদের দেখা মেলে। বন্দীকে রান্না করা খাদ্য, সিগারেট, চিড়া, মুড়িসহ অন্যান্য খাবার দিতে চাইলে আলাদাভাবে 'মেটকে' ২৫ থেকে ৫০ টাকা দিতে হয়েছে। এছাড়াও 'মেটের চাহিদা মতো অর্থ না দিলে বন্দীদের অমানুষিক অত্যাচার সইতে হয়। বিশেষ ক্যাচলিং-এ তাদেরকে রাতে শোয়ানো হয়। এ অবস্থায় ঘাড় এদিক-ওদিক পর্যন্ত ঘোরানো যায় না। আর মেটকে পাঁচশ থেকে এক হাজার টাকা দিলে বিশেষ সেলে বন্দীদের শোয়ানো হয়। এই টাকার ভাগ কারা কর্তৃপক্ষও পায়। বন্দীদের ওপর এসব নির্যাতন দেখার কেউ ছিল না। কারাগারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটসহ ঊর্ধ্বতন কারা কর্তৃপক্ষ মাঝে-মধ্যে কারাগারটি পরিদর্শনে এলেও দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অনিয়ম বন্ধ হয়নি। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ২৫ নভেম্বর ২০০০)

www.pathagar.com

প্রশাসনের সর্বস্তরে দুর্নীতি

২৩ জুন ১৯৯৬ থেকে প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে দুর্নীতি, স্বজন-প্রীতি আর আনুগত্য প্রীতির ভাইরাস আক্রমণ করে। ফলশ্রুতিতে প্রশাসনের কর্মকান্ডে নেমে আসে চরম স্থবিরতা। কাজ-কর্মে মন্থর গতি। ফাইল নিষ্পত্তি হয় শম্বুক গতিতে। হাসিনা সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরই দলীয় অনুগত কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশ 'আমরা রাজপথে নামার পর বিএনপি সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য হয়েছে'-এসব আলোচনা-সমালোচনা করে প্রথম ৬ মাস সময় অতিবাহিত করে। গল্প-গুজবের সঙ্গে সঙ্গে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনেককেই আওয়ামী সরকারের সঙ্গে কানেকশন ঘনিষ্ঠতা করার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। ভালো লোভনীয় পোস্টিং বাগিয়ে নেয়ার জন্য মন্ত্রীদের বা প্রধানমন্ত্রীর পূর্ব পরিচিত আপনজনদের বাড়িতে যাতায়াত শুরু করে। অনেকেই সক্ষম হয় তার কাঙ্খিত পদ বাগিয়ে নিতে। শুরুতেই অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে প্রবল ছিল এই প্রবণতাটি। কাজের চেয়ে তারা আকর্ষণীয়দের জন্য দৌড়াদৌড়ি করেছে বেশি।

১৯৯৬ সালের ২৬ জুন সচিবালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে ভাষণদানকালে প্রধানমন্ত্রী ৬ মাসের মধ্যে নতুন বেতন স্কেল দেয়ার কথা ঘোষণা করে স্বাচ্ছন্দ্যে করতালী গ্রহণ করেন কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তা বাস্তবায়িত হয়নি। সচিবালয় দেশের সকল প্রশাসনিক কাঠামোর প্রধান অঙ্গ। এই অঙ্গকে নিজ আয়ত্তে রাখতে হাসিনা সরকার অনুগতদের মধ্য থেকে পছন্দ মতো সচিব পর্যায়ে রদবদল করে। প্রশাসনে বিগত (১৯৯১-১৯৯৬) সরকারের আমলে নিয়োগদানকৃত বা অপ্রকাশ্য দলীয় অনুগতদের খুঁজে বের করে আওয়ামী রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তালিকা অনুসারে এগিয়ে যাওয়া হয়। এ ধরনের ন্যক্কারজনক কর্মের দায়িত্বভার অর্পিত হয় হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত ড. শওকত আলীর উপর। তিনি প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা ও বিশেষ আদেশ পালনের জন্য আওয়ামী অনুগতদের উপর খাস নজর দিয়ে প্রশাসনিক পদে বসাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তার কাজ-কর্মে মন্থর গতি দেখে প্রধানমন্ত্রী নাখোশ হন। তিনি আরো বিশ্বস্ত ও দলীয় আনুগত্য এবং ব্যক্তিগতভাবে তার আনুগত্য ও তোষামোদকারী সচিব খুঁজতে থাকেন। এ পর্যায়ে 'জনতার মঞ্চের' আমলাদের বেছে নেন।

পাট সচিবের দায়িত্ব থেকে শফিউর রহমানকে ক্ষমতা গ্রহণের ১৫ দিনের মাথায় সংস্থাপন সচিবের পদে বসানো হয়। প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বলে সচিবালয়ে পরিচিত শফিউর রহমানকে প্রথমে প্রধানমন্ত্রী সারাদেশের জেলা ও থানা পর্যায়ের ডিসি, এডিসি ও টিএনওদের দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পোস্টিং দিয়ে মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনকে ঢেলে সাজানোর দায়িত্ব দেন। ডিসিদের সচিব পদে পদোন্নতি দিয়ে আওয়ামী অনুগত অনেককে ডিসি পদে বসিয়ে দেয়া হয়। বিএনপি সরকার আমলে পোস্টিংপ্রাপ্ত ডিসিকে প্রত্যাহার করে নতুন করে পোস্টিং দেয়া হয়। এভাবে ৪০ এর উপর ডিসি, ৫০ এর উপর এডিসি এবং ২ শতাধিক টিএনওকে পোস্টিং দিয়ে পুরো প্রশাসনকে দলীয়করণের আওতায় আনা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ডিসি, এডিসি নিয়োগের বিধিমালা ভঙ্গ করে পোস্টিং দেয়া হয় দলীয় অনুগতদের। শফিউর রহমানের পরামর্শে সচিবালয়ের বিভিন্ন

www.pathagar.com

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু পদে রদবদল করে হাসিনা সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। ক্রিকেট খেলায় জেতার মতো 'লাগলে বারী বাউন্ডারী'-নীতি অনুসরণ করে সুযোগ পেয়েই সচিবালয়ের মধ্যে এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আকর্ষণীয় এবং লোভনীয় পদগুলো বাগিয়ে নেয়।

একই সময় ২৪ জন ১৯৭৩ ব্যাচের (প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় অযোগ্য উপ-সচিব) যুগ্ম-সচিব পদে পদোন্নতিসহ ৫৪জন যুগ্ম সচিব, ৫ জন অতিরিক্ত সচিবকে মেধা, যোগ্যতা এবং জেষ্ঠ্যতা মূল্যায়ন না করে দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সিনিয়র সহকারী সচিব পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। একইভাবে পর্যায়ক্রমে সচিবালয়ের অভ্যন্তরে গুরুত্বপূর্ণ পদে, কর্পোরেশনগুলো এবং বিভিন্ন অধিদফতর, দফতর প্রতিষ্ঠানসমূহের চেয়ারম্যান-পরিচালক পদে পোস্টিং দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর সচিব ড. ম. খা. আলমগীরের সঙ্গে সংস্থাপন সচিবের প্রচন্ড মতবিরোধ দেখা দেয়। বদলি-পোস্টিং নিয়ে এক পর্যায়ে সচিবদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব শুরু হলে সচিবদের একাংশ আলমগীরের প্রশাসনে অযাচিতভাবে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী সচিবদের খুশি করতে আলমগীরকে স্বপদ থেকে সরিয়ে প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। প্রশাসনকে দলীয়করণের প্রক্রিয়া শেষ হলে তড়িঘড়ি করে শফিউর রহমানকে অন্যত্র সরিয়ে দেয়া হয়।

১৯৯৭ সালের ৩১ মে হাসিনা সরকারের এক বছর পূর্তির ২৩ দিন আগে পূর্বের অফিস সময়সূচি বাতিল করে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নয়া বেতন স্কেল ঘোষণা এবং সচিবালয়ের অফিস সময় সীমা ৯টা ৫টা করা হয়। এ ধরনের হটকারী সিদ্ধান্তকে সবাই প্রত্যাখ্যান করলে সচিবালয় থেকে শুরু হয় প্রতিবাদী আন্দোলন। প্রায় ২ মাস ব্যাপী বিরামহীন আন্দোলনের লেলিয়ে দেয়া পুলিশ চূড়ান্ত দমননীতি চালাতে গিয়ে ২ জুন মহিলাসহ ২জনকে আহত করে। প্রধানমন্ত্রী কৌশলে সরকারি দালালদের দ্বারা আন্দোলনে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করে সাময়িক সময়ের জন্য সফল হন। তিনি সচিবালয়ের অফিস করে সরাসরি কথা বলার মাধ্যমে নানা টোপ দেন কিন্তু পরবর্তীতে তার কূটচাল ব্যর্থতার বানে নির্বাসন পায়।

সিভিল প্রশাসনের সাথে সাথে পুলিশ প্রশাসনেও ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে পোস্টিংপ্রাপ্ত ঢাকার পুলিশ কমিশনার আব্দুস সালামকে সরিয়ে দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পুলিশ কমিশনার পোস্টিংসহ সারাদেশের পুলিশ সুপার পদে ব্যাপক রদবদল করা হয়। বিএনপি আমলের পোস্টিং অধিকাংশ পুলিশ সুপারকে প্রত্যাহার বা কম গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি বা ক্লারিকেল পদে বদলি করা হয়। ডিআইজি, এডিশনাল ডিআইজি পদে ১৯৭৩-এর ব্যাচ খুঁজে খুঁজে পোস্টিং দেয়া হয় এবং সামরিক বাহিনী থেকে আগত ১৪ থেকে ১৫ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে পুলিশ প্রশাসন থেকে বের করে দেয়া হয়। অনেককে ওএসডি করে রাখা হয়। সংখ্যালঘুদের মধ্যে বেশ কয়েকজন পুলিশ সুপারকে সীমান্ত জেলায় পোস্টিং দেয়া হয়।

অহেতুক সার্কুলার জারি, মন্ত্রী-সচিবের বিরোধ, প্রশাসনে নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, প্রভাব খাটানো, হাসিনা সরকারের সূচনা লগ্ন থেকে প্রকাশ্য ও নিত্যদিনের ঘটনা ছিল। ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের এক নির্দেশে ১৯৮৯ সালে গঠিত ও পরবর্তীকালে বাতিল হয়ে যাওয়া মতিন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে জনপ্রশাসনের মোট ২৯টি ক্যাডারদের মধ্যে কেবল প্রশাসন ক্যাডারের সদস্যদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও অসন্তোষ দেখা দেয়। বিক্ষুব্ধ ক্যাডার সংগঠনগুলো সরকারের এই সিদ্ধান্তের

www.pathagar.com

প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান, অর্থমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ, সভা-সমাবেশসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে এই আদেশ প্রত্যাহারে বাধ্য করে।

জুলাই মাসে সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবদের কাছে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার পাঠিয়ে তা পূরণের জন্য তাগিদ দিলে প্রশাসনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইশতেহারে বর্ণিত অঙ্গীকার পুরণের কতো দূর অগ্রগতি হলো তা জানতে চেয়ে কয়েকবার চিঠিও দেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে সহকারী একান্ত সচিবের স্বাক্ষরে এ চিঠি পাঠানো হয়। কয়েকদিন পরেই মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ থেকে প্রেরিত চিঠিতে পূর্বের নির্দেশ উল্লেখ করে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ বর্ণিত অঙ্গীকার পূরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো ইতিমধ্যে কি কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছ তা প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করানোর নির্দেশ দেয়া হয়।

অক্টোবরের প্রথম দিকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগকে কেন্দ্র করে প্রশাসনে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দেয়। এই নিয়োগকে কেন্দ্র করে জন্ম নেয় নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব। নবীনরা দাবী করে এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে পদোন্নতির জট। নবীনরাতো বটেই, মধ্য পর্যায়ের প্রবীন কর্মকর্তাদের পদোন্নতিও এতে আটকে থাকছে। এ দ্বন্দ্বের দোলাচলে পড়ে প্রশাসনে নেমে আসে স্থবিরতা। সরকারি চাকরিতে যোগদানের পর সবার মধ্যে একদিন প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে। এটা যুগ যুগ ধরে ঘটে আসা দৃষ্টান্ত কিন্তু প্রশাসনে অভিজ্ঞ কর্মকর্তার শূন্যতার অজুহাতে হাসিনা সরকার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ অব্যাহত রাখে।

হাসিনা সরকারের আমলে প্রশাসনের সর্বাধিক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়। বিগত জাতীয় পার্টির শাসনামলে হাসান আহমদ, হেশান আহমদ এবং প্রতিরক্ষা সচিব জামাল আহমদ, বিএনপির শাসনামলে নাজিম আহমদ, আবু হেনা, মূখ্য সচিব আ.ন.ম. ইনসুফ, স্বরাষ্ট্র সচিব নাসিম উদ্দিন আহমদ, অর্থসচিব আজিম উদ্দিন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর খোরশেদ আলম চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছিলেন। আর হাসিনা সরকার ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে কমপক্ষে ৭১টি চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করেন।

চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রশাসনের মধ্যপর্যায়ের পদোন্নতিযোগ্য কর্মকর্তাদের হতাশ করে। তাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অভিযোগ আছে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে সব সময়ই রাজনৈতিক বিবেচনায় করা হয়ে থাকে। যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতার কথা বলা হলেও এক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনাই মূখ্য। জুনিয়র কর্মকর্তাগণ প্রমোশন পেয়ে সিনিয়র হবেন এবং প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে যাবার সুযোগ পাবেন। একজন সচিব চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হলে অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব, উপ-সচিব এবং সহকারী সচিব পর্যায়ে ৪ জন কর্মকর্তার পদোন্নতি বাধাগ্রস্থ হয়। অন্যদিকে অবসরগামী একজন অতিরিক্ত সচিবের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের কারণে তার অধঃস্তন ও এ পর্যায়ের কর্মকর্তার মনঃক্ষুণ্ণের কারণ হয়। অব্যাহত চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ফলে সরকারি উচ্চ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয় ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৮ সালে হাসিনা সরকার সচিব ও অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ে কয়েকজন কর্মকর্তাকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়। ফলে বাংলাদেশ প্রজন্মের ক্যাডার কর্মকর্তাদের চুক্তিভিত্তিক ১১ জন সচিবের কারণে ৪৪ জন এবং চুক্তিভিত্তিক ৭ জন অতিরিক্ত সচিবের কারণে ২১ জন কর্মকর্তার প্রমোশন আটকে যায়।

নভেম্বর মাসে বেশ কয়েকজন সিনিয়র অফিসারকে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়। তারা হলেন পররাষ্ট্র সচিব মোস্তাফিজুর রহমান (২ বছরের জন্য), ভারতের নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত

www.pathagar.com

সিএম শফি শামী (২ বছর), বহিঃসম্পদ বিভাগের সচিব মসিহউর রহমান (আড়াই বছর), মন্ত্রী পরিষদ সচিব আতাউল হক, স্থানীয় সরকার সচিব হাসনাত আব্দুল হাই, স্বরাষ্ট্র সচিব সফিউর রহমান, পরিকল্পনা কমিশন সদস্য লুৎফর রহমান, দুর্নীতি দমন ব্যুরোর ডিজি খান মোহাম্মদ আলীম আলী। এ অবস্থায় ক্ষুব্ধ প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা অন্যান্য ক্যাডারের সমন্বয়ে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বন্ধের দাবীতে আন্দোলনে নামে। ক্ষুব্ধ নেতারা ১৭ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কাছেও তাদের দাবীর কথা তুলে ধরে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন, বিভিন্ন ক্যাডারের পদোন্নতি, আন্তঃক্যাডার বৈষম্য এবং বেতন বৈষম্য দূরীকরণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

একটি প্রগতিশীল জবাবদিহিমূলক, সংবেদনশীল এবং রুচি ও জ্ঞান-গরিমায় সুউচ্চ মানদন্ডের প্রশাসনিক ব্যবস্থা যে কোন একটি স্বাধীন দেশের জন্যে আশীর্বাদ হিসেবেই গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু আওয়ামী সরকারের শাসনামলে এরূপ কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা দেশে ছিল না। আওয়ামী শাসনামলের প্রথম দিক থেকেই আমলাতান্ত্রিক বিরোধ তুঙ্গে উঠে। ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ মন্ত্রিসভার বৈঠকে কোন রাখঢাক না করেই স্পষ্টভাবে বলা হয়, 'বর্তমান জটিল আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকারি কাজকর্মে যেমন দীর্ঘসূত্রিতার জন্ম হয়, তেমনি জনগণকে হতে হয় হয়রানির শিকার।' মন্ত্রিসভার নির্ধারিত সাপ্তাহিক বৈঠকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগের ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের কার্যক্রমে অগ্রগতি নিয়ে আলোচনাকালে এমন কতগুলো বিষয় উঠে আসে যা পুনর্বার সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেয় সার্বিক প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে হলে প্রচলিত আমলাতন্ত্রের খোলনলচে বদলাতে হবে। বৈঠকে স্পষ্ট করে বলা হয়, 'কোন বিষয়ের ওপর একটি ফাইল চালু করলে সহকারী সচিব হতে শুরু করে সচিব পর্যন্ত ৬টি স্বাক্ষরের পর মন্ত্রীর কক্ষে তা যখন ফেরত আসে তখন অনেক ক্ষেত্রে সাক্ষরের আর জায়গা থাকে না। নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অযৌক্তিক দীর্ঘসূত্রিতা, ফাইল চালাচালিতে ঢিলেমী, উন্নয়ন কার্যক্রমসহ অনেক জরুরী সরকারি সিদ্ধান্ত নিরসনে সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে আমলানির্ভর প্রশাসনিক সংস্কার কমিটিকে দায়িত্ব প্রদানের বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে গুঞ্জন ওঠে। বৈঠকে ডাক, টেলিযোগাযোগ, গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অবশ্যই বর্তমান সরকারি সিদ্ধান্তের পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে। অন্যথায় কোন সরকারই ক্ষমতায় এসে ৫ বছরের মেয়াদের মধ্যে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারবে না। সচিবালয়ের কার্যক্রমে সচিবালয়ের নিয়ম পদ্ধতি লঙ্ঘিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে বৈঠকে বলা হয়, সচিবালয়ের নিয়মানুযায়ী ২৪ ঘন্টার মধ্যে ফাইল ছেড়ে দেয়ার কথা থাকলেও সেখানে দীর্ঘ দিন ফাইল আটকে রাখা হয়। (সূত্রঃ দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)

মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনেক নীতিকথা বলা হলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা রোধে কার্যকর কোন ব্যবস্থা গৃহীত বা বাস্তবায়নের দৃষ্টান্ত দেখা যায়নি। আওয়ামীরা ক্ষমতায় বসে জনগণকে দেখানোর জন্য 'রুলস অব বিজনেস' প্রণয়ন এবং জনপ্রশাসন সংস্কার কমিটি গঠন করে ঔপনিবেশিক পদ্ধতির আমলাতন্ত্রের গায়ের ওপর একটি বড় ধরনের জব্দি অভিযানের ঢেউ ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু জনপ্রশাসনের সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যানদ্বয়ের পদত্যাগ এবং সর্বস্তরে যথাযথভাবে রুলস অব বিজনেস অনুসরণ না হওয়ার প্রেক্ষাপটে প্রচলিত ব্যবস্থাই তাদের শাসনামলের শেষদিন পর্যন্ত ছিল। আওয়ামী শাসনামলে প্রতিটি সরকারি উন্নয়ন কার্যক্রমে জটিলতা সৃষ্টির প্রবণতাই দিনে দিনে প্রকট হয়ে উঠেছে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে,

www.pathagar.com

সরকার প্রধানের সিদ্ধান্ত পর্যন্ত অনেক সময় উপেক্ষিত হয় আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতার কারণে। আওয়ামী সরকারের তিন বছরের মাথায় বেসামরিক প্রশাসনের শীর্ষ পদগুলোতে প্রচলিত বিধিবিধানের তোয়াক্কা না করে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দান অব্যাহতভাবে চলে। একই সাথে সরকারের রাজনৈতিক বিরাগভাজন কর্মকর্তাদের বাধ্যতামূলক অবসরদান থেকে শুরু করে নানা ধরনের নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাও নেয়া হয়। নির্বিচারে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রবণতা এতোটাই বৃদ্ধি পায় যে, খোদ প্রেসিডেন্টকেও পর্যন্ত এ ব্যাপারে বক্তব্য রাখতে হয়। এরপরও সরকার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগদান অব্যাহত রাখে। আওয়ামী সরকারের আড়াই বছরে সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিব পর্যায়ের ৫৬ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১৫ জনই ছিল চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত। এর বাইরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সচিব মর্যাদার একাধিক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দান করা হয়। সচিব পর্যায়ের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব কাজী শামসুল আলম, সংসদ সচিব কাজী মনজুরে মাওলা, বিশ্বব্যাংকের বিকল্প নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ আহমদ, বিপিএসফটিসির রেক্টর ড. একরাম হোসেন, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য মোহাম্মদ ইনামুল হক ও ড. লুৎফুর রহমান, পররাষ্ট্র সচিব সিএম সফি শামী, স্বরাষ্ট্র সচিব সফিউর রহমান, যুব ও ক্রীড়া সচিব এএসএম শাহজাহান, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব ডঃ মসিউর রহমান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইন উপদেষ্টা আলী কায়সার হাসান মোর্শেদ, বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব গোপী মোহন মন্ডল, বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রণালয়ের সচিব চৌধুরী মোহাম্মদ মহসিন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব সাখাওয়াত হোসেন, বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান সিরাজুদ্দিন আহমদ প্রমুখ। এনজিও ব্যুরোর মহাপরিচালক মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন পাঠান, বিসিআইসির চেয়ারম্যান আনোয়ারুল হকসহ আরো কয়েকজন কর্মকর্তাকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দান করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিদেশে বাংলাদেশের ৪৮টি কূটনৈতিক মিশন প্রধানের মধ্যে ১৭ জনই চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত ছিলেন। তাদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কেএম শোয়াব উদ্দিন, ভারতে নিযুক্ত হাই কমিশনার মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ, ব্রাসেলসে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত এএসএম খায়রুল এনাম, সৌদী আরবে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত আব্দুল মোমিন চৌধুরী, নেপালে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মহিউদ্দিন আহমদ অন্যতম ছিলেন। এছাড়া আওয়ামী অনেক নেতাকেও বিভিন্ন দেশে চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্রদূত বা হাই কমিশনার পদে নিয়োগ দেয়া হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন আতাউর রহমান খান কায়সার (মস্কো), মমতাজ হোসেন (ব্রুনেই), ওয়াজেদ আলী খান পন্নী (মালয়েশিয়া), শৈলা জামান (স্পেন), ওসমান সরওয়ার আলম চৌধুরী (সংযুক্ত আরব আমিরাত), কামরুজ্জামান (মরক্কো)। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ১৭ আগষ্ট ১৯৯৯)

২৫ এপ্রিল ১৯৯৯ দৈনিক দিনকালের এক খবরে বলা হয়, সরকারি কর্মকর্তাদের কর্মস্থল হিসেবে গাজীপুর জেলা এখন মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শাসক দলীয় লোকজনের হাতে সেখানে গত কয়েকমাসে কমপক্ষে ১০ জন সরকারি কর্মকর্তা লাঞ্ছিত হয়েছেন। এসব কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন, পৌরসভার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা ডিবির দারোগা, এএসপি, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, নির্বাহী কর্মকর্তা, ভূমি কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন পদমর্যাদার সরকারি কর্মকর্তা। জানা গেছে, স্থানীয় শাসকদলীয় লোকজনের কথামত কাজ না করায় তাদেরকে নিগৃহীত হতে হয়েছে।

আওয়ামী সরকারের তিন বছরের মাথায় সচিবালয়কে মেধা শূন্য করার পাঁয়তারা চলে। শুধু তাই নয়, সচিবালয়ের ৯৭১টি পদের ৮১৫টি অর্থাৎ ৮৪ শতাংশ পদ একটি বিশেষ

www.pathagar.com

ক্যাডারের দখলে চলে যায়। উপ-সচিব পদে ৭০ থেকে ৭৫ শতাংশ পদ রিজার্ভ করে রাখা হয় এ বিশেষ ক্যাডারের জন্যে। গণপদোন্নতিসহ সরকারের শীর্ষ পদগুলোও এ ক্যাডারের দখলে দেয়া হয়। সচিবালয়ের উপ-সচিব ও তদুর্ধ পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক অসম কোটা পদ্ধতি নীতিমালা অবলম্বন করা হয়। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভায় এ নিয়ে তোলপাড় হয়। কমিটি বিষয়টি যাচাইয়ের উদ্যোগও নেয়। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির দ্বাদশ বৈঠকের কার্যবিবরণীতে সচিবালয়কে মেধাশূন্য করাসহ একটি বিশেষ ক্যাডারে পদোন্নতি নিয়োগ সম্পর্কে উদ্বেগজনক তথ্য পাওয়া যায়। সভায় প্রকৃচি-বিসিএস কেন্দ্রীয় সমন্বয় পরিষদের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার সূত্র ধরে জানানো হয়, 'সচিবালয়কে পরিকল্পিতভাবে মেধা শূন্য করার যে প্রক্রিয়া চলছে, তা প্রধানমন্ত্রীকেও জানানো হয়েছে। স্থায়ী কমিটিকেও অবগত করানো হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রতিকার হয়নি।' সভায় জানানো হয়, '১৯৯২ সালে পদ না থাকা সত্ত্বেও ৮৪১টি অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করে গণপদোন্নতি দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে বেশিরভাগই হলো একটি বিশেষ ক্যাডারের কর্মকর্তা।' সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২১ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালের আদেশে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের বিভিন্ন পর্যায়ের ৩২১টি পদ উন্নীত করে আন্তঃক্যাডার ও পেশার বৈষম্য আরো একধাপ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। প্রকৃচি-বিসিএস কেন্দ্রীয় সমন্বয় পরিষদের আন্দোলনের ফলে আদেশটি স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে তা বাতিল করা হয়নি। এদিকে ১৯৭৭ সালে বিসিএস প্রশাসন-এর সর্বমোট পদ ছিল ৯৮১টি। ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত সাড়ে ৫ হাজারে সম্প্রসারিত হয়। অথচ অন্য কোন ক্যাডারে এর একাংশও সম্প্রসারিত হয়নি। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও বিশেষ ক্যাডারের পদসহ সচিবালয়ের অধিকাংশ পদই এ ক্যাডারের দখলে দেয়া হয়। ১৯৯৮ সালের ৫ জুলাই পর্যন্ত সচিবালয়ের যে ৯৭১টি পদ পূরণ হয় তার মধ্যে ৮৮৫টি পদই ছিল বিসিএস প্রশাসনের অর্থাৎ শতকরা ৮৪ ভাগ পদই তারা দখল করে নেয়। সচিবালয়ের উপ-সচিব পদে প্রশাসন ক্যাডারের জন্যে ৭০ থেকে ৭৫ ভাগ পদ রিজার্ভ করে রাখার অভিযোগটিও সভায় পর্যালোচনা করা হয়। আন্দোলনের মাধ্যমে মতিন কমিটির রিপোর্ট বাতিল করা হলেও সেই রিপোর্টকে ভিত্তি করেই এসব করা হয় বলে সভায় অভিযোগ করা হয়। পানি উন্নয়ন বোর্ড, পিডিবিসহ বিভিন্ন সংস্থার এমন অনেকেই ছিলেন যারা গত ২০ বছর ধরে চাকরি করেছে কিন্তু এই পদোন্নতির ভাগীদার হতে পারেনি। কৃষিতেও একই অবস্থা ছিল। বিসিএস হেলথ-এর অবস্থা আরো খারাপ ছিল। ১৯৭৭ সালে যারা বিসিএস প্রশাসনে যোগ দিয়েছিল তাদের প্রায় সবাই ছিলেন উপ-সচিব। শুধু তাই নয় এদের অনেকেই যুগ্ম সচিবও হয়েছেন। অন্যদিকে ১৯৭৭ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং এগ্রিকালচার বা হেল-এ যারা যোগ দিয়েছেন তাদের অধিকাংশই জীবনের প্রথম পদোন্নতিও পাননি। সভায় প্রকৃতি নেতৃবৃন্দ জানান, বিসিএস প্রশাসন ক্যাডার ছাড়া অন্যান্য ক্যাডারের সুনির্দিষ্ট কার্যাদির কথা বলা আছে। কিন্তু প্রশাসন ক্যাডারের তেমন কোন সুনর্দিষ্ট কার্যের কথা উল্লেখ নেই। তারা যখন চাকরিতে যোগদান করে তখন দুটি কাজই নির্দিষ্ট থাকে। একটি হচ্ছে ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথবা ল্যান্ড এডমিনিস্ট্রেশন এবং অন্যটি হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেসি। তারা যখন পদোন্নতি পেয়ে ডিসি হন তখন এ দুটির একটির সাথে অপরটির সম্পৃক্ততা থাকে। কিন্তু তারপরে যখন উপ-সচিব হন, তখন তাদের ম্যাজিস্ট্রেসিও থাকে না, ল্যান্ড এডমিনিস্ট্রেশনও থাকে না। সভায় প্রশাসন ক্যাডারের কার্যাদি সুনির্দিষ্ট করার পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়। (সূত্রঃ দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা ২ ডিসেম্বর ১৯৯৯)

www.pathagar.com

আওয়ামী শাসনামলে প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে। বিস্তার করে ডালপালা। দুর্নীতির গ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন পথই খোলা ছিল না। একেবারে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে সহজভাবে, স্বাভাবিকভাবে কোন কিছুই সম্পন্ন করার উপায় ছিল না। সাধারণ মানুষ দুর্নীতিগ্রস্থ প্রশাসনের কাছে জিম্মি, অসহায় ছিল। দুর্নীতি দমনের জন্য দুর্নীতি দমন ব্যুরো রয়েছে। দুর্নীতি দমন ব্যুরো থেকে মামলা মোকদ্দমা কম হয়নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবকিছু যেন চোরাবালিতে হারিয়ে গেছে। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ২০০০ সালের প্রথম পর্যন্ত সরকারি প্রায় আড়াইশ গেজেটেড কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন ব্যুরো চার্জশীট দেয়। এছাড়া প্রতিদিনই দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ আসে। মাঠ পর্যায়ে কর্মরত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), থানা পশু পালন কর্মকর্তা (টিএলও), থানা শিক্ষা কর্মকর্তা (টিইও), প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, (পিআইও), থানা প্রকৌশলী, থানা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (টিএইচএফপিও), থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা (ওসি), ভূমি কর্মকর্তা (এলও), রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি), শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ, থানা ও জেলা পর্যায়ের প্রকৌশলী, বিভিন্ন জেলার সিভিল সার্জন, খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তা, মৎস্য কর্মকর্তা, ভূমি কর্মকর্তা, সাব রেজিষ্ট্রার, শিক্ষা কর্মকর্তা, পুলিশের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা এবং জেলা পর্যায়ের শতাধিক কর্মকর্তা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের জেলা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাসহ এ ধরনের বহু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, উৎকোচ গ্রহণ, ক্ষমতার অপব্যবহার, অসৌজন্যমূলক আচরণ, স্বজনপ্রীতি, অবৈধ প্রভাব ইত্যাদি নানা ধরনের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল। প্রতিনিয়তই প্রচুর অভিযোগ আসে বিভিন্ন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তার কাছে এবং বহু ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় ও বিভাগে একাধিক অভিযোগ করেও কোন কাজ না হওয়ায় অভিযোগকারীরা দুর্নীতি দমন ব্যুরোর আশ্রয় নিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে অভিযোগ তদন্ত করে প্রমাণ পাওয়ার পর দুর্নীতি দমন ব্যুরোতেও পাঠানো হয়। দুর্নীতি দমন ব্যুরো প্রয়োজনীয় অনুমতি সাপেক্ষে তদন্তে প্রমাণিত দোষীদের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করেছে। সরকারি চাকরি বিধি অনুযায়ী সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ছাড়া বিভাগীয় প্রশাসনিক বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সুপারিশে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের শৃঙ্খলা শাখা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। অর্থ আত্মসাত, সরকারি আর্থিক লোকসান সংক্রান্ত অভিযোগগুলো তদন্ত করে দুর্নীতি দমন ব্যুরো। গেজেটেড অফিসার থেকে উর্ধ্বতন সকল কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রধানমন্ত্রীর অনুমতির প্রয়োজন হয়। অপরদিকে ২০০১ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের ভিআইপিদের বিরুদ্ধে ২৩টি দুর্নীতির অভিযোগ দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে ফাইলবন্দী হয়েছিল। অনুমতির অভাবে এসব মামলা দায়ের করা সম্ভব হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে অনুমতির অপেক্ষায় দীর্ঘদিন পড়ে থাকা এই ফাইলগুলোকে ব্যুরো কর্মকর্তারা প্রক্রিয়াধীন বলে বিবেচনা করেন। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া অপর ১৭টি মামলা তদন্তের অভাবে পড়ে ছিল। অনুমতির অভাবে পড়ে থাকা অভিযোগগুলোর মধ্যে আওয়ামী সরকারের কয়েকজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ ছিল। এছাড়াও এসব দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা এবং এমপি। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী ব্যুরোতে এ ধরনের ৭৮টি অভিযোগ তদন্তের জন্য পড়ে ছিল। এর মধ্যে মাত্র নয়টির তদন্ত কাজ স্থগিত হয় উচ্চ আদালতের নির্দেশে। অবশিষ্টের মধ্যে ২৩টি অভিযোগ সরকারি মঞ্জুরি আদেশের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ছিল। (সূত্রঃ দৈনিক যুগান্তর ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০০ ও জুন ২০০১)

www.pathagar.com

মুজিব পূজায় কোটি কোটি টাকা

১৯৯৬ সালের ২৩ জুন থেকে ১৫ আগষ্টের দূরত্ব ছিল মাত্র ৫৩দিন। এই ৫৩ দিনে জনগণ দেখল ১৫ আগষ্ট পালনের নামে রাস্তা-ঘাট, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ সব জায়গায় সরকারের লিখিত নির্দেশে সরকারি অর্থ ব্যয়ে মিলাদ মাহফিল, গরু জবাই, লাইটিং, স্মরণিকা ছাপানোর নামে চাঁদা আদায়, সরকারি দলের মন্ত্রী-এমপি-চাঁইদের গাড়ীর মিছিল করে শোক পালনের বহর। বিটিভি হয়ে গেল এটিভি। স্বপ্নলোকে চলে গেলেন বিটিভির সকল কর্মকর্তা। 'মুজিব' 'মুজিব' চিৎকারে প্রকম্পিত হলো রামপুরাস্থ টিভি ভবন।

১৯৯৭ সালে ১৫ আগষ্ট পালন পূর্বের ১৫ আগষ্ট পালনের সাথে ছিল অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেই সঙ্গে নতুন নতুন আইটেম যোগ হয়েছিল। যেমন-গোপালগঞ্জে মুজিবের 'মাজার' পুলিশ দিয়ে ঘেরাও করে রেখে মন্ত্রীপরিষদের সকল সদস্যকে নিয়ে জিয়ারত, মুজিবের নামে মূর্তি তৈরি, ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাড়িতে সকল সরকারি কর্মকর্তার বাধ্যতামূলক উপস্থিতি, শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখা, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা-মসজিদে মুজিবের জীবনীর উপরে আলোকপাত করার জন্য নির্দেশ জারি প্রভৃতি। শোনা গেছে তথ্যমন্ত্রী নাকি মুজিবের মৃত্যুবার্ষিকী পালনের খবর সর্বক্ষণ প্রচার ও মুজিবের নামে কোটি কোটি টাকার অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য নিজ দফতর ত্যাগ· করে বিটিভি ভবনে সর্বক্ষণ কাটিয়েছিলেন। মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব পালনের নামে তিনি মুজিব-প্রচার কর্মসূচি নিয়ে ছিলেন মহাব্যস্ত। সরকারের ১৫ আগষ্টের মহাআয়োজন দেখে কিছু অসাধু প্যাকেজ নির্মাতা বিকৃত তথ্য দিয়ে মুজিবকে ঘিরে কয়েকটি নাটকও নির্মাণ করেছিল-যা বিটিভিতে প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গণধিক্কার পেয়েছে। জনগণকে ক্ষুব্ধ ও ক্রোধান্বিত করেছে।

২৫ জুলাই ১৯৯৭ বাচসাস চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন পুরস্কার '৯৫ বিতরণ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তথ্য প্রতিমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, অচিরেই গাজীপুর জেলার কবিরপুরে ৫শ'একর জমিতে একটি স্বতন্ত্র আধুনিক চলচ্চিত্র নগরী গড়ে তোলা হবে। এর নামকরণ করা হবে বঙ্গবন্ধু চলচ্চিত্র নগরী।

২২ জানুয়ারি ১৯৯৮ জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের জয়নাল হাজারীর এক প্রশ্নের উত্তরে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের জানান, ধানমন্ডিতে ৩২ নং রাস্তা এলাকায় প্রায় ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতি অঙ্গন' এবং টুঙ্গিপাড়ায় 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে স্মৃতি সৌধ নির্মাণ প্রকল্পের' জন্য প্রায় ২ কোটি ৮০ লাখ টাকা ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছে।'

১৭ মার্চ শেখ মুজিবের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিটিভি চলে গিয়েছিল স্বপলোকে। দৈনন্দিন সকল প্রচার বাদ দিয়ে আট ঘন্টা অনুষ্ঠানের মধ্যে কেবলমাত্র রবীন্দ্র সংগীত, কার্টুন ও রবিনহুড ছাড়া বাকী ছয় ঘন্টা মুজিব বন্দনা প্রচার করা হয়। অনুষ্ঠানগুলোতে মুজিবের একটি প্রাট্রেট রাখা হয়। বিটিভি'র বাংলা ও ইংরেজী খবর দেখে মনে হয় ১৭ মার্চ দেশে কোনো ঘটনা ঘটেনি। সব মুজিবের জন্ম দিন উপলক্ষ্যে হয় থেমে গিয়েছিল না হয় এ নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

www.pathagar.com

রাত ৮টার বাংলা ও ১০টার ইংরেজী খবরের পুরোটাই ছিল মুজিব বন্দনা। ৮টা ৩০ মিনিটের বাংলা খবরের ২৩ মিনিটই ছিল মুজিবকে নিয়ে। কাজী আবু জাফর সিদ্দিকীর রচনা ও আব্দুল্লাহ আল মামুনের নির্দেশনায় স্বপ্ন ও কল্পনানির্ভর অনুষ্ঠান দেখানো হয় বিটিভিতে। সেখানে দেখা যায়, একটি কিশোর ঘুমিয়ে যমুনা সেতু তৈরির স্বপ্ন দেখছে। এ কিশোর হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এ স্বপ্নের পর আবার দেখানো হয় সেই বস্ত্র দানের সরস কাহিনী। এভাবে স্বপ্ন ও মুজিব বন্দনার মধ্য দিয়ে শেষ হয় ৩০ মিনিটের অনুষ্ঠানটি। এরপর ৯টায় শুরু হয় মার্চের উত্তাল দিনগুলো। যথারীতি এ অনুষ্ঠানে পুরোটা জুড়েই ছিল মুজিব বন্দনা। তবে অনুষ্ঠানের ধারাভাষ্যকার বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক শেখ মুজিবুর রহমান। আরো মজার বিষয় হলো, ১৯৭১ এর ১৭ মার্চ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ভাষ্যকার বলেন, সেদিন ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে দেশী-বিদেশী সাংবাদিকরা এসেছিলেন মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তাদের সঙ্গে আলাপকালে মুজিব বলেন, ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ আমার জন্ম। আমি জীবনে কখনো জন্মদিন পালন করিনি ....। অন্যদিকে রাত ১১টা ৩০ মিনিটের বাংলা ও ইংরেজি সংবাদ নির্ধারিত সময়ের ১০ মিনিট পর প্রচার করা হয়। খবরের সময় তথ্য প্রতিমন্ত্রীর রচিত একটি গান পরিবেশন করা হয়। মুজিবকে নিয়ে লেখা এ গানটি সাদী মোহাম্মদ সুর দিয়ে নিজেই গেয়েছেন। গানটি শেষ হতে ১১টা ৪০মিনিট বাজে। নির্ধারিত খবর বাদ দিয়ে গান প্রচারের ঘটনা নজিরবিহীন। তারপর শুরু হয় খবর। লক্ষ্যণীয় ৮টা, ১০টা এবং সর্বশেষ বাংলা ও ইংরেজি খবরে একই আইটেম ঘুরে ফিরে দেখানো হয়। ১০টার খবরের পর জন্মদিন উপলক্ষ্যে যে অনুষ্ঠান দেখানো হয় তা ছিল খবরে প্রচারিত অংশসমূহের পুনরাবৃত্তি।

১৯৮৫ থেকে '৯৬-এর ২৩ জুনের পূর্ব পর্যন্ত 'যমুনা বহুমুখী সেতু' নামটি ব্যবহৃত হলেও আওয়ামীরা ক্ষমতা গ্রহণ করে যমুনার পূর্বে বঙ্গবন্ধু যুক্ত করে বঙ্গবন্ধু যমুনা বহুমুখী সেতু নামকরণ করে। কিছুদিন পরে বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু তারপর মূল যমুনা শব্দটি বাদ দিয়ে করা হয় বঙ্গবন্ধু সেতু। অর্থাৎ আজীবন জনগণের লালিত প্রবাদ 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা' থেকে যমুনা হাইজ্যাক হয়ে যায়।

৮ জুলাই ১৯৯৮ জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণ করে ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিস ইন এগ্রিকালচারকে (ইপসা) বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করার বিধান বিল ১৯৯৮ পাস করা হয়। অপরদিকে ১৫ জুলাই দেশের চারদিক যখন বন্যার পানিতে নিমজ্জিত, তখন রাজধানীতে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে আওয়ামী সমর্থিত শান্তি ও সম্প্রীতি কমিটি এক বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা প্রদান করে প্রধানমন্ত্রীকে।

জুলাই মাসের শেষের দিকে কূটনৈতিক প্রটোকল ভঙ্গ করে শেখ হাসিনা কলম্বোতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফসহ সার্ক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে কলম্বোর হোটেল কক্ষে শেখ মুজিবের ছবি টানিয়েছিলেন। এমনকি তিনি অন্য সরকার প্রধানদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কক্ষে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে সেখানেও তার পিতার ছবি লাগিয়েছিলেন। আলোচনা শেষে তার প্রটোকলের লোকেরা ছবিটি আবার ফিরিয়ে নিয়ে যান।

সংরক্ষিত সরকারি অফিসের দেয়াল বা ভেতরে কোনো ভবনে কোনো রকম পোষ্টার সাঁটানো নিষিদ্ধ হলেও ১৫ আগষ্ট মুজিবের মৃত্যু বার্ষিকীকে কেন্দ্র করে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সচিবালয়ের দেয়ালে শেখ মুজিবের বহু আকৃতির পোষ্টার সাঁটানো হয়।

www.pathagar.com

১৫ আগষ্টকে সামনে রেখে আওয়ামীদের দু'মাস বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিয়ে মহাব্যস্ত থাকার কথা এখনও কেউ ভুলতে পারেনি। জাতীয় শোক দিবস পালনের নামে বন্যার্তদের বাঁচাতে মনোযোগ না দিয়ে আওয়ামী প্রধানমন্ত্রীর অধীনস্থ তথ্য মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতরের উদ্যোগে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নানা বর্ণের ও নানা ভাষার বর্ণাঢ্য পোষ্টার ছেপে দেয়া হয়েছিল দেশের সর্বত্র। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী তথ্য মন্ত্রণালয় ৫ ধরনের পোষ্টার ছেপে দিয়েছিল এবং ৭ রঙা পোষ্টার আওয়ামীদের উদ্যোগে প্রকাশ পেয়েছিল। কয়েকটি ছাড়া সকল জাতীয় দৈনিকে শেখ মুজিবের মৃত্যুবার্ষিকীর ক্রোড়পত্র দেয়া হয়। এসব ক্রোড়পত্রের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বিজ্ঞাপন দিতে হয়েছে। ক্রোড়পত্র ছাড়াও অধিকাংশ দৈনিকের প্রথম পাতায় রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকের বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। এসব বিজ্ঞাপনে শেখ মুজিবের বিশাল ছবি দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলী জানানো হয়। সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক, শিল্প ঋণ সংস্থা, বিভিন্ন কর্পোরেশন এবং সংস্থার বিজ্ঞাপনে শুধু মুজিবের পোর্ট্রেট দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলী জানানো হয়। পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বাবদও প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় হয়। বিআইডব্লিউটিসি'র বেতন বন্ধ হয়ে গেছে প্রতিষ্ঠানটির আয় নেই বলে অথচ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে হয়েছে। ঢাকা শহরে ১৫ আগষ্টে কমপক্ষে ৫শ' তোরণ নির্মাণ করা হয়। কালো কাপড়ের ব্যানার টানানো হয় হাজার হাজার। বিজ্ঞাপনী সংস্থার হোর্ডিংয়েও মুজিবের প্রতিকৃতি দেয়া হয়। শিল্পীদের নিয়ে মুজিবের বিশাল বিশাল অসংখ্য প্রতিকৃতি আঁকিয়ে বিভিন্ন অফিসের সামনে রাখা হয়। শেখ রেহানার সম্পাদনায় 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাষ্টের' (বাড়ি নং-৮, সড়ক নং-১১, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত ও গ্রাফটোন প্রিন্টার্স ৫৫/১ পুরানা পল্টন) পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ অফসেট এবং আর্ট পেপারে ছেপে 'শ্রদ্ধাঞ্জলী' নামক একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। এছাড়া প্রত্যেকটি পাড়া-মহল্লা থেকেও অসংখ্য নামে-বেনামে স্মরণিকা বের হয়। এসব মিলেও খরচ কোটি টাকার ওপর।

গোটা জাতি যখন পানির নিচে ঠান্ডায়, খাদ্যের অভাবে হাহাকার করছিল তখন বিটিভিতে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে মুজিবকে নিয়ে নতুন নতুন অনুষ্ঠান প্রচার অব্যাহত ছিল। এককথায় বিটিভি মুজিব বন্দনার অতীত সকল রেকর্ড ভঙ্গ করতে সক্ষম হয়। ১ আগষ্ট থকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মুজিবকে নিয়ে তারা বিরতিহীন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। ১৫ আগষ্টের তিন দিন পূর্বে থেকে তো বিটিভি মুজিব ছাড়া কিছুই প্রচার করেনি। ১৫ আগষ্ট ভোর ৫টা থেকে মাঝখানে কিছুক্ষণ বিরতি ছাড়া ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু ভবনে মুজিবের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। এক ঘন্টার একটি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে শুধু টিএন্ডটি বোর্ডকে কয়েক লাখ টাকা দিতে হয়। সরাসরি সম্প্রচার ছাড়াও মুজিবকে নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান, গীতি-নকশা, ভাষণ সম্প্রচার, শিশুদের অনুষ্ঠান ঢালাওভাবে প্রচার করা হয়। মুজিবকে নিয়ে বিভিন্ন প্যাকেজ প্রোগ্রাম ক্রয় করে বিটিভি। সবমিলে শুধু বিটিভির প্রচার বাবদই দুই কোটি টাকারও বেশি খরচ হয় বলে অভিজ্ঞ মহলের অভিমত। তিনদিনে হিসাব করলে বিটিভিতে 'জাতির জনক' এবং 'বঙ্গবন্ধু' নামটি উচ্চারিত হয়েছে কয়েক হাজার বার। ১৫ আগষ্ট বিটিভির ৮টার সংবাদের পুরোটা জুড়েই ছিল শেখ মুজিব। ৮ টার সংবাদে 'বঙ্গবন্ধু' বলা হয়েছে ৪৫ বার এবং 'জাতির জনক' বলা হয়েছে ৩৫ বার। অর্থ্যাৎ রেডিও-টিভির পুরো ট্রান্সমিশনে শেখ মুজিবের মৃত্যুবার্ষিকী পালনে খরচ হয়েছে কয়েক লাখ টাকা। ১ আগষ্ট থেকে শুরু করে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী প্রযোজিত 'সেই কণ্ঠস্বর' নামক

www.pathagar.com

অনুষ্ঠানটি বিটিভিতে প্রচারিত হয় রাত ৮টার সংবাদের পর। অনুষ্ঠানটির মূল প্রতিপাদ্য ছিল বিভিন্ন জনসভায় ও অনুষ্ঠানে প্রদত্ত শেখ মুজিবের ভাষণ। অনেকে মুজিবের ভাষণের কণ্ঠস্বর শুনে প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছেন, এটি নকল। কারণ মুজিবের ঠোঁট নাড়াচাড়ার সময় আওয়াজের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায়নি. এরূপ প্রমাণ হিসেবে তারা বিটিভিতে ডাবিং করে বাংলায় প্রচারিত রবিন হুড, সিন্দাবাদের কথা বলেন। বিশ্বের কোথাও একজন নেতাকে নিয়ে প্রচার মাধ্যমের মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির নজির নেই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক মহাত্মা গান্ধীর জন্ম বা মৃত্যু বার্ষিকীতে ভারতের শতাধিক চ্যানেল থাকা সত্ত্বেও সরকার বারবার তাঁর চিত্র প্রদর্শনের প্রয়োজন মনে করে না। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর রাজীব গান্ধী ক্ষমতায় এসে ব্যাপকহারে মাতৃবন্দনা করেননি। পৃথিবীর বৃহত্তম দেশর মধ্যে একটি দেশ আমেরিকা। ৫০০টি টেলিভিশনের চ্যানেলে তাদের জাতির প্রতিষ্ঠাতা জর্জ ওয়াশিংটন বা আব্রাহাম লিংকনের বন্দনা কত মিনিট করা হয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের উপর অনেক ঝড়-ঝাপটা বয়ে গেলেও তিনিইবা কত মিনিট ব্যক্তিগত কাজে টেলিভিশন চ্যানেলকে ব্যবহার করেছেন।

কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকে প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ডায়রীতে জিয়াউর রহমানের নাম উল্লেখ করা হলেও ১৯৯৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডায়রী থেকে জিয়াউর রহমানের নাম তুলে দেয়া হয়। কর্তৃপক্ষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য শীর্ষক একটি পরিচিতি ১৯৯৯ সালে ডায়রীতে প্রকাশ করেনি।

পবিত্র রমযান মাসে কৃচ্ছতা সাধনের দোহাই দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইফতার পার্টি বর্জনের আহবান জানান। অথচ ১০ জানুয়ারি ১৯৯৯ শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে এক কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করে পোষ্টার সাঁটানো হয় দেশের সর্বত্র।

সরকার জানুয়ারি ১৯৯৯ প্রথম দিকে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ার প্রায় ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে শেখ মুজিবের মাজার কমপ্লেক্স নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেয় এবং ২২ একর জমির ভূমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু এই জমির মালিকদের মধ্যে দু'টি ধারা বিদ্যমান। একটি ধারা শেখ কুদরত উল্লাহর পরিবার-পরিজন নিয়ে আর অন্যটি হচ্ছে শেখ একরাম উল্লাহর পরিবার পরিজন। এর মধ্যে শেখ কুদরত উল্লাহর ধারাটি ১৫ একর জমির মালিক। তারা এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। প্রতিবাদ স্বরূপ তারা ১৪ জানুয়ারি সকালে মাজার প্রাঙ্গণের দক্ষিণ পার্শ্বের পুরনো ভবনের শীর্ষে বিভিন্ন শ্লোগান লিখিত কালো ব্যানার ও কালো পতাকা উত্তোলন করে রাখে। কিন্তু পুলিশ ওই দিন রাত ১২টা ১ মিনিটের সময় উক্ত কালো ব্যানার ও কালো পতাকা নামিয়ে ফেলে।

২৫ জানুয়ারি একটি দৈনিকে প্রকাশিত তথ্যে মুজিব পরিবারের নামে সারাদেশে ৪২ হাজার ৩শ' ৫৬টি সংগঠনের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। খবরে বলা হয়, শেখ মুজিবের সংগঠন করতে হলে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের অনুমতি নিতে হয়। অথচ তারা যে ১ হাজার ২শ' ৩৪টি প্রতিষ্ঠানের খবর পেয়েছে তম্মধ্যে তারা অনুমোদন দিয়েছে মাত্র পাঁচশ'। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সবচেয়ে কঠিন সমস্যা মোকাবিলা করেছে। প্রতিদিন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শেখ মুজিব, বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, শেখ মনি, আব্দুর রব সেরনিয়াবত, শেখ নাসের প্রমুখের নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন চেয়ে আবেদন জমা হয়। ৫ বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মুজিব পরিবারের সদস্যদের নামে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের আবেদন এসেছে কয়েকটি। তাছাড়া আওয়ামী লীগ নেতা মনসুর আলীর নামেও কয়েকটি আবেদন পত্র জমা পড়ে।

www.pathagar.com

শেখ মুজিবের নামে মেহেরপুরে একটি তোরণ নির্মাণ করা হয় ১৮ লাখ ১৯ হাজার টাকা ব্যয় করে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে এ ধরনের কোনো প্রকল্প না থাকলেও বাংলাদেশ সরকারের টাকা দিয়ে এই তোরণ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মেহেরপুরের মুজিবনগর কমপ্লেক্স তৈরির অংশ হিসেবে 'বঙ্গবন্ধু তোরণ' নামে এটি নির্মাণ করা হয়। তোরণ প্রকল্পের আওতায় ৭ লাখ টাকা খরচ করে দু'টি মূর্তি স্থাপন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা চিরঞ্জীব করার নামে মেহেরপুরে মুজিবের নামে এ তোরণ নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়। মেহেরপুরের মুজিবনগরে বৃহদাকার একটি মুজিবনগর কমপ্লেক্স স্থাপনের সিদ্ধান্ত এর আগেই নেয়া হয়। এ কমপ্লেক্স স্থাপনের সময় সরকার পাবে কিনা সংশয় থাকায় জরুরী ভিত্তিতে 'বঙ্গবন্ধু তোরণ' তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ তোরণ নির্মাণ 'মুজিবনগর কমপ্লেক্স' পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয় (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ১২ মার্চ ১৯৯৯)

২৩ মার্চ প্রধানমন্ত্রী হোটেল সোনারগাঁয়ে তার মা বেগম ফজিলাতুন্নেসা চক্ষু সেবা প্রকল্প উদ্বোধন করে ঘোষণা করেন, বেগম ফজিলাতুন্নেসা চক্ষু সেবা প্রকল্পের কর্মকান্ড দেশের সকল জেলায় শিগগির শুরু হবে।

২৫ মার্চ ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ১৯৯৮ অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন : স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের জন্য বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব (মরণোত্তর), তাজউদ্দিন আহমদ (মরণোত্তর), ক্যাপ্টেন (অব.) মনসুর আলী (মরণোত্তর), এএইচএম কামরুজ্জামান (মরণোত্তর), আব্দুর রব সেরনিয়াবত (মরণোত্তর), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য ডক্টর আব্দুল মোসাব্বের চৌধুরী, সাহিত্যে শহীদুল্লাহ কায়সার (মরণোত্তর) এবং ক্রীড়া ও এ্যাথলেটিকের জন্য শেখ কামাল (মরণোত্তর)।

৮ এপ্রিল দৈনিক প্রথম আলোয় প্রকাশ, ঢাকার ওসমানী উদ্যানে নির্মিতব্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের নামকরণ শেখ মুজিবের নামানুসারে করার সিদ্ধান্ত। ১২ এপ্রিল শেখ মুজিবের নামে কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন চীনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং ন্যাশনাল পিপলস গ্রেসের চেয়ারম্যান লি পেং।

আ'লীগ এমপি মেজর জেনারেল (অব.) আব্দুস সালাম বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্টের চেয়ারম্যান হওয়ায় ৮ মে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জাতীয় সদর ও সকল ইউনিটে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা হেনরী ডুনান্টের সঙ্গে মুজিবেরও প্রতিকৃতি অংকনে অর্থ ব্যয় করেন।

৯ জুন ১৯৯৯ সংসদ ভবনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এম এস আকবরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ঢাকায় শিশু একাডেমী প্রাঙ্গণে মুজিব ও রাসেলের ভাস্কর্য স্থাপন করা হবে।

শেখ মুজিবুর রহমান, বেগম ফজিলাতুন্নেসাসহ প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনদের নামে গৃহীত প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১৯৯৯ অর্থ বছরের বাজেটে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এ বরাদ্দের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ ২২৮ কোটি টাকা যোগ করলে বরাদ্দ দাঁড়ায় ১ হাজার ১শ' ১৭ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহের প্রকল্পে একটি বাড়ি, একটি খামারের জন্য ২৫ কোটি, আশ্রায়ন প্রকল্পে ১১৫ কোটি, দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গৃহীত সোহরাওয়ার্দীর উদ্যানের স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পে ২৫ কোটি টাকা হিসাবে ধরা হয়নি। ২০০০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং রাজস্ব খাতের বরাদ্দ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রী এবং তার আত্মীয়-স্বজনের নামে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসহ ৩২টি প্রকল্প বরাদ্দ করা হয়। উন্নয়ন কর্মসূচি প্রায় সকল সেক্টরেই তার পিতার নামের কোনো না কোনো

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দ মিলেছে। এর মধ্যে টুঙ্গীপাড়ায় কবরে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ কমপ্লেক্স, 'মুজিব নগর কমপ্লেক্স', 'বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু'র ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্প স্থান পায়। এডিপির কৃষি সেক্টরের বন সাব সেক্টরে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক এবং বন্যপ্রাণী প্রজননকেন্দ্র' নামের একটি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয় দেড় কোটি টাকা। শেখ মুজিবের কবরে স্মৃতিসৌধ মূল কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা হয় ৫ কোটি ৯০ লাখ টাকা। প্রধানমন্ত্রীর নামে শেরে বাংলানগর 'বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র' নির্মাণের জন্য বরাদ্দ হয় ৪৩ কোটি ৭৪ লাখ টাকা। এই প্রকল্পের আরেকটি উপ-প্রকল্প 'বিশেষ এপার্টমেন্ট' নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা হয় ২৫ কোটি টাকা। যুব মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'শেখ হাসিনা যুব কমপ্লেক্স'-এর জন্য বরাদ্দ করা হয় ৩ কোটি টাকা। বন সাব সেক্টরে মুজিবনগর কমপ্লেক্স বনায়নের জন্য বরাদ্দ করা হয় ৫০ লাখ টাকা। 'বঙ্গবন্ধু ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের একটি প্রকল্পে' বরাদ্দ করা হয় ৫০ লাখ টাকা, বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতুর গাইড বাঁধ, এলাকা বনায়নের প্রকল্পের জন্য প্রায় ৪০ লাখ টাকা, বঙ্গবন্ধু সেতু একসেস রোডের জন্য ৯৫ কোটি। এই সেতুর এ্যাপ্রোচ সড়কে গ্যাস লাইন সংযোগের জন্য ৪০ কোটি, এ সেতু নির্মাণের বকেয়া বিল পরিশোধের জন্য ১শ' কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। যমুনা ব্রীজ তৈরির ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য ১৫ কোটি টাকা, রেল লাইন সংযোগের জন্য ৩৩০ কোটি টাকা, সেতু থেকে তারাকান্দি পর্যন্ত রেল সংযোগের জন্য ১৭ কোটি ৩০ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়। মুজিবনগর কমপ্লেক্স-এ ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপনের জন্য ১৯ লাখ, এখানে একটি ডাকঘর স্থাপনে ১৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা, এই কমপ্লেক্সের জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে আরো ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়' এর একটি প্রকল্পের জন্য ২ কোটি টাকা, মুজিবনগরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পিতা মরহুম মনসুর আলীর নামে সিরাজগঞ্জ শহরে একটি মিলনায়তন নির্মাণের জন্য ১ কোটি টাকা, প্রধানমন্ত্রীর ফুফাতো ভাই মরহুম শেখ ফজলু হক মনির নামে গোপালগঞ্জ শহরে একটি মিলনায়তন নির্মাণের জন্য ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। গোপালগঞ্জ সার্কিট হাউজের সম্প্রসারণ কাজ, গোপালগঞ্জ, টুঙ্গীপাড়া, পৌরসভার পানি সরবরাহের পৃথক পৃথক প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ করা হয়। গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় প্রধানমন্ত্রীর ছোট ভাই শেখ রাসেলের নামে প্রতিষ্ঠিত দুঃস্থ শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্রের নামে বরাদ্দ করা হয় ২৯ লাখ টাকা। মুজিব নগর কমপ্লেক্স-এ একটি শিশু পরিবার স্থাপন প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয় ২ কোটি টাকা। বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের নামে একটি মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমীর নামে বরাদ্দ করা হয় ৮৩ লাখ টাকা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে বঙ্গবন্ধু ফেলোশীপ এর জন্য ১ কোটি ৫০ লাখ টাকা এবং শেরেবাংলা নগর বঙ্গবন্ধু নভো-থিয়েটার প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয় ২৪ কোটি ৮ লাখ টাকা। (সূত্র ঃ দৈনিক দিনকাল ২৯ জুন ১৯৯৯)

২৮ জুন ১৯৯৯ সংসদে বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে বিরোধী দলীয় হুইপ মশিউর রহমান এমপি প্রধানমন্ত্রীর পরিবার ও তার আত্মীয়-স্বজনদের স্মৃতি রক্ষার বিভিন্ন প্রকল্পে ৩শ' ২০ কোটি ৮৯ লাখ ৫ হাজার টাকা বরাদ্দের দীর্ঘ তালিকা সংসদে তুলে ধরেন। সংসদে তিনি জানান যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বইয়ের (১৯৯৯-২০০০) ৩৮ পৃষ্ঠায় কৃষি বিভাগের মুজিব কমপ্লেক্স নির্মাণে ১ কোটি ৮৩ লাখ, ৬২ পৃষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স নির্মাণে ১৬ কোটি ৭৯ লাখ ২৪ হাজার, ২২৮ পৃষ্ঠায় ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধির লেকসহ সংলগ্ন এলাকা উন্নয়নে ১৪ কোটি ৮২ লাখ ৫৫ হাজার, ২৪৬ পৃষ্ঠায় মুজিব পর্যটন সুবিধাধি প্রবর্তনের

www.pathagar.com

জন্য ২ কোটি ৬১ লাখ ৯৭ হাজার, ২৯৪ পৃষ্ঠায় শেখ ফজলুল হক মণি স্মৃতি প্রকল্প নির্মাণে ৬ কোটি ৭০ লক্ষ ৪৩ হাজার, ২৯৬ পৃষ্ঠায় মুজিব সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনে ১৮ কোটি ১৫ লাখ, ৩৭০ পৃষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ প্রকল্পে ৩১ কোটি ৫২ লাখ, বঙ্গবন্ধু নভো থিয়েটারের প্রকল্পে ৫২ কোটি, বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব একাডেমীর জন্য ৫ কোটি ৯২ লাখ ৪ হাজার, ৩৩৮ পৃষ্ঠায় মুজিব কমপ্লেক্সের স্থাপনের জন্য ৩ কোটি ১১ লাখ, ৩৩৬ পৃষ্ঠায় টুঙ্গীপাড়ায় শেখ রাসেল কেন্দ্র নির্মাণে ৭ কোটি ২১ লাখ, ২৯৮ পৃষ্ঠায় টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য ১৫ কোটি ৬৪ লাখ ১৩ হাজার, লাইন এন্ড সাউন্ডের জন্য ৪ কোটি ৭০ লাখ ১২ হাজার এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের জন্য ব্যয় করা হবে ৩ কোটি ৫৬ লাখ ৬২ হাজার টাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যকোন কর্মসূচি না থাকলেও রাষ্ট্রীয় অর্থের অপব্যয় করে ২ জুলাই ১৯৯৯ ১১ টার সময় দু'টি হেলিকপ্টারে করে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে তার মেয়ে, মেয়ের জামাই, দু'নাতনী এবং বেয়ান-বেয়াইসহ এক সফরসঙ্গী দল টুঙ্গিপাড়া এসে শেখ মুজিবের মাজার জিয়ারত, পুষ্পমাল্য অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ করে বাদজুম্মা এ মিলাদ মাহফিলে শরিক হন।

৫ আগষ্ট ১৯৯৯ প্রধানমন্ত্রী আবাহনী ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা শেখ কামাল স্মরণে আবাহনী লিমিটেড ক্রীড়া ও এ্যাথলেটিকসের সকল বিভাগের সর্বাধুনিক সুবিধা সংবলিত ৪০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে ২২ বিঘা জমির ওপর শেখ কামাল ক্রীড়া কমপ্লেক্সের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

www.pathagar.com

আওয়ামী আমলের দলীয়করণ

আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে রাষ্ট্রের সকল সেক্টরে আওয়ামীকরণের যে সূত্রপাত শুরু করে ৫ বছরে তা জনজীবনের প্রতিটি স্তরে স্তরে শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করে। সরকারি প্রশাসনের একটিই কাজ ছিল তা হলো, মুজিবের গুণকীর্তন গাওয়া এবং আওয়ামীদের অন্যায় আবদার অক্ষরে অক্ষরে পালন করা। সর্বত্র চলেছে মুজিব ও আওয়ামীকরণের হিড়িক। ১৭ মার্চ মুজিবের জন্মদিবসে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। রাষ্ট্রের অর্থ অযথা ব্যয় করে অর্থনৈতিক অগ্রগতির কাজে বাধা দেয়া হয় প্রতিনিয়ত। আওয়ামী সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে যত্রতত্র শেখ মুজিব এবং তার পরিবারের সদস্যগণের নাম ব্যবহারের অশুভ প্রক্রিয়া চালু হয়। সবকিছুর সঙ্গে শেখ মুজিবের নাম যোগ করা হয়। এর ফলে আওয়ামী সরকারের নাম হয় 'নামকরণ সরকার।' বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্রিজ, হাসপাতাল, স্টেডিয়ামের, তোরণ, ভাস্কর্য ও প্রতিকৃতি ছিল শেখ মুজিবের নামে উৎকীর্ণ। উইলস ইন্টারন্যাশনাল কাপ ক্রিকেট উপলক্ষে নবরূপে সাজানো বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের শহীদ মুস্তাক গেটে অযথা অর্থ ব্যয় করে বিশাল আকৃতির শেখ মুজিবের প্রতিকৃতি বসানো হয়। ১৯৯৮ সালে স্টেডিয়ামের ভেতরেই শেখ মুজিবের একটি ভাস্কর্য প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন। এর বাইরে দেশের বিভিন্ন স্থানে মুজিবের মূর্তি ও প্রতিকৃতি বানানো হয়। হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এ ধরনের কার্যক্রম শুরু হলেও ১৯৯৯ সাল থেকে এ ধরনের কার্যক্রমকে দ্রুততর করা হয়। বেগম মুজিব, সুলতানা কামালের নামে নামকরণ করা হয় কলেজের ভবন এবং ইনডোর স্টেডিয়ামের নাম। কলাবাগান শিশুপার্কে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে রাসেল স্কোয়ার করা হয়।

খুলনার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি ব্রজলাল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা হোসনে আরা রুনু ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে খুলনা মহানগর মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত হন। নেত্রীবৃন্দের ছবিসহ সংবাদ স্থানীয় ও জাতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সম্মেলনের আগেও তিনি মহানগর মহিলা আওয়ামী লীগের আহবায়িকা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অথচ আইন অনুযায়ী কোনো সরকারি কর্মচারী রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারবে না। কোনো রাজনৈতিক দলের নির্বাচনেও অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না। সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধি ১৯৭৯-এর ৩০ বিধি মোতাবেক সরকারি কর্মচারীর পক্ষে রাজনীতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। (সূত্রঃ দৈনিক মানবজমিন ১ মার্চ ১৯৯৯)

১৩ আগষ্ট ১৯৯৭ আকস্মিকভাবে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজি) এম আজিজুল হককে এক মাসের বাধ্যতামূলক ছুটি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে তাকে সরিয়ে অন্য একজনকে স্থায়ীভাবে আইজিপি নিয়োগ করা হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যমতে, আইজি নিযুক্ত হবার পর তিনি নিরপেক্ষতার ওপর জোর দেন কিন্তু একজন এডিশনাল আইজি এসব ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ এবং সরকারি দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রশাসন চালাতে থাকেন। এ অবস্থায় চাকরির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই হককে বাধ্যতামূলক ছুটি দেয়া হয়।

www.pathagar.com

শক্তিশালী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধানমন্ত্রী যোগ্য লোক মাহবুবুর রহমানকে সরিয়ে ফুফা মোস্তাফিজকে সেনাবাহিনীর প্রধান করেন। এ সম্পর্কে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি সাপ্তাহিক সানডে'র ১১ জানুয়ারি ১৯৯৮ সংখ্যা ঢাকা থেকে সাংবাদিক রোজালিন রাজের পাঠানো 'ব্যারাক ইনট্রিগী' শীর্ষক প্রতিবেদনে নতুন সেনাপ্রধানের নিযুক্তিতে শীর্ষ থেকে অভ্যুত্থান হিসেবে অভিহিত করা হয়।

১৯৯৭ সালের জুনে প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ বিষয়ক উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের নেতৃত্বে একটি সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে জাতীয় সংসদের চীপ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ অষ্ট্রেলিয়া যাত্রা করেন। সিঙ্গাপুরে যাত্রা বিরতিকালে চীফ হুইপ অসুস্থতাবোধ করলে সেখানকার হাসপাতালে ভর্তি হন। চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরে তিনি বৈদেশিক চিকিৎসা ব্যয়ের কাগজপত্রসহ ৫ লাখ ৭৪ হাজার টাকার একটি বিল সংসদ সচিবালয়ে দাখিল করেন। ১৯৫০ সালের মেডিক্যাল অ্যাটেনডেন্স রুলসে বলা আছে, 'সরকার কোন বৈদেশিক চিকিৎসা ব্যয় বহন করবে না।' ফলে সংসদ সচিবালয়ের উপ-সচিব (হিসাব) চীপ হুইপের বিল অনুমোদন সম্ভব নয় বলে মতামত দেন। তিনি প্রস্তাব দেন, রুলসের ব্যত্যয় করে এ বিল কেবল সরকারই অনুমোদন করতে পারেন বিধায় এতে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন প্রয়োজন। নোটে উপ-সচিবের এ মন্তব্য করার খবর পেয়ে চীফ হুইপ অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হন এবং ঐ উপ-সচিবকে নিজের অফিসে ডেকে নিয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সামনে অপমান করেন। এরপর ঐ উপ-সচিবকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে দীর্ঘদিন ওএসডি করে রাখা হয়। এ পরিস্থিতিতে চীপ হুইপকে খুশী করার জন্য সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট যুগ্ম সচিব উপ-সচিবের মতামত নাকচ করে বিল অনুমোদনের পক্ষে মত দিলে অতিরিক্ত সচিব ও সচিব হয়ে স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর কাছে ঐ নথি প্রেরিত হলে স্পীকার তা অনুমোদন করেন। স্পীকার অনুমোদনের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন, মন্ত্রীর মর্যাদাভোগী চীপ হুইপ সংসদের বাজেট থেকে বেতন পান এবং সার্বভৌম সংসদের স্পীকার হিসেবে তিনি চীপ হুইপের বৈদেশিক চিকিৎসা বিল চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করার ক্ষমতা রাখেন। এরপর বিলটি চেকের জন্য এজি অফিসে পাঠানো হলে বেসামরিক সচিবালয়ের প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা শাহীন খান স্পীকার অনুমোদিত বিলে বিধিগত আপত্তি তোলেন। সংসদ সচিবালয়ের জোর তদ্বিরের পর বিষয়টি সিএন্ডএজি অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। অর্থ মন্ত্রণালয় পূর্বে সংসদ সচিবালয়ের উপ-সচিব যে মতামত দিয়েছিলেন সেই আলোকে ব্যবস্থা নিতে অর্থ্যাৎ প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য পরামর্শ দেন। সেই প্রেক্ষিতে এ সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী স্বাক্ষরিত একটি সার সংক্ষেপ ২২ জানুয়ারি ১৯৯৮ প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন করলে এজি চীফ হুইপের দাবীকৃত বিলের চেক ইস্যু করেন।

১ মার্চ ১৯৯৮ একদিকে রাজকীয় সফরে প্রধানমন্ত্রী হেলিকপ্টারযোগে সকাল ১০ টা ২০ মিনিটে নওগাঁ স্টেডিয়ামে এসে পৌছানোর পর ১১টা ৪১ মিনিটে সফর সঙ্গী নিয়ে সার্কিট হাউজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে শহরকে বিশেষ আঙ্গিকে সাজানো হয়। শহরের পর নওগাঁ থেকে বিসিক শিল্প নগরীর পর্যন্ত তিন কিলোমিটারেরও বেশি পথের মাঝে ২০/৩০ গজ অন্তর অন্তর প্রায় শতাধিক বিশাল আকৃতির তোরণ নির্মাণ করা হয়। প্রতিটি তোরণের জন্য ৬/৭ হাজার টাকা ব্যয় হয়। ঢাকা থেকে নেয়া হয় কলরেডির মাইক সার্ভিসকে। কলরেডির তিন ট্রাক সামগ্রীসহ সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারকে আগের দিন নওগাঁ শহরে পৌছানো হয়। প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে পূর্বের দু'দিন থেকে শহরের বিভিন্ন জেলা হতে অতিরিক্ত ১০ হাজার পুলিশ নিয়ে আসা হয়। গোয়ান্দা সংস্থার কর্মকর্তা ও সদস্য মোতায়েন

www.pathagar.com

করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর একদিনের নওগাঁ সফর ও জনসভার জন্য প্রায় এক কোটি টাকারও বেশি ব্যয় হয়। প্রধানমন্ত্রী যে সময় সফর করেছেন সে সময় নওগাঁ জেলার ১১ থানাসহ গোটা উত্তরাঞ্চলে নীরব দুর্ভিক্ষ চলছিল। নওগাঁর খেটে খাওয়া মানুষ ও কৃষকেরা অর্থের অভাবে ফসল উৎপাদন করতে পারছিল না। বিদ্যুৎ ও পানির অভাবে হাজার হাজার একর জমির ফসল নষ্ট হচ্ছিল। নওগাঁর অভাবী মানুষের এক বেলা ভাত জোটানো হয়ে পড়েছিল কষ্টকর।

২৩ মে দুপুর ১টার দিকে ছাত্রলীগের অছাত্র ক্যাডার মুন্সী সেলিম হোসেন সূর্যসেন হল গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে চাইলে কর্তব্যরত একজন পুলিশ কর্মকর্তা তাকে পরিচয় পত্র দেখানোর জন্য অনুরোধ জানান। এ সময় ওই ক্যাডার ক্ষেপে গিয়ে পুলিশ কর্মকর্তার মুখে একটি চড় বসিয়ে দেয়, গালাগাল দিয়ে বলে 'আমারে চিনস না। আমি ছাত্রলীগ করি।' ছাত্রলীগের ওই ক্যাডার শুধু পুলিশকে মেরে ক্ষান্ত হয়নি। সে টেবিলের ওপর রাখা বিভিন্ন কাগজপত্র ছিঁড়ে ফেলে দেয় এবং ওই পুলিশ কর্মকর্তাকে চাকুরিচ্যুতির হুমকি দেয়।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং বিভাগ ১৯৯৬ সালের ৪ নভেম্বর বেসরকারি খাতে নতুন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণরের নেতৃত্বে একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করে। ১৯৯৮ সালের ১৯ জুলাই কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত কমিটিতেও চেয়ারম্যান হন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর। কমিটির অন্য সদস্যরা ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব, অর্থ বিভাগের (ব্যাংকিং) অতিরিক্ত সচিব এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্ণর ড. মোহাম্মদ সোহরাব উদ্দিন। এই কমিটি বেসরকারি খাতে নতুন ব্যাংক স্থাপনের জন্য ৬১টি আবেদনের মধ্যে প্রাথমিকভাবে বাছাই করেছিল ২১টি। এর মধ্যে ৮টি ব্যাংককে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয় সেগুলো হলো এ্যারো বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যান ডঃ এইচবিএম ইকবাল এমপির 'দি প্রিমিয়াম ব্যাংক লি.', আ'লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য পাট ব্যবসায়ী আব্দুল জলিলের 'দি মার্কেন্টাইল ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল লি.' বঙ্গবন্ধু প্রকৌশল পরিষদের নেতা রিয়েল এষ্টেট ব্যবসায়ী সালাহ্ ইমন খানের 'ফাস্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লি.' ইষ্টার্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আকরামুদ্দিন আহমদের 'বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লি.', এনামুল হক চৌধুরীর 'বেঙ্গল এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক লি.', র‍্যাংগস গ্রুপের চেয়ারম্যান এ রউফ চৌধুরীর 'ব্যাংক অব এশিয়া লি.', ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ফজলে হাসান আবেদের 'ব্র্যাক ব্যাংক লি.' ব্যবসায়ী ও আ'লীগ নেতা অশোক দাস গুপ্তের 'ব্যাংক ওয়ান লি.'।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে বিরাজমান দুরবস্থা ও দুর্নীতির সংবাদ সকল গোপনীয়তা ছেদ করে প্রকাশ হয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী ও স্বাস্থ্য সচিব মোহাম্মদ আলীর প্রকাশ্য বিরোধের জের ধরে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা সেলের উপ-প্রধান মেজবাহউদ্দিনকে মন্ত্রী প্রভাব খাটিয়ে বদলির আদেশ দেন। বদলি ঠেকানোর জন্য সচিব মন্ত্রীর কাছে গিয়ে অনুরোধ করে বলেছিলেন, 'মেজবাহউদ্দিন যদি কোন অপরাধ করে থাকেন তাহলে আমি তার পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করছি। তার মতো দক্ষ লোক মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজন।' এরপরও মন্ত্রী এ বিষয়ে কোন কর্ণপাত করেননি। মেজবাহউদ্দিনের বদলির নেপথ্যে ছিল একটি ফিজিওথেরাপি কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমোদন। মন্ত্রীর একজন ঘনিষ্ঠ লোক বেসরকারি পর্যায়ে একটি ফিজিওথেরাপি কলেজের অনুমোদন চেয়ে মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন। এতে নোট দিয়েছিলেন মেজবাহউদ্দিন। মন্ত্রণালয়ের অনেকে কেবল ফিজিওথেরাপির ওপর বিষয়ভিত্তিক কলেজ স্থাপনের বিরোধিতা করেছিলেন। এ ঘটনার জের ধরে মন্ত্রী প্রভাব খাটিয়ে মেজবাহউদ্দিনকে বদলি করেন। ২ আগষ্ট ১৯৯৮ অনুষ্ঠিতব্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে মন্ত্রী-সচিবের দ্বন্দ্ব

www.pathagar.com

প্রকাশ্য রূপ লাভ করে। সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ৮০ কোটি টাকা ঋণে ৪টি কাজের মধ্যে ২টি কাজের জন্য আমি পুনঃদরপত্র আহবানের নির্দেশ দেই। ১ নম্বর ও ২ নম্বর কাজের প্রাক্কলনের তুলনায় অনেক বেশি পুনঃদরপত্র জমা পড়ায় এ নির্দেশ দেই। অথচ আমি বিদেশে থাকাকালে পুনঃদরপত্র আহবান না করে আগের দরপত্র অনুমোদন দেয়া হয়। এ সভায় সচিব বলেন, এডিবির আপত্তির মুখে যথাযথ পদ্ধতিতে দরপত্র অনুমোদন দেয়া হয়েছে। তিনি সভাকে জানান, মন্ত্রী বিষয়টি জানতেন। এ সময় মন্ত্রী বলেন, তাকে বিষয়টি জানানো হয়নি। এক পর্যায়ে সচিব মন্ত্রীকে বলেন, আপনি মিথ্যুক।

৩ আগষ্ট পার্বত্য সর্বদলীয় ঐক্য পরিষদ নেতা অদুদ ভূঁইয়ার সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় আগাম জামিন নেয়ার জন্য খাগড়াছড়িতে যাওয়ার পথে বিভিন্ন স্থানে ওঁৎপেতে থাকা সন্ত্রাসীরা হত্যার উদ্দেশ্যে হামলার চেষ্টা চালায়। এ অবস্থায় তিনি খাগড়াছড়িতে যেতে না পেরে ফিরে আসতে বাধ্য হন। পার্বত্য কালোচুক্তি বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার দায়ে সরকার তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও হয়রানিমূলক বেশ কয়েকটি মামলা দায়ের করে। সে সাথে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে তার বাসভবন ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন স্থানে পুলিশী হামলা চালায়। তাকে না পেয়ে আত্মীয়-স্বজনদের ওপর হামলা চালায়। এক পর্যায়ে তার গাড়ির ড্রাইভারকে পর্যন্ত গ্রেফতার করে ডিটেনশনে দেয়া হয়। পুলিশ তার ঢাকাস্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়। তার বড় ভাই রামগড় উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান বেলায়েত হোসেন ভুঁইয়াকে গ্রেফতার করে। তার আরেক বড় ভাইয়ের দশ বছরের শিশু পুত্র আসাদকে গ্রেফতার করে মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে পাঠায়। এছাড়া তার ৬৫ বছর বয়সী বড় ভাই শাহাবউদ্দিন ভুঁইয়া, ভ্রাতুষ্পুত্র সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র সাজ্জাদ, ৮ম শ্রেণীর ছাত্র রিয়াদ, কলেজ ছাত্র মুরাদ, ঢাকায় অধ্যয়নরত ফরহাদ ও ব্যবসায়ী দাউদুল ইসলামসহ আরো অনেক আত্মীয়-স্বজনকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে সীমাহীন হয়রানি করা হয়।

২১ আগষ্ট 'কৃষক বাঁচাও, গরু বাঁচাও' দাবীতে বদরগঞ্জ থানা সদরের মিতা সিনেমা হলের সামনে ৬ জন ইউপি চেয়ারম্যান ও সামাজিক পরিষদের ডাকে এক জনসভায় নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, ইউপি চেয়ারম্যান নিয়ে কৃষকরা যখন তাদের এলাকার গরু চুরি, খুন, ডাকাতি, মদ-জুয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে তখন এমপি আমিনুল হক চৌধুরী গরু চোরদের পক্ষ নিয়ে তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন। দেশে যে রুগ্ন রাজনৈতিক পরিবেশ বিরাজ করছে এ ঘটনা তারই বহিঃপ্রকাশ। পুলিশ রাষ্ট্রীয় বাহিনী, কিন্তু বর্তমান সরকারের কিছু নেতা পুলিশকে দলীয় বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করছে। এর পরিণতি ভাল নয়। বর্তমান সরকার জনগণের জানমাল হেফাজতে ব্যর্থ হয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে দেশ চলতে পারে না। আওয়ামী লীগের মধ্যে কতিপয় সুযোগ সন্ধানী নেতার লুটেরা চরিত্র বদলায়নি। সংসদে জবাবদিহিতা ও গণতন্ত্রের কথা বলা হয়, কিন্তু দলীয় এমপিরা নিজেদের এলাকায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও জবাবদিহিতার কথা রক্ষা করছেন না। বদরগঞ্জের কৃষকরা যখন তাদের এলাকায় ডাকাত ও গরু চোরদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে আন্দোলন করছে তখন এমপি রংপুরের পুলিশ সুপারের সহযোগিতায় আন্দোলনকামী মানুষকে লাঠিপেটা করে গুলি চালান।

৭ অক্টোবর পুলিশের জি-৭ নামে পরিচিত একটি গ্রুপ এবং সরকারের রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি অনুগত পুলিশ বাহিনীর কয়েকজন অফিসারকে পদোন্নতি দেয়ার লক্ষ্যেই তড়িঘড়ি করে ১২ জন কর্মকর্তাকে চাকরির ২৫ বছর পূর্তি দেখিয়ে অবসর দেয়া হয়। পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে পদোন্নতির পথে বাধা হিসেবে পুলিশ কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে অত্যন্ত

www.pathagar.com

কৌশলে কোন সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হয়। যাদের অবসর প্রদান করা হয় তাদের মধ্যে অতিরিক্ত আইজিপি আহমদ ফজলুল কবির (চাকরির মেয়াদ ছিল মাত্র ৩ মাস), মির্জা রকিবুল হুদা (চাকরির মেয়াদ ছিল ৫ বছরেরও বেশি), মোহাম্মদ সালাম (চাকরির মেয়াদ ছিল ৩ বছরের বেশি)। ৩ জনই সেনাবাহিনী থেকে ১৯৭৬ সালের অক্টোবরে পুলিশের চাকরিতে যোগ দেন। ৫ জন ডিআইজির মধ্যে আমিনুল ইসলাম, মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, মোঃ জিয়াউদ্দিন ছিলেন ওএসডি। তাদের চাকরির মেয়াদ বয়সের হিসেবে ৫/৬ বছরের বেশি ছিল। তবে প্রায় একই সময়ে ডিআইজি হিসেবে সামরিক বাহিনী থেকে পুলিশে যোগদানকারী অপর দু'জনের একজন আশরাফুল হুদা রেল পুলিশে এবং মনসুরুল আজিজ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অতিরিক্ত ডিআইজি হিসেবে কর্মরত ছিলেন গিয়াস উদ্দিন আহমদ। অবসরপ্রাপ্ত অপর ৩ জনের মধ্যে এসপি খাদেম হোসেন রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশে, শমসের আলম বরিশাল আরএফের কমান্ড্যান্ট ছিলেন। উল্লেখিত দুই কর্মকর্তা ১৯৭৩ সালের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারে চাকরিতে যোগ দেন। এএসপি সায়েদুল ইসলাম ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশে কর্মরত ছিলেন।

৯ অক্টোবর পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সমাপ্ত অধিবেশনে যোগদানকালে ঘোষিত আড়াইশ ডলারের হোটেল রুমে না থেকে ৭শ' ডলারের স্যুটে থাকার ব্যাপারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, 'নৈতিকভাবে আমি যেখানে থাকা উচিত মনে করেছি সেখানেই থেকেছি। যারা এসব প্রশ্ন তোলেন তারা কাজ করেন না।' পররাষ্ট্রমন্ত্রী বন্যার কারণে তিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের যোগদানকালে ৭শ' ডলারের পরিবর্তে আড়াইশ ডলারের হোটেল কক্ষে থাকবেন বলে একটি পত্রিকায় যে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন তা অস্বীকার করেন।

২৭ নভেম্বর ক্ষমতার অপব্যবহারের এক ন্যক্কারজনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আয়োজন করেন তার ছেলে আতিকুস সামাদ ও পুত্রবধূ মেরি বেলের বিবাহোত্তর সংবর্ধনা। পদ্মায় সরকারি অনুষ্ঠান ছাড়া ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিবাহোত্তর সম্বর্ধনার পারিবারিক অনুষ্ঠানটি সেখানে আয়োজন করেন।

৩ ডিসেম্বর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে পার্বত্য চুক্তির বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ বলেন, 'খালেদা জিয়া ষড়যন্ত্রের রাজনীতির প্রেতাত্মা। সোজা পথে না এলে আঙ্গুল বাঁকা করতে হবে। খালেদা জিয়া টের পাবেন কিভাবে তাকে রাজনীতি থেকে বের করে দেয়া হয়।'

গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাচনের সকল আয়োজন সম্পন্ন হওয়ার পর নির্বাচনের দুই দিন পূর্বে ২৭ ডিসেম্বর সরকার আকস্মিক এক আদেশে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ম্যানেজিং বোর্ড ভেঙ্গে আওয়ামী লীগের নেতাদের নিয়ে ১৫ সদস্যের এডহক বোর্ড গঠন করেছিলেন। পূর্বতন চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) আব্দুস সালামকেই চেয়ারম্যান হিসেবে বহাল রাখা হয়। অপরাপর সদস্যরা ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান শেখ কবীর হোসেন (প্রধানমন্ত্রীর চাচা ও সেনা প্রধানের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়), মনির হোসেন খান (ঢাকা মহানগরীর আওয়ামী লীগ নেতা), মহিউদ্দিন আহমেদ (আওয়ামী লীগ দলীয় সাবেক এমপি), আলহাজ্ব আবুল হোসেন (সাবেক এমপি লালমনিরহাট), এ সামাদ (সাবেক সভাপতি গাজীপুর আওয়ামী লীগ), মাইনুদ্দীন আহমদ (খুলনা আওয়ামী লীগ নেতা), এডভোকেট এমএ আফজাল

www.pathagar.com

(কিশোরগঞ্জ থেকে সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পরাজিত প্রার্থী), নুরুন্নবী চৌধুরী (চট্টগ্রাম স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা), মোহাম্মদ হোসেন (কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগ নেতা), কে এম হাসান (সিরাজগঞ্জ আওয়ামী লীগ নেতা), রেজাউল করিম রাজু (রাজশাহী), এডভোকেট এবিএম জাকারিয়া (নোয়াখালী), আজিজুল বারী কামাল ও ফকির আব্দুর রাজ্জাক (রাজবাড়ি আওয়ামী লীগ নেতা)। পরবর্তীতে বোর্ডের পরিবর্তন ঘটানো হয়।

১২ জানুয়ারি ১৯৯৯ নাটোরে এক জনসভায় ভাষণ দেয়ার পূর্বে প্রধানমন্ত্রী নাটোর স্টেডিয়ামের নাম পরিবর্তন করে আওয়ামী লীগের প্রয়াত সভাপতি মরহুম শংকর গোবিন্দের নামে নামকরণে করেন।

জাল এলসি ও অস্তিত্বিহীন গার্মেন্টসের নামে কমলাপুর আইসিডির মাধ্যমে অবৈধভাবে ৩ কোটি টাকার প্রায় ৩ লাখ গজ শুল্ক মুক্ত কাপড় আমদানী করে ফেঁসে যায় উপমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরীর প্রতিষ্ঠান পিআইএল বাংলাদেশ। শুল্ক কর্তৃপক্ষের ত্বরিত হস্তক্ষেপে খালাস হওয়ার প্রক্রিয়ায় কাপড়ের দু'টি বড় চালানই আটক করা হয়। জাতীয় রাজস্বরোর্ড অবৈধ কাপড়ের দু'টি বড় চালান আটক করে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেয়। (সূত্রঃ দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা ১৪ জানুয়ারি ১৯৯৯)

২৯ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর মেয়ের ননদের বিয়েতে আসা উপলক্ষ্যে গুলশান ২ নম্বরে ওয়ান্ডারল্যান্ড পার্ক শূন্য করা হয়। প্রধানমন্ত্রী যাবেন বলে সন্ধ্যার পর পার্কে ঢুকতে নিষেধাজ্ঞা ও টিকিট বিক্রি বন্ধ করে বেড়াতে আসা শিশু-কিশোরসহ লোকজনকে জোরপূর্বক বের করে দিয়ে পার্কে সন্ত্রস্ত পরিবেশ কায়েম করা হয়। পার্কের পূর্ব পাশের গুলশান ইয়ুথ ক্লাব মাঠে বিশাল শামিয়ানা টাঙ্গিয়ে উৎসবের আয়োজন করা হয়। বিকাল থেকেই ৯১ নম্বর সড়ক ও পার্কের দক্ষিণ পাশের সড়কে জনসাধারণের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়। পার্ক কর্তৃপক্ষকে সন্ধ্যার আগে পার্ক বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়। ৬টা বাজার পর গুলশান এক নম্বর থেকে দু'নম্বর পর্যন্ত কয়েক প্লাটুন পুলিশ ও কয়েক ডজন পুলিশ কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীর নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কাজে ব্যস্ত থাকে। কূটনৈতিক জোন হওয়া সত্ত্বেও ট্রাফিক পুলিশ লালবাতি উঁচিয়ে সকল গাড়িকে তড়িঘড়ি করে স্থান পরিবর্তনে বাধ্য করে।

বিএনপি সমর্থক জামালপুর জেলার ইসলামপুর থানার ৫ নং নোয়াপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের পর পর তিনবার নির্বাচিত চেয়ারম্যান শেখ মোঃ আব্দুর রশিদ আওয়ামী লীগে যোগ দিতে অস্বীকার করায় এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রতিমন্ত্রী রাশেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়ায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯)

৬ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী সমর্থক দেশের একজন শীর্ষ স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও তার স্ত্রী জয়দেবপুরে দিনভর একটি রাজকীয় গার্ডেন পার্টির আয়োজন করেছিলেন। ২৫ বিঘা জমির ওপর ওই বাগান বাড়ির পার্টিতে কমপক্ষে দু'জন মন্ত্রী, আওয়ামী লীগ এমপি ও নেতৃবৃন্দ, বিপুল সংখ্যক ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, প্রধানমন্ত্রীর বেয়াই, কূটনীতিক, পুলিশ কর্মকর্তা, সাংবাদিকসহ প্রায় ৭ হাজার মেহমান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সারাদেশের ৬১টি চেম্বারের মধ্যে ৪০টি চেম্বারের সভাপতি এবং ১৪৯টি ব্যবসায়িক এসোসিয়েশনের ১০২টির সভাপতিও উপস্থিত ছিলেন। নিমন্ত্রণপত্রে এই পার্টির নাম ছিল 'বাগানে আতিথিয়েতা।' এই আতিথেয়তাকে আকর্ষণীয় ও আরামদায়ক করে তোলার জন্য ছিল ১০১ রকমের খাবার, বিনোদনের জন্য ছিল বাউল গান ও লোকসঙ্গীতের ব্যবস্থা। ঢাকার দু'টি স্থান থেকে শীতাতপ বাসের বহরে করে অতিথিদের জয়দেবপুর নিয়ে যাওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী বিরোধী দল

www.pathagar.com

আহুত ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি র হরতালের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীদের সোচ্চার করে তোলার জন্যই এই আয়োজন করেন কিন্তু তার সে উদ্যোগ সফল হয়নি। ব্যবসায়ী, শিল্পপতিরা বরং সরকারের গৃহীত ভুল ও দেশের জন্য ক্ষতিকর নীতির সমালোচনা করেন।

আওয়ামী সরকারের আমলে ১৯৯৬ সালের জুলাই থেকে ১৯৯৯ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত গরীব রোগীর খাতায় নাম লিখিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ১ হাজার ১৮ জনকে সাহায্য হিসেবে দেয়া হয় ৩ কোটি ৫৩ লাখ ৫২ হাজার ৮শ' ৮১ টাকা। ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ এমপি ওয়াজিউদ্দিন খানের এক প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান সংসদ কার্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তোফায়েল আহমদ। সংসদে উত্থাপিত তথ্যে কাকে কত টাকা দেয়া হয় তা উল্লেখ না করলেও প্রত্যেকের নাম ও ঠিকানার একটি তালিকা সংযুক্ত করা হয়। তালিকায় সরকারি পদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন আতাউল হক (প্রাক্তন মন্ত্রী পরিষদ সচিব), এসএএম জিয়াউদ্দিন (সচিব), ইসমাইল হোসেন (সচিব), আহবাব আহম্মদ (সচিব), একে এম ফারুক (অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব ও চীফ অব প্রোটোকল), সৈয়দ আবদুল মালেক (মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের একান্ত সচিব), আবুল হোসেব (সংসদ সচিবালয়ের সচিব), নূর উদ্দিন মাহমুদ কামাল (চেয়ারম্যান পিডিবি), এম এ জব্বার (মহা পরিচালক ত্রাণ মন্ত্রণালয়), আব্দুল ওয়াহাব (উপ-সচিব), শফিকুল ইসলাম (যুগ্ম-সচিব, চেয়ারম্যান রেশম বোর্ড), মনোয়ারুল হক (উপ-সচিব), শেখ আজিজুর রহমান (সচিব নিম্নতম মজুরী বোর্ড), আমিরুল ইসলাম (রাষ্ট্রপতির একান্ত সচিব), মেজর (অব.) মেহেদী আলী ইমাম (চেয়ারম্যান বন শিল্প কর্পোরেশন), আব্দুল জব্বার (ডিজি ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর), মাহবুব হোসেন (বিমান প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব), আব্দুর মুক্তাদির চৌধুরী (যুগ্ম-সচিব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়), সৈয়দ সিদ্দিকুর রহমান (কিউরেটর বঙ্গবন্ধু জাদুঘর), মাইনুল হাসান (সমাজ কল্যাণ প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব), আনোয়ারা বেগম (সহকারী সচিব) প্রমুখসহ আওয়ামী সমর্থক যুগ্ম-সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, প্রো-ভিসি ও চিকিৎসকদের মধ্যে রয়েছেন ডাঃ আবু ইউসুফ (প্রো-ভিসি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়), ডক্টর শওকত আরা (মনোবিজ্ঞান বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), ডাঃ নূরুল ইসলাম (জাতীয় অধ্যাপক)। সাহায্য গ্রহীতাদের তালিকায় অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান (প্রেসিডিয়াম সদস্য আওয়ামী লীগ ও অধ্যক্ষ জুবলি স্কুল), রনজিত সরকার (সিলেট জেলা ছাত্রলীগ নেতা), সুচরিত তংচঙ্গ (তথ্য সম্পাদক বান্দরবান জেলা আওয়ামী লীগ), সফর আলী (সাধারণ সম্পাদক ডেমরা থানা আওয়ামী লীগ), চান মিয়া (সভাপতি ঢাকা ৫৬ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ), দিনার খান (জাতীয় শ্রমিক লীগ নেতা), সুনীল কান্দি রায় (সাংগঠনিক সম্পাদক ঢাকা ৭৯ নং ওয়ার্ড যুবলীগ), ফরহাদ আহমদ ফকির (যুগ্ম-সম্পাদক তেজগাঁও কলেজ ছাত্রলীগ), সঞ্জয় মিত্র (সভাপতি দিনাজপুর কাহারুল থানা যুবলীগ), তাজুল ইসলাম (সভাপতি ফুলগাজী থানা ছাত্রলীগ), শহিদুল ইসলাম মাসুদ (সহ-সভাপতি মিরপুর থানা ছাত্রলীগ), হাসান আলী (সহ-সভাপতি আদমজী জুট মিল শ্রমিক লীগ), গাজী আজাহার উদ্দিন (কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য আওয়ামী লীগ), দিদার পাশা (জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগ নেতা), কাজী বদরুজ্জামান বাটুল (ফকিরহাট যুবলীগ নেতা), ওহিদুর রহমান (কৃষক লীগ নেতা), আব্দুল হাকিম (নরসিংদী আওয়ামী লীগ নেতা), মোজাম্মেল হক প্রামাণিক (ডেমরা থানা আওয়ামী লীগ নেতা), নাসিমা আক্তার (মহিলা সম্পাদিকা নেত্রকোণা আওয়ামী লীগ), মোঃ শাহজাহান আলী (সহ-সভাপতি সারিয়াকান্দি থানা আওয়ামী লীগ), আঃ রউফ মিয়া (প্রাক্তন এমপি আওয়ামী লীগ), বোরহান উদ্দিন (জয়বাংলা সাংস্কৃতিক ঐক্যজোট

www.pathagar.com

নেতা), হুমায়ুন কবির লিটন (ছাত্রলীগ নেতা), বাদশা মিয়া (যুগ্ম আহবায়ক গাইবান্ধা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ), ডা. শাহজাহান (যুগ্ম-সম্পাদক গুলশান থানা আওয়ামী লীগ), রফিকুল বারী (নাটোরের যুবলীগ নেতা), দেওয়ান আসাদুজ্জামান (সুনামগঞ্জ আওয়ামী লীগ নেতা), মোজাম্মেল হক প্রমাণিক (সভাপতি নীলফামারীর নেতাকি বাড়ি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ), আব্দুল খালেক আজাদ (নেত্রকোনা জেলা কৃষক লীগ নেতা), জিয়াউল হক মোনা (বগুড়া ছাত্রলীগ নেতা), আবুল কালাম আজাদ বাদল (সভাপতি গাজীপুর জেলা আওয়ামী লীগ), শফিক আব্দুর রাকিব (সাধারণ সম্পাদক যশোর আওয়ামী লীগ), শাহীনা পারভীন (সাধারণ সম্পাদিকা বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা), নুরু মিয়া (সভাপতি ঢাকা কতোয়ালী থানা রিকসা শ্রমিক লীগ) প্রমুখ। দু'দফায় ৬ লাখ টাকা নেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আব্দুল মতিন খসরু, আওয়ামী লীগ এমপি আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ, আতিয়ার রহমান আতিক, শাহ আজিজুর রহমান, নোয়াখালী জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি এডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমানের স্ত্রী, আওয়ামী লীগ পন্থী সাংবাদিক ইউনিয়ন নেতা হাবিবুর রহমান মিলন। লীগ পন্থী নেতা সৈয়দ মহিউদ্দিন প্রমুখ।

২৫ ফেব্রুয়ারি সম্মিলিত বিরোধী দলের হরতাল চলাকালে দুপুরে মদের দোকান খোলার আবদার মেটাতে পুলিশ আপত্তি জানালে মাগুরা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসেনের ছেলে টুটুল ক্ষুব্ধ হয়। সে তার সহযোগীদের নিয়ে দোকান খুলতে সহায়তা দানে পুলিশের ওপর চাপ দেয়। পুলিশ এতে গড়িমসি করলে টুটু ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং সে তার সহযোগীদের নিয়ে পুলিশের ওপর সশস্ত্র হামলা চালায়। দুপুর সাড়ে ১২টায় শহরের নতুন বাজার এলাকায় আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনীর এই তান্ডবে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। তারা বেপরোয়াভাবে পুলিশের ওপর সশস্ত্র হামলা চালায়। তাদের বেদম প্রহারে কমপক্ষে ৬ জন পুলিশ আহত হয়। আহতদের মধ্যে দু'জনকে টুটুল বাহিনী রাস্তার ওপর থেকে টেনে-হেঁচড়ে শহরের একটি বাড়িতে নিয়ে হত্যার প্রচেষ্টা চালায়। এ খবর শহরময় ছড়িয়ে পড়লে পুলিশের সদস্যদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। পুলিশের সদস্যরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে সদর থানার ওসির নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে অপহৃত দুই পুলিশকে উদ্ধার করা হয়। আওয়ামী নেতার ছেলেসহ ৬ জনকে আসামী করে মাগুরা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হলে আসামীদের গ্রেফতার করা হয়।

বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে পুলিশ সদস্যদের বিপিএম এবং পিপিএম পদক দেয়া হয়। পুলিশ সপ্তাহ ১৯৯৮ তে ঢালাওভাবে সর্বোচ্চ ৬৫ জনকে পদক দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ৪ মার্চ ১৯৯৯ রাজারবাগ পুলিশ লাইন ময়দানে প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান অতিথি করে পুলিশ সপ্তাহের পরিবর্তে পুলিশ সমাবেশে ৩৮ জনকে পদক প্রার্থীর তালিকাভুক্ত করা হয়। এর মধ্যে পদক গ্রহণ ট্রায়াল প্যারেডে ডেকে এনে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ৮ জন পুলিশকে বাদ দেয়া হয়। পক্ষান্তরে একটি বিতর্কিত মামলার তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে পদক দেয়া হয়।

সরকার রাঙ্গুনিয়া থানার পারুয়া, সরফভাটা ও পাদুয়া ইউনিয়নের গরীব শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালু করে। প্রথম দিকে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি ও শিক্ষকদের মাধ্যমে খাদ্য বিতরণ হতো। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে এতে পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হয়। ফলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পরিচালনা কমিটি শিক্ষকদের মাধ্যমে গম বিতরণে অপারগতা প্রকাশ করে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে গম বিতরণের জন্য

www.pathagar.com

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানায়। ইউপি পরিষদ ৪ বছর ধরে গম উত্তোলন ও বিতরণ করে। কিন্তু রাঙ্গুনিয়া নবারুন সাংস্কৃতিক সংঘ নামে (১৯৯৫ সাল থেকে বন্ধ থাকা) ১টি প্রতিষ্ঠান ভূয়া সভাপতি কাজল কান্তির মাধ্যমে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী এ এ মান্নানের কাছে আবেদন জানায়, ইউপি চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে গম বিতরণে অনিয়ম হচ্ছে। গম বিতরণের দায়িত্ব সংঘকে দেয়া হোক। মন্ত্রী এ আবেদনের ওপর ১৫ জানুয়ারি ১৯৯৯ সুপারিশ করে টিএনওকে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেন। মন্ত্রীর নোট এবং সংঘের আবেদন পেয়ে টিএনও চেয়ারম্যানদের নামে তিন মাসের প্রায় ৩শ' মেট্রিক টন গম প্রদান বন্ধ করে দেন। সরকারি বিধি মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অপারগতা প্রকাশ করলে স্থানীয় চেয়ারম্যান বা কোনো এনজিও সংস্থা বা নিবন্ধনকৃত সংস্থা খাদ্যশস্য বিতরণ করবে। এক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম লংঘন করে ভুয়া সংঘের জন্য সুপারিশ করা হয়। (সূত্রঃ দৈনিক মানব জমিন ৮ মার্চ ১৯৯৯)

১০ মার্চ ১৯৯৯ যশোর জেনারেল হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিধানের জন্য বেশ কয়েকটি নজীরবিহীন ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে আগমন নির্বিঘ্ন করতে নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা সকালেই হাসপাতাল ঘিরে ফেলে। তারা হাসপাতালের সকল প্রবেশ মুখে চলাচল বন্ধ করে দেয়। সকাল থেকে তারা ডাক্তার, কর্মচারীসহ রোগী ও তার আত্মীয়-স্বজনদের হাসপাতালে প্রবেশে বাধা দিতে থাকে। মুমূর্ষু রোগীর কাছে ওষুধ নিয়ে যাওয়ার জরুরী দেখানোর পরও তাদের ঢুকতে দেয়া হয়নি। ১১ টা ২০ মিনিট নাগাদ প্রধানমন্ত্রী হাসপাতালে পৌঁছানোর আধা ঘন্টা পূর্ব থেকে এ ব্যবস্থা আরো কঠোর হয়। জরুরী বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক, কর্মচারীদের সিকিউরিটি পাস না থাকায় বের করে দেবার চেষ্টা করা হয়। এ নিয়ে হাসপাতালের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে ডাক্তার-কর্মচারীদের উত্তপ্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়। ১১টা পর্যন্ত মাত্র ১১ জন রোগী ভর্তি করা হয়। এই সময় পর্যন্ত বহিঃবিভাগের চিকিৎসা সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। যাদের ভর্তি করা হয়েছে তাদের জরুরী বিভাগে ঢুকাতে অনেক বেগ পেতে হয়। প্রবেশগেটে অনেকক্ষণ আটকে থাকার কারণে সড়ক দুর্ঘটনায় মাথায় মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত রমজান (৩৫) ও শ্বাসকষ্টে জ্ঞান হারিয়ে ফেলা মশিউর রহমান (৩৮) সহ কয়েকজন আশংকাজনক অবস্থায় পৌঁছে। সাড়ে ১০ টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ভর্তি কোন রোগীর চিকিৎসা সেবা দেয়া সম্ভব হয়নি। জরুরী বিভাগের সাথে ওয়ার্ডের যোগাযোগ ছিল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। প্রধানমন্ত্রী ফিরে যাবার পর অপমানের শিকার হওয়া অনেক ডাক্তার-কর্মচারীরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং কেউ কেউ ডিউটি বন্ধ করে দেবার জন্যও চাপ প্রয়োগ করেন।

১৯৯৯ সালের হজ্ব পালনকারীদের সেবার নামে সরকারি অর্থ ব্যয়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট হজ্ব প্রশাসনিক টিমের নেতা ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ও তার স্ত্রী, দুই মেয়ে একসঙ্গে গেলে সৌদি আরবের বাংলাদেশ হজ্ব মিশনের কর্মকর্তারা তাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ১১ সদস্য বিশিষ্ট টিমে ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর পিএস শাহ মাহমুদ কামাল শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব সরদার আলী আজহার অর্ধাঙ্গিনীকে নিয়ে, ধর্মমন্ত্রীর জামাতা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক মোস্তফা মনসুর আলম, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব সিরাজুল ইসলাম, সহকারী প্রধান কামাল আতাহার হোসেন, প্রধানমন্ত্রীর দফতরের প্রটোকল অফিসার আব্দুস সোবহান, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা লাহুত মিয়া, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মুহিতুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিবের সহকারী নূরুল ইসলাম, ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর পিএসএর গাড়ীর ড্রাইভার আবুল কাশেম টিমে থাকেন। সচিব সরকারি কোষাগার থেকে ১ লাখ ২৪ হাজার ৭শ' ৬৩ টাকা, উপ-সচিব ১ লাখ ১৫ হাজার ৬শ' ৬৮ টাকা, বাকী

www.pathagar.com

সকলে ১ লাখ ১৪ হাজার ৪শ' ১৮ টাকা করে মোট ১২ লাখ ৮২ হাজার ৭শ' ২৩ টাকা পেয়েছেন। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ১৭ মার্চ ১৯৯৯)

২ এপ্রিল দৈনিক দিনকালে প্রকাশ, 'ধামরাইয়ে আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী মহলের কাছে পুলিশ প্রশাসন জিম্মি হয়ে পড়ায় থানার সর্বত্র দেখা দিয়েছে আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি। আসামী গ্রেফতার করা না করার বিষয়টি অনেকটা নির্ভর করছে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের উপর। এছাড়া মামলা-মোকদ্দমা ভিন্নখাতে প্রবাহিত হওয়ার দরুন বাদী আসামী কর্তৃক হয়রানির শিকার হচ্ছে। কোন মামলায় কোন আসামী গ্রেফতার করতে হবে না হবে তাও নির্ভর করে প্রভাবশালী আওয়ামী নেতা-কর্মীদের ইচ্ছার ওপর। এ সুযোগে প্রকৃত অপরাধী থেকে যাচ্ছে সম্পূর্ণরূপে ধরাছোয়ার বাইরে। এ ব্যাপারে ধামরাই থানার এসআই আবু তাহের কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সাংবাদিকদের কাছে জানান, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ধামরাই থানায় দায়েরকৃত মামলায় গত ১৮ মার্চ তিনি ৫ জন কনস্টেবল নিয়ে আসামী ধরার জন্য থানার বাসুলী এলাকায় গেলে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা আসামী ধরতে বাধা প্রদান করে এবং আসামী গ্রেফতার করা হলে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের অবরোধ ও ওসিকে বদলি করার হুমকি দেয়। চাপের মুখে পুলিশ আসামী খুরশেদুদ্দিনকে গ্রেফতার করতে না পারায় বাদীর জীবনে নেমে এসেছে চরম অনিশ্চয়তার অমানিশা।'

১ এপ্রিল জনকণ্ঠে আ'লীগ কেন্দ্রীয় নেতা এবং বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি মুহম্মদ কামরুজ্জামানকে মরক্কোয় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নিয়োগের তথ্য প্রকাশ। কামরুজ্জামান ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে ঝিনাইদহের একটি আসন থেকে আওয়ামী প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন।

৪ এপ্রিল ভোরে সরকারের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসিন হল তল্লাশি করতে যায়। শামীম আহমেদ গ্রুপকে হলে পুনর্বাসন করাই এই তল্লাশির উদ্দেশ্য ছিল। পুলিশী তল্লাশির পর ছাত্রলীগের রতন-তমি গ্রুপের বহিরাগত ক্যাডাররা বিতাড়িত হলেও সেখানে শামীম গ্রুপের বহিরাগত ক্যাডাররা অবস্থান নেয়। এর আগে হল থেকে বিতাড়িত শামীম গ্রুপের ক্যাডার এবং মুহসিন হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি শফিককে পুলিশ গাড়ীতে করে গেটে নিয়ে আসে। শফিকের সঙ্গে শামীম গ্রুপের আরো ১০/১২ জন ক্যাডার হলে প্রবেশ করে। এ সময় পুলিশের তল্লাশি অভিযান চলছিল। পুলিশ বিভিন্ন রুম থেকে গোলাবারুদ ও অস্ত্র উদ্ধার করে ৪/ক নম্বর কক্ষে অস্ত্র তৈরির একটি কারখানা আবিষ্কার করে। পুলিশ রতন-তমি গ্রুপের ৭ জন ক্যাডারকে গ্রেফতার করে। অন্যরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। শামীম গ্রুপের ক্যাডাররা পুলিশের সামনেই রতন-তমি গ্রুপের ক্যাডারদের কাছ থেকে একটি শর্টগান ছিনিয়ে নেয়। মুহসিন হলে শামীম গ্রুপের পূর্ব নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলে পুলিশ দেড় ঘন্টাব্যাপী তল্লাশি অভিযান সমাপ্ত করে। শামীম গ্রুপের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য মোহাম্মদপুরের সন্ত্রাসী ইমন, মামুনসহ অনেক বহিরাগত সন্ত্রাসীকে মহসিন হলে আনা হয়। পরদিন হল এলাকায় শামীম গ্রুপের ক্যাডারদের সশস্ত্র মহড়া দিতে দেখা যায়। ৯ এপ্রিল রতন-তমি গ্রুপের ক্যাডারদের হতে শামীম গ্রুপের মূল ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত জহুরুল হক হলটি খোয়া যাবার পর শামীম গ্রুপের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে, যা শামীমের গডফাদার হিসেবে পরিচিত উত্তরাঞ্চলের ওই প্রভাবশালী মন্ত্রী মেনে নিতে পারেননি। এই প্রভাবশালী মন্ত্রীর উপর ভরসা করেই শামীম গ্রুপের টপ ক্যাডার টোকাই মিজান ৮ এপ্রিল পুলিশের এডিসি মোর্শেদকে গুলি করে পালাতে সক্ষম হয়। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ১৯ এপ্রিল ১৯৯৯)

www.pathagar.com

৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর আপন ফুফাতো বোন হল্যান্ড অভিবাসী, হেগস্থ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল স্ট্যাডিজের গ্রন্থাগার কর্মী শেলী সাঈদ হোসেন জামানকে স্পেনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হয়। মিসেস শেলী শেখ মুজিবের ছোট বোন লিলি হোসেনের কন্যা।

৯ এপ্রিল দৈনিক দিনকালে প্রকাশ, বাংলাদেশ শিশু স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের একাডেমিক পরিচালক প্রফেসার ওয়াকার আহমেদ খান নিয়ম বহির্ভূতভাবে ছাত্রলীগ ক্যাডার ডা. মোঃ আইনাল হক ও ডা. মোঃ আব্দুজ জাহেরকে এমডি (শিশুরোগ) প্রথম পর্বে ও ডা. মির্জা কামরুল জাহিদ এবং ডা. (মেজর) মেহেরুন নেছাকে এমএস (শিশুরোগ) প্রথম পর্বে ভর্তি করে নেয়ার জন্য বিএসএম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে অনুমোদনপত্র পাঠিয়েছেন। মেধা তালিকায় এদের নাম নেই। এই দু'টি বিভাগে ভর্তির জন্য প্রত্যেক বিভাগে মেধা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উত্তীর্ণ ১২ জন ওয়েটিং লিস্টে থাকা আরো ৪ জনকে নিয়ে মোট ১৬ জনকে ভর্তির জন্য অনুমোদন দেয়া হয়। ওয়েটিং লিস্টের আরো ৯ জনকে ভর্তির সুযোগ না দিয়ে উল্লিখিত ৩ জনকে ভর্তির অনুমোদন দিয়ে তালিকাভুক্ত করা হয়।

কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব থানা সদরের সব দল, মত, শ্রেণী ও পেশার মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে ১৯৯৪ সালে ভৈরব মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তখনো কোনো কোনো ব্যক্তি নিজের বা পিতা-মাতার নামে কলেজের নামকরণ করতে চাইলেও বাস্তবায়ন পরিষদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, কোন ব্যক্তির নামে এ কলেজের নাম রাখা হবে না, ভৈরবের নামই ঊর্ধ্বে থাকবে। সেই থেকেই এর নাম ভৈরব মহিলা কলেজ। ১৯৯৬ সালে গভর্নিং বডির এক সভায় কলেজটির নাম পরিবর্তন করে 'জিল্লুর রহমান মহিলা কলেজ' করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের কলেজ শাখার তথ্য অনুসারে, মন্ত্রী বা যে কোন ব্যক্তির নামে কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে ওই ব্যক্তিকে কলেজ ফান্ডে ২৫ লাখ টাকা দান করতে হবে এবং কলেজটির নিজস্ব ভবন থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে এ দুটি শর্তের কোনটাই পালিত না হলেও উক্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার পরপরই সাইনবোর্ডে নাম পাল্টে যায়। (সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো ২১ এপ্রিল ১৯৯৯)

স্থানীয় একটি প্রভাবশালী মহল সরকারি দলের প্রভাব দেখিয়ে নোয়াখালী জেলার চাটখিল থানা ইয়াছিন হাজীর বাজারের প্রবাসী আলী হোসেনের দোকান ঘর তার অনুপস্থিতির সুযোগে দখল করে সেখানে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেয়। (সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো ২৩ এপ্রিল ১৯৯৯)

আ'লীগ ক্ষমতা গ্রহণের সময় জ্বালানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিভাগের সচিব ড. তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান ছিলেন। তাকে জ্বালানী সচিব করার পর স্বল্প সময়ের জন্য আনিসুল হক চৌধুরী চেয়ারম্যান হন। এরপর অবসরপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব ফারুক সোবহানকে এক বছরের জন্য চেয়ারম্যান হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়। সোবহানকে একই সাথে আসন্ন কমনওয়েলথ সেক্রেটারী জেনারেল পদের নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রার্থী মনোনীত করা হয়। তিনি বছরের অধিকাংশ সময় নির্বাচনী প্রচারণার উদ্দেশ্যে দেশের বাইরে থাকায় বোর্ডের কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে আসে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ ব্যাপারে বিরূপ সমালোচনা বের হবার পর সরকার চুক্তির মেয়াদ নবায়ন না করে নতুন কাউকে চেয়ারম্যান নিয়োগ না দেওয়া পর্যন্ত সিনিয়র সদস্য জাহিদ হোসেনকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ চালাতে থাকেন। এক পর্যায়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে চুক্তিভিত্তিক কর্মরত অতিরিক্ত সচিব প্রকৌশলী চৌধুরী মুহম্মদ মহসিনকে চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়।

www.pathagar.com

প্যারিসে সাহায্যদাতা গোষ্ঠীর সম্মেলন সামনে রেখে মহসিন জরুরী গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকায় ইআরডি সচিব তাকে দায়িত্বমুক্ত না করার সুপারিশ করেন। এর মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে কর্মরত (১৯৯৬ সালের জনতার মঞ্চে আরোহণকারী অন্যতম কর্মকর্তা ও প্রধানমন্ত্রীর ওপর একটি গ্রন্থের লেখক) সিরাজ উদ্দিন আহমদকে অনেকটা তড়িঘড়ি করে চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়। ১ এপ্রিল চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রথম দিনেই সকাল ১০টায় সচিবালয়ে ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের নেতা শাহ্ আলমকে একই গাড়িতে সাথে নিয়ে বিনিয়োগ বোর্ডে আসেন। সকাল ১১টায় বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে কর্মকর্তাদের পরিচিতি সভায় শাহ্ আলমকে তার পাশের চেয়ারে বসান। কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে চেয়ারম্যানকে পুষ্পস্তবক দেয়া হয়। একই সাথে চেয়ারম্যানের সফরসঙ্গী সরকারের কোনো পদস্থ কর্মকর্তা হবে মনে করে বোর্ডের সচিব তার হাতেও পুষ্পস্তবক দেন। পরে পরিচিতির সময় শাহ্ আলম নিজেকে সচিবালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের নেতা হিসেবে তুলে ধরলে কর্মকর্তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সিরাজ উদ্দিন চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণের পর বিনিয়োগ বোর্ড আ'লীগের বরিশাল এলাকার নেতা-কর্মীদের মিলনস্থলে পরিণত হয়। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ২৬ এপ্রিল ১৯৯৯)

ক্ষমতার হালুয়া রুটি, সুযোগ-সুবিধা ভাগাভাগি প্রশ্নে নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানায় আ'লীগ এমপি রাজউদ্দিন আহমদের সঙ্গে মন্ত্রী জিল্লুর রহমানের দীর্ঘ বিরোধ নিস্পত্তির খেসারত হিসেবে ২৯ এপ্রিল ১০ লাখ টাকা ব্যয়ে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। রায়পুরা থানার বারৈচা মোড় থেকে থানা পরিষদ পর্যন্ত ২১টি তোরণ নির্মাণ এবং প্রচুর স্বর্ণের নৌকা উপহারের মধ্যে দিয়ে মন্ত্রীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। দু'জনের সম্পর্কের উন্নতি ঘটার পর মন্ত্রীকে প্রথমবারের মতো সম্বর্ধনা দেয়ার জন্য সরকারি ছুটির দিনে স্কুল, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এনে জড়ো করা হয় এবং থানা পরিষদের সকল অফিস খোলা হয়। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে সম্বর্ধনা স্থলে হাজার হাজার লোকের. সমাগমের ব্যবস্থাও করা হয়।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ত্রাণ বিতরণে ব্যাপকহারে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি এবং দলীয়করণের নজির সৃষ্টি করে সোসাইটির সদর দফতর থেকে পাঠানো ত্রাণ সামগ্রী দলীয় নেতা-কর্মী সমর্থক এবং স্থানীয় ইউপি সদস্যদের মধ্যে বিলির মাধ্যমে। সোসাইটির জাতীয় সদর দফতর থেকে মানিকগঞ্জ পৌরসভাসহ জেলার ৫টি উপজেলায় ২,৫০০ পরিবারের মধ্যে রিলিফ দেয়ার জন্য জেলা ইউনিটকে দায়িত্ব দেয়া হয়। বরাদ্দকৃত ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে ছিল পরিবার প্রতি ২০ কেজি চাল, ৪ কেজি মসুর ডাল, ১ পিস কাপড় এবং বড় একটি প্লাস্টিকের বালতি। বরাদ্দ করা এসব ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে মানিকগঞ্জ পৌর এলাকায় ১০০ জন, সাটুরিয়া উপজেলায় ৪শ', শিবালয়ে ২শ' ৫০ জন, হরিরামপুরে ২শ' ৫০ জন, ঘিওরে ২শ' ৫০ জন, মানিকগঞ্জ সদরে ৩টি ইউনিয়নে ৩শ' ৫০ জনকে দেয়ার তালিকা হয়। মানিকগঞ্জ সদরের ৩টি ইউনিয়নে এবং সাটুরিয়া উপজেলার জন্য বরাদ্দকৃত ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয় ২৩ এপ্রিল। উপজেলার দরগ্রাম কলেজ মাঠে সাটুরিয়ার ৪শ' পরিবারকে ত্রাণ দেয়া হয়। প্রকৃত দুস্থদের ত্রাণ না দিয়ে সরকার দলীয় কর্মী-সমর্থকদের দেয়া হয়। সোসাইটি থেকে পাঠানো ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে পানি রাখার বালতির গায়ে সাদা কালির ছাপ দিয়ে লেখা হয় কর্ণেল মালেকের সালাম নিন, নৌকা মার্কায় ভোট দিন।' যাদেরকে ত্রাণ দেয়া হয় তাদেরকে বলে দেয়া হয় যে, এগুলো কর্ণেল মালেক দিয়েছেন। (সূত্রঃ দৈনিক জনতা ৫ মে ১৯৯৯)

www.pathagar.com

১৪ মে আ'লীগ বুদ্ধিজীবী 'শওকত ওসমানের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীতে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনের নাম পরিবর্তন করে শওকত ওসমান মিলনায়তন করা হয়। (সূত্রঃ দৈনিক ভোরের কাগজ ১৫ মে ১৯৯৯)

ভোলার লালমোহন থানার রামগঞ্জ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আহসান উল্লাহ সেলিমকে আওয়ামী লীগে যোগদান করাতে ব্যর্থ হয়ে সন্ত্রাসীরা ২৩ মে তাঁর মেয়ে ঝর্ণার উপর এসিড নিক্ষেপ করে মুখমন্ডল ঝলসে দেয়।

নীলক্ষেত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী মিলনায়তনে এডভোকেট গাজীউল হকের সভাপতিত্বে সাধনা সংসদ নামে একটি সংগঠনের অভিষেক অনুষ্ঠানে 'বঙ্গবন্ধুঃ স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও গণতন্ত্রের বিকাশ'-শীর্ষক আলোচনা সভায় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র রায়, প্রতিমন্ত্রী জিনাতুন্নেসা তালুকদার, এমপি এসএম আকরাম, অধ্যাপক ড. মোঃ হোসেন মনসুর, অধ্যাপক ডঃ আবুল হাশেম, মুস্তাফা সরোয়ার, দৈনিক খবর সম্পাদক ড. মিজানুর রহমান মিজান, অগ্রণী ব্যাংকের জিএম শাহ এএইচএম আব্দুল হাই, সংসদের মহাসচিব এডভোকেট দেলওয়ার হোসেন ভুঁইয়া প্রমুখ বলেন, দেশের সরকারের বিভিন্ন পদে শেখ মুজিবের আদর্শে বিশ্বাসীদের বসাতে হবে। বাস্তবে বিভিন্ন পদে মুজিবের আদর্শের লোকদের না বসিয়ে স্বাধীনতায় যারা বিশ্বাস করে না তাদের বসানো হচ্ছে। বক্তাগণ বলেন, ডিসি যিনি হবেন তাকেও মুজিব আদর্শের লোক হতে হবে এবং তার ইন্টারভিউ নিতে হবে যে, তিনি মুজিব সম্পর্কে কতটুকু জানেন। দলের সরকার অবশ্যই দলীয়করণ করবে। দলীয় সরকার দলীয় আদর্শে বিশ্বাসীদের দিয়ে দেশ চালাবেন এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া দেশ চলবে না। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ২৩ মে ১৯৯৯)

বিনিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান সিরাজউদ্দিন আহমদ ২৪ মে বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনে সরকারি দল সমর্থকদের আনুষ্ঠানিক পরিচিতি সভার আয়োজন করেন।

১৯৯৮ সালের বন্যার পর অর্থ মন্ত্রণালয় অত্যাবশ্যকীয় নয় এমন ১০ শতাংশ ব্যয় হ্রাসের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত বহাল থাকা সত্ত্বেও ১৯৯৯ সালের প্রথম দিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশী ভিআইপিদের ব্যবহারের নামে জার্মানী থেকে ৪ লাখ ৩৩ হাজার ১শ' ৩৩ ডয়েস মার্কের স্পেশাল প্রটেকডেট বুলেট প্রুপ মার্সিডিজ বেঞ্জ স্টেশন ওয়াগন আমদানী করে। গাড়িটির মূল্য বাংলাদেশী টাকায় ১ কোটি ২০ লাখ ৩৮ হাজার ৩ টাকা ৫১ পয়সা। গাড়ি আমদানি বাবদ মোট শুল্কের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ কোটি ৮৪ লাখ ৮৯ হাজার ১শ' ৯৩ টাকা ১৭ পয়সা। ২ জুন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তারা কমলাপুর অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো থেকে আমদানীকৃত গাড়িটি পরে শুল্ক পরিশোধের কথা বলে সাময়িকভাবে খালাস করে আনেন। কিন্তু অনুমোদিত বরাদ্দের বাইরে অপ্রয়োজনে আমদানিকৃত গাড়ির শুল্ক-কর বাবদ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুকূলে ১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থ বছরে বাজেটে কোনো বরাদ্দ নেই। এমনকি ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটেও এজন্য কোনো ব্যয় ধরা হয়নি। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ১৫ জুন ১৯৯৯)

৪ জুন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে বাংলাদেশের বীর ক্রিকেটারদের গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জিয়াউর রহমানের লিখিত 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ' গানটি অন্যান্য গানের সঙ্গে বেজে উঠলে তড়িঘড়ি করে এটি বন্ধ করে দিয়ে ক্যাসেট বদলানো হয়। গণসংবর্ধনাটি সিটি কর্পোরেশনের হলেও মঞ্চের সামনে লেখা ছিল 'এ বিজয় বাঙ্গালীর, এ

www.pathagar.com

বিজয় শেখ হাসিনার-ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগ দক্ষিণ, বিশ্বকাপে ক্রিকেট এইতো শুরু নেইতো শেষ সাবাস বাংলাদেশ-বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ঢাকা মহানগর উত্তর।' মঞ্চের একটু ভেতরে প্যারেড পরিদর্শনস্থলে একটি ব্যানারে লেখা ছিল 'জয় বাংলার জয়, বাঙালির জয়-জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।' আওয়ামী লীগের ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডের ব্যানার এ অনুষ্ঠানে টাঙ্গানো হয়। প্যারেড স্কোয়ারের ডান পাশে দু'দফায় আগুন লেগে যায়। তখন সেখানে হুড়োহুড়ি ও চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফায়ার ব্রিগেড এসে এ আগুন নেভায়। মাঝখানে আওয়ামী লীগের অন্তর্দ্বন্দ্বে মঞ্চের সামনে দু'গ্রুপের মারামারিতে কয়েকজন আহত হয়। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

৫ জুন ঢাকার উত্তরার ৩ নম্বর সেক্টর লন্ডন প্লাজার একটি ফোন-ফ্যাক্স এর দোকান থেকে প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার পুত্র দীপুর নেতৃত্বে ৩ জন সশস্ত্র যুবক সৈয়দ কামরুলকে অপহরণ করে। এর পরপরই প্রতিমন্ত্রী তার পুত্রকে ৮ জুন ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেন।

১৭ জুন মাজার রোডের দক্ষিণ মাথা এবং গাবতলী সড়কের ক্রসিং-এ ট্রাফিক কনস্টেবল মঞ্জুর রহমান (নং-৮৩৯৫) ডিউটিতে ছিলেন। সকাল ৯টায় ওই এলাকায় ট্রাফিক জ্যাম পড়ে। বাস, ট্রাক, টেম্পোসহ অন্যান্য গাড়ির সঙ্গে বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী খ.ম. জাহাঙ্গীরকে বহনকারী কারটিও আটকা পড়ে। মঞ্জুর কার আরোহী প্রতিমন্ত্রীকে চিনতে না পারলেও বাংলাদেশের মনোগ্রাম খচিত কারটি দেখেই তিনি যানজট মুক্ত করার সাধ্যমত চেষ্টা করেন। মন্ত্রীর কারটিকে যানজট মুক্ত করে কিছুটা পথ দেখিয়ে দেন। এর পর কনস্টেবল মঞ্জুর তার ডিউটিস্থলে ফিরে যান। অপরদিকে সামনে গিয়ে মন্ত্রীকে বহনকারী কারটি একটি বাসকে পিছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে বাসযাত্রী-রিকশারোহীসহ লোকজন উত্তেজিত হয়ে প্রতিমন্ত্রীর গাড়ি ঘেরাও করে। তিনি গাড়ী থেকে নেমে বিক্ষুব্ধ জনতাকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করতে থাকেন। এতে উত্তেজিত জনতা মন্ত্রীকে তেড়ে যায়। এ সময় নিজেকে প্রতিমন্ত্রী বলে পরিচয় দেন। তাতে উত্তেজনা প্রশমন না হয়ে আরো বেড়ে যায়। মন্ত্রী এ সময় কার থেকে নেমে মঞ্জুরকে তেড়ে যান। তিনি মঞ্জুরের ইউনিফর্মের কলার চেপে ধরে কয়েকটি ঘুষি মারেন। একটি ঘুষি মঞ্জুরের কানে আঘাত করলে কান ফেটে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় মঞ্জুর রাস্তায় পড়ে যান। প্রতিমন্ত্রী মঞ্জুরের ইউনিফর্ম ধরে রাস্তা থেকে তুলে পুনরায় ঘুষি মারতে থাকেন। মারপিট করে মঞ্জুরকে আহত করে মন্ত্রী নিজেই গাড়িতে তুলে নিয়ে যান।

১৮ জুন সকালে ছাত্রলীগ নেতা মাজহারের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র কর্মী মিরপুরের লালকুঠিতে বিপুল পরিমাণ জমি দখল করে। ঐ দিনই বাদজুম্মা যুবলীগের গিয়াসের নেতৃত্বে অপর একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ বোমা হামলা চালিয়ে ছাত্রলীগ কর্মীদের দখল থেকে উচ্ছেদ করে। জমি দখল এবং পাল্টা দখলের ঘটনায় উভয় গ্রুপের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এ ব্যাপারে মিরপুর থানায় মামলা-পাল্টা মামলা হয়। ২১ জুন আজহারের নেতৃত্বে মিরপুর বাংলা কলেজ থেকে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলকারীরা যুবলীগের দায়ের করা মামলাকে সাজানো বলে প্রচার করে। তারা দারুস সালাম রোড পুলিশ ফাঁড়ির সামনের রাস্তায় বসে যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। অপর দিকে যুবলীগ একদল নেতা-কর্মী তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাকে সাজানো বলে মিছিল বের করলে উভয়পক্ষে সংঘর্ষ বাঁধে। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, ইটপাটকেল নিক্ষেপ, বোমা হামলার পরও পুলিশ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

২৩ জুন আওয়ামী লীগের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন উপলক্ষ্যে ঢাকার রাজপথের চেহারা পাল্টে যায়। প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে পালিত হয় বিশাল আয়োজনের সুবর্ণ জয়ন্তী। ঢাকার ৯০টি

www.pathagar.com

ওয়ার্ডের প্রতিটিতে ন্যূনতম ৩টি থেকে সর্বোচ্চ ১০টি পর্যন্ত বিশাল বিশাল আকৃতির নৌকা দিয়ে সুবর্ণ জয়ন্তী তোরণ নির্মাণে দু'হাজার থেকে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় হয়। আওয়ামী সরকারের সাফল্যের ফিরিস্তি দিয়ে নানাবর্ণের বিশাল বিশাল ব্যানার দিয়ে প্রতিটি ওয়ার্ডের প্রধান সড়কগুলো আলোকিত করা হয়। সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালের প্রবেশ মুখে ২৩ জুন থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত যে বিশাল আকৃতির তোরণ শোভা পায় সেটার অর্থের যোগান নিয়ে বাস শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। কারণ শ্রমিকদের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে তোরণটি নির্মাণ করা হয়। তোরণটি নির্মাণ করতে ১০ হাজার টাকা ব্যয় ধরা হলেও চাঁদা তোলা হয় লাখ টাকারও ওপরে। মালিবাগ রেলগেট থেকে বিশ্বরোড হয়ে সায়েদাবাদ, যাত্রাবাড়ি মোড়ে কমপক্ষে ২০টি তোরণ নির্মিত হয়। যাত্রাবাড়ি থেকে ইত্তেফাক মোড় হয়ে মতিঝিল, ফকিরেরপুল, কাকরাইল, জিরো পয়েন্ট এলাকা ১৯৯৮ সালের বন্যায় বিধ্বস্ত থাকলেও বিশাল আকৃতির তোরণ, সুদৃশ্য ব্যানারে আওয়ামী লীগ সভাপতি এবং সাধারণ সম্পদকের নাম শোভা পায়। খিলগাঁও-বাসাবো এলাকার অধিকাংশ তোরণ স্থানীয় আওয়ামী লীগ এমপির সৌজন্যে নির্মিত হয়। লোডশেডিং সত্ত্বেও বিভিন্ন সড়কে নির্মিত তোরণকে সারা রাত ধরে আলোক উজ্জ্বল করে রাখা হয়। পল্টন ময়দান, দৈনিক বাংলা মোড়-এই পুরো এলাকা যেনো পরিণত হয় আওয়ামী লীগের অফিসে। মুজিব-হাসিনার শ' শ' পোট্রেট রাস্তার মোড়ে মোড়ে, স্টেডিয়ামের রেলিং ভবনে শোভা পায়। এসব পোট্রেট আঁকতে ২ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় হয়। গুলিস্তান সিনেমা হলের সামনের চৌরাস্তার নাম দেয়া হয় বঙ্গবন্ধু স্কোয়ার। এই স্কোয়ারে বিশাল ব্যানার দিয়ে মোড়ানো হয়। এই স্কোয়ারে মুজিব-হাসিনার বিশাল পোট্রেটগুলো লাগানো হয়। রাজউক ভবন সংলগ্ন বঙ্গভবনের প্রবেশ পথের গোল চক্করে লীগের দলীয় পতাকা ও জাতীয় পতাকা উড়ানো হয়। বঙ্গভবনের প্রধান গেটের সামনে পত পত করে উড়ে অসংখ্য দলীয় ও জাতীয় পতাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে শাপলা চত্বর, বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দোয়েল চত্বর, হাইকোর্টের সামনের চত্বর, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে কদম ফোয়ারা, পান্থপথ, বিজয় স্মরণী, গণভবন, ধানমন্ডির ৩২ নম্বর থেকে কলাবাগান, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা গেট, মহাখালী, ফার্মগেট সর্বত্র রাস্তার দুধারে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ওভার ব্রীজে দলীয় পতাকা, দলীয় শ্লোগান লেখা ব্যানার, প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন, পোস্টার ও প্রতিকৃতিতে ছেঁয়ে যায়। ব্যানার, পতাকা ও ফেস্টুনে কয়েক হাজার গজ কাপড় ব্যবহৃত হয়। বিকাল তিনটায় সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্বোধনের সময় কয়েক হাজার বেলুন ও কয়েকশ পায়রা উড়ানো হয়। সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে রাজধানীর আশে-পাশের জেলাগুলোর দলীয় নেতা-কর্মীদের আনা হয় ট্রাক, বাস ও মিনিবাসে করে। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে ব্যান্ড বাজিয়ে মিছিল আসে।

জেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউর রহমান মন্টুসহ কতিপয় নেতার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী তৎপরতার অভিযোগে মিথ্যা মামলা দায়েরের প্রতিবাদে আয়োজিত সমাবেশে আওয়ামী লীগ, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনসমূহ ২৮ জুন বিকেলে বাগেরহাটে স্বাধীনতা উদ্যানে আয়োজিত এক সমাবেশে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোজাম্মেল হোসেনকে প্রধান সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে। এর আগে ১৯ জুন প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নানা রকম শ্লোগান দিয়ে মিছিল বের হয়। সমাবেশে বক্তাগণ মন্টুসহ অন্যান্য নেতা-কর্মীদের নামে দায়েরকৃত মামলার জন্য প্রতিমন্ত্রীকে সরাসরি অভিযুক্ত করেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সভাপতি ডা. মোশাররফ হোসেন, জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মীর ফজলে সাইদ বাবলু, জেলা যুবলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক

www.pathagar.com

নকীব নজিবুল হক নজু, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি তালুকদার নাজমুল কবির ঝিলাম, জেলা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ সেলিম রেজা, থানা যুবলীগের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম পলিন প্রমুখ। সমাবেশে বক্তাগণ দলীয় নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার অভিযোগকে মিথ্যা ও বানোয়াট আখ্যায়িত করে বলেন, 'জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রীর এককালের সোনার ছেলেরা যদি সন্ত্রাসী হয় তবে তিনিই এ জেলার প্রধান সন্ত্রাসী। মন্ত্রিত্বের আসনে সমাসীন হয়ে তিনি তার লালিত কর্মীদের আজ সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেবার ইন্ধন যোগাচ্ছেন।' প্রতিমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বক্তাগণ আরও বলেন, 'চিরদিন কেউ ক্ষমতায় থাকে না, এক সময় তাকে মাটি ও মানুষের কাছে ফিরে আসতেই হয়।' (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ৫ জুলাই ১৯৯৯)

৪ জুলাই জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে বারিধারা জে ব্লকের ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকরা ঢাকা ৫ আসন থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ এমপি রহমত উল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতায় চিহ্নিতচক্র রাজধানীর নিকুঞ্জ, জোয়ার সাহারা ও জে ব্লক অবৈধভাবে দখল করে নেয়ার অভিযোগ করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রায় ৫০ জনের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত মালিক মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক বীর প্রতীক তথ্য দেন চিহ্নিত চক্র রাজউকের সঙ্গে যোগসাজশে প্রায় দেড়শ' প্লট অবৈধভাবে হাতিয়ে নিচ্ছে। এসব প্লট বরাদ্দ কমিটির সদস্য এমপি রক্ষক হয়ে ভক্ষকের ভূমিকায় নিজের স্বার্থ হাসিল করতে চলেছেন। তিনিই চিহ্নিত চক্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। যথাযথ তদন্ত হলে বেরিয়ে পড়বে এমপির সন্ত্রাসী কর্মকান্ড, লাখ লাখ টাকা ও বিপুল জমিজমা হাতিয়ে নেয়া শ' শ' কাহিনী।

আলেয়া বেগমকে (৫০) বিচারের কথা বলে খুলনা-৩ আসনের আওয়ামী লীগ এমপি কাজী সেকেন্দর আলী ডালিমের ভাই তারা কাজী ডেকে নিয়ে যায়। ২৫ জুন খালিশপুর থানার পুলিশ তারা কাজীর বাড়ি থেকে অপহৃত মহিলা আলেয়াকে উদ্ধার এবং মাতাল অবস্থায় তারা কাজীকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত তারা কাজীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজীরও অভিযোগ ছিল। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ২৭ জুন ১৯৯৯)

প্রধানমন্ত্রী গাজীপুর সদর থানার কাশিমপুর সারাব মৌজার ৮৩ নং খতিয়ানের ১৩৯ এসএ এর ২৪ নং দাগের মোট ১১.৩ একর জমির ঢাকার লালবাগ থানাধীন ১৯/২ ঢাকেশ্বরী রোডের আমির উদ্দিন ও মোসাম্মৎ নাসিমা বেগমের কাছ থেকে আওয়ামী ফাউন্ডেশনের নামে মোট ১৫ লাখ টাকা দিয়ে ক্রয় করেন। জমিটির পূর্বের নাম খারিজের জন্য প্রধানমন্ত্রী গাজীপুর সদর ভূমি অফিসে আবেদন করলে আবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে গিয়ে সপ্তাহ ধরে জমির সার্ভে করে সংশ্লিষ্ট অফিসের লোকজন দেখতে পান যে, দলিলে যে পরিমাণ জমি রয়েছে, পজিশনে রয়েছে এর অর্ধেকের মতো। আশপাশে যাদের জমি রয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই খাঁটি দলিল রয়েছে। ফলে তাদের জমি থেকে শেখ হাসিনাকে জমি দেয়া সম্ভব নয়। তাই শেষ পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী সড়ক ও জনপথ বিভাগের সরকারি জমি থেকে বাকী ৫ একর নিয়ে শেখ হাসিনার আওয়ামী ফাউন্ডেশনের ১১.৩ একর জমি বুঝিয়ে দেয়ার তথ্য প্রকাশ করে ৪ জুলাই-এর দৈনিক দিনকাল।

৫ জুলাই দৈনিক দিনকালে সংসদ ভবন সংলগ্ন মনিপুরি পাড়ায় উপমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরীর ভাই সাদেক হোসেন চৌধুরীর ফুটপাত দখল ও রাজউকের প্ল্যান বহির্ভূতভাবে নির্মাণ কাজের অভিযোগ প্রকাশ। মন্ত্রীর ভাইয়ের মালিকানাধীন এইচআরসি গ্রুপ সেখানে গোডাউন ও অফিস করার জন্য একখন্ড জমি ক্রয় করে। পঞ্চাশগজ দীর্ঘ ও তিনফুট প্রস্থ ফুটপাতের ইট বিছানো উচু ভূমি প্রকাশ্যে দখলও করে নেয়।

www.pathagar.com

দেড় বছর আগে রাজউকের প্লট বরাদ্দের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ঢাকার গুলশান-বনানী ও উত্তরায় ৩০১টি আবাসিক প্লটের জন্য বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর ১৩ হাজার ৪শ' ১৭ জন আবেদনকারী যথা নিয়মে আবেদন করে প্লট প্রাপ্তি তালিকায় ছিলেন। কিন্তু ৯ জুলাই ১৯৯৯ দৈনিক বাংলার বাণীতে প্লট প্রাপ্তদের যে তালিকা প্রকাশ করা হয় তাতে সবাই স্তম্ভিত হয়। মোট ৩০১টি প্লটের মধ্যে বিএনপির এমপি জিয়াউর হক জিয়া ও নাজিম উদ্দিন আলম, আওয়ামী লীগ পার্টনার মঞ্জুর জাতীয় পার্টির এমপি গোলাম ফারুক অভি, জামাতের একজন ও কয়েকজন বিচারপতি ছাড়া বাকী সব প্লট বরাদ্দ হয় আ'লীগ শিবিরে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রয়েছেন পরিবেশ ও বনমন্ত্রী সাজেদা চৌধুরী, পর্যটন ও পূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমা, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. এম আমান উল্লাহ, তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মাওলানা নূরুল ইসলাম, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র রায়, বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী আখম জাহাঙ্গীর হোসেন, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জিন্নাতুন নেসা তালুকদার ও শিল্প উপমন্ত্রী হাসিবুর রহমান স্বপন, মন্ত্রীর পদ মর্যাদা সম্পন্ন ড. এম আহসান উল্লাহ এবং প্রতিমন্ত্রী মর্যাদাসম্পন্ন হুইপ মোস্তফা রশিদী সূজা, উপমন্ত্রীর মর্যাদায় পাহাড়ী নেতা দীপংকর তালুকদার ও বীর বাহাদুর, প্রধানমন্ত্রীর ফুফু ফিরোজা বেগম, ফুপাতো ভাই চীপ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর মেয়ে কান্তা, বোন হেনা সেরনিয়াবত ও পুত্র সাদিক আব্দুল্লাহ, প্রধানমন্ত্রীর ভাই শেখ সেলিমের স্ত্রীর বড় ভাইয়ের ছেলে, মেয়র মোহাম্মদ হানিফের ছেলে মোহাম্মদ সাঈদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের চাচাতো ভাই গোলাম আবু ইনসুফ সূর্য, প্রধানমন্ত্রীর চাচাতো ভাই শেখ হেলাল উদ্দিন এমপি, আ'লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুল জলিল, ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন ও নূরুল ফজল বুলবুল ও তা স্ত্রী। প্লট প্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব ওবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরীর স্ত্রী ফাহিমা খাতুন, প্রধানমন্ত্রীর ২ জন এপিএস এফএম বাহাউদ্দিন নাসিম ও ইব্রাহিম হোসেন খান। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সচিব নকিব উদ্দিন আহম্মেদ, ব্যক্তিগত সহকারী মানু মজুমদার, প্রটোকল অফিসার আলাউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক ডিপিএস আবু আলম শহীদ খানের স্ত্রী নার্গিস বেগম, মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত স্টাফদের মধ্যে এলজিআরডি মন্ত্রী জিল্লুর রহমানের একান্ত সচিব নূরুজ্জামান ভূঁইয়া, পূর্ত মন্ত্রীর গণসংযোগ কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এপিএস রেহানুল ইসলাম, পরিবেশ ও বন মন্ত্রীর পিএস কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পিএস ইয়াকুব আলী, পাটোয়ারী, আ'লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য কামরুজ্জামান, যুবলীগের সাবেক সভাপতি নুরুল মজিদ হুমায়ুন, সাধারণ সম্পাদক ফুলু সরকার, প্রেসিডিয়াম সদস্য মাহবুব জামান ভুলু, আ'লীগ কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মুকুল বোস, দফতর সম্পাদক সিদ্দিকুর রউফ খান, যুবলীগ সাধারণ সম্পাদক কাজী ইকবাল হোসেন, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা অসীম কুমার উকিল, এসএম কামাল হোসেন, শফি আহমদ, শাহে আলম, জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকু, মঞ্জুরুল হক লাভলু, কামরুজ্জামান আনসারী, বাহালুল মজনুন চুন্নু, মিজানুর রহমান মিন্টু, আ'লীগের কেন্দ্রীয় নেতা কর্ণেল (অব.) শওকত আলীর ছেলে ড. খালেদ শওকত, হুইপ মিজানুর রহমান মানুর স্ত্রী দিলরুবা রহমান, আ'লীগের এমপি আব্দুল মান্নানের স্ত্রী খালেদা আক্তার বানু, প্রচার সম্পাদক আব্দুল মান্নানের স্ত্রী শাহাদারা মান্নান, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা এসএম মান্নান ও নুরল আমিন এবং ছাত্রলীগ নেতা পংকজ নাথের মা সবিতা নাথ, ব্যবসায়ী কোটায় আ'লীগ নেতা মাহমুদুর রহমান মান্না, অধ্যাপিকা

www.pathagar.com

নাজমা রহমান, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডা. এস এ মালেকের স্ত্রী সুলতানা নার্গিস বানু, মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর কন্যা মনিজা রহমান, গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ আব্দুল্লাহ, সিরাজগঞ্জ জেলা আ'লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু ইউসুফ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আ'লীগ নেতা লুৎফুল হাই সাচ্চু, চট্টগ্রামের জাফর আহমদ চৌধুরী, বগুড়া জেলা আ'লীগের সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস জামান মুকুল, রাজশাহীর নুরুল ইসলাম ঠান্ডু, মানিকগঞ্জের মোসলেহ উদ্দিন খান, গাইবান্ধার লুৎফুর রহমান প্রমুখ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মুনতাসির মামুন, শেখ মুজিবের হত্যা মামলার রায় ঘোষণাকারী বিচারক গোলাম রসূলের স্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সেক্রেটারী জাওয়াদুল করিমের ছেলে সোয়াত করিম, আ'লীগ পন্থী সাংবাদিক শফিকুর রহমান (ইত্তেফাক), মোড়ল নজরুল (ইত্তেফাক), আবুল কাশেম, আজিজুল ইসলাম ভূইয়া (বাসস এবং প্রধানমন্ত্রীর খবর সংগ্রহ করেন), নির্মলেন্দু গুণ (কবি) কিন্তু দেয়া হয়েছে সাংবাদিক হিসেবে। মোস্তফা ফিরোজ (ভোরের কাগজ), রেজা রায়হান (সংবাদ), যুবলীগের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক (বাণিজ্যিক কর্মকর্তা বাংলার বাণী), কামাল হায়দার (আল আমীন), মাহফুজুল হক (অবজারভার), মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ (আজকের কাগজ), পাভেল রহমান (ফটো সাংবাদিক)। অবশ্য প্লট বরাদ্দে কোন অনিয়ম হয়নি বলে-প্রধানমন্ত্রী ১৫ জুলাই ১৯৯৯ বৃটেন সফর শেষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্লট বরাদ্দ বাতিল ঘোষণা করেন।

৩০ মে রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংক অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে এম নাজমুল হক দায়িত্ব গ্রহণের পর ব্যাংকের প্রশাসনিক কাঠামোতে রদবদল ও পুনর্বিন্যাসের উদ্যোগ নিলে ব্যাংক কর্মকর্তাদের সরকারি দলের সমর্থিত একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ড. মালেকের শরণাপন্ন হয়। ড. মালেক ব্যাংক পরিচালককে তার পদক্ষেপ স্থগিত করতে চাপ দিলে ১২ জুলাই তিনি পদত্যাগ করেন।

২০ জুলাই বিকেল ৫টার দিকে তেজগাঁও-রমনার আ'লীগ এমপি ডা. এইচবিএম ইকবাল পাজারো গাড়ী চড়ে সঙ্গে ৩টি মাইক্রোবাসে ৩০/৩২ জন যুবলীগ ক্যাডার ও অপর ভ্যানে ১০/১২ জন পুলিশ নিয়ে মগবাজার মোড়ে ২ নিউ ইস্কাটনের ৮ম তলা ভবনে প্রবেশ করে লোকজনকে দ্রুত বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। রমনা থানার ওসি রফিক এমপির এ অভিযানকালে উপস্থিত থেকে তাকে সহায়তা করেন। ভয়ে অফিসের কাজ এলোমেলোভাবে ফেলে রেখে বিভিন্ন ফ্লোরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অফিস ত্যাগ করেন। ঢাকা ডায়িং-এর জিএম মকিম চৌধুরী কাগজপত্র গুছিয়ে নেমে আসতে দেরী হওয়ায় যুবলীগ কর্মীরা তার ৬ তলার অফিসে গিয়ে তাকে লাঞ্ছিত করে। যুবলীগ কর্মীরা তাকে নিচে নামিয়ে আনলে ডা. ইকবাল তার কাছ থেকে গাড়ির চাবি কেড়ে নেন এবং মকিম চৌধুরীকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেন। এমপির নির্দেশে পুলিশ জিএমকে হ্যান্ডক্যাপ লাগিয়ে ধাক্কাতে ধাক্কাতে পুলিশ ভ্যানে তুলে রমনা থানায় নিয়ে যায়। পরে যুবলীগ কর্মীরা গেট বন্ধ করে দিয়ে তালা ঝুলিয়ে দেয়। ভবন দখলের ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত ও বিজিএমই'র চাপে অবশেষে পরের দিন বেলা ২টায় ভবনের প্রধান গেটের তালা খুলে দিয়ে দখল ছেড়ে দেয়া হয়। তারা খুলে দেয়ার আগে যুবলীগ কর্মীরা ভবনের ৬ থেকে ৮ তালায় অবস্থিত ঢাকা ডায়িং-এর দরজা ও জানালার কাঁচ, চেয়ার টেবিল, ৮টি সেলাই মেশিন ও একটি ট্রাক ভাঙচুর করে। ২২ জুলাই সন্ধ্যায় ইস্পাহানী স্কুল এন্ড কলেজে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দখলের অজুহাত সম্পর্কে ইকবাল বলেন, 'আমি ভবন দখলের জন্য নয় বরং বিক্ষুব্ধ জনতার হাত থেকে ওই ভবনটি রক্ষার জন্যই

www.pathagar.com

সেখানে গিয়েছিলাম। আমি সেখানে না গেলে বিক্ষুব্ধ জনতা কাউকে ছেড়ে দিত না। অথচ একটি মহল জনসমক্ষে আমাকে সন্ত্রাসী বানানোর পাঁয়তারা চালাচ্ছে।'

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সালাহউদ্দিন ইউসুফ বড় জামাইয়ের কথা মতো খুলনার আওয়ামী লীগ কর্মী আবু তাহের রউফকে এপিএস রিক্রুট করে ফেঁসে যান বলে একটি জাতীয় দৈনিকে তথ্য প্রকাশ। মন্ত্রীর জামাতার সুপারিশেই তাহেরকে জানুয়ারিতে নিয়োগ দেয়া হয়। ২৮ জুন মন্ত্রী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের জনসংখ্যা বিষয়ক বিশেষ অধিবেশনে যোগ দেন ১৫ সদস্যের একটি সরকারি প্রতিনিধি দল নিয়ে। ওই প্রতিনিধি দলের সদস্যরা দেশে ফিরলেও মন্ত্রী নিউইয়র্ক থেকে জাপানের টোকিওতে যান জনসংখ্যা বিষয়ক একটি বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য। মন্ত্রীর সঙ্গে এপিএসের টোকিও যাওয়ার কথা থাকলেও তিনি যাননি। এপিএস রয়ে যান নিউইয়র্কে। এপিএস টোকিওতে অবস্থানের জন্য প্রতিদিনের জন্য ৩শ' ডলার করে ৫ দিনের দেড় হাজার ডলার ভাতা নিয়ে লাপাত্তা হয়ে যান। মন্ত্রী ১০ জুলাই দেশে ফিরলেও এপিএস যুক্তরাষ্ট্রেই রয়ে যান। মন্ত্রী দেশে ফিরে নতুন এপিএস নিয়োগের কথা সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে জানালে এপিএস নিরুদ্দেশের ঘটনাটি ধরা পড়ে। (সূত্রঃ দৈনিক মানব জমিন ২৪ জুলাই ১৯৯৯)

২২ জুলাই সকাল ৯ টায় কামরাঙ্গীরচরের হাক্কুল এবাদ বেইলী ব্রীজ ও আশ্রাফাবাদ ছাতাওয়ালা জামে মসজিদ সংলগ্ন হাফিজ ফ্লাওয়ার মিল (বাবরের ময়দার মিল)-এ অবস্থিত কামরাঙ্গীরচরের ভূমি রেকর্ড ও জরিপ কাজ পরিচালনার জন্য স্থাপিত সরকারি ভূমি তসদিক ক্যাম্পটি হাজী সেলিম এমপি ও তার ক্যাডারদের নির্দেশে অবৈধভাবে জোরপূর্বক তার বাড়িতে স্থানান্তর ও চাঁদাবাজী করা হয়। এর প্রতিবাদে কামরাঙ্গীরচরের সর্বস্তরের জনগণ প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল বের করে এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদফতরের মহা পরিচালকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে।

১২ আগষ্ট সন্ধ্যা ৭টায় সেনাকুঞ্জে বিরোধী দলীয় উপনেতা প্রফেসর একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী কনিষ্ঠ কন্যা ডাক্তার সায়লা শাফিয়া চৌধুরীর সঙ্গে শিল্পপতি রিয়াজ কাজলের প্রথম পুত্র ফাইয়াজ কাজলের বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল। মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য বিরোধী দলীয় উপনেতা রাজনীতিবিদ ও জনপ্রতিনিধিসহ অনেককেই দাওয়াত করেন। কিন্তু সকাল ৯টায় হঠাৎ করে তিনি সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা থেকে একটা চিঠি পান। চিঠিতে বলা হয়, 'নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্যান্যদের সেনাকুঞ্জে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করা হইল।' বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদানের ব্যাপারে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা যে ১২৬ জনকে অনুমতি দেয়নি তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও প্রখ্যাত আইনজীবী এডভোকেট খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমদ, সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার এমপি, সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা এমপি, সাবেক মন্ত্রী শামসুল ইসলাম এমপি, সাবেক মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম, সাবেক মন্ত্রী এমকে আনোয়ার, সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল (অব.) জেড. এ. খান, সাদেক হোসেন খোকা এমপি, শাহজাহান সিরাজ, সাবেক প্রতিমন্ত্রী ফজলুর রহমান পটল এমপি, আমানউল্লাহ আমান এমপি, এহসানুল হক মিলন এমপি, এমরান সালেহ প্রিন্স, আওয়ামী লীগ এমপি কাদের সিদ্দিকী, জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল মতিউর রহমান নিজামী, নায়েবে আমীর আব্বাস আলী খান, দেলোয়ার হোসেন সাঈদী এমপি, মোহাম্মদ কায়কোবাদ এমপি, জুলফিকার আলী ভুট্টো

www.pathagar.com

এমপি, রোস্তম আলী ফরাজী এমপি, বিএনপি নেতা এমএইচ খান মঞ্জু, জিয়া পরিষদ সভাপতি কবির মুরাদ প্রমুখ।

আওয়ামী সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর দেশের কৃষিখাতে ঋণদানকারী বাংলাদেশে কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী উন্নয়ন ব্যাংকের (রাকাব) চেয়ারম্যান পদে যথাক্রমে আওয়ামী লীগ উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য এম এ জলিল এবং রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজুল ইসলাম মোহাম্মদ ফারুককে বসিয়ে দেয়। তারা দু'জন চেয়ারম্যান পদে বসার পর থেকে ২৩ জুন ১৯৯৯ পর্যন্ত তিন বছরে দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ৪ হাজার ৬শ' ৫০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাকাবের অডিট বিভাগের গোপন রিপোর্টের ভিত্তিতেই সরকার উচ্চ পর্যায়ের কমিটির মাধ্যমে ৬ মাস ধরে তদন্ত চালিয়ে রাকাবের চেয়ারম্যানের দুর্নীতি ও অনিয়মের মধ্যে খুঁজে পায় ১৯৯৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর থেকে রাকাবের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি বিশ্ব ব্যাংকের অনুদানে ১১ কোটি ৬৮ লাখ ৪০ হাজার ডলারের প্রস্তাবিত রাকাব পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেননি। কথা ছিল ১৯৯৮ থেকে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে এবং ৩টি পর্যায়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু এর কিছুই না করে ৩ বছরে তশ' কর্মকর্তা এবং প্রায় ৭শ' কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা করেন। এসব নিয়োগে নিয়ম-কানুন অনুসরণ না করায় মেধা যাচাইয়ের সুযোগ হয়নি। ঋণদান ক্ষেত্রে যথাযথ মূল্যায়ন না করে ইচ্ছামত ঋণ দেয়া হয়েছে। ক্রমাগত লোকসান ও শ্রেণী বিন্যস্ত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও বকেয়া ঋণ আদায়ে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এমনি অবস্থা ২৩ আগষ্ট চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনকালে প্রতিষ্ঠানের মাথায় ১ হাজার ২শ' কোটি টাকা ঋণের বোঝা চাপিয়ে পদত্যাগ করেন। (সূত্র ঃ দৈনিক দিনকাল ২৪ আগষ্ট ১৯৯৯)

প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির সহায়তায় ঢাকায় ৪ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এশিয়ান পার্লামেন্টারিয়ানদের সম্মেলনে গঠিত এসোসিয়েশন অব এশিয়ান পার্লামেন্ট ফর পিসের চেয়ারম্যান স্পীকার হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী হওয়া কথা থাকলেও প্রধানমন্ত্রী হাসিনা চেয়ারম্যানের পদটি হাইজ্যাক করেন। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)

৯ সেপ্টেম্বর বিএনপির সর্বস্তরের নেতা-কর্মীর কাছে পরিচিত মুখ হারুন গাজীকে মতিঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ হানিফের নেতৃত্বে একদল পুলিশ দিবাগত রাতে ১৯৫ ফকিরাপুল বাসার সামনে থেকে গ্রেফতার করে একটি পরিকল্পিত গল্পের সূচনা করে। তার গায়ে একটি ব্যানার লটকিয়ে ছবি তোলার পর পুলিশের জনসংযোগ বিভাগ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সংবাদ মাধ্যমে ছবিটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিসহ সরবরাহ করে। সহকারী পুলিশ কমিশনার (জনসংযোগ) মোঃ জহুরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'হারুন গাজীর বাসা থেকে পুলিশ ৯টি শক্তিশালী তাজা বোমা (ককটেল জাতীয়) উদ্ধার করেছে। একই সঙ্গে পুলিশ তার ঘরে থাকা সরকার বিরোধী আন্দোলন সংক্রান্ত বক্তব্য লেখা কয়েকটি ব্যানার ও ফেস্টুন উদ্ধার করে।' প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, 'কাপড়ে লেখা ফেস্টুনগুলো মিছিলের সময় তার শরীরের সামনে ও পিছনে বেঁধে এবং ব্যানারগুলো হাতে নিয়ে মিছিলের আগে-পিছে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় সে নৃত্য করে।'

আওয়ামী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর রাজপথ বন্ধ রেখে জনসভা করা যাবে না বলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ঢাকা সিটি কর্পোরেশন। সে নিষেধাজ্ঞা বিরোধী দলের ক্ষেত্রে বলবৎ রেখে প্রধানমন্ত্রী ১০ সেপ্টেম্বর কলাবাগান মাঠে আওয়ামী লীগ আহূত এক জনসভায় ভাষণ

www.pathagar.com

প্রদান করেন। জনসভার বেশ কিছুক্ষণ আগে মিরপুর, গ্রীন রোড সংশ্লিষ্ট সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে লোকজনকেও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পায়ে হেঁটে যাওয়ার ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হতে হয়। পুলিশ তাদের দেহ তল্লাশি করেছে, কোন কোন ক্ষেত্রে মেটাল ডিটেক্টরও ব্যবহার করেছে।

১৯ সেপ্টেম্বর সাতক্ষীরা জেলার তালা থানায় পাটকেলঘাটা বাজারে দীর্ঘ ২৯ বছর ধরে বসবাসরত বাবর আলী, মকবুল হোসেন আলতাফ ও আকবর হোসেনের জায়গা দখলের জন্য স্থানীয় আওয়ামী এমপি সৈয়দ কামাল বখত সাকি, তার ভাই সৈয়দ খালেদ বখত বুচু, তার ছেলে ফিরোজ কামাল শুভ্র, স্থানীয় সম্পদশালী ব্যক্তি আলতাফ হোসেন, আওয়ামী লীগ নেতা লুৎফুল করিমসহ যুবলীগ, ছাত্রলীগ কর্মীরা দু'ঘন্টা ধরে তান্ডব চালিয়ে ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা কেটে সমতল ভূমিসহ পাঁচ দিনের শিশু কন্যার মুখমন্ডলে গরম পানি ঢেলে ঝলসে দেয়।

২৫ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশ, কক্সবাজার জেলার চকরিয়া থানার সমুদ্র উপকূলীয় বদরখালী ইউনিয়নের আওয়ামী নেতা ১৯৯৭ সালের প্রথম দিকে বদরখালী সমবায় কৃষি ও উপনিবেশ সমিতির কাছে বঙ্গবন্ধু পরিষদের স্থায়ী কার্যালয় নির্মাণের নিমিত্তে একখন্ড জমি বরাদ্দ চায়। সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটি ৮ ফেব্রুয়ারি বাজার ও ভেড়িবাঁধের পাশে পরিষদের কার্যালয় নির্মাণের জন্য বিনামূল্যে ১৫ ফুট বাই ২০ ফুট জায়গা লীজ দেয়। পরিষদের সভাপতি এসএম আখতার কামাল নিজের নামে এ জমি লিখে নিয়ে একটি ঘর নির্মাণ করে ঘরের চালের ওপর পরিষদের একটি সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে কতিপয় অনুসারী নিয়ে বরাদ্দকৃত জায়গার দুই পাশের খালি জায়গা থেকে আরও ২০ ফুট বাই ৩০ ফুট জায়গা জবর দখল করে নির্মিত ঘরটির পরিধি বাড়ায়। আখতার কামাল পরিষদের নাম ভাঙ্গিয়ে বরাদ্দ নেয়া ও জবর দখল করা জায়গাটিতে ৩টি দোকান ঘর নির্মাণ করে প্রতিটি দোকান থেকে ৩০ হাজার টাকা করে সেলামী নিয়ে নিজে মহাজন সেজে ৯০ হাজার টাকা পকেটস্থ করে। এছাড়া পরিষদের স্থায়ী ভবন নির্মাণের জন্য সমবায় সমিতির নির্বাচনে ৪০ জন প্রার্থীর কাছ থেকে ১ হাজার টাকা করে ৪০ হাজার টাকা, বিভিন্ন বিত্তশালী, সরকারি কর্মকর্তা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, ব্যবসায়ী, ঠিকাদারসহ অসংখ্য মানুষের কাছ থেকে কয়েক লাখ টাকা, একটি টেলিভিশন, একটি হারমোনিয়াম চাঁদা হিসেবে গ্রহণ করে নিজে আত্মসাৎ করে।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাস তিনেকের বেতন বকেয়া পড়লেও প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান শেখ কবির হোসেনের বিশেষ ইচ্ছায় সোসাইটির ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একটি ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে ১৫৩ তম সাধারণ সভা সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে ২৫-২৮ সেপ্টেম্বর আয়োজনের জন্য পর্যটন মোটেল শৈবাল ও উপলক্ষে কক্ষ বুকিং করা হয়।

প্যারিসে ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার গ্রহণ শেষে ২৬ সেপ্টেম্বর ১১-৩০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবনে যাবার সময় তাকে যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা হাত নেড়ে অভিবাদন জানায়, সে জন্য ভোর থেকে বিমানবন্দর, মহাখালী, সংসদ ভবন পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের দাঁড় করিয়ে অমানবিক কষ্ট দেয়া হয়। শেখ মুজিব-শেখ হাসিনার ছবি সংবলিত ফেস্টুন, ফুল, পতাকা, ব্যানারসহ প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করার বিভিন্ন সরঞ্জাম। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে শিশু-কিশোররা অস্থির হয়ে পড়লেও তাদের ছুটি দেয়া হয়নি। ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর শিশুদের সামান্য পানিটুকুও সরবরাহ করা হয়নি। বিকেলে পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগ আয়োজিত

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রীর সংবর্ধনায় বিপুল জনসমাগম করার লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষে দলীয় লোকজনকে রাজধানীতে জড়ো করা হয়। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা এবং বাইরে থেকে আনার জন্য শ' শ' বাস, মিনিবাস, রিকুইজিশন করে যানবাহন সংকটের সৃষ্টি করা হয়। সরকারি যানবাহনের যথেচ্ছা ব্যবহার করে রাজধানী এবং নারায়ণগঞ্জের বেশকিছু মিল-কারখানা বন্ধ করে শ্রমিকদের সংবর্ধনা সভায় যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। ঢাকা ও মফস্বলের ৬১টি দৈনিক পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকশ করা হয়। বর্ণাঢ্য পোষ্টারে ঢাকা ছেঁয়ে যায়।

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের মুক্তি সরণী এলাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় কৃষক লীগের সহ-সভাপতি মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিনের মালিকানাধীন কাসসাফ শপিং সেন্টারের জমি দখলের বিরোধ নিয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর সকালে আওয়ামী লীগের দু'গ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ৩ জন পুলিশসহ প্রায় ৪০ জন আহত হয়। গিয়াস উদ্দিন সকাল ৯টায় শপিং সেন্টারের সম্প্রসারণ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য শুকরানা মিলাদ মাহফিল আয়োজন করে। এ সময় পরিবহন সেক্টরের চাঁদাবাজ আওয়ামী লীগ নেতা নূর হোসেন, মাকসুদ ও তার সহযোগী মিঠু গং এর ক্যাডার বাহিনী পুলিশের ছত্রচ্ছায়ায় হামলা চালায়। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ গিয়াস উদ্দিনের পক্ষের লোকজনকে গ্রেফতার করলেও অন্যপক্ষের কাউকে গ্রেফতার করেনি।

২ অক্টোবর দৈনিক দিনকালে প্রকাশিত একটি ছবির ক্যাপশনের ভাষা ছিল, 'গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী কি জনগণকে ভয় পান? সরকারি দল আওয়ামী লীগের কথায় শেখ হাসিনাকে জনগণের প্রধানমন্ত্রী বলে খৈ ফোটায়। জনগণের প্রধানমন্ত্রী বটে! গতকাল তিনি বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে সংবর্ধনা নিতে যাবার সময় ঢাকার রাজপথ দিয়ে যাবেন তাই আধ ঘন্টা আগ থেকে সব রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর যাতায়াতকালে এ নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তার কারণে অনেক রাস্তায় যানবাহন আটকা পড়েছিল। ছুটির দিনেও পথচারীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।'

মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় মিনি পার্কটি ঢাকা মহানগর বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের নেতারা অবৈধভাবে দখল করে নিয়েছে বলে ১০ অক্টোবর দৈনিক সংবাদে প্রকাশ। পার্কে গিয়ে দেখা গেছে এ সংগঠনের নেতারা পার্কের ভেতরে টিনের একটি দু'চালা ঘর উঠিয়ে অবস্থান নিয়েছে। এ ঘর উঠানোর বৈধতা আছে কিনা সংগঠনের নেতাদের প্রশ্ন করা হলে তারা জানান, মেয়রের অনুমতি নিয়েই আমরা এখানে ঘর উঠিয়েছে।'

১৭ অক্টোবর দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশ, আওয়ামী কেন্দ্রীয় অফিসের পশ্চিম পাশের দেয়াল ঘেঁষে রাস্তার ওপর কাচের ফ্রেমের একটি নতুন দোতলা মার্কেটের নির্মাণ কাজ এলাকার মাস্তান-চাঁদাবাজ, আওয়ামী কতিপয় স্থানীয় নেতার যোগসাজশে এগিয়ে চলেছে। রাস্তার পার্শ্বের খালি প্লটটি হচ্ছে জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ-এর (নাটাব)। ৩/৪ মাস পূর্বে নাটাবোর খালি জায়গায় উল্লেখিত মার্কেটটি রাতারাতি নির্মাণ করা হয়েছিল। তখন নাটাবের সভাপতি অধ্যাপক ডা. এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে মার্কেটটি ভেঙ্গে ফেলেন। নাটাবের জায়গার ওপর হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। অবৈধভাবে নির্মিতব্য এ মার্কেটটির সাইনবোর্ডে নাম লেখা না হলেও দোকানদার সমিতি মার্কেটটির নাম প্রধানমন্ত্রীর পুত্রের নামে রাখেন জয় মার্কেট।

২৪ অক্টোবর পূর্ব ঘোষিত সিটি মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন আহমদের বিরুদ্ধে হরতাল আহবান করলে কর্পোরেশনের বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের বাসভবনে মল নিক্ষেপ করা হবে তা

www.pathagar.com

বাস্তবায়িত হয়েছে বিএনপি চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি ও প্রাক্তন সিটি মেয়র মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের চট্টেশ্বরী রোডের গাজী শাহ লেইনস্থ বাসভবনের সামনে সিটি কর্পোরেশনের আবর্জনা ট্রাকে করে আনা মল ও আবর্জনা নিক্ষেপ করে। মীর নাসিরের বাসভবনের রাস্তা জুড়ে মূল প্রবেশপথ এবং সামনের রাস্তা জুড়ে এই ময়লা-আবর্জনায় ভরে যায় এবং বাড়ির সদস্য-সদস্যারা কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

৩ নভেম্বর কাকরাইল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট সংলগ্ন গলিতে অবস্থিত ঢাকা মহানগর পুরাতন ব্যাটারী ব্যবসায়ী মালিক গ্রুপের অস্থায়ী কার্যালয় থেকে সাইনবোর্ড ফেলে দিয়ে আওয়ামী যুবলীগের নাম ব্যবহার করে নয়ন, বসন্ত, মোখলেছ, জাকির, আলমগীর, কাজল, মনসুর, কালু, মকবুল, রহিম ও বাবুলসহ কিছু অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী কার্যালয়টি জোর করে দখল করে নেয়। তারা সেখানে এই ব্যবসায়ী গ্রুপের সাইনবোর্ড ফেলে দিয়ে আওয়ামী লীগের সাইনবোর্ড এবং শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি টানায়। এর পূর্বে উক্ত সন্ত্রাসীরা কাকরাইলের বিপাশা হোটেল একইভাবে দখল করলে যুবলীগ সভাপতি শেখ সেলিম তাতে হস্তক্ষেপ করে সমস্যার সমাধান করেন।

১৯৯৫ সালের ২ জানুয়ারি বোর্ড অব গবর্নসের সভায় ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের চাকরি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। এ অনুযায়ী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিলেকশন কমিটির মাধ্যমে সহকারী অধ্যাপকদের মধ্যে থেকে দু'জনকে ভাইস প্রিন্সিপাল নিয়োগের বিধান রয়েছে। ভাইস প্রিন্সিপালের দু'টি শূন্য পদ পূরণের জন্য ২০০০ সালের শুরুর দিকে সহকারী অধ্যাপকদের কাছ থেকে আবেদন চাওয়া হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২৮ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. আজহার আলীকে চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক আব্দুস সাত্তারকে সদস্য সচিব করে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি সিলেকশন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্য দু'জন সদস্য হলের অধ্যাপক এস এম ইমামুল হক ও জালাল উদ্দিন রুমী। ভিসি একে আজাদ চৌধুরী ১ মার্চ এই সিলেকশন কমিটি অনুমোদন করেন। অনুমোদিত সিলেকশন কমিটি ২০ মার্চ আবেদনকারী ৭ জন প্রার্থীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। সিলেকশন কমিটি সহকারী অধ্যাপক আব্দুল হাকিম মোল্লা ও এফ এম আবুল হাশেমকে মনোনীত করে। ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য তাদের নাম ১২ এপ্রিল ভিসির নিকট পেশ করা হয়। কিন্তু ভিসি দলীয় শিক্ষকদের প্ররোচনায় সিলেকশন কমিটির সুপারিশ অনুমোদন বা বাতিল না করে বিষয়টি পরে দেখবেন বলে পরিচালককে জানান। এর মধ্যে ড. আজহার আলী শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই নতুন পরিচালক পূর্বের সিলেকশন কমিটির সুপারিশ তোয়াক্কা না করে ২৫ সেপ্টেম্বর মিসেস কামরুন নাহার ও আব্দুল হাকিম মোল্লাকে ভাইস প্রিন্সিপাল এবং আওয়ামী পন্থী শিক্ষক নেতা শাহজাহান তপনের স্ত্রী সেলিনা বানুকে ভাইস প্রিন্সিপাল পদ মর্যাদায় প্রাইমারী শাখায় শিক্ষক ইনচার্জ নিয়োগের জন্য ভিসির কাছে প্রস্তাব করেন। তার প্রস্তাবে সিলেকশন কমিটি মনোনীত এফ এম আবুল হামেশের নাম বাদ দেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ড. শাহাদাত আলী ৩ অক্টোবর এই প্রস্তাব সুপারিশ করে ভিসির নিকট প্রেরণ করেন। ভিসি ওই দিনই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এরপর সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের স্ব স্ব পদে নিয়োগ দেয়া হয়। (সূত্র ঃ দৈনিক দিনকাল ৪ নভেম্বর ১৯৯৯)

২২ নভেম্বর কাপাসিয়া ডিগ্রী কলেজের নবীনবরণ ১৯৯৯ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি আফসার উদ্দিন আহমেদ খান এমপি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা

www.pathagar.com

করতে গিয়ে নিজ দলের সন্ত্রাসীদের কোপানলে পড়ে সন্ত্রাসীদের দ্বারা লাঞ্ছিত হন। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোঃ ফজলুল হকের সভাপতিত্বে নবীনবরণ অনুষ্ঠানে ছাত্রদলকে দোষারোপ করে স্বেচ্ছাচারী বক্তৃতা শুরু হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ আয়োজিত অনুষ্ঠানে কোনো বিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বক্তৃতা করতে না দিয়ে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের দিয়ে ছাত্রদলের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক বক্তব্য রাখা হয়।

২৪ নভেম্বর মোহাম্মদপুর থানাধীন জহুরী মহল্লা এলাকায় হাউজিং এস্টেট ২৯ নং রেডসিটার কলোনীর বাচ্চাদের খেলাধুলার মাঠ ও শিশুপার্ক আওয়ামী লীগ দখল করে নেয়। এর আগের দিন দখল করতে এলে এলাকাবাসীর প্রতিরোধের মুখে তারা ফিরে যায়। ২৪ নভেম্বর রাত ১০টায় আওয়ামী লীগের একজন প্রভাবশালী নেতার জোরে ৩ শতাধিক সশস্ত্র ক্যাডার এ মাঠটি দখল করে নেয়। মাঠটি দখল করে সেখানের চারদিকে দেয়াল দেয়া হয়। এ ব্যাপারে গণপূর্ত মন্ত্রী, স্থানীয় এমপি ও পুলিশ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনো ফল পাওয়া যায়নি। বরং স্থানীয় এমপি ও পুলিশ দখলদারদের পক্ষে অবস্থান নেয়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে মহানগরীর খেলার মাঠ, উম্মুক্ত স্থান ও জমির প্রকৃতির পরিবর্তন করে নির্মাণ কাজ শুরুর পর প্রধানমন্ত্রী মূখ্য সচিব ড. সৈয়দ আব্দুস সামাদ এক চিঠিতে নিষেধাজ্ঞা জারির কথা উল্লেখ করলেও নির্দেশ লংঘন করে শিশু পার্ক ও খেলার মাঠের জন্য সংরক্ষিত এ জমি জবর দখল করা হয়।

৫১ মতিঝিলের দক্ষিণ পাশে গাড়ি পার্কিং এর জন্য সরকার নির্ধারিত জায়গাটি ডিসেম্বরের প্রথমদিকে দখল করে নেয় আওয়ামীরা। এ স্থানে দখলদাররা টিনসেড, বিল্ডিং তৈরি করেছে। মতিঝিল টয়োটা ভবনের বিপরীত দিকে ফকিরাপুল সড়কের মুখেই তৈরি করা হয় বেশ কিছু অবৈধ ঘর। মিল ব্যারাক, আইজি গেট, এলাকা ১শ' পাকা অবৈধ ঘর ছিল। এখানে ছিল আওয়ামী লীগের বিশাল অফিস। গুলিস্তান পার্ক দখল করে তৈরি করা হয় ৫৬ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও হকার্স লীগের কার্যালয়।

১ ডিসেম্বর ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশল বিভাগ-১ অঞ্চলের ১৫টি ওয়ার্ডের ৬ কোটি টাকার সড়ক সংক্রান্ত কাজের টেন্ডার সিডিউল স্থানীয় যুব ও ছাত্রলীগের কর্মীরা অন্য কোনো ঠিকাদারকে ক্রয় করতে দেয়নি। প্রাকাশ্যে বোমা ফাটিয়ে অস্ত্র দেখিয়ে গুলি ও হুমকির মুখে তারা সিডিউল ক্রয় করতে আসা শতাধিক ঠিকাদারকে সিডিউল ক্রয় করতে দেয়নি। তারা ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক ডেপুটি মেয়র খালেকুজ্জামানসহ ১৫ জন ঠিকাদারকে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত করে কর্পোরেশন অফিস থেকে বের করে দেয়।

১৫ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানা এলাকায় নির্মাণাধীন দেশের ৩নং জাতীয় স্টেডিয়াম উদ্বোধন উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর আগাম নির্বাচনী জনসভা হয়। জনসভার জন্য এশিয়ার বৃহত্তম আদমজী পাটকলসহ জেলার মিল কারখানা ও গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী বন্ধ থাকায় একদিনে কয়েক কোটি টাকা লোকসান দিতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর জনসভা উপলক্ষে আদমজীতে সকাল বেলা থেকে কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। শ্রমিকরা প্রহর গুনতে থাকে কখন ২টা বাজবে। কারন তাদের বাধ্যতামূলকভাবে জনসভায় যেতে হবে। জনসভায় না গেলে তাদের ওপর চলবে হয়রানি ও নির্যাতন। দুপুর ১২টা থেকে মিলের উৎপাদন হয় নামকাওয়াস্তে। মিল বন্ধ থাকায় আদমজীসহ উৎপাদনে ক্ষতি হয় প্রায় এক কোটি টাকা। এছাড়া ফতুল্লা শিল্পাঞ্চল, সিদ্ধিরগঞ্জ শিল্পাঞ্চলসহ সোনারগাঁও, আড়াইহাজার থানা এলাকার কল-কারখানা বন্ধ করে লোক আনা হয় গাড়ি ভর্তি করে। আওয়ামী লীগ নেতারা মিল-কলকারখানা জোর করে বন্ধ

www.pathagar.com

করে বাস-ট্রাক ভরে লোক আনতে বাধ্য করে। শহর ও শহরতলির সমস্ত গার্মেন্টস-ফ্যাক্টরী বন্ধ করে শ্রমিক নিয়ে আসতে বাধ্য করা হয়। মিল-কারখানা বন্ধ থাকার ফলে মালিকদের লাখ লাখ টাকা লোকসান হয়। প্রধানমন্ত্রীর সভামঞ্চে ও সভামঞ্চের আশপাশে পুলিশের খাতায় চিহ্নিত অবৈধ অস্ত্রধারীরা ছিল। পাশাপাশি সেনাবাহিনী ও পুলিশ ছিল। এক পর্যায়ে চিহ্নিত ক্যাডার বাহিনীর নেতারা হুড়োহুড়ি শুরু করে দেয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ছবি তোলার জন্য।

১৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় বৈকালী মোড় এলাকায় খুলনা-৩ আসনের আওয়ামী লীগ এমপি কাজী সেকেন্দর আলী ডালিমের নেতৃত্বে একটি হরতাল বিরোধী মিছিলের ওপর কে বা কারা দু'টি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এ সময়ে হরতাল সমর্থনকারী পিকেটারদের সাথে মিছিলকারীদের ব্যাপক ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, ইটপাটকেল নিক্ষেপ হয়। এরপর এমপির নেতৃত্বাধীন মিছিল পুলিশের সহায়তায় স্থানীয় বিএনপির অফিসে হামলা ও ভাঙচুর করে। হরতাল বিরোধীদের হামলার ১১নং ওয়ার্ড বিএনপি সভাপতি জহুর মীর, হাদি, মতিয়া, আলতাফসহ কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ পান ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ জেলা শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি ড. আনোয়ারুল ইসলাম। এ নিয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ও উপদেষ্টা পদমর্যাদার ১১ জন ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ পান। এর আগে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সদস্য অধ্যাপক আব্দুল মান্নান ভাইস চ্যান্সেলর হন। এছাড়া সরকারি অর্থে পরিচালিত রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর, ইসলামী, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, খুলনা, জাতীয়, উন্মুক্ত ও মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগের সমর্থক বুদ্ধিজীবী ফোরাম বঙ্গবন্ধু পরিষদের সঙ্গে জড়িত অধ্যাপকগণ ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ৩ মার্চ ২০০০)

৪ এপ্রিল বিরোধী দল বিহীন জাতীয় সংসদে স্পীকার হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী বিএনপি'র এমপি শামসুদ্দিন আহমদ এসহাকের আসন শূন্য বলে ঘোষণা দেন। দুপুরে স্পীকার তার রুলিং-এ বলেন, 'আমি সংসদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ১৯৭ নরসিংদী-১ আসন থেকে নির্বাচিত মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব শামসুদ্দিন আহমদ এসহাক অনুমতি না নিয়ে সপ্তম জাতীয় সংসদের নবম অধিবেশন থেকে পঞ্চদশ অধিবেশন পর্যন্ত একাদিক্রমে সংসদের ১০১টি বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৭ অনুচ্ছেদের (১) (খ) দফা অনুযায়ী সংসদের অনুমতি না নিয়ে কোনো সংসদ সদস্য একাধিক্রমে সংসদের ৯০ বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলে তার আসন শূন্য হবে। অতএব সংবিধানের ৬৭ অনুচ্ছেদের (১) (খ) দফা অনুযায়ী ১৯৭ নরসিংদী-১ আসন থেকে নির্বাচিত মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব শামসুদ্দিন আহমদ এসহাকের আসনটি শূন্য হয়েছে। কার্যপ্রণালী বিধির ১৭৮ (৩) বিধি অনুযায়ী বিষয়টি মহান সংসদে অবহিত করা হলো।

স্পীকারের এ ঘোষণার সময় সংসদ কক্ষে উপস্থিত চীপ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ বেশ তৎপর ছিলেন। বিরোধী দলীয় চীপ হুইপ খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১৮০ উল্লেখ করে স্পীকারের এ ঘোষণা অবৈধ বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'সরাসরি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত একজন সংসদ সদস্যের আসন শূন্য ঘোষণার এ ঘটনাটি নজিরবিহীন। এ সিদ্ধান্ত স্পীকারের রাজনৈতিক পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত।' সংসদ সদস্যের উপস্থিতি স্বাক্ষরের জন্য একটি বই রাখা হয়। সংসদের লবিতে সেটি প্রতিদিনই রাখা

www.pathagar.com

হয়। প্রতিদিন স্বাক্ষরের পর সেই বই সচিবালয়ের লোকেরা নিয়ে যায় এবং পরে আর সেই বই ফেরৎ আনা হয়। এর ফলে ১৮০ বিধি অনুযায়ী সদস্যগণ কর্তৃক পরিদর্শন-এর কোনো সুযোগই থাকবে না। ৯০ দিন অতিবাহিত হলে মোট সদস্যদের উপস্থিতি পরীক্ষা করার সুযোগই থাকবে না। সরকারি যে কোন চাকরির ক্ষেত্রে অনুপস্থিত চাকুরিচ্যুত করতে গেলেও তাকে নোটিশ দেয়া হয়। এখানে একজন জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সংসদ সদস্যকে এ ব্যাপারে চরম ব্যবস্থা নেয়ার আগে কোনো নোটিশ দেয়া হয়নি।

২৬ এপ্রিল দুপুরে কলাবাগান লেক সার্কাস রোডের চীপ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর জ্যেষ্ঠপুত্র সাদেক আব্দুল্লাহর দখলকৃত বাসায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১৯৯৫ সালে ঝিগাতলার খায়রুল হত্যার সাথে জড়িত ক্যাট বাবু, সাঈদ ও পিন্টু নামে তিন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত সাঈদ বরিশালের একাধিক মামলার আসামী। গৃহকর্তীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে ধানমন্ডি থানা পুলিশ সাদেককে তার অবৈধ দখল ছেড়ে দিতে বলে। সাদেক সাততলা বাড়ির দুটি ফ্লোরে অবৈধভাবে দখল করেছিলেন। ঘটনার দু'বছর আগে ভাড়াটে হিসেবে তিনি এ বাড়িতে উঠেন। এরপর অবৈধভাবে সাততলা দখল করেন। ১৯৯৯ সালের জুলাই মাস থেকে তিনি আর কোন ভাড়া দেননি। তার লোকজন অস্ত্রের মুখে বাসার ভাড়াটেরদের বের করে দেয়। গৃহকর্তাকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে বাড়ি ভাড়া করে। বিভিন্ন পত্রিকায় এ নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশের পর পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হয়।

২ মে প্রধানমন্ত্রী সিলেট-ঢাকা মহাসড়কে বালাগঞ্জের সাদীপুর সেতু ও শায়েস্তাগঞ্জ খোয়াই সেতু উদ্বোধন করার পূর্বেই নির্মাণক্রটির কারণে সাদীপুর সেতুর ফ্লোরে ফাটল ও প্রেসেট প্লেট হেলে পড়ায় সেতুটি বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। অপরদিকে সাদীপুর সেতুর নিকট দু'টি হেলিপ্যাড, প্রধানমন্ত্রীর জন্য টয়লেট, উদ্বোধন ফলক ও স্টেজ নির্মাণসহ অন্যান্য সাময়িক স্থাপনার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রায় ২০ লাখ টাকা ব্যয় করে। প্রধানমন্ত্রীর ৩০ মিনিটের প্রোগ্রামের জন্য এতো টাকা খরচের বিষয়টি লোকজন উচ্চ বিলাসী বলে আখ্যায়িত করে অনেকেই মন্তব্য ছুঁড়েন 'ক্রটিপূর্ণ এই সেতু উদ্বোধনের নামে এতো টাকা খরচ না করে আরেকটি সেতু নির্মাণ করা যেতো।'

একমাত্র স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি) থেকেই আওয়ামী মন্ত্রী, এমপি ও দলীয় নেতারা ২০০০ সালে ৮০ হাজার ১৩১ টন গমের বরাদ্দ নেয়। বিরোধী দলের এমপিরা বরাদ্দ পান মাত্র ১৪ হাজার ৯১০ টন গম। অথচ গমের এই বরাদ্দের ক্ষেত্রে একটা ভারসাম্য রক্ষার কথা ছিল। সরকারের সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা অনুযায়ী থানা প্রকৌশলীদের অনুমোদিত স্কীমের বিপরীতে সরকার দলের এমপিদের ৩০০ টন এবং বিরোধী দলের এমপিদের ১৫০ টন করে গম বরাদ্দের কথা ছিল। কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, কবরস্থান ইত্যাদি সংস্কারের নামে অনেক আওয়ামী এমপি মন্ত্রীর চেয়ে ২/৪ গুণ বেশি বরাদ্দ নেয়। আবার কেউ নামমাত্র বরাদ্দও পান। এলজিইডি গম নিয়ে হৈ চৈ'র পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় যে প্রতিবেদন লিখেছে তা থেকে জানা যায়, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতের জন্য বরাদ্দ এই গম থেকে খোদ স্থানীয় সরকার উপ-মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরীই নেন ২ হাজার ৭০০ টন। অথচ এ গম ঢাকার জন্য বরাদ্দ দেয়ার কথা নয়। টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর নেন সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৪০০ টন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ১ হাজার ৪০০ টন এবং চীপ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ ১ হাজার টন, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জিল্লুর রহমান ৯০০ টন, ওবায়দুল কাদের ৭৫০ টন, স.ম. ফিরোজ ৬৫০ টন, ড.

www.pathagar.com

মিজানুল হক ৬শ' ১৪ টন, শেখ হেলাল ৬শ' টন, এডভোকেট আব্দুল মান্নান ৬শ' ৫০ টন, আব্দুল লতিফ মির্জা ৪০০ টন এবং পানি মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক ৩৪০ টন গম পান। এছাড়া চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুস সালাম ৩৫০ টন, কেরানীগঞ্জের নেতা নসরুল হামিদ ৩০০ টন, আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক সিদ্দিকুর রউফ খান ৩০০ টন, সাবেক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক এসএম ইউসুফ ৩৮০ টন, নোয়াখালীর প্রাক্তন এমপি অধ্যাপক মোহাম্মদ আরিফ ৪০০ টন গমের বরাদ্দ পান। এভাবে সরকারের মন্ত্রীরা বরাদ্দ নেন ২৬ হাজার ৪০৪ টন, সরকার দলীয় এমপিরা নেন ৪৭ হাজার ৮৬৭ টন, আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ-সংগঠনের নেতারা নেন ৫ হাজার ৮৬০ টন, বিরোধী দলের এমপিরা পান ১৪ হাজার ৯১০ টন এবং তদবির অনুযায়ী অন্যরা বাকী গমের বরাদ্দ পান। এক একজন ১০/১৫/২০/৩০টি করে প্রকল্পের বিপরীতে এই গমের বরাদ্দ নেন। যেখানে স্কুল-কলেজ মাদ্রাসার জন্য ১০ থেকে ১৫ টন, কবর ও শ্মশানের জন্য ৫ থেকে ১০ টন, রাস্তার অবস্থা অনুযায়ী ২০ থেকে ৫০ টন গম বরাদ্দের কথা ছিল, সেখানে যে যেমনটি পেরেছে তেমন করে বরাদ্দ নিয়েছে। প্রতিটি বরাদ্দপত্রে সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ স্থানীয় সরকার উপ-মন্ত্রীর স্বাক্ষর রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। স্থানীয় সরকার উপ-মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মনোয়ার হোসেন চৌধুরী গমের সব বরাদ্দ দেয়ায় সরকার তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। সারাদেশের গ্রামাঞ্চলের অবকাঠামোগত উন্নয়ন রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় থেকে ১ লাখ ২৮ হাজার ৮০০ টন গম বরাদ্দ করা হয়। কেয়ার, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ও ইউএসএইড বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য আরো ৭০ হাজার টন গম বরাদ্দ করে। এই ২ লাখ ৯৮ হাজার ৮০০ টন গমের বাজার মূল্য প্রায় ২৫০ কোটি টাকা। এলজিইডির মাধ্যমে এই গম বিতরণ যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় তার জন্য প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় সরকার উপ-মন্ত্রীকে সপ্তাহে ২ দিন এলজিইডি ভবনে অফিস করার জন্য নির্দেশ দেন। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই সরকার এলজিইডিকে ১ লাখ ১৮ হাজার ৮০০ টন গমের ছাড়পত্র দেয়। উপ-মন্ত্রীর সুপারিশক্রমে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী যেভাবে বরাদ্দপত্র মঞ্জুর করেন তাতে ৩১ মার্চের মধ্যে ১ লাখ ১৭ হাজার ৯১৪ টন গম শেষ হয়ে যায়। (সূত্রঃ দৈনিক যুগান্তর ৪ মে ২০০০)

আওয়ামী লীগের কতিপয় প্রাক্তন কৃষিবিদ ছাত্রনেতা প্রশ্ন আউট করে একটি সরকারি চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিতে চেয়েছিল। কিন্তু আগের রাতে প্রশ্ন আউট করতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে ১২ মে ঐ পরীক্ষায়ই ভন্ডুল করে দেয়। ফলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের আওতাধীন স্মল হোল্ডার এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের 'মনিটরিং অফিসার' নিয়োগ পরীক্ষাটি আর অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। উল্লেখিত প্রকল্পের ২৫টি মনিটরিং অফিসার পদে নিয়োগ লাভের উদ্দেশ্যে ৯টায় মানিক মিয়া এভিনিউর রাজধানী উচ্চ বিদ্যালয়ে লিখিত পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। এতে সারাদেশ প্রায় সাড়ে ৭শ' প্রার্থী অংশ নেন। কিন্তু পরীক্ষা শুরুর মুহূর্তে যখন প্রতিটি হলে প্রশ্নপত্র পাঠানো হয়, ঠিক তখনই ২০/২৫ জনের একদল প্রার্থী অকস্মাৎ হল পরিদর্শকের নিকট থেকে সকল খাতা ও প্রশ্নপত্র কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। তারা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে প্রতিটি কক্ষে প্রবেশ করেই সমুদয় প্রশ্নপত্র ও খাতাপত্র জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে 'প্রশ্ন আউট' হওয়ার কথিত অভিযোগ তুলে মিছিল করে। এ সময় পুলিশও অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। অন্য প্রার্থী ও কৃষি কর্মকর্তারাও এতে হতবাক হয়ে পড়েন। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ১৩ মে ২০০০)

www.pathagar.com

ছাত্রলীগের ছাত্রী ক্যাডাররা ৭ জুন রাত সাড়ে ৭টা থেকে ১ ঘন্টা বরিশাল প্রেসক্লাব অবরুদ্ধ করে সেখানে তারা একটি সোফা, চেয়ার, কলিংবেল ভেঙ্গে ফেলে। কয়েকজন সাংবাদিক ছাত্রী ক্যাডারদের ভিড়ের চাপে পড়ে জিম্মি ছিলেন এক ঘন্টা। প্রহসনমূলক বাকসু নির্বাচনে বিজয়ী ছাত্রলীগের ছাত্রী কর্মীরা ৫ জুন গভীর রাতে বিএম কলেজের বর্ণবমালী ছাত্রী নিবাসে আমোদ-ফূর্তি করে। আমোদ-ফূর্তির এক পর্যায়ে ছাত্রলীগের অপর এক গ্রুপ ছাত্রী নিবাসে হামলা চালায়। এ নিয়ে জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকে ৬ ও ৭ জুন সংবাদ প্রকাশিত হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে (ছাত্রী) ছাত্রলীগ ও নবনির্বাচিত বাকসু কর্মকর্তাবৃন্দ বর্ণবালী ছাত্রীনিবাসে অবস্থানরত নেত্রীরা নেতা ভাইদের কথামত প্রায় জোরপূর্বক ২/৩শ' ছাত্রীকে নিয়ে বরিশাল প্রেসক্লাবে আসেন। তাদের অভিযোগ, সাংবাদিকরা অতিরিক্ত ও মিথ্যা কথা লিখে দিয়েছে। প্রেসক্লাবে ছাত্রী ক্যাডারদের এ উগ্রতার সময় ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ প্রেসক্লাবের সামনের রাস্তায় অপেক্ষমান ছিল। (সূত্রঃ দৈনিক জনতা ৯ জুন ২০০০)

বাংলাদেশের ২৯ বছরের ইতিহাসে ২০০০-২০০১ সালেই সর্বপ্রথম উন্নয়ন ও রাজস্ব ব্যয় মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রীর অফিসের জন্য ২৮০ কোটি টাকার বিশাল ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। এ ব্যাপারে শুধুমাত্র রাজনৈতিক মহলই নয়, ড. মোজাফফর আহমদের মতো অর্থনীতিবিদও বিস্মিত হন। তিনি মন্তব্য করেন যে, 'কেন প্রধানমন্ত্রীর অফিসের জন্য প্রায় ৩শ' কোটি টাকার এই বিশাল বরাদ্দ দেয়া হলো তার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ বাজেট বিশ্লেষণে আমি খুঁজে পাইনি।' ২০০০-২০০১ সালের বাজেটসহ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে ৫টি বাজেট বিশ্লেষণ করলে অবিশ্বাস্য তথ্য বেরিয়ে আসে। ১৯৯৬-১৯৯৭ সালে প্রধানমন্ত্রীর অফিসের জন্য রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ করা হয় যথাক্রমে ৩৮ কোটি ৮৭ লাখ ও ১৩৩ কোটি ৩৪ লাখ, মোট ১৭২ কোটি ২১ লাখ টাকা। ১৯৯৭-১৯৯৮ সালে বরাদ্দ করা হয় যথাক্রমে ৩৯ কোটি ৫ লাখ ও ৭৫ কোটি ৪৪ লাখ, মোট ১৪৪ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো ১৯৯৬-১৯৯৭ সালে তার অফিসের ব্যয় ৫৭ কোটি ৫২ লাখ টাকা কমানো হয়। ১৯৯৮-১৯৯৯ সালে তার অফিসের মোট বরাদ্দ আরো কমিয়ে রাজস্ব উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ হয় যথাক্রমে ৪০ ও ৬৬ কোটি, মোট ১০৬ কোটি টাকা। আগের বছরের তুলনায় আলোচ্য বছর প্রধানমন্ত্রীর অফিসের ব্যয় হ্রাস করা হয় ৮ কোটি ৬৯ লাখ টাকা, কিন্তু তার পরের বছরই আবার ব্যয় বৃদ্ধি শুরু হয়। ১৯৯৯-২০০০ সালে প্রধানমন্ত্রীর অফিসের বরাদ্দ আরো বেড়ে যায়। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ১৩ জুন ২০০০)

কাওরান বাজারস্থ কেন্দ্রীয় কাঁচামালের আড়তের সম্মুখে অবস্থিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পার্কটি পুনরায় বেদখল হওয়ার তথ্য প্রকাশিত হয় ১৬ জুলাই ২০০০ দৈনিক ইনকিলাবে। ইনকিলাবে বলা হয়, 'পার্কের খোলা পরিবেশের পরিবর্তে সেখানে স্থান পেয়েছে বস্তির ন্যায় অসংখ্য ঝুঁপড়ি ঘর। এ ঘরগুলোকে কেন্দ্র করেই স্থানীয় একটি চিহ্নিত মহল লাখ লাখ টাকার অবৈধ ব্যবসা ফেঁদেছে। আর এই অবৈধ দখল ও ব্যবসার পিছনে শাসক দলীয় স্থানীয় কতিপয় লোক ও কিছু পেশাদার সন্ত্রাসী জড়িত থাকায় সাধারণ ব্যবসায়ীদের স্বাভাবিক কার্যক্রমও মারাত্মক বিঘ্নিত হচ্ছে। পার্কের সাথে সাথে এরা আশপাশের প্রতিটি রাস্তা দখল করে রাখায় প্রকৃত মার্কেটগুলো আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। মার্কেটের মালামাল উঠা-নামা ও লোক চলাচলের ক্ষেত্রে মারাত্মক বিঘ্নের সৃষ্টি হয়েছে। চলাচলের রাস্তাগুলো সব সময়ই ময়লা-আবর্জনা ও নোংরা কাদা পানিতে সয়লাব হয়ে থাকছে। এলাকার সাধারণ ব্যবসায়ী ও মার্কেটের ব্যবসায়ী সমিতিগুলো ইতিপূর্বে বহুবার সিটি কর্পোরেশনের ও আইন প্রয়োগকারী

www.pathagar.com

সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসব অবৈধ দখল উচ্ছেদের আবেদন জানায়। এর প্রেক্ষিতে ক'বছর আগে এসব অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে পাকটি ও রাস্তাঘাট খালি করে দেয়া হয়। কিন্তু দখলদারদের নিয়ন্ত্রণকর্তারা টাকার বিনিময়ে সবকিছু ম্যানেজ করে পুনরায় সেখানে ঝুপড়ি ঘর তৈরি করে।'

দীর্ঘ ২৫ বছর চাকরি করার পর প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মহাসচিব, আওয়ামী শিক্ষক নেত্রী সুফিয়া খাতুনের এসএসসি'র সার্টিফিকেট জাল ধরা পড়ে। জাল সার্টিফিকেট জমা দিয়ে ১৯৭৫ সাল থেকে তিনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করে আসছিলেন। জাল সার্টিফিকেট প্রমাণিত হওয়ায় ৭ সেপ্টেম্বর তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়। সুফিয়া খাতুনের সর্বশেষ কর্মস্থল ছিল ঢাকা মহানগরীর মিরপুর থানাধীন সেনপাড়া পর্বতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। তিনি ওই স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা ছিলেন। তার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। নিজের নামে মিরপুরে সরকারি বাসা বরাদ্দ নিয়ে তিনি সরকারি বিপুল টাকা আত্মসাৎ করেন। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০০)

দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে অনৈসলামিকীকরণ প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সরকার উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাকেও পুরোপুরি অনৈসলামিকীকরণ এবং একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের নেতৃত্বাধীন করার চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পদে একজন হিন্দু ব্যক্তিকে দিয়ে। দীর্ঘ পরিকল্পনার ফসল হিসেবে সরকার অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুল আলোচিত সিন্ডিকেট মেম্বার ও জাতীয় হিন্দু পরিষদের নেতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রফেসর ও জগন্নাথ হলের প্রভোষ্ট ড. দুর্গাদাস ভট্টাচার্যকে ৪ বছরের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়। তার নিয়োগ নিয়ে সচেতন শিক্ষক মহলে তীব্র সমালোচনার ঝড় উঠে। কেননা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে যাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা নেই। দুর্গাদাস তার শিক্ষাজীবনে ৫টি পাবলিক পরীক্ষার ৩টিতেই তৃতীয় শ্রেণী (কম্পার্টমেন্টালসহ) প্রাপ্ত। উপরন্তু তার অনার্সই নেই। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ২০ অক্টোবর ২০০০)

১০ নভেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি ঢাকা মহানগরীর সভাপতি সাবেক ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী সাদেক হোসেন খোকা এমপি নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম.এ.জি ওসমানীর নামে জাতীয় স্টেডিয়ামের নামকরণ পুনর্বহালের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান। সাবেক ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, '১৯৯৪ সাল থেকে ১৯৯৯-২০০০ সাল পর্যন্ত এ স্টেডিয়ামের নাম ওসমানীর নামেই ছিল। কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী স্টেডিয়াম উদ্বোধনের সময় তা পরিবর্তন করে সরকার দলীয় সংসদ সদস্য শামীম ওসমানের দাদা খান সাহেব ওসমান আলীর নামে রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী এ অপকর্ম করে শুধু জেনারেল ওসমানীকেই খাটো করেননি বরং মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন ও চেতনার প্রতি আঘাত হেনেছেন।' সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক মন্ত্রী এম.কে. আনোয়ার, মুক্তিযোদ্ধা নঈম জাহাঙ্গীর, ফারুকী আজম বীর প্রতীক, সাদেক আহমদ, মাইনুদ্দিন আহমদ মর্কিন, চৌধুরী আলম প্রমুখ। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'আমাদের জাতীয় জীবনের এ যাবতকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবজনক ঘটনা হলো মহান স্বাধীনতার যুদ্ধ। জেনারেল ওসমানী ছিলেন আমাদের এই মহান যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু জাতি হিসেবে আমরা যদি নিজেদের কৃতজ্ঞ এবং বীরের প্রতি শ্রদ্ধাবান বলে দাবী করি তাহলে ওসমানীর পুণ্যস্মৃতির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের তাগিদ সবাই স্বীকার করবেন।

www.pathagar.com

সেই দায়িত্ব থেকেই বিএনপি'র বিগত শাসনামলে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় ওসমানীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য একটি জাতীয় স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু আমরা অত্যন্ত দুঃখজনক ও ক্ষোভের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতা আসার পর থেকে ওসমানীর অবমূল্যায়ন ও তার পুণ্যস্মৃতির প্রতি বিদ্বেষমূলক অশ্রদ্ধা প্রদর্শন শুরু করেছে। কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় জাতীয় স্টেডিয়াম উদ্বোধন করেছেন। কিন্তু আমরা দেখলাম ওসমানীর নাম রাতারাতি পাল্টে দিয়ে সেই স্টেডিয়ামের নাম রাখা হয়েছে খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে এ অন্যায় হীন তৎপরতার প্রতিবাদ করেছিলাম। আমরা সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছিলাম, স্টেডিয়ামের নাম পরিবর্তন না করে ওসমানীর নামেই বহাল রাখতে। সরকার আমাদের কথায় কর্ণপাত করেনি। শুধু তাই নয়, সরকার অত্যন্ত নিম্নমানের চালাকি ও মিথ্যাচার দিয়ে তাদের অপকর্ম জায়েজ করারও চেষ্টা করেছে। সরকার এমন একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টাও করেছে যে, যেন এ স্টেডিয়াম তৈরির কাজ তারাই শুরু করেছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য তা নয়। এ স্টেডিয়াম ওসমানীর নামে নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ, ডিএডি থেকে অনুমোদন লাভ, মাটি ভরাটসহ প্রকল্প গ্রহণের কাজ বিএনপি বিগত শাসনামল থেকেই শুরু হয়। বিএনপি'র আমলে ১৬ কোটি ২৫ লাখ ৯৪ হাজার টাকা ব্যয়ে নারায়ণগঞ্জে ওসমানী স্টেডিয়াম নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৪-৯৫ সালে এ প্রকল্পের জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। সরকার কর্তৃক প্রণীত ১৯৯৪-৯৫ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ২৬৪ পৃষ্ঠায় এ প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাবলি সন্নিবেশিত আছে। ১৯৯৫-৯৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে নারায়ণগঞ্জ ওসমানী স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ৫ কোটি ৯৫ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়।

বর্তমান আওয়ামী লীগের ১৯৯৫-৯৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ২২২ পৃষ্ঠায় এ সকল তথ্য সন্নিবেশিত আছে। আওয়ামী লীগ ১৯৯৬-৯৭ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ওসমানী স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প নামে এ প্রকল্পটির জন্য ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। সরকার প্রণীত ১৯৯৬-৯৭ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ২২৪ পৃষ্ঠায় এতদসংক্রান্ত তথ্যাবলী সন্নিবেশিত আছে। ১৯৯৭-৯৮ সালে সংশোধিত উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রকল্পটির মোট ব্যয় দেখানো হয়েছে ২২ কোটি ৮৬ লাখ ৪৬ হাজার টাকা। ১৯৯৭-৯৮ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ২৩২ পৃষ্ঠায় এসব তথ্যাবলী সন্নিবেশিত আছে। ১৯৯৮-১৯৯৯ সালের সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্পে ওসমানী স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পের জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ২৪৪ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত তথ্য আছে। ১৯৯৯-২০০০ সালের সংশোধিত উন্নয়ন কর্মসূচিতে ওসমানী স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পে মোট ব্যয় দেখানো হয়েছে ২৪ কোটি ৮৫ লাখ ৮৭ হাজার টাকা এবং ওই বছরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৮ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। ১৯৯৯-২০০০ সালের সংশোধিত উন্নয়ন কর্মসূচির পৃষ্ঠা ২৫২ দ্রষ্টব্য। অর্থ্যাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি বিএনপি'র সরকার আমলে নির্মাণ শুরু হওয়া এ স্টেডিয়ামের নাম ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছর পর্যন্ত ওসমানীর নামেই বহাল ছিল। কিন্তু কিছুদিন আগে উদ্বোধনের সময় তা পরিবর্তন করে ওসমান আলী নামে রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, জেনারেল ওসমানী এবং ওসমান আলী দুজনই পরলোকবাসী। মরহুমের প্রতি আমাদের কোনো বিদ্বেষ নেই, থাকা উচিত নয়। এ সরকার যদি মরহুম ওসমান আলীর নামে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতো তাহলে কারো আপত্তি থাকত না। কিন্তু মরহুম ওসমান আলীকে যদি অবদানের দিক থেকে জেনারেল ওসমানীর বিকল্প ধরে নিয়ে জেনারেল ওসমানীর নামাঙ্কিত কোনো

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠান মরহুম ওসমান আলী নামে রাখা হয় তাহলে আপত্তির যুক্তিসঙ্গত কারণ আমাদের রয়েছে। কেননা মহান মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে এ জাতির মৌলিক আবেগ বিকল্পহীন গৌরব। এ সরকার যে জেনারেল ওসমানীকে স্রেফ খাটো করার জন্য এ অপকর্ম করেছে তাতে এখন তার কোনো সন্দেহ নেই এবং আমরা এও মনে করি যে, এ সরকার তার হীনতা-নীচতা চরিতার্থ করতে গিয়ে মরহুম ওসমান আলীকে অহেতুক বিতর্কে টেনে এনে তার স্মৃতির প্রতিও অসম্মান প্রদর্শন করেছে। জেনারেল ওসমানীর মতো একজন মহীরুহের বিকল্প হিসেবে মরহুম ওসমান আ'লীর অধিষ্ঠান জাতীয়ভাবে কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। আমরা এ আশঙ্কাও করি যে, অদূর ভবিষ্যতে যখন এ সরকার ক্ষমতায় থাকবে না তখন আবার নাম পরিবর্তন হলে সেখানে মরহুম ওসমান আলীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা কি প্রদর্শিত হবে? তাই সরকারের কাছে আমরা এখনো দাবী করছি, এ স্টেডিয়ামে জেনারেল ওসমানীর নাম পুনর্বহাল করুন। সবকিছু নিয়ে নোংরা খেলতে যাবেন না। এ নোংরামী দেশের হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধ প্রেমিক কোটি কোটি মানুষ কখনো মেনে নেবে না। (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল ১১ নভেম্বর ২০০০)

www.pathagar.com

ISBN 984 8404 46 5

9 789848 404461